৭ম বর্ষের সূচী।

বঙ্গদর্শন।

সৌন্দর্য্য ও সাহিত্য।*

"সৌন্দর্য্যবোধ" ও "বিশ্বসাহিত্য" প্রবন্ধে আমার বক্তব্যবিষয়টি স্পষ্ট হয় নাই, এমন অপবাদ প্রচার হওয়াতে যথাসাধ্য পুনরুক্তি বাঁচাইয়া মূলকথাটা পরিষ্কার করিয়া লইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।

যেমন জগতের যে ঘটনাটিকে কেবল এই-মাত্র জানি যে, তাহা ঘটিতেছে, কিন্তু কেন ঘটিতেছে, তাহার পূর্ব্বাপর কি, জগতের অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কোথায়, তাহা না জানিলে তাহাকে পুরাপুরি আমাদের জ্ঞানে জানা হয় না—তেমনি জগতে যে সকল কেবল আছে মাত্র বলিয়াই জানি, কিন্তু তাহাতে আমার কোনো আনন্দই নাই, তাহা আমার হৃদয়ের পক্ষে একেবারে নাই বলিলেই হয়। এই যে এত-বড় জগতে আমরা রহিয়াছি, ইহার অনেকটাকেই আমাদের জানা-জগতের সম্পূর্ণ সামিল করিয়া আনিতে পারি নাই, এবং ইহার অধিকাংশই আমাদের মনোহর জগতের মধ্যে ভুক্ত হইয়া আমাদের আপন হইয়া উঠে নাই।

অথচ, জগতের যতটা জ্ঞানের দ্বারা আমি জানিব ও হৃদয়ের দ্বারা আমি পাইব, ততটা আমারই ব্যাপ্তি, আমারই বিস্তৃতি। জগৎ যে পরিমাণে আমার অতীত, সেই পরিমাণে আমি ছোট। সেইজন্য আমার মনোবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি, আমার কর্ম্মশক্তি নিখিলকে কেবলি অধিক করিয়া অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। এমনি করিয়াই আমাদের সত্তা সত্যে ও শক্তিতে বিস্তৃত হইয়া উঠে।

এই বিকাশের ব্যাপারে আমাদের সৌন্দর্য্য-বোধ কোন্ কাজে লাগে? সে কি সত্যের যে অংশকে আমরা বিশেষ করিয়া সুন্দর বলি—কেবল তাহাকেই আমাদের হৃদয়ের কাছে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া বাকি অংশকে ম্লান ও তিরস্কৃত করিয়া দেয়? এ যদি হয়, তবে ত সৌন্দর্য্য আমাদের বিকাশের বাধা—নিখিল সত্যের মধ্যে হৃদয়কে ব্যাপ্ত হইতে দিবার পক্ষে সে আমাদের অন্তরায়। সে ত তবে সত্যের মাঝখানে বিন্ধ্যাচলের মত উঠিয়া তাহাকে সুন্দর-অসুন্দরের আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পরস্পরের মধ্যে চলাচলের পথকে দুর্গম করিয়া রাখিয়াছে। আমি বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, তাহা নহে;—জ্ঞান যেমন ক্রমে ক্রমে সমস্ত সত্যকেই আমাদের বুদ্ধিশক্তির আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে,

* জাতীয় শিক্ষাপরিষদে পঠিত।

সৌন্দর্য্যবোধও তেমনি সমস্ত সত্তাকেই ক্রমে ক্রমে আমাদের আনন্দের অধিকারে আনিবে, এই তাহার একমাত্র সার্থকতা। সমস্তই সত্য, এইজন্য সমস্তই আমাদের জ্ঞানের বিষয়। এবং সমস্তই সুন্দর, এইজন্য সমস্তই আমাদের আনন্দের সামগ্রী।

গোলাপফুল আমার কাছে যে কারণে সুন্দর, সমগ্র জগতের মধ্যে সেই কারণটি বড় করিয়া রহিয়াছে। বিশ্বের মধ্যে সেইরূপ উদার প্রাচুর্য্য অথচ তেমনি কঠিন সংযম;—তাহার কেন্দ্রাতিগ শক্তি অপরিসীম বৈচিত্র্যে আপনাকে চতুর্দ্দিকে সহস্রধা করিতেছে এবং তাহার কেন্দ্রানুগ শক্তি এই উদ্দাম বৈচিত্র্যের উল্লাসকে একটিমাত্র পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যে মিলাইয়া রাখিয়াছে। এই যে একদিকে ফুটিয়া-পড়া এবং আর একদিকে আঁটিয়া-ধরা, ইহারই ছন্দে ছন্দে সৌন্দর্য্য,—বিশ্বের মধ্যে এই ছাড়িয়া-দেওয়া এবং টান-রাখার নিত্য লীলাতেই সুন্দর আপনাকে সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতেছেন। যাদুকর অনেকগুলি গোলা লইয়া যখন খেলা করে, তখন গোলাগুলিকে একসঙ্গে ছুঁড়িয়া-ফেলা এবং লুফিয়া-ধরার দ্বারাই আশ্চর্য্য চাতুর্য্য ও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে থাকে। ইহার মধ্যে যদি কোনো-একটা গোলার কেবল ক্ষণকালীন অবস্থা আমাদের চোখে পড়ে, তবে হয় তাহার ওঠা নয় পড়া দেখি—তাহাতে দেখার পূর্ণতা হয় না বলিয়া আনন্দের পূর্ণতা ঘটে না। জগতের আনন্দলীলাকেও আমরা যতই পূর্ণতররূপে দেখি, ততই জানিতে পারি, ভালমন্দ, সুখদুঃখ, জীবনমৃত্যু সমস্তই উঠিয়া ও পড়িয়া বিশ্বসঙ্গীতের ছন্দ রচনা করিতেছে —সমগ্রভাবে দেখিলে এই ছন্দের কোথাও বিচ্ছেদ নাই, সৌন্দর্য্যের কোথাও লাঘবতা নাই। জগতের মধ্যে সৌন্দর্য্যকে এইরূপ সমগ্রভাবে দেখিতে শেখাই সৌন্দর্য্যবোধের শেষ লক্ষ্য। মানুষ তেমনি করিয়া দেখিবার দিকে যতই অগ্রসর হইতেছে, তাহার আনন্দকে ততই জগতের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিতেছে —পূর্ব্বে যাহা নিরর্থক ছিল ক্রমেই তাহা সার্থক হইয়া উঠিতেছে, পূর্ব্বে যে যাহার প্রতি উদাসীন ছিল ক্রমে সে তাহাকে আপনার সঙ্গে মিলাইয়া লইতেছে, এবং যাহাকে বিরুদ্ধ বলিয়া জানিত তাহাকে বৃহতের মধ্যে দেখিয়া তাহার ঠিক স্থানটিকে দেখিতে পাইতেছে ও তৃপ্তিলাভ করিতেছে। বিশ্বের সমগ্রের মধ্যে মানুষের এই সৌন্দর্য্যকে দেখার বৃত্তান্ত, জগৎকে তাহার আনন্দের দ্বারা অধিকার করিবার ইতিহাস মানুষের সাহিত্যে আপনা-আপনি রক্ষিত হইতেছে।

কিন্তু সৌন্দর্য্যকে অনেকসময় আমরা নিখিল সত্য হইতে পৃথক করিয়া দেখি এবং তাহাকে লইয়া দল বাঁধিয়া বেড়াই, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপে সৌন্দর্য্যচর্চ্চা, সৌন্দর্য্য-পূজা বলিয়া একটা সাম্প্রদায়িক ধুয়া আছে। সৌন্দর্য্যের বিশেষভাবের অনুশীলনটা যেন একটা বিশেষ বাহাদুরির কাজ, এইরূপ ভঙ্গীতে একদল লোক তাহার জয়ধ্বজা উড়াইয়া বেড়ায়। স্বয়ং ঈশ্বরকেও এইরূপ নিজের বিশেষ-দলভুক্ত করিয়া বড়াই করিয়া এবং অন্য দলের সঙ্গে লড়াই করিয়া বেড়াইতে মানুষকে দেখা গিয়াছে।

বলা বাহুল্য, সৌন্দর্য্যকে চারিদিক্ হইতে বিশেষ করিয়া লইয়া জগতের আর সমস্ত ডিঙাইয়া কেবল তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া

বেড়ানো সংসারের পনেরো-আনা লোকের কর্ম্ম নহে। কেবলি সুন্দর-অসুন্দর বাঁচাইয়া যেন তপস্বীদের মত প্রতি পদক্ষেপের হিসাব লইয়া চলিতে গেলে চলাই হয় না।

পৃথিবীতে, কি সৌন্দর্য্যে, কি শুচিতায়, যাহাদের হিসাব নিরতিশয় সূক্ষ্ম, তাহারা মোটা-হিসাবের লোকদিগকে অবজ্ঞা করে। তাহা-দিগকে বলে গ্রাম্য। মোটা-হিসাবের লোকেরা সসঙ্কোচে তাহা স্বীকার করিয়া লয়।

য়ুরোপের সাহিত্যে, সৌন্দর্য্যের দোহাই দিয়া, যাহা-কিছু প্রচলিত, যাহা-কিছু প্রাকৃত, তাহাকে তুচ্ছ, তাহাকে hum-drum বলিয়া একেবারে ঝাঁটাইয়া দিবার চেষ্টা কোনো কোনো জায়গায় দেখা যায়। আমার বেশ মনে আছে—অনেকদিন হইল, কোনো বড় লেখকের লেখা একখানি ফরাসী-বহির ইংরেজি তর্জ্জমা পড়িয়াছিলাম। সে বইখানি নামজাদা। কবি সুইন্‌বর্‌ন্‌ তাহাকে Gospel of Beauty অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের ধর্ম্মশাস্ত্র উপাধি দিয়াছেন। তাহাতে একদিকে একজন পুরুষ ও আর একদিকে একজন স্ত্রীলোক আপনার সম্পূর্ণ মনের মতনকে পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর মধ্যে খুঁজিয়া বেড়ানোকেই জীবনের ব্রত করিয়াছে। সংসারের যাহা-কিছু প্রতিদিনের, যাহা-কিছু চারিদিকের, যাহা-কিছু সাধারণ, তাহা হইতে কোনোমতে আপনাকে বাঁচাইয়া, অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার সামান্যতাকে পদে-পদে অপমান করিয়া সমস্ত বইখানির মধ্যে আশ্চর্য্য লিপিচাতুর্য্যের সহিত রঙের পর রং, সুরের পর সুর চড়াইয়া সৌন্দর্য্যের একটি অতি দুর্লভ উৎকর্ষের প্রতি একটি অতি তীব্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করা হইয়াছে। আমার ত মনে হয়, এমন নিষ্ঠুর বই আমি পড়ি নাই। আমার কেবলি মনে হইতেছিল, সৌন্দর্য্যের টান মানুষের মনকে যদি সংসার হইতে এমনই করিয়া ছিনিয়া লয়, মানুষের বাসনাকে তাহার চারিদিকের সহিত যদি কোনোমতেই খাপ্‌ খাইতে না দেয়, যাহা প্রচলিত তাহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রচার করে, যাহা হিতকর তাহাকে গ্রাম্য বলিয়া পরিহাস করিতে থাকে, তবে সৌন্দর্য্যে ধিক্‌ থাক্‌। এ যেন আঙুরকে দলিয়া তাহার সমস্ত কান্তি ও রসগন্ধ বাদ দিয়া কেবলমাত্র তাহার মদটুকুকেই চোলাইয়া লওয়া।

সৌন্দর্য্য জাত মানিয়া চলে না—সে সকলের সঙ্গেই মিশিয়া আছে। সে আমাদের ক্ষণকালের [illegible] চিরন্তনকে, আমাদের সামান্যের মুখশ্রীতেই চিরবিস্ময়কে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়া দেয়। সমস্ত জগতের যেটি মূল-সুর, সৌন্দর্য্য সেটি আমাদের মনের মধ্যে ধরাইয়া দেয়—সমস্ত সত্যকে তাহার সাহায্যে নিবিড় করিয়া দেখিতে পাই। একদিন ফাল্গুন-মাসের দিনশেষে অতি সামান্য যে একটা গ্রামের পথ দিয়া চলিয়াছিলাম—বিকশিত সর্ষের ক্ষেত হইতে গন্ধ আসিয়া সেই বাঁকা রাস্তা, সেই পুকুরের পাড়, সেই ঝিকিমিকি বিকাল-বেলাটিকে আমার হৃদয়ের মধ্যে চিরদিনের করিয়া দিয়াছে। যাহাকে চাহিয়া দেখিতাম না, তাহাকে বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছে; যাহাকে ভুলিতাম, তাহাকে ভুলিতে দেয় নাই। সৌন্দর্য্যে আমরা যেটিকে দেখি, কেবল সেইটিকেই দেখি এমন নয়, তাহার যোগে আর সমস্তকেই দেখি; মধুর গান সমস্ত জল-স্থল-আকাশকে, অস্তিত্ব-মাত্রকেই মর্য্যাদাদান করে। যাঁহারা সাহিত্যবীর,

তাঁহারাও অস্তিত্বমাত্রের গৌরবঘোষণা করিবার ভার লইয়াছেন। তাঁহারা ভাষা, ছন্দ ও রচনারীতির সৌন্দর্য্য দিয়া এমন সকল জিনিষকে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করেন, অতিপ্রত্যক্ষ বলিয়াই আমরা যাহাদিগকে চাহিয়া দেখি না। অভ্যাসবশত সামান্যকে আমরা তুচ্ছ বলিয়া জানি—তাঁহারা সেই সামান্যের প্রতি তাঁহাদের রচনাসৌন্দর্য্যের সমাদর অর্পণ করিবামাত্র আমরা দেখিতে পাই, তাহা সামান্য নহে, সৌন্দর্য্যের বেষ্টনে তাহার সৌন্দর্য্য ও তাহার মূল্য ধরা পড়িয়াছে। সাহিত্যের আলোকে আমরা অতিপরিচিতকে নূতন করিয়া দেখিতে পাই বলিয়া, সুপরিচিত এবং অপরিচিতকে আমরা একই বিস্ময়পূর্ণ অপূর্ব্বতার মধ্যে গভীর করিয়া উপলব্ধি করি।

কিন্তু মানুষের যখন বিকৃতি ঘটে, তখন সৌন্দর্য্যকে সে তাহার পরিবেশ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাহাকে উল্টা কাজে লাগাইতে থাকে। মাথাকে শরীর হইতে কাটিয়া লইলে সেই কাটামুণ্ড শরীরের যেমন বিরুদ্ধ হয়, এ তেমনি। সাধারণ হইতে বিশেষ করিয়া লইলে সাধারণের বিরুদ্ধে সৌন্দর্য্যকে দাঁড় করান হয়; তাহাকে সত্যের ঘরশত্রু করিয়া তাহার সাহায্যে সামান্যের প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণা জন্মাইবার উপায় করা হয়। বস্তুত সে জিনিষটা তখন সৌন্দর্য্যের যথার্থ ধর্ম্মই পরিহার করে। ধর্ম্মই বল, সৌন্দর্য্যই বল, যে-কোনো বড় জিনিষই বল না, যখনি তাহাকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া একটু বিশেষ করিয়া লইবার চেষ্টা করা হয়, তখনই তাহার স্বরূপটি নষ্ট হইয়া যায়। নদীকে আমার করিয়া লইবার জন্য বাঁধিয়া লইলে সে আর নদীই থাকে না, সে পুকুর হইয়া পড়ে।

এইরূপে সংসারে অনেকে সৌন্দর্য্যকে সঙ্কীর্ণ করিয়া তাহাকে ভোগবিলাসের, অহঙ্কারের ও মত্ততার সামগ্রী করিয়া তোলাতেই কোনো কোনো সম্প্রদায় সৌন্দর্য্যকে বিপদ্ বলিয়াই গণ্য করিয়াছে। তাহারা বলে, সৌন্দর্য্য কেবল কনকলঙ্কাপুরী মজাইবার জন্যই আছে।

ঈশ্বরের প্রসাদে বিপদ্ কিসে নাই! জলে বিপদ্, স্থলে বিপদ্, আগুনে বিপদ, বাতাসে বিপদ্। বিপদ্ই আমাদের কাছে প্রত্যেক জিনিষের সত্য পরিচয় ঘটায়, তাহার ঠিক ব্যবহারটি শিখাইতে থাকে।

ইহার উত্তরে কথা উঠিবে—জলে-স্থলে, আগুনে-বাতাসে আমাদের এত প্রয়োজন যে, তাহাদের নহিলে একমুহূর্ত্ত টিকিতে পারি না—সুতরাং সমস্ত বিপদ্ স্বীকার করিয়াই তাহাদিগকে সকলরকম করিয়া চিনিয়া লইতে হয়, কিন্তু সৌন্দর্য্যরসভোগ আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে, সুতরাং তাহা নিছক্ বিপদ্. অতএব তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য এই বুঝি—ঈশ্বর আমাদের মন পরীক্ষা করিবার জন্যই সৌন্দর্য্যের মায়ামৃগকে আমাদের সম্মুখে দৌড় করাইতেছেন। ইহার প্রলোভনে আমরা অসাবধান হইলেই জীবনের সারধনটি চুরি যায়।

রক্ষা কর! ঈশ্বর পরীক্ষক এবং সংসার পরীক্ষাস্থল, এই সমস্ত মিথ্যা বিভীষিকার কথা আর সহ্য হয় না। আমাদের নকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঈশ্বরের খাঁটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা করিয়ো না। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নাই এবং পরীক্ষার কোনো প্রয়োজনই নাই। সে বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র শিক্ষাই আছে। সেখানে কেবল বিকাশেরই ব্যাপার চলিতেছে।

সেইজন্য, মানুষের মনে সৌন্দর্য্যবোধ যে এমন প্রবল হইয়া আছে, সে আমাদের বিকাশ ঘটাইবে বলিয়াই। বিপদ্ থাকে ত থাক্, তাই বলিয়া বিকাশের পথকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া চলিলে মঙ্গল নাই।

বিকাশ বলিতে কি বুঝায়, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সমগ্রের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ যতরকম করিয়া যতদূর ব্যাপ্ত হইতে থাকে, ততই প্রত্যেকের বিকাশ। স্বর্গরাজ ইন্দ্র যদি আমাদের সেই যোগসাধনের বিঘ্ন ঘটাইবার জন্যই সৌন্দর্য্যকে মর্ত্ত্যে পাঠাইয়া দেন, ইহা সত্য হয়, তবে ইন্দ্রদেবের সেই প্রবঞ্চনাকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া দুই চক্ষু মুদিয়া থাকাই শ্রেয়, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

কিন্তু ইন্দ্রদেবের প্রতি আমার লেশমাত্র অবিশ্বাস নাই। তাঁহার কোনো দূতকেই মারিয়া খেদাইতে হইবে, এমন কথা আমি বলিতে পারিব না। এ কথা নিশ্চয় জানি, সত্যের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের প্রগাঢ় এবং অখণ্ড মিলন ঘটাইবার জন্যই সৌন্দর্য্যবোধ হাসিমুখে আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। সে কেবল বিনা-প্রয়োজনের মিলন—সে কেবলমাত্র আনন্দের মিলন। নীলাকাশ যখন নিতান্তই শুধুশুধু আমাদের হৃদয় দখল করিয়া সমস্ত শ্যামল পৃথিবীর উপর তাহার জ্যোতির্ম্ময় পীতাম্বরটি ছড়াইয়া দেয়, তখনি আমরা বলি, সুন্দর। বসন্তে গাছের নূতন কচিপাতা বনলক্ষ্মীদের অঙ্গুলিগুলির মত যখন একেবারেই বিনা আবশ্যকে আমাদের দুই চোখকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিতে থাকে, তখনি আমাদের মনে সৌন্দর্য্যরস উছলিয়া উঠে।

কিন্তু সৌন্দর্য্যবোধ কেবল সুন্দরনামক সত্যের একটা অংশের দিকেই আমাদের হৃদয়কে টানে ও বাকি অংশ হইতে আমাদের হৃদয়কে ফিরাইয়া দেয়, তাহার এই অন্যায় বদ্‌নাম কেমন করিয়া ঘুচান যাইবে, সেই কথাই ভাবিতেছি।

আমাদের জ্ঞানশক্তিই কি জগতের সমস্ত সত্যকেই এখনি আমাদের জানার মধ্যে আনিয়াছে? আমাদের কর্ম্মশক্তিই কি জগতের সমস্ত শক্তিকে আজই আমাদের ব্যবহারের আয়ত্ত করিয়াছে? জগতের এক অংশ আমাদের জানা, অধিকাংশই অজানা, বিশ্বশক্তির সামান্য অংশ আমাদের কাজে খাটিতেছে, অধিকাংশকেই আমরা ব্যবহারে লাগাইতে পারি নাই। তা হউক, তবু আমাদের জ্ঞান সেই জানা-জগৎ ও না-জানা জগতের দ্বন্দ্ব প্রতিদিন একটু একটু ঘুচাইয়া চলিয়াছে—যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া জগতের সমস্ত সত্যকে ক্রমে আমাদের বুদ্ধির অধিকারে আনিতেছে ও জগৎকে আমাদের মনের জগৎ, আমাদের জ্ঞানের জগৎ করিয়া তুলিতেছে; আমাদের কর্ম্মশক্তি জগতের সমস্ত শক্তিকে ব্যবহারের দ্বারা ক্রমে ক্রমে আপন করিয়া তুলিতেছে এবং বিদ্যুৎ-জল-অগ্নি-বাতাস দিনে দিনে আমাদেরই বৃহৎ কর্ম্মশরীর হইয়া উঠিতেছে। আমাদের সৌন্দর্য্যবোধও ক্রমে ক্রমে সমস্ত জগৎকে আমাদের আনন্দের জগৎ করিয়া তুলিতেছে—সেইদিকেই তাহার গতি। জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার মন ব্যাপ্ত হইবে, কর্ম্মের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার শক্তি ব্যাপ্ত হইবে এবং সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার আনন্দ ব্যাপ্ত হইবে, মনুষ্যত্বের ইহাই লক্ষ্য। অর্থাৎ জগৎকে

জ্ঞানরূপে পাওয়া, শক্তিরূপে পাওয়া ও আনন্দরূপে পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে।

কিন্তু পাওয়া-না-পাওয়ার বিরোধের ভিতর দিয়া ছাড়া পাওয়া যাইতেই পারে না; দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া ছাড়া বিকাশ হইতেই পারে না, সৃষ্টির গোড়াকার এই নিয়ম। একের দুই হওয়া এবং দুয়ের এক হইতে থাকাই বিকাশ।

বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখ। মানুষের একদিন এমন অবস্থা ছিল, যখন সে গাছে, পাথরে, মানুষে, মেঘে, চন্দ্রে, সূর্য্যে, নদীতে, পর্ব্বতে প্রাণি-অপ্রাণীর ভেদ দেখিতে পাইত না। তখন সবই তাহার কাছে যেন সমান-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। ক্রমে তাহার বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধিতে প্রাণী ও অপ্রাণীর ভেদ একান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপে অভেদ হইতে প্রথমে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। তাহা যদি না হইত, তবে প্রাণের প্রকৃত লক্ষণগুলিকে সে কোনোদিন জানিতেই পারিত না। এদিকে লক্ষণগুলিকে যতই সে সত্য করিয়া জানিতে লাগিল, দ্বন্দ্ব ততই দূরে সরিয়া যাইতে থাকিল। প্রথমে প্রাণী ও উদ্ভিদের মাঝখানের গণ্ডিটা ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল; কোথায় উদ্ভিদের শেষ ও প্রাণীর আরম্ভ, তাহা আর ঠাহর করা যায় না। তাহার পরে আজ, ধাতুদ্রব্য—যাহাকে জড় বলিয়া নিশ্চিন্ত আছি—তাহার মধ্যেও প্রাণের লক্ষণ বিজ্ঞানের চক্ষে ধরা দিবার উপক্রম করিতেছে। অতএব যে ভেদবুদ্ধির সাহায্যে আমরা প্রাণ-জিনিষটাকে চিনিয়াছি, চেনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভেদটা ক্রমেই লুপ্ত হইতে থাকিবে, অভেদ হইতে দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্ব হইতেই ঐক্য বাহির হইবে এবং অবশেষে বিজ্ঞান একদিন উপনিষদের ঋষিদের সঙ্গে সমান সুরে বলিবে—"সর্ব্বং প্রাণ এজতি"—সমস্তই প্রাণে কম্পিত হইতেছে।

যেমন সমস্তই প্রাণে কাঁপিতেছে, তেম্‌নি সমস্তই আনন্দ, উপনিষদ্ এ কথাও বলিয়াছেন। জগতের এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দরূপ দেখিবার পথে সুন্দর-অসুন্দরের ভেদটা প্রথমে একান্ত হইয়া মাথা তোলে। নহিলে সুন্দরের পরিচয় ঘটা একেবারে অসম্ভব।

আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের প্রথমাবস্থায় সৌন্দর্য্যের একান্ত স্বাতন্ত্র্য আমাদিগকে যেন ঘা মারিয়া জাগাইতে চায়। এইজন্য বৈপরীত্য তাহার প্রথম অস্ত্র। খুব একটা টক্‌টকে রং, খুব একটা গঠনের বৈচিত্র্য নিজের চারিদিকের ম্লানতা হইতে যেন ফুঁড়িয়া-উঠিয়া আমাদিগকে হাঁক দিয়া ডাকে। সঙ্গীত কেবল উচ্চশব্দের উত্তেজনা আশ্রয় করিয়া আকাশ মাৎ করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। অবশেষে সৌন্দর্য্যবোধ যতই বিকাশ পায়, ততই স্বাতন্ত্র্য নহে সুসঙ্গতি, আঘাত নহে আকর্ষণ, আধিপত্য নহে সামঞ্জস্য—আমাদিগকে আনন্দদান করে। এইরূপে সৌন্দর্য্যকে প্রথমে চারিদিক্ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া সৌন্দর্য্যকে চিনিবার চর্চ্চা করি, তাহার পরে সৌন্দর্য্যকে চারিদিকের সঙ্গে মিলাইয়া-লইয়া চারিদিক্‌কেই সুন্দর বলিয়া চিনিতে পারি।

একটুখানির মধ্যে দেখিলে আমরা অনিয়ম দেখি, চারিদিকের সঙ্গে অখণ্ড করিয়া মিলাইয়া দেখিলেই নিয়ম আমাদের কাছে ধরা পড়ে। তখন,—যদি-চ ধোঁয়া আকাশে উড়িয়া যায় ও ঢেলা মাটিতে পড়ে, সোলা জলে ভাসে ও লোহা জলে ডোবে, তবু এই সমস্ত দ্বৈতের

মধ্যে ভারাকর্ষণের এক নিয়মের কোথাও বিচ্ছেদ দেখি না।

জ্ঞানকে ভ্রমমুক্ত করিবার এই যেমন উপায়, তেমনি আনন্দকেও বিশুদ্ধ করিতে হইলে তাঁহাকে খণ্ডতা হইতে ছুটি দিয়া সমগ্রের সহিত যুক্ত করিতে হইবে। যেমন উপস্থিত যাহাই প্রতীতি হয়, তাহাকেই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে বিজ্ঞানে বাধে, তেম্‌নি উপস্থিত যাহাই আমাদিগকে মুগ্ধ করে, তাহাকেই সুন্দর বলিয়া ধরিয়া লইলে আনন্দের বিঘ্ন ঘটে। আমাদের প্রতীতিকে নানাদিক্ দিয়া সর্ব্বত্র যাচাই করিয়া লইলে তবেই তাহার সত্যতা স্থির হয়—তেম্‌নি আমাদের অনুভূতিকেও তখনি আনন্দ বলিতে পারি, যখন সংসারের সকল দিকেই সে মিশ খায়। মাতাল মদ খাইয়া যতই সুখবোধ করুক্, নানা দিকেই সে সুখের বিরোধ;—তাহার আপনার সুখ, অন্যের দুঃখ, তাহার আজিকার সুখ, কালিকার দুঃখ, তাহার প্রকৃতির এক অংশের সুখ, প্রকৃতির অন্য অংশের দুঃখ। অতএব এ সুখে সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, আনন্দভঙ্গ হয়। প্রকৃতির সমস্ত সত্যের সঙ্গে ইহার মিল হয় না।

নানা দ্বন্দ্ব, নানা সুখদুঃখের ভিতর দিয়া মানুষ সুন্দরকে, আনন্দকে সত্যের সব দিকে ছড়াইয়া বৃহৎ করিয়া চিনিয়া লইতেছে। তাহার এই চেনা কোথায় সঞ্চিত হইতেছে? জগদ্ব্যাপারসম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অনেকদিন হইতে অনেক লোকের দ্বারা স্মৃতিবদ্ধ হইয়া বিজ্ঞানের ভাণ্ডার ভরিয়া তুলিতেছে—এই সুযোগে একজনের দেখা আর একজনের দেখার সঙ্গে, এককালের দেখা আর এক কালের দেখার সঙ্গে পরখ করিয়া লইবার সুবিধা হয়। এমন নহিলে বিজ্ঞান পাকা হইতেই পারে না। তেম্‌নি মানুষ-কর্ত্তৃক সুন্দরের পরিচয়, আনন্দের পরিচয়, দেশে দেশে কালে কালে সাহিত্যে সঞ্চিত হইতেছে। সত্যের উপরে মানুষের হৃদয়ের অধিকার কোন্ পথ দিয়া কেমন করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে—সুখবোধ কেমন করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে ক্রমে প্রসারিত হইয়া মানুষের সমস্ত মন, ধর্ম্মবুদ্ধি ও হৃদয়কে অধিকার করিয়া লইতেছে ও এম্‌নি করিয়া ক্ষুদ্রকেও মহৎ এবং দুঃখকেও প্রিয় করিয়া তুলিতেছে —মানুষ নিয়তই আপনার সাহিত্যে সেই পথের চিহ্ন রাখিয়া চলিয়াছে। যাঁহারা বিশ্বসাহিত্যের পাঠক, তাঁহারা সাহিত্যের ভিতর দিয়া সেই রাজপথটির অনুসরণ করিয়া—সমস্ত মানুষ হৃদয় দিয়া কি চাহিতেছে ও হৃদয় দিয়া কি পাইতেছে, সত্য কেমন করিয়া মানুষের কাছে মঙ্গলরূপ ও আনন্দরূপ ধরিতেছে—তাহাই সন্ধান করিয়া ও অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

ইহা মনে রাখিতে হইবে, মানুষ কি জানে, তাহাতে নয়, কিন্তু মানুষ কিসে আনন্দ পায়, তাহাতেই মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের সেই পরিচয়ই আমাদের কাছে ঔৎসুক্যজনক। যখন দেখি, সত্যের জন্য কেহ নির্ব্বাসন স্বীকার করিতেছে, তখন সেই বীর-পুরুষের আনন্দের পরিধি আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। দেখিতে পাই, সে আনন্দ এত বড় জায়গা অধিকার করিয়া আছে যে, নির্ব্বাসনদুঃখ অনায়াসে তাহার অঙ্গ হইয়াছে। এই দুঃখের দ্বারাই আনন্দের মহত্ত্ব প্রমাণ হইতেছে। টাকার

মধ্যেই যাহার আনন্দ, সে টাকার ক্ষতির ভয়ে অসত্যকে, অপমানকে অনায়াসে স্বীকার করে। সে চাকরী বজায় রাখিতে অন্যায় করিতে কুণ্ঠিত হয় না;—এই লোকটি যত পরীক্ষাই পাস্ করুক্, ইহার যত বিদ্যাই থাক্, আনন্দশক্তির সীমাতেই ইহার যথার্থ পরিচয়টি পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের কতখানি আনন্দের অধিকার ছিল, যাহাতে রাজাসুখের আনন্দ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, ইহা যখন দেখি, তখন প্রত্যেক মানুষ মনুষ্যত্বের অভ্রভেদী পরিধির বিপুলতা দেখিয়া যেন নিজেরই গুপ্তধন অন্যের মধ্যে আবিষ্কার করে—নিজেরই বাধামুক্ত পরিচয় বাহিরে দেখিতে পায়। এই মহৎচরিত্রে আনন্দবোধ করাতে আমরা নিজেকেই আবিষ্কার করি।

অতএব মানুষ আপনার আনন্দপ্রকাশের দ্বারা সাহিত্যে কেবল আপনারই নিত্যরূপ, শ্রেষ্ঠরূপ প্রকাশ করিতেছে।

আমি জানি, সাহিত্য হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রমাণ আহরণ করিয়া আমার মোট-কথাটাকে খণ্ডখণ্ড করিয়া ফেলা অত্যন্ত সহজ। সাহিত্যের মধ্যে যেখানে যাহা-কিছু স্থান পাইয়াছে, তাহার সমস্তটার জবাবদিহি করিবার দায় যদি আমার উপরে চাপানো হয়, তবে সে আমার বড় কম বিপদ্ নয়। কিন্তু মানুষের সমস্ত বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে শত শত আত্মবিরোধ থাকে। যখন বলি, জাপানীরা নির্ভীক সাহসে লড়াই করিয়াছিল—তখন জাপানী সেনাদলের প্রত্যেক লোকটির সাহসের হিসাব লইতে গেলে নানা স্থানেই ত্রুটি দেখা যাইবে—কিন্তু ইহা সত্য, সেই সমস্ত ব্যক্তিবিশেষের ভয়কেও সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়া জাপানীদের সাহস যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে। সাহিত্যে মানুষ বৃহৎভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে—সে ক্রমশই তাহার আনন্দকে খণ্ড হইতে অখণ্ডের দিকে অগ্রসর করিয়া ব্যক্ত করিতেছে—বড় করিয়া দেখিলে এ কথা সত্য—বিকৃতি এবং ত্রুটি যতই থাক্, তবু সব লইয়াই এ কথা সত্য।

একটি কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে,—সাহিত্য দুইরকম করিয়া আমাদিগকে আনন্দ দেয়। এক, সে সত্যকে মনোহররূপে আমাদিগকে দেখায়, আর সে সত্যকে আমাদের গোচর করিয়া দেয়। সত্যকে গোচর করানো বড় শক্ত কাজ। হিমালয়ের শিখর কত-হাজার ফিট্ উঁচু, তাহার মাথায় কতখানি বরফ আছে, তাহার কোন্ অংশে কোন্ শ্রেণীর উদ্ভিদ জন্মে, তাহা তন্নতন্ন করিয়া বলিলেও হিমালয় আমাদের গোচর হয় না। যিনি কয়েকটি কথায় এই হিমালয়কে আমাদের গোচর করিয়া দিতে পারেন, তাঁহাকে আমরা কবি বলি। হিমালয় কেন, একটা পানা-পুকুরকেও আমাদের মনশ্চক্ষুর সাম্‌নে ধরিয়া দিলে আমাদের আনন্দ হয়। পানাপুকুরকে চোখে আমরা অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাকেই ভাষার ভিতর দিয়া দেখিলে তাহাকে নূতন করিয়া দেখা হয়;—মন চক্ষুরিন্দ্রিয় দিয়া যেটাকে দেখিতে পায়, ভাষা যদি ইন্দ্রিয়স্বরূপ হইয়া সেইটেকেই দেখাইতে পারে, তবে মন তাহাতে নূতন একটা রসলাভ করে। এইরূপে সাহিত্য আমাদের নূতন একটি ইন্দ্রিয়ের মত হইয়া জগৎকে আমাদের কাছে নূতন করিয়া দেখায়। কেবল নূতন নয়;—ভাষার একটা বিশেষত্ব আছে;—সে মানুষের নিজের জিনিষ—সে অনেকটা আমাদের মন-

গড়া ;—এইজন্য বাহিরের যে-কোনো জিনিষকে সে আমাদের কাছে আনিয়া দেয়, সেটাকে যেন বিশেষ করিয়া মানুষের জিনিষ করিয়া তোলে। ভাষা যে ছবি আঁকে, সে ছবি যে যথাযথ ছবি বলিয়া আমাদের কাছে আদর পায়, তাহা নহে—ভাষা যেন তাহার মধ্যে একটা মানবরস মিশাইয়া দেয়, এইজন্য সে ছবি আমাদের হৃদয়ের কাছে একটা বিশেষ আত্মীয়তা লাভ করে। বিশ্বজগৎকে ভাষা দিয়া মানুষের ভিতর দিয়া চোলাইয়া লইলে সে আমাদের অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়ে।

শুধু তাই নয়, ভাষার মধ্য দিয়া যে ছবি আমাদের কাছে আসে, সে সমস্ত খুঁটিনাটি লইয়া আসে না। সে কেবল ততটুকুই আসে, যতটুকুতে সে একটি বিশেষ সমগ্রতা লাভ করে। এইজন্য তাহাকে একটি অখণ্ডরসের সঙ্গে দেখিতে পাই—কোনো অনাবশ্যক বাহুল্য সেই রস ভঙ্গ করে না। সেই সুসম্পূর্ণ রসের ভিতর দিয়া দেখাতেই সে ছবি আমাদের অন্তঃকরণের কাছে এত অধিক করিয়া গোচর হইয়া উঠে।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্তের যে বর্ণনা আছে, সে বর্ণনায় মানুষের চরিত্রের যে একটা বড় দিক্ দেখানো হইয়াছে, তাহা নহে—এইরকম চতুর স্বার্থপর এবং গায়ে পড়িয়া মোড়লী করিতে মজবুৎ লোক আমরা অনেক দেখিয়াছি। তাহাদের সঙ্গ যে সুখকর, তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু কবিকঙ্কণ এই ছাঁদের মানুষটিকে আমাদের কাছে যে মূর্ত্তিমান্ করিতে পারিয়াছেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। ভাষায় এমন একটু কৌতুকরস লইয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে যে, সে শুধু কালকেতুর সভায় নয়, আমাদেরও হৃদয়ের দরবারে অনায়াসে স্থান পাইয়াছে। ভাঁড়ুদত্ত প্রত্যক্ষসংসারে ঠিক এমন করিয়া আমাদের গোচর হইত না। আমাদের মনের কাছে সুসহ করিবার পক্ষে ভাঁড়ুদত্তের যতটুকু আবশ্যক, কবি তাহার চেয়ে বেশি কিছুই দেন নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ-সংসারের ভাঁড়ুদত্ত ঠিক ঐটুকুমাত্র নয়—এইজন্যই সে আমাদের কাছে অমন করিয়া গোচর হইবার অবকাশ পায় না। কোনো-একটা সমগ্রভাবে সে আমাদের কাছে গোচর হয় না বলিয়াই আমরা তাহাতে আনন্দ পাই না। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্ত তাহার সমস্ত অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া কেবল একটি সমগ্র রসের মূর্ত্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।

ভাঁড়ুদত্ত যেমন, চরিত্রমাত্রই সেইরূপ। রামায়ণের রাম যে কেবল মহান্ বলিয়াই আমাদিগকে আনন্দ দিতেছেন, তাহা নহে, তিনি আমাদের সুগোচর, সেও একটা কারণ। রামকে যেটুকু দেখিলে একটি সমগ্ররসে তিনি আমাদের কাছে জাগিয়া উঠেন, সমস্ত বিক্ষিপ্ততা বাদ দিয়া রামায়ণ কেবল সেইটুকুই আমাদের কাছে আনিয়াছে ;—এইজন্য এত স্পষ্ট তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি—এবং স্পষ্ট দেখিতে পাওয়াই মানুষের একটি বিশেষ আনন্দ। স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া মানেই একটা-কোনো সমগ্রভাবে দেখিতে পাওয়া, যেন অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাওয়া। সাহিত্য তেমনি করিয়া একটা সামঞ্জস্যের সুষমার মধ্যে সমস্ত চিত্র দেখায় বলিয়া আমরা আনন্দ পাই। এই সুষমা সৌন্দর্য্য।

আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে,

সাহিত্যের একটা বৃহৎ অংশ আছে, যাহা তাহার উপকরণবিভাগ। পূর্ত্তবিভাগে কেবল যে ইমারৎ তৈরি হয়, তাহা নহে, তাহার দ্বারা ইটের পাঁজাও পোড়ান হয়। ইটগুলি ইমারৎ নয় বলিয়া সাধারণ লোক অবজ্ঞা করিতে পারে, কিন্তু পূর্ত্তবিভাগ তাহার মূল্য জানে। সাহিত্যের যাহা উপকরণ, সাহিত্যরাজ্যে তাহার মূল্য বড় কম নয়। এইজন্যই অনেকসময় কেবল ভাষার সৌন্দর্য্য, কেবল রচনার নৈপুণ্যমাত্রও সাহিত্যে সমাদর পাইয়াছে।

হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য মানুষ যে কত ব্যাকুল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হৃদয়ের ধর্ম্মই এই, সে নিজের ভাবটিকে অন্যের ভাব করিয়া তুলিতে পারিলে তবে বাঁচিয়া যায়। অথচ কাজটি অত্যন্ত কঠিন বলিয়া তাহার ব্যাকুলতাও অত্যন্ত বেশি। সেইজন্য যখন আমরা দেখি, একটা কথা কেহ অত্যন্ত চমৎকার করিয়া প্রকাশ করিয়াছে, তখন আমাদের এত আনন্দ হয়। প্রকাশের বাধা দূর হওয়াটাই আমাদের কাছে একটা দুর্ম্মূল্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে আমাদের শক্তি বাড়িয়া যায়। যে কথাটা প্রকাশ হইতেছে, তাহা বিশেষ মূল্যবান্ একটা-কিছু না হইলেও সেই প্রকাশ-ব্যাপারের মধ্যেই যদি কোনো অসামান্যতা দেখা যায়, তবে মানুষ তাহাকে সমাদর করিয়া রাখে। সেইজন্য যাহা-তাহা অবলম্বন করিয়া কেবল-মাত্র প্রকাশ করিবার লীলাবশতই প্রকাশ, সাহিত্যে অনাদৃত হয় নাই। তাহাতে মানুষ যে কেবল আপনার ক্ষমতাকে ব্যক্ত করিয়া আনন্দদান করে, তাহা নহে—কিন্তু যে-কোনো উপলক্ষ্য ধরিয়া শুদ্ধমাত্র আপনার প্রকাশধর্ম্মটাকে খেলানতেই তাহার যে আনন্দ—সেই নিতান্ত বাহুল্য আনন্দকে সে আমাদের মধ্যেও সঞ্চার করিয়া দেয়। যখন দেখি, কোনো মানুষ একটা কঠিন কাজ অবলীলাক্রমে করিতেছে, তখন তাহাতে আমাদের আনন্দ হয়—কিন্তু যখন দেখি, কোনো কাজ নয়, কিন্তু যে-কোনো তুচ্ছ উপলক্ষ্য লইয়া কোনো মানুষ আপনার সমস্ত শরীরকে নিপুণভাবে চালনা করিতেছে—তখন সেই তুচ্ছ উপলক্ষ্যের গতিভঙ্গীতেই সেই লোকটার যে প্রাণের বেগ, যে উদ্যমের উৎসাহ প্রকাশ পায়, তাহা আমাদের ভিতরকার প্রাণকে চঞ্চল করিয়া সুখ দেয়। সাহিত্যের মধ্যেও হৃদয়ের প্রকাশধর্ম্মের লক্ষ্যহীন নৃত্য-চাঞ্চল্য যথেষ্ট স্থান পাইয়াছে। স্বাস্থ্য শ্রান্তিহীন কর্ম্মনৈপুণ্যেও আপনাকে প্রকাশ করে, আবার, স্বাস্থ্য যে কেবলমাত্র স্বাস্থ্য, ইহাই সে বিনা কারণেও প্রকাশ করিয়া থাকে। সাহিত্যে তেম্‌নি মানুষ কেবল যে আপনার ভাবের প্রাচুর্য্যকেই প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা নহে, সে আপনার প্রকাশশক্তির উৎসাহমাত্রকে ব্যক্ত করিয়া আনন্দ করিতে থাকে। কারণ প্রকাশই আনন্দ—এইজন্যই উপনিষদ্ বলিয়াছেন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। সাহিত্যেও মানুষ কত বিচিত্রভাবে নিয়ত আপনার আনন্দরূপকে, অমৃতরূপকেই ব্যক্ত করিতেছে, তাহাই আমাদের দেখিবার বিষয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রেখাধ্যায়।

কচের বর্গপতি ক-রথী'র

রেখামূর্ত্তি।

দাঁড়ি ক-রেখা বেত্রের ছড়ি ছাত্রের দমন।

কসি কভু (।) দাঁড়ি, কভু (—) কসি, যেখানে যেমন

কএর পংক্তিবিন্যাস।

দু-দাঁড়ি'তে কক হয় তাহা আমি জানি।
॥ এই লিখিলাম কক দুই দাঁড়ি টানি ॥
দুই ক বেরো'ল বটে, কিন্তু দুই টানে।
তাহাতে আমার মন প্রবোধ না মানে ॥
এক টানে দুই ক বাহির করা চাই।
সেটি হয় কি উপায়ে ভাবিতেছি তাই ॥
ভাবিতে হবে না আর, হ'য়েছে উপায়।
সাষ্টাঙ্গে নমু'ক্ কসি দণ্ডিকা'র পায় ॥
এই দেখ এক টানে দুই ক বেরো'ল।
আরো ক চাহ কি ? তবে জয়ধ্বজা তোলো ॥
ককক করিছে কাক, ফোটে নি কাকাকা।
ধ্বজা'র মাথায় এবে উড়ু'ক পতাকা ॥
কককক কপ্‌চায় কাগের ছা-গুলো।
চকিতে কেমন দেখ চারি ক বেরু'ল ॥
চলে যবে লেখনী থামায় কা'র সাধ্য।
থামো রে লেখনী-মণি হ'য়ো না অবাধ্য ॥

লেখনী'র প্রতি।

শুন্ রে বাচ্ছা বচন হিত।
পংকতি-ভঙ্গ নহে উচিত ॥

নেবো না ⅃ পাতালে, উঠো না ⌴ স্বর্গে।

বিচরো মর্ত্ত্যে ⊔ ⊔⊓ সুসংসর্গে ॥

দেখ চেয়েঃ—

|দাঁড়ি কসি|দাঁড়ি কসি|দাঁড়ি কসি| দাঁড়ি।

গড়গড় করি যেন চলে রেলগাড়ি।

তপের বর্গপতি ত-রথী'র

রেখামূর্ত্তি।
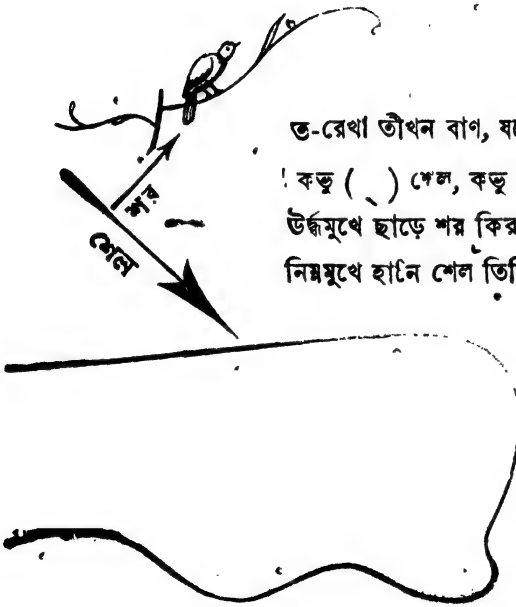
ত-রেখা তীখন বাণ, যমের লস্কর।
কভু ( ) শেল, কভু ( ) শর, ঠ্যাকানো দুষ্কর ॥
উর্দ্ধমুখে ছাড়ে শর কিরাতের ছেলে।
নিম্নমুখে হানে শেল তিমি-ধরা জেলে ॥

তএর পংক্তিবিন্যাস।

তরঙ্গ এ ত'র রঙ্গ, ওঠা-নাবা খেল ॥

দেখ চেয়ে ঃ—

ততত ততত ততততত ততততততত

তএর পরে কএর

লিখনপদ্ধতি।

দাঁড়িও ক, কসিও ক, কথা সত্য বটে।
কসি-ক ঘ্যাসে না কিন্তু তএর নিকটে॥
পিছনে থাকিতে বলো—তা'তে সে তোএর!
এগো'বে না প্রাণান্তেও সামনে তএর॥
তএর তোড়ের মুখে দাঁড়িই দাঁড়ায়।
দাঁড়ি যে নায়ের দাঁড়ি, বাড়ী মেঘনায়॥

দেখ চেয়ে ঃ—

তক কতক কততককত তকততককত

নটের বর্গপতি ন-রথী'র

রেখামূর্ত্তি।

ন কভু (◡) শূন্য, কভু (◠) ভরভর

উপরে তরণী নীচে তরঙ্গ॥

দেখ চেয়ে ঃ—

নকন কনকন ককনককন নসনসনত নসকনন
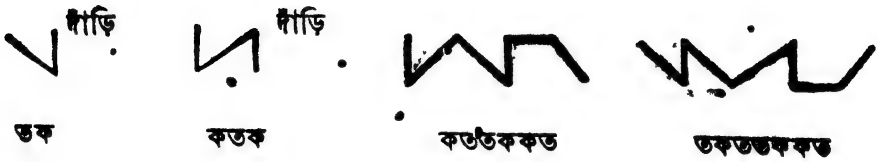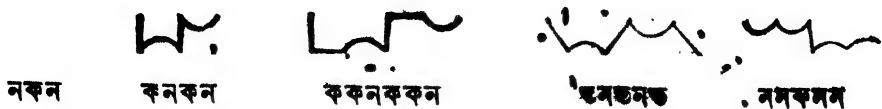
নএর পরে কএর

লিখনপদ্ধতি।

তরঙ্গ-তরীর মুখে, দাঁড়ি থাকে স্থির।
সামনে না যায় কসি তরঙ্গ-তরীর॥

দেখ চেয়ে :—

দাঁড়ি দাঁড়ি

নক কনক কনক কনককনক ননকনন

রসের বর্গপতি র-রথীর

রেখামূর্ত্তি।

"র র র র" রব শুনি রাত্রে কাঁপে গাত্র।
কারু হাতে তলোয়ার, কারু হাতে দাত্র॥
পিঠে ধার অসিটা'র, পেটে ধার দা'র।
ঝোলা তোলা দাত্র-অসি, ছুয়ে ছুয়ে চার॥

দেখ চেয়ে :—

ঝোলা দা ঝোলা অসি

তোলা দা তোলা অসি

অস্ত্রনির্ম্মাণ।

ল্যাজ বাঁকা'নু দাঁড়িটা'র। দাত্র হ'ল চমৎকার।

বাঁকাইনু কসি'র জিহবা। তলোয়ার হ'ল যে! বাহবা
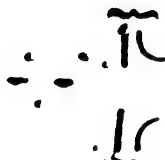
বিশ্বকর্ম্মার প্রতি।

বিশাই মশাই তুমি কম নহ পাত্র।
দাঁড়ি'র বাঁকা'য়ে ল্যাজ বিরচিলে দাত্র॥

কসি'র বাঁকা'য়ে জিহ্বা অসি বিরচিলে।
এ তিন ভুবনে তোর জুড়ি নাহি মিলে॥

দাত্র-অসির যুগলাঙ্গ।

দাঁড়ি আধা, কসি আধা
দা এ যে খাঁড়ার দাদা!

কসি আগে, দাঁড়ি শেষে
অসি এ যে সর্ব্বনেশে!
এই দেখ, দাত্র
দাঁড়ি-কসি মাত্র॥
অসি-হাতিয়ার
কসিদাঁড়ি-সার॥

দাঁড়ি-কসির ওলট্‌পালট্‌।

সমানে সমানে কি রোখারুখি!
অসমে অসমে গা-শোঁকাশুকি॥
সমানের ব্যবহার বিপরীত একি!
কসির্ সঙ্গে কসির্ নাই মুখ-দেখাদেখি॥
দাঁড়ি'কে দেখিলে দাঁড় মুখ করে হাঁড়ি।
দাঁড়ি'র পাশে বসে কসি কসির্ পাশে দাঁড়ি॥
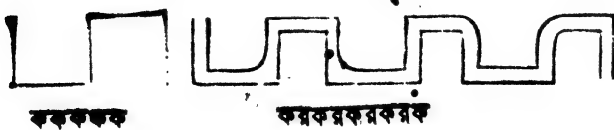
নএর ও তএর পরে রএর

লিখনপদ্ধতি।

বীরের হাতেই সাজে অসি জম্‌কালো।
ন-ত-ছুভা'য়ের হাতে কাটারিই ভালো॥

দেখ চেয়ে :—

ত ন আর র, তিনের

জটলা।

ত র ত ত র ত ত   ক র ন র ক র ন র   ত র ন র ত র ন র

ক র ত র র ক র ত র র

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চিরসুন্দর।

একা বসে' বসে' ভাবি স্বপ্নমুগ্ধ মত,
সেই সে সুন্দর মুখ দৃষ্টি স্নেহনত ;
সুকোমল কণ্ঠস্বর, সেই সুকুমার
প্রিয়তম অতুলন সোহাগ তোমার !
কুসুম যেমন বুকে রাখে গো সুবাসে
তেমনি রাখিতে তুমি মোরে বক্ষপাশে —
কতদিন চলে' গেছ আঁখির বাহিরে
কত ছবি মুছে গেছে নয়নের নীরে,
আজো তবু সারধন দৃষ্টির মতন
এ চক্ষে জাগিছে তব মূর্ত্তি অতুলন।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বঙ্গের জমিদার।

আসন্ন ও ভাবী বিপদ্।

স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু বঙ্গদর্শনে বঙ্গের কৃষক-সম্বন্ধে কয়েকটি চিরস্মরণীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে দুঃখিজনের সহিত তাঁহার গভীর সহানুভূতির এবং প্রকৃত স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়াছিলেন। কৃষককুলের উন্নতির জন্য, দুঃখমোচনের জন্য তিনি জমিদারসম্প্রদায়ের নিকটই করুণ আবেদন করিয়াছিলেন। যে কৃষককুলের করুণকাহিনী একদা জলদ-গম্ভীর নির্ঘোষে নিনাদিত হইয়াছিল, তাহাদিগেরই মঙ্গলকামনায় গবমেণ্ট প্রচলিত-ব্যবস্থা-সংশোধনার্থ একটি পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গের শিক্ষিতসমাজ ও স্বদেশপ্রেমিকগণ আনন্দ না দুঃখ প্রকাশ করিবেন? বিবেককে আশ্রয় করিয়া নিরপেক্ষভাবে প্রস্তাবিত বিধি আলোচনা করিবেন, না স্বস্ব-ক্ষুদ্রস্বার্থ-রক্ষার্থ বদ্ধ-পরিকর হইয়া দেশের পনর-আনা উনিশ-গণ্ডা তিন-কড়া পরিমাণ লোকের স্বত্বসুখ-সাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃক্‌পাত করিবেন?

কৃষকদিগের অবস্থার উপর জমিদারের এবং দেশের মঙ্গল নির্ভর করে। বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের কোলাহলে এই সহজ ও নিতান্ত সত্য কথাটা আমরা যেন ভুলিয়া না যাই। গাভীকে খাওয়াইয়া ও যত্ন করিয়া হৃষ্টপুষ্ট করিতে পারিলে গাভী দুগ্ধ দেয়; কৃষকদিগকে ভাল অবস্থায় রাখিলে তাহাদিগের নিকট জমিদার সহজে খাজনা পান, দেশ ধনধান্য-ভরা হয়, দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া বিদূরিত হয়, সমাজ প্রফুল্লপ্রাচুর্য্যে হাসিতে হাসিতে উন্নতিপথে ধাবিত হয়। সমাজ গৃহ, কৃষক তাহার ভিত্তি; সমাজ বৃক্ষ, কৃষক তাহার মূল; সমাজ দেহ, কৃষক তাহার রক্ত; সমাজ ভোক্তা, কৃষক তাহার অন্নদাতা। সুতরাং কৃষক প্রতিপালক, সমাজ প্রতিপালিত। কৃষক ক্লিষ্ট হইলে, সমাজ ক্লিষ্ট হয়; কৃষক উৎসন্ন হইলে সমাজ উৎসন্ন যায়। কিন্তু এই কথা আমাদিগের মনে থাকে কৈ? সমাজ বর্ব্বরতামোহে মুগ্ধ হইয়া এই অন্নদাতা কৃষককে পশু বা ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করে। তাহার মঙ্গলের জন্য, অন্তত বঙ্গদেশে, বাগ্মীর স্বরলহরী প্রায়ই উত্থিত হয় না; গভীরগবেষণাপূর্ণ লেখকের লেখনী প্রায়ই চালিত হয় না। দুঃখের বিষয়। যে স্বদেশপ্রেম কুটীরবাসী অগণ্য কৃষকগণের মঙ্গলের জন্য চিন্তিত হয় না, তাহাদিগের উন্নতির জন্য কোন কার্য্য করে না, তাহা নিশ্চয়ই স্বদেশপ্রেম নহে।

যে কৃষকগণ সমাজের ভিত্তি, তাহাদিগের উন্নতির জন্য স্বদেশহিতৈষিগণের সতত দৃষ্টি রাখা আবশ্যক; যাহাতে তাহাদের উন্নতি

হয়, তৎপক্ষে সাহায্য করা উচিত। সুতরাং গবর্মেণ্ট যখনই খাজনা বা কৃষকদিগের স্বত্ব সম্বন্ধে কোন আইন করিবার সঙ্কল্প করেন, তখনই দেশের শিক্ষিতলোকের সেই আইনের সম্ভাবিত ফলাফল আলোচনা করা উচিত, এবং দেশের পক্ষে যাহা মঙ্গলজনক বোধ হয়, তাহা গবর্মেণ্টকে জানান কর্ত্তব্য। এই কার্য্য যে কেবল "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ য়্যাসোশিয়েশন্" বা "ল্যাণ্ডহোল্ডারস্ য়্যাসোশিয়েশনে"র কার্য্য, তাহা নহে। ইহা সমুদয় শিক্ষিত বঙ্গসমাজের অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য। অনেকগুলি বাঙ্‌লা মাসিকপত্র আছে; আমরা ভরসা করি, তাহাতে চিন্তাশীল লেখকগণ,—যাঁহারা কৃষকগণের ও জমিদারগণের অবস্থা অবগত আছেন এবং তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন,—নিরপেক্ষভাবে এ বিষয় আলোচনা করিবেন। আমি, জমিদারগণের এবং কৃষকগণের উভয়ের মঙ্গলকামনা করিয়া, প্রায় গত পনরবৎসর ধরিয়া মাসিকপত্রে সময়-সময় এ বিষয় লিখিয়া আসিতেছি। জমিদারগণ সাবধান না হইলে ক্রমেই যে তাঁহাদের বিপদ্ ঘটিবে, প্রভুত্বের ও স্বত্বের সঙ্কোচ হইবে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। বঙ্গের জমিদারগণের অতি উচ্চ স্থান ছিল, প্রভূত প্রভুত্ব ছিল, কিন্তু আইন প্রতি পদবিক্ষেপে তাঁহাদিগকে নিম্নে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তাঁহাদিগের হস্তে বন্ধনের উপর বন্ধন কষিয়া বাঁধিতেছে। প্রতি বন্ধনের পূর্ব্বে তাঁহারা কাঁদেন, দোহাইদস্তর পাড়েন। কিন্তু গবর্মেণ্ট তাহা গ্রাহ্য করেন না। হায়, জমিদারগণের কি অবস্থা ছিল, আর কি অবস্থা হইয়াছে! আর কৃষকের? আমি কত-সময় আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি যে, গবর্মেণ্ট বাহ্যিক-শাসনকার্য্য-সম্বন্ধে আমাদিগের প্রভু হইলেও, জমিদারগণই আভ্যন্তরিক-বিষয়-সম্বন্ধে সমাজের রাজা, নেতা ও শাসক হইবেন; সর্ব্ববিধ মঙ্গলজনক কার্য্যের প্রবর্ত্তক পরিচালক হইবেন; এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিবেন। কিন্তু আজ যে Tenancy Amendment Bill দেখিতেছি, তাহা পাঠ করিয়া সে আশা কোথায় থাকে? এতদিন পরে আইনদ্বারা মন্দ ও ভাল জমিদার শ্রেণীবদ্ধ করিবার প্রস্তাব হইল।

এতদিন পরে, আদালতে রফাসুরতে যে খাজনাবৃদ্ধির ডিক্রী হইবে, তাহাও লঙ্ঘন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে; এতদিন পরে, জমিদারগণের মধ্যে অনেকেই অদ্যাপি প্রজাপীড়ন করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগের দমনের জন্য আইনের সাহায্য প্রয়োজন হইয়াছে, এই কথা গেজেটে স্পষ্টভাবে ঘোষিত হইল—ইহার অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? জমিদারগণ এখনও সাবধান না হইলে, ব্যবস্থা আরও কঠিন হইবে, তাহার বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে।

জমিদার যাহাতে প্রজাকে উচ্ছেদ এবং তাহার খাজনাবৃদ্ধি করিতে না পারেন, এই দিকে আইন শনৈঃ শনৈঃ যাইতেছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের এবং বঙ্গদেশের কৃষককুলের ইতিহাস আলোচনা করিয়া আশঙ্কা হয় যে, প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপিত হইলে পর যদি গবর্মেণ্টের আবার প্রতীতি হয় যে, অনেক জমিদার প্রজাপীড়ন করিতেছেন, এবং নূতন আইন কোন কাজের হইল না, তখন গবর্মেণ্ট আইনের

স্ক্রু আরও কষিবেন, অনেক প্যাঁচ ঘুরাইবেন। সার্ জর্জ্জ ক্যাম্পবেল বলিয়াছিলেন—Law or no law the zemindar can do much without law or against law। বর্ত্তমান গবর্মেণ্টের তাহাই ধারণা। সুতরাং গবর্মেণ্ট যদি বিশ্বাস করেন যে, জমিদারকে আইনে আবদ্ধ করা অসম্ভব বা কঠিন, তাহা হইলে জমিদারী-স্বত্ব পাকে-প্রকারে উঠাইয়া দিবেন। এইরূপ ব্যবস্থা যে এখানেই প্রথম হইবে, তাহা নহে। ইউরোপে নানা দেশে জমিদারের স্বত্ব জমিদারের হস্ত হইতে লইয়া প্রজাকে দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গদেশে আইনের ভবিষ্যতে যে পথে যাইবার আশঙ্কা আছে, এই প্রবন্ধে তাহার কতকটা সূচনা করিব।

১। উদ্ধার অর্থাৎ প্রজাকর্ত্তৃক জমিদারের স্বত্বখরিদ।—গবর্মেণ্ট যখনই বঙ্গদেশে প্রজা-সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিবার সঙ্কল্প করেন, তখনই একটি দূরবর্ত্তী দ্বীপের প্রতি তাকাইয়া থাকেন। গবর্মেণ্ট ভূস্বত্বসম্বন্ধে আয়র্লণ্ডের ইতিহাসে যে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, বঙ্গদেশে তাহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তাহা মনে করেন।

আয়র্লণ্ডের ১৮৬০ সালের আইন অনুসারে জমিদারের সহিত প্রজার সম্বন্ধ চুক্তিমূলক ছিল। ১৮৭০ সালের Landlord and Tenant Act দ্বারা এই চুক্তিশক্তিকে দুর্ব্বল করা হয়। বঙ্গদেশের ১৮৮৫ সালের খাজনার আইনে ১৭৮ ধারায় বঙ্গীয় প্রজাকে চুক্তির গ্রাস হইতে রক্ষণার্থ বিধান হয়। আয়র্লণ্ডের ১৮৭০ সালের আইনে, প্রজা জমিদারের স্বত্ব খরিদ করিতে পারিবে, এবং গবর্মেণ্ট ইহার জন্য প্রজাকে টাকা কর্জ্জ দিবেন, এইরূপ বিধান হয়; এবং ১৮৮০ সালের আইনে জমিদারের স্বত্বক্রয়করণপক্ষে প্রজাগণের আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং বঙ্গদেশে জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধ ভবিষ্যতে ভাল না হইলে, খুব সম্ভব যে, প্রজা জমিদারের স্বত্ব খরিদ করিতে পারিবে, এইরূপ বিধান হইবে। তবে আয়র্লণ্ডের জমিদারগণ ক্ষমতাশালী এবং বঙ্গদেশের জমিদারগণ দুর্ব্বল হওয়ায়—আয়র্লণ্ডের জমিদারদিগের অপেক্ষা বঙ্গদেশের জমিদারদিগের পক্ষে সর্ত্তগুলি অসুবিধাজনক হইবে।

ইংলণ্ডের জমিদারগণেরও স্বত্ব খরিদ করিয়া লওয়ার কথা মধ্যে মধ্যে উঠে। জমি কাহারও নহে, জমি সমুদয় দেশের লোকের, জমি ক্রয় করিয়া সমুদয় দেশের লোকের মধ্যে ঐ জমি ন্যায়ত বিভাগ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, এই মত পোষণ করিয়া বড় বড় বহি লেখা হইয়া থাকে। এই সকল লেখকের মধ্যে জে. ম্যাক্‌ডনেল (J. Macdonell on the Land Question) একটি কথঞ্চিৎ সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি বলেন, জমিদারকে কেবলমাত্র তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারীর স্বত্বে মূল্য ধরিয়া দিয়া, জমিদারের মৃত্যুর পর গবর্মেণ্ট তাহার জমিদারি লইলে, ক্ষতিপূরণ জন্য অপেক্ষাকৃত কম টাকা দিয়া গবর্মেণ্ট জমিদারীস্বত্ব খরিদ করিতে পারেন। কিন্তু জমিদারী স্বত্বসমুদয় খরিদ করিয়া দেশের লোকের মধ্যে বিভাগ করিলে কোন সুবিধা হইবে না, তাহা অধ্যাপক ফসেট্ (Fawcett) প্রভৃতি ধনতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রাঞ্জলভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং ঐ কথাটা এখন একপ্রকার চাপা পড়িয়াছে।

জে. হেক্‌টর (J. Hector on Rail-

ways and Land), বঙ্গদেশের জমিদারী-স্বত্ব বিশগুণ পণে খরিদ করিতে হইলে ২০০ হইতে ২৬০ মিলিয়ন্ পাউণ্ড লাগিতে পারে, গণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু জমির যাহা মোট মূল্য, তাহার অর্দ্ধেক গবর্মেণ্টের প্রাপ্য, এরূপ ধরিলে জমিদারগণকে ২০০ অথবা ২৬০ পাউণ্ডের অনেক কম টাকা দিলেই কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে, এরূপ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই প্রস্তাব যে গবর্মেণ্ট গ্রহণ করিবেন, তাহা বোধ হয় না।

আর একজন সাহেব বলেন যে, বঙ্গের জমিদারগণকে কেবলমাত্র ১০০ মিলিয়ন্ পাউণ্ড এবং প্রজাদিগের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আর ১০০ পাউণ্ড দিয়া, সমুদয়ে ২০০ মিলিয়ন্ পাউণ্ড দিয়া জমিদারী খাস করা যাইতে পারে। একেবারে সমুদয় জমি এক সময় খাস করা আবশ্যক হইবে না। ক্রমশ খাস করিলে চলিতে পারে।

উপস্থিত বিলে ভাল ও মন্দ শ্রেণীতে জমিদারগণকে বিভাগ করা হইতেছে। বঙ্গদেশে ক্রমে এরূপ আইন হইতে পারে যে, যদি কোন মন্দ জমিদারকে প্রজা খাজনার অর্দ্ধেকের (বা অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট অংশের পনরগুণ, বা অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট পণ টাকা দেয়, তাহা হইলে তাহার জমা চিরকাল জমিদারের হস্ত হইতে উদ্ধার হইবে; খাজনার অবশিষ্ট অর্দ্ধেক বা নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রজা গবর্মেণ্টকে বৎসর বৎসর দিবে। যে সকল প্রজা জমা উদ্ধার করিবার জন্য গবর্মেণ্টের নিকট কর্জ্জ চাহিবে, তাহারা নিজের জমি বন্ধক দিয়া গবর্মেণ্টের কাগজের সুদের হারে সুদ দিয়া নির্দ্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করার সর্ত্তে গবর্মেণ্টের নিকট টাকা ঋণ পাইবে। গবর্মেণ্ট ঐ টাকা নূতন "লোন্ ইসু" করিয়া, অর্থাৎ সাধারণ লোকের নিকট ঋণপত্রের দ্বারা ধার লইয়া, প্রজাকে কর্জ্জ দিবেন। ইহার ভিতর যে সকল সূক্ষ্ম কথা আছে, তাহার আলোচনা আপাততঃ নিষ্প্রয়োজন বোধে এখানে উল্লেখ করিলাম না। গবর্মেণ্ট এইরূপে প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্টপরিমাণ টাকার লোন্ ইসু করিয়া এবং প্রজার নিকট ঋণের টাকা ক্রমশ আদায় করিয়া ক্রমে ক্রমে সহজেই বঙ্গের জমিদারকুলকে একেবারেই বিলুপ্ত করিতে পারেন। প্রথমে যাহা মন্দ জমিদারের প্রতি প্রয়োগ হইবে, পরে তাহা সমুদয় জমিদারপক্ষে খাটিবে।

২। জমিবিভাগ। - বঙ্গে ১৮৮৫ সালের Tenancy Actএর যখন পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হইয়া নানা তর্কবিতর্ক হয়, তখন প্রাজ্ঞ ৺রাণাদে (Ranade) একটি কথা তুলিয়াছিলেন। তাহা পরে তাঁহার ভারতবর্ষের ধনতত্ত্বসম্বন্ধীয় পুস্তকে প্রকাশিত হয়। তাহা এই,—প্রশিয়াতে ১৮১০ সালে (Hardenburg) হার্ডেন্বর্গ প্রজাস্বত্বযুক্ত জমির মধ্যে মেয়াদি জমি হইতে অর্দ্ধেক এবং পৈতৃক জমি হইতে এক তৃতীয়াংশ জমিদারকে দিবার এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেক বা দুই তৃতীয়াংশ প্রজাকে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশে গবর্মেণ্ট যদি ঐরূপ একটা ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে জমিদারদিগের বড়ই বিপদ্ হইবে। কিন্তু এ বিধান বঙ্গদেশে করা হইবে, তাহার তত আশঙ্কা নাই। কারণ প্রশিয়াতে এই সকল জমির প্রজাগণ জমিদারকে শ্রম ও অর্থ উভয়ই দিতে বাধ্য ছিল। তবে

গবর্মেণ্ট এই ব্যবস্থা করিতে পারেন যে, জমিদার যে সকল জমি নিজে খাসে আবাদ করিবেন, অর্থাৎ প্রাচীন হিন্দুরাজত্বসময়ে সঙ্গতিসম্পন্ন বৈশ্য কৃষকগণ যেরূপভাবে ভূমিকর্ষণ করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধি করিতেন, ঐরূপভাবে যে সকল জমি জমিদার কর্ষণ করিবেন, তাহাই তাঁহার দখলে থাকিবে, অবশিষ্ট জমি প্রজা ইচ্ছা করিলে উদ্ধার করিয়া লইতে পারিবে।

৩। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিধান।—শীঘ্র অধিকদূর না গিয়া গবর্মেণ্ট এইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন যে, খাজনামাত্রই মনিঅর্ডারযোগে দেয় হইবে, এবং খাজনার পরিমাণ বা জমির স্বত্বসম্বন্ধে জমিদারের কোন আপত্তি থাকিলেও তিনি ঐ টাকা লইয়া রসিদ দিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু ঐ মনিঅর্ডারে স্বত্ব-হিসাবাদি-সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রজা লিখিবে, তাহার দ্বারা জমিদার কোনরূপে বাধ্য হইবেন না। ইহাতেও যদি গবর্মেণ্ট মনে করেন যে, অনেক জমিদার পীড়ন করিয়া রায়তকে উচ্ছেদ করে, তাহা হইলে গবর্মেণ্ট এমন আইন করিতে পারেন যে, জমিদার বাকী-খাজনার ডিক্রীজারিতেও প্রজাকে একেবারে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না, কেবল যে কয়েক বৎসরের খাজনা বাকী পড়িয়াছে, সেই কয়েক বৎসরের দ্বিগুণ বা তিনগুণ বৎসরের জন্য ঐ জমি জমিদার খাস করিয়া লইতে পারিবেন। এবং ঐ জমি চাষ করিয়া তাহার মুনাফাদ্বারা হাল-বকেয়া খাজনা শোধ করিয়া লইয়া রায়তকে ঐ জমি ফেরত দিতে বাধ্য হইবেন।

বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপিতে বিধান আছে, যে সকল ভাল জমিদার তাঁহাদিগের আদায়-তহশীলের কাগজ, অর্থাৎ আয়ের হিসাব সরকারী কর্ম্মচারিগণকে দেখাইবেন, এবং যাঁহাদিগের জমিদারীতে সরকারী জরিপজমা-বন্দী হইয়া রেকর্ড্‌স্ অব্ রাইট্‌স্ অর্থাৎ ভূস্বত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং যে সকল জমিদার খারিজ দাখিল ও স্বত্বের অন্যান্য যাহা-কিছু পরিবর্ত্তন হইবে, তদনুযায়ী সেরেস্তার কাগজ সংশোধন করিতে থাকিবেন, সেই সকল জমিদারকে খাজনার নালিশে সরাসরি বিধানের সুবিধা প্রদত্ত হইবে। এখন আয়ের হিসাব দেখানর বিধান হইতেছে, পরে জমিদারগণের ব্যয়ের হিসাব দেখানর বিধান প্রকারান্তরে কি হইতে পারে না ?

আজকাল কোন কোন জমিদার স্বেচ্ছায় স্বস্ব জমিদারি "কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের" অধীন করিতেছেন। ইহার মধ্যে কেহ বা "রাজা"-"স্যার"-উপাধিধারী আছেন। আমি কয়েক-বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে, গবর্মেণ্ট জমিদারগণকে গবর্মেণ্টের অধীন করিবার জন্য প্রথমে কোর্ট-অব্-ওয়ার্ডস্ অ্যাক্ট কিছু পরিবর্ত্তন করিবেন এবং "Disqualified" এই শব্দটার অর্থ বিস্তৃত করিবেন। তাহাই ঘটিয়াছে। জমিদার ক্ষিপ্ত বা নাবালক বা স্ত্রীলোক না হইলে, ইচ্ছা করিলে আপনাকে Disqualified অর্থাৎ জমিদারীপরিচালনে অনুপযুক্ত এইরূপ বিবেচিত করিতে পারেন; কোর্ট-অব্-ওয়ার্ডস্ অ্যাক্ট সংশোধন করিয়া তাহার ৬ ধারা ঙ প্রকরণে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই গেল স্বেচ্ছার কথা। জমিদারের অনিচ্ছায়ও তাঁহাকে অবস্থাবিশেষে অনুপযুক্ত ঘোষণা করার জন্য ব্যবস্থার সংশোধন হইয়াছে। সুতরাং স্বেচ্ছায়-অনি-

চ্ছায় জমিদারগণ পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে কোর্ট-অব্-ওয়ার্ডসের অধীন হইতে পারেন। এই সকল "ষ্টেটে"র আয় হইতে জমিদারদিগকে নির্দ্দিষ্ট মাসহারা দিয়া গবর্মেণ্ট জমিদারের ঋণ পরিশোধ করেন। গবর্মেণ্ট দেখিতেছেন, অনেক জমিদারই ঋণে জড়িত, কেহ বা চরম বিপৎকালে কোর্ট-অব্-ওয়ার্ডসের অধীন হন। Prevention is better than cure যে একটা ইংরেজি প্রবাদ আছে, তদনুসারে গবর্মেণ্ট এরূপ মনে করিতে পারেন যে, জমিদারগণ যাহাতে ঋণে আদৌ জড়িত না হন, তাহার বিধান করা উচিত। তজ্জন্য এখন যেমন গবর্মেণ্টকর্ম্মচারীকে আয়ের হিসাব দেখানর কথা উঠিতেছে, পরে সেইরূপ ব্যয়ের হিসাব দেখানর কথা উঠিবে। অন্তত এরূপ বিধান হইতে পারে যে, যখনই কোন জমিদার কর্জ্জ লইবেন, রেজিষ্টারী আপিস্ হইতে খতের নকল কালেক্টরের নিকট পেশ্ হইবে। যখন কালেক্টর দেখিবেন যে, কোন জমিদারের খাটি মুনাফার দ্বিগুণ বা তিনগুণ ঋণ হইল, তখনই তাঁহার জমিদারী কোর্ট-অব্-ওয়ার্ডসের অধীন করা হইবে।

গবর্মেণ্ট যদি অবশেষে দেখেন যে, অধিকাংশ জমিদার প্রজার কোন হিতকর কার্য্য করেন না, কেবল করসংগ্রাহক ও করভোগী মাত্র, তখন প্রত্যেক জমিদারকে আয়ের শতকরা এত টাকা প্রজার হিতার্থে ব্যয় করিতে হইবে এবং নির্দ্দিষ্ট টাকা তিনি ব্যয় করেন কি না, তাহা স্থির করিবার জন্য জমিদার গবর্মেণ্টকে তাঁহার ব্যয়ের হিসাব দেখাইতে বাধ্য হইবেন। দশশালার বন্দোবস্তে গবর্মেণ্ট সদর-খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারেন না, কিন্তু প্রজার মঙ্গলার্থে জমিদারকে কতক টাকা ব্যয় করাইতে বাধ্য করিতে পারেন, গবর্মেণ্ট এইরূপ তর্ক করিবেন।

গবর্মেণ্ট এতদিন সদর-খাজনা যাহাতে সুচারুরূপে আদায় হয়, তাহাই প্রধানত লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এখন দেখিতেছেন, শিক্ষিত-লোক অসন্তোষযুক্ত আন্দোলনের তরঙ্গ তুলিয়াছে; কৃষককুল অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ লোক গবর্মেণ্টের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিলে এই আন্দোলনে গবর্মেণ্টের কোন বিপদ্ হইবার সম্ভাবনা নাই। গবর্মেণ্ট ইহাও দেখিতেছেন, বঙ্গদেশের দ্বারে দুর্ভিক্ষরাক্ষসী দণ্ডায়মান; প্রজা অন্নাভাবে মরিতে পারে। নিজের ত্রুটি কেহ স্বীকার করিতে চাহে না। গবর্মেণ্টও চাহেন না। সুতরাং যত দোষ জমিদারের; জমিদারের ক্ষমতাকে ক্ষীণ করা আবশ্যক।

আরও গবর্মেণ্ট মনে করিতে পারেন যে, দশশালার বন্দোবস্তের এমন সুবিধাসত্ত্বে বঙ্গদেশে জমিদারগণের শ্রীবৃদ্ধি হইল না। অধিকাংশ জমিদারই ঋণে জড়িত। সাধারণের মঙ্গলজনক বহুব্যয়সাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিবার অর্থসঞ্চয় করা দূরে থাকুক, অনেক জমিদার সময়ে সময়ে ধার না করিয়া সংসার চালাইতে পারেন না। যে উদ্বৃত্ত টাকায় দেশের ও প্রজার হিতকর কার্য্য হওয়া সম্ভব ছিল, তাহা উকিলমোক্তারের ও মহাজনের হস্তে দ্রুতবেগে যাইতেছে, এবং তাহাতে স্নেহশূন্য, বণিক্‌বৃত্তিসার নূতন নূতন জমিদারের উদ্ভব হইতেছে। এই নূতন জমিদারগণ জমিদারীকে কেবলমাত্র একটি "ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট" টাকা খাটাইবার উপায়মাত্র বিবেচনা করেন, মনুষ্যে-

মনুষ্যে যে সম্বন্ধ, জমিদারের সহিত প্রজার যে পিতাপুত্রসম্বন্ধ, রক্ষক-রক্ষিতের সম্বন্ধ, গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ, তাহা এই অধিকাংশ নবভূস্বামী জানেন না, বুঝেন না; কেবলমাত্র বুঝেন টাকা। তাঁহারা দূরদর্শী সমাজতত্ত্ববিদ্-ধন-তত্ত্ববিদ্ নহেন, সমাজের সমষ্টির জন্য ব্যস্ত নহেন। "প্রজার কেবল মঙ্গলচেষ্টা করিতে আমি বাধ্য নহি, প্রজা আমাকে খাজনা দিতে বাধ্য"—এই ইঁহাদিগের জমিদারীকার্য্যের মূলমন্ত্র। একজন উকিল বা মহাজন এক-পুরুষেই জমিদার হইলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ওয়ারিশগণ জমিদারি উড়াইতেছেন; গবর্মেণ্ট এরূপ কত স্থানে দেখিতেছেন। সুতরাং গবর্মেণ্ট মনে করেন, যেখানে হৃদয়ের কোমল সম্পর্ক নাই, সেখানে লৌহবৎ কঠিন ব্যবস্থাবিধি আবশ্যক।

আশঙ্কা হয়, গবর্মেণ্ট নানাপ্রকার কঠিন ব্যবস্থা করিতে পারেন। জমিদার-দিগের মধ্যে আত্মরক্ষার কোন কার্য্যকরী চেষ্টা নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ য়্যাসোশিয়েশন্ "রোদন, আবেদন ও নিবেদন" তাঁহাদিগের মঙ্গলের একমাত্র উপায়, সিদ্ধিলাভের এক-মাত্র সাধনা, গন্তব্যস্থানের একমাত্র রাজপথ জানিয়া রাখিয়াছেন। এই সভাটি এতকাল ধরিয়া আছে, তথাপি জমিদারগণের নিজের চেষ্টার দ্বারা তাঁহাদিগের যে উন্নতি হইতে পারে, তাঁহাদিগের যে শক্তির বৃদ্ধি হইতে পারে, অন্তত অধোগতির বেগ মন্দীভূত হইতে পারে—এই সত্যকথাটা যেন সভার বিশাল হৃদয়ে একবারও জাগিয়া উঠে নাই—যদি বা কখন জাগিয়া উঠিয়া থাকে, দুইএকটা জৃম্ভণ ত্যাগ করিয়া আবার সুষুপ্তিতে ডুবিয়া গিয়াছে।

জমিদারগণের পক্ষে আত্মরক্ষার নূতন উপায় কি, তাহা আজ কতকটা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; পনরবৎসর পূর্ব্বেও কতকটা নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু কে কাহার কথা শুনিবে? ঐ যে এক আবেদন-নিবেদন আমাদিগের দেশের শিক্ষিত-ব্যক্তিগণ মান্ধাতার আমল হইতে শিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ব্যতীত তাঁহারা নিজের উন্নতির আর কোন পথ দেখিতে পান না। Petition এবং Agitation—টাউনহল্-সভা, আর লম্বা নিবেদনপত্র, তাঁহারা এই দুই বস্তু বেশ চেনেন, আর কিছু চিনিতে চাহেন না। কেবল জমিদার নহেন; নাওরজি ও গোখেল মহাশয়গণ মহাপণ্ডিত ও মহারথী হইয়াও "Constitutional agitation" মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া জালবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় ছট্ফট্ করিয়া অরণ্যে রোদন করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, রোদনে জাল কাটিয়া যাইবে, অধ্যবসায়ের সহিত রোদন কর।

১৮৭১-৭২ সালের কার্য্যবিবরণীতে স্যার্ জর্জ ক্যাম্পবেল লিখিয়াছিলেন, জমিদারীর আয় কোন কোন স্থলে ১০, ১৫, ৬০, ১২০ গুণ বাড়িয়াছে। কিন্তু জমিদারগণের সেই অনু-পাতে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে কোথায়? ১৮৭২ সালে বোর্ড অব্ রেভিনিউ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "জমিদারীর আয় যে এত বাড়িয়াছে, তাহাতে কাহার লাভ হইয়াছে?"

তদুত্তরে বোর্ড বলিয়াছিলেন যে, "যে খাজনা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা মহাজনের উদরে যায়।" ঠিক কথা বলিতে হইলে আরও কয়েকশ্রেণী লোকের নাম করিতে হয়। জমিদারীর যে আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার কতক যায় মহাজনের

উদরে, কতক যায় ব্যারিষ্টার-উকিল-মোক্তারের ঘরে, আর কতক যায় ধূর্ত্ত নায়েব ও গোমস্তার করকমলে, আর কতক যায় কোর্ট-ফি, ষ্টাম্প ইত্যাদি আকারে গবর্মেণ্টের ঘরে। আর এক শ্রেণীর নাম করি নাই। তাঁহারা মধ্যস্বত্ববান্। এতগুলি জোঁক যদি একটা দেহের রক্তশোষণ করে, তাহা হইলে সেই দেহে শোণিতদারিদ্র্য ও ক্ষীণতা কেন না হইবে? "Home-charges"রূপ "bleeding" রক্তমোক্ষণ লইয়া আমাদের স্বদেশী প্রভুগণ বিদেশী শ্বেতপ্রভুগণের নিকট কাঁদিয়া আকুল। এই স্বদেশী প্রভুগণের মধ্যে যে সকল জমিদার আছেন, তাঁহারা কি কখন ভ্রমেও মনে করেন না যে, কি "ব্লীডিং"টা তাঁহাদিগের দেহে অবিরাম হইতেছে। এই রক্তনিঃস্রাবসত্ত্বেও যে জমিদারকুল আজও একেবারে বিনষ্ট হন নাই, তাহাতেই তাঁহাদিগকে ধন্য বলিতে হয়। যাঁহারই বঙ্গদেশের জমিদারীপরিচালনবিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তিনিই জানেন, জমিদারের আয় বাহিরে থাকিয়া যদিও অধিক বোধ হয়, মামলা-মোকদ্দমা, সরঞ্জামিখরচ ইত্যাদি বাদ দিলে তাঁহার প্রকৃত খাঁটি মুনাফা অতি কম হইয়া যায় এবং বাহিরের আড়ম্বর ও ঠাট বজায় রাখিতে অনেকসময় তাঁহাকে ঋণে জড়িত হইতে হয়। নদীয়াজেলায় ইদানীং যে কয়েকটি জমিদারের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের বংশধরগণের মধ্যে অনেকেই এক্ষণে দরিদ্র, কেহ কেহ সামান্য চাকুরীর জন্য লালায়িত। অন্যান্য জেলায়ও অনুসন্ধানে জানা যায়, অনেক জমিদারের অবস্থা শোচনীয়,—জমিদারী গুরু ঋণভারে আক্রান্ত।

কেন নিজেদের এরূপ দুর্দশা হইতেছে, জমিদারগণ কি তাহা স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন? তাহার প্রতিকারের জন্য কি তাঁহারা কখন সমবেত চেষ্টা করিয়াছেন?

গবর্মেণ্টের অভিপ্রায় যতই ভাল হউক না কেন, দীনদুঃখী কৃষকবৃন্দের অবস্থা উন্নত করিবার চেষ্টা যতই প্রশংসনীয় হউক না কেন, গবর্মেণ্ট বঙ্গদেশের জমিদারগণকে হীন ও দুর্ব্বল করিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে দেশের অনিষ্ট করিতেছেন, এবং প্রজাকে রক্ষা করিতে গিয়া কেবল জমিদার ও প্রজাগণের মধ্যে অসদ্ভাব, বিবাদ ও মামলা-মোকদ্দমার বৃদ্ধি করিতেছেন। গবর্মেণ্ট যদি দূরদর্শী হইতেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশে জমিদারগণকে দুর্ব্বল না করিয়া নিজের দৃষ্টান্তের সংশিক্ষার দ্বারা জমিদারগণের হৃদয় উচ্চভাবে প্রণোদিত করিয়া তাঁহাদিগকে আরও সবল করিয়া তুলিতেন এবং তাঁহাদিগের হস্তেই দেশের সুশাসনের ভার প্রচুরপরিমাণে অর্পণ করিতেন। গবর্মেণ্ট খাসমহালে যেরূপ কঠিনভাবে নিজের খাসজমিদারি পরিচালনা করেন, তাহা আদর্শস্থল নহে। জমিদারদিগের সম্বন্ধে যে Sun-set Law করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতেও জমিদারের সুখদুঃখের সহিত বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ পায় না। সূক্ষ্মভাবে বঙ্গে ইংরেজগবর্মেণ্টের জমিদারীপ্রণালী আলোচনা করিলে,—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ অ্যাড্‌মিনস্‌ট্রেশন্ ভাল করিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনুধাবন করিলে মনে হয়, যে বণিক্‌বৃত্তি লইয়া গবর্মেণ্ট প্রথমে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, দীর্ঘকালের চেষ্টাতেও তাহা পরিহার করিতে পারেন নাই; বরঞ্চ এদেশে প্রাচীন জমিদারবংশের ভিতর যে একটা উচ্চ আদর্শ ছিল, প্রজার

প্রতি যে স্নেহ ছিল, তাহা গবর্মেণ্ট প্রথমে বিনষ্ট করেন। কিরূপে বিনষ্ট করেন, বর্কের বক্তৃতায় দেবীসিং, কান্তবাবু প্রভৃতি ইজারদার এবং করসংগ্রাহক ইংরেজগণের কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলে কতকটা বুঝা যায়। তাহার পরবর্ত্তী যুগে গবর্মেণ্ট অনেকটা ভাল হইয়াছেন বটে; কিন্তু উচ্চনীতি ও কোমল সহানুভূতি, প্রকৃত প্রজাপ্রেমের পবিত্র শিখা আজিও ভারতে জ্বালিয়া দিতে পারেন নাই। জমিদার অথবা প্রজার কাহারও হৃদয় স্পর্শ করিয়া, পরকে আপন করিতে পারেন নাই। চেষ্টা আছে, কিন্তু প্রেমমূলক সহানুভূতির অভাবে গবর্মেণ্টের মঙ্গলচেষ্টা অমঙ্গলে পরিণত হইতেছে। প্রেমতত্ত্বে শাসনতত্ত্ব নিহিত, ধনতত্ত্ব নিহিত। কিন্তু প্রজার সহিত গবর্মেণ্টের সহানুভূতি নাই বলিবার অগ্রে, গবর্মেণ্টকে দোষ দিবার অগ্রে, জমিদারগণের মধ্যে মন্দ জমিদারগণকে নিন্দা করিবার অগ্রে, শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর ব্যক্তিগণের কি চিন্তা করা উচিত নহে যে, তাঁহারাই দরিদ্র কৃষককুলের কি মঙ্গলচেষ্টা করিয়া থাকেন? এখানেও সেই প্রকৃত প্রেমের অভাব,—যে প্রেম কখন ধর্ম্মনামে, কখন 'পেট্রিয়টিজম্'-নামে, কখন সেবানামে, কখন ভক্তি, কখন আনন্দ-আখ্যায় অভিহিত হইয়া যুগে যুগে মহাজনকর্ত্তৃক প্রচারিত ও বিতরিত হয়। কিন্তু আমি ধর্ম্মের কথা একেবারেই এই প্রবন্ধের মূলপ্রস্তাবে তুলি নাই। আমি জমিদারগণের নিকট, "নিজের (ক্ষুদ্র) স্বার্থের দিক্ দিয়া দেখিয়া আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করুন"; এই নিবেদন করিতেছি। আত্মরক্ষার জন্য তাঁহারা কি কি করিতে পারেন এবং গবর্মেণ্ট তাঁহাদিগের হস্তে সুশাসনের ভার কিরূপে অর্পণ করিতে পারেন, তাহা পরে আলোচ্য। একএকটি বড় জমিদার যাহাতে তাঁহার জমিদারীর ভিতর একএকটি প্রজাবৎসল ক্ষুদ্র রাজা হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে গবর্মেণ্টের এবং জমিদারগণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

রাজতপস্বিনী।

[জীবনীপ্রসঙ্গ]

১৩

সেকালে পুটিয়ায় বৈশাখজ্যৈষ্ঠমাসে "পদ্মযাত্রা"র বড় ধুম ছিল। রাজপরিবারের কুলদেবতা গোবিন্দজীবিগ্রহ পর্য্যায়ক্রমে মাসের নির্দ্দিষ্ট দিনে এক সরিকের ঠাকুরবাড়ী হইতে অন্যের দেবালয়ে কিরূপ সমারোহে গৃহীত হইতেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বৎসরের প্রারম্ভে প্রত্যেক রাজবাটীতে তাঁহার অধিষ্ঠান হইলে একএকদিন গোবিন্দজীর পুষ্পোৎসব

হইত। সে দিন অপরাহ্নে রাশিরাশি সদ্যো-বিকসিত শ্বেত এবং রক্তোৎপলে তিনি বিভূষিত হইতেন। দেবমন্দিরের সর্ব্বত্র বিকচ কমলের সজ্জা ও সৌরভ এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে শোভা বিবিধ আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

রাজবাটীতে তখন বারমাসে আঠার পার্ব্বণ এবং সকল কাজের প্রধান অঙ্গ ব্রাহ্মণঠাকুর-দের ভোজনব্যাপার। এই পুষ্পোৎসব উপ-লক্ষেও তাহার কোন ত্রুটি হইত না। মহারাণী সাময়িক নানাবিধ সুমিষ্ট ফলমূল সংগ্রহ করা-ইয়া এই সময়ে ব্রাহ্মণদের মত সকলশ্রেণীর অতিথি-অভ্যাগতগণকে পরমযত্নে আহার করাইতেন। অন্যান্য সরিকের গৃহেও এই পর্ব্বোপলক্ষে যথেষ্ট ধুমধাম হইত। ফলত নূতন বৎসরের প্রথম দুইমাস এইরূপ ক্রমাগত ধর্ম্মসঙ্গত বসন্তোৎসব আর কোথাও আচরিত হইত কি না, জানি না।

মহারাণীমাতার পিত্রালয়েও গৃহদেবতার এই পুষ্পসজ্জার মহোৎসব বরাবর অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে। তদুপলক্ষে নিমন্ত্রিতদের সভায় রাজবাটীতে তাম্রকূটসেবন যেরূপ নিষিদ্ধ ছিল, এখানেও সেইরূপ। প্রায় ত্রিশ-বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। একবার এই সময়ে "স্বর্ণলতা"র প্রণেতা ডাক্তার তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সরকারীকার্য্যোপলক্ষে পুটিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। "বাবুর বাড়ীতে" (মহারাণীর পিতৃগৃহে) পদ্মযাত্রার দিন তাঁহার ও আর কয়জন গবর্মেণ্টকর্ম্মচারী এবং স্কুলমাষ্টারদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। স্থানীয় বিস্তর ভদ্র-লোক সমবেত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ন্যায় ইংরেজিনবীশ কয়টিরও আদর-অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু প্রথাবিরুদ্ধ বলিয়া "তামাক দিবার" কোন ব্যবস্থা ছিল না। এখানে বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, দেবাদির অর্চ্চনাস্থলে তামাকের চলন নিতান্ত আধুনিক প্রথা, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের মুখে শোনা যায় যে, নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় পুত্র শিবচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, যে সকল ব্রাহ্মণ তামাকসেবা করেন, তাঁহাদিগকেও প্রণাম করিও। সে যাহা হউক, নিমন্ত্রিত শিক্ষিত-বাবুকয়টির কাছে ইহা বড় বিসদৃশ বোধ হইতেছিল এবং "তামাক তামাক" করিয়া তাঁহারা অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য যে (আমলা) ভদ্রলোকটি নিযুক্ত ছিলেন, তিনি গলবস্ত্র হইয়া বিনীত-ভাবে জানাইলেন যে, সে ক্ষেত্রে তামাকসেবন নিষিদ্ধ। গঙ্গোপাধ্যায়মহাশয় ইহাতে অপ-মানজ্ঞান করিয়া তৎক্ষণাৎ সভাস্থল ত্যাগ করিয়া গেলেন। তিনি যে আহূত যুবকদলের অগ্রগণ্য হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহার ভিতর কেহ কেহ প্রথমে ব্যবহারটা অনুমোদনীয় নহে ভাবিয়া ইতস্তত করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে দলপতিকে অনুসরণ করিতে বাধ্য হইলেন। পুটিয়ার ভদ্রসমাজ ইংরেজীওয়ালাদের এই আচরণ অবশ্য প্রশংসমানচক্ষে দেখেন নাই এবং ক্রমে ইহা মহারাণীমাতার গোচর হইয়া-ছিল। কিন্তু তিনি ইহাতে কোন বিরাগ-প্রকাশ করেন নাই। বরং ঘটনার ৩।৪দিন পরেই তিনি তারকবাবুপ্রমুখ এই দলটিকে রাজবাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া পরমসমাদরে প্রচুর আহার করাইয়াছিলেন। সেদিন অবশ্য সুবাসিত-পরমসেব্য-তাম্রকূট-সেবা বাদ যায়

নাই। মহারাণী এইরূপ কমনীয় শিষ্টাচারে সর্ব্ববিধ অসৌজন্য পরাজিত এবং অমানীকে মান্যদান করিয়া লোকশিক্ষা দিতেন।

পুটিয়াস্থ যে নিরপেক্ষ কর্ত্তব্যপরায়ণ পুলিস্-কর্ম্মচারীটির কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তিনি এই নিমন্ত্রিতদলের একজন। এখনও তিনি জীবিত এবং ভগবানের কৃপায় দীর্ঘকাল পেন্‌শন্ ভোগ করিতেছেন। সেদিনও গল্পটি তাঁহার মুখে নূতন করিয়া শুনিয়াছি। তিনি বলেন, একবার অন্নপূর্ণাপূজার দিন ওয়ারেণ্টের আসামী মহারাণীর দেবসেবার নায়েবকে শিবের বড়মন্দির হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আনিলাম। আর কেহ হইলে আমায় কখন ক্ষমা করিতেন না, কিন্তু মহারাণীমাতার ইহাতে কিছুমাত্র ক্রোধের সঞ্চার হয় নাই। আর একবার রাজবাটীর বরকন্দাজেরা একজন প্রজাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল। সংবাদ পাইয়া তাহাদিগকে যথাবিহিত চালান দিলাম। তাহাতেও মহারাণীর কোন ভাবান্তর হয় নাই। ন্যায়পরতার দিকে তাঁর এম্‌নি তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল।

মহারাণীমাতার পুত্রবৎ স্নেহভাজন এক তরুণ যুবকের বালিকা পত্নী বিবাহের কিছুদিন পরে এক দুঃসাধ্য পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন। বন্ধুরা অনেকেই উপদেশ দিলেন, সবে বিবাহ হইয়াছে,—তোমার অত মাথাব্যথা কেন? আর একটা বিবাহ কর। কিন্তু যুবাটি মহা অর্থকৃচ্ছ্র সহ্য করিয়াও স্ত্রীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। মাতা সর্ব্বদা এই দম্পতির সংবাদ লইতেন এবং যুবার বন্ধুবান্ধবদের বাচনিক সহধর্ম্মিণীর অসুখের সময় তাহার বিষম পরীক্ষার কথা শুনিয়াছিলেন। প্রায় এক-বৎসর পরে সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাহাকে কাছে বসাইয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে বলিলেন, "ছেলেমানুষ তুমি যে ধর্ম্মবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছ, তাহাতে আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। ভগবান্ অবশ্য তোমার ভাল করিবেন।"

মহারাণীমাতার অসাধারণ চক্ষুলজ্জা ছিল এবং তাহার দুইএকটি পরিচয় ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। ১২৮৯ সালের আশ্বিনমাসে যে প্রকাণ্ড ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল, একদিন শেষরাত্রে মহারাণী তাহা দর্শন করিয়া প্রাতে আমাদের কাছে তাহার গল্প করিতেছিলেন। কয়দিন পূর্ব্বে দেখিয়া আমি মাতাকে বলিয়াছিলাম। তাই আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, —"আজ তোমার ধূমকেতু সুন্দররূপে দেখিয়াছি—খুব বড়।" অন্যান্য কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে এক প্রৌঢ়া ব্রাহ্মণকন্যা একবাটী তৈল আনিয়া মহারাণীর কাছে বসিলেন এবং আমাদের সমক্ষে চুল খুলিয়া বেশ সপ্রতিভভাবে তাহাতে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। কেহ বলিল, এখনও হাজিরা দিবার লোক বাকী আছে,—ঠাকুরাণীটি তথাপি নির্ব্বিকারভাবে তাঁহার কুন্তলদাম তৈলনিষিক্ত করিয়া চলিলেন। দুইচারিফোঁটা তৈল হর্ম্ম্যতলে পড়িতেছিল এবং তিনি মাঝে মাঝে হাতমুখ নাড়িয়া গল্পও করিতেছিলেন। মহারাণীমাতা তৈল স্পর্শ করিতেন না, দৃশ্যটাও তাঁর ভাল লাগিতেছিল না, ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম। কিন্তু তিনি গম্ভীর হইয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। ঠাকুরাণীটির ব্যবহার আমার সহিষ্ণুতা অতিক্রম করিল। আমি হাসিয়া বলিলাম, "রাজার সম্মুখে তেল মাখিতে নাই।" ব্রাহ্মণী তাচ্ছীল্যের হাসি

হাসিলেন, "শ্রীশকে সেদিন ছোট্ট দেখিলাম, এখন বড় হয়েছে! তা আমি রাণী কৃষ্ণমতীর সঙ্গে একত্রে খাইতাম।" আমি—"খাইতে আছে, তেল মাখিতে নাই।" মা হাসিলেন, আমিও হাসিয়া উঠিলাম। ঠাকুরাণী ইহার পর উঠিয়া গেলেন। মহারাণী এতক্ষণ কিছু বলেন নাই, আস্তে আস্তে ত্রৈলোক্যকে বলিলেন, "তেলটুকু মুছিয়া লও!"

একদিন মহারাণী ও তাঁহার মাতার কাছে আমরা বসিয়া আছি, এমনসময় একটি অল্পবয়স্ক রাজকর্ম্মচারী আসিলেন। বিশেষ প্রয়োজনে অন্যের অসাক্ষাতে মাতার কাছে তাঁহার কিছু বক্তব্য ছিল। আমি উঠিতে চাহিলে মহারাণী এবং তাঁহার মাতা বলিলেন, —"তুমি উঠিলে কি হইবে? অনেকে আছেন।" মহারাণী নিজে উঠিয়া জানালার দিকে গেলেন। তাঁহাদের কথা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এমনসময় কাদোর কোলে শ্রীসুন্দরী দেবীর ছোট কন্যাটি ঘুমাইয়া পড়িল। কাদো হাসিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"আপনি বিছানা করিয়া দেন।" মা হাসিলেন, বলিলেন, "সে কি কথা?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "বেশ তো, তাতে দোষ কি?" আমি বিছানার কাছে যাইতে না যাইতে মহারাণীমাতা নিজে বিছানা ছড়াইয়া দিলেন।

পূজার পূর্ব্বে একদিন প্রাতে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলাম। দেখিলাম, তাঁর বড় খেজালৎ। চারিদিক্ হইতে অনাথা, বিধবা, বালকবালিকারা আসিয়াছে। কেহ পূরবী, কেহ দান, কেহ কাপড় চাহিতেছে, মা বারংবার কাছারীতে ধনাধ্যক্ষের কাছে টাকা চাহিয়া পাঠাইতেছেন, হয় উত্তর পাইতেছেন না, নয় স্পষ্ট জবাব পাইতেছেন। বিরক্তির, খেজালতের সীমা নাই। এক ঠাকুরাণী বসিয়া আছেন, তাঁহার ডুলি প্রস্তুত, টাকা চাই, এখনই যাইতে হইবে। মহারাণীমাতার অমন ধৈর্য্য, তাহাও আজ কিছু অস্থির দেখিলাম। এবং ইহা যে অসুস্থশরীর, বৈষয়িক নানা ঝঞ্ঝট এবং কুমারের সেভাবে দেশভ্রমণে বহির্গত হওয়ার ফল, ইহাও বেশ বুঝিতে পারিলাম। কিছু পরে আমার দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন—"আগে অনেক সহ্য করিতে পারিতাম, এখন কেন বা সহ্য হয় না, অল্পেই রাগ হয়।"

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

বঙ্কিমচন্দ্র।*

সগরসন্ততিগণ ভস্ম-করা কপিলের রোষে
হারাইলে প্রাণ
ভগীরথ-তপে তুষ্ট হে জাহ্নবি! মঙ্গল-নির্ঘোষে
তুলি কলতান
নামিলে করুণাধারে ঝরঝর রজতনিঃসারে
মৃতসঞ্জীবনী
পাপরাশি ধৌত করি নবজন্ম-মহিমা-সঞ্চারে
রক্ষিলে ধরণী।

তেমনি কাহার শাপে বঙ্গের সন্তানকুল হায়!
হ'ল হতজ্ঞান
আপন গৌরব সাথে দীক্ষাশিক্ষা ভুলি মৃতপ্রায়
জর্জ্জরিতপ্রাণ।
হেনকালে হে বঙ্কিম! ভাবাবেগে শুভ্র মূর্ত্তিমতী
বহাইলে ভাষা
অধন্য বাঙালী ধন্য—মাতৃমূর্ত্তি হেরি জ্যোতির্ম্ময়ী
হৃদে ধরে আশা।

দেখাইলে মহাহর্ষে প্রতিভাদর্পণে হাস্যময়ী
সর্ব্বৈশ্বর্য্যে ভরা
অলঙ্কারবিভূষণা হেমবর্ণে প্রভাতার্কজয়ী
বিশ্বমনোহরা
দিব্য জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি,—সমুদিল উজলি' অতীত
পূর্ণজ্যোতিভরে
যখন ভারত ছিল বীর্য্যবন্ত শূরেন্দ্রবন্দিত
উন্নতিশিখরে।

পরে এল ধ্যানে তব কালীমূর্ত্তি কঙ্কালমালিকা
শ্মশানের মাঝে
দলিয়া আপন শিবে অপহৃত-সর্ব্বস্ব নগ্নিকা
অট্টহাস্যে নাচে।
এ মূর্ত্তি নেহারি তব কি ক্রন্দন জাগিল পরাণে
বিধিলিপি হায়!
এখন সে অন্ধকারে কালী নাচে ভারতশ্মশানে
কি আছে উপায়?

তোমার অভয়মন্ত্র আছে আছে ভুলিব না কভু
ঘুচিবে আঁধার
সেই কালী হইবেন দশভুজা সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রভু
যখন আবার
দশায়ুধে! তবাশ্রয়ে দৃপ্তসিংহ শত্রুনিপীড়নে
পা'বে জন্মভূমি
সিদ্ধি, ভাগ্য, বিদ্যা, বল, সঙ্গে ল'য়ে সুবর্ণকিরণে
দেখা দিবে তুমি।

কবে মা! আসিবে তবে নেহারিব সার্থকনয়নে
দুর্গামূর্ত্তি তব?—
এ দাসত্বদৈন্যমাঝে জননীয়ে কোন্ শুভক্ষণে
পা'ব অভিনব?
ব্রহ্মর্ষি বঙ্কিমচন্দ্র! ধ্বনিতেছে তব দিব্যবাণী
অভয়-গম্ভীরে—
"সমগ্র সন্তানকুল মা বলিয়া একাগ্র আহ্বানি'
পা'বে জননীরে।"

* গত ৮ই বৈশাখ কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-উৎসবে এবং মেদিনীপুর সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত বঙ্কিমোৎসব উপলক্ষে পঠিত।

পঞ্চাক্ষর দিব্যমন্ত্র তাই তুমি দিয়েছ শ্রবণে
হে গুরু মহান্
তাহাই উদাত্তস্বরে কোটিমর্ম্মে বাজিছে সঘনে ;—
আজি এক প্রাণ
সুমেরু-কুমারী ব্যাপি' ভারতের সমগ্র সন্তান
হৃদয় বাঁধিয়া
কি অসীম ভক্তি-আর্ত্ত মাতৃমূর্ত্তি করিছে লন্ধান
এ মন্ত্র সাধিয়া।

সঙ্কীর্ণ স্বার্থের দৃষ্টি নাহি আজি নয়নে নয়নে
চিত্তে ভক্তি ভরি'
মায়ের ভাণ্ডারে জাগে কোটি কোটি অবহিতমনে
যুবক প্রহরী।
এমনি মায়েরে 'সেবি' লক্ষ্মীরে বাঁধিব আজি ঘরে
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা
পূরাবেন মনস্কাম আশিষিয়া সুবর্ণনির্ঝরে
হিরণ্য-অঞ্চলা।

হে বঙ্কিম! ধূলিতলে আমরা আছিনু পদানত,
বুঝি নি আপনা
তোমার বিষাণে শুনি মাতৃনাম মোরা বজ্রাহত,
উচ্চকিতমনা
সহসা চাহিয়া দেখি সাহসে ভ'রেছে সর্ব্ববুক
ব্রহ্ম দৃপ্ত বলে
নিত্য-নব্য বীরপূজা—পরাভূত ভারতের মুখ
গৌরবে উজলে।

তোমারি মন্ত্রের বলে নবতর বিশ্ববিদ্যালয়
উঠিল জাগিয়া
বাণীপদে দাঁড়ায়েছে কত হিয়া আজি ভক্তিময়
আশিষ মাগিয়া
এ সাধনা সার্থ হবে—আমাদের বেদবিধি যত
কাব্য-ইতিহাস
দর্শনবিজ্ঞান-আদি মাতৃমুখে শুনি মনোমত
পূরাইব আশ।

জীবন্ত সাধনা তুমি শিখাইলে এমনি করিয়া
উপন্যাসছলে
মন্ত্রশক্তি ব্যর্থ নহে—এই সত্য মাধুরী ভরিয়া
শিখালে কৌশলে।
সাধনা-অভাবে ছিল মন্ত্রশক্তি কুপ্ত অর্থহীন
নির্জীব অক্ষরে
হে বরেণ্য তাই ভাবি' ধন্য তুমি করিলে দুর্দ্দিন
নব মন্ত্রস্বরে।

ভগীরথ-জ্যোতি তব গাঙ্গধারা আশিবে ঝরিয়া
মর্ত্ত্যপথে নামি'
ভারতশ্মশানভস্ম নবতর জীবনে ভরিয়া
থাক্ দিনযামি'।
রশ্মি-কিরণ-বীণা প্রতিভা-তপন হ'তে তব
বাজি' বারে বারে
রুগ্ণকণ্ঠ ডুবাইয়া শক্তিগীতে সুচির গৌরব
জাগাক্ ঝঙ্কারে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

হারামণির অন্বেষণ।

উপক্রমণিকা।

প্রাণ চায় তো আর-কিছু না—কেবল সে খাইয়া-পরিয়া কথঞ্চিৎপ্রকারে বর্ত্তিয়া থাকিতে পারিলেই বাঁচে। মনের আকিঞ্চন আর-একটু বেশী—মন চায় **আনন্দে** বর্ত্তিয়া থাকিতে। জ্ঞান হাত বাড়ায় আরো উচ্চে—জ্ঞান চায় অক্ষয়ধনে ধনী হইয়া নিত্যকাল আনন্দে বর্ত্তিয়া থাকিতে, অর্থাৎ আনন্দে বর্ত্তিয়া থাকা'র ব্যাপারটাকে আপনার কর্ত্তৃত্বের মুঠার মধ্যে আনিতে। জ্ঞান যাহা চায়, তাহা সে পাইবে কেমন করিয়া। জ্ঞান যে আত্ম-বিস্মৃত। এক একবার বিদ্যুতের ন্যায় যখন তাহার স্মৃতি গা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে, তখন সে মাথা তুলিতেছে—তাহার পরক্ষণেই নত-শির! আত্মাকে হারাইয়া জ্ঞান দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াছে বড়ই বিষম! মণিহারা ফণীর ন্যায় অধীর হইয়া উঠিতেছে **যখন-তখন**! হারামণি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে **যেখানে-সেখানে**! চেষ্টা ছাড়িতেছে না **কিছুতেই**! এক-বারকার রোগী যেমন আরবারকার রোঝা হয়, জ্ঞান তেম্নি—একবার **প্রাণ** হইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে, একবার **মন** হইয়া প্রশ্ন তুলিতেছে, একবার **বুদ্ধি** হইয়া উত্তরপ্রদান করিতেছে। বুদ্ধির কথা—একবার মন বুঝিতেছে, প্রাণ বুঝিতেছে না; একবার প্রাণ বুঝিতেছে, মন বুঝিতেছে না; একএকবার আবার এমনও হইতেছে যে, বুদ্ধি নিজের কথা নিজে বুঝিতেছে কি না, সন্দেহ। নানা শ্রেণীর নানা কথার ঘ্যান্‌ঘ্যানানিতে তিতিবিরক্ত হইয়া আমি জ্ঞানকে বলিলাম—"তোমার আপনার সঙ্গে আপনার এরূপ বোঝাপড়া চলিতে থাকিবে কতদিন?" ভ্রূললাট কুঞ্চিত করিয়া জ্ঞান তাহার উত্তর দিলেন এই যে, "হারামণি পাওয়া না যাইবে যতদিন।"

প্রশ্নোত্তর।

মূল জিজ্ঞাস্য দুইটি—(১) কি আছে এবং (২) কি চাই। ইহার সোজা উত্তর এই যে, **আছে** সত্য,—**চাই** মঙ্গল।

প্রশ্ন। এ যে একটি কথা তুমি বলিতেছ "আছে সত্য"—তোমার এই গোড়া'র কথাটি'র ভাবার্থ আমি এইরূপ বুঝিতেছি যে, **যাহা আছে**, তাহাই সত্য। তবেই হইতেছে যে, সবই সত্য—সত্য ছাড়া দ্বিতীয় পদার্থ নাই। কিন্তু মঙ্গল চাহিতে গেলে মঙ্গল বলিয়া একটা পৃথক্ বস্তু থাকা চাই, আর, তা ছাড়া—চাহিবার একজন কর্ত্তা থাকা চাই। সত্য ছাড়া দ্বিতীয় পদার্থ যখন নাই—তখন যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া তদ্ব্যতীত চাহিবার বস্তুই বা পাইতেছ কোথা হইতে—চাহিবার কর্ত্তাই বা পাইতেছ কোথা হইতে?

উত্তর। সত্য আপনিই চাহিবার বস্তু, আপনিই চাহিবার কর্ত্তা। সত্য আপনাকে আপনি চা'ন, আপনাকে আপনি পা'ন, আপনাতে আপনি আনন্দে বিহার করেন;—সত্যই মঙ্গল।

প্রশ্ন। আপনাকে-আপনি-চাওয়াই বা কিরূপ, আপনাকে-আপনি-পাওয়াই বা কিরূপ?

উত্তর। সত্য যদি কস্মিন্‌কালেও কাহারো নিকটে প্রকাশিত না হ'ন; না আপনার নিকটে—না অন্যের নিকটে—কাহারো নিকটে কোনোকালে প্রকাশিত না হ'ন, আর, কোনোকালে যে কাহারো নিকটে প্রকাশিত হইবেন—মূলেই যদি তাহার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে "সত্য-আছেন"-কথাটাই মিথ্যা হইয়া যায়। সত্য যদি প্রকাশই না পা'ন, তবে তিনি যে আছেন, তাহা কে বলিল? তাহার প্রমাণ কি? সত্য যদি তোমার নিকটে জন্মেও প্রকাশ না পাইয়া থাকেন, আর, তবুও যদি তুমি বলো "সত্য আছেন", তবে তোমার সে কথার মূল্য—এক কানাকড়িও নহে। দ্বিপ্রহর রজনীতে তুমি যখন প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলে, তখন তুমি ভাবিতেও পার নাই যে, সত্য বলিয়া এক অদ্বিতীয় ধ্রুবপদার্থ সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে বিদ্যমান। তোমার নিদ্রাভঙ্গে যখন তোমার নবোন্মীলিত চক্ষে চেতনের কপাট এবং দিক্‌চক্রবালে আলোকের কপাট—এক কপাট মর্ত্ত্যলোকে এবং আর-এক কপাট স্বর্গলোকে—দুই লোকে দুই কপাট একই সময়ে উদ্‌ঘাটিত হইল, আর, সেই শুভযোগে যখন তুমি উপরে-নীচে আশেপাশে এবং চারিদিকে চাহিয়া-দেখিয়া জানিতে পারিলে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কল্যও যাহা ছিল—অদ্যও তাহাই আছে, আর, সেই সঙ্গে যখন দেখিলে যে, বিশ্বজননী প্রকৃতির ক্রোড়ে কল্যও যেমন নিঃশঙ্কচিত্তে বসিয়া ছিলে, অদ্যও তেম্‌নি নিঃশঙ্কচিত্তে বসিয়া আছ, তখন তোমার মন বলিল যে, সত্য আছেন, আর, তোমার সুবুদ্ধি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সায় দিল। "কে তোমাকে জাগাইয়া তুলিল?" এখন তোমার মুখে কথা ফুটিয়াছে, তাই তুমি বলিতেছ, "আমাকে কেহই জাগাইয়া তোলে নাই—আমি আপ্নি জাগিয়া উঠিয়াছি।" এটা তুমি দেখিতেছ না যে, তুমি যাহাকে বলিতেছ "আমি আপ্নি"—তোমার গত-রাত্রের প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় সে আপ্নি ছিলই না মূলে, তাহার পরিবর্ত্তে ছিল কেবল একটা অন্ধ, পঙ্গু এবং অকর্ম্মণ্যের একশেষ তোমার বিছানায় পড়িয়া। সেই অসাড় অপদার্থটা'র কর্ম্ম কি আপনার বলে অজ্ঞান-অন্ধকার ঠেলিয়া-ফেলিয়া জ্ঞানে ভর দিয়া দাঁড়ানো? যাহার হাত-পা অসাড়, চক্ষু অন্ধ, তাহার কি কর্ম্ম সাঁতার দিয়া পদ্মা পার হইয়া উচ্চডাঙায় উঠিয়া দাঁড়ানো? সে তো তখন অকর্ত্তা। অকর্ত্তা'র আবার কর্ম্ম কিরূপ? অকর্ত্তার কর্ম্মও যেমন, আর, বন্ধ্যার পুত্রও তেম্‌নি, দুইই সমান। ফল কথা এই যে, তোমার প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় একে তো জাগিয়া উঠিতে পারিবার মতো শক্তি ছিল না তোমার হাড়ে একবিন্দুও; তাহাতে আবার, জাগিয়া উঠিবার ইচ্ছা যে, কোনো দিক্ দিয়া তোমার মনের ত্রিসীমার মধ্যেও প্রবেশ করিবে, তাহার পথ ছিল না মূলেই। অতএব এটা স্থির যে, তুমি আপন ইচ্ছায় জাগিয়া ওঠো নাই। কাহার ইচ্ছায় তবে তোমার মনের অজ্ঞান-

অন্ধকার ঠেলিয়া-ফেলিয়া প্রাণের ভিতর হইতে জ্ঞানের আলোক অল্পে-অল্পে ফুটিয়া বাহির হইল? সত্য ভিন্ন যখন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, তখন কাজেই বলিতে হইতেছে যে, জাগ্রৎ-জগতেই হো'ক্ আর নিদ্রিত জগতেই হো'ক্, পর্ব্বতশিখরেই হো'ক্ আর সমুদ্রগর্ভেই হো'ক্, জীর্ণকুটীরেই হো'ক্ আর স্বর্ণপ্রাসাদেই হো'ক্—যেখানে যে-কোনো কার্য্য হইতেছে, হইতেছে তাহা সত্যেরই ইচ্ছায়—তোমার ইচ্ছায়'ও নহে, আমার ইচ্ছায়'ও নহে। সত্যই আপন ইচ্ছায় তোমাকে জাগাইয়া-তুলিয়া তোমার নিকটে প্রকাশিত হইলেন; তা' শুধু না—তিনিই আপন ইচ্ছায় তোমাকে জাগাইয়া-রাখিয়া তোমার নিকটে প্রকাশ পাইতেছেন, আর, প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়াই, তুমি অকুতোভয়ে বলিতে পারিতেছ যে, সত্য আছেন। সত্য এই যে তোমার নিকটে প্রকাশিত হইতেছেন, আর, তুমি যে সত্যের প্রকাশ নয়ন ভরিয়া পান করিয়া প্রত্যহ পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতেছ, ইহার অবশ্যই কোনো-না-কোনো নিগূঢ় কারণ আছে—নহিলে সত্যই বা তোমার কে, আর, তুমিই বা সত্যের কে যে, তুমি সত্যের দেখা না পাইলে তোমার মঙ্গল নাই, আর, সত্য তোমাকে দেখা না দিলে তাঁহার নিস্তার নাই। কেমন করিয়া বলিব যে, তুমি সত্যের কেহই না বা সত্য তোমার কেহই না। তুমি তো আর অসত্য নহ। তুমি যে আমার চক্ষের সম্মুখে সত্য দেদীপ্যমান! তুমি যদি অসত্য হইতে, তবে তোমাকে কে বা পুছিত? তুমি সত্য বলিয়াই সত্য তোমার নিকটে প্রকাশিত হইতেছেন; সত্য সত্যেরই নিকটে প্রকাশিত হইতেছেন—পরের নিকটে না। অতএব এটা স্থির যে, তোমার নিকটেই হো'ক্, আমার নিকটেই হো'ক্, আর তৃতীয় যে-কোনো ব্যক্তির নিকটেই হো'ক্, যাহারই নিকটে সত্য প্রকাশ পা'ন—প্রকাশ পা'ন তিনি সত্যেরই নিকটে—আপনারই নিকটে। সত্যের এই যে আপনার নিকটে আপনার প্রকাশ, ইহারই নাম আপনাকে আপনি পাওয়া। কেন না, সত্যের প্রকাশেরই নাম সত্যের উপলব্ধি, আর, তাহারই নাম সত্যকে পাওয়া। আপনাকে-আপনি-পাওয়া কিরূপ, তাহা দেখিলাম, এখন আপনাকে-আপনি-চাওয়া কিরূপ, তাহা দেখা যা'ক। আপনার প্রকাশে যখন আপনার প্রতি আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, তখন আপনার প্রতি আপনার দৃষ্টির সেই যে প্রসক্তি, তাহা শুধুই কি কেবল চক্ষের চাওয়া? উদাসীন পরিব্রাজক পার্শ্বস্থ পুরস্বামীর প্রতি যে-ভাবে মর্ম্মক চাহিয়া আপনার গন্তব্য-পথ অনুসরণ করেন, উহা কি সেইভাবের চাওয়া? সত্য কি আপনার নিকটে আপনি কোথাকার কোন-একজন বেগানা লোক? তাহা হইতেই পারে না। ঠিক তাহার বিপরীত। পরস্পরের পছন্দসই সুবিবাহিত বরকন্যার শুভদৃষ্টির বিনিময়কালে উভয়ের চক্ষের চাওয়া'র মধ্য দিয়া কেমন অকৃত্রিম প্রাণের চাওয়া বাহির হইয়া পড়িতে থাকে—তাহা তো তোমার দেখিতে বাকি নাই। সেইভাবের প্রাণের চাওয়া'র সঙ্গে আপনাকে-আপনি-চাওয়া'র সৌসাদৃশ্য থাকিবারই কথা, কেন না, সুবিবাহিত বরকন্যা দোঁহে দোঁহার দ্বিতীয় আপ্নি। এটা'ও কিন্তু দেখা উচিত যে, দুয়ের মধ্যে সৌসাদৃশ্য যতই থাকুক না কেন, তাহা সৌসাদৃশ্য বই আর

কিছুই নহে; সে সৌসাদৃশ্য একপ্রকার অপ্রতিমের প্রতিমা বা জ্যোতির্ম্ম গুলের গাত্র-চ্ছায়া। প্রকৃত কথা এই যে, সত্য যে কিরূপ শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-পবিত্র-মধুময়-ভাবে আপনার প্রতি আপনি চা'ন, আর, সেই অনিরুদ্ধ জ্ঞানের চাওয়ার মধ্য দিয়া অতলস্পর্শ গভীর প্রাণের চাওয়া যে কিরূপ অপরিসীম ধীর-গম্ভীর এবং অটল শক্তিপ্রভাবে—মহাসংযম এবং মহা-উদ্যম দুয়ের অনির্ব্বচনীয় যোগ-প্রভাবে উদ্বেল হইয়া, জ্যোতির্ম্ময় আশী-র্ব্বাদে নিখিল ব্যোম উদ্দীপিত করিয়া, ভূর্ভুবস্বঃ হইয়া দশদিকে ফাটিয়া পড়িতেছে, তাহা (আমরা তো কীটাণুকীট) মহোচ্চ দিব্যধামবাসী মুনি-ঋষি এবং দেবতাদিগেরও ধ্যানের অতীত।

প্রশ্ন। তা তো বুঝিলাম। কিন্তু তাহাতে আমার জিজ্ঞাসা থামিতেছে না—বরং বৃদ্ধিই পাইতেছে। আমি চাই জানিতে চাওয়া এবং পাওয়া একত্র বাস করিবে কেমন করিয়া? বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল পি'বে কেমন করিয়া? আমি তো এইরূপ বুঝি যে, যতক্ষণ পাওয়া না হয়, ততক্ষণই প্রাণের ভিতর হইতে চাওয়া বাহির হইতে থাকে; পাওয়া হইলেই চাওয়া ঘুচিয়া যায়। তবে যদি বলো যে সত্য কোনো-সময়ে বা আপনাকে পা'ন, কোনো-সময়ে বা আপনাকে চা'ন; সেটা বটে একটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। তাই কি তোমার অভিপ্রায়? তুমি কি বলিতে চাও, সত্যের প্রকাশ সাময়িক প্রকাশ? আবার তা'ও বলি, অপ্রকাশের অবস্থায় চাওয়া কতদূর সম্ভবে—সেটাও একটা ভাবিবার বিষয়—বিশেষত প্রতিদিনই যখন দেখিতেছি যে, রাত্রিকালের প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় অপ্রকাশ যে-সময়ে সর্ব্বেসর্ব্বা হয়, সে সময়ে চাওয়া ধুইয়া-পুঁছিয়া মন হইতে এম্নি সাফ্ সরিয়া পালায় যে, তাহার চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। বলিতে কি—আমার জিজ্ঞাসা রক্ত-বীজের সহোদর—মরিতে চাহে না কিছুতেই! এক বীরের নিপাত হইল তো অম্নি তার জায়-গায় তিন বীর আসিয়া তাল ঠুকিয়া দণ্ডায়-মান! তার সাক্ষী :—

নবোত্থিত তিন প্রশ্ন।

(১) চাওয়া-পাওয়া'র একত্র-বাস কিরূপ সম্ভবে?

(২) সত্যের প্রকাশ সাময়িক প্রকাশ, না চিরপ্রকাশ?

(৩) প্রকাশ এবং অপ্রকাশের সহিত চাওয়া-পাওয়া'র কিরূপ সম্বন্ধ?

উত্তর। তোমার তিন প্রশ্নের উত্তর আমি যথাক্রমে দিব—মাসখানেক ধৈর্য্য ধরিয়া থাকো।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অভাবনীয়।

১

রাজকুমার চক্রবর্ত্তী যখন ইস্কুলে-কলেজে পড়েন, সাহেবী চালচলনে তখন হইতেই তাঁর ভারি অনুরাগ। ডভ্‌টন্-কলেজে বোর্ডাররূপে প্রবেশ করিয়া পড়াশুনা করিবেন, তাঁর ছাত্রজীবনের এই সুখস্বপ্ন দরিদ্র কেরাণী পিতার সামান্য উপার্জ্জনে সফল হয় নাই। কিন্তু প্রথম বিভাগে এফ্.-এ.-পরীক্ষায় পাস্ হইয়া পাঁচিশটাকার বৃত্তিলাভ করিলে নিজে তিনি ইহা কার্য্যে পরিণত করিলেন, বাপমা, আত্মীয়বন্ধু কাহারও কথা শুনিলেন না। তবে স্কলার্‌শিপের টাকায় এবং বাইবেলপরীক্ষার পুরস্কার-অর্থে সাহেবসাজার সখ্ তেমন মিটিত না। ক্লাসের ফিরিঙ্গী ছাত্রদের ভিতর খোস্‌পোষাকী কয়জনের সঙ্গে তিনি যে টক্কর দিতে পারিতেন না, গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে রাজকুমারের এ বড় দুঃখ। একবার জনরব উঠিয়াছিল, এই মনস্তাপে রাজকুমার খৃষ্টান হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে। সে যাহা হউক, বি.-এ. পাস দিবার পূর্ব্বে সবজজ্ অনুকূলবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা চারুবালার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। তদুপলক্ষে নগদ অর্থ, স্বর্ণরৌপ্যের আভরণ এবং দানসামগ্রীতে চক্রবর্ত্তিমহাশয়ের গৃহ পূর্ণ হইল। প্রবীণ পেন্‌শন্‌প্রাপ্ত চক্রবর্ত্তী আনন্দ এবং বিস্ময়ের বেগ ধারণ করিতে না পারিয়া কুটুম্বগৃহাগত লোকজনের সমক্ষেই বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, তিনি চিরজীবন রোজগার করিয়া যাহা আনিতে পারেন নাই, তাঁর রাজু একদিনেই তার পাঁচগুণ লাভ করিল! শুনিয়া বৈবাহিকা সবজজ্‌পত্নীর ধনগৌরবদৃপ্ত মুখখানিতে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং নিজে অনুকূলবাবু ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন।

যাহা হউক, অতঃপর রাজকুমার সখ্ মিটাইয়া শ্বশুরের অর্থে সাহেবী চালচলনের উন্নতি ও প্রশংসার সহিত এম্.-এ. পর্য্যন্ত পাস্ করিতে কোন বাধা পাইলেন না। এবং একাধারে অর্জ্জিতবিদ্যা ও সইসুপারিসের মণিকাঞ্চনযোগ সংঘটিত হওয়াতে গবমেণ্ট যথাসময়ে তাঁহাকে হিসাবকিতাববিভাগে বড় একটি চাকরীও দিলেন।

ইতিপূর্ব্বেই রাজকুমার একটি কন্যার মুখ দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহার নাম রাখিয়াছিলেন লিলি! কিন্তু শেষে সসম্পর্কীয় লোকদের, বিশেষত শ্যালিকামহলের বাক্যযন্ত্রণায় বাধ্য হইয়া যখন নামটাকে দেশী "লীলা"য় পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছিল, তখন তিনি শেক্‌স্‌পীয়রের প্রসিদ্ধ কবিতা আওড়াইয়া বলিয়াছিলেন, নামে কি এসে-যায়! যাহা হউক, তখন হইতে বাড়ীর লোকে তাহাকে লীলা বলিয়া ডাকিলেও বাপের কাছে চিরদিন সে "লিলি"ই রহিয়া গেল। রাজকুমারবাবু স্নানাগারে প্রবেশ করিয়া মুখপ্রক্ষালনের সময় চিলম্‌চীর উৎসৃষ্ট জলটুকু বারংবার

বক্ষ মধ্যে গ্রহণ করিতেছেন দেখিয়া তাঁর এক শ্যালক একবার সেরূপ সাহেবি-আনায় ধিক্কার দিলে সহাস্যে তিনি বলিয়াছিলেন, "ওটা অভ্যাস করতে হয়েচে হে!" ফলত রংটুকু ছাড়া আর কিছুতেই তাঁহাকে চিনিবার তেমন উপায় ছিল না। চাকরদের উপর আদেশ ছিল, তাঁহাকে ভুলিয়াও কেহ বাবু বলিবে না,—সাহেব বলিবে। যদি কখন কাহারও সে মারাত্মক ভ্রম হইত, চক্রবর্ত্তিসাহেব তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিতেন না।

এইরূপে ৫।৭বৎসর কাটিয়া গেল এবং ইহার মধ্যে রাজকুমারবাবুর ২।৩টা প্রোমোশন্ হওয়ায় আয়ও বেশ বৃদ্ধি হইল। কিন্তু সাহেবি-আনারূপ যজ্ঞে যে স্বর্ণরৌপ্যের আহুতির প্রয়োজন, এদেশে সচরাচর চাকুরীব্যবসায়ীর পক্ষে তাহার যোজনা সাধ্যের সীমা ছাড়াইয়া উঠে। রাজকুমার ক্রমশ ঋণজালে জড়িত হইতে লাগিলেন এবং "শ্যাম্পেন্ ডিনারের" মাত্রাতিশয্যে তাঁহার যকৃতের পীড়াও দেখা দিল। ডাক্তারেরা বলিল, তিনি অতঃপর পানাহারসম্পর্কে সংযত না হইলে শীঘ্রই ব্যারামটি দুরারোগ্য হইয়া উঠিবে।

২

রাজকুমারের অনেকগুলি সন্তান জন্মিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রথমা কন্যা ও একটি পুত্র-সন্তান ছাড়া সকলেই অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। লীলা ও সুকুমার ঠিক্ ফিরিঙ্গী মেয়েছেলের মত লালিতপালিত হইতেছিল এবং পিতার কঠোর শাসনে চাকরবাকরদের সঙ্গে হিন্দী ছাড়া কখন বাঙ্লা বলিতে পাইত না। চারুবালা স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা মেম হইয়া গেলেও তাঁহার এ সব বাড়াবাড়ির অনুমোদন করিত না এবং মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নান ও কালীঘাটে পূজাদান চক্রবর্ত্তিসাহেবের চক্ষুশূল হইলেও তাহার দ্বারা সম্পাদিত হইত।

"লিলি" পাঁচবৎসর বয়সে লোরেটো-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া দশবৎসর পর্য্যন্ত বরাবর সেখানে ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিল। দেশীয় কোনরূপ শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করা যে কর্ত্তব্য, তাহা রাজকুমারবাবুর বা তাঁর পত্নীর মনে হইত না। কিন্তু যকৃতের পীড়াটা ক্রমশ বৃদ্ধি হওয়ায় যখন চিকিৎসকদের পরামর্শে দীর্ঘ ছুটি লওয়ার প্রয়োজন হইল, তখনই উভয়ের জ্ঞানচক্ষু প্রথম উন্মীলিত হইল। রাজকুমার তার এক হিন্দুভাবাপন্ন বাল্যবন্ধুর গৃহে কতকগুলি সংস্কৃত, ফারসী ও বাঙ্লা মহাজনবচনাবলী কার্পেটের অক্ষরে সুন্দর ফ্রেমে বাঁধান ছবির মত লম্বিত দেখিয়াছিলেন। একটিতে লেখা ছিল—"ঐসা দিন নেহী রহেগা!" ব্যাধিক্লিষ্ট এবং আকণ্ঠঋণমজ্জিত রাজকুমার সে কথা মনে করিয়া অশ্রুমোচন করিলেন। জীবনে অনেক শিক্ষা হয়, কিন্তু ঠিক্ সময়ে যদি হইত! ছুটির প্রথমবর্ষ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি দেহত্যাগ করিয়া গেলেন। এবং তাঁর যে সব মূল্যবান্ ব্যবহারের জিনিষ ছিল, দেখিতে দেখিতে দেনার দায়ে সবই বিক্রয় হইয়া গেল।

রাজকুমারবাবুর স্ত্রী চারুবালা ইহার বহুপূর্ব্বে পিতৃহীনা হইয়াছিলেন। এই অভাবনীয় দুস্থ অবস্থায় তিনি ভাইদের আশ্রয় লইয়া কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন। লীলার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ উত্তীর্ণ হইয়াছিল, বিবাহ

দিলে নহে। কিন্তু সুপাত্র সহজে মেলে , মিলিলেও যে অর্থবলের প্রয়োজন, তাহা গ্রহের কোন উপায় ছিল না। এদিকের বর ত এইরূপ। অন্যত্র মেয়েটির শিক্ষা-ক্ষা সম্পূর্ণ হিন্দুরীতির বহির্ভূত হওয়াতেও াল বাধিতে লাগিল। লীলার ছোটমামার শুরবাড়ী হইতে জনরব উঠিল যে, সে একদিন ত্রে আহারের পূর্ব্বে ঘুমাইয়া পড়িলে তাহার ছাটমামী যেমন তাহাকে উঠাইতে গেল, মনি সে ইংরেজী-ফরাসীতে গালি ত দিলই, পরন্ত হিন্দীতেও নাকি বলিয়াছিল—"তোরা ড় খাইচি!" এই গল্প শুনিয়া কলিকাতা-ঞ্চলের শ্বশ্রুস্থানীয়া মহিলারা চারুবালার পর পর্য্যন্ত খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে সংবাদ পাওয়া গেল, বেহার-ঞ্চলে নূতন রেলওয়ে-লাইনের এক ষ্টেশন্-াষ্টার বিপত্নীক অবস্থায় বছরখানেক কাটাইয়া কটি বড় মেয়ে খুঁজিতেছেন। লীলার াতুলেরা সন্ধান করিয়া জানিলেন, পাত্রটির য়স পঁয়ত্রিশের মধ্যে এবং বি.-এ. পর্য্যন্ত ড়িয়া তিনি রেলওয়ের চাকরীতে প্রবেশ রিয়াছেন। আর তাঁর প্রথমপক্ষের কোন ন্তানও নাই। অতএব এই সুযোগ উপেক্ষা করিয়া চারুবালা লীলার বিবাহ দিলেন। াহার একমাত্র সান্ত্বনা এই হইল যে, যত্নে ক্ষিতা আদরের লীলাকে মূর্খপাত্রের হাতে ড়িতে হয় নাই।

৩

লারেটো-বিদ্যালয়ে লীলা যে কয়টি ইংরেজ-ালিকার সঙ্গে পড়িত, তাহার মধ্যে স্ এড্‌গারের সহিত তাহার বড় সখীত্ব ছল। এড্‌গারসাহেব ছোট কাজে প্রবেশ করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি এবং চরিত্রগুণে ক্রমশ রেলওয়ের একজন বড় কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। একমাত্র কন্যা জুলিয়ার স্নেহে তিনিও সপরিবারে লিলিকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন এবং চক্রবর্ত্তিসাহেবের জীবদ্দশায় সর্ব্বদা উভয় পরিবারে সৌহার্দ্দের আদানপ্রদান চলিত। তিনি পীড়িত হওয়ার বছরদুই পূর্ব্বে এড্‌গার পত্নী ও দুহিতাসহ স্বদেশে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী আর নাই। তাঁহার সন্তানদের খবর লইয়া জানিয়াছিলেন, অবস্থাবিপর্য্যয়ে তাহারা সুদূর পল্লীগ্রামে বাস করিতেছে। জুলিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া একএকবার পিতামাতাকে "লিলি"র সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে সেই কথা শুনিতে পাইত। চারুবালা সাহেবসমাজের সংস্পর্শকলঙ্ক মুছিয়া ফেলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন,—লীলা জুলিয়ার নামও মুখে আনিতে পাইত না।

বিবাহের মাসছয়েক পরেই লীলা স্বামীর ঘর করিতে গেল। ঘর না বলিয়া বন বলিলেই ঠিক্ হয়। প্রায় চারিদিকে পাহাড়-প্রাচীরবেষ্টিত ক্ষুদ্র মহৎপুর রেলওয়ে-ষ্টেশনের অদূরে ষ্টেশন্‌মাষ্টারবাবুর বাসা। তাহার তিন দিকে অল্পবিস্তর ধান্য এবং রবিশস্যক্ষেত্র। একপাশ দিয়া শুভ্রকঙ্করখচিত সরল সুদীর্ঘ রাজপথ দূরের শৈলনীলিমায় অন্তর্হিত হইয়াছে। ক্ষুদ্রকারাগৃহবৎ ছোট ছোট তিনটি ঘর এবং তাহার প্রাঙ্গণটুকু ঠিক্ সেই মাপের। এই গৃহের গৃহিণী হইয়া প্রথম-প্রথম লীলার মন টিকিত না। স্বামী নবীনমাধববাবু মাঝে মাঝে সাধ্যমত নূতন বই সংগ্রহ করিয়া দিয়া বালিকার এই বনবাসক্লেশ কথঞ্চিৎ লাঘব

করিতেন। তিনি শ্বশুর রাজকুমারবাবুর কাহিনী সকলই শুনিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন, তেমন সমৃদ্ধি ও আদরে লালিত-পালিত বধূকে কখন তাহার আদর্শের ওজনে সুখী করিতে পারিবেন না। এইজন্য তিনি লীলার সকল ইচ্ছা যথাসাধ্য পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেন, কখন তাহার প্রতিরোধ করিতেন না। তাহার পছন্দ বুঝিয়া গৃহ-প্রাচীরের বাহিরে বাগানের জন্য একখণ্ড জমি ঘিরিয়া লইয়াছিলেন। বালিকা প্রাতে এবং অপরাহ্ণে সেখানে একটু একটু বেড়াইয়া বাঁচিত এবং দাইয়ের কন্যাদের সহায়তায় স্বহস্তে তাহাতে শাকশবজি ও মরসুমীফুলের গাছ রোপণ করিত। তা ছাড়া, রোজ দুইবার ট্রেন্‌যাতায়াতের সময় শয়নগৃহের জানালার পথে একদৃষ্টে যাত্রীদের দেখা তাহার একটা কাজ ছিল।

নবীনমাধব দেখিতেন, লীলা সাধারণত বাঙালী ভদ্রলোকের মেয়েদের মত ঘোম্‌টা টানিয়া লজ্জা করিতে পারে না। ট্রেনের সময় অন্য অন্তঃপুরিকারা যেমন গবাক্ষের কপাট অর্দ্ধমুক্ত করিয়া কৌতূহলোদ্দীপ্ত কালো কালো চক্ষুগুলি নির্নিমেষে অপরিচিত স্ত্রী-পুরুষদের প্রতি স্থাপিত করে, সে তাহা পারে না। অতএব তিনি পর্দ্দার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। লীলা কখন তাহার অন্তরালে থাকিত, কখন বা মুক্তবাতায়নতলে দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া তাহার নিত্য বাষ্পীয়রথ-দর্শনের আনন্দটুকু ভোগ করিত। ইহাতে ঐ রেলওয়ে-লাইনের সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত বাবুমহলে তাহার বড় নিন্দারটনা হইল এবং নবীনমাধববাবু দ্বিতীয়পক্ষের পরিবারশাসিত হওয়াতে একেবারে মানুষের বাহির হইয়া গিয়াছেন, এই পরম সত্যতত্ত্বটুকুও তাঁহাদের রসনাগ্রে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

৪

বৎসরের শেষভাগে রেলওয়ে-লাইন পরিদর্শন জন্য কর্তৃপক্ষীয়দের স্পেশিয়াল ট্রেন্‌ যখন মহৎপুরে আসে, তখন সেখানে বড় ধুম। সচরাচর এজেণ্টসাহেব অন্যান্য-বড়-কর্ম্মচারি-পরিবৃত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী নিবিড় বন ও শৈল-উপত্যকায় শিকার খেলিবার জন্য একদিন সেখানে অবস্থিতি করেন। এড্‌গারসাহেব আফিশএটিং এজেণ্ট হইয়াছেন এবং সম্ভবত সপরিবারে আসবেন, স্বামীর মুখে শুনিতে পাইয়া লীলা ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। কতদিনের কত সুখস্মৃতি তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। মাতার নিষেধমতে সে সাহেবদের সহিত ঘনিষ্ঠতার কথা কাহাকেও বলিত না—স্বামীকেও নহে। তিনি বাহিরে গেলে অন্তরালে সে দুইফোঁটা চোখের জল ফেলিল।

নির্দ্দিষ্টদিনে স্পেশিয়াল্‌ ট্রেন্‌ যখন আসিল, তখন প্রভাতসূর্য্যের কনককিরণ অসমতল-বনানীশিরে এবং দিগন্তবিস্তৃত শৈলমালার শৃঙ্গে শৃঙ্গে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। লীলা ঔৎসুক্যের সহিত চিত্রবিচিত্র গাড়িগুলির পানে তাকাইয়া ছিল। এজেণ্টসাহেব অবতীর্ণ হইয়া কিশোরী কন্যা জুলিয়াকে নামাইয়া লইলেন। তাহার সেই স্নেহের জুলিয়া,—লম্বিতবেণী পদ্মরাণী! কেন না, সে অর্দ্ধস্ফুট প্রভাতকমলের মতই সুন্দরী! চারিবৎসরে সে একটু দীর্ঘাঙ্গী হইয়াছে মাত্র, আর কোন পরিবর্ত্তন লীলা লক্ষ্য করিতে পারিল না।

এজেণ্টসাহেব অর্দ্ধঘণ্টা পরে সদলবলে শিকারে চলিয়া গেলেন। জুলিয়া গেল না—সে তাহার দাসীর সঙ্গে গাড়িতে রহিল—ইহাতে মৃগয়াপ্রিয় সাহেবমহলে একটু কানাকানি পড়িয়া গেল। বুঝিয়া এড্‌গার হাসিয়া উঠিলেন এবং কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া স্মিতমুখে বলিলেন—"ও আমার হিন্দুভাবাপন্ন মেয়ে, রক্তপাত দেখিতে পারে না। উহার হিন্দু সখী 'লিলি'র প্রভাব এখনও উহার উপর সম্পূর্ণ। আমি যে রবিবারে শিকারে যাই, ইহাও আমার কুসংস্কারাপন্না ক্ষুদ্র মাতাটির অসহ্য!" প্রায় সকল সাহেবই Nonsense বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং কেহ অশ্বপৃষ্ঠে কেহ কেহ বা সাইকেলে ভর করিয়া মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইলেন।

ওদিকে মিস্ এড্‌গার খানিকক্ষণ কুকুর লইয়া ছুটাছুটি করিল এবং তার পর প্রধানা আয়াকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইল। লীলা কতক অবস্থাবিপর্য্যয়ে কতক বা বধূজনোচিত লজ্জায় এ পর্য্যন্ত আত্মসংবরণ করিয়া ছিল, কিন্তু আর পারিল না। ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যানের নিকটবর্ত্তিনী হইবামাত্র পরিচিতকণ্ঠে "জুলিয়া" ডাক শুনিয়া মিস্ এড্‌গার চমকিয়া উঠিল। দেখিল, সেখানে তাহার "লিলি" বাঙালীবধূর বেশে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তখন আর ভ্রম রহিল না। জুলিয়া ছুটিয়া আসিয়া বাল্যসখীকে জড়াইয়া ধরিল এবং ছেলেবেলারই মত তাহাকে চুম্বনের উপর চুম্বন করিল।

এই মিলনের আনন্দ অনুভব করা যায়, কিন্তু বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু একটুতে জুলিয়া বুঝিল, তাহার সে "লিলি" আর নাই! তখন লীলার মুখে তাহাদের দুরবস্থার কথা একে একে বাহির করিয়া লইয়া সে মর্ম্মাহত হইল।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে এড্‌গারসাহেব একটা বাঘ ও গোটাদুই হরিণ শিকার করিয়া স্পেশিয়াল্ ট্রেনে ফিরিলেন। জুলিয়া তাঁহাকে দেখিয়া অন্যদিনের মত ছুটিয়া আসিল না, এবং হত ব্যাঘ্রাদি দেখিবার জন্য কোন ঔৎসুক্যও প্রকাশ করিল না। কয়ঘণ্টার ভিতর সে বালিকাসুলভ নিশ্চিন্ত আনন্দভাব ভুলিয়া যুবতীর মত গম্ভীর হইয়াছে!

আহারাদিশেষে পিতার কাছে বাহিরের লোক কেহ রহিল না। তখন সে "লিলি"র সঙ্গে সাক্ষাতের গল্প করিল। লিলি স্বামীর সঙ্গে ঘোড়ার ঘরের মত কুৎসিত গৃহে বাস করে, ইহা জুলিয়া সহিতে পারিতেছিল না। তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে বাপকে বলিতেছিল যে, এমন ছোট্ট ছোট্ট কারাগার যাহারা মানুষের বাসের জন্য তৈয়ারি করিয়াছে, নিশ্চয়ই তাহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত এবং ইহা বলিতে তাহার একটুও দ্বিধাবোধ হয় না।

এড্‌গারসাহেব ইহাতে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। অতঃপর তিনি নবীনমাধবকে ভাল একটু কাজ দিয়া কলিকাতার সন্নিকটে বদলী করিয়াছিলেন। সেখানে জুলিয়া মাঝে মাঝে তাহার আদরের "লিলি"কে দেখিতে আসিত।

সেই।

যখনি কোলে বীণাটি তুলে,
গাহিতে চাহি গান
বীণার তারে, বাজিয়া ওঠে
একটি শুধু নাম।
যখনি মোর, জানালা খুলে
গগনপানে চাই
নীলাম্বরে, তাহারি আঁখি
দেখিতে শুধু পাই।
আষাঢ়ে যবে আকাশ ছেয়ে
সজল মেঘ ভাসে
নিবিড় কালো, অলক তার
কেবলি মনে আসে।
মাধবীরাতে পূর্ণিমাতে
জোছনা যবে ফোটে
রঙিন তার ওড়নাখানি
আঁখিতে জেগে ওঠে।
কাহারে যদি, ডাকিতে চাই;
তাহারি নাম ধরি
চমকি উঠি, নীরব হই
সরমে প্রাণে মরি।
নিশীথে যবে, সাধনা করে'
আলস চোখে আনি
স্বপনে প্রাণে, জাগে গো তার
বিমল মুখখানি।

শ্রীজঃ—

রাইবনীদুর্গ।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

মীরহবীব অভয়ানন্দকে মুখ্যত যে ভার দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার হরিহরপুর ও রাজঘাট ছাড়া অন্য কোন স্থানে ঘুরিবার বিশেষ দরকার ছিল না। ময়ূরভঞ্জরাজ্যে সেনাবলের তাদৃশ অভাব ছিল না। কিন্তু নিয়মিত শিক্ষাদীক্ষার অতিরেকে তাহারা নবাবী সুশিক্ষিত এবং কামানে-বন্দুকে অভ্যস্ত ফৌজের সমকক্ষ নহে। রাজঘাটের দুর্গ সুসংস্কৃত করিয়া অল্পসময়মধ্যে তথায় সম্মুখসমরে আলিবর্দ্দীর গতিরোধ করার উপযোগী সেনাবল সংগ্রহ করিতে পারিলেই উড়িষ্যার দেওয়ানপ্রবরের মনোমত কার্য্য হইত। কিন্তু অভয়ানন্দ সমরোদ্যোগকে কেন্দ্রীভূত না করিয়া নানাস্থানে বিস্তারিত করিতেছিলেন।

মীরহবীব নাগপুরী মহারাষ্ট্রদের সহিত ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার পর সেনাপতি রঘুজীর আদেশে ভাস্করপণ্ডিত সসৈন্যে উড়িষ্যা পরিক্রম করিয়া গেলেন। তদবধি উৎকলের সিংহাসন কালে যে তাঁহারই হইবে, এ বিষয়ে দেওয়ানজীর আর সংশয় রহিল না। এজন্য তিনি সে প্রদেশের রাজন্যবর্গমধ্যে কেহ বলীয়ান্ হইয়া উঠিতে না পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। ময়ূরভঞ্জপতির সেনাবলবৃদ্ধি তিনি কেবল সাময়িক-প্রয়োজনানুরোধেই সমর্থন করিয়াছিলেন, সে রাজ্যের স্থায়িকল্যাণকামনায় নহে। বুঝিয়া অভয়ানন্দ ঠিক বিপরীত পক্ষে চলিতে লাগিলেন। তবে বর্গীর প্রথম অভিযান যে মীরসাহেবের চক্রান্তপ্রসূত, ইহা প্রথমে কাহারও সন্দেহ হয় নাই। অভয়ানন্দ বাহ্যত তাঁহার আদেশমত রাজঘাটদুর্গকে দুর্জ্জয় করিয়া তুলিতেছিলেন।—কিন্তু ভিতরে ভিতরে বামনঘাটির বিশাল অরণ্যমধ্যে তিনি যে বিপুল বাহিনীর সৃষ্টি করিতেছিলেন, সময় থাকিতে সে চেষ্টা হইলে উৎকলের রাজদণ্ড কাহার হস্তগত হইত, বলা যায় না।

অভয়ানন্দ কয়মাসের ভিতর সমস্ত জঙ্গলমহাল ও ছোটনাগপুরের খণ্ডরাজ্যসকল নানা বেশে পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বামনঘাটির বনানীতলে তিনি বন্যজাতিদের একত্র করিয়া মাঝে মাঝে তাহাদের সমরাভিনয় দেখিতেন এবং ঠাকুরজী বলিয়া তাহাদের নিকট পরিচিত হইলেন। ইহার ফলে ভীষণ লাড়কা কোলেরা পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগত হইয়া উঠিল।

কিন্তু কামানবন্দুকের সমক্ষে কি করিয়া তাহারা স্থির থাকিতে পারে, ইহাই তাঁহার প্রধান ভাবনার বিষয় হইল। জঙ্গলমহালের স্থানে স্থানে প্রচুর লৌহখনি ছিল। অভয়ানন্দ বহুদর্শিতার অভাবে কেবল আশায় নির্ভর করিয়া মনে করিলেন, অভিজ্ঞ কর্ম্মকারগণকে আনাইয়া তাহার কতক কতক প্রস্তুত করাইবেন। মুঙ্গের, বিষ্ণুপুর এবং পালামৌ অঞ্চলে তৎকালে অস্ত্রশস্ত্র যথেষ্ট পাওয়া যাইত। গোপনে সে সকল সংগ্রহের ও চেষ্টা হইতে লাগিল।

এদিকে জনরব উঠিল, নবাব আলিবর্দ্দী উড়িষ্যাবিজয়ের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন—বর্ষার পূর্ব্বেই মুর্শিদকুলীকে উচ্ছেদ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করা তাঁহার অভিপ্রেত। মীরহবীব কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বড় বড় রোকা লইয়া সওয়ারেরা কটক হইতে ডাকে ঘনঘন হরিপুর-অভিমুখে ছুটিতে লাগিল। সকল সময়ে তাহারা অভয়ানন্দের দেখা পাইত না। এজন্য দেওয়ানজী ঠিক সময়শিরে পত্রোত্তর পাইতেছিলেন না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

কণ্ঠহিতা শকুন্তলার দিনে কোকিলবধূদের ছলনাবারতা রাজামহারাজদেরও অবিদিত ছিল না। কিন্তু স্ফুটবাক্ গৃহপালিতা মদনসারিকার রীতিনীতি আজিকার দিনেও বোধ করি সর্ব্বজনপরিচিত নহে। ফলত এই পাহাড়িয়া ময়নাদের অসাধারণ সতর্কতা এবং কূটবুদ্ধির কথা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। ইহারা সাধারণত পার্ব্বত্যপ্রদেশে নিবিড় কণ্টকবৃক্ষসঙ্কুল বনমধ্যে আপনাদের বাসস্থান নির্ব্বাচন করিয়া মানুষের কবল হইতে শাবকগুলিকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। যে বৃক্ষকোটরে তাহারা নীড় বাঁধে, তাহা কণ্টকাকীর্ণ এবং অন্যান্য গাছ হইতে দূর ও স্বতন্ত্র হওয়া চাই; আর যে শাখাটিতে বাসস্থান, তাহা এরূপ শুষ্ক ও ভঙ্গুর হইবে যে, কোন আরোহীর পদচাপ সহিবে না। এই সকল দীর্ঘ তরুকোটরে সচরাচর ভীষণ সর্পের বাস, শুকসম্পাতি অবশ্য তাহাতে বাসা বাঁধে না। কিন্তু কুলায়লুণ্ঠনের সম্ভাবনা বুঝিলে তাহারা সেই অজগরবিবরের চারিপার্শ্বে আর্ত্ত চীৎকার করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়ায়—ভুলিয়াও নিজেদের আবাসগৃহাভিমুখে ধাবিত হয় না। অসতর্ক মানুষ সেই কোটর পক্ষিনীড় ভাবিয়া তাহাতে হস্তার্পণ করিলেই সর্পদংশনে প্রাণ হারায়।

মীরহবীব এই বিহঙ্গসুলভ কূটবুদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আধুনিক ভারতীয় ঐতিহাসিকযুগে তাঁহার ন্যায় চৌকষ অতিসাবধান রাজনীতিজ্ঞ আর দেখা যায় না। এইজন্য সামান্য অবস্থা হইতে যথাকালে তিনি বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার প্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন। ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিলে তিনি কালের বেলায় পদাঙ্ক অঙ্কিত করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু ভগবান্ জীবনযাত্রার প্রধানপাথেয়স্বরূপ সে অমৃতকণা তাঁহার ভাগ্যে বিধান করেন নাই।

শিবাপ্রসন্ন দাসের সঙ্গে মীরহবীবের চাক্ষুষ-পরিচয় ছিল। তিনি জানিতেন যে, দাস-মহাশয় অলৌকিক ব্যক্তি, দরকার হইলে হিন্দুমুসলমাননির্ব্বিশেষে প্রাণপাত করিতেও তিনি কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু কোনরূপ অধর্ম্ম তাঁহার কাছে প্রশ্রয় পাইবে না। প্রভু মুর্শিদকুলীখাঁর বিদ্রোহাচরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া দেওয়ানজী এইজন্য প্রথমেই শিবাপ্রসন্নকে কারারুদ্ধ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, দাসজীউ ঘুণাক্ষরে তাঁহার অভিসন্ধি টের পাইলে ময়ূরভঞ্জপতিও বক্র হইয়া উঠিবেন।

ক্রমশ।

প্রাচীন সামাজিক চিত্র।

বহুবিবাহ ও সপত্নীদ্বেষ।

মহাভারতের বকবধপর্ব্বে বকরাক্ষসের দৈনিক আহারের জন্য জানপদবর্গকে পালাক্রমে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত একএকটি মানুষ প্রদান করিতে হইত। পর্য্যায়ক্রমে যখন এই পালা কোন ব্রাহ্মণপরিবারে উপস্থিত হয়, তখন সেই পরিবারের স্বামী, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার মধ্যে কোন্ ব্যক্তি নিজেকে অর্পণ করিবে, তদ্বিষয়ে বিষম তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল; সকলেই অপরের জন্য নিজের প্রাণবিসর্জ্জনে উদ্যত হইয়া তদনুকূল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণপত্নী তাঁহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর স্ত্রী পাইতে পারিবেন, তাহার দ্বারাই আপনার ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। পুরুষগণের পক্ষে বহুপত্নীকতা দোষ নহে, পূর্ব্বপতিকে উল্লঙ্ঘন করিলে স্ত্রীলোকেরই মহান্ অধর্ম্ম হয়—

"উৎসৃজ্যাপি হি মামার্য্য প্রাপ্স্যস্যন্যামপি স্ত্রিয়ম্।
ততঃ প্রতিষ্ঠিতো ধর্ম্মো ভবিষ্যতি পুনস্তব।
ন চাপ্যধর্ম্মঃ কল্যাণ বহুপত্নীকতা নৃণাম্।
স্ত্রীণামধর্ম্মঃ সুমহান্ ভর্ত্তুঃ পূর্ব্বস্য লঙ্ঘনে।"

মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১৫৮। ৩৫—৩৬

'বহুপত্নীকতা যে দোষ নহে, তাহা আমরা 'ব্রাহ্মণ'গ্রন্থেও ঐরূপেই দেখিতে পাই—

"একস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি, নৈকস্যৈ বহবঃ সহপতয়ঃ।" *

ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, ৩,২।১২

'একজনের বহু জায়া হয়, এক জায়ার এক সঙ্গে বহু পতি হয় না।' ঐতরেয়ব্রাহ্মণে এক পতির বহু জায়ার কথা আরও পাওয়া যায়।† বেদের মন্ত্রভাগের মধ্যেও ইহার বহুল পরিচয় পাওয়া যায়। ‡ ঋগ্বেদের দুইটি সমগ্র সূক্তই এই বহুপত্নীকতার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। এই সূক্তদ্বয়ে অতি বিচিত্ররূপে সপত্নীদ্বেষ বর্ণিত হইয়াছে। সূক্তদুইটি যথাক্রমে ঋগ্বেদ দশম মণ্ডলের ১৪৫, ও ১৫৯ সংখ্যক।

প্রত্যেক বৈদিক মন্ত্রেরই ঋষি ও দেবতা আছেন। যাঁহার সেই বাক্য, অর্থাৎ যিনি ঐ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন, তিনিই ঐ মন্ত্রের ঋষি; এবং ঐ বাক্যদ্বারা যাহা প্রতিপন্ন হয়, তাহাই ঐ বাক্যের দেবতা।

প্রথম সূক্ত ইন্দ্রাণীর, অতএব ইন্দ্রাণীই তাহার ঋষি; এবং এই সূক্তদ্বারা 'সপত্নীবাধন'

* ঋগ্বেদ, ১।১০৫।৮, ৩।১।১০; ৬—৪
† বিধবাবিবাহসমর্থনকারিগণের এই শ্রুতি অন্যতম অস্ত্র।
‡ "যদি হ বা অপি বহ্ব্য ইব জায়াঃ, পতির্বাব তাসাং মিথুনম্।" ৩,২।১২

অর্থাৎ সপত্নীপীড়ন প্রতিপাদিত হইতেছে বলিয়া ইহার দেবতা 'সপত্নীবাধন'! *

দ্বিতীয় সূক্তে পুলোমতনয়া শচী নিজেরই স্তুতি করিয়াছেন, অতএব তিনিই দেবতা, তিনিই ঋষি।†

নিম্নে সূক্তদুইটির অনুবাদ প্রদান করিতেছি—

প্রথম সূক্ত।

১। যাহা দ্বারা সপত্নীকে বাধা দেওয়া যায়, যাহা দ্বারা পতিকে অসাধারণভাবে লাভ করা যায়, আমি সেই অতিবীর্য্যবতী লতারূপ ওষধিকে ‡ খনন করিতেছি।

২। হে ওষধি, তোমার পত্রগুলি উত্তান হইয়া রহিয়াছে, তুমি সৌভাগ্যলাভের উপায়-স্বরূপ, তুমি দেবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছ, তুমি বলবতী, তুমি আমার সপত্নীকে দূর কর, এবং পতিকে কেবল আমারই করিয়া দাও।

৩। হে ওষধি, তুমি উৎকৃষ্ট, তোমার প্রসাদে আমিও যেন উৎকৃষ্ট হই, উৎকৃষ্ট স্ত্রীলোক হইতেও যেন আমি উৎকৃষ্টতর হই; আর আমার যে সপত্নী আছে, সে যেন নিকৃষ্টা হইতেও নিকৃষ্টতরা হয়।

৪। আমি এই সপত্নীর নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করি না, সপত্নীজনের উপর কেহ প্রীত হয় না, আমি সপত্নীকে দূর হইতে আরও দূরে পাঠাইয়া দিই—(স্বামীর নিকট হইতে অত্যন্ত বিযুক্ত করি)।

৫। হে ওষধি, আমি সপত্নীকে অভিভব করিতে পারি, তুমিও তাহাকে অভিভব করিতে পার; আমরা দুইজনে বলবতী হইয়া সপত্নীকে অভিভব করি।

৬। হে পতি, এই সপত্নীর অভিভব-কারিণী ওষধিকে তোমার উপধান (বালিশ) করিতেছি, সেই অভিভবকারিণী ওষধিদ্বারা আমি তোমাকে চতুর্দ্দিকে ধারণ করিতেছি—আলিঙ্গন করিতেছি; § যেমন গো বৎসের প্রতি, অথবা যেমন জল নিম্নপথে বেগে ধাবিত হয়, সেইরূপ তোমার মন আমার প্রতি ধাবিত হউক। ¶

দ্বিতীয় সূক্ত।

১। এই যে সূর্য্য উদিত হইয়াছেন, ইহা আমার সৌভাগ্যই উদিত হইয়াছে; তাহা আমি জানিয়াছি (অথবা, আমি পতিকে লাভ করিয়াছি), আমি সপত্নীকে অভিভব করিয়া, পতিকেও অভিভব করিয়াছি।

* "ইমামিন্দ্রাণ্যুপনিষৎ সপত্নাবাধনম্—" কাত্যায়নকৃত সর্ব্বানুক্রম।

† "পৌলোমী স্বান্ গুণাংস্ত্বত্র সপত্নানাং প্রশংসতি।" বৃহদ্দেবতা, :৬২

"'উদসৌ' স্বস্য পৌলোমী শচী নাম মুনিঃ স্মৃতঃ ॥ আর্ষানুক্রমণী, ৮২

‡ আপস্তম্ব এই ওষধি 'পাঠা' নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

আপস্তম্বগৃহ্যসূত্র, ৯।৫-

§ আপস্তম্বগৃহ্যসূত্র, ৯।৬ দ্রষ্টব্য।

¶ অনূদিত সূক্তটির মূল এইরূপ—

"ইমাং খনাম্যোষধিং বীরুধং বলবত্তমাম্।
যয়া সপত্নীং বাধতে যয়া সংবিন্দতে পতিম্ ॥ ১ ॥
উত্তানপর্ণে সুভগে দেবজূতে সহস্বতি।
সপত্নীং মে পরা ধম পতিং মে কেবলং কুরু ॥ ২ ॥

২। আমি সমস্ত জানি, আমি মস্তক,—সকলের মধ্যে প্রধান আমি; আমি উগ্রা হইয়া (পতিকে) আমার অভিমতই বলাই; সপত্নীগণের অভিভবকারিণী আমার বুদ্ধি বা কার্য্য অনুসরণ করিয়া পতি চলেন।

৩। আমার পুত্রগণ শত্রুহননকারী অর্থাৎ বলবান্, আমার কন্যা বিশেষভাবে শোভিত, আমি সপত্নীগণকে সম্যক্ জয় করিয়াছি, পতির নিকটে আমারই যশ উত্তম।

৪। যে হবির দ্বারা ইন্দ্র কর্ম্মকর্ত্তা, যশস্বী (অথবা অন্নবান্) ও উত্তম হইয়াছেন, হে দেবগণ, আমিও তাহা করিয়াছি, এইজন্য আমি শত্রুরহিতা হইয়াছি।

৫। আমি শত্রুহীনা; আমি শত্রুকে হনন করি, জয় করি, অভিভব করি; যেমন অস্থির লোকের ধন অন্যে হরণ করে, সেইরূপ আমি সপত্নীগণের ধন ও তেজ খণ্ডন করি।

৬। আমি সপত্নীগণকে সেইরূপ অভিভব করিয়াছি,—পরাজয় করিয়াছি, যাহাতে আমি বীর—পতির, ও তদীয় পরিজনের উপর বিরাজ করিতেছি।*

আপস্তম্বগৃহ্যসূত্রে উদাহৃত সূক্তদুইটি সপত্নীপীড়নার্থ অনুষ্ঠেয় কার্য্যে নিম্নলিখিতরূপে বিনিযুক্ত হইয়াছে।

পুনর্বসুনক্ষত্রযোগে বধূ 'পাঠা'-নামক ওষধির সমীপে গমন করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে একুশটি যব এই মন্ত্রে ছড়াইয়া দিবে—

"যদি বারুণ্যসি বরুণা ত্বা নিষ্ক্রীণামি. যদি সৌম্যসি, সোমা ত্বা নিষ্ক্রীণামি"—'যদি তুমি বরুণদেবতার হও, বরুণের নিকট হইতে

উত্তরাহমুত্তর উত্তরেদুত্তরাভ্যঃ
অথা সপত্নী যা মমাধরা সাধরাভ্যঃ ॥ ৩ ॥
ন হ্যস্যা নাম গৃভ্ণামি নো অস্মিন্ রমতে জনে
পরামেব পরাবতং সপত্নীং গময়ামসি ॥ ৪ ॥
অহমস্মি সহমানাথ ত্বমসি সাসহিঃ।
উভে সহস্বতী ভূত্বা সপত্নীং মে সহাবহৈ ॥ ৫ ॥
উপ তেঽধাং সহমানামভি ত্বাধাং সহীয়সা।
মামনু প্র তে মনো বৎসং গৌরিব ধাবতু পথা
বারিব ধাবতু ॥ ৬ ॥"

এটি অথর্ববেদসংহিতাতেও আছে। তৃতীয়কাণ্ড, অষ্টাদশসূক্ত দ্রষ্টব্য।

* মূল—"উদসৌ সূর্য্যো অগাদুদয়ং মামকো ভগঃ।
অহং তদ্বিদ্বলা পতিমভ্যসাক্ষি বিষাসহিঃ ॥ ১ ॥
অহং কেতুরহং মূর্দ্ধাহমুগ্রা বিবাচনী।
মামদনু ক্রতুং পতিঃ সেহানায়া উপাচরেৎ ॥ ২ ॥
মম পুত্রাঃ শত্রুহণোঽথো মে দুহিতা বিরাট্।
উতাহমস্মি সংজয়া পত্যৌ মে শ্লোক উত্তমঃ ॥ ৩ ॥
যেনেন্দ্রো হবিষা কৃত্ব্যভবদ্ দ্যুম্ন্যুত্তমঃ।
ইদং তদক্রি দেবা অসপত্না কিলাভুবম্ ॥ ৪ ॥
অসপত্না সপত্নঘ্নী জয়ন্ত্যভিভূবরী।
আবৃক্ষমন্যাসাং বর্চো রাধো অস্থেয়সামিব ॥ ৫ ॥
সমজৈষমিমা অহং সপত্নীরভিভূবরী।
যথাহমস্য বীরস্য বিরাজানি জনস্য চ ॥ ৬ ॥"

তোমাকে ক্রয় করিয়া লইতেছি; যদি তুমি সোমদেবতার হও, সোমের নিকট হইতে তোমাকে ক্রয় করিয়া লইতেছি।'

পরদিন বধূ পূর্ব্বোদাহৃত 'ইমাং খনামি' ইত্যাদি প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রে ঐ পাঠা উত্থিত করিয়া পরবর্ত্তী মন্ত্রত্রয় তাহাতে পাঠপূর্ব্বক ছেদন করিয়া স্বামীর অগোচরে 'অহমস্মি সহমানা' এই চতুর্থমন্ত্রে স্বহস্তে বন্ধন করিবে এবং শেষে 'উপ তেঽধাম্' এই পঞ্চম মন্ত্রে স্বামীকে আলিঙ্গন করিবে। * ইহা করিলে স্বামী বশীভূত হয়, † ও সপত্নীগণকে বাধা প্রদান করা যায়। ‡

এইরূপ "উদসৌ সূর্য্যোঽগাৎ" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূক্তদ্বারা সর্ব্বদা সূর্য্যোপস্থান করিলে সপত্নীবাধনকামনা পূর্ণ হয়। §

অথর্ব্ববেদের কৌশিকসূত্রে উদাহৃত প্রথমসূক্তের পঞ্চম ভিন্ন অপর মন্ত্রগুলির সপত্নীজয়কর্ম্মেই বিনিয়োগ উক্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহার প্রকার আপস্তম্ব হইতে বিভিন্ন। কৌশিকসূত্রকার বলেন—'ইমাং খনামি' ইত্যাদি প্রথমমন্ত্রে বাণাপর্ণী-(নীলঝিণ্টী ?)-পত্রের চূর্ণ দধির জল দিয়া লোহিতবর্ণের অজানামক ॥ মহৌষধির সহিত মিশ্রিত করিয়া সপত্নীর শয্যায় ছড়াইয়া দিতে হইবে; ষষ্ঠমন্ত্রের দ্বিতীয়পাদ ('উপ তেঽধাং' ইত্যাদি অথর্ব্বসংহিতাধৃত পাঠ) উচ্চারণপূর্ব্বক বাণাপর্ণীর পাতা সপত্নীর শয্যার নীচে এবং ঐ মন্ত্রের অপরাংশ পাঠ করিয়া ঐ পাতা শয্যার উপরে দিতে হইবে। ¶

কৌশিকসূত্রকার পঞ্চমমন্ত্রের ('অহমস্মি' ইত্যাদি) বিবাদজয়কার্য্যে বিনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঈশানদিক্ দিয়া সভায় গমন করিলে বিবাদে (মোকদ্দমায়) জয়লাভ করা যায়।**

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

* "যোক্ত্রেণ উত্তরয়োত্থাপ্যোত্তরাভিস্তিসৃভিরভিমন্ত্র্যোত্তরয়া প্রতিচ্ছন্নাং হস্তয়োরাবধ্য শয্যাকালে বাহুভ্যাং ভর্ত্তারং পরিগৃহ্নীয়াদুপধানলিঙ্গয়া।"

আপস্তম্বগৃহ্যসূত্র, ৯।৬

† "বশ্যো ভবতি"। ঐ, ৯।৭

‡ "সপত্নীবাধনঞ্চ।" ৯।৮

§ "এতেনৈবংকামেনোত্তরেণানুবাকেন সদাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।" ঐ ৯।৯

॥ অজা মহৌষধী জ্ঞেয়া শঙ্খকুন্দেন্দুপাণ্ডুরা।" সুশ্রুত।

¶ ইমাং খনামীতি বাণাপর্ণীং লোহিতাজায়া দধ্নেন সংনীয় শয়নম্ অনুপরিকিরতি। কৌশিকসূত্র, ৪।১২; অথর্ব্ববেদসংহিতা, ৩।১৮।১ সূক্তের সায়ণভাষ্য দ্রষ্টব্য।

** "অহমস্মীত্যপরাজিতাৎ পরিষদম্ আব্রজতি।" কৌশিকসূত্র, ৫।২

বঙ্গদর্শন।

ক্লাইব-কীর্ত্তিস্তম্ভ।*

এখন আর সে দিন নাই। যে দিন ইংরাজ-বণিক্ বাঙালীর বস্ত্রাঞ্চলের আশ্রয় প্রাপ্ত না হইলে, বঙ্গোপসাগরের অতল সলিলে জীর্ণ কঙ্কাল বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইতেন, সে দিনের সকল কথাই এখন উপন্যাসের ন্যায় বিস্ময়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। সময় পাইয়া ইতিহাসলেখকগণ আপন-আপন পক্ষসমর্থনের জন্য কত অলীক সিদ্ধান্তে গ্রন্থকলেবর বর্দ্ধিত করিবার অবসর লাভ করিয়াছেন (সিরাজ-দ্দৌলার "ঐতিহাসিকচিত্রে"), যথাস্থানে তাহার কিছু-কিছু পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। লিখিত ইতিহাস জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত হইতে পারে না। তাহা কেবল বিদ্বৎসমাজেই পুস্তকালয়ের শোভাসংবর্দ্ধন করে। স্মৃতিচিহ্ন বা প্রস্তরমূর্ত্তি সেরূপ নহে। তাহা দৃঢ়কলেবরে লোকলোচনের সম্মুখীন হইয়া, নীরবে কত কীর্ত্তি বিঘোষিত করিয়া থাকে। এইরূপে ইংরাজরাজধানী কলিকাতামহানগরী অনেক স্মৃতিচিহ্নে সুশোভিত হইয়াছে। নিরক্ষর নাগরিক এবং কৌতূহলপরায়ণ অশিক্ষিত পথিক তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হয়;—বৃটিশবীরত্বের অলৌকিক মোহে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়ে। বোধ হয়, সেই উদ্দেশ্যেই ভারতরাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন্ ভারতবর্ষের বিবিধ স্থানে স্মৃতিচিহ্নসংস্থাপনের জন্য নিরতিশয় আগ্রহপ্রকাশ করিতেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াও, সে আগ্রহ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই,—সম্প্রতি ক্লাইবের প্রস্তরমূর্ত্তিসংস্থাপনার্থ অর্থসংগ্রহে ব্যাপৃত হইয়াছেন।

কি ভারতবর্ষে, কি বৃটিশসাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল রাজধানী লণ্ডননগরে, কোন স্থলেই ক্লাইবের প্রস্তরমূর্ত্তি বা স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। সিরাজদ্দৌলার ঐতিহাসিক চিত্রে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া একটি তর্কের অবতারণা করা হইয়াছে। তর্কটি এই—"যে মহাজাতি আত্মগৌরবকাহিনীতে সভ্যজগৎ প্রতিশব্দিত করিয়া স্বদেশের রাজপথপার্শ্বে বৃটিশবীরকেশরী নেল্‌সন্-ওয়েলিংটনের জয়স্তম্ভ গঠিত করিয়াছে, তাহারা ক্লাইবের জন্য

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সিরাজদ্দৌলার তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। এই প্রবন্ধ উহার পরিশিষ্ট হইতে লেখকমহাশয়ের অভিপ্রায়মত বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত হইল। সম্পাদক।

এখনও জাতীয় কীর্ত্তিমন্দিরে পাদপীঠ রচনা করে নাই!"

ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসেরও প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু লর্ড ক্লাইবের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভারত-প্রবাসী ইংরাজদিগের মুখপাত্র কোন কোন সংবাদপত্র মধ্যে মধ্যে আর্ত্তনাদ করিতেন। এখন ক্লাইবের প্রস্তরমূর্ত্তিসংস্থাপনের প্রস্তাবে তাঁহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। এই প্রস্তরমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইলে ক্লাইবের স্মৃতি সমাদর প্রাপ্ত হইবে কি না, তাহাতে কিন্তু সংশয়ের অভাব নাই। ক্লাইবের যাহাই হউক, ইহাতে আধুনিক ইংরাজসমাজের যে নিন্দা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইংরাজ খৃষ্টধর্ম্মানুরক্ত। আধুনিক ইংরাজের খৃষ্টধর্ম্মানুরাগ প্রবল থাকিলে, আত্মহত্যাকারীর প্রস্তরমূর্ত্তিসংস্থাপনের প্রস্তাব আদৌ উত্থাপিত হইতে পারিত না। আত্মহত্যাকারীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নাই;—খৃষ্টিয়ান্‌সমাজ তাহাকে কোনরূপ সমাদরপ্রদর্শন করিতে সম্মত হইতে পারেন না। ক্লাইবের মৃত্যুকালে তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ স্পষ্টই বলিয়া উঠিয়াছিলেন,—এত পাপের এইরূপ পরিণামই স্বাভাবিক!

কোন কোন বিষয়ে সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের উক্তি এবং আচরণ ইতিহাসের সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। ক্লাইবের সমসাময়িক ব্যক্তিগণ তাঁহাকে কিরূপ চরিত্রের লোক বলিয়া জানিতেন? ভারতবর্ষের লোকে কে কি বলিত, তাহার আলোচনা না করিলেও ক্ষতি নাই। ইংলণ্ডের নরনারী কি বলিত, তাহার আলোচনা আবশ্যক।

তাহারা ক্লাইবের চরিত্রকে আদৌ ইংরাজচরিত্র বলিয়া স্বীকার করিতেই সম্মত হইত না। তাহারা লর্ড ক্লাইবকে অবজ্ঞাচ্ছলে "নবাব ক্লাইব" বলিত; এবং প্রকাশ্যে বা আকারে-ইঙ্গিতে ঘৃণাপ্রকাশেও ত্রুটি করিত না। ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ক্লাইব কিরূপ সামাজিক অবজ্ঞার পাত্র হইয়াছিলেন, মেকলে তাহার আভাস প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রচুর কারণ বর্ত্তমান ছিল।

অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ক্লাইব ইংলণ্ডে বাস করিয়াছিলেন। এই কালের মধ্যে শৈশব ছাড়িয়া দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা শিক্ষাকাল। সেই অত্যল্প শিক্ষাকাল কিরূপভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার পরিচয়ের অভাব নাই। তিনি যখন ভারতবর্ষে প্রেরিত হন, তৎকালে চরিত্রবলের জন্য খ্যাতিলাভ করেন নাই। বরং কুচরিত্র বলিয়াই আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে দেশবহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন;—"হয় ধনসঞ্চয় করুক, না হয় মাদ্রাজের ম্যালেরিয়াজ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হউক,"—ইহাই ক্লাইবের আত্মীয়বর্গের অভিমত বলিয়া সুপরিচিত। সেই অশান্ত-বালক যাহা-কিছু করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতার ফল। ভারতবর্ষে আসিয়া ক্লাইব তৎকালপ্রচলিত সকলপ্রকার দুষ্কার্য্যেই অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার স্বদেশবাসিগণ আদর্শ ইংরাজ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই; বরং ইংরাজকুলকলঙ্ক বলিয়াই ঘৃণাপ্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

এই অশান্ত ইংরাজবালক যে একদিন বিপুল সাম্রাজ্যসঞ্চয়ে বৃটিশজাতির অন্নজলের সুব্যবস্থা করিয়া দিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহার জন্যও সমসাময়িক ইংরাজগণ ক্লাইবের প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে সম্মত হন নাই। তাঁহার কৃতকার্য্যের বিচারের জন্য মহাসভা একটি অনুসন্ধানসমিতি গঠিত করিয়াছিলেন। সেই অনুসন্ধানসমিতির সদস্যগণ ক্লাইবের সকল কার্য্যের মূলানুসন্ধান করিয়া, তাঁহাকে অপরাধীর ন্যায় বিচারালয়ে সমর্পণ করিবার জন্য মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাসভায় যখন সেই মন্তব্য আলোচিত হয়, তখন কেহই তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। ক্লাইব সাম্রাজ্যসঞ্চয় করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার কুকীর্ত্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াও, মহাসভা তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। মহাসভা এইরূপে ক্ষমাপ্রদর্শন করায়, ফরাসিদিগের নিকট বিশেষ বিদ্রূপ লাভ করিয়াছিলেন। ক্ষমা করা বৃটিশমহাসভার উপযুক্ত হয় নাই বলিয়া ফরাসিরা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এরূপ কটূক্তি করিতে পারেন। ক্লাইবের ন্যায় ডুপ্লে (Duplex) ভারতবর্ষে ফরাসিরাজ্য বিস্তৃত করিতে ব্যস্ত ছিলেন। ফরাসিরা ডুপ্লের দুষ্কার্য্যের বিচার করিয়া জঞ্জাল করেন; তাঁহারা সাম্রাজ্যলাভ করিয়াছেন বলিয়া, ডুপ্লের অপরাধ ক্ষমা করিতে সম্মত হন নাই!

সে দিনের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলে, ইংরাজ এবং ফরাসি, এই দুই খৃষ্টিয়ান্ মহাজাতির ধর্ম্মনীতির পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া, ইতিহাস ইংরাজজাতিকে ধিক্কার করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। দস্যুর নিকট উৎকোচগ্রহণ করিয়া তাহার অপরাধ ক্ষমা করিলে, ধর্ম্মাধিকরণের নাম গৌরবযুক্ত হয় না। ভারতসাম্রাজ্যরূপ উৎকোচ লাভ করিয়া, ক্লাইবের অপরাধের প্রমাণ পাইয়াও ক্ষমাপ্রদর্শন করায়, ইংলণ্ডের মহাসভার ন্যায় মহাধর্ম্মাধিকরণ গৌরবলাভ করে নাই। এরূপ নির্লজ্জ বিচারে কোন জাতিই গৌরবলাভ করিতে পারে না।

ক্লাইবের কথা ইংরাজ-ইতিহাসলেখকদিগের নিরতিশয় লজ্জার কথা। চরিতাখ্যায়কগণ যাহাই বলুন না কেন, ইংরাজ-ইতিহাসলেখকগণ সকলেই একবাক্যে লজ্জাপ্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কাহাকে ছাড়িয়া কাহার কথা বলিব? সকলের কথাই এক কথা। তাহা ইংরাজের কলঙ্কের কথা,—সমগ্র মানবসমাজের কলঙ্কের কথা! ক্লাইবের প্রস্তরমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইলে, সকল কথাই আবার জনসমাজে আলোচিত হইবার সূত্রপাত হইবে। ইতিমধ্যেই তাহার সূচনা হইয়াছে।

ক্লাইব যে বীরকীর্ত্তির জন্য ইংরাজের ইতিহাসে "স্বর্গজাত সেনাপতি" নামে পরিচিত, সে বীরকীর্ত্তিও সমালোচনা সহ্য করিতে অসমর্থ। মুসলমানগণ তাঁহাকে "সাবুদজঙ্গ" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাই বরং প্রকৃত উপাধি বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। তাঁহার "জঙ্গ" প্রতাপ "সাবুদ" প্রমাণীকৃত হইয়াছিল; লোকে তাহাতে ভীত হইয়াছিল; তজ্জন্য সকলেই তাঁহাকে মানিয়া চলিত—ভক্তি করিত না! শার্দ্দূল "সাবুদজঙ্গ",—তাহাকে কে না ভয় করিয়া থাকে? ক্লাইবের বীরত্ব অপেক্ষা তাঁহার কুটিল কৌশলই তাঁহাকে "সাবুদজঙ্গ" করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার সম-

সাময়িক ইংরাজ-বাঙালি যাহাতে ইতস্তত করিত, তিনি তাহার কিছুতেই ইতস্তত করেন নাই। নচেৎ কেবল বীরকীর্ত্তির সমালোচনায় বঙ্গদেশে ক্লাইব প্রশংসালাভ করিতে পারেন নাই।

চরিতাখ্যায়কগণ চাটুকারের ন্যায় লিখিয়া গিয়াছেন,—মাদ্রাজের ইংরাজদরবার যখন ম্যানিংহামের নিকট কলিকাতা-আক্রমণ ও ড্রেক্‌সাহেবের পলায়নের সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, তখন—আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই—স্থির হইয়া গেল যে, কলিকাতার উদ্ধারসাধনের জন্য ক্লাইব স্থলসৈন্যের সেনাপতি হইবেন।*

বলা বাহুল্য, চরিতাখ্যায়কের এই উক্তি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া পরিচিত হইতে পারে নাই। কলিকাতার সংবাদ পাইয়া কর্ত্তব্য-নির্ণয় করিতে মাদ্রাজের ইংরাজ-দরবারকে তিন মাস কেবল বাদানুবাদে কালক্ষয় করিতে হইয়াছিল। অবশেষে যখন সেনাপ্রেরণ করা স্থির হয়, তখনও সদস্যগণ অনন্যোপায় হইয়াই ক্লাইবকে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মাদ্রাজের গবর্ণর পিগট্‌সাহেব যুদ্ধব্যাপারে অনভিজ্ঞ;—জ্যেষ্ঠ সেনাপতি অল্‌ডারক্রন্‌ বাংলাদেশের সম্বন্ধে অনুপযুক্ত,—লরেন্স অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত হইয়াও হাঁপানীরোগে জীর্ণশীর্ণ; অগত্যা ক্লাইব নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

আদেশপালন করা সেনা ও সেনাপতিগণের প্রধান ধর্ম্ম। ক্লাইব শান্তিসংস্থাপনের আদেশ লইয়া বঙ্গদেশে উপনীত হইয়া জানিতে পারিলেন,—সন্ধি হয় হয়,—যুদ্ধের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। পল্‌তার পলায়িত ইংরাজগণ তাঁহাকে সে কথা পুনঃপুন জানাইয়াছিলেন; এবং রসদ ও গোলাবারুদের গাড়ি-বলদ দিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। তথাপি ক্লাইব যুদ্ধযাত্রা করিয়া আদেশলঙ্ঘন করিয়াছিলেন। কেন করিয়াছিলেন,—তাহার কৈফিয়ৎ নাই!

বজ্‌বজের ক্ষুদ্র দুর্গের সম্মুখে আসিয়া,—আটক্রোশের পর্য্যটনপরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হইয়া,—প্রহরী পর্য্যন্ত না রাখিয়া,—ক্লাইব সসৈন্যে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলেন। মাণিকচাঁদ ইচ্ছা করিলে, সকলকেই নিহত করিতে পারিতেন। ইহা অসীম সাহসের কথা নহে;—হঠকারিতারও কথা নহে;—ইহা কেবল অনভিজ্ঞতার কথা। ইহার জন্য ইতিহাস-লেখকগণ ক্লাইবকে ভর্ৎসনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। বজ্‌বজের যুদ্ধ—কলিকাতার যুদ্ধ—কলিকাতার পুনরুদ্ধার—হুগলীর লুণ্ঠন-ব্যাপার—যুদ্ধ বলিয়া ইতিহাসে স্থানলাভের অযোগ্য। প্রত্যেক স্থানেই এক কথা,—বিশ্বাসঘাতকদিগের সহায়তা এবং ইংরাজসেনার অভীষ্টলাভ।

সিরাজদ্দৌলা যখন দ্বিতীয়বার কলিকাতা আক্রমণ করেন, তখন ক্লাইব এক নিশারণে সেনাচালন করিয়াছিলেন। সে যুদ্ধে ক্লাইব প্রতিপদে পরাভূত হইয়া, আলিনগরের সন্ধি-সংস্থাপনে লজ্জারক্ষা করেন। তাহার জন্য ইংরাজমাত্রেই তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। ক্লাইব নিজেও তাহাকে গৌরবের কথা বলিয়া

* Within forty-eight hours after the arrival of the intelligence it was determined that an expedition should be sent to the Hughley, and that Clive should be at the head of the land-forces.—*Macaulay's Lord Clive.*

ব্যক্ত করিতে পারেন নাই ;—কোম্পানীর মঙ্গলের জন্য অকীর্ত্তিকর কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

ইহার পর যে যুদ্ধ, তাহাই একমাত্র যুদ্ধ। তাহার নাম "চন্দননগরের যুদ্ধ"। তাহাতে ওয়াট্‌সনের নৌসেনাদলই বিশেষ শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দান করে। কিন্তু সে যুদ্ধেও বিশ্বাসঘাতকের সহায়তালাভ না করিলে, জয়লাভের আশা ছিল না। ফরাসিদিগের পৃষ্ঠরক্ষার জন্য সিরাজদ্দৌলার বিশেষ আদেশে সেনাপতি নন্দকুমার সসৈন্যে চন্দননগরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উৎকোচ লইয়া স্থানত্যাগ না করিলে, ইংরাজসেনার জয়লাভের উপায় ছিল না। নন্দকুমারে বিশ্বাসঘাতকতা করিবার পরেও ইংরাজ জয়লাভ করিতে পারেন নাই। তাহার পর টেরানুনামক ফরাসিসৈনিক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। সুতরাং "চন্দননগরের যুদ্ধে" বীরকীর্ত্তির পরিচয় কত অল্প, তাহা কাহারও বুঝিয়া লইতে ইতস্তত হয় না।

পলাশীর যুদ্ধের কথা উল্লিখিত না হইলেই ভাল হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে কাটোয়ার শিবিরে—মন্ত্রণাসভায়—গঙ্গাতীরে—ক্লাইব কেবল সমরভীতিরই পরিচয়প্রদান করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময়ে পলাশিক্ষেত্রে—উমিচাঁদের সহিত বাক্যালাপে,—সেনাদলকে লুকাইয়া থাকিবার আদেশপ্রদানে,—স্বয়ং মৃগয়ামঞ্চের মধ্যে আশ্রয়গ্রহণে,—সেনাপতি কুটের সহিত তর্কবিতর্কে—কেবল সমরভীতিই প্রকাশিত হইয়াছিল। ক্লাইবকে বীর বলিয়া সমাদর করিতে হইলে, বীরত্বের মর্য্যাদা বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে! সমসাময়িক ইংরাজেরা তাঁহাকে বীরের সম্মান প্রদান করেন নাই। পরবর্ত্তী ইতিহাসলেখকগণ তাঁহাকে বীর সাজাইতে গিয়া তর্কবিতর্কে বিপর্য্যস্ত হইয়াছেন। সেকালে যাঁহারা কেরাণীগিরি বা গোমস্তাগিরির উমেদার হইয়া মাদ্রাজে আসিতেন, ক্লাইব তাঁহাদেরই একজন। আবশ্যক হইলে, এই সকল অশিক্ষিত গোমস্তা ও মুহুরিদিগকেও যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত হইতে হইত। ক্লাইব তাহার অধিক কিছুই করেন নাই। পরিণামফল সমুজ্জ্বল বলিয়া, ইতিহাসে বীর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন! ফল অন্যরূপ হইলে, ক্লাইবের কলঙ্কে ইংরাজের ইতিহাস পূর্ণ হইয়া উঠিত।

সাম্রাজ্যসংস্থাপনকার্য্যই ক্লাইবের উল্লেখযোগ্য কার্য্য। তিনি যে মোগলের হস্তচ্যুত ভারতসাম্রাজ্য কুড়াইয়া লইবার জন্য উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত উপায়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যখন জাল না করিলে চলে না, তখন অম্লানচিত্তে জাল করিয়াছেন;—যখন জুয়াচুরি না করিলে চলে না, তখন অবলীলাক্রমে তাহাতে অগ্রসর হইয়াছেন ;—নচেৎ সাম্রাজ্যসংস্থাপন অসম্ভব হইত! ইহার জন্য ইংরাজজাতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করিয়া জালজুয়াচুরির প্রশ্রয় দিতে পারেন না। ইহাকে উৎকোচরূপে গ্রহণ করিয়া ক্লাইবের সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন। সমসাময়িক ইংরাজগণ তাহাই করিয়া গিয়াছেন। ক্ষমা এক কথা, বীরপূজা অন্য কথা। সেইজন্য সেকালের তাঁহারা স্মৃতিচিহ্নের বা প্রস্তরমূর্ত্তির কথা চিন্তা করিতে পারেন নাই।

ক্লাইবের প্রস্তরমূর্ত্তিসংস্থাপনের একমাত্র সার্থকতা স্বীকৃত হইতে পারে। এক দলের সঙ্গে আত্মীয়তার ভাণ করিয়া অপর দলকে পরাভূত করিবার যে ভেদনীতি বৃটিশ-অধিকৃত

ভারতসাম্রাজ্যসংস্থাপনের মূলনীতি, ক্লাইব তাহার পথপ্রদর্শক। তিনি সে কথা অনেকবার বলিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে ক্লাইব প্রথম পথপ্রদর্শক না হইলেও বিশেষ বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া প্রশংসালাভের দাবি করিতে পারেন। প্রথম পথপ্রদর্শক ভাস্কো-ডা-গামা। তিনি কোচিনরাজের পক্ষ ধরিয়া কালিকটের সর্ব্বনাশসাধনের চেষ্টা করেন। পরবর্ত্তী ইউরোপীয়গণ সকলেই গামার প্রাচ্যনীতির উপাসক। ক্লাইবও সেই নীতির অনুসরণে সাম্রাজ্যসংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইংরাজদিগের মধ্যে এ বিষয়ে ক্লাইবকেই পথপ্রদর্শক বলিতে হয়। এই নীতি যতদিন ভারতসাম্রাজ্যশাসনের মূলনীতি বলিয়া অনুসৃত হইবে, ততদিন ইহার পথপ্রদর্শক বলিয়া ক্লাইব প্রস্তরমূর্ত্তির দাবি করিতে পারেন।

যে সকল রাজপ্রতিনিধি ক্লাইবের প্রদর্শিত পুরাতন পথে ভারতশাসন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রস্তরমূর্ত্তিতে ভারতরাজধানীর নাগরিকশোভা সংবর্দ্ধিত করিতেছেন। লর্ড রিপন্ তাহা করেন নাই বলিয়া, প্রস্তরমূর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। শিষ্যগণ যাহা লাভ করিয়াছেন, ক্লাইব তাহা পাইবার জন্য দাবি করিলে, অসঙ্গত হয় না। ক্লাইবের পক্ষে লর্ড কর্জ্জন্ সেই দাবি উত্থাপিত করায়, তাহা সর্ব্বাংশেই সুসঙ্গত হইয়াছে। সত্যই ত সুসঙ্গত কথা,—সকলেরই আছে,—লর্ড কর্জ্জনেরও হইতেছে;—ক্লাইবের হইবে না কেন?

ভারতবর্ষের কথা স্বতন্ত্র। এখানে সমস্তই শোভা পায়। এখানে ইতিহাসের মর্য্যাদারক্ষার জন্য আগ্রহ নাই,—সত্যের সম্মানরক্ষার জন্য ব্যাকুলতা নাই,—রাজভক্তি আকর্ষণ করিবার সরল স্বাভাবিক উদারনীতির প্রাধান্য নাই,—এখানে সমস্তই শোভা পায়। কেবল তাহাই নয়;—এখানে এই সকল বিষয়ে অর্থভিক্ষা করিলে, ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হইতে বিলম্ব ঘটে না। হেষ্টিংস্ মহারাজ নন্দকুমারকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ইংরাজের ন্যায়নিষ্ঠা তাহা সহ্য করিতে পারে নাই;—হেষ্টিংস্‌কে অভিযুক্ত করিয়া, সাধারণ অপরাধীর ন্যায় ধর্ম্মাধিকরণের সম্মুখীন করিয়াছিল। কিন্তু সেই হেষ্টিংসের পক্ষসমর্থন করার যখন প্রয়োজন হইয়া উঠিল, তখন নন্দকুমারের বংশধরই হেষ্টিংসের প্রশংসাপত্রে নিজনাম স্বহস্তে লিখিয়া দিয়া হেষ্টিংসের পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন! সুতরাং ক্লাইবের প্রস্তরমূর্ত্তিসংস্থাপনের জন্য চাঁদা চাহিলে, ভারতবর্ষে চাঁদাদাতার অভাব হইবে না। যাঁহারা চাঁদা দিবেন, তাঁহাদের নাম লোকসমাজে অপরিজ্ঞাত নাই।

ভারতবর্ষের কথা যাহাই হউক, ইংলণ্ডের কথা স্বতন্ত্র। সেখানে এখনও ন্যায়ের মর্য্যাদা বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতপ্রত্যাগত "অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্" ভিন্ন ইংলণ্ডের জনসাধারণ অর্থদান করিতে সম্মত হইবে না। আর এতকাল পরে, ইংলণ্ডে ক্লাইবের এক প্রস্তরমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইলেই বা ক্ষতি কি? লোকে তাহার উদ্দেশ্য লইয়া চিরদিনই তর্কবিতর্ক করিবে,—চিরদিনই বিলুপ্তপ্রায় পুরাতন কলঙ্ককথা নবীনতালাভ করিবে।

এখন ভারতবর্ষেও ইংলণ্ডের পুরাতন বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। এখন উদারনীতির নূতন বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রয়োজন। এখন আর তরবারি দেখাইয়া ভক্তি-আকর্ষণের

সম্ভাবনা নাই। এখন সকলেই বুঝিয়াছে—যে তরবারি ভারতজয় করিয়া ভারতশাসন করিতেছে, সে তরবারি আমাদিগেরই তরবারি,—আমাদিগের হিন্দুমুসলমান সিপাহী-সেনার হৃদয়শোণিতে তাহার অভিষেকক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। এখন ক্লাইবের প্রস্তরমূর্ত্তি থাকিলেও, তাহা উপহাসের সামগ্রী হইত; নূতন করিয়া সংস্থাপন করিতে বসিলে, হয় ত উপহাসের সঙ্গে প্রতিহিংসাও সংযুক্ত হইতে পারে!

মোগলের বীরবাহু যে বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহার ধ্বংসদশায় ক্লাইব ভারতবর্ষে আসিয়া চারিদিকে কেবল ধ্বংসলীলারই অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি যে ক্ষেত্রে, যে সময়ে, যে সহবাসে, যে আদর্শে জীবনযাপন করেন, তাহা প্রশংসালাভ করিতে পারে নাই। সাম্রাজ্যসংস্থাপনে ক্লাইব অপেক্ষা ভারতবাসীর সংস্রব অধিক। তাহারা ইহার জন্য কি না করিয়াছে, অদ্যাপি কি না করিতেছে? ইংলণ্ড কিরূপে ভারত-সাম্রাজ্য করতলগত করে, ভারতবর্ষ কিরূপে ইংলণ্ডের কণ্ঠলগ্ন হয়, তাহার আলোচনায় কালক্ষয় না করিয়া, কিরূপে সে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে, তাহারই আলোচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে যে নবশক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, তাহা দেশশক্তি। তাহাকে প্রকৃতপথে পরিচালিত করিতে হইলে, সেকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া, একালের কর্ত্তব্য লইয়াই কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ এখন যেই পথে দণ্ডায়মান,—তাহা অতীতের চির-পরিচিত পথ নহে,—ভবিষ্যতের অজ্ঞাতপূর্ব্ব পথ। এ সময়ে ক্লাইবের প্রস্তরমূর্ত্তি খাড়া করিয়া, লোকচিত্ত বিমুগ্ধ করিবার আশা নাই। বরং তাহাতে বিদ্বেষানলই প্রধূমিত হইতে পারে!

ভারতশাসনের মূলনীতি কি, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই নিঃসংশয়ে নির্ণয় করিতে পারেন নাই;—কারণ, কাগজপত্রের সঙ্গে কার্য্যপদ্ধতির সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। মূলনীতি কি হইবে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিবার সময় আসিতেছে। এরূপ যুগসন্ধিকালে ক্লাইবের প্রস্তরমূর্ত্তি সংস্থাপিত করিলে, প্রকারান্তরে সেই পুরাতন নীতিই ঘোষিত করা হইবে। তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত অকীর্ত্তিকর অনুদার নীতি। সাম্রাজ্যসংস্থাপনের দিনে তাহার প্রয়োজন ও সার্থকতা থাকিলেও, সাম্রাজ্যসংরক্ষণের দিনে তাহার প্রয়োজন ও সার্থকতা থাকা স্বীকার করা যায় না। সুতরাং ক্লাইবের প্রস্তরমূর্ত্তি বর্ত্তমানযুগের অনুকূল হইতে পারে না।

যদি কেবল ইতিহাসানুরাগের নিদর্শন বলিয়াই ক্লাইবের প্রস্তরমূর্ত্তি সংস্থাপিত করিতে হয়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকের প্রস্তরমূর্ত্তির সংস্থাপনা করিতে হইবে। সে হিসাবে ক্লাইব অপেক্ষা মীরজাফরের দাবী অধিক হইয়া পড়ে! মীরজাফর না থাকিলে, ক্লাইব ক্লাইব হইতেন না, তাঁহার নাম ইতিহাসে সুপরিচিত হইবারও অবসরলাভ করিত না।

ইংরাজদিগের ভারতবর্ষের সহিত প্রথম সংস্রব কেবল বাণিজ্যসংস্রব বলিয়াই পরিচিত ছিল। ইংরাজবণিক্‌সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষগণ বাণিজ্যরক্ষার্থ সেনাদল প্রেরণ করিতেন, কিন্তু সর্ব্বপ্রযত্নে যুদ্ধকলহ পরিহার করিবার

জন্যই পুনঃপুন উপদেশপ্রদান করিতেন। দুর্গনির্ম্মাণে, সেনাদলসংগঠনে, অথবা কলহবর্দ্ধনে তাঁহাদের অনুরাগ লক্ষিত হইত না। রাজ্যবিস্তারে তাঁহাদিগের বিভীষিকাই লক্ষিত হইত। তাঁহাদিগের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া ক্লাইব যে রাষ্ট্রবিপ্লবে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার কৈফিয়ৎ দিবার সময়ে ক্লাইবকেও বাণিজ্যরক্ষার কথা বলিয়াই আত্মকার্য্যের সমর্থন করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা ক্লাইবের নিকট সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিণামে যথেষ্ট উপকার লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই ক্লাইবের প্রস্তরমূর্ত্তিসংস্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। এতকাল পরে ইহার আয়োজন হইতেছে কেন,—ভারতবর্ষের লোকে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য স্বভাবতই কৌতূহলপ্রকাশ করিতে পারে। লর্ড কর্জ্জন্ তাহাদিগকে কিরূপ প্রত্যুত্তর দিতে পারিবেন? সত্য কথা বলিতে হইলে, কি বলিয়া অস্মপক্ষের সমর্থন করিবেন? মিথ্যা বলিলে, ইংরাজচরিত্র কলঙ্কিত হইবে। সত্য বলিলেও, ইংরাজের উদারনীতি প্রশংসালাভ করিবে না। এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইবার প্রয়োজন কি?

প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষকে বিজিতদেশ বলিতে না পারিলে, তাহাকে বিজিতদেশের ন্যায় যথেচ্ছ শাসন করা চলে না;—তাহাকেও বৃটিশসাম্রাজ্যভুক্ত অন্যান্য দেশের ন্যায় স্বাধীনতা প্রদান করিতে হয়। সুতরাং ভারতবর্ষকে বিজিতদেশ বলিয়া প্রতিপন্ন না করিলে, ভারতশাসননীতির সমর্থন করা যায় না। তজ্জন্য বিজিতদেশ বলিলেই চলে না, কে ভারতবিজেতা, তাহাও দেখাইয়া দিতে হয়। ক্লাইবকে জনসমাজের সম্মুখে সেই বিজেতার মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রস্তরমূর্ত্তির প্রয়োজন। কিন্তু ক্লাইব কি ভারতবিজেতা?—পলাশী কি বিজয়ক্ষেত্র?—বাঙালী কি রণপরাজিত?—এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, ইতিহাসলেখকগণকে গল্পদ্ধর্ম্ম হইতে হইবে। ক্লাইব বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সত্য কথা। কিন্তু ইহাও সত্য কথা,—সে বিজয় লেখনীবলেই সাধিত হইয়াছিল,—তাহার বিজয়ক্ষেত্র পলাশী নহে,—মীরজাফর খাঁ বাহাদুরের উচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত অন্তঃপুর! সেখানে ক্লাইবের প্রতিনিধি ওয়াট্‌স্‌সাহেব শিবিকারোহণে অবগুণ্ঠনবতী বেগমের ন্যায় গোপনে প্রবেশলাভ করিয়া, গুপ্তসন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত করিয়া আনিয়াছিলেন! সেই সন্ধিপত্র এইরূপে স্বাক্ষরিত হইয়াও ফলদান করিতে পারিত না;—উমিচাঁদ প্রতারিত না হইলে, সকল কথাই প্রকাশিত হইয়া পড়িত। তাহার জন্য আর একখানি জালসন্ধিপত্রের অবতারণা করিতে হইয়াছিল। সেই জালসন্ধিপত্রই বঙ্গবিজেতা কর্ণেল্ ক্লাইবের প্রকৃত ব্রহ্মাস্ত্র। বঙ্গবিজয়ের স্মৃতিস্তম্ভ সংস্থাপিত করিতে হইলে, সেই স্তম্ভগাত্রে জালসন্ধিপত্রখানিও খোদিত করাইয়া রাখিতে হয়। ইংরাজেরা এই সকল কারণেই এতকাল ক্লাইবের কীর্ত্তিস্তম্ভসংস্থাপনের আয়োজন করেন নাই। এখন সেই আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলে, কেহই ইংরাজের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে পারিবে না।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

বারাণসী-অভিমুখে।

৫

চিতাসজ্জা।

শীতকাল; গঙ্গার উপর; ধূসরবর্ণ সন্ধ্যা আগতপ্রায়। দিবাবসানে পবিত্র নদীবক্ষ হইতে কুয়াসা উত্থিত হইয়া, সন্ধ্যা না হইতে হইতেই অস্তমান সূর্য্যকে ম্লান করিয়া ফেলিল। অবনত মন্দির ও চূর্ণপ্রাসাদসমন্বিত বারাণসীর বিপুল ছায়াচিত্র পশ্চিমদিকের সম্মুখে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমগগন এখনো প্রভাময়।

আর-সব নৌকা নিদ্রিত; কেবল আমার নৌকাখানি চলিতেছে,—এই পবিত্র নগরীর পাদদেশ দিয়া, উহার বিরাট্ ছায়াতল দিয়া, অত্যুচ্চ ভগ্নমন্দির ও অতীব ঘোরদর্শন প্রাসাদাদির নীচে দিয়া—ধীরে ধীরে চলিতেছে।

তিনবৎসরব্যাপী যে অনাবৃষ্টি দেশে দুর্ভিক্ষ আনিয়াছে, তাহাতেই নদী শুকাইয়া গিয়াছে; এবং এই কারণেই সকল জিনিষেরই উচ্চতা যেন আরো বেশী বলিয়া মনে হইতেছে। এই শুষ্কতাবশতই বারাণসীর অনাদিকালের মূলগুলা পর্য্যন্ত, ভিত্তিগুলা পর্য্যন্ত অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। শতশত বৎসর হইতে, যে সকল প্রাসাদ জলের নীচে নামিয়া গিয়াছিল, তাহারই খণ্ডাংশসমূহ অচল নৌকাগুলার মধ্য হইতে ইতস্তত মাথা বাহির করিয়া রহিয়াছে। জলমগ্ন জনবিস্মৃত ভগ্নাবশেষগুলা আবার দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৃদ্ধা গঙ্গার ভগ্নাবশেষপূর্ণ রহস্যময় তলদেশ অল্প-অল্প দেখা যাইতেছে।

এই যে সব তটভূমি বিবস্ত্রা হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতেই এই গঙ্গাদেবীর বিকট স্বৈরলীলার পরিচয় পাওয়া যায়; ইনি পালনকর্ত্রী ও সংহারকর্ত্রী—উভয়ই। যিনি জনয়িতা ও সংহারকর্ত্তা, সেই শিবের সহিত ইঁহার তুলনা হইতে পারে; প্রাবৃটে যখন নদী ভরিয়া উঠে, তখন তাঁহার ভীষণ বেগ কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে না। সুর্ব্বোন্নত পাষাণপ্রাচীর, সমগ্র প্রাকারবপ্রাদি একটা অখণ্ড প্রস্তরখণ্ডের মত নদীর উচ্চতটের উপর গড়াইয়া পড়িয়াছে এবং পড়িয়া সেইখানেই থাকিয়া গিয়াছে; কোন জাগতিক প্রলয়বিপ্লবের পর যেভাবে ঝুঁকিয়া থাকে, সেইরূপ অচল ভঙ্গীসহকারে বিস্ময়স্তম্ভিত হইয়া যেন আপনার আসন্নপতন প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতীক্ষা করিতেছে।

ত্রিশচাল্লিশফীট্ উচ্চতার কমে নিরাপদ্ স্থানের আরম্ভ হয় নাই; সেইখানেই মনুষ্যগৃহের প্রথম গবাক্ষ উদ্ঘাটিত হইয়াছে, বারণ্ডা বাহির হইয়াছে, বলভী উঠিয়াছে। আরো নীচে গঙ্গারই একাধিপত্য, বৎসরের মধ্যে অন্তত একবার সকলকেই উহাতে ডুব দিতে হইবে; চিরদিনই উহার পবিত্র মৃত্তিকা লইয়া গায়ে লেপিতে হইবে; উহারই জন্য নিবাস-আদি নির্ম্মাণ করিতে হইবে;

দুর্গের গুপ্ত-গারদের মত প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড চতুষ্কমণ্ডপ—তাহার মধ্যে গুরুভার, স্থূল ও খর্ব্ব-কায় দেববিগ্রহ রক্ষিত, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ভিত্তি-ভূমি, বিকট-ভীষণ প্রস্তরস্তূপ—এই সমস্ত অচলপ্রতিষ্ঠ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু কোন-কোন সময়ে নদীর স্রোতে এরূপ ভীষণ বেগ উপস্থিত হয় যে, উহাদিগকে কাঁপাইয়া তুলে—গ্রাস করিয়া ফেলে।

গৃহাদির উর্দ্ধে, প্রাসাদাদির উর্দ্ধে, হিন্দুমন্দিরের অসংখ্য চূড়া পশ্চিমগগনে সমুত্থিত; রাজস্থানের ন্যায় এখানকার মন্দিরের চূড়াগুলাও বড়-বড়-প্রস্তরময় ঝাউএর আকারে গঠিত, কিন্তু এখানকার এই মন্দিরচূড়াগুলা লাল—ঘোর লাল,—তাহার সহিত 'ম্যাড়্মেড়ে' সোনালি-কাজ মিশ্রিত। সমস্ত বারাণসীর মন্দির-চূড়াগুলি রক্তিম—কেবল চূড়ার অগ্রবিন্দুগুলি সোনালি। নদী যেমন-যেমন বাঁকিয়া গিয়াছে—সেই অনুসারে নগরীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রস্তরময় সোপানাবলী তটভূমির উপরে যেন পক্ষবিস্তার করিয়া রহিয়াছে—যেন একটা প্রকাণ্ড স্তম্ভপীঠ (pedestal) উপর হইতে—যেখানে মানুষের বসতি, সেইখান হইতে—নামিয়া-আসিয়া পবিত্র জলরাশির অভিমুখে প্রসারিত হইয়াছে।

আজিকার সন্ধ্যায়, এই বৃহৎ ঘাটের শেষ-ধাপটি পর্য্যন্ত—এমন কি, ঘাটের ভিত-দেয়ালটি পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দুর্বৎসর ছাড়া এই ভিত-দেয়াল কখনো বাহির হইয়া পড়ে না—ইহা দুর্ভিক্ষ ও দুঃখদৈন্যের পূর্ব্বসূচনা। এই মহিমান্বিত বৃহৎ সোপানপংক্তি এখন একেবারেই জনশূন্য—এখানে ফলবিক্রেতা, পবিত্র গাভীবৃন্দের জন্য যাহারা তৃণবিক্রয় করে সেই তৃণবিক্রেতা, বিশেষত এই লোকপাবনী পরমারাধ্যা বৃদ্ধা নদীর উপর যে পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষিপ্ত হয়, সেই সকল ফুলের তোড়া ও ফুলের মালাবিক্রেতা—ইহাদের দ্বারাই সোপানের ধাপগুলা দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এবং অসংখ্য বাঁখারির ছাতা—যাহা সকলকেই ছায়াদান করে,—সেই সকল ছাতার বাঁট মাটির মধ্যে স্থায়িভাবে পোঁতা এবং ঐ সকল ছাতা যেন প্রাতঃসূর্য্যের প্রতীক্ষায় উদয়াচলের দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে।

এই ভাঁজবিহীন আতপত্রগুলি দেখিতে কতকটা ধাতুময় চাকৃতির মত, এবং যতদূর দৃষ্টি যায়, নগরীর সমস্ত প্রস্তরময় তলদেশ এই সকল আতপত্রে সমাচ্ছন্ন। দেখিলে মনে হয়, যেন ঢালের ক্ষেত্র প্রসারিত।

ম্লানপ্রভ আলোকচ্ছায়া সন্ধ্যার আগমন-বার্ত্তা জানাইয়া দিল এবং হঠাৎ শৈত্যের আবির্ভাব হইল। বারাণসীতে আসিয়া ধূসর আকাশ ও শীতের লক্ষণ দেখিব, এরূপ প্রত্যাশা করি নাই।

প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড তমোময় পাষাণপিণ্ডের পাদদেশ দিয়া তটভূমি ঘেঁসিয়া আমার নৌকা স্রোতের মুখে নিঃশব্দে চলিয়াছে।

নদীতটের একটা বীভৎস কোণে, প্রাসাদের ভাঙাচূরার মধ্যে, কালো মাটির ও পাঁকের উপর, তিনটি ছোট-ছোট চিতা সজ্জিত; 'ন্যাকড়া'-পরা কতকগুলা কদাকার লোক তাহাতে আগুন ধরাইবার চেষ্টা করিতেছে; উহা হইতে ধোঁয়া বাহির হইতেছে—কিন্তু আগুন জলিতেছে না। এই চিতাগুলা অদ্ভুত আকারের—দীর্ঘ ও সরু। এইগুলা শবদাহের কাঠ। নদীর দিকে পা করিয়া প্রত্যেক শব আপন-আপন

চিতাশয্যায় শয়ান; কাছে গিয়া দেখিতে পাইলাম, ডাল্‌পালার টুক্‌রার মধ্যে পায়ের বুড়ো-আঙুল কানি দিয়া জড়ান; কানি হইতে আঙুলটা একটু বাহির হইয়া রহিয়াছে—উঠিয়া রহিয়াছে। এই চিতাগুলা কি ক্ষুদ্রাকার; সমস্ত শরীরটা এত অল্প কাষ্ঠে দগ্ধ হয়!

আমার নৌকার হিন্দু-মাঝি আমাকে বুঝাইয়া দিল—"ও-সব গরিবদের চুলো। ওর চেয়ে ভাল কাঠ কিন্‌তে ওদের পয়সা জোটে না—তাই খারাপ ভিজে-কাঠ এনেছে।"

এক্ষণে পূজা-অর্চ্চনার সময় উপস্থিত। মহাসমারোহে সান্ধ্যপূজার অনুষ্ঠানাদি আরম্ভ হইল। উত্তরীয়বস্ত্রে অবগুণ্ঠিত হইয়া ব্রাহ্মণেরা সোপান-ধাপ দিয়া নামিতে লাগিল; পবিত্র জল লইবার জন্য, স্নানের জন্য, এবং ব্রাহ্মণের অবশ্য-পাল্য কতকগুলি ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য তারা সিঁড়ির নীচে পর্য্যন্ত নামিয়া আসিল; পাথরের ধাপগুলা, যাহা একেবারেই জনশূন্য ছিল, এক্ষণে নিঃশব্দে জনপূর্ণ হইল; সর্ব্ব-সাধারণের পূজা-অর্চ্চনার জন্য নদীর ধারে অসংখ্য ডোঙা, প্রাসাদমন্দিরাদির ছায়াতলে অসংখ্য বাঁশের মাচা সাজান রহিয়াছে; এই সমস্ত বসিবার স্থান ভক্তজনে পূর্ণ হইয়া গেল; তাঁহারা সংযতচিত্ত হইয়া স্থিরভাবে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইলেন। এবং অনতিবিলম্বেই, এই বিপুল জনতার চিন্তারাশি সেই অতলস্পর্শ পরপারের অভিমুখে উড্ডীন হইল—যাহার মধ্যে কিছুকাল পরে আমাদের সকলেরই এই ক্ষণস্থায়ী 'অহং'গুলা বিলীন হইবে—তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে।

সেই শ্মশানকোণটিতে সেই ধূমায়মান তিনটি চিতার সন্নিকটে, কাপড়-জড়ানো আরো দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা যাইতেছে—উহারা নদীর জলে অর্দ্ধনিমজ্জিত; উহাদের প্রত্যেকেই একএকটা হাল্‌কা খাটিয়ার উপর শুইয়া আছে; উহাদের জন্য যে চিতা সজ্জিত হই-তেছে, তদুপরি স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই পার্শ্ব-বর্ত্তী অন্যান্য জীবন্ত লোকের ন্যায় উহারাও গঙ্গার পূতজলে স্নান করিয়া লইতেছে।

পরপারের তটভূমি—পঙ্ক ও তৃণাদিতে আচ্ছন্ন অসীম ক্ষেত্র, যাহা প্রতিবৎসরেই গঙ্গার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে—এই তটভূমির উপর, সন্ধ্যার কুয়াসা ক্রমেই ঘনাইয়া আসি-তেছে; প্রথমে ঐ তটভূমির উপর একটা অনির্দ্দেশ্য ধোঁয়া-ধোঁয়া ভাব দেখা যাইতেছিল; ক্রমে এই সব কুয়াসা আকাশের মেঘের মত একএকটা সুগঠিত আকার ধারণ করিতে লাগিল। মনে হইল, যেন এই পবিত্র বৃহৎ-নগরী পদতলস্থ জলদ-চূড়াগুলা নিরীক্ষণ করিবার জন্য অর্দ্ধচক্রাকারে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে।

শ্মশানের ঐ কোণটিতে একজন যুবা সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান—বক্ষের উপর বাহুদ্বয় আড়াআড়ি-ভাবে বিন্যস্ত এবং ঐ আর্দ্র চিতার মধ্যে কি-একটা ঘোর ব্যাপার চলিতেছে, তাহাই দেখিবার জন্য সেই দিকে মাথা ঝুঁকাইয়া রহিয়াছে। তাহার চুলগুলা কাঁধের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, তাহার নগ্নদেহ—যাহা এখনো পর্য্যন্ত সুন্দর ও মাংসল—শ্বেতচূর্ণে আচ্ছন্ন; এবং যেরূপ ফুলের মালা প্রতিদিন নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ একটা ফুলের মালা তাহার বক্ষের উপর বিলম্বিত।

চিতাগুলার একটু উপরে,—বহুকাল হইতে নদীর উপর গড়াইয়া পড়িয়াছে এমন

একটা পুরাতন প্রাসাদের উপরিভাগে, ধুতি-কাপড়ে আচ্ছাদিত ৫।৬জন লোক উবু হইয়া বসিয়া আছে, ঐ সন্ন্যাসীর মত উহারাও অনন্য-মনে ঐ দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে! উহারা ঐ মৃতদিগের আত্মীয়জন; বিশেষত উহাদের মধ্যে দুইজন, যাহাদের দেহ বার্দ্ধক্যে নত হইয়া পড়িয়াছে, উহারা—তিনটা চিতার মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ও গরিব-ধরণের, সেইটির দিকে আকুলভাবে তাকাইয়া রহিয়াছে। আমার হিন্দুমাঝি বলিল, "ওটি দশবৎসরের একটি ছোট ছেলে,—উহাকে পোড়াইবার জন্য উহারা খুব অল্প কাঠ আনিয়াছে।" ঐ চিতা হইতে ধূমরাশি উত্থিত হইয়া ঐ অচলমূর্ত্তি লোকগুলার দিকে ধাবিত হইল। যাহারা দাহ করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে দুইজন একটা অতীব কদর্য্য ন্যাকৃড়া কটিদেশ হইতে টানিয়া-লইয়া চিতায় ক্রমাগত বাতাস দিতে লাগিল—ক্রমে চিতাটা ধোঁয়াইতে আরম্ভ করিল; এইবার উহাদের শিশুটির দেহ ভস্মসাৎ হইবে। এবং চতুর্দ্দিকের এই সমস্ত মন্দিরপ্রাসাদাদি—যাহা কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, উহারা সদর্প ঔদাস্যসহকারে ও পরমনির্ব্বিকারচিত্তে এই শ্মশান-কোণটির উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দরিদ্র শবের বিলম্বিত দাহকার্য্য অবলোকন করিতেছে—সেই শ্মশান, যেখানে সমস্ত রক্ত-মাংসের শেষ হয়, মৃত্যুতে সমস্ত দুঃখকষ্টের অবসান হয়।

এই সময়ে, বিরাট্ সোপানাবলীর শীর্ষদেশে, চিতার আর একটি নূতন আহুতি আসিয়া উপস্থিত হইল; এই পঞ্চম শবটি, ঐ উপরের একটি ছায়াময় সঙ্কপথ হইতে বাহির হইয়া এই বৃদ্ধা গঙ্গার অভিমুখে আসিতেছে; উহারও ভস্মরাশি গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইবে। ডুলির আকারে বাঁশের কতকগুলা শাখা পাশাপাশি বাঁধা, তাহার উপর শবটি রহিয়াছে; 'ট্যানা-পরা' অর্দ্ধনগ্ন ছয়জন লোক উহাকে লইয়া আসিতেছে। শবের পা সম্মুখে বাহির হইয়া রহিয়াছে এবং পথটা এত বেশী ঢালু যে, মনে হইতেছে যেন শবটা প্রায় খাড়া হইয়া রহিয়াছে। কেহই অনুগমন করিতেছে না, কেহই কাঁদিতেছে না। কতকগুলি বালক, যাহারা স্নানের জন্য নীচে নামিতেছে, তাহারাও যেন উহাকে দেখিয়াও দেখিতেছে না, উহার চতুর্দ্দিকে উৎফুল্লভাবে লাফালাফি করিতেছে। বারাণসীতে আত্মাই শুধু ধর্ত্তব্যের মধ্যে; তাই আত্মা চলিয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিযুক্ত ও অপসারিত করা হয়। প্রায় দরিদ্রেরাই শবের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে আইসে; তাহাদের ভয় হয়, পাছে দাহের জন্য কাঠে না কুলায় এবং পাছে দাহের পর দাহকেরা শবের অদগ্ধ অংশ গঙ্গায় নিক্ষেপ করে।

বড়-বড় উজ্জ্বল নক্সা-কাটা একটা লাল মল্‌মল্‌বস্ত্রে এই শবের দেহ আচ্ছাদিত; এবং উহার কটিদেশে কতকগুলা শাদা ও লাল ফুল গোঁজা। ইহা একটি রমণীমূর্ত্তি, প্রথমত এই পুষ্পসজ্জাতেই তাহা জানা যায়; তা ছাড়া, মৃত্যুর হিমময়-বিকৃতাবস্থা-সত্ত্বেও পাত্‌লা কাপড়ের ভিতর দিয়া উহার নারীসৌন্দর্য্য দিব্য প্রকাশ পাইতেছে! আমার মাঝি বলিল—"উনি একজন ধনিলোকের মেয়ে; দেখ না, ওঁর জন্য কেমন খাসা কাঠ আনা হয়েছে।"

এই শবের দাহ দেখিবার প্রতীক্ষায়, এই

গঙ্গার উপর,—এই আবিল, পীতাভ, পঙ্কিল জলের উপর আমার নৌকা থামাইলাম, - যে জল তৃণাদিতে, আবর্জ্জনারাশিতে, ফুলের পাপ্‌ড়িতে, ফুলের মালায় নিত্য আচ্ছন্ন এবং যাহা হইতে পচাগন্ধ নিয়ত উচ্ছ্বসিত হইতেছে। গোলাপ, রজনীগন্ধ, বিশেষত হল্‌দেফুল গাঁদা, কুঁদফুলের মালা প্রভৃতি যাহা এই পবিত্র বৃদ্ধা গঙ্গার বক্ষে পুষ্পাঞ্জলিরূপে প্রতিদিন নিক্ষিপ্ত হয়—এই সমস্ত ফুল জলের উপর ভাসিতেছে, গাঁজিয়া উঠিতেছে। ধবল ফেনপুঞ্জ, কিনারায় সঞ্চিত কাদার ফেনা, তাহার উপর ছড়ান গাঁদাফুল – ইহার সহিত মনুষ্যবিষ্ঠা মিশিত হইয়া সমস্তই পচিয়া উঠিয়াছে।

শববাহকেরা, একটা পরিত্যক্ত জঘন্য জিনিষের মত এই সুন্দরীর মৃতদেহকে লইয়া নীচে নামিতেছে; যখন একেবারে জলের ধারে আসিল—আমার খুব নিকটে আসিল,—অন্তর্জ্জলীর জন্য শবকে জলের মধ্যে অর্দ্ধ-নিমজ্জিত করিল; এবং উহার মধ্যে একজন লোক শবের উপর ঝুঁকিয়া জন্মের মত শেষবার তাহার মুখটি দেখিয়া লইল এবং অন্ত্যেষ্টির পদ্ধতি অনুসারে করতলে একটু গঙ্গাজল লইয়া তাহার মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিল। সেই সময়ে আমি দেখিতে পাইলাম — দুইটি দীর্ঘায়ত চক্ষু মুদ্রিত—নেত্রপল্লব কৃষ্ণ পক্ষ্মরাজিতে বিভূষিত; ঋজু নাসিকা,—নাসিকার পার্শ্বদ্বয় সুকুমার; ফুল্ল কপোল; ওষ্ঠাধরের গঠন অতীব সুন্দর—ধবলকান্তি মুখের উপর অর্দ্ধোদ্‌ঘাটিত হইয়া রহিয়াছে। রমণী যে পরমা সুন্দরী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; যখন ইঁহার দেহ সবল-সুস্থ ছিল, পূর্ণ-যৌবনে ইঁহার রূপ ঢল্‌ঢল্‌ করিতেছিল, বোধ হয় সেই সময়ে হঠাৎ কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া ইনি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন; তাই ইঁহার মুখে এখনো কোন বিকৃতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তা ছাড়া, ইনি যে লাল বস্ত্র-খণ্ডে আচ্ছাদিত, তাহা জলে ভিজিয়া স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে এবং উঁহার বক্ষ ও কটিদেশের উপর এমন আঁটিয়া ধরিয়াছে যে, উঁহার সৌন্দর্য্যকে যথেষ্টপরিমাণে ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছে না।...এই সমস্ত কতকগুলা স্থূলরুচি বাহকের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্তই ধ্বংস হইয়া যাইবে।...আর যে দুইজনের শব সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার মধ্যে একজনের পালা এইবার উপস্থিত; ইহা একজন পুরুষের শব, শাদা মল্‌মলে আচ্ছাদিত; পবিত্র জলে স্নান করাইয়া, তাহাকেও চিতার উপর রাখা হইল। ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এখনো কঠিন ও আড়ষ্ট হইয়া যায় নাই; মুহূর্ত্তের জন্য উহার মস্তক একবার ডাইনে ও একবার বামে ঢলিয়া পড়িল; তাহার পর, কাষ্ঠ-উপাধানের উপর একেবারে স্থির হইয়া রহিল; ডালপালায় উহাকে আচ্ছাদিত করিয়া, পায়ের দিকে আগুন ধরান হইল! সেই ছোট বালকটির মৃতদেহ এখনো দাহ হইতেছে; তাহার কৃষ্ণাভ ধূমরাশি তাহার সেই জনক-জননীর দিকে উড়িয়া আসিতেছে;—অচলমূর্ত্তি দুইটি প্রাণী, যাহারা একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে।

এইবার পাখীদের শয়নকাল নিকটবর্ত্তী; ভারতে, বিশেষত বারাণসীতে পাখীদের গৌরব চিরকালই বেশী; দাঁড়কাকেরা মৃত্যুকে ডাকিতেছে, পায়রার ঝাঁক পাণ্ডুবর্ণ আকাশ-

তলে যাতায়াত করিতেছে; এবং প্রত্যেক মন্দিরচূড়ায় একএকটা বিশেষ ঝাঁক আছে, তাহারা সেই চূড়ারই চতুর্দ্দিকে ঘোরপাক দিয়া চক্রাকারে উড়িয়া বেড়ায়। নদীসমুত্থিত কুয়াসা ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে, সন্ধ্যাবায়ু ক্রমেই শীতল হইয়া আসিতেছে এবং গলিত দ্রব্যাদির দুর্গন্ধে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। সেই নবযৌবনা দেবীমূর্ত্তির চিতারোহণ দেখিবার জন্য আরো কিছুক্ষণ আমার এখানে থাকিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাহা হইলে অনেক বিলম্ব হইবে; তা ছাড়া, বিশ্বাসঘাতক ঐ লাল বস্ত্রখণ্ড দেবীর সমস্ত দেহযষ্টিকে এমনভাবে অনাবৃত করিয়া রাখিয়াছে যে, দেখিতে বড়ই সঙ্কোচবোধ হয়; এ সময়ে এতটা দেখা একপ্রকার দেবাবমাননা;—কেন না, উনি এখন মৃত। না, যখন দাহের সময় হইবে, বরং সেই সময়ে, একটু পরে আবার এখানে আসিব। এখন এখান হইতে যাওয়া যাক্।

কি অক্লান্ত-প্রলয়ঙ্করী এই গঙ্গা! কত প্রাসাদ ইহার স্রোতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে! প্রাসাদসমূহের সমগ্র মুখভাগ স্খলিত হইয়া অটুটভাবে নীচে নামিয়া আসিয়াছে এবং অর্দ্ধনিমজ্জিত হইয়া ঐখানেই রহিয়া গিয়াছে। আর এখানে দেবালয়ই বা কত! নীচেকার যে সকল মন্দির নদীর খুব ধারে, উহাদের চূড়াগুলা ইটালীর 'পিজা'-স্তম্ভের ন্যায় ঝুঁকিয়া রহিয়াছে এবং উহার মূলদেশ এরূপ শিথিল হইয়া গিয়াছে যে, প্রতিবিধানের কোন উপায় নাই। কেবল উপরের মন্দিরগুলা প্রস্তররাশির দ্বারা—সর্ব্বকালের রাশীকৃত পাষাণভিত্তির দ্বারা সংরক্ষিত হওয়ায়, উহাদের রক্তিম চূড়াগ্রভাগ কিংবা সোনালী চূড়াগ্রভাগ এখনো সিধা রহিয়াছে এবং আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, এবং এই প্রত্যেক চূড়ার সঙ্গে এক-এক ঝাঁক কালো পাখীও রহিয়াছে।—খুঁটিনাটি করিয়া দেখিতে গেলে, এ দেশের এই মন্দিরচূড়াগুলার আকারে একপ্রকার রহস্যময় ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমি ইতিপূর্ব্বে আমাদের "গোরস্থানের, বৃহৎ ঝাউ-গাছের" সহিত ইহার তুলনা দিয়াছি, কিন্তু কাছে আসিয়া দেখিলে আরো অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়; ইহা যেন বাণ্ডিলের মত বাঁধা ছোট-ছোট চূড়ার সমষ্টি, ছোট-ছোট অসংখ্য একইরকমের জিনিষ, ইহার এই অপরিবর্ত্তনীয় আকার শতশত বৎসর হইতে সমান চলিয়া আসিতেছে। আমাদের পাশ্চাত্য বাস্তুবিদ্যার পরিজ্ঞাত কোন-কিছুরই সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই।

এক্ষণে বারাণসীর সমস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলী এই গভীরসলিলা নদীর ঘাটে আসিয়া সমবেত হইয়াছে; তীরে বাঁধা ছোটছোট অসংখ্য ডিঙী-নৌকা উপাসকদিগের ভারে নত হইয়া পড়িয়াছে—জলের ভিতর অনেকটা ডুবিয়া গিয়াছে। উহাদের মধ্যে কেহ বা অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, কেহ বা জলের উপর পুষ্পনিক্ষেপ করিতেছে। এই সমস্ত লোকের ঊর্দ্ধদেশে ধূসরবর্ণের সোপান, ধূসরবর্ণের সোপানভিত্তি; এই সমস্ত গাঁথুনির গঠন ভারী-ধরণের ও রং পাঁকের মত। দেখিলে মনে হয়, যেন পবিত্র বারাণসীর মূলগুলা পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

আবার আমার নৌকা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল, অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন ঘাটের সম্মুখ

দিয়া চলিতে লাগিল ; এই অঞ্চলটায় কেবলই পুরাতন প্রাসাদ, নদীর ধারে কোন ডিঙী বাঁধা নাই। গঙ্গার উপর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদিগের একএকটা নিবাসগৃহ—একটু 'পোড়ো'-ধরণের—তাঁহারা সময়ে সময়ে সেইখানে আসিয়া বাস করেন। প্রথমেই গুরুপিণ্ডাকার প্রকাণ্ড প্রাকার সিধা উঠিয়াছে, তাহাতে কোনপ্রকার ছিদ্রপথ নাই, কেবল খুব উপরদিকে,—এই সমস্ত দুর্ভেদ্য আবাসগৃহের গবাক্ষ, বারণ্ডা, জীবন আরম্ভ হইয়াছে। আজ সন্ধ্যায় প্রাসাদের ভিতরে সঙ্গীত হইতেছে—এ সঙ্গীতের সুর চাপা, কাঁদুনে, ও অল্পদমের। শানাইয়ের কাঁদুনি শুনা যাইতেছে—শানাইয়ের আওয়াজটা কতকটা আমাদের hautbois-যন্ত্রের আওয়াজের মত। মাঝে মাঝে একটিমাত্র তান, একটিমাত্র বিলাপধ্বনি উপরে উঠিতেছে, আবার মরিয়া যাইতেছে ; তাহার পর, ক্ষণকাল নিস্তব্ধ,—এই নিস্তব্ধতার সময়ে কাক একবার ডাকিয়া গেল—তাহার পরেই আবার একটা তান যেন উত্তরের মত অন্য এক প্রাসাদ হইতে আসিয়া পৌঁছিল। তা ছাড়া, ঢাকঢোলের বাদ্যও শুনা যাইতেছে—যেন গুহাগহ্বরের মধ্য হইতে আওয়াজ বাহির হইতেছে। আর যেন খুব বিলম্বে-বিলম্বে ঢাকের উপর ঘা পড়িতেছে।...ঐ অতি উচ্চে, অতি দূরে, ঐ সমস্ত সঙ্গীতের রহস্যময় অনির্দ্দেশ্য বিষণ্ণ সুর আমার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে – এদিকে, এই নীচে জলের উপর আমার নৌকা মৃত্যু আঘ্রাণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে! আমার নিকট ইহা যেন সেই তরুণীর মৃত্যুজনিত শোকসঙ্গীত। সেই মৃত্যুর দৃশ্যই অষ্টপ্রহর আমার মাথায় যেন ঘুরিতেছে ;—আমার কল্পনায় জাগিতেছে। আমার নিকট ইহা শোকসঙ্গীত বলিয়া মনে হইতেছে আরো অন্যলোকের জন্য, যাহারা আর নাই—আরো অন্য জিনিষের জন্য, যাহা আর নাই।...

যেমন আমি মনে করি নাই,—এই পবিত্র নগরীতে আসিয়া ধূসর আকাশ দেখিব, শীতের ভাব দেখিব, সেইরূপ ইহাও ভাবি নাই—আমার মনের ভাব পূর্ব্বের মতই থাকিবে,—পূর্ব্বেরই মত জীবজগতের ও বাহ্যজগতের নবনব সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইব। বারাণসী—যাহার জুড়ি নাই—যাহা ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল, যাহা পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন একটি বৃহৎ দেশের হৃদয়,—সেই বারাণসীতে আসিয়া, সাধুদের সংসর্গে ও তাঁহাদের প্রসাদে আমারও কিছু বৈরাগ্য জন্মিবে, আমিও কিছু শান্তি পাইব—এই আমার আশা ছিল। সাধুরা কৃপা করিয়া আমাকে গুহ্যধর্ম্মে অল্পস্বল্প দীক্ষা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন—এই দীক্ষার অনুষ্ঠান কল্য হইতে আরম্ভ হইবে। কিন্তু দেখ, এইখানে আসিয়া,—যাহা-কিছু দেখিতে সুন্দর, যাহা-কিছু ভৌতিক, যাহা-কিছু মায়াময় ও মৃত্যুর অধীন, তাহাতেই যেন আমি পূর্ব্বাপেক্ষা আরো অধিক আসক্ত হইয়া পড়িতেছি—ঘোরতর আসক্ত হইয়া পড়িতেছি—উদ্ধারের কোন উপায় দেখি না।...

আবার সেইসব চিতার নিকট ফিরিয়া আসিলাম।...এইবার প্রকৃত সন্ধ্যার আবির্ভাব হইয়াছে ; পাখীদের আকাশভ্রমণ শেষ হইয়াছে ; উহারা মন্দিরপ্রাসাদাদির প্রত্যেক কার্ণিসের উপর রাত্রিবাসের জন্য একটা দীর্ঘ রজ্জুর আকারে সারিসারি বসিয়া গিয়াছে—পাখার ঝাপ্‌টাঝাপ্‌টিতে রজ্জুটা যেন স্পন্দিত হইতেছে.

—আজিকার মত ইহাই উহাদের শেষ ঝাপ্‌টা-ঝাপ্‌টি। মন্দিরচূড়াগুলা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আর দেখা যাইতেছে না;—কালো-কালো বৃহৎ ঝাউগাছের আকার ধারণ করিয়া পাণ্ডু-বর্ণ আকাশের অভিমুখে সমুত্থিত হইয়াছে। ফুল, ফুলের মালা ও তৃণাদির জঞ্জাল টানিয়া-লইয়া আমার নৌকা আবার সেই চিতার নিকট ফিরিয়া আসিল।

একটা স্থূল গন্ধ,—মৃত্যুর গন্ধ, বীভৎস গলিতদ্রব্যের গন্ধ ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। ঠিক্ যেখানটায় চিতার ধোঁয়া উঠিতেছে, তাহার নিকটে উপনীত হইবার জন্য আবার আমাকে সেই ধ্যানমগ্ন লোকদিগের পাশ দিয়া—সেই অচলমূর্ত্তি ব্রাহ্মণদিগের ভারে ভারাক্রান্ত অসংখ্য ডিঙীর পাশ দিয়া যাইতে হইল। এই সমস্ত লোক, যাহারা যোগানন্দে আত্মহারা, যাহাদের মুখ ভস্মে আচ্ছন্ন, যাহাদের জলন্ত চক্ষু আমার চক্ষুর উপর নিপতিত—অথচ যাহারা আমাকে দেখিয়াও দেখিতেছে না—ইহাদের গা ঘেঁষিয়া আমার নৌকা চলিতেছে, তবু যেন আমার মনে হইতেছে—আমাদের মধ্যে কি-একটা অনির্দ্দেশ্য দূরত্বের ব্যবধান রহিয়াছে।

শ্মশানের সেই কোণটিতে আমার পৌঁছিতে একটু বেশী বিলম্ব হইয়াছে। একটা বৃহৎ চিতা—ধনিলোকের চিতা দাউ-দাউ করিয়া জলিতেছে—এবং তাহা হইতে স্ফুলিঙ্গ ও শিখারাশি প্রবলবেগে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। চিতার মাঝখানে সেই তরুণী, তাহার আর কিছুই দেখা যাইতেছে না, শুধু দেখা যাইতেছে তাহার শোকম্লান একটি পা—একটিমাত্র পা; যেন অতিমাত্র যন্ত্রণায়, ঐ পায়ের আঙুলগুলা পরস্পর হইতে অদ্ভুতভাবে ছাড়া-ছাড়া হইয়া রহিয়াছে। চিতা-আলোকের সম্মুখে সেই পা-খানির কৃষ্ণবর্ণ ছায়াচিত্র অতীব পরিস্ফুট-ভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

একটা ভাঙা-দেয়ালের উপরে ঘোম্‌টা-টানা, অদৃশ্যমুখশ্রী চারজন নূতন লোক উবু হইয়া বসিয়া বেশ নির্ব্বিকারচিত্তে উদাসীন-ভাবে বলিলেও হয়—এই তরুণীকে নিরীক্ষণ করিতেছে। উহারা বোধ হয় তাহার আত্মীয়-স্বজন, একই বংশের লোক—তরুণীর রূপলাবণ্যের অঙ্কুর বোধ হয় উহাদের হইতেই নিঃসৃত।...

এই সব লোক—কাল আবার যাহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য আমার ইচ্ছা হইতেছে—ইহাদের যেরূপ বিশ্বাস, তাহাতে মৃত্যু, বিচ্ছেদ, পুনর্মিলন—এই সমস্তের ভাব কতটা বদ্‌লাইয়া যায়। এই যে তরুণীর আত্মা ইহলোক হইতে অপসৃত হইল, ইহার প্রকৃত আপনার প্রায় কিছুই ছিল না; তা ছাড়া, উহার আত্মীয়দের আত্মা হইতেও উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু হয় ত উহা একটি বহু পুরাতন আত্মা, যুগযুগান্তর হইতে চৈতন্যলাভ করিয়াছে এবং যাত্রাপথে কিছু-কালের জন্য উহাদের দুহিতা-রূপে ঐ তরুণদেহ আশ্রয় করিয়া ছিল, এইমাত্র। একটি আত্মা প্রস্থান করিল; কিছুকালের জন্য মুক্তিলাভ করিল কিংবা চিরকালের জন্য মুক্তিলাভ করিল, তাহা কে বলিতে পারে? আরো কিছুকাল পরে—ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই আবার আসিয়া উহাদের সহিত মিলিত হইবে—কিন্তু আরো কিছুকাল পরে, আরো কিছুকাল পরে, যুগযুগান্তের পরে। এরূপভাবে রূপান্তরিত হইবে, পরিবর্ত্তিত হইবে যে, বহুকালের

পর পরস্পরের সহিত আবার মিলন হইলেও কেহ কাহাকে পূর্ব্বের সেই লোক বলিয়া চিনিতে পারিবে না—সুতরাং স্নেহমমতাও থাকিবে না, অশ্রুধারাও থাকিবে না। একই অখণ্ডের অংশসকল, যাহা বিযুক্ত হইয়াছিল, তাহা আবার পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইবে, একপ্রকার আনন্দহীন মোক্ষাবস্থায় উপনীত হইয়া পুনর্মিলিত হইবে।...

সে যাহাই হউক, প্রাচীরের পাথরের উপর বসিয়া দরিদ্র-বসনে অবগুণ্ঠিত যে দুইটি জরাবনত মনুষ্যমূর্ত্তি উপর হইতে অবিচলিত-ভাবে মৃতশিশুর দাহকার্য্য নিরীক্ষণ করিতে-ছিল, উহাদের মধ্যে একজন দাঁড়াইয়া উঠিল এবং মুখের অবগুণ্ঠন সরাইয়া, আরো নিকট হইতে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল। সেই তরুণীর চিতার আলোকে ক্ষুদ্র বালকটির মুখশ্রী পূর্ণরূপে আলোকিত হইয়া উঠিল। একজন শীর্ণকায়া বৃদ্ধা যেন এইভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"সমস্তটা ভাল করে' পুড়েছে ত?" স্ত্রীলোকটি খুব প্রাচীনা; মা অপেক্ষা দিদিমা হওয়াই সম্ভব;—কখন-কখন নাতিনাত্নী ও পিতামহীর মধ্যে কি-একটা রহস্যময় আকর্ষণ, একটা অসীম স্নেহের বন্ধন দেখিতে পাওয়া যায়।—"সমস্তটা ভাল করে' পুড়েছে ত?" তাহার ব্যাকুলনেত্র যেন এই ভাবটি প্রকাশ করিতেছে——"যতটা কাঠের দরকার, অর্থাভাবে তাহা কিনিয়া দিতে পারি নাই; এখন ভয় হয়, পাছে নির্দ্দয় দাহকেরা, যাহা এখনো চেনা যাইতেছে, সেই সব অদগ্ধ অংশ গঙ্গায় ফেলিয়া দেয়।" আবার সে ঝুঁকিয়া ব্যাকুলভাবে দেখিতে লাগিল—ধনীদের চিতার আলোকে দেখিতে লাগিল। এদিকে দাহক, আর কিছুই অবশিষ্ট নাই ইহা দেখাইবার জন্য, একটা ডাল দিয়া পোড়া-কাঠগুলা নাড়িয়া দিল। তখন সে ইঙ্গিত করিয়া যেন এইভাবে বলিল, "হাঁ, ঠিক্ হয়েছে; এখন যাও; এখন ওগুলা গঙ্গায় ফেলে দিতে পার।" কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে সেই চিরন্তন মানবহৃদয়ের তীব্র বেদনা দেখিতে পাইলাম, যাহা কি ভারতে, কি অস্মদ্দেশে—সর্ব্বত্রই সমান; যাহা আমাদের সাহস কিংবা অস্পষ্ট আশাভরসা সত্ত্বেও, সময়কালে আমাদের সকলের নিকটেই দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে। যাহা এইমাত্র ধ্বংস হইয়া গেল, সেই ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্রমূর্ত্তিটিকে বোধ হয় উহার দিদিমা ভালবাসিত;—উহার ক্ষুদ্র মুখখানি, উহার মুখের ভাবটি, উহার হাসিটি ভালবাসিত; এখনো উহার যথেষ্ট বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই, এবং ব্রাহ্মণ্যের নির্ব্বিকারভাব এইবার যেন একটু খর্ব্ব হইল—কেন না, সে কাঁদিতে লাগিল।...

যে-সব ক্ষুদ্রশিশু আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহাদের নেত্রের সেই মধুর দৃষ্টি কিংবা আমাদের পিতামহী প্রভৃতির সেই স্নেহের দৃষ্টি কিংবা তাঁহাদের সেই পলিতকেশ আমাদের নিকট আবার ফিরাইয়া দিবে, এইরূপ কোন ধর্ম্মই কি অঙ্গীকার করিতে সাহস করে, এমন কি, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা মধুর, সেই খৃষ্টধর্ম্মও কি এইরূপ অঙ্গীকার করিতে সাহস করে?...

দরিদ্র-চিতার শেষ-অঙ্গার ও ভস্মাবশেষ-গুলা একটা কাঠের হাতা করিয়া উহারা গঙ্গায় ফেলিয়া দিল।

পাশের চিতাটির উপর সেই রূপ-

লাবণ্যসম্পন্না তরুণীর পা—যে পায়ের আঙুলগুলা ছাড়া-ছাড়াভাবে ছিল, সেই পা-খানি অবশেষে ভস্মরাশির মধ্যে খসিয়া পড়িল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাটের চাষ ও দুর্ভিক্ষ।

বঙ্গদেশীয় অধিকাংশ সাময়িকপত্রে পাটচাষের বিরুদ্ধে আজকাল বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। ইহা দেশের পক্ষে কল্যাণকর কিংবা অকল্যাণকর, তৎসম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের বিশেষরূপে চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

পাটচাষের বিরুদ্ধে গুরুতর দুইটি অভিযোগ এই যে,—

(১) পাটের চাষ দুর্ভিক্ষবৃদ্ধি করিতেছে,

(২) পাটের চাষে ম্যালেরিয়ায় দেশ ডুবিয়া যাইতেছে।

পাটের বিরুদ্ধে লঘুতর তৃতীয় অভিযোগ এই যে,—

(৩) পাট কৃষকদিগকে বিলাসী করিয়া তুলিতেছে।

পাটের চাষ কি দুর্ভিক্ষবৃদ্ধি করিতেছে? সত্যসত্য কি পাটের চাষ দুর্ভিক্ষবৃদ্ধি করিতেছে? আমাদের বিবেচনায় পাট বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ হ্রাস করিয়াছে। যাঁহারা বলেন যে, পাট দুর্ভিক্ষবৃদ্ধি করিতেছে, তাঁহাদের যুক্তি এই যে, পাটের চাষে ধানের চাষের হ্রাস হওয়াই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ। পাটের জমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে ধানজমির পরিমাণের হ্রাস হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন মতভেদ হইতে পারে না। তবে পাটের জমি বৃদ্ধি পাওয়াই দুর্ভিক্ষের কারণ কি না, তৎসম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের দুর্ভিক্ষের ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে অধিক বন্যায় ধানগাছ বিনষ্ট হওয়ায় দুর্ভিক্ষ ঘটে। দ্বিতীয়ত পূর্ব্ববঙ্গের নিম্নভূমিতে চৈত্র অগত্যা বৈশাখমাসের মধ্যে উপযুক্ত বৃষ্টির অভাবে ধানবপন না করিতে পারিলেও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হয়। ফরিদপুর ও ঢাকার বিলে-জমি ব্যতীত অন্যান্য স্থলে প্রথম কারণেই শস্যহানি হইয়া থাকে। শ্রাবণমাসের শেষে কিংবা ভাদ্রমাসের প্রথমে সাধারণত বন্যা উপস্থিত হয়। কখন-কখন আশ্বিন বা কার্ত্তিকমাসেও বন্যা আসিয়া ধান বিনষ্ট করে। বন্যানিবারণ করিবার উপায় থাকিলে পূর্ব্ব বা উত্তর বঙ্গে কখন দুর্ভিক্ষ হইত না। আমি পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়া কেবল পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের কথা এইজন্য বলিতেছি যে, পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গেই প্রধানত পাটচাষ হইয়া থাকে। বন্যানিবারণ করিতে আমাদের শক্তি নাই, কিন্তু পাটচাষদ্বারা বন্যার অপচয় যথেষ্ট লঘু হয়। কারণ, বন্যার পূর্ব্বেই অধিকাংশস্থলের পাট কাটা হয়। আর বন্যার জলে ১০।১৫দিন পাটগাছ ডুবিয়া থাকিলেও ইহার বিশেষ অনিষ্ট হয় না। মনে করুন,

এক চাষীর ১৬বিঘা আবাদী-জমি আছে এবং ১৬বিঘাতেই সে ধান্য রোপণ বা বপন করে। যে বৎসর বন্যা আসিল, সে বৎসর তাহার ১৬বিঘা জমির ফসলই ধ্বংস-প্রাপ্ত হইল। এখন পূর্ব্বাপেক্ষা লোকের খরচ অধিক, সুতরাং এখন কৃষক দুই বৎসরের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে সক্ষম হয় না। এক বৎসরের শস্যহানি হইলেই তাহার কষ্টের অবধি থাকে না। ইহার উপর যদি পরপর দুই বৎসরেই শস্যহানি হয়, তবে তাহাকে কে রক্ষা করিতে পারে? অপর পক্ষে, ঐ কৃষক ১৬বিঘা জমির মধ্যে ৬ বা ৭ বিঘা জমিতে পাটবপন করিল, বাকি জমিতে ধানের চাষ করিল। বন্যায় ধান বিনষ্ট হইল, কিন্তু পাট থাকায় তাহার ।৵০ বা ।৶০ আনা ফসলের দ্বারা কোনপ্রকারে দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা-প্রাপ্ত হইতে পারে। গত দুইবৎসরে পাটের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই হিসাবে ৭বিঘা জমিতে যতটাকার পাট জন্মে, ১৬বিঘা ধানের জমিতেও তত টাকা প্রদান করে না। একমণ পাট উৎপন্ন করিতে সর্ব্ব-সমেত প্রায় ৩৷৷০ টাকা বা ৪৲ টাকা খরচ পড়ে। ২০বৎসর পূর্ব্বে যখন পাট ৩৲ টাকায় মণ বিক্রয় হইত, তখনও বঙ্গদেশীয় প্রজাগণ ২০লক্ষ একর জমিতে পাট উৎপন্ন করিত। প্রজাগণ স্ব স্ব শারীরিক পরিশ্রমের কোন মূল্য হিসাবে ধর্ত্তব্য বলিয়া মনে না করিলেও পাট অপেক্ষা ধানচাষে তাহাদের অধিক লাভ হইত, তাহা তাহারা বেশ বুঝিতে পারিত। তথাপি তাহারা সম্পূর্ণ জমিতে ধানরোপণ না করিয়া এত অধিক জমিতে পাটচাষ করিত, তাহার কি কোন বিশেষ হেতু ছিল না। ইহার কারণ এই যে, ধান বিনষ্ট হইলেও সে অন্তত একটা-ফসল পাট প্রাপ্ত হইবে, এই আশায় সে অনেক জমিতে তখনও পাটের চাষ করিত। ঐ নিরক্ষর প্রজা আমাদের অনেক পাণ্ডিত্যাভি-মানী ব্যক্তি অপেক্ষা বুদ্ধিমান্। পাটের মূল্য-বৃদ্ধি হওয়াতে ২০লক্ষ একরের স্থানে ৩৩লক্ষ একর জমিতে পাটচাষ হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? যে সমস্ত জেলায় পাট জন্মে, তথায়ও এখন মোট আবাদী-জমির তুলনায় পাটের জমি দশ-ভাগের একভাগ মাত্র। সমস্ত বঙ্গদেশের আবাদী-জমির পরিমাণে এই পাটের জমি অধিক নয়। ইহাতেই পাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা কেবল বাঙালীর অসারত্ব প্রমাণ করে। বন্যায় পূর্ব্ববঙ্গের ধান্য বিনষ্ট হওয়ায় গত দুইবৎসরে চাউলের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল, পাটের চাষ ইহার কারণ নহে। পাটের চাষে চাউলের মূল্যবৃদ্ধি হইলে যত জমিতে পাট জন্মে, তদনুযায়ী অর্থাৎ ১৬আনায় এক-আনা বৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, এখন ১৬বিঘা জমির মধ্যে মাত্র এক বিঘায় পাট জন্মে—৩৲ টাকার স্থলে যে ৮৲ টাকায় চাউলের মণ বিক্রয় হইয়াছে, ইহা কখন পাটের চাষ বৃদ্ধি হওয়ার জন্য হইতে পারে না। যদি পাটের চাষ চাউলের মূল্যবৃদ্ধি করিয়া থাকে, তবে ইহাতে প্রজার লাভ বই লোকসান কি? প্রজা যদি বুঝে যে, সে একবিঘা জমির ধানে যত টাকা প্রাপ্ত হয়, তদপেক্ষা অধিক টাকা পাটে প্রাপ্ত হইবে, তবে সে ধানের পরিবর্ত্তে পাট চাষ করিয়া ঐ পাটের টাকাদ্বারা অন্যত্র হইতে ধান আমদানি করিবে। ইহাতে তাহার বিজ্ঞতাই প্রকাশ পাইবে। বলা বাহুল্য যে, ভারতবর্ষের শতকরা ৮০জন কৃষিকার্য্য-

দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, সুতরাং শস্যের মূল্যবৃদ্ধি হইলে শতকরা ৮০জনের অবস্থার উন্নতি ঘটিবে, সন্দেহ নাই। এইরূপ অবস্থায় যদি কেহ প্রজাকে পাটচাষ করিতে নিষেধ করে, তবে তিনি প্রজার মিত্র হইতে পারেন না। পরন্তু প্রজা ঐ ব্যক্তিকে স্বার্থপর বলিয়া অবজ্ঞা করিবে। যাঁহারা প্রজার বন্ধু, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে, প্রজাদিগের কষ্টের সময়ে তাহাদিগকে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়া এবং তাহাদিগকে বপনের সময়ে উত্তম বীজ দ্বারা সাহায্য করা। উৎপন্ন ফসল হইতে প্রজাগণ শতকরা ২০ বা ২৫ ভাগ বীজ অধিক দিলেও বাধিত হইবে। উল্লিখিত বিবরণ হইতে প্রমাণ হয় যে, পূর্ব্ববঙ্গের প্রজা পাটচাষদ্বারা দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বিলক্ষণরূপে হ্রাস করিয়াছে। পাটের চাষ না থাকিলে পূর্ব্ববঙ্গে গতবৎসর কি ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হইত, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যদি প্রজার শস্যহানি না হয়, তবে চাউলের মূল্যবৃদ্ধি হইলে, তাহার লাভ। ইহাতে মধ্যবর্ত্তী ভদ্রলোকদিগের অবশ্যই কষ্টবৃদ্ধি হইবে। এই শ্রেণীর লোকদিগের আয় সামান্য, কিন্তু ব্যয় অধিক। সম্বলবিহীন আত্মীয়স্বজনদিগকে ইহারা প্রতিপালন করিতে বাধ্য হন। চাকুরিই এই শ্রেণীর লোকের একমাত্র সম্বল। চাকুরি যেরূপ দিনদিন দুষ্প্রাপ্য হইতেছে, তখন এই শ্রেণীর লোক কিরূপে জীবনরক্ষা করিবে, তাহা চিন্তা করিলে ব্যাকুল হইতে হয়। সম্প্রতি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও দ্বারভাঙ্গা-মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় অন্নরক্ষিণী সভা নামে একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতির উদ্দেশ্য এই যে, দেশের অন্ন বিদেশে রপ্তানী না করা। ইহা কতদূর সম্ভব, বুঝিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সহিত বাণিজ্যের আদানপ্রদান চলিতেছে। এইরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষে চাউলের মূল্য প্রতি মণে ২৲ টাকা থাকিবে, আর চীনদেশে ইহা দশটাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে, তাহা কখন হইতে পারে না। আর ভারতবর্ষে যত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, তাহা ভারতবর্ষীয় লোকের প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক অধিক। ভারতবর্ষ এই অধিক আহার্য্যশস্য রপ্তানি না করিয়া কি করিবে? এমন কি, দুর্ভিক্ষের বৎসরেও প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক শস্য ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়া থাকে। শস্যের অভাবে কখন ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ হয় না। প্রচুর খাদ্য থাকিলেও কেবল অর্থের অভাবে এতদ্দেশীয় লোক দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। ভারতবর্ষে চাউলের মূল্য ৫৲ টাকা মণ হইলেই দুর্ভিক্ষ ঘটে—কিন্তু ইউরোপীয়েরা অনায়াসে ১০৲ টাকায় চাউলের মণ ক্রয় করিয়া লইয়া যাইবে। গবর্মেণ্ট ইচ্ছা করিলে খাদ্যশস্যের একটা সীমা নির্দ্ধারিত করিতে পারেন। মূল্য সীমালঙ্ঘন করিলে তখন রপ্তানী বন্ধ করিলে, খাদ্যশস্যের মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারিবে না। গবর্মেণ্ট ব্যতীত আর কেহ এই কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে না। মূলকথা, যতদিন না এতদ্দেশীয় লোক অর্থবলে অন্যদেশীয় লোকের সমকক্ষ হইবে, ততদিন নিশ্চয়ই ভিন্নদেশীয় লোক অধিক মূল্যে এতদ্দেশের আহার্য্যশস্য ক্রয় করিয়া লইয়া যাইবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ব্যতীত মধ্যবর্ত্তিশ্রেণীর লোকের দারিদ্র্য দূর

হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত-যুবকগণের ২৫৲ টাকা বেতনের চাকুরীও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। তাহারা চাকুরীসন্ধানে সময় নষ্ট না করিয়া যদি প্রত্যেকে ৫০বিঘা জমি চাষ করে, তবে অনায়াসে বৎসরে ৫০০৲ টাকা লাভ করিবে। পাটের চাষ করিলে তাহারা ৫০বিঘা জমি হইতে অন্যূন ১০০০৲ টাকা লাভ করিবে।

অন্নরক্ষিণী সভা অথবা অন্য কোন সভা এই মধ্যশ্রেণীর যুবকদিগকে জমিজমা সংগ্রহ করিয়া দিলে তাহাদের প্রভূত কল্যাণসাধন হইতে পারে।

অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে শস্যহানি হইলে ভারতবর্ষের প্রজাসাধারণ কষ্টে পতিত হয়। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, যে-স্থলে শস্যহানি হইয়াছে, তত্রত্য লোকসংখ্যার শতকরা ৮০ জন কৃষিজীবী অধিবাসী শস্যহানির কষ্ট অনুভব করে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশের লোক এত অধিকসংখ্যক পরিমাণে কৃষিজীবী নহে। ভারতবর্ষের পর আমেরিকার অধিবাসিগণ অধিকপরিমাণে কৃষিজীবী। তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৪০জনের উপরে নহে। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার যদি শতকরা ৫০জন কৃষিজীবী হইত এবং অন্য ৫০জন শিল্পবাণিজ্যদ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিত, তবে কোন বৎসরে শস্যহানি-জনিত কষ্ট এত ভীষণ হইত না। এই কৃষকসম্প্রদায়কে রক্ষা করিতে হইলে ইহাদের মধ্যে স্বল্প আয়ের কৃষকদিগকে শিল্পকার্য্যে অর্থাৎ কলকারখানা স্থাপন করিয়া ইহাদিগকে মজুরের কাজে নিয়োগ করিতে হইবে। এই শিল্পকার্য্যে যাহাতে তাহাদের আয় কৃষির আয়ের সমতুল্য বা ততোধিক হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের ধনকুবেরগণ তাহাদের ধনরাশি পরহস্তে সম্প্রদান না করিয়া স্বস্ব হস্তে শিল্পকার্য্যে নিয়োগ করিলে বহু-সংখ্যক দরিদ্র কৃষক ও মধ্যবর্ত্তী ভদ্রসন্তান-দিগকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইবেন। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যে সকল কৃষক কৃষি ছাড়িয়া শিল্পকার্য্যে নিযোজিত হইবে, তাহাদের জমি কে চাষ করিবে? এবং তজ্জন্য খাদ্যশস্যের হ্রাস হইলে কিরূপে দুর্ভিক্ষ শাসন করা যাইবে? আমাদের মতে পূর্ব্ব-কথিতরূপে শিক্ষিতব্যক্তির হস্তে কৃষিকার্য্যের ভার অর্পিত হইলে তাহারা আধুনিক বৈজ্ঞানিকপ্রণালীতে অল্পসংখ্যক মজুরের দ্বারা অধিক জমি কর্ষণ ও অধিকপরিমাণে শস্য উৎপন্ন করিতে সক্ষম হইবে। আমাদের দেশে কৃষি অজ্ঞলোকের হস্তেই ন্যস্ত। তাহারা যাহা দেখিয়াছে, তাহা বেশ করিতে পারে; কিন্তু যাহা দেখে নাই, তাহা কিরূপে করিবে? তাহারা পুস্তক বা খবরের কাগজ পড়িয়া ভিন্ন-দেশের নূতন তত্ত্বের বিষয় কিছুই জানিতে পারে না। তাহারা গোবর ও স্থানে স্থানে খোল ব্যতীত কোন সারের নামই শুনে নাই। সোরা ও হাড় যে অতি উৎকৃষ্ট সার, তাহা এদেশের কয়জন জানে। আমে-রিকায় অনেক কৃষিযন্ত্র আছে, তাহা দ্বারা দশজন মজুরের কার্য্য একজন মজুর করিতে সক্ষম হয়। এক শস্যের কোন জাত্ অন্য জাত্ অপেক্ষা অধিক শস্য উৎপন্ন করিতে পারে। এই সকল বিষয় অবগত হইয়া উৎপন্ন বস্তুর পরিমাণবৃদ্ধি ও ইহার ব্যয়হ্রাস করা অজ্ঞব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে

না। যতদিন পর্য্যন্ত দরিদ্র কৃষকদিগকে কল-কারখানায় নিয়োগ করিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতি করা না যায়, ততদিন তাহাদিগকে তাহাদের কার্য্যের সময়ে অল্পসুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। তাহাদিগকে প্রতি টাকায় অন্যূন এক-আনা সুদে টাকা কর্জ্জ করিতে হয়। তাহারা অতি কষ্টে কোন-প্রকারে সুদ পরিশোধ করে, কিন্তু আসলের টাকা আর কিছুতেই শোধ হয় না। প্রত্যেক গ্রামে কৃষিসমিতি স্থাপন করিয়া প্রজাদিগকে অল্পসুদে টাকা ও বীজ বিতরণের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

পাটের সহিত ম্যালেরিয়াব কি সম্বন্ধ। পাটচাষের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, পাটের চাষে ম্যালেরিয়ায় দেশ ডুবিয়া যাইতেছে। পাটচাষের সহিত ম্যালেরিয়ার ঘনিষ্ঠতা আছে কি না, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, যে যে স্থলে পাট জন্মে, তাহার সকলস্থানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব নাই। মৈমনসিংজেলার মধ্যে জামালপুর ও সরিষাবাড়ীতে, ঢাকার মধ্যে বিক্রমপুরে, ফরিদপুর-মধ্যে শিবচর ও পালং থানায়, ত্রিপুরার মধ্যে চাঁদপুরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাট জন্মে, কিন্তু এই সকল স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দৃষ্ট হয় না। রংপুরের মধ্যে গাইবান্ধায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাট জন্মে, কিন্তু গাইবান্ধা ব্যতীত রংপুরের অন্যান্য স্থান ম্যালেরিয়ায় আচ্ছন্ন। আসাম ম্যালেরিয়ার স্থায়ী আবাস। আসামের মধ্যে একমাত্র গোয়ালপাড়া-জেলাতেই অধিক পাট জন্মে, কিন্তু সেখানেও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব নাই। আমি গোয়ালপাড়ায় কখন যাই নাই, তবে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্মেণ্টের কৃষিবিভাগের বহুদর্শী সহকারী ডাইরেক্টর রায় বাহাদুর ভূপালচন্দ্র বসু মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন যে, গোয়ালপাড়া অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। দ্বিতীয়ত যে যে স্থলে পাট জন্মে না, তাহারও বহুস্থল ম্যালেরিয়ায় আচ্ছন্ন। রাঢ়-দেশে পাট জন্মে না, কিন্তু তথায় ম্যালেরিয়ার খুব প্রাদুর্ভাব। শাহাবাদজেলায় খালের নিকটবর্ত্তী স্থানে এখন ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিয়াছে। সেখানে কিন্তু পাটের হাওয়া পর্য্যন্ত পৌছে না। মতিহারিজেলার টেরাইয়েও (পাহাড়ের তলা) পাটের হাওয়া পৌছে না, কিন্তু এস্থানও ম্যালেরিয়ায় আচ্ছন্ন। এইরূপ অবস্থায় পাটের স্কন্ধে ম্যালেরিয়ার দোষারোপ করা সঙ্গত হইতে পারে না। যে স্থলে জলনিকাশের ব্যবস্থা নাই কিংবা যে স্থল জঙ্গলাদিতে আচ্ছন্ন থাকায় তথাকার ভূমি শীঘ্র শুষ্ক হয় না, সেই সেই স্থলেই সাধারণত ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। রেলওয়ে এবং জলসেচনের খাল প্রস্তুত করায় অনেকস্থলের জলনিকাশের স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ হওয়ায় তথায় এখন ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়। ৪০।৫০বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার লোক বর্দ্ধমানে স্বাস্থ্যলাভ করিতে যাইত। এক্ষণে ম্যালেরিয়ার ভয়ে বর্দ্ধমানে কেহ পদার্পণ করিতে চায় না। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করি যে, পাট-পচানোয় কোন কোন স্থানের পানীয়জল অব্যবহার্য্য হয়। তজ্জন্য পেটের পীড়া, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে। এরূপস্থলে পুষ্করিণী বা কূপ খনন করিয়া পানীয়জলের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মূলকথা, অগ্রে অন্নচিন্তার ব্যবস্থা, পরে স্বাস্থ্যলাভ।

পাট কি কৃষকদিগকে বিলাসী করিতেছে? পাটচাষের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ এই যে, পাট কৃষকদিগকে বিলাসী করিয়া তুলিতেছে—তাহারা এখন ভাল কাপড় পরে, অঙ্গে অঙ্গরক্ষা ধারণ করে, এবং বড় বড় ইলসামাছ কিনিয়া টাকার অপব্যয় করে। এই অভিযোগ অতি অসার। লোকে স্বভাবের গতি অবরোধ করিতে পারে না। লোক ধনবান্ হইলে তাহার বেশভূষা ও সুস্বাদু আহারের জন্য স্বভাবতই আকাঙ্ক্ষা জন্মে। যে এই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে অক্ষম, সে ব্যক্তি ঘৃণিত কৃপণ। অর্থেই লোকের সভ্যতাবৃদ্ধি করে। পাটের চাষে প্রজা অর্থশালী হইলে সে কিরূপে ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া লোকসমাজে উপনীত হয়? তৎপরে দৈবঘটনায় তাহার অবস্থার অবনতি ঘটিলেও তাহাকে বাধ্য হইয়া দেনা করিয়াও লোকসমাজে তাহার পূর্ব্বগৌরব রক্ষা করিতে ব্যস্ত হইতে হয়। বঙ্গদেশীয় প্রজার এই গৌরবের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক এবং ইহা দ্বারা তাহারা অচিরাৎ উন্নতিসোপানে অধিরোহণ করিবে, আশা করা যায়। কোন নিরন্ন ভদ্রলোককে কন্যার বিবাহ বা পিতামাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দেনা করিয়াও ব্যয় করিতে হয় কেন? কারণ, তাহার মানসম্ভ্রমরক্ষার জন্য ইহা না করিলে চলে না। বঙ্গদেশীয় প্রজাগণ, মানসম্ভ্রমরক্ষা না হউক, ইহা লাভ করিবার নিমিত্ত কখন-কখন কিছু অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া ফেলে। ইহাতে তাহারা নিন্দনীয় হইতে পারে না। ইউরোপীয় এই-শ্রেণীর লোক দৈনিক ৩৲ টাকা উপার্জ্জন করিলে প্রায় ২৲ টাকা মদিরাপান করিয়া উড়াইয়া দেয়। হিন্দুস্থানী বহু কৃষক পানাসক্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশের হিন্দু ও মুসলমান প্রজা এক কপর্দ্দকও কখন মদিরায় ব্যয় করে না।

পাটের বাণিজ্য।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ হইতে পাট প্রথম বিলাতে রপ্তানী করা হয়, তৎপূর্ব্বে বঙ্গদেশে অতি সামান্যভাবে পাটচাষ হইত। ইদানীং ইউরোপের নানা দেশে ও আমেরিকায় পাটের ব্যবহার এত অধিকপরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে যে, প্রতিবৎসর পাটের আবাদ বৃদ্ধি করিয়াও অভাবমোচন হইতেছে না। গতবৎসর বাঙ্‌লা ও আসাম প্রদেশে প্রায় ৪২৫লক্ষমণ (৮৫লক্ষ-বস্তা) পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯০০ সনে ৩২৫লক্ষমণ পাট উৎপন্ন হয়। এই ৬ বৎসরে ১০০লক্ষমণ অধিক পাট উৎপন্ন হইয়া থাকিলেও ইহার মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এই বৎসর কলিকাতায় উৎকৃষ্ট পাট প্রতিমণ ১৪৲ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। দুইবৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় উৎকৃষ্ট পাটের দর ৬।৭ টাকা ছিল। ২০বৎসর পূর্ব্বে পাটের দর ৩৲ টাকার অধিক ছিল না। ইহার মূল্য যে শীঘ্র ৮৲ টাকার কম হইবে, তাহা বোধ হয় না। ইহাতে প্রজাগণ ধান অপেক্ষা পাটের চাষে বিশেষ মনোযোগ দিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

বঙ্গদেশে পাটের শিল্পও বর্ত্তমানসময়ে বিলক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে উৎপন্ন ফসলের প্রায় অর্দ্ধপরিমাণ বঙ্গদেশীয় কলে ব্যবহৃত হইতেছে। ১৮৯৬ সনে পাটকলে মাত্র ৯,৮৪১টি তাঁত ছিল, ১৯০৬ সনে তাঁতের সংখ্যা ২৩,৮৮৪ হইয়াছে। বহুসংখ্যক লোক পাটকলে খাটিয়া ও পাটের ব্যবসা করিয়া

জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের কৃষকশ্রেণীও পাটচাষ করিয়া উত্তরোত্তর অবস্থার উন্নতিসাধন করিতেছে। ১৯০৬ সনে প্রায় ৩৭ক্রোর টাকার পাটের কারবার হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রায় ২০ক্রোর টাকা প্রজার ঘরে আসিয়াছে। বঙ্গদেশ ব্যতীত আর কোথাও পাট জন্মে না। বঙ্গদেশ আর কিছুদিন পাট আয়ত্তাধীন রাখিতে পারিলে, বঙ্গদেশের প্রজাবৃন্দের সৌভাগ্য বহুপরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

ভারতবর্ষ বিদেশের সহিত যত বাণিজ্য-দ্রব্যের আদানপ্রদান করে, তাহা বিচার করিলে দেখা যায় যে, ইহাতে ভারতের উৎপাদিকা শক্তি দিনদিন হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। কারণ, ভারতবর্ষ হইতে যে খাদ্যশস্য বা তৈলযুক্ত বীজ বিদেশে যায়, তাহার বিনিময়ে ভারতবর্ষ সূত্র, লৌহ, কাঁচ, চিনি প্রভৃতি অসার পদার্থ প্রাপ্ত হয়। নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস্ ও পটাস্ নামক পদার্থত্রয়ই প্রধানত ভূমির দুর্লভ সার। অন্যান্য পদার্থ ভূমিতে যথেষ্টরূপে বিদ্যমান আছে। খাদ্যশস্য, তৈলবীজ ও ডালকড়াই বিদেশে পাঠাইলে ইহাদের সহিত উক্ত তিন পদার্থই ভারত হইতে দিনদিন লুপ্ত হয়। পাট, তূলা, চিনি, তৈল, পালো প্রভৃতি পদার্থে উক্ত সার পদার্থত্রয় থাকে না। সুতরাং মৃত্তিকার উর্ব্বরতাসম্বন্ধে বিচার করিলে ইহারা অসার। সুতরাং পাট ও তূলা বিদেশে রপ্তানি করা ভারতবর্ষের পক্ষে অলাভের কথা হইতে পারে না। পাট বিক্রয় করিয়া রেঙ্গুন হইতে চাল-ডাল আনয়ন করিলে ভারতবর্ষের লাভ। এই সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনা করিয়া যেদিন ভারতবর্ষ বহির্বাণিজ্যের আদানপ্রদান করিবে, সেদিন কল্পনার দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না। পাট-চাষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করিয়া যাহাতে উপযুক্ত-সার-প্রয়োগে ইহার ফসলের পরিমাণ-বৃদ্ধি হয় এবং যাহাতে পাটের বহির্বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার বিহিত চেষ্টা করিলে দেশের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী।

নির্ব্বাক্।

আমার অনন্ত ব্যথা ছাড়া পেতে চায়
অর্থহীন, অর্থভরা অজস্র ভাষায়,
তবুও যখনি কিছু বলিবারে যাই,
অশ্রুজলে কোন কথা খুঁজিয়া না পাই!

নির্ব্বাণ।

এত শিশুমুখ, এত স্নেহের বচন
এ রুদ্ধ হৃদয়দ্বার করে না মোচন,
সেথায় পশে না আর কোন হাসিগান,
কোন আলো, কোন ছায়া,—সকলি নির্ব্বাণ।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

কবিতাসম্বন্ধে দুইচারিটি কথা। *

অদ্য আপনাদের নিকট কবিতাসম্বন্ধে কয়েকটি কথা নিবেদন করিতে সাহসী হইতেছি। আমার দুঃসাহস, সন্দেহ নাই—কারণ, বক্ষ্যমাণ-বিষয়-সম্বন্ধে বলিবার অধিকার যথার্থ কাব্য-রসগ্রাহী ভিন্ন আর কাহারও হইতে পারে না। যথার্থ কাব্যরসসম্ভোগ আবার কেবল-মাত্র উদার নির্ভীক বীরহৃদয় ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভবে। আমি অযোগ্য হইলেও আপনাদের সহৃদয়তা এবং সহিষ্ণুতায় আশ্বস্ত হইয়া দুইচারিটি কথা নিবেদন করিতে উদ্যত হইয়াছি। আশা আছে, আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া প্রবন্ধের কথিত বিষয়টিকে আমি যে-ভাবে বলিতে চেষ্টা করিব, আপনারা আপনাদের সহানুভূতি দিয়া সেইভাবে গ্রহণ করিবেন। হয় ত আমার অযোগ্যতাবশত আমার বক্তব্য ভালরূপে বুঝাইতে সক্ষম হইব না, সেই ভয়ে এ কথা বলিতেছি।

কবিতাসম্বন্ধে আমি কি বিষয়ে বলিতে চাই, তাহার একটা আভাস এস্থলে দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি। আমি ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদি যাহা লইয়া কবিতার বিশ্ব-বিমোহিনী মূর্ত্তি গঠিত হয়, সে বিষয়ে আলোচনা করিব না। কবিতার প্রাণস্বরূপ যে অন্তরতম ভাব—যাহা সর্ব্বদেশের সর্ব্ব-কালের যথার্থ কবিদিগের রচনায় মানবভাষার দারিদ্র্যবন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার শুভ্র-জ্যোতিতে আপনি বিভাসিত হইয়া উঠে, যাহা বিশ্বের পুরাতন সত্যগুলিকে প্রত্যহ নবীন নবীন মূর্ত্তিতে মানবনয়নের সম্মুখে ধারণ করিয়া প্রকৃতির সহিত মানবহৃদয়ের অচ্ছেদ্য নিবিড়সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয়—সেই অন্তরতম ভাব আমার পঠিত কোন্ কোন্ কবির রচনায় আমি কি ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি, তাহারই সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

যাঁহার নাম করিতে হইলে দীর্ঘ ভূমিকার আশ্রয় লইতে হয় না, সেই বাংলার কবি শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথের রচনা অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের অবতারণা করিব। তাঁহার কাব্যগ্রন্থাবলীর ১৩১০ সালে যে নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, সম্পাদক ৺মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয় তাহার ভূমিকায় একস্থলে লিখিয়াছেন—"যে কবিতা অনির্ব্বচনীয়তায় সঙ্গীতের যত সদৃশ, এবং যে কবিতায় পাঠক মানবজীবনের প্রসার যত অধিক অনুভব করেন, তাহা তত শ্রেষ্ঠ"। পুনশ্চ—"যিনি জীবনের একটি সামান্যতম সত্যকে পরিস্ফুট ও সুন্দর করিয়া তুলিতে পারেন, তিনি কবি,—কিন্তু উচ্চতর কবি, তিনি, যাঁহার কবিতায় সমগ্র মানবজীবনের সুগম্ভীর বিজয়গীতি শ্রুত হয়"। অতি সত্য কথা! রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধ কবি নহেন, তিনি শ্রেষ্ঠকবি।

* ভাগলপুর শাখা সাহিত্যপরিষদে গত অগ্রহায়ণমাসে পঠিত। অল্প পরিবর্ত্তিত।

তাঁহার অমরতুলিকায় তিনি যে সৌন্দর্য্য অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সঙ্কীর্ণ নহে, তাহা বৃহৎ—তাহা বিপুল—তাহা উদার। তাহা সমগ্র বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য্যের আভাস আমাদের বিস্ময়বিহ্বল নয়নের সম্মুখে ধারণ করে। যাঁহারা তাঁহার রচনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই মোহিনী শক্তির পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহার যে সকল কবিতায় সৌন্দর্য্যের যে-কোন বিশেষমূর্ত্তির সহিত নিবিড় স্নেহ-পরিচয় লাভ করা যায়, সকলগুলিতেই এক অখণ্ড পূর্ণসৌন্দর্য্যের ইঙ্গিত আছে। এই লক্ষণই শ্রেষ্ঠ কবিত্বের লক্ষণ। ইহারই প্রেরণায় বসন্তদেব সগর্ব্বে বলেন—

"আমি ঋতুরাজ।
জরা মৃত্যু দুই দৈত্য নিমেষে নিমেষে
বাহির করিতে চাহে বিশ্বের কঙ্কাল,
আমি পিছে পিছে ফিরে' পদে পদে তারে
করি আক্রমণ; রাত্রিদিন সে সংগ্রাম।
আমি অখিলের সেই অনন্তযৌবন।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিপুল পূর্ণস্বর বংশীধ্বনির সঙ্কেতে সৌন্দর্য্যের যবনিকার পর যবনিকা উন্মুক্ত করিয়া আমাদিগকে সেই বিশ্বের পুঞ্জীভূত সৌন্দর্য্যের রাজরাজেশ্বরের স্বর্ণকুহেলিকায় আবৃত মহারহস্যময় সিংহাসনের পদপ্রান্তে লইয়া যান। সৌন্দর্য্যের এই শ্রেষ্ঠ উপাসকের সঙ্গীতে আমরা প্রকৃতিদেবীর অজস্র স্নেহস্তন্যধারায় প্রবাহিত "সৌন্দর্য্য, প্রাণ এবং আনন্দে" পুষ্ট মানবাত্মার প্রসার ও পূর্ণতা অনুভব করি, এবং এই পূত উপাসনায় উৎসর্গীকৃত মানবজীবনের জন্মমরণভয়বর্জ্জিত জয়গান শুনিতে পাই।

কবির এই অন্তরতম ভাব, এই শ্রেষ্ঠ উপাসনা তাঁহার জীবনে কিরূপে ক্রমশ পরিণতিলাভ করিয়াছে, তাহা তাঁহার রচনার ভিতর দিয়া সজ্ক্ষেপত দেখিতে চেষ্টা করিব। নিয়মবদ্ধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে রচনাগুলিকে বিশ্লেষণ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। সে ক্ষমতাও আমার নাই। যে সত্যের বীজ সহজে এই মহাপ্রাণ মানবের হৃদয়ে অঙ্কুরিত এবং তাঁহার আনন্দে পুষ্ট হইয়া ফলপুষ্প-মঞ্জরীপরিশোভিত শ্যামস্নিগ্ধ গগনস্পর্শী মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়া তাঁহার কবিজীবন সার্থক করিয়াছে, সে সত্যের বিশ্লেষণ কিরূপে হইতে পারে, তাহা জানি না। কবিতার দেহের বিশেষণ হইতে পারে, তাহার প্রাণরূপী অন্তরতম ভাবের বিশ্লেষণ হইতে পারে না। সমধর্ম্মী বা বিপরীতধর্ম্মা অপর মহাভাবের সহিত তাহার তুলনা চলিতে পারে মাত্র।

এই পরিণতি দেখিতে গেলে দেখিতে পাই যে, প্রকৃতিমাতা তাঁহার অঞ্চলে সৌন্দর্য্য ও আনন্দের যে অসংখ্য কণারাশি তাঁহার স্নেহলালিত সৌভাগ্যবান্ সন্তানগুলির জন্য ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, আমাদের কিশোর কবি সেইগুলির এক একটিকে দেখিতেছেন আর বিহ্বলহর্ষে সৌন্দর্য্যের প্রতিঘাতজনিত ভাবরাশি পান করিতেছেন। এই হর্ষ বৃহত্তর আনন্দের ছায়া আনিয়া দিতেছে। কিন্তু সেই বৃহত্তর আনন্দের—বিশ্বের সংহত সৌন্দর্য্যের প্রতিঘাতজনিত বৃহত্তর আনন্দের—দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে তাঁহার অবসর নাই। কি আনন্দে এই বিশ্লিষ্ট সৌন্দর্য্যকণাগুলির প্রাণের সঙ্গে আপনার প্রাণ মিশাইতেছেন, তাহা এই কয়টি ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে।—

"মেঘগরজনে বরষা আসিবে,
মদিরনয়নে বসন্ত হাসিবে,
বিশদবসনে শিশিরমালা—
আসিবে হাসিবে শরতবালা—
কূলে কূলে মোর উছলি জল
কুলুকুলু ধোবে চরণতল।
কূলে কূলে মোর ফুটিবে হাসি
বিকশিত কাশকুসুমরাশি।
দূরে দূরে কভু বাজিবে বাঁশী
মূরছি পড়িবে মলয়বায়!
দুরুদুরু মোর দুলিবে হিয়া
শিহরিয়া মোর উঠিবে কায়।"

ইহা ব্যতীত কবি এখন সৌন্দর্য্যকে দেখিতেছেন, তাহাতেই বিহ্বল হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু সুন্দরকে দেখেন নাই। সৌন্দর্য্যকেই আপনার সহজ আনন্দদ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতেছেন; যিনি নিখিল সৌন্দর্য্যের প্রাণরূপী, তাহার দর্শন এখনও হয় নাই। সাধক ভক্ত প্রথমে প্রতিমাপূজা আরম্ভ করিয়াছেন,—জীবনের তরুণ প্রভাতে শ্রদ্ধার চন্দনে নির্ম্মল ললাট ভূষিত করিয়া আপনার দিব্যশঙ্খ বাজাইয়াছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে কাহার বিপুল আহ্বানবাণী শুনিয়া দূরাগত-বংশীধ্বনি-শ্রবণে চকিত মৃগের ন্যায় আকুল হইয়া বলিয়া উঠিতেছেন—

"ডাকে যেন—ডাকে যেন—সিন্ধু মোরে
ডাকে যেন।
আজি চারিদিকে মোর কেন কারাগার হেন!
ঐ যে হৃদয় মোর আহ্বান শুনিতে পায়,—
'কে আসিবি কে আসিবি কে তোরা
আসিবি আয়।
পাষাণবাঁধন টুটি ভিজায়ে কঠিন ধরা
বনেরে শ্যামল করি ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা
সারা প্রাণ ঢালি দিয়া জুড়ায়ে জগতহিয়া
আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবি আয়
তোরা।'
আমি যাব আমি যাব—কোথায় সে কোন্ দেশ
জগতে ঢালিব প্রাণ গাহিব করুণাগান;
উদ্বেগ-অধীর হিয়া, সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব আর সে গান করিব শেষ।"

যৌবনে দেখিতে পাই, সৌন্দর্য্যের প্রতিমা তাহাকে পূর্ণভাবে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। এখন আর কেবল বিশ্লিষ্ট সৌন্দর্য্য তাঁহার অর্চ্চনা আকর্ষণ করে না। এখন বিশ্বের যেখানে যত মানবদৃষ্টিগম্য সুষমা আছে, সমস্ত জমাট বাঁধিয়া মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহার অর্চ্চনা গ্রহণ করিতেছে। এই অর্চ্চনা প্রকৃতির ললামভূতা মহিমময়ী নারী পুরুষের নিকট যে অর্চ্চনা পান, সেই অর্চ্চনা। এখানে সাধক সময়ে সময়ে এত আত্মবিস্মৃত যে, ব্যাবহারিক জগতের অন্যান্য কার্য্যকলাপের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার অবসর নাই। কেবল অসীম নির্জ্জন সৃষ্টি করিয়া মানসী প্রতিমার সহিত মিলনের অসহ্য আনন্দ শিরায় শিরায় অনুভব করিতেছেন। উদ্বেগজড়িত কম্পিত-স্বরে "আজন্মসাধন ধন আলোকবসনা বাসনা-বাসিনী মানসরূপিণী"কে বলিতেছেন—

"শুধু ঢেকে দাও
"আমার সর্ব্বাঙ্গমন তোমার অঞ্চলে
সম্পূর্ণ হরণ করি লহ গো সবলে
আমারি আমারে; নগ্নবক্ষে বক্ষ দিয়া
অন্তররহস্য তব শুনে নিই প্রিয়া।

তোমার হৃদয়কম্প অঙ্গুলির মত
আমার হৃদয়তন্ত্রী করিবে প্রহত।
সঙ্গীততরঙ্গধ্বনি উঠিবে গুঞ্জরি
সমস্ত জীবন ব্যাপি' থরথর করি।"

পুনশ্চ—

"কার এত দিব্য জ্ঞান
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ,
পূর্ব্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কিনা তুমি
আমার জীবনবনে সৌন্দর্য্যে কুসুমি—
প্রণয়ে বিকশি ? মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু একঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হ'য়ে গেছ, প্রিয়ে
তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে!
ধূপ দগ্ধ হ'য়ে গেছে গন্ধবাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার।
গৃহের বনিতা ছিলে টুটিয়া আলয়—
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়।"

অবশ্য এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কবি-জীবনের এই অংশের রচনা সমস্তই এই সৌন্দর্য্যের প্রতিমাকে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করিয়া পূজা নহে। তবে এই সময়ের উল্লেখযোগ্য সমস্ত রচনাই এই ভাবে অনুপ্রাণিত। কবির স্বর্ণলেখনীপ্রসূত "সমুদ্রের প্রতি", "বসুন্ধরা", "উর্ব্বশী", "সোনার তরী", "নিরুদ্দেশ যাত্রা", "স্বর্গ হইতে বিদায়" ইত্যাদিতে এই মহাভাবের প্রতিধ্বনি স্পষ্ট ধ্বনিত হইতেছে শুনিতে পাওয়া যায়। যৌবনের পূর্ণ আবেগের সহিত সৌন্দর্য্যসম্ভোগের চিহ্ন বিশদভাবে অঙ্কিত।—কোথাও বা প্রিয়া-বিরহব্যথায় ব্যথিত হৃদয়ের তপ্ত অশ্রুজল,—কচিদ্বা বুভুক্ষিত হৃদয়ের বিরহান্ত মিলনের দুর্জ্জয় আনন্দোচ্ছ্বাস।

এই সময়ের রচনাগুলির মধ্যে আর একটি অপূর্ব্বরহস্যময় অথচ ভারতবাসীর চির-পরিচিত ভাব ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। কৈশোরে যাঁহার আহ্বানবাণী খেলাঘরের খেলার অবকাশে শুনিতে পাইয়া ত্রস্তনেত্রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন—এখন সেই আহ্বানকারী দেবতাকে নিখিলবিশ্বের প্রাণের ভিতর এবং আপন মানবাত্মার গূঢ়তম আনন্দের ভিতর যেন তিনি অনুভব করিতেছেন;—যিনি সুন্দর, বিশ্বের সমগ্র সৌন্দর্য্য যাঁহার অঙ্গ, যিনি চিরপুরাতন হইয়াও ঋষিগণের নিকট, কবিগণের নিকট নিত্যনূতন, তাঁহাকে যেন অন্তরে-বাহিরে দেখিতে পাইতেছেন। তাই জগতের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী—
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীলগগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুলকাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চলচরণে,
তুমি চঞ্চলগামিনী।
মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে,
অলকগন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে,
মধুর নৃত্যে নিখিলচিত্তে বিকাশে
কত মঞ্জুলরাগিণী।
কত না বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত
কত যে ছন্দে কত সঙ্গীতে রটিত
কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত
তব অসংখ্য কাহিনী।
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।"

তাই আপনার নিভৃত হৃদয়ের দিকে

চাহিয়া অবাক্ হইয়া অন্তর্যামীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"রাখ কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ি!
আমার অর্থ তোমার তত্ত্ব
বলে দাও মোরে অয়ি!
আমি কি গো বীণাযন্ত্র তোমার
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূর্চ্ছনাভরে গীতঝঙ্কার
ধ্বনিছ মর্ম্মমাঝে।
আমার মাঝারে করিছ রচনা
অসীম বিরহ অপার বাসনা
কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদনা
মোর বেদনায় বাজে?"

বুঝিতে পারিতেছেন, বিশ্বের সমুদয় কথিত ও অকথিত বাণী উদ্দিষ্ট না হইয়াও তাহার উদ্দেশে ধাবিত হইয়া তাহারি পদপ্রান্তে সফলতালাভ করে। তাই সেই জীবন-দেবতাকে নিতান্ত নির্ভরের সহিত বলিতেছেন—

"যা-কিছু আমার আছে আপনার
শ্রেষ্ঠধন
দিতেছি চরণে আসি
অকৃত কার্য্য অকথিত বাণী অগীত গান
বিফল বাসনারাশি।
ওগো বিফল বাসনারাশি
হেরিয়া আজিকে ঘরে পরে সবে
হাসিছে হেলার হাসি।
তুমি যদি দেবি লহ কর পাতি
আপনার হাতে রাখ মালা গাঁথি
নিত্য নবীন রবে দিনরাতি
সুবাসে ভাসি
সফল করিবে জীবন আমার
বিফল বাসনারাশি।"

এই ভাবের রচনাগুলির ভিতর দিয়া আমরা এই কবিজীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করি। আমরা দেখিতে পাই, কবি যৌবনে প্রকৃতির দ্রাক্ষাকুঞ্জ নিষ্পীড়িত করিয়া ঝলকে ঝলকে যে সুবর্ণমদিরা পান করিয়াছেন, সেই মদিরা অমৃতকণায় সম্পৃক্ত ছিল। এই অমৃতের আস্বাদ যৌবনাপগমেও তাঁহাকে নূতন জীবনে সঞ্জীবিত করিয়াছে। ইহাই আত্যন্তিক ভোগের অবসাদ হইতে তাঁহাকে ও তাঁহার পাঠকবর্গকে রক্ষা করিয়াছে। বিপুল তৃষ্ণায় সমগ্র বিশ্বের রসাস্বাদনের চেষ্টা অনাদ্যনন্ত বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণের সহিত আপনার প্রাণের সজাতীয়ত্ব অন্তরে-অন্তরে অনুভব করাইয়া তাঁহাকে অমর করিয়াছে। আমি ইহাকেই ভারতবর্ষের বিশেষভাব বলিতেছি। কবি ভারতবর্ষের যে বিশেষসম্পত্তি বেদান্তের সাধারণ অপব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া "মায়াবাদ"শীর্ষক" কবিতায় তীব্র বিদ্রূপের ভাষায় তাড়না করিয়াছেন, তাহারি অন্তর্নিহিত সনাতন সত্যের নিকট আপনি ধরা পড়িয়াছেন। এই মহাসত্য কোন্ ভাগ্যবানের নিকটে কি ভাবে কোন্ মার্গ অবলম্বন করিয়া আপনার শুভ্রজ্যোতিতে অন্তর-বাহির আলো করিয়া মূর্ত্তিমান্ হন, তাহা কে বলিবে। কি অপরূপ রূপ ধারণ করিয়া মোক্ষ সৌন্দর্য্যের এই উপাসকের হৃদয়দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা এই কয়টি ছত্রে প্রকাশ পায়—

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়!
অসংখ্যবন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার

মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়! প্রদীপের মত
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমারি মন্দিরমাঝে! ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন! সে নহে আমার!
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে!
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।"

মানবাত্মার এই স্বতোমুক্ত স্বভাব অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া কবি কি অপূর্ব্ব ঝঙ্কারের সহিত মানবজীবনের কালভয়সংহারিণী বিজয়-গীতি আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—

"যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
তাঁর কতমত ছিল আয়োজন
ছিল কত শত উপকরণ!
তাঁর লটপট করে বাঘছাল,
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে!
তাঁর বব্বম্ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!

শুনি শ্মশানবাসীর কলকল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ!
তাঁর বাম আঁখি ফুরে থরথর
তাঁর হিয়া দুরুদুরু দুলিছে!
তাঁর পুলকিত তনু জরজর
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে!
তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি কর
ক্ষ্যাপা বরেরে করিতে বরণ
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!

মরণ আসিতেছেন, তাঁহার "পিঙ্গলচ্ছবি মহাজট" গগন স্পর্শ করিয়াছে, রক্তাকাশে তাঁহারি "বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট" তরঙ্গিত হইতেছে, ভৈরব উল্লাসে মুমূর্ষুর "অবশবক্ষ-শোণিত" শেষবার দোলাইয়া চরাচর স্তব্ধ করিয়া তাঁহার পিনাক বাজিয়া উঠিয়াছে। যে সংসার পিতার কঠোরতা এবং মাতার স্নেহে এতদিন এই জীবকে ইহলোকের সর্ব্ব অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল—সেই সংসার এই মহাবিদায়ের দিনে হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু জীবাত্মা চিরপ্রত্যাশিত দয়িতের পদশব্দে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। প্রকৃতির বাধন আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। মিলনের আত্যন্তিক আগ্রহ বন্ধনগুলিকে একে একে মহাবলে ছিন্ন করিতেছে—আর প্রকৃতিগঠিত জড়দেহ থরথরে কাঁপিয়া উঠিতেছে।

মরণসম্বন্ধে কবি অপরস্থলে বলিতেছেন—

"জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে
এ আশ্চর্য্য সংসারের মহানিকেতনে,
সে ক্ষণ অজ্ঞাত মোর। কোন্ শক্তি মোরে

ফুটাইল এ বিপুল রহস্যের ক্রোড়ে
অৰ্দ্ধরাত্রে মহারণ্যে মুকুলের মত ?
তবু ত প্রভাতে শির করিয়া উন্নত
যখনি নয়ন মেলি' নিরখিনু ধরা
কনককিরণগাঁথা নীলাম্বর-পরা,
নিরখিনু সুখে দুঃখে খচিত সংসার,
তখান অজ্ঞাত এই রহস্য অপার
নিমেষেই মনে হোলো মাতৃবক্ষসম
নিতান্তই পরিচিত একান্তই মম !
রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি
ধরেছে আমার কাছে জননীমূরতি !

মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর ! আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে !

ওরে মূঢ় জীবন সংসার
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার
জনমমুহূর্ত্ত হ'তে তোমার অজ্ঞাতে,
তোমার ইচ্ছার পূর্ব্বে ? মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্ত্তে চেনার মত !

* * *

স্তন হ'তে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে
মুহূর্ত্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে !"

মরণকে এত সহজভাবে, এত সুন্দরভাবে—জীবনেরি পরিণতিরূপে ভারতবর্ষ বহুপুরাতন যুগ হইতে দেখিয়া আসিতেছে। ইহাই ভারতবর্ষের বিশাল সাধনার শ্রেষ্ঠ ফলগুলির অন্যতম। কিন্তু হায়, আজ কতগুলি ভাগ্যবান্ ভারতসন্তান মরণকে এইভাবে দেখিতে সক্ষম হন ?

সৌন্দর্য্যের উপাসনার চরমফল আমরা কবির অতুলনীয় রচনা "নৈবেদ্যে" দেখিতে পাই। আজন্ম সাধনাদ্বারা ভাব ও ভাষার যে অমল-ধবল কুন্দশুভ্র উপকরণ কবি সংগ্রহ করিয়াছেন, হৃদয়শোণিতার্জ্জিত সেই শ্রেষ্ঠ উপকরণদ্বারা গঠিত "নৈবেদ্য" লইয়া তাঁহার জীবননাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। এই পবিত্র দৃশ্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাদের বিদ্রোহোদ্ধত শির আপনি অবনত হইয়া আইসে। সম্ভ্রম-নম্রস্বরে বলিতে ইচ্ছা হয় —

"ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে জীবন সমর্পণ
ওরে দীন তুই জোড়কর করি কর্ তাহা দরশন।
ঐ যে আলোক পড়েছে তাঁহার
উদার ললাটদেশে
সেথা হ'তে তার একটি রশ্মি
পড়ুক মাথায় এসে।

**

শান্ত কর রে মন
ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে জীবন সমর্পণ।"

কবির রচনার ভিতর দিয়া ইতিপূর্ব্বে সঙ্ক্ষেপত যে ইতিহাস দেখাইতে অক্ষম-প্রয়াস করিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁহার জীবনের সেই ইতিহাস এই অমর কবিতার মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। তাঁহার জীবন-স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"নির্জ্জন শয়নমাঝে কালি রাত্রিবেলা
ভাবিতেছিলাম আমি বসিয়া একেলা
গত জীবনের কত কথা। হেন ক্ষণে
শুনিলাম, তুমি কহিতেছ মোর মনে ;—

ওরে মত্ত, ওরে মুগ্ধ, ওরে আত্মভোলা,
রেখেছিলি আপনার সব দ্বার খোলা,

চঞ্চল এ সংসারের যত ছায়ালোক,
যত ভুল, যত ধূলি, যত দুঃখশোক,
যত ভালমন্দ, যত গীতগন্ধ ল'য়ে
বিশ্ব পশেছিল তোর অবাধ আলয়ে।
সেই সাথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্যবার এসেছিনু নামি।
দ্বার রুধি জপিতিস্ যদি মোর নাম
কোন্ পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম!

তখন করি নি নাথ কোন আয়োজন:
বিশ্বের সবার সাথে হে বিশ্বরাজন্,
অজ্ঞাতে আসিতে হাসি আমার অন্তরে
কত শুভদিনে; কত মুহূর্তের পরে
অসীমের চিহ্ন লিখে গেছ! * *
* * * *
* * * *
হে নাথ, অবজ্ঞা করি যাও নাই ফিরে
আমার সে ধূলাস্তূপ খেলাঘর দেখে!
খেলামাঝে শুনিতে পেয়েছি থেকে থেকে
যে চরণধ্বনি - আজ শুনি তাই বাজে
জগতসঙ্গীতসাথে চন্দ্রসূর্য্যমাঝে!"

এই ইতিহাস বহুভাবে তিনি এই রচনায় বলিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না।—

স্বর্গ হইতে বুঝি সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র এই মহাপ্রাণ মানবের দুর্জ্জয় সৌন্দর্য্যপিপাসারূপ চিত্তবৃত্তির চরম পরিণতি দেখিতেছেন— আর তাঁহার ছায়াময় পবিত্র আনন আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

আমি এস্থলে নিবেদন করিতে চাই যে, আমি moralityর দিক্ হইতে কোন প্রসঙ্গ এই প্রবন্ধে উত্থাপন করিতেছি না। এই কবির রচনা আলোচনা করিতে যাইয়া যে সত্যটি তাঁহার জীবনে সহজে পরিণতিলাভ করিয়াছে ও ঐ রচনার ভিতরে আমি যাহার সহজ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তাহাই নিবেদন করিতেছি। মর‍্যালিটির দিক্ হইতে দেখিতে হইলে বোধ হয় আলোচনা করিতে হয়, কবিজীবনে এই সত্যের এইরূপ পরিণতি না হইলে কি হইতে পারিত। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই "কি হইতে পারিত"র রাজ্যে প্রবেশ করিয়া লাভ নাই। প্রকৃতিমাতার স্নেহাঞ্চল হইতে যে অসামান্য প্রতিভার দান আমরা এই কবির ভিতর দিয়া পাইয়াছি, তাহাই যথেষ্ট মনে করি।

কিন্তু "কি হইতে পারিত", ইহার নিষ্ফল আলোচনা না করিয়া যাহার জীবনে এই মহাসত্যের এই পরিণতি হয় নাই, এরূপ কোন মহাযশা বিদেশী কবির রচনায় এই পরিণতির অভাবে "কি হইয়াছে", তাহা দেখিতে বোধ হয় দোষ নাই। আমি অমরকবি শেলির কথা বলিতেছি। শেলির সৌন্দর্য্যোপাসনা বিশ্লিষ্ট সৌন্দর্য্যের উপাসনা। সময়ে সময়ে যখন তিনি কবিতার উচ্চতম আদর্শে উঠিয়াছেন, তখন দেখিয়াছেন বটে, একই বহু হইয়াছে- দেখিয়াছেন যে, এই এক আপনাকে সৌন্দর্য্যরূপে দেখিয়া এবং প্রেমরূপে সেই সৌন্দর্য্যের ভিতরে বহুধারায় প্রবাহিত হইয়া আপনাকে বৈচিত্র্যময় বহুত্বে পরিণত করিয়াছে। তাঁহার "Adonais"নামক কবিতার শেষ ভাবে এই উচ্চ আদর্শের পরিচয় পাই। কিন্তু এই ভাব তাঁহার জীবনে কখন বদ্ধমূল হয় নাই। তাঁহার দৈনিক ব্যাবহারিক জীবনেও নহে—তাঁহার সাধারণ কবিজীবনেও

নহে। এই অসামান্য কবি আপন প্রতিভা-ছায় প্রত্যেক বিশ্লিষ্ট সৌন্দর্য্যের মধ্যে এমন প্রাণ সঞ্চারিত করিয়াছেন যে, এপর্য্যন্ত পৃথিবীর অতি অল্পসংখ্যক কবিই ঐরূপ সৌন্দর্য্যবর্ণনায় তাঁহার সমকক্ষ হইয়াছেন—কিন্তু সৌন্দর্য্যের বহু অভিব্যক্তির অন্তরে তিনি একটি প্রাণের, একটি নাড়ীর স্পন্দন দেখেন নাই,—দেখিতে চানও নাই। প্রকৃতির মোহকরী পরিবর্ত্তনশীলতাই তাঁহাকে চিরকাল এতদূর মুগ্ধ রাখিয়াছিল যে, এই পরিবর্ত্তনশীল অভিব্যক্তির অন্তরে অপরিবর্ত্তনীয় সনাতন সত্যকারণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন। কবির অন্তরের এই ভাবই আমাদিগকে তাঁহার "Lift not the painted veil which those who live call life" এই উক্তির অর্থ বুঝাইয়া দেয়।

বহু অভিব্যক্তির মধ্যে একের দর্শনে অক্ষমতা বা অনিচ্ছা তাঁহাকে কোথায় লইয়া গিয়াছিল, তাহা দেখিতে হইলে তাঁহার রচিত "Triumph of Life" নামক কবিতাটি পাঠ করিতে হয়। প্রকৃতির অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিয়া সত্যজ্ঞানের উপলব্ধিদ্বারা মুক্ত মানবাত্মা যে দুঃখমরণভয়রহিত জয়াস্বাদ সম্ভোগ করে, তাহা এই "triumph"শব্দে সূচিত হয় নাই। শেলি যে অর্থে ইহা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা উক্ত অর্থের ঠিক বিপরীত। জীবনের দুর্জ্ঞেয় বা অজ্ঞেয় প্রহেলিকাকর্ত্তৃক প্রকৃতির নিদারুণ রহস্যাবরণের উন্মোচনে চেষ্টিত মানবের যে পরাভব, তাহাই এই triumphশব্দে সূচিত হইয়াছে। এস্থলে মানব বিজয়ী নহে—জীবনের নির্দ্দয় প্রহেলিকাই মানবকে অভিভূত করিতেছে। এই নির্দ্দয় Life the conqueror বা বিজয়ী জীবনসমস্যাকে কবি তাঁহার অলোকসামান্য কল্পনাদ্বারা কি ভীষণরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বক্ষ্যমাণ কবিতাটি না পাঠ করিলে উপলব্ধি করা যায় না।

শ্যামশোভাবর্জ্জিত ধূলিময় পথে আপনার ভীষণ হিমরশ্মিদ্বারা সুখোজ্জ্বল সূর্য্যকিরণের মধুরতা ও উত্তাপ নষ্ট করিয়া এক রথ চলিতেছে। তদুপরি স্থবিরবৎ বক্রদেহ জীবন আপাদমস্তক কৃষ্ণবস্ত্রে আবরিত করিয়া গোরস্থানের প্রতিকৃতির ন্যায় বসিয়া আছেন। অন্ধ চতুর্ম্মস্তক কাল এই রথের সারথি—সেইজন্য এই রথের গতি লক্ষ্যহীন। জীবন স্বয়ংও এই লক্ষ্য অবগত নহেন। রথাগ্রে যৌবনমত্ত মানব-মানবী উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে করিতে ছুটিয়াছে। তাহারা যৌবনসুখের উদ্দাম উপভোগদ্বারা জীবনের রহস্য অবগত হইতে চাহে। রথের পশ্চাতে যৌবনের সুখসম্ভোগে অতৃপ্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বার্দ্ধক্যহেতু খঞ্জের ন্যায় কুৎসিতভাবে নৃত্য করিতে করিতে রথের পশ্চাদ্ধাবিত হইতে বৃথা প্রয়াস করিতেছে। দেখিতে দেখিতে অগ্রগামী যুবক-যুবতীগণ দলে দলে জীবনের রথচক্রে ধৃত হইয়া চক্রতলে নিষ্পিষ্ট ও নিতান্ত নিরর্থক দুর্গন্ধময় ফেনপুঞ্জে পরিণত হইয়া এই ভীষণ পথের ধূলার সহিত মিশিতেছে।

আবার কতকগুলি হতভাগ্য মানব রথসংযুক্ত শৃঙ্খলে নিবদ্ধ এবং রথকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া দাসবৎ চলিতেছে। হায়, এই হতভাগ্যেরা কেহ বা জ্ঞানী, কেহ বা কর্ম্মবীর বলিয়া যশস্বী ছিল। কিন্তু বার্দ্ধক্যে জ্ঞান বা কর্ম্মের নিষ্ফলতা উপলব্ধি করিয়া ইহাদের

অন্তরে সেই পুরাতন প্রশ্ন উঠিয়াছিল—"অন্ধ-কাল-নিযোজিত-রথারূঢ় ভীষণ রহস্যে আবৃত জীবন কি?" এই প্রশ্নের মীমাংসায় অক্ষম হইয়া, জীবনের নিদারুণ রহস্যকর্ত্তৃক বিজিত হইয়া তাহারা মহা-অন্ধকারে ডুবিয়া গেল—এই রহস্যের দাস চিরকালের জন্য রহিয়া গেল।

বাল্যে, কৈশোরে ও যৌবনে যে অনবদ্য সৌন্দর্য্যপ্রতিমা কবিজীবনের অবলম্বনস্বরূপা ও পথপ্রদর্শয়িত্রী, বয়োবৃদ্ধির সহিত কবির অন্তরেও এই প্রশ্নের আবির্ভাবহেতু কিরূপে সেই সৌন্দর্য্যপ্রতিমা কবিনয়নসম্মুখে অস্পষ্টতর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ একেবারে অপসৃতা হন এবং শেষে ভীষণহিমরশ্মিমণ্ডিত-লক্ষ্যহীন-রথারূঢ় জীবনসমস্যাই কবির সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে, তাহাও এই কবিতায় তিনি দেখাইয়াছেন। আরও তিনি দেখিয়াছেন যে, যে মানব যত অধিক কল্পনা বা চিন্তার দান সংসারে বিলাইয়াছে, সে তত শীঘ্র বলহীন ও সৌন্দর্য্যভ্রষ্ট হইয়া জীবনের পথপার্শ্বে অপবিত্র ধূলার সহিত মিশিয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় কবি অধীর হইয়া বলিয়া উঠিয়াছেন—"Then what is life?"—"তবে এই জীবন কি?" এই জিজ্ঞাসা তাঁহার শেষ জিজ্ঞাসা। ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ কবিতার শেষ ছত্র। এই প্রশ্নের দারুণ ব্যথা লইয়া ইহজীবন হইতে তিনি বিদায় লইয়াছেন।

আক্ষেপের সহিত বলিতে ইচ্ছা হয়—হায়, কবি যে ভূমা চৈতন্যের আস্বাদ জীবনের কোন কোন শুভমুহূর্ত্তে পাইয়াছিলেন, তাহা যদি তাঁহার জীবনে বদ্ধমূল হইত।

আমরা এইস্থলে "যে কবিতায় পাঠক মানবজীবনের প্রসার যত অধিক অনুভব করেন, তাহা তত শ্রেষ্ঠ" এই উক্তি পুনরায় স্মরণ করিব। "জীবনের প্রসার" শব্দে চৈতন্যের বহুব্যাপিত্ব এবং সেইহেতু কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তার সূচিত হইয়াছে, মনে করি। এইজন্য প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মহাসত্যগুলিকে যিনি যত অধিক দিক্ হইতে উপলব্ধি করিয়া মানবনয়নের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তিনি তত শ্রেষ্ঠ। এই সূত্র ধরিয়া আলোচনা করিলে বোধ হয় আমরা দেখিতে পাই যে, রবীন্দ্রনাথ সুখের দিক্ হইতে, সৌন্দর্য্যসম্ভোগজনিত সুখের অনুভূতিদ্বারা বিশ্বের সনাতন সত্যের পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতি মোহিনীও বটেন, ভীষণাও বটেন। রবীন্দ্রনাথ এই মোহিনী প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন—ভীষণাকে বড়-একটা দেখেন নাই। মোহিনীর সহিত বড় নিবিড় প্রেমসম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু ভীষণাকে বুঝি চক্ষের অন্তরালে রাখিবারই চেষ্টা করিয়াছেন। কবি ধরিত্রীকে একস্থলে "অক্ষমা" বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"অসীম ঐশ্বর্য্যরাশি নাই তোর হাতে
হে শ্যামলা সর্ব্বসহা জননি মৃন্ময়ি।
সকলের মুখে অন্ন চাহিস্ জোগাতে,
পারিস্ নে কতবার,—কই, অন্ন কই,
কাঁদে তোর সন্তানেরা ম্লান শুষ্ক মুখ;—
জানি মা গো, তোর হাতে অসম্পূর্ণ সুখ,
যা কিছু গড়িয়া দিস্ ভেঙে ভেঙে যায়,
সব তাতে হাত দেয় মৃত্যু সর্ব্বভুক্,
সব আশা মিটাইতে পারিস্ নে হায়
তা বলে' কি ছেড়ে যাব তোর তপ্তবুক!"

ইহা দেখিয়া আমার মনে হয়, ভীষণা প্রকৃতির ছায়ামাত্র দেখিয়া ভীষণার মুখের অবগুণ্ঠন-উন্মোচনে চেষ্টা না করিয়া কবি বারবার মোহিনীরই পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়াছেন। দরিদ্রা, পূর্ণসুখদানে অক্ষমা মাতার রূপে তিনি ধরণীকে দেখিয়াছেন; কিন্তু ভীষণ যন্ত্রণাদানে সম্পূর্ণ সক্ষমা, আপনার হৃদয়রক্তপানে আপনি তৃপ্তা, মহাভয়ঙ্করী ছিন্নমস্তাকে দেখিতে চান নাই। আমরা দেখি, স্নেহের সন্তানগুলিকে আকণ্ঠ সুখস্তন্য পান করানোর ঐকান্তিক আগ্রহ ধরিত্রীতে আরোপিত হইয়াছে—কিন্তু হতভাগ্য জীবলোকের দারুণ যন্ত্রণাদানের ইচ্ছা কাহার উপর আরোপিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি না। ইহাতে খৃষ্টানদিগের কল্পিত পুণ্যময় ঈশ্বর ও পাপের অবতার সয়তানের চিত্র আমাদের মনে উদিত হয়।

"বসুন্ধরা" শীর্ষক কবিতায় কবি এই ধরিত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে,
বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃন্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে রই;
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত; বিদারিয়া—
এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণবন্ধ
সঙ্কীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার,—হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া
শিহরিয়া, সচকিয়া, আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে' যাই সমস্ত ভূলোকে।"

ইহাতেও সেই নৃত্য, গীত, রূপ এবং বিচিত্র সুখেরই অসহ তৃষ্ণা ভাষা পাইয়াছে। এই কবিতায় তিনি বিশ্বের অজস্র "আনন্দমদিরাধারা" কি কি রূপে পান করিবেন বলিতে বলিতে বলিয়াছেন—

"হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর—
আপন প্রচণ্ডবলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে; দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজ্রের মতন—রুদ্র মেঘমন্দ্রস্বরে
পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের 'পরে
বিদ্যুতের বেগে, অনায়াস সে মহিমা—
হিংসাতীব্র সে আনন্দ—সে দৃপ্ত গরিমা—
ইচ্ছা করে একবার লভিবার স্বাদ।"

আমাদের কবি অপর জীবের যন্ত্রণার উপর প্রতিষ্ঠিত "হিংসাতীব্র আনন্দ" পান করিতে চাহিয়াছেন—কিন্তু আক্রান্ত মৃগের চক্ষে যে নিঃসহায় ভাষাহীন দারুণ বেদনা ফুটিয়া উঠে, সেই রিক্ত বেদনার আস্বাদ লইতে অগ্রসর হইতে তাঁহাকে কখন দেখি নাই। অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের নূতন সংস্করণে এই অংশটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। কেন পরিত্যক্ত হইয়াছে, বুঝিতে পারি নাই। সাধারণ মানবের হৃদয়ে জীবত্বহেতু যে স্বাভাবিক শোণিতপিপাসা বর্ত্তমান দেখা যায়, কবিহৃদয়ে তাহারই অলক্ষিত প্রতিবিম্ব দেখিয়া কি সম্পাদক কুণ্ঠিত বা ভীত হইয়াছেন? আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই কুণ্ঠা বা ভয়ের কোন কারণ নাই। যতদিন পৃথিবীর এই নিদারুণ "positive pain" বা সদ্বস্তু বেদনার সম্মুখীন হইবার বীর্য্যের উপলব্ধি না হয়, ততদিন মানবহৃদয়ে এই হিংসাতীব্র আনন্দের পিপাসার অস্তিত্ব ভালই মনে করি। হিংসার সহিত এই ভীষণ যন্ত্রণার বড়ই

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—সেইজন্য এই হিংসাই অনেকস্থলে সত্য-বেদনার সহিত পরিচয় করাইয়া মানুষকে বীর্য্যবান্ করে। মাত্র শোণিত-দর্শনের ভয়ে যে মানব হিংসার আনন্দ পান করিতে কুণ্ঠিত হয়, তাহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"ছাগকণ্ঠরুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার,
দেখে তোর হিয়া কাঁপে,
কাপুরুষ! দয়ার আধার? ধন্য ব্যবহার!!
মর্ম্মকথা বলি কাকে।"

যে এত ভীরু, সে স্বয়ং দয়ার পাত্র—সে কখন অপরকে দয়া করিতে পারে না—মহা-যন্ত্রণার সম্মুখীন হইবার বীর্য্য তাহার নাই। অধিকাংশ ভারতবাসীর হিংসার আনন্দপানে বিমুখতা যে এই ঘোর-তামসিক-ভীরুতা-প্রসূত নহে, তাহা কে বলিবে?

এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"ইচ্ছা করে, আপনার করি
যেখানে যা-কিছু আছে।"

এই "যা-কিছু" আর-কিছু নহে,—যেখানে যা-কিছু সুখের আছে, যা-কিছু বৈচিত্র্যময় সুখের নব নব ধারা আকণ্ঠ পান করাইয়া সুখের চির-অতৃপ্ত অসহ্য পিপাসার কথঞ্চিৎ শমতাসম্পাদন করে—ইহা সেই "যা-কিছু"—দুঃখের "যা-কিছু" নহে। কবিতার শেষভাগে কবি স্পষ্ট বলিতেছেন—

"জননি লহ গো মোরে
সঘন-বন্ধন তব বাহুযুগে ধোরে
আমারে করিয়া লহ তোমার বুকের
তোমার বিপুল প্রাণে বিচিত্র সুখের
উৎস উঠিতেছে যেথা, সে গোপনপুরে
আমারে লইয়া যাও—রাখিয়ো না দূরে।"

হাঁ—যেখানে অসংখ্য নয়নাভিরাম বর্ণে রঞ্জিত বিচিত্র সুখের উৎস উঠিতেছে, সেখানে লইয়া যাও—যেখানে অনন্ত নিশীথ ব্যাপিয়া নরকাগ্নিগর্ভ ভীম শৈলের ব্যাদিত গহ্বরমুখ হইতে বেদনার রক্তকায় করালজ্বালা উদ্গীরিত হইয়া জীবলোকের অনন্তকালধ্বনিত আর্ত্ত-স্বরের সহিত মিশিয়া অসীমশূন্যে লীন হইতেছে, সেখানে লইয়া যাইও না।

কেহ কেহ বলিবেন, "কেন, রবীন্দ্রনাথ কি তাঁহার তূলিকায় বেদনার ছবি অঙ্কিত করেন নাই?" উত্তরে আমি বলিব, "হাঁ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা অধিকাংশস্থলেই সদ্বস্তু বেদনা নহে,—সুখাতিশয্যের বেদনামাত্র। তবে কোন কোন স্থলে এই সত্যবেদনার অনুভূতি আমরা দেখিতে পাই। তাহার কারণ আর কিছুই নহে—যাঁহার উপর রমা ও বাণীর জননী গৌরীর অমৃতময়ী প্রসন্নদৃষ্টি সর্ব্বদা বর্ষিত হইতেছে—হরগৌরীর একাঙ্গতাহেতু মধ্যে মধ্যে হরের তৃতীয়নয়নবর্ষিত ভৈরব করজাল তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিবেই করিবে। এই রুদ্র করজালও অর্দ্ধপথে গৌরীর স্নিগ্ধ-মধুর নয়নরশ্মির সহিত মিশিয়া আপনার রুদ্রত্ব বহুপরিমাণে হারাইতেছে। সৌন্দর্য্য ও সুষমাই এই কবির প্রাণ—সেইজন্য ভৈরবকে দেখিতে হইলেও উমার সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষায় উৎফুল্ল, বরবেশে গিরিরাজগৃহগমনে উদ্যত বিলোচনকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। ত্রিলোকসংহারাভিলাষে উদ্যত, ত্রিশূল, মুক্তজট, প্রলয়াগ্নিদীপ্তনয়ন মহারুদ্রকে দেখিবার চেষ্টা তাঁহার রচনার মধ্যে দেখিতে পাই না।

ব্রাহ্মণ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই সংহারের দেবতা, এই নিয়ম এবং সামঞ্জস্যের বাহিরের

দেবতাকে একদিন দেখিয়াছিলেন। তাহার ফলে আমরা তাঁহার ব্রাহ্মণোচিত পাগলশীর্ষক * মৌলিকরচনা লাভ করিয়াছিলাম। নিতান্ত ইচ্ছাসত্বেও বাহুল্যভয়ে দুইএকস্থল উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। যাঁহারা তাঁহার এই অসাধারণ পদ্যময় গদ্য পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ১৩১১ সালের ৪র্থ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে এই রচনা দেখিতে পাইবেন।

এই সত্যবেদনার মৃদিত অনুভূতি আমরা রবীন্দ্রনাথের শেষ রচনাগুলির মধ্যে কোন কোন স্থলে দেখিতে পাই। পূর্ব্ব রচনাগুলির মধ্যে যে ব্যথা অঙ্কিত আছে, তাহা অধিকাংশ-স্থলেই সুখাতিশয্যের ব্যথা, বা নরনারীর বিচিত্র প্রেমলীলায় গড়িয়া-তোলা সৌখীন বেদনামাত্র। তাই বুঝি যতদিন সদ্বস্ত বেদনার ছায়াপাত তাঁহার হৃদয়ে না হইয়াছে, ততদিন আমরা তাঁহার হতভাগ্য স্বজাতি "বঙ্গবীর" প্রভৃতি কবিতায় তাঁহার শ্লেষের উপাদানমাত্র ছিলাম—আর এখন আমাদের শত অক্ষমতা-সত্বেও তাঁহার উদ্যত দক্ষিণবাহু হইতে ব্রাহ্মণের অজস্র আশীর্ব্বাদ আমরা পাইতেছি।

একস্থলে কবি বেদনাকে শিরে পাতিয়া লইয়া গাহিয়াছেন —

"অপরাধ যদি করে' থাকি পদে
না কর যদি ক্ষমা,
তবে পরাণপ্রিয়, দিও হে দিও
বেদনা নব নব।"

ইহা অতি সুন্দর,—শুনিতে সুন্দর, বলিতে সুন্দর, অনুভূতিতে আরও সুন্দর। কিন্তু সেই এক কথা—ইহা "সুন্দর"। রিক্ত বেদনার আস্বাদ ইহাতেও পাই না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই "সদ্বস্ত বেদনা" আমি কাহাকে বলিতেছি। হায়, অক্ষম আমি - কিরূপে বলিব এই বেদনা কি? ইহার কোন বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দিবার ক্ষমতা আমার নাই। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, আক্রান্ত মৃগের নয়নে যে মর্ম্মান্তিক নীরব বেদনা ফুটিয়া উঠে;—ঘোর দুর্ভিক্ষে অনশনপীড়িত কঙ্কালা-বশিষ্ট আসন্নমরণ শিশু কোটরপ্রবিষ্ট বুভুক্ষিত কাতরনয়নে তাহার ইহলোকের ভগবান্ শীর্ণকায়া উদাসনয়না হতভাগিনী জননীর মর্ম্মান্তিকনৈরাশ্যব্যঞ্জক মুখের দিকে চাহিয়া আছে—হতভাগ্য শিশু অপর কোন ভগবান্, অপর কোন নির্ভরের দেবতা দেখিতে শিখে নাই—তখন পরস্পরের দিকে চাহিয়া উভয়ের চক্ষে যে জমাটবাঁধা নিঃসহায় রিক্ত বেদনার ছায়া দেখা দেয়—যেখানে বেদনাই বেদনার সহচর—যে বেদনার পশ্চাতে মঙ্গলের দেবতা, নির্ভরের দেবতা দেখা—সভ্য-মহোদয়গণ, আমাকে ক্ষমা করিবেন—আমি শ্ববৃত্তির লক্ষণ, কুক্কুরবৃত্তির লক্ষণ মনে করি, ইহা সেই বেদনা।

জীবনক্ষয়কারী তপস্যার পরে ভগবান্ বুদ্ধদেবের চক্ষের সম্মুখে বিশ্বের অনন্ত যন্ত্রণা বুঝি জমাটবদ্ধ হইয়া রিক্তমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিল—তাই এই দুঃখের ঋষির মুখ হইতে প্রথমমন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল—"কষ্ট

* এই পাগলশীর্ষক প্রবন্ধটি কিন্তু ত্রিবেদীমহাশয়ের নহে, ইহাও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবুরই রচনা—প্রবন্ধের নিম্নে লেখকের নাম না থাকায় বোধ হয় এই ভ্রম হইয়াছে। বঃ সঃ।

আছে, কষ্ট আছে"। দারুণ শোকের ভিতর দিয়া এই অনন্ত বেদনার ছায়াপাত বুঝি শেলির হৃদয়ে হইয়াছিল, তাই তিনি বলিয়াছেন—

"It is a woe 'too deep for tears'; when all
Is reft at once, when some surpassing spirit,
Whose light adorned the world around it, leaves
Those who remain behind, not sobs and groans—
The passionate tumult of a clinging hope;
But pale despair, and cold tranquility,
Nature's vast frame, the web of human things,
Birth and the grave, that are not as they were."

এই যন্ত্রণা "too deep for tears"ই বটে। কেন কাঁদিবে? কাহার কাছে কাঁদিবে? নির্ভরের দেবতা, অভিমানের দেবতা কেহ থাকিলে তবে ত তাহার কাছে কাঁদিবে।

বিশ্বের পুঞ্জীভূত রিক্ত যন্ত্রণার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর,—অনন্ত হাহাকারের উপর প্রতিষ্ঠিত শবরচিত সিংহাসনে উপবিষ্টা করালিনীর নিরাভরণা-নিরাবরণা নগ্নমূর্ত্তি দেখিয়া সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তাঁহার বিরাট্‌হৃদয়নিঃসৃত যে বীর্য্যের গান আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, তাহার তুলনা কোথাও দেখি নাই। আপনাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনাসত্বেও আমি তাহার শেষাংশ উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইতেছি। আপনাদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি। সন্ন্যাসী প্রথমে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির সুন্দর ও ভীষণ দুই রূপেরই অতি বিশদচিত্র অঙ্কিত করিয়া বলিতেছেন—

"দেহ চায় সুখের সঙ্গম, মনবিহঙ্গম
সঙ্গীতসুধায় ধায়।
মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল,
যাইতে দুঃখের পার॥
ছাড়ি হিমশশাঙ্কছটায়, কেবা বল চায়,
মধ্যাহ্নতপনজ্বালা।
প্রাণ যার চণ্ডদিবাকর, স্নিগ্ধ শশধর,
সেও তবু লাগে ভালো॥
সুখতরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর
দুঃখে যার ভালবাসা।
সুখে দুঃখ অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল,
তবু নাহি ছাড়ে আশা॥
রুদ্রমুখে সবাই ডরায় কেহ নাহি চায়
মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উষ্ণধার, রুধির-উদগার, ভীম তরবার
খসাইয়া দেয় বাঁশী॥
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী সুখবনমালী
তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনি কর মর্ম্মচ্ছেদ হোক্ মায়াভেদ,
সুখস্বপ্ন, দেহে দয়া॥
মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়
নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে, ভীম অট্টহাস নগ্নদিক্‌বাস
বলে মা দানবজয়ী॥
মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময়,
কোথা যায় কেবা জানে।

মৃত্যু তুমি, রোগ-মহামারী বিষকুম্ভ ভরি
বিতরিছ জনে জনে॥
রে উন্মাদ, আপনা ভুলাও, ফিরে নাহি চাও,
পাছে দেখ ভয়ঙ্করা।
দুঃখ চাও, সুখ হবে বলে' ভক্তিপূজাছলে
স্বার্থসিদ্ধি মনে ভরা॥
ছাগকণ্ঠরুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার,
দেখে তোর হিয়া কাঁপে।
কাপুরুষ! দয়ার আধার? ধন্য ব্যবহার!!
মর্ম্মকথা বলি কাকে?
ভাঙ বীণা, প্রেমসুধাপান, মহা আকর্ষণ,
দূর কর নারীমায়া।
আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজলপান,
প্রাণপণ থাক্ কায়া॥
জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখ তার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার,
প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়,
তাহা না ডরাক্ তোমা।
চূর্ণ হোক্ স্বার্থ, সাধ, মান, হৃদয় শ্মশান,
নাচুক্ তাহাতে শ্যামা॥"

এই কবিতার ছত্রে ছত্রে তীব্রবেদনার অনুভূতির সহিত যে ভাস্বরবীর্য্যের শুভ্রদীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে—তাহা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা আজ কয়জন ভারতবাসীর আছে?

মানুষ স্বভাবতই সুখপিপাসু, সেইজন্য এই মৃত্যুরূপা এলোকেশী দুঃখের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর দিকে চাহিতে ভীত হয়। যাহারা কখন বা এই মহাভয়ঙ্করীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহারাও মহাভয়ে এই মুণ্ডমালিনীকে দয়াময়ী বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলে—"মাতঃ ভয়ঙ্করি! আমরা জানি, তোমার রোষদীপ্ত ভীষণ নয়নের বহ্নি আমাদিগের কোন অমঙ্গল বিধান করিবে না। ভীম অট্টহাস্যে তুমি যে জ্বালাময় করাল কৃপাণ ঊর্দ্ধে উদ্যত করিয়াছ, তাহা আমাদিগের শত্রু দানবেরই বক্ষশোণিত পান করিবার জন্য লোলজিহ্ব। তাহা আমাদিগের সুখের সংসারের উপর বজ্রের ন্যায় পতিত হইয়া তাহাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিবে না। আমাদিগের সুখস্বপ্ন অটুট থাকিবে।" কিন্তু হায় মা, তুমি এই চাটুকার ভীরু ধূলামলিন পৃথিবীর সন্তানগণের মিথ্যাস্তবে তুষ্ট হও না। অট্টহাস্যে ভয়ার্ত্ত মানবের স্তব উপহাস করিয়া বিরাট্ নগ্নদেহের নীল আভায় শিবারবমুখরিতা তমিস্রা রজনীর অন্ধকার ভীষণতর করিয়া—তোমার স্নেহের সহচর মহারোগ, মহামারী, মহাদুর্ভিক্ষ, মানবের প্রতি মানবের দারুণ হিংসা প্রভৃতি শোণিতবর্ণা যোগিনীদিগকে সঙ্গে লইয়া সংহাররূপিণী তুমি ক্ষুদ্র মানবের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াও—আর হতভাগ্যের চাটুস্তব অর্দ্ধ-উচ্চারিত হইয়া থামিয়া যায়, তাহার অন্তরাত্মা বিহ্বলভাবে কাঁপিয়া উঠে—সে তোমার রুদ্র নয়নপথ হইতে অপসৃত হইবার চেষ্টা করে।

ক্ষুদ্র মানবের এই দশা দেখিয়া বীর সন্ন্যাসী ভৈরবস্বরে আহ্বান করিতেছেন—"কে মুক্তিকামু নির্ভীক বীর আছ—মোহময় সুখস্বপ্ন ত্যাগ করিয়া জাগ্রত হও, জাগ্রত হও। দেখ, শ্মশানবিলাসিনী যন্ত্রণার অধিষ্ঠাত্রী দেবী তোমার অর্চ্চনা লইবার জন্য তোমার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তুমি কি এই দেবীর অর্চ্চনা করিতে ভীত হইবে? যুদ্ধই ইহার অর্চ্চনা। তোমার সমস্ত ক্ষুদ্র স্বার্থ, সমস্ত

চিত্তদৈন্য, সর্ব্ব ক্ষুদ্রকামনা, ঐ শোণিতরঞ্জিত চরণে জলাঞ্জলি দিয়া নিষ্কলঙ্ক ললাটে রক্তচন্দনের অর্দ্ধচন্দ্র অঙ্কিত করিয়া জীবনান্তকর মহাযুদ্ধে অগ্রসর হইয়া দেবীর সম্মুখে উদ্ধতশিরে দণ্ডায়মান হও। নতশিরে স্তবের দ্বারা করালিনীর তুষ্টিসাধনে চেষ্টা করিও না। আহবেই এই দেবীর পরম পরিতোষ। অস্ত্র নাই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছ? আছে, অস্ত্র আছে। আপনার হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখ—প্রেমমন্ত্রে পূত সেবাস্ত্ররূপ শাণিতখড়্গ তোমার হৃদয়কোষে নিবদ্ধ আছে। যেখানে মৃত্যুরূপা দেবী আপনার করাল কৃপাণমুখে হতভাগ্য জীবকুলের হৃৎপিণ্ড হইতে শোণিতের সহস্র উৎস ছুটাইয়া দিতেছেন, সেইখানে তুমিও প্রেমে বীর্য্যবান্ নির্ভীক স্ফীতবক্ষে তোমার এই ভাস্বর সেবাস্ত্র কোষমুক্ত করিয়া দণ্ডায়মান হও। তোমার শত ক্ষতমুখে শোণিত ক্ষরিয়া পড়ুক্, তোমার মর্ম্মস্থান সহস্রধা ছিন্ন হউক্—তুমি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইও না। ভীমার অট্টহাস্যের সহিত তোমারও মুখনিঃসৃত "অভীঃ অভীঃ" শব্দ ভয়ার্ত্ত জীবকুলের কর্ণে ধ্বনিত হউক্। মহাযুদ্ধে অবসন্ন হইয়া যখন অন্তিমধূলিশয্যায় শয়িত হইবে, তখনও তোমার বলহীন কম্পিতহস্ত আর্ত্তের সেবার জন্যই শেষবার প্রসারিত হউক্,—তোমার বীরহৃদয়ের দুর্জ্জয় প্রেম তোমার মরণচ্ছায়াগ্রস্ত আননেও শুভ্রস্নিগ্ধ হাস্যে প্রতিফলিত হউক্।"

এই যুদ্ধের ফল কি, তাহাও সন্ন্যাসী বলিয়াছেন। হায়,—সদা পরাজয়ই এই যুদ্ধের ফল। বিশ্বের পুঞ্জীভূত যন্ত্রণার সম্মুখে মহাবীরেরও শক্তি ব্যর্থ হয়। অনন্ত যুদ্ধেও এই অনন্ত বেদনার পরিমাণ অটুট থাকে। ইহাই pessimist বা দুঃখবাদীদিগের শেষ কথা। কিন্তু সাধারণে pessimist কথাটি যে ভাবে ব্যবহার করেন, সেই অর্থে এই মহাবীর্য্য সন্ন্যাসীকে pessimist নামে অভিহিত করিলে কথাটির অপব্যবহার করা হয়। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন—"সে কি—যদি সদা পরাজয়ই যুদ্ধের ফল হয়, তবে যুদ্ধ কিরূপে চলিতে পারে? সদা পরাজিতের আবার যুদ্ধ কিরূপ?" তখন অপর একটি প্রশ্নদ্বারা এই শ্রেণীর দুঃখবাদীরা ইহার উত্তর দেন।—তাহা এই, "যদি মরিবেই, তবে বাঁচিয়া থাক কেন? বাঁচিয়া থাকার চেষ্টাই যেমন জীবিতের পক্ষে স্বাভাবিক, সেইরূপ জীবনব্যাপী মহাসমরই মহাকালীর ভৈরব আহ্বানে প্রবুদ্ধচৈতন্য বীরের পক্ষে স্বাভাবিক। ফল কি হইবে, দেখিবার অবসর বা ইচ্ছা তাঁহার নাই।" গীতার কথা আসিয়া পড়িতেছে।—

বহুদিন ধরিয়া, বহুজন্ম ধরিয়া আমরা বহু কবির ললিত বেণুরবে মুখরিত, মলয়মারুতনিষেবিত আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে সুখশয্যায় শয়ন করিয়া সুখের মিথ্যাস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই নিদ্রা কালনিদ্রায় পরিণত হইবার উপক্রম হইতেছিল। আজ বুঝি আমাদের মোহতন্দ্রা ছুটিতেছে, তাই এই মহাবীর্য্য সন্ন্যাসীর তূর্য্যনিনাদ সাগরগর্জ্জনবৎ আমাদের কর্ণে আসিয়া পশিতেছে।—

এই তিমিরমধ্যবর্ত্তিনী সংহাররূপিণীকে কবি রবীন্দ্রনাথ কিভাবে তাঁহার সৃষ্ট রঘুপতির চৈতন্যের ভিতর দিয়া দেখিয়াছেন, তাহা দেখিতে চেষ্টা করিব। কল্পিতশক্রর হৃদয়-

শোণিতধারা দেবীর তর্পণের আশায় উৎফুল্ল রঘুপতি বলিতেছেন—

"এতদিনে আজ বুঝি জাগিয়াছ দেবি!
ঐ রোষহুহুঙ্কার! অভিশাপ হাঁকি
নগরের 'পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ
তিমিররূপিণি? ঐ বুঝি তোর
প্রলয়সঙ্গিনীগণ দারুণ ক্ষুধায়
প্রাণপণে নাড়া দেয় বিশ্বমহাতরু!
আজি মিটাইব তোর দীর্ঘ উপবাস।

ভক্তেরে সংশয়ে ফেলি এতদিন ছিলি
কোথা দেবি? তোর খড়্গ তুই না তুলিলে
আমরা কি পারি? আজ কি আনন্দ, তোর
চণ্ডীমূর্ত্তি দেখে! সাহসে ভরেছে চিত্ত,
সংশয় গিয়েছে; হতমান নতশির
উঠেছে নূতন তেজে! ঐ পদধ্বনি
শুনা যায়, ঐ আসে তোর পূজা! জয়
মহাদেবী—।"

কিন্তু যখন স্তবে বধিরা মহাদেবী শক্রর শোণিত-গ্রহণ না করিয়া নিশ্চলভাবে এই তীব্রহিংসক ব্রাহ্মণের তীব্র স্নেহের পাত্র, জীবন-মন্থন-করা ধন, পুত্রাধিক জয়সিংহের হৃদয়রক্ত পান করিলেন, তখন উন্মত্ত রঘুপতি কি বলিতেছেন, শ্রবণ করুন —

"দেখ দেখ, কি করে' দাঁড়ায়ে আছে, জড়
পাষাণের স্তূপ! মূঢ় নির্ব্বোধের মত!
মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির! তোরি কাছে
সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাঁদিয়া মরিছে!
পাষাণচরণে তোর, মহৎ হৃদয়
আপনারে ভাঙিছে আছাড়ি! হা হা হা হা!
কোন্ দানবের এই ক্রূর পরিহাস
জগতের মাঝখানে রয়েছে বসিয়া।
মা বলিয়া ডাকে যত জীব—হাসে তত
ঘোরতর অট্টহাসে নির্দ্দয় বিদ্রূপ!
দে ফিরায়ে জয়সিংহে মোর! দে ফিরায়ে!
দে ফিরায়ে রাক্ষসি পিশাচি! (নাড়া দিয়া)
শুনিতে কি—
পাস্? আছে কর্ণ? জানিস্ কি করেছিস্?
কার্ রক্ত করেছিস্ পান? কোন্ পুণ্য-
জীবনের? কোন্ স্নেহ-দয়া-প্রীতি-ভরা
মহাহৃদয়ের?

থাক্ তুই চিরকাল
এইমত—এই মন্দিরের সিংহাসনে,
সরল ভক্তির প্রতি গুপ্ত উপহাস!

* * * *

* * * * "

ইহাতে আমাদিগকে বিবেকানন্দস্বামীর সেই কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—

"মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়
নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে ভীম অট্টহাস নগ্নদিক্‌বাস
বলে মা দানবজয়ী।"

যতদিন রঘুপতির আশার স্বপ্ন অটুট ছিল, ততদিন সাধারণ মানবের ন্যায় রঘুপতিও মুণ্ডমালিনীকে ভক্তবৎসলা এবং কেবলমাত্র শক্ররূপিদানবদলনী বলিয়াই পূজা করিয়াছিলেন।—কিন্তু যাই তাঁহার উগ্র স্নেহের একমাত্র পাত্র জয়সিংহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রিক্ত-কঠোর জীবনে যাহা-কিছু আশার, সুখের বা শোভার আস্পদ ছিল, সমস্তই মুহূর্ত্তে চূর্ণবিচূর্ণ হইল—তখনি এই ব্রাহ্মণ আর্ত্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"জানিস্ কি করেছিস্?
কার্ রক্ত করেছিস্ পান? কোন্ পুণ্য-

জীবনের ? কোন্ স্নেহ-দয়া-প্রীতি-ভরা
মহাহৃদয়ের ?"

সাধারণ মানবের ন্যায় নির্ব্বোধ রঘুপতিও জানিতেন না যে, করালিনী আপনার শোণিত-খর্পর পূর্ণ করিবার সময় ভক্ত বা ভক্তের শত্রু-মিত্রের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখেন না। তবে সাধারণ মানব হইতে রঘুপতির প্রভেদ এই যে, তিনি সাধারণ মানবের ন্যায় ভয়ার্ত্ত নহেন। এইরূপ মানবই কিন্তু দেবীর সত্য-মূর্ত্তিদর্শনে অধিকারী। সেই পূর্ণ অধিকার যতদিন না জন্মে, ততদিন হিংসার তীব্র-আনন্দ-পানে ইঁহারা বিমুখ হন না।

রঘুপতি বলিতেছেন, "সরলভক্তির প্রতি গুপ্ত উপহাস"। কিন্তু ইহা ত সরলভক্তি নহে;—"সরল" কোথায় ? এবং ভক্তিই বা কোথায় ? সরল নহে, স্বার্থবক্র—ভক্তি নহে, ভয়। এই দেবীও ভক্তির দেবী নহেন। যুদ্ধই ইঁহার অর্চ্চনা।

সন্ন্যাসী দেখিয়াছেন, এই দেবী "দানবের ক্রূর পরিহাস" মাত্র নহেন। ইতি সত্যরূপিণী—তাই বলিয়াছেন—

"সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী সুখবনমালী
তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনি কর মর্ম্মচ্ছেদ হোক্ মায়াভেদ,
সুখস্বপ্ন, দেহে দয়া॥

ইনি যদি উপহাসমাত্র হইবেন, তাহা হইলে ইঁহার ভীম অসির আঘাতে যে সুখ-বনমালীর সুখের মুরলী মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ধূলি-চুম্বন করে, তিনি কি ?

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। আমার শেষ কথা নিবেদন করিয়া আমি বিদায় লইতেছি।—

রবীন্দ্রনাথের শেষ উপলব্ধি—যাঁহার আনন্দধারা বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া আসিয়া উপাসকের হৃদয়ে ভক্তিরূপে ফুটিয়া উঠে:—

বিবেকানন্দের উপলব্ধি—যাঁহার আনন্দ-ধারা বিশ্বের অনন্ত শোণিতরাঙা সত্যবেদনার ভিতর দিয়া আসিয়া যুধ্যমান বীরের আপনাতে-আপনি-পূর্ণ বিরাট্ হৃদয়ে যন্ত্রণাপীড়িত জীবের প্রতি প্রেমরূপে ফুটিয়া উঠে।

আমি এস্থলে সুখদুঃখাতিরিক্ত অনির্ব্বচনীয় অনুভূতিকে আনন্দ বলিতেছি।

উপসংহারে আমার নিবেদন, কেহ মনে না করেন, আমি রবীন্দ্রনাথের সহিত বিবেকানন্দস্বামীর কবিহিসাবে কোন তুলনা করিয়াছি। "কবি"শব্দটির সাধারণ যে অর্থে ব্যবহার হয়, সেই অর্থে স্বামী বিবেকানন্দকে কবি বলা যায় কি না, সন্দেহ করি। প্রবন্ধের ভিতর একস্থলে ভগবান্ বুদ্ধদেবের নাম উল্লেখ করিয়াছি। কবি-হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সহিত বিবেকানন্দের তুলনা করিয়াছি বলিলে ইহাও বলিতে হয়, বুদ্ধদেবের সহিতও রবীন্দ্রনাথের তুলনা করিয়াছি—কারণ, যে প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের নামোল্লেখ করিয়াছি ঠিক সেই প্রসঙ্গেই বলিতে বলিতে বিবেকানন্দস্বামীর কথা আসিয়া পড়িয়াছে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়।

হারামণির অন্বেষণ।

২

প্রশ্ন। বলিতেছিলাম যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাওয়া না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্তই চাওয়া বাহিব হইতে থাকে—পাওয়া হইয়া চুকিলেই চাওয়া বন্ধ হয়। তাই বলি যে, চাওয়া এবং পাওয়া একত্রে বাস করিবে কেমন করিয়া—বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল পি'বে কেমন করিয়া?"

উত্তর। এইমাত্র তুমি তোমার বাগানের মালীকে ডাকিয়া আম্র চাহিলে। তুমি যদি ইহার পূর্ব্বে কোনোকালে আম্রের আস্বাদ না পাইতে, তাহা হইলে কখনই তুমি আম্র চাহিতে না। তবেই হইতেছে যে, চাওয়া বলিয়া যে একটি ব্যাপার, তাহা পাওয়া'রই বেস অর্থাৎ অনুতান বা লেজুড়। আবার, একটু পূর্ব্বে তুমি যখন তোমার বাগানের মালঞ্চ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলে, আর, সেই সুযোগে আমি যখন দিব্য একটি ফুটন্ত গোলাপ-ফুল দেখিয়া তাহা তুলিবার জন্ত হাত বাড়াইলাম, তুমি তৎক্ষণাৎ আমার হাত টানিয়া-ধরিয়া বলিলে, "কর কি—কর কি! উহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমার মন বলিতেছে 'চিরজীবী হইয়া বাঁচিয়া থাকো!' আর, তুমি কিনা স্বচ্ছন্দে উহাকে বধ করিবার জন্ত হস্ত উত্তোলন করিতেছ—তুমি দেখিতেছি জল্লাদের শিরোমণি!" ফুলের সৌন্দর্য্য সেই যে তুমি জ্ঞানে উপলব্ধি করিলে, জ্ঞানের সেই উপলব্ধি-ক্রিয়ার নামই পাওয়া, আর, আমি ফুলের গাত্রে হস্তক্ষেপ করিবামাত্র তোমার প্রাণ সেই যে কাঁদিয়া উঠিল, প্রাণের সেই ক্রন্দনের নামই ফুলটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাওয়া। যে সময়ে তুমি ফুলটিকে তোমার চক্ষের সম্মুখে পাইয়াছিলে, সেই সময় হইতেই তুমি চাহিতে-ছিলে যে, ফুলটি চিরজীবী হইয়া বাঁচিয়া থাকুক; একই অভিন্ন সময়ে, তোমার জ্ঞানের পাওয়া এবং প্রাণের চাওয়া পরস্পরের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া হরিহরাত্মা হইয়া গিয়াছিল;—তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে ব্যাঘ্রমৃগের সম্বন্ধ। তোমার দৃষ্টিতে তুমি যেখানে দেখিতেছ ব্যাঘ্রমৃগের সম্বন্ধ, আমার দৃষ্টিতে আমি সেখানে দেখিতেছি পুরুষপ্রকৃতির সম্বন্ধ বা জ্ঞানপ্রাণের সম্বন্ধ। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—জ্ঞান সব-চেয়ে ভালবাসে কাহাকে? জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিলে জ্ঞান কি বলে? জ্ঞান বলে—প্রাণ-তুল্য ভালবাসাই ভালবাসার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। তাহা যখন সে বলে, তখন তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জ্ঞান প্রাণকে যেমন ভালবাসে, এমন আর কাহাকেও নহে। প্রাণ আবার তেমনি ভালবাসে জ্ঞানকে। জ্ঞান একমুহূর্ত্ত চক্ষের আড়াল হইলে প্রাণ দশদিক অন্ধকার দেখে। জ্ঞান ছাড়িয়া পলাইলে প্রাণের নাড়ি ছাড়িয়া যায়। ভালবাসা যদি-চ বস্তু একই, তথাপি জ্ঞানের ভালবাসা

এবং প্রাণের ভালবাসার মধ্যে একপ্রকার অভেদ-ঘ্যাঁসা প্রভেদ আছে, আর, সে যে প্রভেদ, তাহার গোড়া'র কথা হ'চ্চে প্রতিযোগিতা অর্থাৎ পাশ্চাত্যবিজ্ঞানশাস্ত্রে যাহাকে বলে "Polarity" কিনা মিথুনীভাব। পুরুষ যেভাবে স্ত্রীকে ভালবাসে, জ্ঞান সেইভাবে প্রাণকে ভালবাসে, আবার, স্ত্রী যেভাবে পুরুষকে ভালবাসে, প্রাণ সেইভাবে জ্ঞানকে ভালবাসে। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, নবোদিত সূর্য্য যেভাবে পদ্মিনীর প্রতি চক্ষু উন্মীলন করে, নবোদিত জ্ঞান সেইভাবে প্রাণের প্রতি চক্ষু উন্মীলন করে; তার সাক্ষী —মনুষ্যাবতারের আদিমবয়সে পৃথিবীতে জ্ঞানের যখন সবে-মাত্র অরুণোদয় দেখা দিয়াছিল, তখন জ্ঞানের কার্য্যই ছিল—প্রাণ কিসে ভাল থাকে, অহোরাত্র কেবল তাহারই পন্থায় ঘুরিয়া বেড়ানো। আবার, সুরভি নিশ্বাস ছাড়িয়া পদ্মিনী যেভাবে নব বিভাকরের প্রতি হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করে, প্রাণ সেইভাবে জ্ঞানের প্রতি হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করে; —জ্ঞানকে পাইলেই প্রাণ তাহার নিকটে আপনার নিগূঢ় অন্তরের কথা খোলে—বিনা বাক্যে অবশ্য, কেন না, জ্ঞান শ্রোতা নহে—জ্ঞান দ্রষ্টা; জিজ্ঞাসা বটে শ্রোতা, আর, সেইজন্য তাহার সাঙ্কেতিকচিহ্ন কর্ণাকৃতি (?) এইরূপ;—ফলে, জ্ঞানের চক্ষে আকার-ইঙ্গিতই বাক্যের চূড়ান্ত।* একই আম্রের অঙ্কুর যেমন আঁটির দলযুগলের জোড়ের মাঝখান হইতে দুই দিকের দুই ডাল হইয়া ছটকিয়া বাহির হয়, একই ভালবাসা তেম্‌নি পুরুষপ্রকৃতির দাম্পত্যবন্ধনের মাঝখান হইতে দুইভাবের দুইতরো ভালবাসা হইয়া ছটকিয়া বাহির হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, স্ত্রীর প্রতি পুরুষের ভালবাসাই বা কি-ভাবের ভালবাসা, আর, পুরুষের প্রতি স্ত্রীর ভালবাসাই বা কি-ভাবের ভালবাসা? যখন দেখিতেছি যে, স্বামী নববিবাহিতা স্ত্রীকে "তুমি আমার ভব-জলধি-রত্ন" বলিয়া অধিকার করে, তখন তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, স্বামীর ভালবাসা অধিকার-প্রধান—স্বামিত্ব-প্রধান—পাওয়া-প্রধান; পক্ষান্তরে, যখন দেখিতেছি যে, স্ত্রী অকথিত ভাষায় "আমি তোমারই" বলিয়া একান্ত অধীনা-ভাবে স্বামীর আশ্রয় যাচ্ঞা করে, তখন তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, স্ত্রীর ভালবাসা অধীনতা-প্রধান—চাওয়া-প্রধান, আর, চাওয়া মুখ খুলিতে পারে না বলিয়া লজ্জা-প্রধান। এখন দেখিতে হইবে এই যে, পাওয়া বা অধিক্রিয়া বা উপলব্ধিক্রিয়া জ্ঞানের যেমন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, চাওয়া বা অভাবজ্ঞাপন বা ক্রন্দন প্রাণের তেম্‌নি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। পুরুষের প্রতি স্ত্রীর যেরূপ চাওয়া-প্রধান ভালবাসা, তাহা প্রাণঘ্যাঁসা-মনের ভালবাসা—সংক্ষেপে প্রাণের ভালবাসা; আর, স্ত্রীর প্রতি পুরুষের যেরূপ পাওয়া-প্রধান ভালবাসা, তাহা জ্ঞানঘ্যাঁসা-মনের ভালবাসা—সংক্ষেপে জ্ঞানের ভালবাসা। স্ত্রীর প্রাণের ভালবাসা এক-প্রকার জ্ঞানশূন্য অহেতুক ভালবাসা; রাধাকে তাই কবিরা বলেন "উন্মাদিনী রাধা"। পক্ষান্তরে, পুরুষের জ্ঞানের ভালবাসা একপ্রকার রঙ্গচেনা

* স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু।
কালিদাস—মেঘদূত।

চোকালো ভালবাসা; কৃষ্ণকে তাই কবিরা বলেন "চতুরচূড়ামণি"। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, "কৃষ্ণকে ভালবাসি জানি না সই আমি কিজন্য" এইরূপ জ্ঞানশূন্য অহেতুক ভালবাসা বড়, না "রাধা মূর্ত্তিমতী প্রেমমাধুরী, তাই আমি রাধার চরণ-কিঙ্কর" এইরূপ চোকালো-ধাঁচার সহেতুক ভালবাসা বড়? ইহার উত্তর এই যে, রাধার অহেতুক ভালবাসা প্রাণাংশে বড়, কৃষ্ণের সহেতুক ভালবাসা জ্ঞানাংশে বড়। হারজিতের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে,

ভিন্ন জাতির ভিন্ন রীত।
আপন মুলুকে সবার'ই জিত।

ফলকথা এই যে, কৃষ্ণরাধিকার যুগবাঁধা প্রেম এ বলে আমায় ছাখ্, ও বলে আমায় ছাখ্; দুয়েরই মর্য্যাদা নিক্তির ওজনে সমান; যেহেতু জ্ঞানের পাওয়া এবং প্রাণের চাওয়া চখাচখীর ন্যায় সখাসখী। ভিতরের কথাটি তবে তোমাকে ভাঙিয়া বলি—

প্রাণ হইতে জ্ঞানে পৌছিবার মাঝপথে একটি সন্ধিস্থান আছে, সেইটিই ভালবাসা'র জন্মস্থান। সে স্থানটি হ'চ্চে মন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মন পদার্থটা কি? গঙ্গা-জলই যেমন গঙ্গার সারসর্ব্বস্ব, তেম্নি, মানস বলিয়া যে-একটি মনোবৃত্তি আছে, তাহাই মনের সারসর্ব্বস্ব। মানস, সঙ্কল্প, ইচ্ছা, মন একই। তার সাক্ষী—"মন নাই" বলিলে বুঝায় ইচ্ছা নাই, "মনে ধরে না" বলিলে বুঝায় ইচ্ছার সঙ্গে মেলে না, "মন যায় না" বলিলে বুঝায় ইচ্ছা হয় না। পৃথিবীর ভূগোল তোমার নখাগ্রে, তাহা আমি জানি; তোমার জানিতে কেবল বাকি মনের ভূগোল; জানা কিন্তু উচিত—বিশেষত তোমার মতো পণ্ডিত-লোকের। অতএব প্রণিধান কর—

মন হ'চ্চে মানস-সরোবর বা ইচ্ছা-সরোবর, আর, তা'র দুই কূল হ'চ্চে জ্ঞান এবং প্রাণ। মনের যে-জায়গাটি জ্ঞানের কূল ঘেঁষিয়া তরঙ্গিত হয়, মানস-সরোবরের সেই জ্ঞান-ঘ্যাঁসা কিনারাটি প্রভাবাত্মক বা প্রভুত্বপ্রধান বা পাওয়া-প্রধান ইচ্ছা, সংক্ষেপে ঈশনা; আর, মনের যে-জায়গাটি প্রাণের কূল ঘেঁষিয়া তরঙ্গিত হয়, মানস-সরোবরের সেই প্রাণ-ঘ্যাঁসা কিনারাটি অভাবাত্মক বা অধীনতা-প্রধান বা চাওয়া-প্রধান ইচ্ছা, সংক্ষেপে বাসনা। মুখে সব কথা খোলোসা করিয়া বলিতে গেলে বড্ড বেশী বকিতে হয়, অথচ, বক্তা'র কেবল বকুনিই সার হয়—শুনিবেন যাঁহারা, তাঁহারা ঘড়ি-ঘড়ি স্বস্ব গৃহের দিকে মুখ ফিরাইতে থাকেন। তাহাতে কাজ নাই। মানসী-সরোবরের একখানি ক্ষুদ্র মানচিত্রের (একপ্রকার হাতচিটে'র) জোগাড় করিয়াছি, তাহা দেখিলেই সরোবরটি'র কূলকিনারা'র ঠাহর পাইতে তোমার একমুহূর্ত্তও বিলম্ব হইবে না; অতএব দেখ—

ও-কূল—জ্ঞান

ও-পারের কিনারা—ঈশনা বা পাওয়া-প্রধান ইচ্ছা

মানস-সরোবর বা সঙ্কল্প বা ইচ্ছা বা মন

এ-পারের কিনারা—বাসনা বা চাওয়া-প্রধান ইচ্ছা

এ-কূল—প্রাণ

মানচিত্রে এ যাহা দেখিলে, তাহা যদি

বাস্তবিক-মানস-সরোবরের সহিত হাতে-কলমে মিলাইয়া দেখিতে চাও, তবে চলো তোমাকে সরোবরটির এ-পার হইতে পাড়ি দিয়া ও-পারে লইয়া যাই, তাহা হইলেই তোমার ধন্দ মিটিয়া যাইবে।

একটু পূর্ব্বে তুমি যখন নিদ্রায় অচেতন ছিলে, তখন তোমার নিশ্বাসপ্রশ্বাস ঘড়ি'র কলের মতো বাঁধানিয়মে চলিতেছিল, ইহাতে আর ভুল নাই। ঘড়ি'র কল'কে তো চালায় জানি ঘড়ি'র স্প্রিঙ্—তোমার নিদ্রাবস্থায় তোমার নিশ্বাসপ্রশ্বাস চালাইতেছিল কে? তোমার প্রাণ অবশ্য। তুমি তো নিদ্রায় অচেতন, আর, আমি সেই সময়ে তোমার শয়নঘরের এককোণে চেয়ারে হ্যালান্ দিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছি; ইতিমধ্যে তোমার নাক ডাকিয়া উঠিল গগনভেদী সপ্তমস্বরে—ডাকিয়া উঠিল অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় এম্‌নি সহসা যে, আমি চম্‌কিয়া উঠিলাম, আর, সেই মুহূর্ত্তে যে-ছোটো-ছেলেটি তোমার পার্শ্বে শুইয়াছিল, তাহার ঘুম ভাঙিয়া যাওয়াতে সে বিছানায় উঠিয়া-বসিয়া ভয়োদ্বিগ্নচিত্তে তোমার শব্দায়মান নাসিকার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তুমি তো সামান্য ডাক্তার নহ, তুমি মহামহোপাধ্যায় এম্.-ডি.; বলি তাই—সেই বছর-সাতেকের ছেলেটি তোমারই তো ছেলে! অ্যালোপাথিক্ ডাক্তারিবিদ্যায় সে পেট-থেকে-পড়িয়াই পণ্ডিত। সে ভাবিল যে, "বাবার নাকের ছিদ্র দিয়া প্রাণ বাহির হইতে চাহিতেছে—কিছুতেই আমি তাহা হইতে দিব না"; এইরূপ ভাবিয়া ছেলেটি তোমার নাক টিপিয়া ধরিল যতদূর তাহার সাধ্য শক্ত করিয়া। তাহার ফল যাহা হইল, তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি, শ্রবণ কর—

প্রথমে নিদ্রার ভাঙো-ভাঙো অবস্থায় তোমার দুঃস্বপ্নপীড়িত অর্দ্ধস্ফুট মনে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পথের বাধা সরাইয়া ফেলিবার ইচ্ছার উদ্রেক হইল; আর, সে যে ইচ্ছা, তাহা নিতান্ত অবলা ইচ্ছা—চাওয়া-প্রধান প্রাণঘ্যাঁসা ইচ্ছা—বাসনা-মাত্র। তাহার পরে তুমি ধড়্‌ফড়্ করিয়া জাগিয়া-উঠিয়া ছেলেটির হাতের কামড়্ হইতে তোমার নাসিকা ছাড়াইয়া লইতে ইচ্ছা করিলে; এবার'কার এ ইচ্ছা প্রভাবাত্মক সবলা ইচ্ছা—পাওয়া-প্রধান জ্ঞানঘ্যাঁসা ইচ্ছা; ইহারই নাম ঈশনা। যেই তোমার মনে জাগ্রত জ্ঞানের উদয় হইল, সেই-অম্নি ঈশনার পরাক্রমের চোটে ছেলেটির হস্ত হইতে তৎক্ষণাৎ তুমি তোমার বিপন্ন নাসাগ্র টানিয়া-লইয়া ছেলে-বেচারিটিকে এক-ধম্‌কে কাঁদাইয়া ফেলিলে। মানস-সরোবরের এ-কূল হইতে ও-কূলে—প্রাণ হইতে জ্ঞানে—উত্তীর্ণ হইবার পথের ঠিক্-ঠিকানা এই তো তুমি হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া সুনির্ঘাত জানিতে পারিলে। পথ-অতিবাহনের ক্রম-পদ্ধতির বিবরণ এ যাহা তুমি জানিতে পারিলে, তাহা সংক্ষেপে এই—

স্থূল ক্রমপদ্ধতি।

(১) প্রাণ

(২) মন

(৩) জ্ঞান

সবিশেষ ক্রমপদ্ধতি।

(১) প্রাণ

(২) মন { (১৷৷০) প্রাণঘ্যাঁসা মন—বাসনা
(৩৷৷০) জ্ঞানঘ্যাঁসা মন—ঈশনা }

(৩) জ্ঞান

পূর্ব্বপ্রদর্শিত মানচিত্রখানিতে ক্রমপদ্ধতির অন্তর্ভুক্তি ছিল না। মানস-সরোবরের অমন একখানি সুন্দর নখদর্পণে অসম্পূর্ণতা-দোষ থাকিতে দেওয়া উচিত হয় কি? কোনোক্রমেই না; অতএব দেখ—

মানস-সরোবরের মানচিত্রের
দ্বিতীয় সংস্করণ।

(৩) ও-কূল——জ্ঞান

(৩।।০) পাওয়া-প্রধান জ্ঞানঘ্যাঁসা মন—ঈশনা

(২) মানস-সরোবর—মন

(১।।০) চাওয়া-প্রধান প্রাণঘ্যাঁসা মন—বাসনা

(১) এ-কূল—প্রাণ

প্রথমে পাওয়া হইয়াছিল মানস-সরোবরের কূলকিনারা'র সন্ধান, এক্ষণে পাওয়া হইল মানস-সরোবরের এ-কূল হইতে ও-কূলে পৌঁছিবার ক্রমপদ্ধতির সন্ধান। আর-দুইটি বিষয়ের সন্ধান পাইতে এখনো বাকি; সে দুইটি বিষয় হ'চ্চে—(১) ত্রিগুণ-রহস্য বা ব্যক্তাব্যক্ত-রহস্য এবং (২) দ্বন্দ্ব-রহস্য বা চাওয়া-পাওয়া'র বিচ্ছেদমিলনের ব্যাপার। এ দুইটি রহস্য-ভাণ্ডারের কপাট উদ্ঘাটন আগামী মাসে হাতে লওয়া যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একথাল মিষ্টান্ন।

[সোদরা-প্রতিমা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী বহুবিধ মিষ্টান্ন নিজহস্তে প্রস্তুত করিয়া আমার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, সুতরাং—বলা বাহুল্য, এই মহীয়সী নারীটি প্রাতঃস্মরণীয়া। আমি inspired (শক্তি-আবিষ্ট) হইয়া এই কবিতাটি লিখিয়া উৎসর্গস্বরূপে তাঁহার করকমলে অর্পণ করিলাম। হায়! এই নীমনিসিন্দাময়ী পৃথিবীতে মিষ্টরসে কে না বশীভূত?]

(১)

সোদরা-সদৃশি অয়ি,　　গীতিময়ি প্রীতিময়ি,
আদরিণি শরৎকুমারি,
একথাল এই তব　　সুমধুর অভিনব
মিষ্টদ্রব্য—কি বিস্ময়কারী!
ওগুলি কি "মতিচুর"?　　কোথা লাগে কহিনুর!
"পুরকান্তি", হেমকান্তি-হারা;
"সিঙাড়া" অমৃতে গড়া　　যেন "ভারতে"'র ছড়া
যেন "গীতগোবিন্দী" ফোয়ারা!

(২)

কহিতে না পারি লাজে, আনন্দে শরীরমাঝে
কদম্বপুলক উপজয় ;
কহিতে না পারি লাজে, আমার রসনামাঝে
অকস্মাৎ ফল্গুনদী বয়।
লুব্ধ-মুগ্ধ হ'য়ে চাই !— চিত্তে তবু ক্ষোভ পাই ;—
চন্দ্রসম বিমল উজ্জ্বল
এ-হেন রতনরাশি কেমনে ফেলিব গ্রাসি ?
থাক্ জিহ্বা ! হ'স্ নে চঞ্চল !

(৩)

এমনি স্বভাব মোর ! হেরি যদি চিত্তচোর
তরু-কোলে কমনীয় ফুল,
একদৃষ্টে, তার পানে, পিপাসিত দুনয়ানে,
চেয়ে থাকি, আনন্দ-আকুল।
কর, মন নাহি সরে, কুসুমেরে সমাদরে
তরুশাখা হইতে তুলিতে।
সৌন্দর্য্যবিভোর হই, একদৃষ্টে চেয়ে রই,
এঁকে লই ভাবের তূলিতে।

(৪)

দুটি নেত্র করে মানা, চঞ্চল যে এ রসনা
"খাও খাও" বলে বারবার।
জ্বলিল জঠর-অগ্নি, কি আর বলিব ভগ্নি,
নয়ন মানিল শেষে হার !
বিশ্বজয়ী রসনার পরামর্শ চমৎকার,
আঁখিদুটি চুপে বুজিলাম !
রাশিরাশি মিষ্টরাশি বদনে ফেলিনু গ্রাসি,
অহো কি আনন্দ পাইলাম।

(৫)

তখন বুঝিনু সুখ ! কি আনন্দ, কি কৌতুক
উপজিল মুখে আর বুকে !
পিয়ে সেই মকরন্দ, নেত্র-রসনার দ্বন্দ্ব
একেবারে গেল বোন্ চুকে।

শীতকালে নদীতীরে দাঁড়াইয়া, নদীনীরে
নামিবারে, মন নাহি সরে,
শেষে কিন্তু ডুব দিয়া তনু উঠে পুলকিয়া !
তেমতি আনন্দ এ অন্তরে।

(৬)

আদরের পেস্তা দিয়া, সোহাগ-বাদাম দিয়া,
আর যতনের কিস্‌মিস্‌,
যাহুকরি কুহকিনি, গুণময়ি হে ভগিনি,
গড়েছ এ সুন্দর জিনিষ !
বাসরে সুন্দরী-কুঞ্জে কবে কোন্‌কালে ভুঞ্জে-
ছিনু আমি গীতি সুমধুর,
সে সঙ্গীত পড়ে মনে, হাসি খেলে দুনয়নে,
আস্বাদি এ মিষ্ট মতিচুর !

(৭)

হে ভগিনি যাহুকরি, নূপুর-শিঞ্জিনী পরি
শয্যা ছাড়ি, প্রাতে, অতি ভোরে,
ক্ষীরসাগরেতে গিয়া, আসিয়াছ ডুব দিয়া,
তুমি বুঝি স্বপনের ঘোরে ?
নন্দনকাননে গিয়া, কল্পশাখা দোলাইয়া,
তুমি বুঝি পেড়েছিলে ফুল ?
তুলেছিলে পারিজাত ? তাই এত মিঠে হাত,
কুসুমসৌরভে সমাকুল !

(৮)

তোমার এ মিষ্টপনা, তোমার এ-গুণপনা,
বিলোকিয়া তোমার এ রীতে,
(আমিও জ্যোতিষী ভারি !) গণিয়া বলিতে পারি
তোমার চরিত্র, সুচরিতে ?
হেরিলে কাঙালজন, ঝরে তব দুনয়ন,
অন্নপূর্ণে ! তুমি মুক্তহস্ত ;
ভাসে সে আনন্দনীরে, শুধুহাতে নাহি ফিরে
দ্বারে কেহ হইলে দ্বারস্থ।

(৯)

রোগার্ত্তে হেরিলে পরে, তোমার দুচক্ষু ঝরে,
হোক্ না সে চণ্ডাল অধম !
দিবারাতি অনিবার সেবা তুমি কর তার,
ত্যজি অবলজ্জা কুসরম।
হে স্বামি ! হে অন্তর্যামি ? কি আর বলিব আমি ?
পূর্ণ কর এ ভিক্ষা আমার,—
পুত্রকন্যা ক্রোড়ে ধরি, "মতি"-মালা * গলে পরি,
সর্ব্ব-শোভা সর্ব্ব-গুণাধার,
সুখে থাক্ ভগিনী আমার।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

পিতৃভুমি এবং মাতৃভুমি।

আর্য্যজাতীয় কবিরা আদিমকাল হইতে পিতা-মাতার উপমা দিয়া আসিতেছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুই অক্ষকোটির (poleএর) সহিত। সকলেই তাঁহারা একবাক্যে পিতা'র উপমা স্থা'ন আকাশের সহিত, মাতার উপমা স্থা'ন পৃথিবীর সহিত। তাঁহাদের সকলের মুখে একই কথা—তবে কিনা, ভিন্ন-ভিন্ন-রকমের ভাষায়। কেহ বলেন "পিতামহ চতুর্মুখ ব্রহ্মা" (খুব সম্ভব যে, চতুর্মুখের গোড়া'র কথা আকাশের চারিদিক্—চারিবেদের প্রভবরূপী চতুর্মুখ ...রুত আধুনিক, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; সকলেই জানে যে, চতুর্থবেদ অথর্ব্ব, বেদের একটা উপসর্গমাত্র); কেহ বলেন "দ্যুপিতা" (Jupiter), কেহ বলেন "Heavenly Father"—সবই আকাশ-ব্যঞ্জক। লোকপ্রসিদ্ধ শ্লোকই আছে যে, "মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা"—মাতা ভূমি হইতে গুরুতর, পিতা আকাশ হইতে উচ্চতর। এটাও একটা সুপ্রসিদ্ধ শ্লোক যে, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী!" এখানে জন্মভূমির উপমা দেওয়া হইতেছে জননীর সহিত, জনকের সহিত নহে। তা ছাড়া, সর্ব্বদেশের (বিশেষত আর্য্যপ্রধান দেশের) সর্ব্বলোকেই বলে পৃথিবী-মাতা, Mother earth। এ তো সকলেরই জানা কথা; কিন্তু এই সর্ব্ববাদিসম্মত কথাটির সঙ্গে আর একটি কথা জোড়া লাগানো আছে—সেটাও বিবেচ্য। সে কথাটি জন্মভূমির কৃতী

* ইনি সুবিখ্যাত মাননীয় মতিলাল ঘোষ ব্যারিষ্টার মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী।

সন্তানদিগের তেজোময় প্রাণের কথা, তা বই, তাহা জন্মভূমির আদুরে ছেলেদিগের কথা নহে। সে কথা এই যে, জন্মভূমি যেমন মাতা, দেশের পিতৃপুরুষেরা তেম্‌নি পিতা। সে কথার ভিতরের কথা এই যে, দেশের পূর্ব্বতন এবং অধুনাতন পিতৃপুরুষদিগের প্রতাপে এবং আশীর্ব্বাদে জন্মভূমির গায়ে হাত তোলে কাহারো এত-বড় যোগ্যতা নাই; সংক্ষেপে,—জন্মভূমি অনাথা জননী নহে, জন্মভূমি সনাথা জননী। বীরপুরুষেরা যখন দেশরক্ষার জন্য একজোট হ'ন, তখন তাঁহারা কচিখোকার ন্যায় "মাতা মাতা" শব্দ ধ্বনিত না করিয়া দেশের পিতৃপুরুষদিগের নাম ধ্বজপতাকায় স্বর্ণাক্ষরে গ্রথিত করিয়া ল'ন। আমাদের দেশের সহজপ্রকৃতির লোকেরাও আপনাদের পুরাতন আমলের বসত্‌বাটীকে "পৈতৃক ভিটা" বলে—কেহই "মাতৃক ভিটা" বলে না। Patriotশব্দের মূল উপাদান পিতৃশব্দ—মাতৃশব্দ নহে। Patriotismশব্দের গোড়া-ঘ্যাঁসা অর্থ কি? "পিতৃপুরুষদিগের প্রভাবব্যঞ্জক ভূমির প্রতি অনুরাগ"—এই তাহার মর্ম্মান্তিক অর্থ।

জর্ম্মান্‌দেশ বীরের দেশ, তাই জর্ম্মাণির লোকেরা আপনাদের দেশকে "পিতৃভূমি" বলে। দেশের পিতা থাকিতে কেহ মাতার নামে দেশকে সংজ্ঞিত করে না। উপনিবেশীরা বটে আপনাদের আদিমনিবাসকে মাতৃভূমি বলিয়া থাকে—যেমন ইংলণ্ডকে অষ্ট্রেলিয়েরা, এমন কি, মার্কিণেরাও। আমাদের দেশের যদি পিতা থাকিত, তবে আমাদের এরূপ দুর্গতি হইত না। আমাদের দেশের আমরা একপ্রকার উপনিবেশী; কাজেই আমাদের দেশকে মাতৃসম্বোধন করিয়া ক্রন্দন করা আমাদের পক্ষে শোভা পায়—কিন্তু নিশান উড়ানো নৈব চ নৈব চ! এরূপ বিসদৃশ কার্য্য সমজ্‌দার লোকের চক্ষে নিতান্তই একটা হাস্যজনক বেসুরা-কাণ্ড। দেশকে যদি পিতৃভূমি (!) বলিতে পারো তো নিশান উড়াও—না পারো তো নিশান গুটাইয়া রাখিয়া স্বদেশের যাহাতে সত্যসত্য মঙ্গল হয়, তাহাতে কোমর বাঁধিয়া লাগো; নিশান উড়ানো এখন মুল্‌তুবি থাক্‌। তবে যদি স্বদেশকে মাতৃসম্বোধন করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা কর, তবে সে ইচ্ছার চরিতার্থতার পক্ষে মাতৃসম্বোধনই উপযুক্ত সম্বোধন, তাহা খুবই ঠিক্‌; কিন্তু তা বলিয়া যাহার-তাহার কাছে কাঁদিয়া বেড়ানো উচিত হয় না। আমরা যদি আসল জায়গায় সত্যিকে'র কান্না কাঁদি, তবে সেরূপ কান্নার ফল আছে; কিন্তু তাহা আমরা করিতেছি কৈ? যিনি অগতির গতি, তাঁহার কাছে ক্রন্দন না করিয়া—আমরা ক্রন্দন করিতেছি অরণ্যে। আমাদের উল্লাসও যেমন, ক্রন্দনও তেম্‌নি, দুইই পাত্রাপাত্র-বিরহিত, কাণ্ডজ্ঞান-বিরহিত।

দেশের ব্যথার ব্যথী।

রাজতপস্বিনী।

[জীবনীপ্রসঙ্গ]

১৫

রাজদরবারে একশ্রেণীর লোক দেখা যায়, যাহাদিগকে সাধারণত বহুরূপীর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। বহুরূপী যখন যার উপর ভর করিয়া শিকার করে, তখন তাহার সেইরূপ রং, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য যে আহার্য্যান্বেষণ, তাহাতে তাহার কখন ভুলচুক্ হয় না। পুটিয়ার রাজসভায় সেই প্রকৃতির একটি লোক ছিলেন। সামান্য কাজে প্রবেশ করিয়া ক্রমশ তিনি পদস্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা যে বিদ্যাবুদ্ধি অথবা কার্য্যকুশলতার বলে, এমন বলিতে পারি না। বহুরূপ এবং তির্য্যগ্‌গতিতে তিনি পারদর্শী ছিলেন এবং আজীবন তাহাই তাঁহার সাধনার বিষয় ছিল। জীবনসংগ্রামে জয়লাভ প্রকৃতির নিয়মানুসারে বলবানেরই হইয়া থাকে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে সামর্থ্যের সংজ্ঞা কেবল শারীরিক এবং মানসিক শক্তিতেই আবদ্ধ নহে। যাঁহার কথা হইতেছে, সাদাসিধে চাল ও পরামর্শ কখন তিনি পছন্দ করিতেন না। মসলার প্রাচুর্য্য নহিলে অনেকের যেমন সুপক্ব ব্যঞ্জনও মুখরোচক হয় না; সব কাজে একটু চাণক্যনীতির ছিটেফোঁটা না থাকিলে ইনি তেম্‌নি তাহাতে যথেষ্ট গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিতেন না। রাজকুমার যেদিন প্রথম পলায়ন করেন, তাহার পরদিন পুলিস্‌বিভাগের তখনকার কর্ত্তা বিখ্যাত মন্‌রোসাহেব পুটিয়ার থানা পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সকল শুনিয়া তিনি মহারাণীকে আশ্বস্ত করেন এবং পুলিসের উপর কড়া হুকুম দিয়া যান, কুমারকে যেখানেই পাওয়া যাক্, আনিয়া দিতে হইবে। কুমারের গৃহে প্রত্যাগমনের পর পরামর্শ স্থির হইল, মন্‌রোসাহেবকে বিপদের দিনে সহানুভূতি ও সহায়তার জন্য ধন্যবাদ দিয়া মহারাণীমাতার তরফ হইতে একখানি পত্র লেখা হউক্। এই চিঠির মুসাবিদার ভার আমাদের উপর পড়িল। উহাতে সাদাকথায় প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করা হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারিমহাশয় বলিয়া বসিলেন যে, ঠিক্ কথা লিখিলে কুমারমহাশয়ের উপর দোষ পড়িবে। লেখা হউক যে, তিনি আপনা-আপনি ফিরিয়া আসিতেছিলেন, পথে রাজকর্ম্মচারীদের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, তাঁহার কথা টিকে নাই। মুখে ইনি সকলকেই পরিতুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু বহুরূপীরা কখন বেশীদিন লোকচক্ষুকে প্রতারিত করিতে পারে না। সাধারণ্যে তাঁহার নাম রটিয়াছিল—"মিছরির ছুরী।" সে যাহা হউক, তাঁহার চরিত্রের একটা দিকে কিঞ্চিৎ হাস্যরসের অবসর ছিল। ফলের মধ্যে কাঁঠাল তাঁর অতিরিক্ত প্রিয় ছিল। একবার অজীর্ণরোগে চিকিৎসক তাহার ব্যবহার বিশেষরূপে নিষেধ করায় তিনি প্রায় রোদনোন্মুখ হইয়া

বলিয়াছিলেন—"তেমন করিয়া বেঁচে থাকার সুখ কি?" আর একবার প্রভুচরিত্রজ্ঞ পুরাতন ভৃত্য জমাখরচ লেখাইতেছিল। অন্যান্য দ্রব্যের ফর্দ্দ দিয়া সে বলিয়া বসিল—"লিখুন, কাঁঠাল চারি-আনা!" মনিব কিছুতে মনে করিতে পারিতেছিলেন না যে, লিখিত তারিখে তিনি তদীয় প্রিয়ফলটির রসাস্বাদন করিয়াছিলেন। অতএব অবাক্ হইয়া প্রায় আধঘণ্টা ভাবিলেন। শেষে বলিলেন—"যা করেছ, তা করেছ; এমন কাম্ আর করিস্ না!"

ইনি অনেকদিনের কর্ম্মচারী—মহারাণীর পিতার আমলের। কাজেই স্বার্থসিদ্ধির জন্য যতটা আড়ম্বর করিয়া জাল পাতিবার দরকার মনে করিতেন, তাহার চেয়ে অনেক কম আয়াসে কাজ হাসিল হইত। মহারাণী ইহাকে বেশ চিনিতেন, কিন্তু চক্ষুলজ্জায় কিছু বলিতে পারিতেন না। তবে তিনি কখন অনুমান করিতে পারেন নাই যে, এই লোকটা নিজের উন্নতিলাভের আশায় তাঁহার ব্যক্তিগত-অনিষ্ট-চেষ্টাতেও পশ্চাৎপদ হইবে না। সাবালক হইবার পূর্ব্বেই কুমারের বৈষয়িকব্যাপারে হস্তার্পণ করার কথা বলিয়াছি। এই কর্ম্মচারীটি তখন হইতেই তাঁহার খাস্‌দরবারে যাতায়াত করিতে সুরু করেন। শেষে কুমারকে মাতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী হইবেন, এ দুরাশাও তাঁহার হইয়াছিল। রাজকুমার এই ধৃষ্টতা সহ্য করিতে পারিলেন না। একদিন মহারাণীমাতাকে সব কথা বলিয়া দিলেন। সংসারে এতটা বিশ্বাসঘাতকতা থাকিতে পারে, মহারাণী ইহা জানিতেন না, অতএব বলিলেন, "না বোকন, তোমার ভুল হইয়াছে,—ইহা কি সম্ভব?" কুমার তাঁহার প্রত্যেক কথা প্রমাণ করিয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়া মাতার নিকট প্রস্তাব করিলেন, গুপ্তভাবে থাকিয়া একদিন তাঁহাকে তাঁহাদের দুজনের বিশ্রম্ভালাপ শুনিতে হইবে। মহারাণী প্রথমে ইহাতে সম্মত হন নাই, কিন্তু শেষে পুত্রের অনুরোধ ও মাথার দিব্য উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। নির্দ্দিষ্টদিনে কুমার বহির্ব্বাটীর মন্ত্রণাগৃহে কর্ম্মচারীটিকে ডাকাইয়া নিভৃতে তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন—মাতাকে অন্তরালে থাকিয়া সকলই শুনিতে হইল! কিন্তু তিনি সেই অকৃতজ্ঞ বয়োবৃদ্ধটিকে কোন অনুযোগ করিলেন না, বরং পাছে সে মাতাপুত্রের সেই ষড়্‌যন্ত্রের কথা জানিতে পারে, ইহা ভাবিয়া লজ্জিত হইয়াছিলেন। কথাটা পরে প্রকাশ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কর্ম্মচারিমহাশয় ইহা গায়ে মাখেন নাই। বরং কুমারবাহাদুর শেষে স্পষ্টভাবে তাঁহার দুরাশায় বাদ সাধিলে ইনি তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি জানেন যে, আমি ইচ্ছা করিলে আপনাকে পথের ভিখারী করিতে পারি। আপনি মস্তক, তাহা আমি অসিদ্ধ করিতে পারি।" ম—মহাশয়ের এই সাহস মুমূর্ষুর শেষ-উত্তম-তুল্য,—কেন না, এক হস্ত কণ্ঠদেশে, অন্য হস্ত পদতলে, ঘোর স্বার্থান্ধ বৈষয়িকের এই জীবন্তচিত্র তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল। কুমার উত্তরে কেবলমাত্র বলিয়াছিলেন,—"আমায় অসিদ্ধ করিয়া আপনি কি মস্তক হইবেন?"

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

রাইবনীদুর্গ।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বনকুঞ্জের কথা যখন বলিতে বসিব, তখন আর রাধাচরণকে অভয়ানন্দ নামে না-ই ডাকিলাম। "ঘরের মেয়ে তার কি সাজে সংস্কৃতনাম?" ফলত আটপৌরে নামের সঙ্গে স্মৃতির গানে সুখ ও দুঃখের সুর এবং তানের যে লয় হয়, পোষাকিতে সে সঙ্গতি নাই। কথাটা বিদেশীকবির সুপ্রসিদ্ধ কবিতাবিশেষের ঠিক উল্টা হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু বাস্তবিক নামে কি এসে-যায় না? অন্তত যে সুসভ্যসমাজে কবিতাটির জন্ম, উহা তাহার মর্ম্মকথা নহে, ইহা নিশ্চয়। এক মন্ত্রী গ্লাড্‌ষ্টোন্ ছাড়া সেখানে নামান্তরগ্রহণে কাহারও অরুচির কথা শোনা যায় না। কবি টেনিসন্‌ও সে মোহ কাটাইতে পারেন নাই।

মথুরার সিংহাসন অধিকৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপনে কি প্রকাশ্যে পুনরায় বৃন্দাবনধামে সশরীরে দর্শন দিয়াছিলেন, ইতিহাসে কি কাব্যে এমন কথা নাই। কিন্তু বাসন্তী অথবা শারদীয়া নিশায় কৌমুদীপ্রফুল্ল যমুনাপুলিনের শোভা দেখিয়া গোকুলের জন্য তিনি বিহ্বল হইতেন এবং রাজোদ্যানে বিকচ বকুলের সুগন্ধে আত্মবিস্মৃত হইয়া ব্রজধামের বনপথে মধুর বংশীধ্বনি শুনিতে পাইতেন, কল্পনা ও প্রেমের এই চিত্র চিরদিন হিন্দুজগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তথাপি রাজাধিরাজ শৈশব এবং কৈশোরের সেই লীলাস্থলের অত কাছে থাকিয়া একটিদিনের জন্যও সেখানে পদার্পণ করিলেন না, ভাবিলে কেমন একটু খট্‌কা বাধে। যিনি ভগবানের অবতার বলিয়া পরিচিত, ইহা কি তাঁহার আত্মসংযমের পরিচায়ক, না কুশলী কবিশিল্পীরা রংএর উপর রং ফলাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই?

বস্তুত সেই অতিমানুষ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্র অঙ্কিত করিতে যে কুশলতার প্রয়োজন, এ ক্ষুদ্র লেখকের তাহা নাই। সেইজন্য রাধাচরণকে আবার বনকুঞ্জে লইয়া যাইতে কোন দ্বিধাবোধ করিতেছি না।

রাধাচরণ পরিব্রাজক উদাসীনের বেশে বনকুঞ্জগ্রামে প্রবেশ করিলেন। প্রায় বিশবৎসর পরে! মনুষ্যজীবনের যে প্রভাতে প্রেমই প্রায় সর্ব্বস্ব,—জ্ঞানের উন্মেষমাত্র দেখা দেয়,—তাহাই এই তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহার কাটিয়াছিল। দুঃখিনী অনন্তস্নেহশালিনী জননীর শেষ বিদায়-অশ্রু এইখানেই ধরিত্রীবক্ষ সিক্ত করিয়াছিল। অপত্যবৎ প্রীতিতে যিনি লালনপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে বাল্যসখীর সংসর্গ-বিচ্যুত না হইলে জীবন সুখশান্তিতে মধুময় হইয়া উঠিতে পারিত—তাঁহাদের সকলেরই স্মৃতি ইহার প্রত্যেক ধূলিকণার সঙ্গে জড়িত। গ্রামে প্রবেশ করিয়া চিরপরিচিত সোজাপথে রাধাচরণ দীর্ঘিকার দিকে চলিলেন। সেই ক্ষুদ্র আম্রকাননের তরুগুলি সময়ধর্ম্মে ভুজে ভুজে নিবিড়বন্ধনে একে অন্যকে আলিঙ্গন

করিয়াছে, তাহারই নিকটে [বাঁধাঘাটের] অদূরে তাঁহার স্বহস্তরোপিত কদম্বগাছ-দুইটি অসম্ভব বাড়িয়া উঠিয়াছে। গৈরিক-বসনধারী রাধাচরণ তাহারই ছায়াতলে উপবেশন করিয়া মথিতহৃদয় সংযত করিতে চেষ্টা করিলেন।

তখন শরৎকাল শেষ হইয়া আসিয়াছে। দীর্ঘিকার কমলদল আর অজস্র ফুটিয়া দিক আলো করে না। তাহার পরিবর্ত্তে শতশত ঘনহরিৎ পদ্মফল মাথা তুলিয়া আছে—তাহাদের অবকাশপথে জলচরপক্ষীরা দলে দলে বিচরণ করিতেছে। কিন্তু সেকালের মত সুন্দর কোমল হাতদুখানি তুলিয়া কোন বালিকা তাহাদিগকে আহারসংগ্রহে আহ্বান করিতেছিল না।

রাধাচরণ স্নিগ্ধ ছায়াতলে বসিয়া বসিয়া আত্মহারা হইতেছিলেন। তখন বেলা প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। ভদ্র কুলকামিনীরা স্নানার্থে দীঘির দিকে আসিতেছিলেন। ঘাটের ধারে তেজঃপুঞ্জময় নবীন সন্ন্যাসীকে সেভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহারা সঙ্কুচিত হইতেছিলেন। বুঝিয়া রাধাচরণ সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নারায়ণী দেবী প্রাতঃস্নান এবং শিবপূজা শেষ করিয়া গৃহকর্ম্মে মন দিবার পূর্ব্বে খোঁজ লইতেছিলেন, সেদিন কোন অতিথি-অভ্যাগতের বহির্বাটীতে সমাগম হইয়াছে কি না। দীঘির ঘাট ত্যাগ করিয়া রাধাচরণ বাল্যের সেই আবাসগৃহের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, পথে ছেলের দল তাঁহার সঙ্গ লইল। সুতরাং একটু পরে বাহিরে জনতা দেখিয়া গৃহকর্ত্রী স্বয়ং সেখানে দেখা দিলেন।

রাধাচরণকে কেহ চিনিতে পারিতেছিল না, কিন্তু নারায়ণী দেবীর মূর্ত্তিতে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল তাঁর সুদীর্ঘ কেশগুলি সব শুক্ল হইয়া গিয়াছিল মাত্র। সন্ন্যাসী তাঁহাকে দেখিয়াই সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন। ভয়, নহিলে পাছে তিনি প্রথমে প্রণাম করিয়া ফেলেন। ইহাতে কিন্তু বৃদ্ধা বড় অসন্তুষ্ট হইলেন। অনিষ্টাশঙ্কায় বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন,—"বাবা, তুমি সন্ন্যাসি-গোঁসাই, আমায় নমস্কার করে' কেন অকল্যাণ করিলে?"

প্রণামের সময় গোঁসাইয়ের বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল,—কেন না, জীবনে এমনদিন তাঁহার আসিয়াছিল, যখন এই পুণ্যময়ী বর্ষীয়সীকে তিনি গর্ভধারিণী জননী হইতে অভিন্ন ভাবিয়াছেন। আজ স্মৃতির উপর স্মৃতির তরঙ্গ আসিয়া হৃদয়মন তাঁহার প্লাবিত করিতে-ছিল। ব্রহ্মচারীর মোহবন্ধ কই ছিন্ন হয় নাই, অদর্শনে এতদিন তাহাতে একটা ভ্রমাত্মক আত্মপ্রত্যয়ের আবরণ পড়িয়াছিল মাত্র। প্রণাম করিতে করিতে তিনি ভাবিতেছিলেন, সেই মুহূর্ত্তে নিজের পরিচয় দিয়া অকৃতজ্ঞতার জন্য মাতার কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করিবেন। নহিলে হৃদয়ভার কিছুতে লাঘব হইতেছিল না। কিন্তু নারায়ণী দেবীর কথায় সে সঙ্কল্প তখনকার মত স্থগিদ রহিল। উদ্বেল হৃদয় দমন করিয়া, সজল চক্ষের বারিবিন্দু নিমেষে রোধ করিয়া রাধাচরণ উচ্চহাস্য করিলেন। পরে বলিলেন,—"মা, আপনার মত বয়োবৃদ্ধা ব্রাহ্মণকন্যারা চিরদিনই মাতৃস্বরূপা এবং মনুষ্যলোকে পূজনীয়া। অকল্যাণের কথা কেন মনে

করিতেছেন। আমি মাতৃপদে প্রণাম করিয়াছি, আশীর্ব্বাদ করুন।”

সেই আত্মদমনের চেষ্টা এবং কথা-কহার প্রণালী কতকটা বালক রাধাচরণের মত। কতদিন সরলা 'কৃষ্ণপ্রিয়াকে ভুলাইয়া রাধাচরণ একাকী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া আসিত এবং শেষে তাঁহাদের কাছে এমনি করিয়া আত্মদোষক্ষালনের চেষ্টা করিত। অনেকদিন পরে আজ তাহা বৃদ্ধার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। কে যেন সহসা তাঁহাকে বলিয়া দিল—সেই বটে, সম্মুখে তোমার সেই হারাধন রাধাচরণই বটে!

সামান্যা স্ত্রীলোক হইলে এই প্রতীতি-মাত্রেই নারায়ণী দেবী সকলের সমক্ষে মনোভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলিতেন এবং কাঁদিয়া-কাটিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইতেন। কিন্তু তিনি তাহার কিছু করিলেন না। কেবল বলিলেন, “তোমার মত অতিথির আগমনে বাড়ী আমার পবিত্র হ'ল। বেলা হয়েচে, স্নানাহ্নিক কর।” ছেলের দলের প্রতি স্নেহকোমল দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—“বাবাসকল, সন্ন্যাসি-ঠাকুরকে ঘিরিয়া বিরক্ত কোরো না। তোমরা সব ঘরে যাও।”

এমন সময়ে নিকটে দ্রুতগামি-অশ্বপদ-ধ্বনি শোনা গেল। কৌতূহলী ছেলের দল সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। একটু পরে কুমার পদ্মাক্ষনারায়ণ সহাস্য-মুখে মাতামহীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পাদস্পর্শ করিতে গেলেন। বৃদ্ধা অন্নায়ী দৌহিত্রের স্পর্শভয়ে দুই হাত সরিয়া গিয়া বলিলেন—“হয়েচে হয়েচে, রোজ রোজ আবার পেরণাম কি?” কুমার হাসিয়া কহিলেন, “দিদিমা, আমায় ছুঁলে না, অপমান কর্‌লে, তবে আমি আর দাঁড়াব না, আবার এখুনি শিকারে যাই।” দিদিমা জানিতেন, মৃগয়াব্যাপারে তাঁর নাতিটির যে কথা সেই কাজ। একটু শঙ্কিত হইয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু-স্বরে বলিলেন, “ছি, ও কথা বলিতে নাই। গোঁসাই কি ভাবিবেন!” ইহাতে কুমার অপাঙ্গে মাতামহীকে ঠোঁট ফুলাইয়া যে সহাস্য জবাব দিলেন, তার উত্তরে অন্যসময়ে তাঁহাকে কানমলা খাইতে হইত। কিন্তু এখন কেবল “পাথ্‌মারা” ও “শ্যালক” দিদিমার এই প্রিয় গালিদুইটি লাভ করিয়া “খিদে পেয়েচে, খেতে দেবে এসো” বলিতে বলিতে অন্দরপথে ছুটিয়া চলিলেন।

নারায়ণী দেবী তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অতিথিকে অন্দরে আহ্বান করিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “এটি কৃষ্ণ-প্রিয়ার ছেলে! ভগবান্ ঐটুকু দিয়া তাহাকে চিরদুঃখিনী করিয়াছেন।” রাধাচরণ তাঁহার পশ্চাতে ভিতরবাড়ীতে প্রবেশ করিতে-ছিলেন, দুইফোঁটা চোখের জল তাঁহার গণ্ড বাহিয়া পড়িল।

ক্রমশঃ।

রেখা'র জাতিভেদ

এবং বসিবার-দাঁড়াইবার কেতা।

(১) মুখী বা মুখাঙ্গী রেখা।

মুখী বা মুখাঙ্গী রেখা, দুইদল স'ঙ্গ।
এক দল উর্দ্ধ-মুখী, অধো-মুখী অন্য॥
চারি-জোড়া মুখী রেখা সবেমাত্র পুঁজি।
ক্ষেত্রে করি নেত্রপাত, পাত্র লও খুঁজি॥
উর্দ্ধমুখী ধ্বজা ধরি যুদ্ধে চলে বীর।
নিম্নমুখী যষ্টি ধরি, সমঝি' চলে ধীর॥
উর্দ্ধমুখী তলোয়ার ফতে করে কাজ।
নিম্নমুখী তলোয়ার সিপাহীর সাজ॥
উর্দ্ধমুখে ছাড়ে শর কিরাতের ছেলে।
তিমির নিরখে তিমি নিম্নমুখী শেলে॥
উর্দ্ধমুখী দাত্রখানি পাত্র অনিবার্য্য।
নিম্নমুখে ঝুলি' রহে সমাপিয়া কার্য্য।

অধ-উর্দ্ধ-মুখী | যষ্টি | অসি | শর | দাত্র

মুখী বা মুখাঙ্গী এই চারিজোড়া মাত্র॥

মুখাদের আরম্ভ
এবং সমাপ্তি।

নিম্নমুখী দেখিবে যদি
হের' তবে নদনদী।
পবর্বতে নিবসতি।
পারাবারে মতিগতি॥

ঊর্দ্ধমুখী দেখ্‌তে চাও ?
হাউই-চোঙে আগুন দাও ॥
অমনি অবনী করিয়া তুচ্ছ।
আকাশে উঠিবে নাড়িয়া পুচ্ছ ॥

দেখ চেয়ে :—
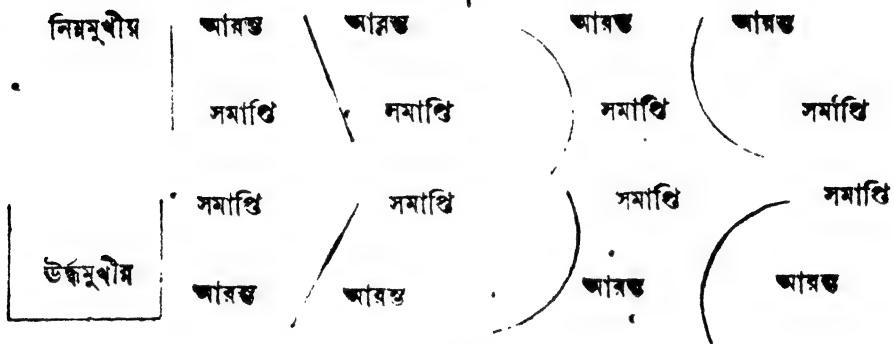
(২) শায়ী রেখা।

মুখাঙ্গী যাহারা তা'র শায়ী থাকে শুয়ে।
উচ্চশায়ী উচ্চে শো'য়, নিম্নশায়ী ভূঁয়ে ॥

দেখ চেয়ে :—

বত্রিশ সিংহাসন।

ঋষিকে চড়িয়া ইএঞা বাঁচিল পলা'য়ে।
অন্তস্থ ব উড়ি' গেল আপন কুলায়ে ॥
(এ দুটা আছিল মোর দু-চক্ষের বিষ !)
চৌত্রিশের দুই গেল, রহিল বত্রিশ ॥
আসিয়াছে আমার বত্রিশ সিংহাসন।
বত্রিশ অক্ষর যার বত্রিশ বাহন ॥
মন্ত্রপূত পায়া চারি রাখিলাম খুলি'।
খোপে খোপে কি সুন্দর পুতুলা পুতুলী ॥

দেখ চেয়ে :—

(১)

কএর কর্কশ কণ্ঠ কঠোর ঠোকোর ;
চএর চাহনি চারু চঞ্চল চকোর ;
কখগঘ ভায়াদের চছজঝ জায়া।
বত্রিশ সিংহাসনের আস্ত এই পায়া॥

(২)

তএর তনুর তেজ তিমিরের বাঘ।
পএর পায়ের রাগ পদ্মের পরাগ॥
তথদধ ভায়াদের পফবভ জায়া।
বত্রিশ সিংহাসনের দোস্‌রা এই পায়া॥

(৩)

ম-নাবিক না' ভিড়ায় নেহারিয়া ডাঙা ;
টানা আঁখি টএর, ঠএর ঠোঁট রাঙা॥
নণমঙ ভায়াদের টঠডঢ জায়া।
বত্রিশ সিংহাসনের তেস্‌রা এই পায়া॥

(৪)

র রাজরাজেশ্বর রঘুপতি রাম।
স সীতা সোনার লতা সৌদামিনী-দায়।

রলযহ ভায়াদের সষশক্ষ জায়া।
বত্রিশ সিংহাসনের চৌঠা এই পায়া॥

বড়-মেজো-সেজো-ছোটো।

ক-চ ত-প ন-ট র-স বর্গের গোড়া।
খ-ছ থ-ফ ণ-ঠ ল-ষ মেজো জোড়া জোড়া॥
গ-জ দ-ব ম-ড য-শ সেজো এই অষ্ট।
ঘ-ঝ ধ-ভ ঙ-ঢ হ-ক্ষ ছোটো এরা পষ্ট॥

জোড় মিলন।

ক-চ খ-ছ গ-জ ঘ-ঝ মাণিক-জোড় শেরা।
ত-প থ-ফ দ-ব ধ-ভ চখাচখী এরা॥
ন-ট ণ-ঠ ম-ড ঙ-ঢ নট-নটী চারি।
র-স ল-ষ য-শ হ-ক্ষ কিবা শুকসারী॥

মাথা আর মুখ-হাত।

যেখানে আরম্ভ যা'র সে-ই তা'র মূল।
গৌরবের মূল গুরু, সৌরভের ফুল॥
নৌকা-মূলে কর্ণধার, শর-মূলে পক্ষ।
কোথায় কাহার মূল, করা চাই লক্ষ্য॥
যেদিকে যাহার টাঁক সেই দিকে মুখ।
সিন্ধুমুখী নদনদী, সারীমুখো শুক॥
নৌকা-মুখ কূলে ঠ্যাকে, শরমুখ লক্ষ্যে।
কোথায় কাহার মুখ দেখা চাই চক্ষে॥
আগা কোথা, গোড়া কোথা, করা চাই স্থির
আগাটাই জেনো মুখ, গোড়াটাই শির॥

আপত্তি।

যেথার বরণ সাপের জাত।
কোথা বা চরণ, কোথা বা হাত॥

আপত্তি-খণ্ডন।

হো'ক্ না—ওরা সাপের জাত।
মুখের আগা'ই ওদের হাত।

হাত যে মুখের আগা সাক্ষী তার তিন।
ভুজঙ্গ বিহঙ্গ আর মাতঙ্গ প্রবীণ॥
এক-নাগের ফণা শোভা, আর-নাগের শুণ্ড।
হস্ত বলো হস্ত তাহা, তুণ্ড বলো তুণ্ড॥
সারসের চঞ্চুহাত চলে খুব তেজে।
খগে নাগে একবাক্য—বেদবাক্য এ যে!

দেখ চেয়ে :—
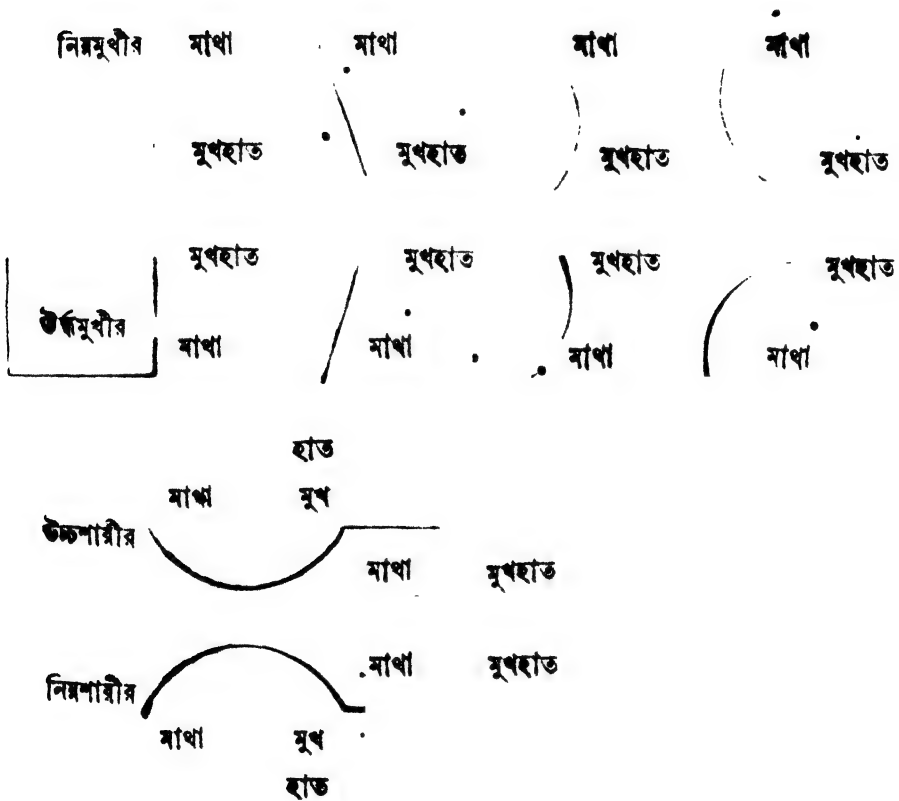
নরনারীর শিরশ্চিহ্ন
এবং চাক্ষুষলক্ষণ।

নরের মাথায় চুলের ধাক্তি।
নারীর মাথায় খোঁপা'র চাক্তি॥

দেখ চেয়ে :—

আবার তা'ও বলি—

যোষিৎ চোখোলো, পুরুষ অন্ধ।
খনা'র বচন এ নহে মন্দ॥

তার সাক্ষী :—

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রার্থনা।

আমার মাথা নত করে' দাও হে তোমার
চরণধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

নিজেরে করিতে গৌরবদান
নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।
আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে ;
তোমারি ইচ্ছা কর হে পূর্ণ
আমার জীবনমাঝে।
যাচি হে তোমার চরম শান্তি,
পরাণে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়পদ্মদলে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খেয়া-ডিঙি।

[ভাদ্রচিত্র]

পাটের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে
ঘাটের ডিঙা বাই,
তবু আমার হাটের সাথে
কোন বাঁধন নাই।
শিরা-ওঠা ফাটা হাতে
হালের গোড়া ধরি,—
আমি শুধু আপন মনে
এপার-ওপার করি।

তোমরা ভাব ক্ষেত আর ফসল
বিষ্টি-বাদল-বান,
ডুব্‌ল কত বাঁচ্‌ল কত
ভরা ভাদুই ধান
আমার কিন্তু সে সব দিকে
খেয়াল-খবর নাই,
আমি আমার নিয়মমতন
ঘাটের ডিঙা বাই।

ভাদর আসে মরা-গাঙে
ভরা বন্যা নিয়ে,
রাঙা-জলে এপার-ওপার
একসা করে' দিয়ে;
লগির গোড়া পায় না তলা
মিলেনাক থই,
দিনে-রাতে তবু আমার
ঘাটের ডিঙা বই।

হঠাৎ যেদিন বানের জলে
ছাপিয়ে পড়ে মাঠ,
হাঁটু-নাগাল ধানের জমি
গলা-নাগাল পাট
কানাকানি বানের জলে
ধানের আগা দোলে,
টলমলিয়ে ডিঙা আমার
চলে তারি কোলে।

কোথায় বা সে আলের রেখা
কোথায় বা সে বাঁধ,
বাবলাগাছের বেড়া নিয়ে
কোথায় বা বিবাদ!
বাঁধনহারা বানের মুখে
বিধিবিধান নাই
পাথারসম সাঁতার-ক্ষেতে
ঘাটের ডিঙা বাই।

কোমর-জলে দাঁড়িয়ে, কসে'
কাস্তে চালায় চাষী,
ধানের শীষের সোঁদাগন্ধ
হাওয়ায় বেড়ায় ভাসি;
কাজল কটা ধানের ডগা
নুইয়ে জলের তলে,—
মস্‌মসিয়ে তারি মাঝে
ডিঙা আমার চলে।

আঁটীবাঁধা ধানের রাশি
এপার-ওপার করি,
পালাবাঁধা পাটের গাদা
বোঝাই করে' মরি।
দিনে-রাতে কত লোকের
কত কথা শুনি,
আমি বসে' আপন মনে
খেয়ার কড়ি গুণি।

জলের গায়ে সিঁদুর ঢেলে
সূয্যি উঠে পূবে
দিনের খেয়া সেরে আবার
পশ্চিমেতে ডুবে;—
বারমাসে একটিদিনও
ছুটি কামাই নাই,
তারি সাথে আমি আমার
ঘাটের ডিঙা বাই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী।

বঙ্গদর্শন।

সাহিত্যসৃষ্টি।

যেমন একটা সূতাকে মাঝখানে লইয়া মিছরির কণাগুলা দানা বাঁধিয়া উঠে, তেম্নি আমাদের মনের মধ্যেও কোনো-একটা সূত্র অবলম্বন করিতে পারিলেই অনেকগুলা বিচ্ছিন্নভাব তাহার চারদিকে দানা বাঁধিয়া একটা আকৃতি-লাভ করিতে চেষ্টা করে। অস্ফুটতা হইতে পরিস্ফুটতা, বিচ্ছিন্নতা হইতে সংশ্লিষ্টতার জন্য আমাদের মনের ভিতরে একটা চেষ্টা যেন লাগিয়া আছে। এমন কি, স্বপ্নেও দেখিতে পাই, একটা কিছু সূচনা পাইবামাত্রই অম্নি তাহার চারিদিকে কতই ভাবনা দেখিতে দেখিতে আকারধারণ করিতে থাকে। অব্যক্ত ভাবনাগুলা যেন মূর্ত্তিলাভ করিবার সুযোগ-অপেক্ষায় নিদ্রায়-জাগরণে মনের মধ্যে প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দিনের বেলা আমাদের কর্ম্মের সময়—তখন বুদ্ধির কড়াক্কড় পাহারা—সে আমাদের আপিসে বাজে ভিড় করিয়া কোনোমতে কর্ম্ম নষ্ট করিতে দেয় না। তাহার আমলে আমাদের ভাবনাগুলা কেবল-মাত্র কর্ম্মসূত্র অবলম্বন করিয়া অত্যন্ত সুসঙ্গত-ভাবে নিজেকে প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়। অবসরের সময় যখন চুপচাপ করিয়া বসিয়া আছি, তখনো এই ব্যাপারটা চলিতেছে। হয় ত একটা ফুলের গন্ধের ছুতা পাইবামাত্র অম্নি কতদিনের স্মৃতি তাহার চারিদিকে দেখিতে দেখিতে জমিয়া উঠিতেছে। একটা কথা যেম্নি গড়িয়া উঠে, অম্নি তাহাকে আশ্রয় করিয়া যেমন-তেমন করিয়া কত-কি কথা যে পরে পরে আকারধারণ করিয়া চলে, তাহার আর ঠিকানা নাই। আর কিছু নয়, কেবল কোনো-রকম করিয়া কিছু-একটা হইয়া উঠিবার চেষ্টা। ভাবনারাজ্যে এই চেষ্টার আর বিরাম নাই।

এই হইয়া উঠিবার চেষ্টা সফল হইলে তার পরে টিঁকিয়া থাকিবার চেষ্টার পালা। কাঁঠালের গাছে উপযুক্ত সময়ে হুড়াহুড়ি করিয়া ফল ত বিস্তর ধরিল, কিন্তু যে ফলগুলা ছোট ডালে ধরিয়াছে, তাহার বোঁটা নিতান্তই সরু, সেগুলা কোনোমতে কাঁঠাললীলা একটুখানি সুরু করিয়াই আবার অব্যক্তের মধ্যে অন্তর্দ্ধান করে।

আমাদের ভাবনাগুলারও সেই দশা। যেটা কোনোগতিকে এমন-একটা সূত্র পাইয়াছে, যাহা টেঁকসই, সে তাহার পূরা আয়তনে বাড়িয়া উঠিতে পায়—তাহার সমস্ত কোষগুলি ঠিকমত সাজিয়া ও ভরিয়া উঠিতে থাকে—তাহার

হওয়াটা সার্থক হয়। আর যেটা কোনোমতে একটুখানি ধরিবার জায়গা পাইয়াছে মাত্র, সেটা নেহাৎ তেড়াবাঁকা অসঙ্গতগোছ হইয়া বিদায় লইতে বিলম্ব করে না।

এমন গাছ আছে, যে গাছে বোল ধরিয়াই ঝরিয়া যায়, ফল হইয়া ওঠা পর্য্যন্ত টেঁকে না। তেম্‌নি এমন মনও আছে, যেখানে ভাবনা কেবলি আসে-যায়, কিন্তু ভাব-আকার ধারণ করিবার পূরা অবকাশ পায় না। কিন্তু ভাবুক-লোকের চিত্তে ভাবনাগুলি পূরাপূরি ভাব হইয়া উঠিতে পারে, এমন রস আছে, এমন তেজ আছে। অবশ্য অনেকগুলা ঝরিয়া পড়ে বটে, কিন্তু কতকগুলা ফলিয়াও উঠে।

গাছে ফল যে-ক'টা ফলিয়া উঠে, তাহাদের এই দরবার হয় যে, ডালের মধ্যে বাঁধা থাকিলেই আমাদের চলিবে না—আমরা পাকিয়া, রসে ভরিয়া, রঙে রাঙিয়া, গন্ধে মাতিয়া, আঁটিতে শক্ত হইয়া গাছ ছাড়িয়া বাহিরে যাইব—সেই বাহিরের জমিতে ঠিক অবস্থায় না পড়িতে পাইলে আমাদের সার্থকতা নাই। ভাবুকের মনে ভাবনাগুলা ভাব হইয়া উঠিলে তাহাদেরও সেই দরবার। তাহারা বলে, কোনো সুযোগে যদি হওয়া গেল, তবে এবার বিশ্বমানবের মনের ভূমিতে নবজন্মের এবং চিরজীবনের লীলা করিতে বাহির হইব। প্রথমে ধরিবার সুযোগ, তাহার পরে ফলিবার সুযোগ, তাহার পরে বাহির হইয়া ভূমিলাভ করিবার সুযোগ, এই তিন সুযোগ ঘটিলে পর তবেই মানুষের মনের ভাবনা কৃতার্থ হয়। ভাবনাগুলা সজীব পদার্থের মত সেই কৃতার্থতার তাগিদ মানুষকে কেবলি দিতেছে। সেইজন্য মানুষে মানুষে [illegible] চলিতেছেই। একটা মন আর একটা মনকে খুঁজিতেছে—নিজের ভাবনার ভার নামাইয়া দিবার জন্য—নিজের মনের ভাবকে অন্যের মনে ভাবিত করিবার জন্য। এইজন্য মেয়েরা ঘাটে জমে,—বন্ধুর কাছে বন্ধু ছোটে, চিঠি আনাগোনা করিতে থাকে, এইজন্যই সভাসমিতি, তর্কবিতর্ক, লেখালেখি, বাদপ্রতিবাদ—এমন কি, এজন্য মারামারি-কাটাকাটি পর্য্যন্ত হইতে বাকি থাকে না। মানুষের মনের ভাবনাগুলি সফলতালাভের জন্য ভিতরে ভিতরে মানুষকে এতই প্রচণ্ড তাগিদ দিয়া থাকে; মানুষকে একলা থাকিতে দেয় না; এবং ইহারই তাড়নায় পৃথিবী জুড়িয়া মানুষ সশব্দে ও নিঃশব্দে দিনরাত কত বকুনিই যে বকিতেছে, তাহার আর ঠিকানা নাই। সেই সকল বকুনি কথায়-বার্ত্তায়, গল্পে-গুজবে, চিঠিপত্রে, মূর্ত্তিতে-চিত্রে, গদ্যে-পদ্যে, কাজে-কর্ম্মে, কত বিচিত্র সাজে, কত বিবিধ আকারে, কত সুসঙ্গত এবং অসঙ্গত আয়োজনে মানুষের সংসারে ভিড় করিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া চলিতেছে, তাহা মনের চক্ষে দেখিলে স্তব্ধ হইতে হয়।

এই যে এক-মনের ভাবনার আর-এক মনের মধ্যে সার্থকতালাভের চেষ্টা মানবসমাজ জুড়িয়া চলিতেছে, এই চেষ্টার বশে আমাদের ভাবগুলি এমন একটি আকার ধারণ করিতেছে, যাহাতে তাহারা ভাবুকের কেবল একলার না হয়। অনেকসময়ে এ আমাদের অলক্ষিতেই ঘটিতে থাকে। এ কথা বোধ হয় চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কোনো বন্ধুর কাছে যখন কথা বলি, তখন কথা সেই বন্ধুর মনের ছাঁদে নিজেকে কিছু-না-কিছু গড়িয়া লয়। এক বন্ধুকে আমরা যে-রকম করিয়া চিঠি লিখি, আর এক বন্ধুকে আমরা ঠিক তেমন

করিয়া চিঠি লিখিতে পারি না। আমার ভাবটি বিশেষবন্ধুর কাছে সম্পূর্ণতালাভ করিবার গূঢ় চেষ্টায় বিশেষমনের প্রকৃতির সঙ্গে কতকটা-পরিমাণে আপোষ করিয়া লয়। বস্তুত আমাদের কথা শ্রোতা ও বক্তা দুইজনের যোগেই তৈরি হইয়া উঠে।

এইজন্য সাহিত্যে লেখক যাহার কাছে নিজের লেখাটি ধরিতেছে মনে মনে নিজের অজ্ঞাতসারেও তাহার প্রকৃতির সঙ্গে নিজের লেখাটি মিলাইয়া লইতেছে। দাশুরায়ের পাঁচালি দাশরথীর ঠিক একলার নহে;—যে সমাজ সেই পাঁচালি শুনিতেছে, তাহার সঙ্গে যোগে এই পাঁচালি রচিত। এইজন্য এই পাঁচালিতে কেবল দাশরথীর একলার মনের কথা পাওয়া যায় না—ইহাতে একটি বিশেষ কালের বিশেষ মণ্ডলীর অনুরাগ-বিরাগ, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-রুচি আপনি প্রকাশ পাইয়াছে।

এম্নি করিয়া লেখকদের মধ্যে কেহ বা বন্ধুকে, কেহ বা কোন সম্প্রদায়কে, কেহ বা সমাজকে, কেহ বা সর্ব্বকালের মানবকে আপনার কথা শুনাইতে চাহিয়াছেন। যাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাদের লেখার মধ্যে বিশেষভাবে সেই বন্ধুর, সম্প্রদায়ের, সমাজের বা বিশ্বমানবের কিছু-না-কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এম্নি করিয়া সাহিত্য কেবল লেখকের নহে—যাহাদের জন্য লিখিত, তাহাদেরও পরিচয় বহন করে।

বস্তুজগতেও ঠিক জিনিষটি ঠিক জায়গায় যখন আসর জমাইয়া বসে, তখন চারিদিকের আনুকূল্য পাইয়া টিকিয়া যায়—এও ঠিক তেম্নি। অতএব যে বস্তুটা টিকিয়া আছে, সে যে কেবল নিজের পরিচয় দেয়, তাহা নয়, সে তাহার চারিদিকের পরিচয় দেয়—কারণ, সে কেবল নিজের গুণে নহে, চারিদিকের গুণে টিকিয়া থাকে।

এখন সাহিত্যের সেই গোড়াকার কথা, সেই দানাবাঁধার কথাটা ভাবিয়া দেখ। দুই-একটা দৃষ্টান্ত দেখান যাক্।

কত নববর্ষার মেঘ, বলাকার শ্রেণী, তপ্ত ধরণীর 'পরে বারিসেচনের সুগন্ধ—কত পর্ব্বত-অরণ্য, নদী-নির্ঝর, নগর-গ্রামের উপর দিয়া ঘনপুঞ্জগম্ভীর আষাঢ়ের স্নিগ্ধসঞ্চার, কবির মনে কতদিন ধরিয়া কত ভাবের ছায়া, সৌন্দর্য্যের পুলক, বেদনার আভাস রাখিয়া গেছে! কাহার মনেই বা না রাখে! জগৎ ত দিন-রাতই আমাদের মনকে স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে —এবং সেই স্পর্শে আমাদের মনের তারে কিছু-না-কিছু ধ্বনি উঠিতেছেই।

একদা কালিদাসের মনে সেই তাঁহার বহুদিনের বহুতর ধ্বনিগুলি একটি সূত্র অবলম্বন করিবামাত্র একটার পর আর একটা ভিড় করিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়া কি সুন্দর দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। অনেক দিনের অনেক ভাবের ছবি কালিদাসের মনে এই শুভক্ষণটির জন্য উমেদারি করিয়া বেড়াইয়াছে, আজ তাহারা যক্ষের বিরহবার্ত্তার ছুতাটুকু লইয়া বর্ণনার স্তরে স্তরে মন্দাক্রান্তার স্তবকে স্তবকে ঘনাইয়া উঠিল। আজ তাহারা একটির যোগে অন্যটি এবং সমগ্রটির যোগে প্রত্যেকটি রক্ষা পাইয়া গেছে।

সতীলক্ষ্মী বলিতে হিন্দুর মনে যে ভাবটি জাগিয়া ওঠে, সে ত আমরা সকলেই জানি। আমরা নিশ্চয়ই প্রত্যেকেই এমন কোনো-না-কোনো স্ত্রীলোককে দেখিয়াছি, যাঁহাকে

দেখিয়া সতীত্বের মাহাত্ম্য আমাদের মনকে কিছু-না-কিছু স্পর্শ করিয়াছে। গৃহস্থঘরের প্রাত্যহিক কাজকর্ম্মের তুচ্ছতার মধ্যে কল্যাণের সেই যে দিব্যমূর্ত্তি আমরা ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি, সেই দেখার স্মৃতি ত মনের মধ্যে কেবল আবছায়ার মত ভাসিয়াই বেড়াইতেছে।

কালিদাস কুমারসম্ভবের গল্পটাকে মাঝখানে ধরিতেই সতী নারীর সম্বন্ধে যে সকল ভাব হাওয়ায় উড়িয়া বেড়াইতেছিল, তাঁহারা কেমন এক হইয়া শক্ত হইয়া ধরা দিল! ঘরে ঘরে নিষ্ঠাবতী সতী স্ত্রীদের যে সমস্ত কঠোর তপস্যা গৃহকর্ম্মের আড়াল হইতে আভাসে চোখে পড়ে, তাহাই মন্দাকিনীর ধারাধৌত দেবদারুর বনচ্ছায়ায় হিমালয়ের শিলাতলে দেবীর তপস্যার ছবিতে চিরদিনের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

যাহাকে আমরা গীতিকাব্য বলিয়া থাকি অর্থাৎ যাহা একটুখানির মধ্যে একটিমাত্র ভাবের বিকাশ—ঐ যেমন বিদ্যাপতির—

ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর,—

সেও আমাদের মনের বহুদিনের অব্যক্তভাবের একটি কোনো সুযোগ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠা। ভরা-বাদলে ভাদ্রমাসে শূন্যঘরের বেদনা কত লোকেরই মনে কথা না কহিয়া কতদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়াছে—যেমনি ঠিক ছন্দে ঠিক কথাটি বাহির হইল, অমনি সকলেরই এই অনেকদিনের কথাটা মূর্ত্তি ধরিয়া আঁট বাঁধিয়া বসিল।

বাষ্প ত হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু ফুলের পাপড়ির শীতল স্পর্শটুকু পাইবামাত্র জমিয়া শিশির হইয়া দেখা দেয়। আকাশে বাষ্প ভাসিয়া চলিয়াছিল, দেখা যাইতেছিল না, পাহাড়ের গায়ে আসিয়া ঠেকিতেই মেঘ জমিয়া বর্ষণের বেগে নদী-নির্ঝরিণী বহাইয়া দিল। তেমনি গীতি-কবিতায় একটিমাত্র ভাব জমিয়া মুক্তার মত টলটল করিয়া ওঠে, আর বড় বড় কাব্যে ভাবের সম্মিলিত সঙ্ঘ ঝরণায় ঝরিয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু মূল কথাটা এই যে, বাষ্পের মত অব্যক্তভাবগুলি কবির কল্পনার মধ্যে এমন একটি স্পর্শলাভ করে যে, দেখিতে দেখিতে তাহাকে ঘেরিয়া বিচিত্রসুন্দর মূর্ত্তি রচনা করিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।

বর্ষাঋতুর মত মানুষের সমাজে এমন এক-একটা সময় আসে, যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুররূপে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা আসিয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়া ছিল। তাই দেশে সে সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব্ব ভাষা এবং নূতন ছন্দে, কত প্রাচুর্য্যে এবং প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।

ফরাসীবিদ্রোহের সময়েও তেমনি মানব-প্রেমের ভাবহিল্লোল আকাশ ভরিয়া তুলিয়াছিল। তাহাই নানা কবির চিত্তে আঘাত পাইয়া কোথাও বা শান্তিতে, কোথাও বা করুণায়, কোথাও বা বিদ্রোহের সুরে আপনাকে নানামূর্ত্তিতে অজস্রভাবে প্রকাশ করিয়াছিল। অতএব কথাটা এই, মানুষের মন যে সকল বহুতর অব্যক্তভাবকে নিরন্তর উচ্ছ্বসিত করিয়া দিতেছে—বায়ু অনবরত

ক্ষণিক বেদনায়, ক্ষণিক ভাবনায়, ক্ষণিক কথায় বিশ্বমানবের সুবিশাল মনোলোকের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—একএকজন কবির কল্পনা একএকটি আকর্ষণ-কেন্দ্রের মত হইয়া তাহাদেরই মধ্যে একএক দলকে কল্পনাসূত্রে এক করিয়া মানুষের মনের কাছে সুস্পষ্ট করিয়া তোলে। তাহাতেই আমাদের আনন্দ হয়। আনন্দ কেন হয়? হয় তাহার কারণ এই, আপনাকে আপনি দেখিবার একটা চেষ্টা সমস্ত মানবমনের মধ্যে কেবল কাজ করিতেছে—এইজন্য যেখানেই সে কোনো-একটা ঐক্যের মধ্যে নিজের কোনো-একটা বিকাশকে দেখিতে পায়, সেখানেই তাহার এই নিয়তচেষ্টা সার্থক হইয়া তাহাকে আনন্দ দিতে থাকে। কেবল সাহিত্য কেন, দর্শন-ইতিহাসও এইরূপ। দর্শনশাস্ত্রের সমস্ত প্রশ্ন ও সমস্ত চিন্তা অব্যক্তভাবে সমস্ত মানুষের মনে ছড়াইয়া আছে—দার্শনিকের প্রতিভা তাহাদের মধ্যে কোনো-একটা দলকে কোনো-একটা ঐক্য দিবামাত্র তাহার একটা রূপ, একটা মীমাংসা আমাদের কাছে ব্যক্ত হইয়া উঠে—আমরা নিজেদের মনের চিন্তার একটা বিশেষমূর্ত্তি দেখিতে পাই। ইতিহাস লোকের মুখে মুখে জনশ্রুতি-আকারে ছড়াইয়া থাকে—ঐতিহাসিকের প্রতিভা তাহাদিগকে একটি সূত্রের চারিদিকে বাঁধিয়া তুলিবামাত্র এতকালের অব্যক্ত ইতিহাসের ব্যক্তমূর্ত্তি আমাদের কাছে ধরা দেয়।

কোন্ কবির কল্পনায় মানুষের হৃদয়ের কোন্ বিশেষ রূপ ঘনীভূত হইয়া আপন অনন্ত বৈচিত্র্যের একটা অপরূপ প্রকাশ সৌন্দর্য্যের দ্বারা ফুটাইয়া তুলিল, তাহাই সাহিত্যসমালোচকের বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। কালিদাসের উপমা ভাল বা ভাষা সরস বা কুমারসম্ভবের তৃতীয়সর্গের বর্ণনা সুন্দর বা অভিজ্ঞানশকুন্তলের চতুর্থসর্গে করুণরস প্রচুর আছে, এ আলোচনা যথেষ্ট নহে। কিন্তু কালিদাসের সমস্ত কাব্যে মানবহৃদয়ের একটা বিশেষ রূপ বাঁধা পড়িয়াছে। তাঁহার কল্পনা একটা বিশেষ কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া আকর্ষণ-বিকর্ষণ-গ্রহণ-বর্জ্জনের নিয়মে মানুষের মনোলোকে কোন্ অব্যক্তকে একটা বিশেষ সৌন্দর্য্যে ব্যক্ত করিয়া তুলিল, সমালোচকের তাহাই বিচার্য্য। কালিদাস জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া, দেখিয়াছেন, ভাবিয়াছেন, সহিয়াছেন, কল্পনা ও রচনা করিয়াছেন—তাঁহার এই ভাবনা-বেদনা-কল্পনাময় জীবন মানবের অনন্ত রূপের একটি বিশেষ রূপকেই বাণীর দ্বারা আমাদের কাছে ব্যক্ত করিয়াছে; সেইটি কি? যদি আমরা প্রত্যেকেই অসাধারণ কবি হইতাম, তবে আমরা প্রত্যেকেই আপনার হৃদয়কে এমন করিয়া মূর্ত্তিমান্ করিতাম, যাহাতে একটি অপূর্ব্বতা দেখা দিত এবং এইরূপে অন্তহীন বিচিত্রই অন্তহীন এককে প্রকাশ করিতে থাকিত। কিন্তু আমাদের সে ক্ষমতা নাই। আমরা ভাঙাচোরা করিয়া কথা বলি—আমরা নিজেকে ঠিকমত জানিই না—যেটাকে আমরা সত্য বলিয়া প্রচার করি, সেটা হয় ত আমাদের প্রকৃতিগত সত্য নহে, তাহা হয় ত দশের মতের অভ্যস্ত আবৃত্তিমাত্র—এইজন্য আমি আমার সমস্ত জীবনটা দিয়া কি দেখিলাম, কি বুঝিলাম, কি পাইলাম, তাহা সমগ্র করিয়া, সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইতেই পারি না। কবিরা যে সম্পূর্ণ পারেন, তাহা

নহে। তাঁহাদের বাণীও সমস্ত স্পষ্ট হয় না, সত্য হয় না, সুন্দর হয় না—তাঁহাদের চেষ্টা তাঁহাদের প্রকৃতির গূঢ় অভিপ্রায়কে সকল সময়ে সার্থক করে না;—কিন্তু তাঁহাদের নিজের অগোচরে, তাঁহাদের চেষ্টার অতীত প্রদেশ হইতে একটা বিশ্বব্যাপী গূঢ় চেষ্টার প্রেরণায় সমস্ত বাধা ও অস্পষ্টতার মধ্য হইতে আপনিই একটি মানসরূপ—যাহাকে "ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলে আর মেলে না"—কখনো অল্পমাত্রায়, কখনো অধিকমাত্রায় প্রকাশ হইতে থাকে। যে গূঢ়দর্শী ভাবুক, কবির কাব্যের ভিতর হইতে এই সমগ্ররূপটিকে দেখিতে পান, তিনিই যথার্থ সাহিত্য-বিচারক।

আমার এ সকল কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের ভাবের সৃষ্টি একটা খাম্‌খেয়ালি ব্যাপার নহে, ইহা বস্তুসৃষ্টির মতই একটা অমোঘ নিয়মের অধীন। প্রকাশের যে-একটা আবেগ আমরা বাহিরের জগতে সমস্ত অণুপরমাণুর ভিতরেই দেখিতেছি—সেই একই আবেগ আমাদের মনোবৃত্তির মধ্যে প্রবলবেগে কাজ করিতেছে। অতএব যে চক্ষে আমরা পর্ব্বতকানন-নদনদী-মরুসমুদ্রকে দেখি, সাহিত্যকেও সেই চক্ষেই দেখিতে হইবে—ইহাও আমার-তোমার নহে, ইহা নিখিল সৃষ্টিরই একটা ভাগ।

তেমন করিয়া দেখিলে সাহিত্যের কেবল ভালমন্দ বিচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকা যায় না। সেই সঙ্গে তাহার একটা বিকাশের প্রণালী, তাহার একটা বৃহৎ কার্য্যকারণসম্বন্ধ দেখিবার জন্য আগ্রহ জন্মে। আমার কথাটা একটি দৃষ্টান্ত দিয়া স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব।

'গ্রাম্যসাহিত্য'নামক প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি, দেশের সাধারণলোকের মধ্যে প্রথমে কতকগুলি ভাব টুক্‌রা-টুক্‌রা কাব্য হইয়া চারিদিকে ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়। তার পরে একজন কবি সেই টুক্‌রা কাব্যগুলিকে একটা বড় কাব্যের সূত্রে এক করিয়া একটা বড় পিণ্ড করিয়া তোলেন। হরপার্ব্বতীর কত কথা যাহা কোনো পুরাণে নাই, রামসীতার কত কাহিনী যাহা মূলরামায়ণে পাওয়া যায় না—গ্রামের গায়ককথকদের মুখে মুখে পল্লীর আঙিনায় আঙিনায় ভাঙা ছন্দ ও গ্রাম্যভাষার বাহনে কতকাল ধরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়াছে। এমন-সময় কোনো রাজসভার কবি যখন, কুটীরের প্রাঙ্গণে নহে, কোনো বৃহৎ বিশিষ্টসভায় গান গাহিবার জন্য আহূত হইয়াছেন, তখন সেই গ্রাম্যকথাগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া মার্জ্জিত ছন্দে গম্ভীর ভাষায় বড় করিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। পুরাতনকে নূতন করিয়া, বিচ্ছিন্নকে এক করিয়া দেখাইলেই সমস্ত দেশ আপনার হৃদয়কে যেন স্পষ্ট ও প্রশস্ত করিয়া দেখিয়া আনন্দলাভ করে। ইহাতে সে আপনার জীবনের পথে আরো একটা পর্ব্ব যেন অগ্রসর হইয়া যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল, কেতকাদাস প্রভৃতির মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, এইরূপ শ্রেণীর কাব্য;—তাহা বাংলার ছোট ছোট পল্লীসাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাঁধিবার প্রয়াস। এম্‌নি করিয়া একটা বড় জায়গায় আপনার প্রাণপদার্থকে মিলাইয়া দিয়া পল্লীসাহিত্য, ফল ধরা হইলেই ফুলের পাপড়িগুলার মত, ঝরিয়া পড়িয়া যায়।

পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, আরব্য উপন্যাস,

ইংলণ্ডের আর্থারকাহিনী, স্কান্দিনেবিয়ার সাগাসাহিত্য এম্‌নি করিয়া জন্মিয়াছে—সেই-গুলির মধ্যে লোকমুখের বিক্ষিপ্ত কথা এক জায়গায় বড় আকারে দানা বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে।

এইরূপ ছড়ানো ভাবের এক হইয়া উঠিবার চেষ্টা মানবসাহিত্যে কয়েক জায়গায় অতি আশ্চর্য্য বিকাশ লাভ করিয়াছে। গ্রীসে হোমরের কাব্য এবং ভারতবর্ষে রামায়ণ-মহাভারত।

ইলিয়াড্ এবং অডেসিতে নানা খণ্ডগাথা ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে জোড়া লাগিয়া এক হইয়া উঠিয়াছে, এ মত প্রায় মোটামুটি সর্ব্বত্রই চলিত হইয়াছে। যে সময়ে লেখা-পুঁথি এবং ছাপা-বইয়ের চলন ছিল না, এবং যখন গায়কেরা কাব্য গান করিয়া শুনাইয়া বেড়াইত, তখন যে ক্রমে নানা কালে ও নানা হাতে একটা কাব্য ভরাট হইয়া উঠিতে থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কথা নাই। কিন্তু যে কাঠামোর মধ্যে এই কাব্যগুলি খাড়া হইবার জায়গা পাইয়াছে, তাহা যে একজন বড় কবির রচনা, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, এই কাঠামোর গঠন অনুসরণ করিয়া নূতন নূতন জোড়াগুলি ঐক্যের গণ্ডী হইতে ভ্রষ্ট হইতে পায় নাই।

মিথিলার বিদ্যাপতির গান কেমন করিয়া বাংলা পদাবলী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে, স্বভাবের নিয়মে এক কেমন করিয়া আর হইয়া উঠিতেছে। বাংলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীকে বিদ্যাপতির বলা চলে না। মূল কবির প্রায় কিছুই তাহার অধিকাংশ পদেই নাই। ক্রমেই বাঙালী গায়ক ও বাঙালী শ্রোতার যোগে তাহার ভাষা, তাহার অর্থ, এমন কি, তাহার রসেরও পরিবর্ত্তন হইয়া সে এক নূতনজিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রিয়র্সন্ মূল বিদ্যাপতির যে সকল পদ প্রকাশ করিয়াছেন—বাংলা পদাবলীতে তাহার দুটিচারটির ঠিকানা মেলে —বেশির ভাগই মিলাইতে পারা যায় না। অথচ নানা কাল ও নানা লোকের দ্বারা পরিবর্ত্তনসত্ত্বেও পদগুলি এলোমেলো প্রলাপের মত হইয়া যায় নাই। কারণ, একটা মূল-সুর মাঝখানে থাকিয়া সমস্ত পরিবর্ত্তনকে আপনার করিয়া লইবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া বসিয়া আছে। সেই সুরটুকুর জোরেই এই পদগুলিকে বিদ্যাপতির পদ বলিতেছি, আবার আগাগোড়া পরিবর্ত্তনের জোরে এগুলিকে বাঙালীর সাহিত্য বলিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রথমে নানা-মুখে প্রচলিত খণ্ডগানগুলা একটা কাব্যে বাঁধা পড়িয়া সেই কাব্য আবার যখন বহুকাল ধরিয়া সর্ব্বসাধারণের কাছে গাওয়া হইতে থাকে, তখন আবার তাহার উপরে নানা দিক্ হইতে নানা কালের হাত পড়িতে থাকে। সেই কাব্য দেশের সকল দিক্ হইতেই আপনার পুষ্টি আপনি টানিয়া লয়। এম্‌নি করিয়া ক্রমশই তাহা সমস্ত দেশের জিনিষ হইয়া উঠে। তাহাতে সমস্ত দেশের অন্তঃকরণের ইতিহাস, তত্ত্বজ্ঞান, ধর্ম্মবোধ, কর্ম্মনীতি আপনি আসিয়া মিলিত হয়। যে কবি গোড়ায় ইহার ভিৎ পত্তন করিয়াছেন, তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতাবলেই ইহা সম্ভবপর হইতে পারে। তিনি এমন জায়গায় এমন করিয়া গোড়া বাঁধিয়াছেন,

তাঁহার প্ল্যান্‌টা এতই প্রশস্ত যে, বহুকাল ধরিয়া সমস্ত দেশকে তিনি নিজের কাজে খাটাইয়া লইতে পারেন। এতদিন ধরিয়া এত লোকের হাত পড়িয়া কোথাও যে কিছুই তেড়াবাঁকা হয় না, তাহা বলিতে পারি না—কিন্তু মূল গঠনটার মাহাত্ম্যে সে সমস্তই অভিভূত হইয়া থাকে।

আমাদের রামায়ণ-মহাভারত, বিশেষভাবে মহাভারত, ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

এইরূপ কালে কালে একটি সমগ্রজাতি যে কাব্যকে একজন কবির কবিত্বভিত্তি আশ্রয় করিয়া রচনা করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকেই যথার্থ মহাকাব্য বলা যায়।

তাহাকে আমি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীর সঙ্গে তুলনা করি। প্রথমে পর্ব্বতের নানা গোপনগুহা হইতে নানা ঝরণা একটা জায়গায় আসিয়া মোটা নদী তৈরি করিয়া তোলে। তার পরে সে যখন আপনার পথে চলিতে থাকে, তখন নানা দেশ হইতে নানা শাখানদী তাহার সঙ্গে মিলিয়া তাহার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে।

কিন্তু ভারতবর্ষের গঙ্গা, মিশরের নীল ও চীনের ইয়াংসিকিয়াং প্রভৃতির মত মহানদী জগতে অল্পই আছে। এই সমস্ত নদী মাতার মত একটি বৃহৎ দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তকে পালন করিয়া চলিয়াছে। ইহারা একএকটি প্রাচীন সভ্যতার স্তন্যদায়িনী ধাত্রীর মত।

তেম্‌ন মহাকাব্যও আমাদের জানা সাহিত্যের মধ্যে কেবল চারটিমাত্র আছে। ইলিয়ড্‌, অডেসি, রামায়ণ ও মহাভারত। অলঙ্কারশাস্ত্রের কৃত্রিম আইনের জোরেই রঘুবংশ, ভারবি, মাঘ বা মিল্‌টনের প্যারাডাইস্ লষ্ট, ভল্‌টেয়ারের হাঁরিয়াড্‌ প্রভৃতিকে মহাকাব্যের পংক্তিতে জোর করিয়া বসানো হইয়া থাকে। তাহার পরে এখনকার ছাপাখানার শাসনে মহাকাব্য গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত লোপ হইয়া গেছে।

রামায়ণ রচিত হইবার পূর্ব্বে রামচরিত-সম্বন্ধে যে সমস্ত আদিম পুরাণকথা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এখন তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদেরই মধ্যে রামায়ণের একটা পূর্ব্ব-সূচনা দেশময় ছড়াইয়া ছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশে যে সকল বীরপুরুষ অবতাররূপে গণ্য হইয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই জগতের হিতের জন্য কোনো-না-কোনো অসামান্য কাজ করিয়াছিলেন। রামায়ণ রচিত হইবার পূর্ব্বে দেশে রামচন্দ্রসম্বন্ধে সেইরূপ একটা লোকশ্রুতি নিঃসন্দেহই প্রচলিত ছিল। তিনি যে পিতৃসত্যপালনের জন্য বনে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নীহরণকারীকে বিনাশ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব প্রমাণ করে বটে, কিন্তু যে অসাধারণ লোকহিত সাধন করিয়া তিনি লোকের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিলেন, রামায়ণে কেবল তাহার আভাস আছে মাত্র।

আর্য্যদের ভারত-অধিকারের পূর্ব্বে যে দ্রাবিড়জাতীয়েরা আদিমনিবাসীদিগকে জয় করিয়া এই দেশ দখল করিয়া বসিয়াছিল, তাহারা নিতান্ত অসভ্য ছিল না। তাহারা আর্য্যদের কাছে সহজে হার মানে নাই। ইহারা আর্য্যদের যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাইত, চাষের ব্যাঘাত

করিত, কুলপতিরা অরণ্য কাটিয়া যে এক-একটি আশ্রম স্থাপন করিতেন, সেই আশ্রমে তাহারা কেবলি উৎপাত করিত।

দাক্ষিণাত্যে কোনো দুর্গমস্থানে এই দ্রাবিড়জাতীয় রাজবংশ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়া এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদেরই প্রেরিত দলবল হঠাৎ বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আর্য্য উপ-নিবেশগুলিকে ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

রামচন্দ্র বানরগণকে অর্থাৎ ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদিগকে দলে লইয়া বহুদিনের চেষ্টায় ও কৌশলে এই দ্রাবিড়দের প্রতাপ নষ্ট করিয়া দেন—এই কারণেই তাঁহার গৌরবগান আর্য্যদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। যেমন শকদের উপদ্রব হইতে হিন্দুদিগকে উদ্ধার করিয়া বিক্রমাদিত্য যশস্বী হইয়াছিলেন, তেমনি অনার্য্যদের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া যিনি আর্য্য-দিগকে নিরুপদ্রব করিয়াছিলেন, তিনিও সাধা-রণের কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং পূজ্য হইয়া-ছিলেন।

এই উপদ্রব কে দূর করিয়া দিবে, সেই চিন্তা তখন চারিদিকে জাগিয়া উঠিয়াছিল। বিশ্বা-মিত্র অল্পবয়সেই সুলক্ষণ দেখিয়া রামচন্দ্রকেই যোগ্যপাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিশোর-বয়স হইতেই রামচন্দ্র এই বিশ্বামিত্রের উৎসাহে ও শিক্ষায় শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত হন। তখনি তিনি আরণ্য গুহকের সঙ্গে বন্ধুতা করিয়া যে প্রণালীতে শত্রুজয় করিতে হইবে, তাহার সূচনা করিতেছিলেন।

গোরু তখন ধন বলিয়া এবং কৃষি পবিত্র-কর্ম্মরূপে গণ্য হইত। জনক স্বহস্তে চাষ করিয়াছেন। এই চাষের লাঙল দিয়াই তখন আর্য্যেরা ভারতবর্ষের মাটিকে ক্রমশ আপন করিয়া লইতেছিলেন। এই লাঙলের মুখে অরণ্য হঠিয়া গিয়া কৃষিক্ষেত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। রাক্ষসেরা এই ব্যাপ্তির অন্তরায় ছিল।

প্রাচীন মহাপুরুষদের মধ্যে জনক যে আর্য্য-সভ্যতার একজন ধুরন্ধর ছিলেন, নানা জন-প্রবাদে সে কথার সমর্থন করে। ভারতবর্ষে কৃষিবিস্তারে তিনি একজন উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কন্যারও নাম রাখিয়াছিলেন সীতা। পণ করিয়াছিলেন, যে বীর ধনুক ভাঙিয়া অসামান্য বলের পরিচয় দিবে, তাহাকেই কন্যা দিবেন। সেই অশান্তির দিনে এইরূপ অসা-মান্য বলিষ্ঠপুরুষের জন্য তিনি অপেক্ষা করিয়া ছিলেন। প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে যে লোক দাঁড়াইতে পারিবে, তাহাকে বাছিয়া লই-বার এই এক উপায় ছিল।

বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে অনার্য্যপরাভবব্রতে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাকে জনকের পরীক্ষার স্থলে উপস্থিত করিলেন। সেখানে রামচন্দ্র ধনুক ভাঙিয়া তাঁহার ব্রতগ্রহণের শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেন।

তার পর তিনি ছোটভাই ভরতের উপর রাজ্যভার দিয়া মহৎ প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য বনে গমন করিলেন। ভরদ্বাজ, অগস্ত্য প্রভৃতি যে সকল ঋষি দুর্গম দক্ষিণে আর্য্যনিবাস-বিস্তারে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাঁহাদের উপদেশ লইয়া অনুচর লক্ষ্মণের সঙ্গে অপরিচিত গহন অরণ্যের মধ্যে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

সেখানে বালি ও সুগ্রীব নামক দুই প্রতি-দ্বন্দ্বী ভাইয়ের মধ্যে এক ভাইকে মারিয়া অন্য ভাইকে দলে লইলেন। বানরদিগকে বশ

করিলেন, তাহাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইয়া সৈন্য গড়িলেন। সেই সৈন্য লইয়া শত্রুপক্ষের মধ্যে কৌশলে আত্মবিচ্ছেদ ঘটাইয়া লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া দিলেন। এই রাক্ষসেরা স্থাপত্যবিদ্যায় সুদক্ষ ছিল। যুধিষ্ঠির যে আশ্চর্য্য প্রাসাদ তৈরি করিয়াছিলেন, ময়দানব তাহার কারিকর। মন্দিরনির্ম্মাণে দ্রাবিড়জাতীয়ের কৌশল আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বিশিষ্টতালাভ করিয়াছে। ইহারাই প্রাচীন ইজিপ্টিয়দের সজাতি বলিয়া যে কেহ কেহ অনুমান করেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না।

যাহা হউক, স্বর্ণলঙ্কাপুরীর যে প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছিল, তাহার একটা-কিছু মূল ছিল। এই রাক্ষসেরা অসভ্য ছিল না। বরঞ্চ শিল্পবিলাসে তাহারা আর্য্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল।

রামচন্দ্র শত্রুদিগকে বশ করিয়াছিলেন, তাহাদের রাজ্য হরণ করেন নাই। বিভীষণ তাঁহার বন্ধু হইয়া লঙ্কায় রাজত্ব করিতে লাগিল। কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্যভার বানরদের হাতে দিয়াই চিরদিনের মত তিনি তাহাদিগকে বশ করিয়া লইলেন। এইরূপে রামচন্দ্রই আর্য্যদের সহিত অনার্য্যদের মিলন ঘটাইয়া পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদানের সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেন। তাহারই ফলে দ্রাবিড়গণ ক্রমে আর্য্যদের সঙ্গে একসমাজভুক্ত হইয়া হিন্দুজাতি রচনা করিল। এই হিন্দুজাতির মধ্যে উভয়জাতির আচারবিচারপূজাপদ্ধতি মিশিয়া গিয়া ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপিত হয়।

ক্রমে ক্রমে আর্য্য-অনার্য্যের মিলন যখন সম্পূর্ণ হইল—পরস্পরের ধর্ম্ম ও বিদ্যার বিনিময় হইয়া গেল, তখন রামচন্দ্রের পুরাতন কাহিনী মুখে মুখে রূপান্তর ও ভাবান্তর ধরিতে লাগিল। যদি কোনোদিন ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর পরিপূর্ণ মিলন ঘটে, তবে কি ক্লাইবের কীর্ত্তি লইয়া বিশেষভাবে আড়ম্বর করিবার কোনো হেতু থাকিবে, না, ম্যাটিনির উট্রাম্ প্রভৃতি যোদ্ধাদের কাহিনীকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করিয়া তুলিবার স্বাভাবিক কোনো উত্তেজনা থাকিতে পারিবে?

যে কবি দেশপ্রচলিত চরিতগাথাগুলিকে মহাকাব্যের মধ্যে গাঁথিয়া ফেলিলেন, তিনি অনার্য্য বশব্যাপারকে আচ্ছন্ন করিয়া বীরচরিতের এক সম্পূর্ণ আদর্শকে বড় করিয়া তুলিলেন। তিনি করিয়া তুলিলেন বলিলে বোধ হয় ভুল হয়। রামচন্দ্রের পূজ্যস্মৃতি ক্রমে ক্রমে কালান্তর ও অবস্থান্তরের অনুসরণ করিয়া আপনার পূজনীয়তাকে সাধারণের ভক্তিবৃত্তির উপযোগী করিয়া তুলিতেছিল। কবি তাঁহার প্রতিভার দ্বারা তাহাকে একজায়গায় ঘনীভূত ও সুস্পষ্ট করিয়া তুলিলেন। তখন সর্ব্বসাধারণের ভক্তি চরিতার্থ হইল।

কিন্তু আদিকবি তাহাকে যেখানে দাঁড় করাইয়াছেন, সে যে তাহার পর হইতে সেখানেই স্থির হইয়া আছে, তাহা নহে।

রামায়ণের আদিকবি, গার্হস্থ্যপ্রধান হিন্দুসমাজের যত-কিছু ধর্ম্ম, রামকে তাহারই অবতার করিয়া দেখাইয়াছিলেন। পুত্ররূপে, ভ্রাতৃরূপে, পতিরূপে, বন্ধুরূপে, ব্রাহ্মণধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তারূপে, অবশেষে রাজারূপে বাল্মীকির রাম আপনার লোকপূজ্যতা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি যে রাবণকে মারিয়াছিলেন, সেও কেবল ধর্ম্মপত্নীকে উদ্ধার করিবার জন্য—অবশেষে সেই পত্নীকে ত্যাগ করিয়া-

ছিলেন, সেও কেবল প্রজারঞ্জনের অনুরোধে। নিজের সমুদয় সহজপ্রবৃত্তিকে শাস্ত্রমতে কঠিন শাসন করিয়া সমাজরক্ষার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। আমাদের স্থিতিপ্রধান সভ্যতায় পদে পদে যে ত্যাগ, ক্ষমা ও আত্মনিগ্রহের প্রয়োজন হয়, রামের চরিত্রে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়া রামায়ণ হিন্দুসমাজের মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে।

আদিকবি যখন রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, তখন যদি-চ রামের চরিতে অতিপ্রাকৃত মিশিয়াছিল, তবু তিনি মানুষেরই আদর্শরূপে চিত্রিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু অতিপ্রাকৃতকে একজায়গায় স্থান দিলে তাহাকে আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না, সে ক্রমেই বাড়িয়া চলে। এম্‌নি করিয়া রাম ক্রমে দেবতার পদবী অধিকার করিলেন।

তখন রামায়ণের মূল-সুরটার মধ্যে আর একটা পরিবর্ত্তন প্রবেশ করিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

রামকে দেবতা বলিলেই তিনি যে সকল কঠিন কাজ করিয়াছিলেন, তাহার দুঃসাধ্যতা চলিয়া যায়। সুতরাং রামের চরিত্রকে মহীয়ান্ করিবার জন্য সেইগুলির বর্ণনাই আর যথেষ্ট হয় না। তখন যে ভাবের দিক্ দিয়া দেখিলে দেবচরিত্র মানুষের কাছে প্রিয় হয়, কাব্যে সেই ভাবটাই প্রবল হইয়া উঠে।

সেই ভাবটি ভক্তবৎসলতা। কৃত্তিবাসের রাম ভক্তবৎসল রাম। তিনি অধম-পাপী সকলকেই উদ্ধার করেন। তিনি গুহক-চণ্ডালকে মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করেন। বনের পশু বানরদিগকে তিনি প্রেমের দ্বারা ধন্য করেন। ভক্ত হনুমানের জীবনকে ভক্তিতে আর্দ্র করিয়া তাহার জন্ম সার্থক করিয়াছেন। বিভীষণ তাঁহার ভক্ত। রাবণও শত্রুভাবে তাঁহার কাছ হইতে বিনাশ পাইয়া উদ্ধার হইয়া গেল। এ রামায়ণে ভক্তিরই লীলা।

ভারতবর্ষে এক সময়ে জনসাধারণের মধ্যে এই একটা ঢেউ উঠিয়াছিল। ঈশ্বরের অধিকার যে কেবল জ্ঞানীদিগেরই নহে, এবং তাঁহাকে পাইতে হইলে যে তন্ত্রমন্ত্র ও বিশেষ-বিধির প্রয়োজন করে না, কেবল সরল ভক্তির দ্বারাই আপামর চণ্ডাল সকলেই ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে, এই কথাটা হঠাৎ যেন একটা নূতন আবিষ্কারের মত আসিয়া ভারতের জনসাধারণের দুঃসহ হীনতাভার মোচন করিয়া দিয়াছিল। সেই বৃহৎ আনন্দ দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যখন ভাসিয়া উঠিয়াছিল, তখন যে সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহা জন-সাধারণের এই নূতন গৌরবলাভের সাহিত্য। কালকেতু, ধনপতি, চাঁদসদাগর প্রভৃতি সাধারণ-লোকেই তাহার নায়ক;—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় নহে, মানজ্ঞানী সাধক নহে, সমাজে যাহারা নীচে পড়িয়া আছে, দেবতা যে তাহাদেরও দেবতা, ইহাই সাহিত্য নানাভাবে প্রচার করিতেছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণেও এই ভাবটি ধরা দিয়াছে। ভগবান্ যে শাস্ত্রজ্ঞানহীন অনাচারী বানরদেরও বন্ধু, কাঠবিড়ালীর অতি সামান্য সেবাও যে তাঁহার কাছে অগ্রাহ্য হয় না, পাপিষ্ঠ রাক্ষসকেও যে তিনি যথোচিত শাস্তির দ্বারা পরাভূত করিয়া উদ্ধার করেন, এই ভাবটিই কৃত্তিবাসে প্রবল হইয়া ভারতবর্ষে রামায়ণকথার ধারাকে গঙ্গার শাখা ভাগীরথীর ন্যায় আর একটা বিশেষ পথে লইয়া গেছে।

রামায়ণকথার যে ধারা আমরা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি, তাহারই একটি অত্যন্ত আধুনিক শাখা মেঘনাদবধকাব্যের মধ্যে রহিয়াছে। এই কাব্য সেই পুরাতন কথা অবলম্বন করিয়াও বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস হইতে একটি বিপরীত প্রকৃতি ধরিয়াছে।

আমরা অনেক সময়ে বলিয়া থাকি যে, ইংরেজি শিখিয়া যে সাহিত্য আমরা রচনা করিতেছি, তাহা খাঁটিজিনিষ নহে—অতএব এ সাহিত্য যেন দেশের সাহিত্য বলিয়াই গণ্য হইবার যোগ্য নয়।

যে জিনিষটা একটা-কোনো স্থায়ী বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে, যাহার আর কোনো পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই, তাহাকেই যদি খাঁটিজিনিষ বলা হয়, তবে সজীব প্রকৃতির মধ্যে সে জিনিষটা কোথাও নাই।

মানুষের সমাজে ভাবের সঙ্গে ভাবের মিলন হয় এবং সে মিলনে নূতন নূতন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইতে থাকে। ভারতবর্ষে এমন মিলন কত ঘটিয়াছে, আমাদের মন কত পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়া আসিয়াছে, তাহার কি সীমা আছে! অল্পদিন হইল, মুসলমানেরা যখন আমাদের দেশের রাজসিংহাসনে চড়িয়া বসিয়াছিল, তাহারা কি আমাদের মনকে স্পর্শ করে নাই? তাহাদের সেমেটিক্-ভাবের সঙ্গে হিন্দুভাবের কোনো স্বাভাবিক সম্মিশ্রণ কি ঘটিতে পায় নাই? আমাদের শিল্পসাহিত্য, বেশভূষা, রাগরাগিণী, ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে মুসলমানের সামগ্রী মিশিয়াছে। মনের সঙ্গে মনের এ মিলন না হইয়া থাকিতে পারে না। যদি এমন হয় যে, কেবল আমাদেরই মধ্যে এরূপ হওয়া সম্ভব নহে, তবে সে আমাদের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথা।

যুরোপ হইতে একটা ভাবের প্রবাহ আসিয়াছে এবং স্বভাবতই তাহা আমাদের মনকে আঘাত করিতেছে। এইরূপ ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিলে নিজের চিত্তবৃত্তির প্রতি অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে। এইরূপ ভাবের মিলনে যে একটা ব্যাপার উৎপন্ন হইয়া উঠিতেছে—কিছুকাল পরে তাহার মূর্ত্তিটা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইবার সময় আসিবে।

যুরোপ হইতে নূতন ভাবের সংঘাত আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে, এ কথা যখন সত্য, তখন আমরা হাজার খাঁটি হইবার চেষ্টা করি না কেন, আমাদের সাহিত্য কিছু-না-কিছু নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া এই সত্যকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। ঠিক সেই সাবেক জিনিষের পুনরাবৃত্তি আর কোনোমতেই হইতে পারে না—যদি হয়, তবেই এ সাহিত্যকে মিথ্যা ও কৃত্রিম বলিব।

মেঘনাদবধকাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্ত্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রামরাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনের মধ্যে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে, স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রামলক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্ম্মভীরুতা সর্ব্বদাই

কোন্‌টা কতটুকু ভাল ও কতটুকু মন্দ, তাহা কেবলি অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ, দৈন্য, আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য্য; ইহার হর্ম্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথি-অশ্বে-গজে পৃথিবী কম্পমান; ইহা স্পর্দ্ধাদ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে; যাহা চায়, তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোনো-কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারী রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্রপৌত্র-আত্মীয়স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে; তাহাদের জননীরা ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটলশক্তি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনোমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না,—কবি সেই ধর্ম্ম-বিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্দ্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।

য়ুরোপের শক্তি তাহার বিচিত্র প্রহরণ ও অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যে পার্থিবমহিমার চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া আজ আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে—তাহার বিদ্যুৎখচিত বজ্র আমাদের নত মস্তকের উপর দিয়া ঘনঘন গর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়াছে;—এই শক্তির স্তবগানের সঙ্গে আধুনিককালে রামায়ণকথার একটি নূতন বাঁধা তার ভিতরে ভিতরে সুর মিলাইয়া দিল, এ কি কোনো ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালে হইল? দেশ জুড়িয়া ইহার আয়োজন চলিয়াছে,—দুর্ব্বলের অভিমানবশত ইহাকে আমরা স্বীকার করিব না বলিয়াও পদে পদে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি,—তাই রামায়ণের গান করিতে গিয়াও ইহার সুর আমরা ঠেকাইতে পারি নাই।

রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া আমি এই কথাটা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, মানুষের সাহিত্যে যে একটা ভাবের সৃষ্টি চলিতেছে, তাহার স্থিতিগতির ক্ষেত্র অতি বৃহৎ। তাহা দেখিতে আকস্মিক; এই চৈত্রমাসে যে ঘন-ঘন এত বৃষ্টি হইয়া গেল, সেও ত আকস্মিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কত সুদূর পশ্চিম হইতে কারণপরম্পরার দ্বারা বাহিত হইয়া কোথাও বা বিশেষ সুযোগ, কোথাও বা বিশেষ বাধা পাইয়া সেই বৃষ্টি আমার ক্ষেত্রকে অভি-ষিক্ত করিয়া দিল। ভাবের প্রবাহও তেম্‌নি করিয়াই বহিয়া চলিয়াছে;—সে ছোট-বড় কত কারণের দ্বারা খণ্ড হইতে এক এবং এক হইতে শতধা হইয়া কত রূপরূপান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সম্মিলিত মানবের বৃহৎ মন, মনের নিগূঢ় এবং অমোঘ নিয়মেই আপনাকে কেবলই প্রকাশ করিয়া অপরূপ মানসসৃষ্টি সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার করিতেছে। তাহার কত রূপ, কত রস, কতই বিচিত্র গতি!

লেখককে যখন আমরা অত্যন্ত নিকটে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখি, তখন লেখকের সঙ্গে লেখার সম্বন্ধটুকুই আমাদের কাছে প্রবল হইয়া উঠে—তখন মনে করি, গঙ্গোত্রীই যেন গঙ্গাকে সৃষ্টি করিতেছে। এইজন্য জগতের যে সকল কাব্যের লেখক কে, তাহার যেন ঠিকানা নাই—যে সকল কাব্য আপনাকেই যেন আপনি সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, অথচ যাহার সূত্র ছিন্ন হইয়া যায় নাই, সেই সকল কাব্যের দৃষ্টান্ত দিয়া আমি ভাবসৃষ্টির বিপুল নৈসর্গিকতার প্রতি আপনাদের মন আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিবের গান।

'ধান ভানতে শিবের গান' কথাটা বহু প্রাচীন,—বঙ্গদেশের কোন কোন স্থলে প্রবাদটি "ধান ভানতে মহীপালের গান" এই আকারেও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই দুইটি প্রবাদই সত্য। বঙ্গভাষাকে যে সময়ে পৈশাচিক প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত মনে করিয়া পণ্ডিতগণ উপেক্ষা করিতেন, ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে যখন এই ভাষার আদর ছিল না, রাজদরবারে যখন ইহা প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় নাই—সেই সময়ে গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকেরা কতকগুলি গান রচনা করিয়া আত্মরঞ্জন করিত—সেই গানগুলি শিবপ্রসঙ্গে ও পালরাজগণের কীর্ত্তিকথা লইয়া মুখে মুখে রচিত হইয়াছিল। লেখনী বা মস্যাধারের সঙ্গে সেই কৃষককবিগণের কোন সম্পর্কই ছিল না।

পালরাজগণের মধ্যে মাণিকচাঁদ ও গোবিন্দচাঁদের গান সংগৃহীত হইয়াছে। রংপুর-অঞ্চলে এখনও অপরাপর কয়েকজন পাল-রাজন্যের গীতি প্রচলিত আছে—সেই সকল গানের উদ্ধারকল্পে কোন চেষ্টাই হইতেছে না, আর কয়েকবৎসরের মধ্যে তাহারা লুপ্ত হইবে, তখন আমাদের সেই ক্ষতিপূরণের কোন সম্ভাবনা থাকিবে না।

পালরাজগণের এই সকল গান পড়িয়া কবিত্বপিপাসু পাঠকগণ যে তৃপ্ত হইবেন, এমন ভরসা আমরা দিতে পারি না—ঐতিহাসিকগণও উহাদের বহু পত্র অগ্রাহ্য করিবেন। যতপ্রকার অবিশ্বাস্য ও আজগুবি কল্পনা মনে উদয় হইতে পারে, পাঠকগণ ঐ সকল গানে তাহা পাইবেন,—তা ছাড়া, উহাদের রুচি অতি গ্রাম্য ও রচনা একান্ত অসংযত। কিন্তু চলিতকথায় আছে, ছাই কুড়াইয়া রাখিলেও রত্নলাভ হইতে পারে,—এই গান-

গুলির মধ্যেও এরূপ বহুমূল্য তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে, যাহাতে বঙ্গদেশের অতীত ইতিহাসের কতকগুলি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে,—উঁহাদের উপেক্ষিত গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট শব্দসমূহের দ্বারা ভাষাবিজ্ঞানি পুষ্ট হইতে পারে। যাঁহারা পাথরের টুক্‌রায় প্রাচীনলিপি পাইলে আনন্দে প্রমত্ত হইয়া পড়েন,—প্রাচীন পল্লীতে একটু খোলাভাঙা, ভাস্কর্য্যের নিদর্শনযুক্ত স্তম্ভের অগ্রভাগ, একটি প্রাচীনমুদ্রা কিংবা প্রস্তরমূর্ত্তি মাটি খুঁড়িয়া পাইলে যাঁহারা হারানিধির ন্যায় অঞ্চলে বাঁধিয়া রক্ষা করেন, সেই বঙ্গীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের সমষ্টিস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পালরাজগণের গানগুলির প্রতি এরূপ উপেক্ষা কেন প্রদর্শন করিতেছেন—তাহা বুঝিতে পারা যায় না। গ্রীয়ারসনসাহেব মাণিকচাঁদের গান এশিয়াটিক্ সোসাইটির জারন্যালে ছাপাইয়া তৎসম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলেন, তখন বাঙালী পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে সহসা সচেষ্ট হন। এখন গ্রীয়ার্‌সন্‌সাহেব বিলাতে, ব্লক্‌সাহেবও ছুটিতে গিয়াছেন, সুতরাং জ্ঞানাঞ্জনশলাকাদ্বারা কে আর আমাদের মোহ ভাঙিয়া দিবে? এই সকল গানের কবিত্ব সহসা চক্ষে এড়াইয়া গেলেও যিনি তত্ত্বান্বেষীর ন্যায় এগুলি পর্য্যালোচনা করিবেন, তিনি গোপীচাঁদের সন্ন্যাস এবং ময়নামতী ও অদুনার শোকবর্ণনায় যে করুণ প্রেম ও মর্ম্মগাথার আভাস দেখিতে পাইবেন,—পরবর্ত্তী বৈষ্ণবসাহিত্য তাহাই বিকাশ করিয়াছে, সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন। নিম্নশ্রেণীর লোকের রচনা হইলেও উহা পরবর্ত্তী সমৃদ্ধ সাহিত্যের অন্তরঙ্গ।

খুব প্রাচীন শিবের গান আমরা পাই নাই, সেগুলি পরবর্ত্তী কবিরা নূতনভাবে গড়িয়া-পিটিয়া লইয়াছেন। প্রায় চারিশতবৎসর পূর্ব্বে রচিত রতিদেবের মৃগলুব্ধ, তিনশতবৎসর পূর্ব্বের রামকৃষ্ণের শিবায়ন এবং শঙ্কর কবিচন্দ্রের শিবমঙ্গল ও দুইশতবৎসর পূর্ব্বে রচিত রামেশ্বরের শিবায়ন প্রভৃতি কতকগুলি শিবগীতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

এই পুস্তকগুলি যদিও অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তথাপি অতি প্রাচীন শিবের গীতি. যাহা স্ত্রীলোকেরা ধান ভানিবার সময় গাহিতেন, তাহা কিরূপ ছিল, সেই নিদর্শন এই সমুদয় পুস্তকে যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শিবসম্বন্ধে এই সকল গানের অনেকগুলিতে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা কোন সংস্কৃত পুরাণাদি হইতে গৃহীত হয় নাই। শিব ইন্দ্রের নিকট হইতে চাষ করিবার জন্য কিছু জমি গ্রহণ করিতেছেন, এতদুপলক্ষে জমির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। দেববৃত্তি, গোবৃত্তি ও ব্রহ্মবৃত্তি দেশে অনেক ছিল, সেগুলি বর্জ্জন করিয়া শিবঠাকুর তেপান্তরমাঠে কতকটা জমি লইয়া ইন্দ্রের নিকটে পাট্টা গ্রহণ করিতেছেন; ছেলে-ভুলান ছড়ায় যে তেপান্তরমাঠের উল্লেখ পাওয়া যায়, ইহা সেই তেপান্তর মাঠ,—ইহা বঙ্গীয় প্রবাদ ও গানগুলির একটি প্রাচীন সম্পত্তি। শিব "ডম্বুরের ডোরে" পাটাখানি বাঁধিয়া লইয়া গৃহে যাইলেন এবং তৎপরে শূল ভাঙিয়া তদ্দ্বারা লাঙলের ফাল ও কোদাল প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া লইলেন। জমি হইল, চষিবার সরঞ্জাম প্রস্তুত হইল, কিন্তু জমিতে বুনিবার জন্য ধান্যবীজের জোগাড় নাই; বৃদ্ধ শিবঠাকুর কুবেরের নিকট কিছু ধান্যবীজ ধার করিয়া ভৃত্য ভীমের সঙ্গে তেপা-

তন্তরমাঠে উপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দশবার হলদ্বারা ভূমিকর্ষণ করিলেন, মই দিয়া মাটি ভাঙিলেন, ভূমির উত্তরাংশ উচ্চ করিয়া দক্ষিণ-দিক্ নত করিলেন। তখন বৈশাখমাসে বৃষ্টি আরম্ভ হইল—হর্ষে তাঁহার ক্ষেতের উপর দিয়া ব্যাঙ্‌গুলি লাফাইয়া ছুটিতে লাগিল, জল পাইয়া ধান্য পুষ্ট হইতে লাগিল।

এদিকে শিব গৃহে যান না, শিবানী বিরহে কাতরা হইলেন, নারদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তিনি ভোলানাথকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তেপান্তরমাঠে সহস্র সহস্র জোঁক ছাড়িয়া দিলেন, তাহারা শিব ও তাঁহার ভৃত্য ভীমের সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া ধরিল, শিব চূন ও লবণ দ্বারা জোঁক মারিতে লাগিলেন। শিবানী শতশত মশক পাঠাইয়া শিবকে পুনরায় ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। পাঠক দেখিবেন, এইরূপ বর্ণনায় কোন কবিত্বই নাই,—কালিদাসের যক্ষ বিরহবিধুর হইয়া মেঘকে দূত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, নিষধাধিপ এরূপস্থলে রাজহংস-দ্বারা দৌত্যসম্পাদন করাইয়াছিলেন, গোপ-বধূগণ পদাঙ্কদূতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আর পার্ব্বতী জোঁক, মশক ও ভীমরুল পাঠাইয়া শিবকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা পাইতেছেন। এই গানের রচয়িতা কৃষকগণের কবিত্বশক্তি যথেষ্ট না থাকিলেও তাহারা নেহাৎ স্থূলবুদ্ধি ছিল না,—মেঘ, রাজহাঁস বা পদাঙ্ক যে সংবাদ লইয়া প্রণয়ীকে জানাইবে, তাহা শিক্ষিতসম্প্রদায় স্বীকার করিলেও কৃষকদিগকে এ কথা বুঝান কঠিন। তাহারা বরং এটা ভাল বুঝিতে পারে যে, ক্ষেতে জোঁক ও মশকের উপদ্রব বেশি, সেখানে চাষার কাস্তে বেশিক্ষণ চলিতে পারে না, তাহারা এইরূপ উৎপীড়নে শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া আসিতে পারে। সুতরাং কবিত্বের হিসাবে যাহাই হউক না কেন,—শিবের গানের এই সকল বর্ণনা শুনিতে চাষাদের মধ্যে শ্রোতার অভাব হয় নাই।

মশকের উপদ্রবনিবারণকল্পে শিবঠাকুর তুষের আগুন জ্বালিয়া ধোঁয়ার সৃষ্টি করিলেন,—মশক পালাইয়া গেল। এই সকল বর্ণনার আর একটা দিক্ দেখা যায়। চাষবাসের সম্বন্ধে শিবের গানে অনেক বহুদর্শিতার কথা লিপিবদ্ধ আছে। বঙ্গদেশে কৃষিতত্ত্ববিচারের সময় শিবায়নগুলির সন্ধান করিতে হইবে, তখন কাব্য সহসা বিজ্ঞানের আকার ধারণ করিবে।

শিবের গানসম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তদ্দ্বারা লক্ষিত হইবে যে, এই রচনা যে সময়ের, তখন বঙ্গভাষা শিক্ষিতসম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। উহা ঠিক ধান ভানিবার সময় গীত হইবারই যোগ্য ছিল,—নতুবা যে শিবের ললাটের অর্দ্ধেন্দুর বর্ণনা করিতে যাইয়া কত কবি উপমার নদী বহাইয়া দিয়াছেন, যাঁহার প্রলয়কালের তাণ্ডবনৃত্যে নক্ষত্রগণ কক্ষচ্যুত হয়, বিষাণশব্দে সপ্তসমুদ্র স্তব্ধ হয় এবং প্রসারিত শূলাগ্রে দিক্‌হস্তিগণ বিদ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়, শত শত স্তোত্র ও তাম্র-ফলকের বন্দনায় যাঁহার উদগ্র অথচ সুন্দর, বিশ্ববিনাশকর অথচ বিশ্ববিমোহন রূপের অপূর্ব্ব পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তিনি তেপান্তরমাঠে ক্ষেতের চতুর্দ্দিকে আইল বাঁধিয়া ভৃত্য ভীমের সঙ্গে ধান্য নিড়াইতেছেন কিংবা পার্ব্বতীপ্রেরিত মশক তাড়াইবার জন্য তুষের ধোঁয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন, এ সকল

চিত্রদর্শনে মনে হয়, কৃষকেরা তাহাদের ঠাকুরকে তাহাদের মত গড়িয়া প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়াছিল, উচ্চাঙ্গের কবিতা বা ধর্ম্মভাব তাহারা ধারণা করিতে পারে নাই; মহিষেরা যদি তাহাদের দেবতা গড়িতে চাহে, তবে তাঁহার দুইটি শৃঙ্গ কল্পনা না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না,—চাষার দেবতা ক্ষেত্রে ধান্তবীজ বপন করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে। দেবতা যদি অন্তরঙ্গ হন, তবেই তাঁহার সহিত ভাবের আদানপ্রদান চলিতে পারে।

কিন্তু পালরাজগণের গানের যেরূপ একটা অংশ আছে, যেখানে পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে সেই গানগুলির যোগ পাওয়া যায়,—এই শিবের গানেরও কোন কোন স্থানে সেইরূপ বঙ্গীয় কবিতার চিরপরিচিত আকার পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। শিবের পায়ে পড়িয়া পার্ব্বতী একজোড়া শঙ্খ চাহিতেছেন, শিব নিতান্ত দরিদ্র, তিনি শঙ্খ কিনিবার কড়ি কোথায় পাইবেন? সাধ্বীর শঙ্খ পরিবার সাধ ও শিবের কটূক্তিতে প্রাচীন বঙ্গীয় গৃহস্থালীর একখানি চিত্র চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পার্ব্বতী রাগ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন, শিব অনন্যগতি হইয়া শাঁখারী সাজিয়া হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন,—পার্ব্বতী শাঁখারীকে চিনিতে পারিলেন, তিনি শাঁখা পরিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন;—শিব স্বীয় কোমল পদ্মহস্তে যখন শিবানীকে শাঁখা পরাইতেছিলেন, তখন সাধ্বী ভাবিতেছিলেন, ভোলানাথ তাঁহার জন্য কষ্ট করিয়া শাঁখা নিজে গড়িয়া আনিয়াছেন এবং ছদ্মবেশ স্বীকার করিয়া শাঁখা পরাইবার জন্য এত শ্রম স্বীকার করিতেছেন, অথচ তিনি শিবের হাতদুখানি মশক ও জোঁকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত করাইয়াছেন। তখন হৈমবতীর উজ্জ্বল গণ্ডদ্বয়ে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল,—তিনি স্বামীর নিকট আপনাকে অপরাধী মনে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ইহার পর আর এক দৃশ্য। হৈমবতী অন্নপরিবেষণ করিতেছেন, তাঁহার ললিতদেহ ঈষৎ নমিত হইতেছে,—মুখচন্দ্রে নীহারবিন্দুর ন্যায় শ্রমজনিত স্বেদবিন্দু, অন্ন আনিতে ও পরিবেষণ করিতে অবসর পাইতেছেন না,—ধুতুরাফলভাজা খাইয়া শিব যখন আনন্দে মাথা নাড়িতেছেন, পার্ব্বতী তখন অপাঙ্গদৃষ্টিতে স্বামীর পরিতৃপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া মনে মনে অসীম প্রীতি উপভোগ করিতেছেন। এদিকে কার্ত্তিক-গণেশ নিমেষের মধ্যে খাদ্য ফুরাইয়া ফেলিয়া 'দাও দাও' বলিয়া চীৎকার করিতেছেন,—অন্যত্র নন্দীও সেইরূপ চীৎকার করিয়া শিবানীকে উদ্ভ্রান্ত করিতেছে। তিনি বলিতেছেন, "বাছারা, একটু ধীরে ধীরে খা",—এই দৃশ্য কৈলাসের নহে, ইহা হিন্দুর অন্তঃপুরকে চিত্রিত করিয়া দেখাইতেছে। গ্রাম্যকৃষকের গানের এই অধ্যায়ে ভাব বা ভাষার দারিদ্র্য নাই, যেহেতু বিদ্যাবুদ্ধিতে হিন্দু-চাষা খাটো হইতে পারে, তাহার অর্থবলও কিছুই নাই,—কিন্তু গার্হস্থ্যধর্ম্ম সে যেরূপ বুঝিয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

শিবের গানে পার্ব্বতীর বাগ্দিনীবেশে মহাদেবকে ছলনার কথা সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়,—কোন কোন পুঁথিতে বাগ্দিনীস্থলে ডুম্নীর কথা আছে,—এই ছলনার ইতিহাস গ্রাম্যতা-

দোষদুষ্ট,—কিন্তু ইহার মধ্যে পল্লিজীবনের সরসতা আছে। এই ছলনার বৃত্তান্ত পদ্মাপুরাণেও দৃষ্ট হইয়া থাকে,—বৃত্তান্তটির আগাগোড়ায় যেরূপ পরিহাস ও বাক্‌চাতুরী দৃষ্ট হয়, তাহা নিম্নশ্রেণীরই যোগ্য। বাঙ্‌লাভাষা যে-কালে পাড়াগায়ের নিম্নশ্রেণীর জন্য অমার্জ্জিত সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল—এই রচনা সেই কালের। তার পর কতকাল গিয়াছে,—সংস্কৃত তখন ধূর্জ্জটির জটামুক্ত গঙ্গার ন্যায় পণ্ডিতসভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাঙ্‌লাভাষাকে নবশক্তি প্রদান করিয়াছে,—ভারতচন্দ্রের "জয় শিবেশ শঙ্কর, বৃষধ্বজেশ্বর, মৃগাঙ্গশেখর দিগম্বর" প্রভৃতি পদের ভাষা সংস্কৃত কি বাঙ্‌লা নির্ণয় করা সুকঠিন হইয়াছে। এত দীর্ঘকাল পরেও চাষার হাতে শিব যে গড়ন পাইয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রের মত সংস্কৃতজ্ঞ কবিও তাহার প্রভাব একান্তভাবে এড়াইতে পারেন নাই। মেনাদের ঢেঁকি, শিববিবাহ ও শিবের ভিক্ষা বর্ণনায় অশিক্ষিত আদিকবিগণের হাতের গড়ন তিনি বজায় রাখিয়াছেন।

বস্তুত কালিদাসের কবিতায়, সংস্কৃতনাট্যকারদিগের বন্দনায়, তাম্রফলকের শিরোনামায়,—শঙ্করস্তোত্র ও পুরাণাদিতে শিবের যে বর্ণনা আছে,—কৃষকগণের শিবের ধারণা আদপেই তদ্রূপ ছিল না;—শিবের গানের শিব যে সকল কর্ম্মে নিযুক্ত, পাড়াগেঁয়ে গোলাদার বড় চাষা সেই সকল কার্য্য করিয়া থাকে। কোথায় বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও শঙ্করের শিবোহহম্, আর কোথায় ভবানী-ভ্রুকুটীভঙ্গিবিব্রত, হল-কোদাল-হস্ত, বলীবর্দ্দব্যাকুলমর্দ্দী, ভেপান্তরক্ষেত্রের পাট্টাপ্রাপ্ত এই বৃদ্ধ শিবঠাকুর!

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

বারাণসী।

৬

তত্ত্বজ্ঞানীদের গৃহ।

একটি পুরাতন উদ্যানের প্রান্তভাগে একটি সামান্য হিন্দুগৃহ, অত্যন্ত নিম্ন ও কালের চিহ্নে ঈষৎ চিহ্নিত; সব শাদা- চুনকাম-করা; আমার জন্মভূমির সেকেলে বাড়ীর মত ঝিল্‌মিলিগুলা সবুজ। গৃহের ছাদ, শাদা-শাদা কতকগুলা পিল্লার উপর স্থাপিত এবং চারিপার্শ্ব হইতে বারণ্ডার আকারে সম্মুখে অনেকটা বাহির হইয়া আসিয়াছে। বেশ বুঝা যাইতেছে, এখনো আমি সেই চিরন্তন সূর্য্যের দেশেই অবস্থিতি করিতেছি। কিন্তু এই পোড়ো-ধরণের বাগানটির মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা আমার চোখে বিদেশী কিংবা নিতান্ত অপরিচিত বলিয়া মনে হইতে পারে। আমাদের উদ্যানেরই মত সেই নিবিড় ছায়া, সরু-সরু পথের দুধারে সেকেলে-ধরণে-বসানো সেই ফুটন্ত গোলাপগাছ।

আমার নিমন্ত্রকেরা দয়ার্দ্র-স্মিতমুখে ও মৃদুমধুর সম্ভাষণে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

তাঁহাদের মুখশ্রী সুন্দর ও গম্ভীর; কৃষ্ণকুন্তল-শোভিত যিশুখৃষ্টের যেন কতকগুলি পিত্তল-মূর্ত্তি। তাঁহাদের অতীব মধুর দৃষ্টি আমার উপর নিপতিত হইয়া আবার তখনি যেন ঔৎসুক্যবিহীন হইয়া অন্যত্র—আরো উর্দ্ধে—বোধ হয় সেই সূক্ষ্মশরীরের জগতে ফিরিয়া গেল—যেখানে মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহাদের আত্মাপুরুষ কখন-কখন উড়িয়া যায়।

এরূপ শান্তিময়—এরূপ আতিথেয় গৃহ আর কোথাও নাই। যে-কেহ এখানে আসিতে চায়, তাহার জন্যই ইহার দ্বার চির-অবারিত।

তথাপি, কি-এক গভীর ও অনির্দ্দেশ্য ভীতির ভাব আমার মনকে অধিকার করিল। আমি ভয়ে-ভয়ে দ্বারে আঘাত করিলাম। আমি বুঝিয়াছিলাম, ইহাই আমার শেষ-চেষ্টা। যদি এখানে কিছু না পাই, তবে আর কোথাও কিছু পাইব না।

এই তত্ত্বজ্ঞানীরা ধ্যানও করেন, কাজও করেন এবং অন্য হিন্দুর ন্যায় ইঁহারাও অতীব মধুর ধৈর্য্যসহকারে ভূচর-খেচর উভয়প্রকার জীবেরই অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকেন। গাছের ছোট-ছোট কাঠবিড়ালী জান্‌লা দিয়া ইঁহাদের গৃহে প্রবেশ করে; চড়াইপাখী বিশ্রব্ধভাবে ইঁহাদের ঘরের ছাদে বাসা বাঁধে। ইঁহাদের গৃহ পাখীতে ভরা।

মাঝের ঘরটিতে শাদা কাপড় দিয়া ঢাকা একটা তক্তাপোষ রহিয়াছে। যাঁহারা এখানে আসিয়া মিলিত হন (অনেকেই আসিয়া থাকেন), তাঁহারা এই তক্তাপোষের উপর চক্রাকারে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া আধ্যাত্মিক গুহ্যতত্ত্বসকল নির্ণয় করেন। ইঁহারা সেই সব চিন্তাশীল ব্রাহ্মণ, যাঁহাদের ললাট হয় বৈষ্ণবচিহ্নে, নয় শৈবচিহ্নে অঙ্কিত;—যাঁহারা নগ্নবক্ষে ও নগ্নপদে গমনাগমন করেন; যাঁহাদের কোমরে শুধু একটা মোটা ধুতি জড়ানো; যাঁহারা সমস্ত তত্ত্ব তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করেন, যাঁহারা সংসারের মোহমায়ায় ভোলেন না। ইঁহারা সেই সব মহাপণ্ডিত,—পার্থিববিষয়ের প্রতি নিতান্ত উদাসীন বলিয়া যাঁহাদিগকে রাস্তার মুটে-মজুর বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু যাঁহারা য়ুরোপের সূক্ষ্মতম ও আধুনিকতম দর্শনগ্রন্থ-সকল বিচার করিয়া দেখিয়াছেন এবং যাঁহারা প্রশান্তভাবে ও নিঃসংশয়চিত্তে তোমাকে বলিবেন—"তোমাদের দর্শনের যেখানে শেষ, আমাদের দর্শনের সেইখানেই আরম্ভ।"

এই তত্ত্বজ্ঞানীরা—হয় একাকী, নয় সমবেত হইয়া কাজ করেন, ধ্যান করেন। একটা সামান্য মেঝের উপর কতকগুলি সংস্কৃত-গ্রন্থ উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে—যাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বসকল নিহিত এবং এই সকল তত্ত্ব আমাদের দর্শন ও ধর্ম্মের বহুসহস্র-বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমাদের জাতির ও আমাদের যুগের লোকদের অপেক্ষা যাঁহাদের দৃষ্টির প্রসর অনন্তগুণে অধিক, সেই পুরাকালের তত্ত্বদর্শিগণ এই সকল অতল-স্পর্শ গভীর গ্রন্থের মধ্যে জ্ঞানের চরমতত্ত্ব মহারত্নসকল রাখিয়া গিয়াছেন। যাহা ধারণার অতীত, তাঁহারা প্রায় তাহাকে ধারণার মধ্যে আনিয়াছিলেন; এবং তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদি, যাহা শতশত বৎসর ধরিয়া বিস্মৃতির মধ্যে সুষুপ্ত ছিল, আজ তাহা আমাদের মত ভ্রষ্টবুদ্ধি অধম মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য। তাই, এই সকল তমসাচ্ছন্ন শব্দ-

রাশির মধ্য হইতে তমোরাশি অপসৃত হইয়া যাহাতে অল্পে-অল্পে জ্ঞানরশ্মি আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়—আমাদের দৃষ্টির প্রসর বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য এখনো আমাদের অনেক-বৎসরের শিক্ষাদীক্ষা আবশ্যক।

মনে হয়, এই সব গ্রন্থ যদি কেহ এখন বুঝিতে পারেন, তবে এই বারাণসীর তত্ত্বজ্ঞানীরাই। কেন না, ইঁহারাই সেই পরমাশ্চর্য্য মুনিঋষিদিগের বংশধর—যাঁহারা এই সকল গ্রন্থের রচয়িতা; ইঁহারা সেই একই বংশের লোক—যাঁহারা পুরুষানুক্রমে শুদ্ধাচারী ছিলেন;—সেই একই বংশের লোক, যাঁহারা কখনো জীবহত্যা করেন নাই, যাঁহাদের দেহের মাংস অন্যজীবের মাংসে পরিপুষ্ট হয় নাই। সুতরাং ইঁহাদের দেহের উপাদান-পদার্থ আমাদের দেহের মত ততটা স্থূল কিংবা অস্বচ্ছ হইবে না। কুলপরম্পরাগত ধ্যানধারণা ও পূজা-অর্চ্চনার ফলে অবশ্যই ইঁহাদের চিত্তবৃত্তি এরূপ সুকুমার হইয়াছে, ইঁহাদের জ্ঞান এরূপ সূক্ষ্ম হইয়াছে যে, তাহা আমাদের ধারণার অতীত। তথাপি ইঁহারা অত্যন্ত বিনয়ের সহিত আমাকে বলিলেন,—"আমরা কিছুই জানি না, কিছুই প্রায় বুঝি না, আমরা শুধু সত্যের অন্বেষণ করিতেছি মাত্র।"

একটি রমণী—* য়ুরোপীয় রমণী, পাশ্চাত্য মোহাবর্ত্ত হইতে পলাইয়া আসিয়া ইঁহাদের মধ্যে একটা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। ইঁহার মুখশ্রী এখনো চিত্তাকর্ষক; শুভ্রপলিত কেশ; নগ্ন পদ; ইনি ব্রাহ্মণপত্নীর ন্যায় মিতাচারিণী, এবং সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কঠোরব্রত তাপসীর জীবন যাপন করিতেছেন। দুর্গম জ্ঞানমন্দিরের ভীষণ দ্বারটি যাহাতে আমার অন্ধ নয়নের সমক্ষে অল্পে-অল্পে প্রকাশ পায়, তজ্জন্য আমি তাঁহারই শুভ ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া আছি। কেন না, আমাদের উভয়ের মধ্যে ততটা ব্যবধান নাই; পূর্ব্বে তিনি আমারই স্বজাতীয়া ছিলেন এবং আমার দেশভাষাও তাঁহার নিকট সুপরিচিত।

তথাপি অতীব সন্দিগ্ধচিত্তে আমি তাঁহার নিকট গমন করিলাম। প্রথমেই তাঁকে একটা ফাঁদে ফেলিবার জন্য, আর একটি † স্ত্রীলোকের কথা পাড়িলাম—যিনি তাঁহারই পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিলেন, যিনি এই তত্ত্বজ্ঞানী সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং যাঁহার প্রখ্যাত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াই আমি স্বধর্ম্মে সন্দিহান হইয়াছিলাম। আমি ইঁহার কাছে কথাটা এইজন্য পাড়িলাম, কেন না, আমি শুনিয়াছিলাম, ইঁহারও ধ্রুববিশ্বাস,—তিনি বুজরুকি দেখাইয়া প্রবঞ্চনা করিতেন। আমি তাঁকে

* শ্রীমতী অ্যানী বেসান্ত।

† ইনি শ্রীমতী ব্লাভাট্‌স্কি। তিনি যাহাই করুন না কেন, তাঁহাকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান না দিলে, তাঁহার প্রতি অন্যায় করা হয়। কতকগুলি ভারতীয় গ্রন্থে যে সকল চমৎকার মতবাদ শতশত বৎসর ধরিয়া প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহার প্রথম প্রকাশক তিনিই। সত্য বটে, তাঁহার শিষ্যেরা পর্য্যন্ত এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই যে, স্বমত প্রচার করিতে গিয়া, তাঁহার শেষদশায় এরূপ একটা মত্ততা উপস্থিত হইয়াছিল যে, কোন কোন লোককে বুজরুকি দেখাইয়াও তিনি আপনার দলে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই বালকোচিত চিত্তদৌর্ব্বল্যসত্ত্বেও, তত্ত্বপ্রকাশক বলিয়া তাঁহার যে খ্যাতি, তাহার কিছুমাত্র লাঘব হয় না। যে তত্ত্বজ্ঞান পৃথিবীর মত পুরাতন, যাহা ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে না, তাহার সহিত শ্রীমতীর নাম বিশেষরূপে জড়িত করা ভারী ভুল।

বলিলাম—"আপনি কি মনে করেন না, কাহারও কোন বিষয়ে হৃদ্‌বোধ করাইবার জন্য যদি বুজ্‌রুকি দেখান হয়, তাহা মার্জ্জনীয় ?"

অকপটদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি উত্তর করিলেন—"প্রতারণা-প্রবঞ্চনা কোন অবস্থাতেই মার্জ্জনীয় নহে ; মিথ্যাকথা হইতে কখনই ভাল ফল উৎপন্ন হয় না।"

এই কথায়, আমার দীক্ষাগুরুর প্রতি আমার সহসা বিশ্বাস জন্মিল। মুহূর্ত্ত পরেই তিনি আবার বলিলেন—"আমাদের বিশেষ ধর্ম্মমত কি ?...আমাদের কোন বিশেষ ধর্ম্মমত নাই। আমাদের 'থিয়সফিষ্ট'সম্প্রদায়ের মধ্যে (লোকে এই নামে আমাদিগকে অভিহিত করে) বৌদ্ধ আছে, হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, ক্যাথলিক্ আছে, পুরাতন সম্প্রদায়ের গোঁড়া লোক আছে, এমন কি, তোমার ধরণের লোকও আছে। আমাদের দলভুক্ত হ'তে তোমার যদি ইচ্ছা হয়..."

—"আপনাদের দলভুক্ত হইতে হইলে কি করা আবশ্যক ?"

"শুধু এই শপথ করিতে হইবে,—জাতি ও বর্ণনির্ব্বিশেষে আমি সকল মনুষ্যকেই ভ্রাতা জ্ঞান করিব ; কি রাজা, কি সামান্য একজন মজুর, সকলের প্রতিই সমান ব্যবহার করিব ; সত্যের অন্বেষণে (জড়বাদীর ভাবে নহে) সাধ্যমত প্রবৃত্ত হইব। ইহা ছাড়া আর কিছুই করিতে হইবে না। এখানে আসিবার সময় তোমার যাত্রাপথে আমাদের যে সকল মান্দ্রাজি বন্ধুর সহিত তুমি সাক্ষাৎ করিয়াছিলে, তাঁহাদের বৌদ্ধধর্ম্মের দিকেই একটু বেশী ঝোঁক্। আমি জানি, তাঁহাদের আগ্রহহীন ঔদাসীন্যের ভাব তোমার গূঢ়রহস্য-প্রবণ আত্মাকে প্রতিহত করিয়াছিল। কিন্তু আমরা সেই প্রাচীনকালের গুহ্য ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মেই শান্তি ও আলোক লাভ করিয়াছি। মানুষের পক্ষে যতদূর জানা সম্ভব—সত্যের সেই উচ্চতম ভাব উহারই মধ্যে নিহিত।

"আমাদের খুবই ইচ্ছা, আমরা যে পথ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি, পথপ্রদর্শক হইয়া আমরা তোমাকেও সেই পথে লইয়া যাই। 'দ্বাররক্ষকে'র সেই পুরাতন রূপক-কাহিনীটি বোধ হয় তুমি জান ; নবদীক্ষার্থীকে ভয় দেখাইবার জন্য সেই সব ভীষণ রক্ষক, দীক্ষার আরম্ভকালে, দেবালয়ের দ্বারদেশে বিচরণ করে। উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই—জ্ঞানোদয়ের আরম্ভে, স্বভাবতই নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখা যায়। আমাদের বিশ্বাস এই,—মানুষের সমস্ত ব্যক্তিগত অংশ ক্ষণস্থায়ী ও মায়াময়। তোমার মত যে-সব লোকের ব্যক্তিত্বের ভাব অতীব তীব্র, তাহাদের পক্ষে সিদ্ধিলাভ করা বড়ই কঠিন। আমরা আরো অনেক কথা বিশ্বাস করি, যাহা তোমার কৌলিক সংস্কারের সম্পূর্ণ বিপরীত। যে সকল আশা তোমার অজ্ঞাতেও তুমি গূঢ়-রূপে এখনো তোমার অন্তরে পোষণ করিতেছ, সেই সকল আশা যদি আমরা তোমার মন হইতে উঠাইয়া লই, তাহা হইলে তুমি কি আমাদিগকে অভিশাপ করিবে না ?"

"না। আশার কথা যদি বলেন, সে পক্ষে আমার আর কিছুই হারাইবার নাই।"

"বেশ, তা হ'লে তুমি আমাদের নিকটে এস।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গৌড়-কাহিনী।

অবতরণিকা।

যদুপতির সে মথুরাপুরী কোথায় চলিয়া গিয়াছে? রঘুপতির সে উত্তরকোশলাই বা কোথায় চলিয়া গিয়াছে? তথাপি জনসমাজ এখনও মন স্থির করিয়া আত্মসংবরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। গৌড়ের কথাও সেইরূপ। গৌড় নাই। কিন্তু তাহার কথা স্মরণ করিলে, জনসমাজ এখনও আত্মসংবরণ করিতে পারে না। ধ্বংসাবশিষ্ট পুরাতন নগরতোরণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, কি-এক শ্মশানবৈরাগ্যে হৃদয়মন পরিপূর্ণ হইয়া যায়!

কি ছিল, কি হইয়াছে! সকল কীর্ত্তি লোকলোচন হইতে অন্তর্হিত হইলে, এরূপ হইত না। যাহা আছে,—তাহাতেই,—যাহা নাই, তাহার জন্য মানবপ্রাণ কাতর হইয়া পড়ে। নগরপ্রাচীর পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার উপর যে সকল বিচিত্র প্রহরিমন্দির বর্ত্তমান ছিল, তাহা একে একে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে;—তাহার স্থানে কত পুরাতন মহামহীরুহ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নীরবে কালগণনা করিতেছে! সুদীর্ঘ সরোবর পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাতে অবতরণ করিবার জন্য যে পাষাণসোপান রচিত হইয়াছিল, তাহা ভূগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে;—জনকোলাহলের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র নিষ্ঠুর নীরবতা! উপাসনালয় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার বিস্তৃত কক্ষে আর উপাসকদলের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায় না;—শ্বাপদসমাগমশঙ্কায় পর্য্যটকগণকে সতর্কপদবিক্ষেপে কক্ষপ্রবেশ করিতে হয়।

গৌড় কতদিনের পুরাতন রাজনগর, তাহা আর নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণীত হইবার সম্ভাবনা নাই। ইতিহাসের অভাবে, জনশ্রুতি কালনির্ণয়ের ভারগ্রহণ করিয়া, কত অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করিয়া গিয়াছে! একটি কাহিনী এইরূপ—"খৃষ্টাবির্ভাবের ৩৯৩বৎসর পূর্ব্বে সিঙ্গলদীপ-নামক নরপতি কুচবিহার হইতে বিজয়যাত্রায় বহির্গত হইয়া, বঙ্গবিহার করতলগত করেন। তিনিই ভুবনবিখ্যাত গৌড়নগরী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।" * এই কাহিনী এখন আর জনসমাজে প্রচলিত নাই।

একদা অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গের অধিকাংশ জনপদ গৌড়ীয়সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল †। সাম্রাজ্যসীমা পূর্ব্বে কামরূপ এবং পশ্চিমে কাশীরাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল।

---

* গৌড়ের শেষ ইতিহাসলেখক ইলাহিবক্স—আল্-হুসেনী-আওরেঙ্গাবাদী স্বকৃত পারস্যভাষানিবদ্ধ "খুরশেদ জাঁহানামা"নামক হস্তলিখিত ইতিহাসে এই জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মূলগ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। কেবল মহাত্মা বিভারিজসাহেবের আগ্রহে কোন কোন অংশের ইংরাজী অনুবাদের কোন কোন কথা "এশিয়াটিক্ সোসাইটির" পত্রিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইলাহিবক্সের মূলগ্রন্থ এখনও সুরক্ষিত হইতেছে, কালে তাহাও বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে।

† শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে এবং বৃহৎসংহিতায় এইরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখনও যাহা কিছু জানিতে পারা যায়, তাহা ইতিহাস নহে,- জনশ্রুতিমাত্র। কালে তাহাও বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে। এইরূপে ভারতবর্ষের কত পুরাতন কাহিনী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে!

গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ মালদহজেলার অন্তর্গত। তাহা মহানন্দার উভয়তীরেই অবস্থিত। মালদহের লোকের নিকট একাংশ "গৌড়" এবং অপরাংশ "পাণ্ডুয়া" নামে পরিচিত। প্রকৃতপ্রস্তাবে উভয় স্থানেই গৌড়ীয়সাম্রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল;—কখন এখানে, কখন সেখানে, কখন উভয় স্থানেই যুগপৎ রাজকার্য্য পরিচালিত হইত। উভয় স্থানেই বিবিধ ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। কত পুরাতন—কে বলিতে পারে? মহানন্দার পশ্চিমতীরে "গৌড়";—তাহা মিথিলার অন্তর্গত। পূর্ব্বতীরে "পাণ্ডুয়া";—তাহাই পুরাতন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। মিথিলা এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধন চিরপুরাতন বলিয়াই প্রসিদ্ধ;-কত পুরাতন, তাহা নির্ণীত হইবার উপায় নাই। বৈদিকযুগে এই জনপদ পর্য্যন্ত আর্য্যাভিযান বিস্তৃত হইয়াছিল।

এক সময়ে ভারতবর্ষে "পঞ্চগৌড়" প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার নাম,—সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা এবং উৎকল। সকল গৌড়ই বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার উত্তরাংশে অবস্থিত বলিয়া স্কন্দপুরাণে উল্লিখিত আছে।* পুরাকালে গৌড় বলিতে জনপদ এবং রাজধানী উভয় স্থানই সূচিত হইত।

গৌড়ের নাম গৌড় হইল কেন? তাহার রহস্যোদঘাটনের জন্য অনেকে অনেক তর্কবিতর্কের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক দেশের জনপদ বা রাজনগরের নামকরণের ইতিহাস পাইবার আশা আছে। ভারতবর্ষের ন্যায় পুরাতন দেশের পক্ষে সেরূপ সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। সংস্কৃতসাহিত্যে জনপদের নাম সংজ্ঞাশব্দের অন্তর্গত; তাহার ব্যুৎপত্তিনির্দ্দেশের চেষ্টা সফল হইতে পারে না। তথাপি কেহ কেহ বলেন,—"গুড়" শব্দ হইতে দেশের নাম "গৌড়" হইয়া থাকিবে। প্রমাণস্থলে এই প্রদেশের ইক্ষুবিশেষের কথা উল্লিখিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ঐতিহাসিক তথ্যনির্ণয়ের জন্য এরূপ ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করা অসঙ্গত।

হিন্দু-বৌদ্ধ, পাঠান-মোগল পর্য্যায়ক্রমে গৌড়ীয়সাম্রাজ্যে আধিপত্যলাভ করিয়াছিল। সকলেই আত্মশক্তি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাধ্যমত আয়োজন করেন। কিন্তু সকলেই বুদ্বুদের মত বিলীন হইয়া গিয়াছে। কাহারও কাহারও নাম পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেবল অক্লান্ত অধ্যবসায়ের অভ্রান্ত নিদর্শন,—পরিখা, প্রাচীর, সিংহদ্বার, সমাধিমন্দির,—এখনও জরাপলিতকলেবরে পূর্ব্বসৌভাগ্যের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে।

* সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চ গৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ।
স্কন্দপুরাণ

গৌড়-কাহিনী বঙ্গ-কাহিনী। তাহার সহিত বঙ্গবাসী হিন্দুমুসলমানের কত কথাই জড়িত হইয়া রহিয়াছে! ধর্ম্মে ভিন্ন,—দেশে এক;—সকলের অবস্থাই একরূপ,—সকলেই এখন বাঙালী! বাঙালীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, অধ্যবসায়,—বাঙালীর দুর্ভাগ্য, দুর্ব্বলতা, দুঃখদৈন্য,—বাঙালীর জয়পরাজয়কাহিনী—গৌড়-কাহিনীর অন্তর্গত। বাঙালীর উদ্ভব-ক্ষেত্র বলিয়া গৌড়দেশ চিরগৌরবে গৌরবান্বিত,—বাঙালীর বিলয়ভূমি বলিয়া সেই গৌড়দেশ এখন চিরচিতাচ্ছন্ন মহাশ্মশান। গৌড়ীয় ধ্বংসাবশেষের ন্যায় গৌড়ীয় পুরাকাহিনীতেও সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন।

গৌড়ের নাগরিক সৌন্দর্য্য বহুকাল অক্ষুণ্ণ-প্রতাপে বর্ত্তমান থাকিতে পারিত। কিন্তু এক আকস্মিক বিপৎপাতে সকলই শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ গৌড়ীয়-সাম্রাজ্যের চিরস্মরণীয় কাল সংবৎসর। সেই শেষ! তাহার পর গৌড় ক্রমে ক্রমে বিজন-বনে পরিণত হয়। দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি খান্ খানান্ মনায়েম খাঁ সেই কাল সংবৎসরে গৌড়ে সেনাসমাবেশ করেন। সহসা সেনা-নিবাসে মহামারী উপস্থিত হয়। দেখিতে না দেখিতে, তাহার তীব্র বিষ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। নাগরিকগণ পলায়ন করিবার পূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিত হইতে আরম্ভ করে! এইরূপে জনকোলাহলপূর্ণ রাজনগর বিজনবনে পরিণত হইলেও, অট্টালিকাদি অনেকদিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। পরে তাহা স্থানান্তরিত করিবার আয়োজন আরব্ধ হয়। যে পারিয়াছে, গৌড়ের কারুকার্য্যখচিত ইষ্টকপ্রস্তর স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছে;—কেহ লুটিয়া লইয়াছে, কেহ বা "খেস্ত গৌড়" নামক রাজকর প্রদান করিয়া প্রকাশ্যভাবে ভাঙিয়া লইয়া গিয়াছে। দীর্ঘ-কাল এই ধ্বংসলীলার অভিনয় অব্যাহতভাবে আত্মশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছে। কত লোকে ধনরত্ন লাভ করিয়া অর্থশালী হইয়াছে; কত লোকে কত পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন ভাঙিয়া অর্থানুসন্ধানের চেষ্টা করিয়া গিয়াছে; পর্য্যটক-গণ কত ইষ্টকপ্রস্তর পৃথিবীর কত দেশের প্রদর্শনীগৃহে পুঞ্জীকৃত করিয়াছে;—যাহা এই সকল উৎপীড়নে অব্যাহতিলাভ করিয়াছিল, তাহাই কেবল অদ্যাপি বিদ্যমান আছে;—তাহা সমস্তই বৃহৎ এবং সুন্দর।*

এই সকল ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিতে হইলে, মালদহের আধুনিক প্রধাননগর ইংরেজাবাদে † উপনীত হইতে হয়। সেই স্থান হইতেই পরিদর্শনকার্য্যের সুব্যবস্থা হইতে পারে। ইংরেজাবাদ মহানন্দার পশ্চিমতীরে অবস্থিত। দিল্লীশ্বর আরঙ্গ-জেব-বাদশাহের অনুমতি লইয়া, ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে এখানে কোম্পানীবাহাদুর একটি "কুঠি" সংস্থাপিত করেন। তখন তাঁহারা কার্পাস এবং পট্টবস্ত্র ক্রয় করিয়া বিলাতে প্রেরণ করিতেন। তাহার পর রেশম-

* মালদহ, রাজমহল, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা এবং কলিকাতা পর্য্যন্ত এই সকল পুরাতন ইষ্টকপ্রস্তর চলিয়া গিয়াছিল। যে পারিত, তাহার পক্ষে অপহরণ করিবারও অসুবিধা ছিল না। ইংরাজেরাই তাহার প্রধান পথপ্রদর্শক!

† ইংরেজাবাজের পুরাতন নাম—রংরেজা। তাহাই এখন ইংরেজাবাদ, ইংরেজবাজার, ইংলিসবাজার নামে পরিচিত হইয়াছে।

প্রস্তরের জন্যও ইংরেজেরা চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই পুরাতন "কুঠি" বর্ত্তমান নাই। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে এক নূতন "কুঠি" নির্ম্মিত হয়,—তাহা প্রাচীরবেষ্টিত; তাহার চারি কোণে কামান পাতিবার জন্য চারিটি "বুরুজ" আছে। এখন তাহা কাছারীতে পরিণত হইয়াছে।*

ইংরেজাবাদে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত ইষ্টকপ্রস্তরের অভাব নাই। অধিকাংশ পুরাতন অট্টালিকায় তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থানে স্থানে কৃষ্ণমর্ম্মরময় ফলকলিপি, দ্বারজানালা এবং হিন্দুবৌদ্ধমূর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে।†

নগরের অনতিদূরেই মৃৎপ্রাচীর—উচ্চ এবং সুদীর্ঘ,—তাহার কোন কোন প্রাচীরের উপর রাজপথ,—তাহার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষরাজি। সেকালে এইরূপ বহুসংখ্যক মৃৎপ্রাচীর রচিত হইয়াছিল। তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে;—কোন কোন প্রাচীরের উপর দিয়া শকটচালনারও সুব্যবস্থা হইয়াছে। সেকালে এই সকল মৃৎপ্রাচীর অনেক কার্য্য সাধিত করিত;—ইহাতে বন্যার বেগ প্রতিহত হইত;—লোকচলাচলের সুবিধা ঘটিত;—শত্রুর আক্রমণ হইতে নগররক্ষার সদুপায় হইত। চারিদিকে সমতলক্ষেত্র;—স্থানে স্থানে জলাভূমি;—তাহার মধ্যে এই সকল সুবৃহৎ নগরপ্রাচীর কত দিনে কত ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার কথা চিন্তা করিলে, বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। মৃৎপ্রাচীরের তলদেশ ২০০ফিট্ প্রস্থ; শিখরদেশ ৪০ফিট্ উচ্চ। ইহার পার্শ্বদেশে ইষ্টকের আচ্ছাদন এবং শিখরদেশে বহুসংখ্যক প্রহরিমন্দির বর্ত্তমান ছিল। তাহা লোকে ভাঙিয়া লইয়া গিয়াছে; স্থানে স্থানে অদ্যাপি তাহার চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইংরেজাবাদ হইতে গৌড়াভিমুখে অগ্রসর হইলে, উত্তর-দক্ষিণে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন নগরাংশ দৃষ্টিগোচর হয়। উত্তরাংশের প্রধান স্মৃতিচিহ্ন "—সাগরদীঘি"নামক সুবৃহৎ সরোবর। দক্ষিণাংশের প্রধান স্মৃতিচিহ্ন—"দখলদরজা"-নামক সুবিখ্যাত দুর্গদ্বার।‡ উত্তরাংশই সমধিক পুরাতন;—জনশ্রুতি তাহাকেই পাল এবং সেনবংশীয় নরপালগণের পুরাতন রাজধানী বলিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকে।

ইংরেজাবাদের উত্তরে,—মহানন্দার অপর তীরে, যে নগর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই নাম মালদহ। এখন ইংরেজাবাদ মালদহ নামে পরিচিত হইতেছে বলিয়া, মালদহের নাম হইয়াছে—"পুরাতন মালদহ।" তথায় এখনও অনেক পুরাকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। এই স্থান হইতে একটি পুরাতন রাজপথ উত্তরাস্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পুরাতন রাজধানী পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল;

---

* লর্ড কর্জ্জনের আদেশে কাছারীগৃহের ভিত্তিগাত্রে এক প্রস্তরফলক সংযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে এই অট্টালিকা কোম্পানীবাহাদুরকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

† যে বাটীতে মালদহের ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব বাস করেন, তাহার উদ্যানমধ্যে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত উপবেশন-স্থানে পৃষ্ঠরক্ষার্থ এক মসজেদের ফলকলিপি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পবিত্র মসজেদের ফলকলিপিতে "কোরাণ সরিফের" বচন উদ্ধৃত আছে। তাহার এরূপ পরিণাম কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই;—এখন কালক্রমে সকলই সম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

‡ "প্রবাসী"পত্রে এই সকল স্মৃতিচিহ্নের চিত্রসমন্বিত বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

এখনও স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে মৃৎপ্রাচীর বর্ত্তমান নাই; সকল স্থানই সমতল; তাহার সর্ব্বত্র অসংখ্য পুরাতন সরোবর। এই জনপদের প্রধান স্মৃতিচিহ্ন—"আদিনা।" এত বড় মস্‌জেদ অল্পস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌড়কাহিনীর আলোচনা করিতে হইলে, বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানের আলোচনা করিতে হয়। একদা সকল স্থানই গৌড়ীয়-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কামরূপ, কাশীরাজ্য এবং উৎকলখণ্ডের কোন কোন স্থানেরও গৌড়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবের অভাব ছিল না। কখন শত্রুভাবে, কখন বা মিত্রভাবে এই সকল স্থানের সহিত গৌড়ীয়-সাম্রাজ্যের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল।

এখন যে সকল ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পাঠানকীর্ত্তি। নানা গ্রন্থে তাহার বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহার অভ্যন্তরে যে সকল হিন্দুবৌদ্ধকীর্ত্তি প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান আছে, তাহার কথা কোন গ্রন্থেই বিশেষভাবে আলোচিত হয় নাই। *

অধিকাংশ গ্রন্থ ভ্রমণকারীদিগের লেখনীপ্রসূত। কোন কোন গ্রন্থ চিত্রসমন্বিত,—চিত্তাকর্ষক—কবিত্বময়—দৃশ্যমান ধ্বংসাবশেষের রচনাপারিপাট্যের বাহ্য বিবরণে আদ্যন্ত অলঙ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। এই সকল গ্রন্থ † পুরাতন হইয়া উঠিতেছে;—কোন কোন গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে।

বাঙালী গৌড়কাহিনীসঙ্কলনে যথাযোগ্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে হস্তক্ষেপ করে নাই। ‡ হিন্দু ইহাতে একেবারে হস্তক্ষেপ করে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহাতেই প্রচলিতপুস্তকে কেবল এক সময়ের কথা;—তাহার সকল কথাই পাঠানশাসনের শেষ সময়ের কথা।

এতকালের পর সকল কথার আলোচনা করিবার উপায় নাই। যাহা গৌড়ের ইতিহাস বলিয়া প্রচলিত আছে, তাহার সকল কথাও ইতিহাসের কথা বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। তথ্যানুসন্ধাননিপুণ আধুনিক সুপণ্ডিতবর্গ মুদ্রা ও পুরাতনলিপির আলোচনায় নিযুক্ত হইয়া, লিখিত ইতিহাসের সহিত প্রকৃত ব্যাপারের নানা অনৈক্য আবিষ্কৃত করিয়া, লিখিত ইতিহাসের মোহজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছেন! এখন ইতিহাস লিখিতে হইলে, স্বাধীনভাবে তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

ভ্রমণকারীদিগের গ্রন্থের মধ্যে হিয়ঙ্-থ্‌সাঙ্গের গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া পরিচিত। তাহার গ্রন্থে গৌড়ের নাম নাই;—তাহার সকল কথাই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের কথা তখন গৌড় অপেক্ষা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নামই

* যাহা বাহির হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে পাঠানশিল্পই প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে। অভিনিবেশসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, তাহার অপরদিকে হিন্দু-বৌদ্ধ-শিল্পের পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহার নিদর্শন যে সকল প্রস্তরে দেদীপ্যমান, সেরূপ অনেক প্রস্তর মালদহের কাছারীবাড়ীর উত্তরপশ্চিম বুরুজের উপর এক দেশে পুঞ্জীকৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

† ক্রাইটন্, রাভেন্‌শা, লেথব্রিজ, কনিংহাম, ব্লকম্যান প্রভৃতির গ্রন্থ ও প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

‡ গোলাম হোসেন সলেমির "রিয়াজ-উস্-সলাতিন্" এবং ইলাহিবক্‌সের "খুরশেদ জাহানামা" নামক পারস্যভাষানিবদ্ধ ইতিহাসে অনেক গৌড়কাহিনী সন্নিবিষ্ট আছে; কিন্তু তাহার সকল কথা ইতিহাসের কথা নহে।

প্রবল ছিল বলিয়া বোধ হয়। হিয়ঙ্‌থসাঙ্গ তাহার যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও সংক্ষিপ্ত; অসম্পূর্ণ। তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন্‌ স্থানের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও নানা তর্কবিতর্ক মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

কবি কহ্লণের "রাজতরঙ্গিণী" সর্ব্বজন-সমাদৃত কাশ্মীরের ইতিহাস। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে গৌড়ের কথা,—পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের কথা,—সেকালের গৌড়ীয় সেনাদলের বাহুবিক্রমের কথা,—তাহাদিগের অলৌকিক স্বদেশপ্রেম ও আত্মবিসর্জ্জনের কথা,—নানাভাবে লিখিত আছে। রাজতরঙ্গিণীর এই সকল কথা এখন ঐতিহাসিক কথা বলিয়াই সুপরিচিত হইতেছে।

এখন আর সমগ্র বঙ্গদেশ গৌড়দেশ বলিয়া অভিহিত হয় না। অল্পকাল পূর্ব্বেও বঙ্গদেশ "গৌড়দেশ" এবং বঙ্গভাষা "গৌড়ীয় সাধুভাষা" নামে কথিত হইত। পুরাকালে কেবল রাজনগরকেই গৌড় বলিত না। রাজধানী নানা সময়ে নানা স্থানে সংস্থাপিত হইত; তদনুসারে তাহার নামও নানাভাবে পরিবর্ত্তিত হইত;—রাজ্য গৌড়রাজ্য নামেই কথিত হইত। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের কথাও সেইরূপ।

বাঙালীর বাঙালীনাম অধিক পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না। "গৌড়ীয়"নামই ভারতবিখ্যাত,—বাঙালী অনেকদিন পর্য্যন্ত সেই নামেই সুপরিচিত ছিল।* সুতরাং পুরাতন ইতিহাসে যাহা "গৌড়ীয়াদিগের" কথা, তাহা সেকালের বাঙালীর কথা বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে।

এক সময়ে গৌড় এবং তন্নিকটবর্ত্তী সকল স্থানই বাঙালীর কীর্ত্তিক্ষেত্র বলিয়া সুপরিচিত ছিল। বাঙালীর পুরাতন সাহিত্যেও তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেকালের বাঙালীর রাজা "গৌড়েশ্বর" নামে কথিত হইতেন এবং সেই উপাধিকেই গৌরবের উপাধি বলিয়া গ্রহণ করিতেন। সুতরাং সকল দিক্‌ দিয়াই গৌড়কাহিনীকে বঙ্গকাহিনী বলিয়া ব্যক্ত করিতে হয়। তাহা জয়পরাজয়ের বিচিত্র কাহিনী।

বক্তিয়ার খিলিজির আক্রমণসময়ে এদেশ মিথিলা, বরেন্দ্র, রাঢ়, বাগ্‌ড়ী এবং বঙ্গ নামক পঞ্চবিভাগে বিভক্ত ছিল। সে কথা মুসলমান-লিখিত ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। তাঁহারা তৎকালে এদেশে লক্ষ্মণাবতী, লক্ষৌর এবং বিক্রমপুর নামক তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রাজধানী দর্শন করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়সাম্রাজ্য এই সকল রাজধানীর অধীন ছিল।†

ইহার সহিত কখন কামরূপ, অঙ্গ এবং কলিঙ্গের কিয়দংশ সংযুক্ত হইত;—কখন তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত;—আবার কখন বা রাঢ়-বাগ্‌ড়ীর কিয়দংশ পর্য্যন্ত কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইত। কখন পার্ব্বত্যজাতি,—চীন-হূণ-কিরাতগণ,—গৌড়ীয়সাম্রাজ্যে আপতিত হইয়া গ্রামনগর বিধ্বস্ত করিত; গৌড়েশ্বরের বাহুবলে পুনরায় পার্ব্বত্যদেশে

* কবিবর মধুসূদন দত্ত সেদিনও বাঙালীকে "গৌড়জন" বলিয়া তাঁহার অমরকাব্যে উল্লিখিত করিয়া গিয়াছেন।

† মিন্‌হাজকৃত "তবকাৎ-ই-নাসেরী" দ্রষ্টব্য। মেজর রাভার্টিকৃত ইংরাজি অনুবাদ এক্ষণে এই পুরাতন পারস্যভাষানিবদ্ধ ইতিহাসকে সর্ব্বত্র সুপরিচিত করিয়া দিয়াছে।

প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইত। কখন গৌড়ীয়গণ কেবল গৌড়রাজ্যেই নিবিষ্ট হইয়া রহিত; কখন বা বঙ্গোপসাগর উত্তীর্ণ হইয়া, বিবিধ দ্বীপোপদ্বীপে বাণিজ্যবিস্তার করিত। সুতরাং গৌড়কাহিনী সর্ব্বাংশেই বিচিত্র কাহিনী;—অসংখ্য আখ্যায়িকার আধার।*

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

বৃক্ষের আকারবিধান।

এদেশে (America) বাগানে ফলের গাছ লাগাইবার পর হইতে, দু'তিনবৎসর তার উপর কিপ্রকার তদ্বির করা হয়, তাহাই আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

দোকান হইতে দু'তিনবৎসর বয়সের একটা কলম আনিয়া, এদেশের ভাল মালীরা প্রথমেই গাছটির মাথা কাটিয়া দেয়। অনেক-সময় একটি ছোট কাঠি ছাড়া গাছের আর কোন চিহ্নই থাকে না। কেন এপ্রকার করে, তাহা বুঝা শক্ত নয়। চারাটা পূর্ব্বে যেখানে ছিল, সেখান হইতে উঠাইতে হয়। উঠাইয়া আনিতে যতই সাবধান হওয়া যাউক না কেন, গাছের অনেক শিকড়ই আগেকার মাটিতে থাকিয়া যায়, কিন্তু তাহার উপরাংশ ডালপালাপাতা যে-রকম ছিল, ঠিক্ সেই-রকমই থাকে, একটুও কমে না। যখন সেই চারা বাগানের জমিতে লাগানো হইল, তখন তাহার উপরে ফলাও-রকমের ডাল-পালা রহিয়াছে, কিন্তু নীচের শিকড় একটু-খানি। সেই ছোট শিকড় দিয়া উপরের অত বড়-বড় ডালপালার খাবার জোগানো বড় শক্ত ব্যাপার। যখন সকল শিকড়ই ছিল, তখন তাহারা সকলে মিলিয়া ডালপালার জন্য প্রচুর খাবার সংগ্রহ করিতে পারিত; এবং ডালপালা যেমন বাড়িতেছিল, শিকড়ও সেই অনুসারে বাড়িয়া উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করিত। কিন্তু এখন শিকড় ছোট হইয়া গেছে, অর্থাৎ সেই পরিমাণে খাবারসংগ্রহের উপায় বন্ধ হইয়া গেছে, সুতরাং এ অবস্থায় ডালপালা না বাড়িয়া খাদ্যাভাবে শুকাইয়া যাইবার কথা। ফলে তাহাই দেখা যায়,—বড়-বড়-ডালপালা-সমেত গাছ পুঁতিলে, গাছটাকে বাঁচানো প্রায়ই কঠিন হইয়া পড়ে।

কেবল শিকড় ছিঁড়িয়া যাওয়াতেই চারা-গাছ মারা যায় না, খুব সাবধানে গাছ উঠাইয়া

---

* ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলিত হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, এই সকল পুরাকাহিনী সঙ্কলিত হইতে পারে। ইহার জন্য সম্প্রতি নানা চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মালদহপ্রবাসী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় দীর্ঘকালের অধ্যবসায়ে নানা তথ্য সঙ্কলিত করিয়াছেন; স্থানে স্থানে পুরাতন মুদ্রাদি সঙ্কলিত হইয়া সুরক্ষিত হইতেছে; এবং লেখকের মালদহের সহিত দীর্ঘকালের পরিচয়ে যে সকল পুরাকাহিনী সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা অপ্রচুর হইলেও, "গৌড়কাহিনী" নামে লিখিত হইতেছে।

স্থানান্তরে পুঁতিলেও, তাহার উপরকার ডাল-পালা কাটিয়া দেওয়া আবশ্যক। কারণ, নূতন মাটিতে বসাইবামাত্র শিকড়গুলা সেই মাটি হইতে পূর্ণমাত্রায় খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে না,—নূতন মাটির সহিত সম্বন্ধস্থাপন করিতে তাহার কিছুদিন সময় লাগে। কোন নূতন স্থানে গেলে গুছাইয়া বসিতে আমাদের যেমন দু'চারদিন কাটিয়া যায়, ইহাদেরও ঠিক্ সেইপ্রকার গুছাইয়া লইতে একটু সময় লাগে। সুতরাং এই গুছাইয়া লইবার সময়ে শিকড়গুলার নিকট হইতে খাদ্যের আশা করা বৃথা, কাজেই সম্পূর্ণ-শিকড়-সমেত গাছ বাগানে বসাইলেও, তাহার ডালপালা ছাঁটিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহা না করিলে সেগুলাকে বাঁচাইয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়িবে, এবং প্রচুর খাদ্যের অভাবে মূলগাছটাকেও মৃত্যুর পথে টানিয়া আনা হইবে।

এদেশের লোক গাছ অতি সাবধানে ছাঁটিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক নিয়ম আছে। আমরা এখানে তাহার মধ্যে কয়েকটিমাত্রের আলোচনা করিব। প্রথমত কোন ডাল কাটিতে হইলে, গাছের কোন-একটা অঙ্কুরের (চোখের) নিকটে কাটিতে হয়। ১ম চিত্রের মত একটা ডাল কাটিতে হইলে "ক"এর নিকটে কাটা উচিত। দুইটা অঙ্কুরের মাঝামাঝি কাটিলে, কাটা-স্থানের ক্ষতটা শুকাইতে অনেক সময় লাগে। কিন্তু চোখের নিকটে (অর্থাৎ "ক"এর মত) কাটিলে

১ম চিত্র।

কাটার দাগটা দুইএক বৎসরের মধ্যে এমন মিলাইয়া যায় যে, তাহার আর কোন চিহ্নই থাকে না। দ্বিতীয় চিত্রের "ক" "খ" "গ" "ঘ" ছবিগুলি হইতে, দুইটা অঙ্কুরের মধ্যে কাটিলে কি দোষ হয়, বুঝা যাইবে। একটা ডাল "ক"এর মত কাটিলে, এক-বৎসর পরে "গ"-এর মত হইবে। কিন্তু "খ"এর মত কাটিলে "ঘ"এর মত হইবে। এই দুইটার মধ্যে কোন্‌টি ভাল, বুঝা শক্ত নয়। বড় গাছের ডাল কাটিতে হইলে ৩য় চিত্রের "ছ"এর মত কাটা উচিত। "চ"এর মত কাটা কোনোক্রমে ভাল নয়। "ছ"এর মত কাটিলে কাটা-স্থান কিপ্রকার ভাল হইতে আরম্ভ করে, "জ" দেখিলেই বুঝা যাইবে।

২য় চিত্র।

ছোট ডাল কাটিতে হইলে গাছকাটা কাঁচি কিংবা ভাল ছুরি ব্যবহার করা ভাল, বড় ডাল কাটিতে করাৎ ব্যবহার করা উচিত। কোন খোঁজখাজ্ না রাখিয়া কাটাই ভাল, এবং কাটার উপর মোম্ বা শাদা-রঙ্ মাখাইবার রীতি আছে, নিতান্ত ছোট-রকমের কাটা হইলে অবশ্য এ সকল আবশ্যক হয় না।

এই ত গেল কাটার কথা। এখন দেখা যাউক, কোন্ ডালগুলা কাটা উচিত। কারণ,

প্রথম ডাল কাটার উপর গাছের ভবিষ্যৎ আকারপ্রকার নির্ভর করে। এজন্য ডাল অতি সাবধানে হিসাব করিয়া কাটিতে হয়।

৩য় চিত্র।

ডালকাটার প্রধানত দুইপ্রকার প্রণালী আছে। প্রথমটা উঁচু মাথাওয়ালা গাছ এবং দ্বিতীয়টা বেঁটে গাছ প্রস্তুতের জন্য। গাছের মাথা বলিতে, যেখান হইতে বড়-বড় ডালগুলা বাহির হয়, তাহাই বুঝানো আমার উদ্দেশ্য।
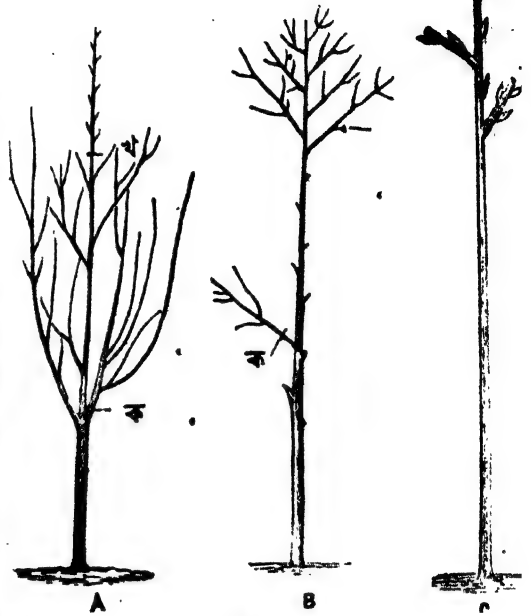
৪র্থ চিত্র।

চতুর্থ চিত্রের "ক"এর উপরদিকের সকল অংশ গাছের মাথা। এদেশের যে সকল স্থানে (যেমন New Yorkএর দিকে) শীতবৃষ্টি খুব অধিক হয়, সেখানে সকলে গাছের মাথা উঁচু করাইতে চেষ্টা করে। যেখানকার মাটি খুব শুষ্ক, বেশী বৃষ্টি নাই, সে সকল স্থানে (যেমন California, Colorado অঞ্চলে) গাছের মাথা নীচু ও উপরটা ঝোপের মত করে। আমাদের দেশেও, বিশেষ বীরভূম-অঞ্চলে গাছের মাথা নীচু করানো ভাল।

উঁচু মাথা করাইবার প্রণালী।—উঁচু মাথার জন্য গাছ যত বড় পাওয়া যায়, ততই ভাল। ছয়সাতফিট্ উঁচু গাছই খুব ভাল। মনে কর, ৪র্থ চিত্রের "A" যেন একটা তিন-

বৎসরের চারা। এই চারাটি "খ" পর্য্যন্ত দুই বৎসরে বাড়িয়াছে। "খ"এর উপরটুকু এই বৎসরে হয়েছে। এখনো উহা হইতে ডালপালা গজায় নাই, অঙ্কুর ধরিয়াছে মাত্র। ভাঙাচুরো শিকড় কাটিয়া-ফেলিয়া চারাটিকে মাটিতে বসাইবার পর, "খ" পর্য্যন্ত যা-কিছু ডালপালা আছে, একেবারে নির্ম্মমভাবে গোড়া ঘেঁষে কাটিয়া ফেলা উচিত। এই অবস্থায় গাছের চেহারা কতকটা ৪র্থ চিত্রের "B"এর মত হইবে। নীচের ডালগুলা কাটার জন্য পরের বৎসরে উপরের অঙ্কুরগুলা হইতে খুব তেজালো অনেকগুলি ডাল ("B"এর ফুটকির মত) বাহির হইবে। এই সকল নূতন ডাল হইতে তিনচারিটি জোরালো শাখা বাছিয়া-লইয়া অন্যগুলাকে কাটিয়া দেওয়া উচিত। "ক"এর মত কোন ডাল যদি বাহির হয়, তাহাকেও কাটিবে, এবং যে কয়েকটি ডাল রাখা হইল, তাহাদের আগাগুলাও ছাঁটিয়া দিবে। তখন গাছটিকে ৪র্থ চিত্রের "C"এর মত দেখিতে হইবে। ঐ নির্ব্বাচিত ৩।৪টা ডালই ভবিষ্যতে গাছের প্রধান-ডাল
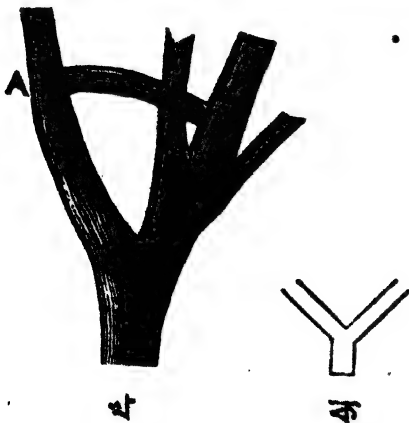
৫ম চিত্র।

(Scaffold limbs) হইবে। কেবল দুইটি ডাল যেন গুঁড়ির একস্থান হইতে না উঠে। উঠিলে গাছ বড় হইলে, তাহার আকার ৫ম চিত্রের "ক"এর মত হইবে।

ইহাতে গাছ বড় কম জোরালো হয়, ঝড়ের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করা তখন তাহার দায় হইয়া উঠে। যদি কোন গাছের এক অংশ হইতে ঐপ্রকার দুই ডাল বাহির হয়, তাহার প্রতিবিধান আছে। ঐ দুইটা ডাল হইতে বহির্গত দুটা সরু ও লম্বা ডাল লইয়া জড়াইয়া দাও, কয়েকবৎসর পরে দেখিবে, সে দুইটা মিলিয়া-গিয়া একটা মোটা লাঠির মত হইয়া পড়িয়াছে। ৫ম চিত্রের "খ"এর "A"অংশটা দেখিলেই, আমার কথা বেশ বুঝা যাইবে।

এখন আবার সেই নির্ব্বাচিত ডাল-কয়েকটার কথা বলা যাউক। তৃতীয় বৎসরে ঐ প্রধান কয়েকটি ডাল ঠিক্ রাখিয়া, ছোট-খাটো সকল নূতন ডালই ছাঁটিয়া দেওয়া উচিত। তিনবৎসর এইপ্রকার কাটাকুটি করিলে দেখিবে, সেই চারাগাছটি একটি চমৎকার সোজা উঁচুগাছ হইয়া উঠিতেছে। ডালকাটার জন্য গাছের কোন অনিষ্ট হয়, এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। যত ডাল কাটা হইবে, তাহার দ্বিগুণ নূতন ডাল বাহির হইবে। এ দেশে প্রতি বৎসরেই সকল গাছের কিছু-না-কিছু ডাল কাটিয়া দেওয়া হয়।

নীচু-মাথার গাছ প্রস্তুতের প্রণালীটা কি, এখন দেখা যাউক। এজন্য যত ছোট গাছ পাওয়া যায়, ততই ভাল। ৬ষ্ঠ চিত্রের "ক"-গাছটা যেন একবছরের একটি চারা। দুই-

একটা ডাল একটু বাহির হইয়াছে মাত্র, অপর ডালগুলা অঙ্কুর-অবস্থায় আছে। এই গাছটার
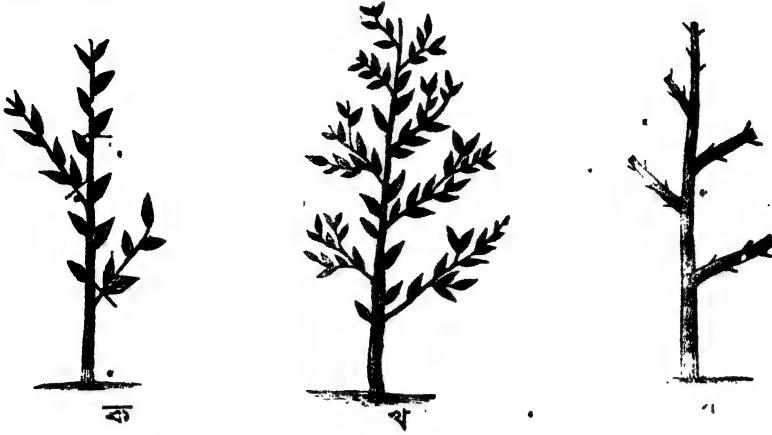
৬ষ্ঠ চিত্র।

যতটা উঁচুতে মাথা রাখিতে চাও, ঠিক্ সেই স্থানে কাটিয়া ফেল। যদি দেড়হাত উঁচুতে মাথা রাখিতে চাও, তবে উহার কিছু উঁচুতে গাছটার মাথা কাটিয়া দেওয়া উচিত ও নীচে কোন ডাল থাকিলে তাহাও কাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কাটার পর সেই বৎসরেই গাছের নানা অঙ্গ হইতে অঙ্কুর বাহির হইবে, এবং গাছটিকে ৬ষ্ঠ চিত্রের "খ" এর মত দেখাইবে।

দ্বিতীয় বৎসরে ঐ গাছের ডাল দুইপ্রকারে কাটা যাইতে পারে,—আসল ডালটা রাখিয়া বা কাটিয়া-ফেলিয়া। আসল ডালটা রাখিলে সপ্তম চিত্রের "ক"এর মত গাছ হইবে, এবং

৭ম চিত্র।

কাটিয়া ফেলিলে ঐ চিত্রের "খ"এর মত হইবে। যতগুলি ডাল বাহির হয়, তাহার মধ্যে চারিপাঁচটা রাখিয়া অন্যগুলি কাটিয়া ফেলা উচিত এবং যেগুলা রাখা যায়, তাহাদেরও অগ্রভাগ ছাঁটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই কাটাকুটির পর গাছটাকে ষষ্ঠ চিত্রের "গ"এর মত দেখিতে হইবে।

তৃতীয় বৎসরে অধিক ডাল কাটিবার প্রয়োজন নাই। প্রধান ডালগুলিকে ঠিক্ রাখিয়া আশেপাশের ডালগুলাকে ছাঁটিয়া দিলেই চলিবে। গাছের প্রথম ডাল-কাটা চারা বসাইবার পরই হয়। তার পরের যা-কিছু কাটাকুটি এদেশে শীতের সময়ে করে। আমাদের দেশে শীতের শেষে অর্থাৎ পাতা পড়িবার কিছু-দিন অগ্রে কাটাকুটি করাই বোধ হয় ভাল।

এই ত গেল গাছকাটার দুইটি প্রধান প্রণালী। ইহারই ভিতর আবার কতরকমের যে ছোটখাটো হেরফের হয়, তাহা বলিতে আরম্ভ করিলে আর প্রবন্ধ শেষ হইবে না। ইহা হইতে পাঠক বেশ বুঝিবেন, এদেশবাসীরা গাছকে কিরকম নিজেদের ইচ্ছামত বাড়িয়ে তোলে। যেপ্রকার গাছই হউক না কেন, ইহারা তাহাকে কাটিয়া-কুটিয়া যে-রকমটি দরকার এবং যে-রকম হইলে ভাল হয়, অবিকল সেইরকম করিয়া তুলে। গাছের এই সকল কাটাকুটি কেবল সৌন্দর্য্যের জন্য বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, ইহার সহিত ফলধরারও বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যাহাতে ভাল ফল প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়, কাটার লক্ষ্য সেইদিকেই থাকে। এমন কি, মালীরা ঐরকম কাটাকুটি করিয়া অনেকে গাছের এক-একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফল ধরায়, এবং আগে হইতেই বলিয়া দিতে পারে যে, গাছে ক'টা ফল হইবে।

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
College of Agriculture,
University of Illinois, U. S. America.

রাজতপস্বিনী।

[জীবনীপ্রসঙ্গ]

১৫

শ্যামসাগর নামে বৃহৎদীর্ঘিকার তিন দিকে—পূর্ব্বে, পশ্চিমে এবং উত্তরে—পুটিয়ার রাজাদের সৌধশ্রেণী। যতদিন লস্করপুরের জমিদারী পুটিয়ার ঠাকুরদের করায়ত্ত, প্রাচীন পরিখা ও এই সরোবর বোধ করি ততদিনের। তাহা না হইলেও শ্যামসাগর যে সুদীর্ঘকাল কোনরূপ সংস্কারের মুখ দেখে নাই, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার হরিতাভ সলিলরাশি

মনুষ্যের অব্যবহার্য্য—এবং স্থানীয় অস্বাস্থ্যকরতার একটা প্রধান কারণ। কয়টি রাজবাটীর মধ্যস্থলে এরূপ একটা জলাশয় অবাধে দীর্ঘকাল ধরিয়া ম্যালেরিয়ার বিষ উদ্গার করিতেছে; অথচ কখন তাহার প্রতিবিধান হয় না। ইহার একমাত্র অর্থ এই যে, শ্যামসাগর সাজার সম্পত্তি এবং সকল সরিকের হস্তীদের জলকেলির স্থান।*

মহারাণীর স্বামী রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ একবার এই দীর্ঘিকাটিকে ব্যবহারে লাগাইয়াছিলেন। নীলবিদ্রোহের সময় তিনি রাজশাহীতে একজন প্রধান নেতা ছিলেন, সে কথা প্রথমেই বলিয়াছি। নীলকুঠীসকল লুট করাইয়া বিস্তর নীল তিনি ইহাতে ডুবাইয়া দেন। সম্ভবত সেই অবধি ইহার জল এরূপ অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে।

দ্বিতীয়বার আমি যখন পুটিয়ায় যাই, চারি-আনির রাজবাটীর সীমানায়, শ্যামসাগরের অদূরে আমাদের বাসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সকল সরিকের হাতীগুলি মধ্যাহ্নের পর স্নানার্থ ক্রমে ক্রমে সেখানে নীত হইত, এবং পরে মাহুতদের শাসনমুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে জলক্রীড়া করিতেছে, দেখিতে সেই বাল্যকালে আমার ভারি ভাল লাগিত। পাঁচ-আনির (মহারাণীমাতার তরফের) দুইটিমাত্র হাতী ছিল—তাহার ভিতর দন্তীটি সুঠাম বিপুল কায়, রজতশুভ্র অসাধারণ দীর্ঘ দন্তযুগল এবং জীবহিংসাপ্রবণতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। চারি-আনির রাজা পরেশনারায়ণের তখন সাত-আটটি হস্তী ছিল—কিন্তু তাহার কোনটিই উহার তুল্য নহে। রাজা অত্যন্ত হস্তিপ্রিয় ছিলেন, কিছুদিনের ভিতর বিশহাজার টাকায় দুইটি প্রকাণ্ড দন্তী ময়মনসিংহের সুসঙ্গদুর্গাপুর হইতে আনাইয়া লইলেন। যেদিন তাহারা আসিয়া পৌঁছিল, সেদিন স্বয়ং কয়ক্রোশ প্রত্যুদ্গমন করিয়া রাজা তাহাদের লইয়া আসিলেন। তাঁহার আনন্দের সীমা ছিল না। ফলত সেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উন্নতদেহ, সর্ব্বাংশে প্রায় তুল্যযুগ্ম করীর সম্মিলন কদাচিৎ ঘটে। হস্তিপকদের কৌশলে পথ চলিবার সময় উভয়ে এরূপ মহিমাময় নির্ব্বিকারভাবে মস্তকোত্তোলন করিয়া মন্দগতিতে অগ্রসর হইত যে, দর্শকবৃন্দ তাহাতে মুগ্ধ হইত। পাঁচ-আনির কুঞ্জরটির পসার ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইল। স্বয়ং করিবর সেটা অনুভব করিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু দুই সরিকের নিম্নশ্রেণীর আশ্রিতবর্গ এই ব্যাপার লইয়া একটা কলহ বাধাইয়া বসিল।

একদিন দুইপ্রহরে কাছারী বরখাস্ত করিয়া রাজবাটীর কর্ম্মচারীরা বাসায় গেলে পর শ্যামসাগরের জলরাশিতে একটা তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে কৌতূহলী দর্শকবৃন্দে দীঘির ধার পূর্ণ হইল। আমি কিছু পূর্ব্ব হইতে দেখিতেছিলাম, পাঁচ-আনির ঐরাবতটি জলে একাকী পড়িয়া আপন মনে অবগাহনসুখ সম্ভোগ করিতেছেন। একটু পরে চারি-আনির নূতন দুই গজরাজ মাহুতবাহিত হইয়া তাহার ঠিক সম্মুখে স্নানে নামিলেন। দেখিতে দেখিতে পাঁচ-আনির মাহুতদের সঙ্গে নবাগত মাহুতদুটার কণ্ঠপরীক্ষা হইয়া গেল এবং তখন হাতীতে হাতীতে যুদ্ধ বাধিল। খানিকক্ষণ যোঝাযুঝির পর পাঁচ-আনির হাতীর হার

হইল এবং সে শুণ্ড ও পুচ্ছ উচ্চ করিয়া জলাশয় ছাড়িয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিল। এই অসম দ্বন্দ্বের জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না।—জলে পড়িয়া একাকী তীরে অর্দ্ধদণ্ডায়মান দুইটা মহাবলশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হওয়া সম্ভবও নহে। প্রধান কর্ম্মচারীদের আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই দুই সরিকের সড়কী-ওয়ালারা তখন সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল। হৈহৈ ব্যাপার,—খুনোখুনী অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে চারি-আনির দেওয়ানজী কোনরূপে আহ্নিক শেষ করিয়া তাঁহার অদূরবর্ত্তী বাসা হইতে ঘটনাস্থলে দেখা দিলেন। লাঠালাঠি-মারামারি আর হইতে পাইল না।

ভৃত্যদের বিবাদ এইরূপ অল্পে-স্বল্পে মিটিয়া গেল, কিন্তু হস্তীদের জয়পরাজয় দুই সরিকের প্রভুরা আপনার বলিয়া গ্রহণ করিলেন। সে মনোমালিন্য কতদিন ছিল, ঠিক্ বলিতে পারি না। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে স্বয়ং মহারাণীমাতা যেরূপ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, তাহা আমার মনে পড়িতেছে। আশ্রিত মূকজন্তুটাকে অকস্মাৎ সেভাবে আক্রমণ ও পীড়িত করিয়া তাঁহাকেই অবমানিত করা হইয়াছে, তাঁহাকে এরূপ অভিমান ২।৩দিন প্রকাশ করিতে শুনিয়াছিলাম। মাতার বয়ঃক্রম তখন বাইশ-তেইশ-বর্ষ মাত্র।

ফলত তিনি সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের একমাত্র সন্তান বলিয়া পিতামহী ও পিতার আদরে বাল্যকালে যেরূপ অভিমানিনী ছিলেন, সহজেই তাহা অনুমেয়। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন দ্বাদশবর্ষ, কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীসুন্দরী দেবী তখন জন্মগ্রহণ করেন। সেই অভিমানভাব পরিণতবয়সেও কখন-কখন প্রকাশ পাইত, কিন্তু সহজে নহে। তাঁহার কাশীবাসের কিছুদিন পূর্ব্বে কন্যাস্থানীয়া কোন আত্মীয়ার শরীর সর্ব্বদা অসুস্থ হইত। কিন্তু ঔষধাদিসেবন ও নিয়মপালনে তাঁহার রুচি ছিল না, জেদ করিলে হিতে বিপরীত হইত। একদিন মহারাণী কাহাকেও বলিতে-ছিলেন, তাহাকে ঔষধ খাওয়াও, কিন্তু রাগ করিলে যেন খাওয়ান না হয়। ইহাতে নিকটে উপবিষ্টা এক ঠাকুরাণী হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "রাগ কেন ?" মা দুঃখিত হইলেন, তাঁহার প্রফুল্ল-চক্ষু ছলছল হইল। একটু কম্পিতস্বরে বলিলেন, "এখন সকলেরই রাগের ভয় করিয়া চলিতে হয়। কত ভয়ে যে ভাত খাই, তার আর কি বলিব ? যখন ভয় করিতাম না, তখন কাহাকেও না। এখন সবাইকে ভয় করিয়া চলিতে হয়।" সাবালক হওয়ার পূর্ব্বে কুমার মহারাণীর অজ্ঞাতসারে এক উইল করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তাহার কতক-কতক মর্ম্ম মাতার গোচর হইল। তিনি ইহাতে মহা বিরক্ত হইলেন। সহায়কারীদের ভিতর কেহ বলিয়াছিলেন, শুনিতে পাই, জনরব উঠিয়াছে যে, মহারাণীর পিতার বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করিতেও আমাদের ইচ্ছা আছে। তাহা কি হইতে পারে ? আর সে বিষয়ই বা কি ? মা শুনিয়া বিরক্তির সহিত অথচ তাচ্ছীল্য-ভাবে সে লোকটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "তবু যে বিষয় আছে, তাহার মত দশটা সংসার তাহাতে প্রতিপালিত হইতে পারে।"

কতকগুলি স্বার্থপর কুটুম্ব, আত্মীয় এবং আশ্রিতলোকের ব্যবহারে ইদানীং মধ্যে

মধ্যে তিনি বড় মর্ম্মপীড়া পাইতেন, তাহার আভাস ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। তাঁহার জীবনের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা,—সংসারত্যাগ করিয়া ৺কাশীধামে নির্জ্জনে বাস, এইজন্য কুমারের বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই পূর্ণ করিতে তিনি স্থির-সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এই সময়ে একদিন কথা হইতেছিল যে, কুমারের ইচ্ছা, ছোটবাড়ী ও বড়বাড়ীতে এক করিয়া কতকগুলি ঘর বাড়ান। মা বলিলেন—"তা সত্য, নহিলে ঘরে কুলায় না।"—দেবী কাছে বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "ঘরের অভাবে মহারাণীর নিজের বড় কষ্ট হয়। বর্ষার রাত্রে জলের সময় সরবৎ একটু খাইতে হইলেও এদিক্ দিয়া ওদিক্ দিয়া ঘুরিয়া তবে নীচে যাইতে হয়। এত-বড় লোকটার ওরূপ দশা দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হয়।" মহারাণী বিষাদের হাসি হাসিলেন। পরে বলিলেন, "ঘরে আর কাজ নাই, এ বাড়ী ছাড়িতে পারিলেই আমি বাঁচি!" কাশীবাসকালে নূতন বাড়ী খরিদ হইলে স্বহস্তে তিনি কয়টি ঘর পরিমার্জ্জিত করিতে করিতে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন—"এতদিনে আমার নিজের বাড়ী হইয়াছে!"

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

মহাত্মা যিশুখ্রীষ্টের প্রতি।

জীবন কাটিয়া গেল; দেখা যায় মরণের তীর;
ওই হায় উপকূলে শোনা যায় জলধিগর্জ্জন!
আমার সম্বল মাত্র ভাঙা-বুক, নয়নের নীর!
এই পারাণির কড়ি, দয়া করি, নাবিক সুজন,
লও, লও! লোকে বলে, বিশ্বমাঝে তুমি অতুলন,
দয়াময়, স্নেহময়, প্রেমময় কাণ্ডারী সুধীর!
হে যিশু! কাঁদিছে প্রাণ; দলে দলে গভীর তিমির
ঘনাইল! এল বুঝি কালরাত্রি! ফুরায় জীবন!
হে নির্লোভ! হে নিষ্পাপ! তুমি চাও খাঁটি অশ্রুবারি
পরিতপ্ত হৃদয়ের, নাহি চাও ধনীর কাঞ্চন;
তাই হোক্; শুভক্ষণে, বেলাভূমে, দোহাই তোমারি,
চরণরাজীবে আজি অশ্রুজল করিনু অর্পণ!
বাহ তরী, বাহ তরী; উজলিয়া নদীর মোহানা,
ফুটিছে চাঁদের আলো! পারে চল, গাহিয়ে সাহানা!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

রেখাক্ষর বর্ণমালা।

সরু-মোটা-সাধন।

যে রেখা উপর হ'তে টানা হয় নীচে,
মোটা'লেই মোটা হয় ＼＼ বিনা খিরকীচে॥

নীচে হ'তে উপরে টানিতে হ'লে রেখা,
সহজে না যায় তাহা // মোটা করি লেখা॥

চেষ্টার অসাধ্য নাই, জানো তা অবশ্য।
পড়িতে ডরাও যদি, চড়িও না অশ্ব॥
দোয়াত হইতে ল'য়ে কালি এক-পোঁচ,
ঈষৎ করিয়া আড় কলমের মোচ,
কসিয়া টানিয়া তাহা কাগচের গায়ে,
উর্দ্ধমুখী মোটা রেখা তুলিবে ফুটা'য়ে॥
কিন্তু লেখনী এখন কানে থা'ক্ গোঁজা।
কলমে যা সুকঠিন, পেন্সিলে তা সোজা॥
মতি যা'র অতি সূক্ষ্ম বড় সে অভাগা।
মাঝারি সূক্ষ্মই ভাল পেন্সিলের আগা॥
রেখারা হইবে তবে আজ্ঞার অধীন।
চাপ্ দিলে মোটা হবে, ঢিল্ দিলে ক্ষীণ॥

বড়-মেজো-সেজো-ছোটোদের ভেদচিহ্ন।

বড়'রা বিশুদ্ধ রেখা, হাতে নাই নখ।
মেজোদের বাঁকা নখ অতি ভয়ানক॥

বড়-মেজো আবাদেবী রোগা ডিগ্‌ডিগে। মনে হয়, শুধু হাড়, হেরিলে তা'দিগে॥	❘ ক ᑭ চ ᥀ খ ᑭ ছ
হাড়ে গজাইলে মাস (হায় রে অদৃষ্ট!) বড়-মেজো কেঁচে হয়, তৃতীয় কনিষ্ঠ॥	❙ গ ᑭ জ ᥀ ঘ ᑭ ঝ

বড়-সেজো শুদ্ধ রেখা ... .. ক গ চ জ

বড়-মেজো ক্ষীণ। ...... ক খ চ ছ

মেজো-ছোটো নোখো রেখা.. খ ঘ ছ ঝ

সেজো-ছোটো পীন।... গ ঘ জ ঝ

আদ্যরেখা।

শব্দের আদিতে যারা বসিবার পাত্র,
"আদ্য" তা' সবার নাম ; কথা এইমাত্র ॥

আদ্যমুখী নিম্নমুখী... কত শত পথ

আদ্য র-স অসি।... রথ ষত হত

আদ্য ত-প শেলবাণ... তল ফল বল

আদ্য ন-ট শশী ॥...... নত ঠক মদ

আদ্যের শ্রেণীবন্ধন।

বীরমদে মাতি উঠি শুনি রণবাদ্য,
সবাই হ'য়েছে জড়ো, যত আছে আদ্য ॥
কে শুদ্ধ, কে নোখো, কে কাণা, কে চোখো,
কে রোগা, কে মোটা মোষ।
আছে তো নেত্র—দেখ' না ক্ষেত্র !
আলসেমি বড় দোষ ॥

শ্রেণীবদ্ধ আদ্য রেখাক্ষর										
		অবক্র রেখাক্ষর				বক্র রেখাক্ষর				
		কচ-বর্গ		তপ-বর্গ		নট-বর্গ		রস-বর্গ		
		অন্ধ	চোকো	অন্ধ	চোকো	অন্ধ	চোকো	অন্ধ	চোকো	
সরু	শুদ্ধ	ক	চ	ত	প	ন	ট	র	স	ইতি বড়'র
	নোখো	খ	ছ	থ	ফ	ণ	ঠ	ল	ষ	ইতি মেজো'র
মোটা	শুদ্ধ	গ	জ	দ	ব	ম	ড	য	শ	ইতি সেজো'র
	নোখো	ঘ	ঝ	ধ	ভ	ঙ	ঢ	হ	ক্ষ	ইতি ছোটো'র

দল-সংগ্রহ।

যাড়িতে দিব না আর কলহ-কাজিয়া।
যেথা'র দল-কে-দল দাঁড়া'ক্ সাজিয়া॥

মুখীর দল।

ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ত থ দ ধ প ফ ব ভ র ঋ ল ৯ য য় হ ং স স ষ ষ শ শ ক্ষ

শায়ীর দল।

উর্দ্ধশায়ী

ক খ গ ঙ ছ জ ঝ ন ণ ম ঙ ট ঠ ড ঢ

নিম্নশায়ী

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কুমারসম্ভব।

রতিবিলাপ।

মূরছি' পড়িয়া মনসিজপ্রিয়া রতি
ছিলা এতখন হতবিচেতন হোথা—
জাগে বিধিবশে ভুগিবারে ও-সে অতি
নববিধবার অসহ্য-ভার ব্যথা! (১)

মোহ-অবসান; উঠে দুনয়ান ফুটি—
অবহিতমনে প্রিয়-দরশনে হানে;
যারে হেরি' চির-অতৃপ্ত আঁখিদুটি,
তার দেখা ফিরে পাবে না, তা কি সে জানে!
(২)

"অয়ি প্রাণনাথ! রয়েছ কি-প্রাণ ধরি'?"—
বলি' উঠি' বালা নিরখিলা পুরোভাগে
ক্ষিতিতলে এক পুরুষ-আকৃতি পড়ি'
হর-কোপানল-ভস্ম কেবল জাগে! (৩)

অতনু-প্রেয়সী আবার বিষাদাকুল—
বসুধায় লুটি' ধূসরিল দুটি স্তন,
বিলপিছে বালা এলায়ে' চাঁচর চুল,
সমদুখে যেন দুঃখিত করি' বন! (৪)

"তব কলেবর রূপের আকর মানি'
বিলাসিজনের আদর্শ নিশিদিন—
এ-দশা-গ্রস্ত নিরখি' ও তনুখানি
এখনো না মরি, দেখ নারী কি কঠিন! (৫)

"চলিলে কোথায় ফেলিয়া এ অধীনীরে,
ক্ষণিকে ভাঙিয়া স্নেহভালবাসা হেন—
জলরাশি বলী পরিহরি' নলিনীরে
পলাইল ছুটি' সেতু-বাঁধ টুটি' যেন! (৬)

"হে প্রিয় ! কর নি অপ্রিয় মোর কভু,
আমিও কিছুই করি নি ত প্রতিকূল—
কেন অকারণ দরশন তবু নাহি
দিতেছ রতিরে, কাঁদিছে সে সমাকুল ! (৭)

"মনে কি পড়েছে—ডাকিলে নামটি ভুলে',
বাঁধিতাম তোমা কনক-মেখলা-ডোরে,
মারিতাম ছুঁড়ি' কমল-দুলটি খুলে'
আঁখি-দুটি ঝরা-পরাগে যাইত ভরে' ! (৮)

"'হৃদে আছ সদা'—মম প্রিয় কথা হেন
বলিতে তুমি যে, বুঝিনু সে মিছে অতি !
চাটুবাণী হবে না যদি সে, তবে কেন
তব তনু হতা, আমি অক্ষতা রতি ? (৯)

"পরলোকে নব-পরবাসী তুমি কাম—
আমিও এখনি ধরিব শরণি তব !
সারাটি ভুবন বঞ্চিলা বিধি বাম—
তোমার বিহনে বাঁচিবে কেমনে ভব ? (১০)

"রজনী-তিমির-গুণ্ঠিত পুর-পথে
ঘন-গরজন-শঙ্কিতা প্রেমিকারে
প্রিয়-নিকেতনে আপন ভবন হ'তে
তোমা বিনে প্রিয় ! কে আর লইতে পারে ?
(১১)

"অরুণ নয়ন ঘূর্ণিত অনুখন,
স্খলিত বচন পদে পদে প্রমদার—
তুমি হেথা নাই ! তাই আজি হে মদন,
বারুণীমদিরা কি বিড়ম্বনা তার ! (১২)

"আছে তব দেহ শবদে মাত্র বেঁচে,
জানি' তাহা, তব প্রিয়বান্ধব শশী
অসিতপক্ষ গেলেও বিফলে সে যে
উদিবে গগনে কোনমতে নিশ্বসি' ! (১৩)

"হরিত-অরুণ-তরুণ-বৃন্ত-ভরে,
কুহু-কলকল কোকিল-কণ্ঠরবে
ফুটি' উঠি' আর বল না কাহার শরে
নব চূতফুল এবে পরিণত হবে ? (১৪)

"অলি-পাঁতি দিয়া শতবার যে আপনি
ফুলধনু-ছিলা বিরচিয়াছিলা বাঁধি'—
আজি সকরুণ করি' গুন্‌গুন্‌ধ্বনি
মোর শোকে তারা হতেছে যে সারা কাঁদি' !
(১৫)

"মনোমোহকর পুন কলেবর ধরি'
হে প্রিয় আমার, উঠি' আগেকার মত
রতিদূতিপদে লহ পিকবধূ বরি'
মধুরালাপে যে সুচতুরা স্বভাবত। (১৬)

"শির পাতি' নিতি যাচিতে পীরিতি মোর,—
কম্প্র শরীর বাঁধিতে নিবিড়তম ;
সেই তোমা সনে বিজনে মিলনে ভোর—
হে স্মর, স্মরিয়া শান্তি নাহি যে মম। (১৭)

"তোমারি রচিত হে রতিদয়িত, এ যে
অঙ্গে অঙ্গে মোর বসন্ত-ভব
কুসুমভূষণ রয়েছে এখনো সেজে'—
হে অতনু, কোথা সুচারু সে তনু তব ! (১৮)

"ক্রূর সুরগণ করিল স্মরণ যবে,
এ অঙ্গরাগ পুষ্পপরাগ মাখি'
সারা না করিতে গেলে যে ত্বরিতে ! তবে
এস রচ রাগ—বামপদভাগ বাকি ! (১৯)

"পতঙ্গসম বহ্নিতে মম দেহ
ঢালি' দিয়া তব কোলে পুন লব ঠাঁই—
স্বরগে চতুরা অমরবধূরা কেহ
তোমা ধনে চুপি' লয় পাছে লুকিয়াই ! (২০)

"মদনবিহনে ক্ষণেকমাত্র তবু
ছিল রতি জীয়ে' কলঙ্ক কি এ ঘোর
আর কোনমতে ঘুচিবে জগতে কভু,
যদিও রমণ! হই অনুগামী তোর? (২১)

"কেমনে করিব তব অন্তিম সাজ —
পরলোকে তুমি চলি' যাবে, সে কি জানি?
কিছু না কহিতে লুকালে চকিতে আজ—
প্রাণের সঙ্গে গেছে যে অঙ্গখানি! (২২)

"সেই পড়ে চিতে—সরল করিতে শর;
ক্রোড়দেশ-ভরা কুসুমিত শরাসন;
বসন্ত সনে আলাপনে তৎপর —
মুখে হাসি ছিল, অপাঙ্গে বিলোকন! (২৩)

"কোথা সে তোমার প্রিয়সখা ঋতুরাজ—
যে তব রচিত কুসুমযোজিত ধনু?
দারুণ পিনাকী রোষভরে নাকি আজ
সুহৃদের পথে পাঠাল তাহারো তনু!" (২৪)

শুনিয়া রতির এতেক অথির বাণী—
হৃদয়ে দিগ্ধ শর হেন বড় লাগে;
কাতরা রতিরে বাঁচাতে ভরসা দানি'
মধু আসি' দিলা দরশন পুরোভাগে। (২৫)

মাধবে নিরখি' কত না কাঁদিল বালা,
স্তন-সম্বাধ বক্ষে দু'হাত হানে—
স্বজন পাইলে দুখের শোকের জ্বালা
ছুটে শতধার, যেন খোলা দ্বার মানে। (২৬)

বিরহবিধুরা কহিলা মধুরে তবে—
"সুহৃদের তব নেহার' কি আছে আর!
গুঁড়ায় গুঁড়ায় অই যে উড়ায় নভে
পায়রার পারা হায় রে পাংশু ছার! (২৭)

"অয়ি, সম্প্রতি দেহ দরশন আসি'—
বসন্ত এ যে সমাকুল তোমা তরে!
দয়িতার দায় প্রেম কোথা যায় ভাসি'—
নাহি টলে সে ত সুহৃদ্‌জনের 'পরে! (২৮)

"ইনিই না তব রহিয়া পার্শ্বচর
সুরাসুর সহ আনেন বিশ্ব বশে!
মৃণাল-ছিলায় পেলব পুষ্পশর
যোজি' ধনু তবে কেমনে এ ভবে পশে? (২৯)

"গেছেই, গো মধু,—ফিরিছে না, বঁধু প্রাণে!
সে যে বাতাহত প্রদীপের মত সারা;
আমি দশাসম, চেয়ে দেখ মম পানে—
কি ঘোর দুঃখ ঘিরেছে ধূমের পারা! (৩০)

"বিধির করণে আধেক মরণে মরি—
বধিল মনোজে আমারে হেন যে ছেড়ে'!
দৃঢ় আশ্রয়-তরু উপাড়য় করী,
লতার তখন ধূলায় পতন যে রে! (৩১)

"তাই ত এখন করহ অনন্তরে—
বান্ধবজন মানে প্রয়োজন যাহা,
বিরহ-কাতরা, (চিতা জ্বালি' ত্বরা করে')
লহ গো রতিরে পতি-পদবীরে আহা! (৩২)

"শশী সহ মুদি' যায় কৌমুদী সতী,
মেঘের সহিত মিলায় তড়িৎলতা—
প্রমদা যতেক পতির পথের পথি',
চেতনা-বিহীনো প্রমাণে এ হেন কথা! (৩৩)

"ওই সুন্দর প্রিয়-কলেবর-ছাই
হরষে আপন উরসে লেপন করি',
নব কিশলয়ে যেন মানি' লয়ে' ঠাঁই
রাখিব এ তনু চিতাহুতাশন'পরি! (৩৪)

"কুসুমশয়ন করিতে রচন মোরা
কত না সহায় হ'তে মধু, হায় তুমি—
তবে মোর চিতা কর বিরচিতা ত্বরা,
যাচি করপুটে, ওগো শির লুটে ভূমি! (৩৫)

"তার পর মোরে চিতানল করে' দান,
দক্ষিণ-বায়ু বীজনি' ত্বরায় জ্বাল'—
জান ত হে মধু, তব প্রিয়বঁধু কাম
ক্ষণেক' না রহে রতির বিরহে ভাল! (৩৬)

"এতেক আচরি', দোঁহে দিয়ো করি' মনে
সলিলাঞ্জলি শুধু এক, বলি মধু!
বারি সে পরম পরলোকে মম সনে
এক সাথে পান করিবে সে প্রাণবঁধু। (৩৭)

"পরলোক-বিধি হে মধু! সাধিবি আর—
অতনুরে স্মরি' চূতমঞ্জরী দিয়ো,
কচি কিশলয়ো কিছু সাথে লয়ো' তার—
সখা যে তোমার বড় এ-সবার প্রিয়!" (৩৮)

দেহবিমোচনে হেন দিলা মনে সায়!
—রতিরে তখন আশাসে গগনবাণী;
সর-শোষাহতা শফরীরে যথা হায়
প্রথম বরষা বাঁচায় ভরসা আনি'। (৩৯)

"স্মর-বধূ অয়ি! দুরলভ দয়িতার
রবে না জানিয়ো চির তব প্রিয়তম!
শুন যে-কারণ হয়েছে মরণ তাঁর
হর-আঁখি-ভব অনলে শলভসম;— (৪০)

"যবে তব প্রিয় ক্ষোভে ইন্দ্রিয়চয়—
স্বীয় আত্মজা অভিলাষে প্রজাপতি;
ক্ষণে করি' তাঁর চিত্তবিকার জয়
শাপে অতনুর সেহেতু এ দুর্গতি!— (৪১)

" 'উমা-পরিণয় করি' যে সময়, হরে
(গিরিজার তপে প্রীত হ'য়ে সঁপে' হৃদি)
লভিবে হরষ নিভৃতে পরস্পরে,
নিজ কলেবরে যোজিবেন স্মরে বিধি!' (৪২)

"—যম উপযাচে, বিধি কন পাছে হেন
তোমার প্রাণেশ-অভিশাপশেষ-কথা।
অশনি, অমৃত, এ উভয়েরি ত জেন'
বশী, জলধর, জনয়িতা সর্ব্বথা! (৪৩)

"তাই সুশোভনে! ও তনু যতনে রেখ'
হবে এ শরীরে প্রিয়াগম ফিরে যদি!—
রবিতেজে ভারি শুকালেও বারি দেখ
নিদাঘের পরে পুন স্রোতে ভরে নদী!" (৪৪)

এরূপে তখন অলখে সে কোন্ দেবতা
করিল রতির বাসনা শিথিল মরণে!
মনোজসুহৃদো মানিয়া প্রকৃত সে কথা
অতনু-বধূর আশাসে মধুর বচনে! (৪৫)

রতিও এ বিপাক পরিপাক যতদিন
প্রতীখে প্রতি নিশা, অতি কৃশা জাগিয়া!
দিবসে বসি' একা শশিলেখা যথা ক্ষীণ—
কিরণ নাহি সাজ—রহে সাঁঝ লাগিয়া! (৪৬)

শ্রীবিহারিলাল গোস্বামী।

রাইবনীদুর্গ।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই অবধি রাধাচরণ অবসর পাইলেই ছুটিয়া মাতৃদর্শনে আসিতেন। রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া এবং কুমার পদাঙ্কনারায়ণের ঐহিক-কল্যাণকামনায় নারায়ণী দেবী মনে মনে যে সকল সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, পুত্রস্থানীয় সন্ন্যাসীর সঙ্গে মাঝে মাঝে তাহার আলোচনা হইত। তাঁহার স্নেহের "পদ" রাইবনীকে কেন্দ্র করিয়া অন্তত উৎকলে আবার হিন্দু স্বাধীনতা ও গৌরব জয়যুক্ত করিবে, শিবা-প্রসন্ন দাসের এই জাগরণস্বপ্ন বৃদ্ধার গোচরী-ভূত ছিল না। অথচ দাদামহাশয় তাহা সফল করিবার উদ্দেশে যে সকল আয়োজন এতদিন ধরিয়া করিয়া আসিয়াছেন, তাহার কতক-কতক তাঁহার জানাশোনা না ছিল, এমত নহে। গল্পে গল্পে মাতার মুখে সে পরিচয় পাইয়া রাধাচরণ যেন জীবনের অনির্দিষ্ট লক্ষ্যটিকে যথাস্থানে নিবেশিত দেখিলেন। স্থির করি-লেন, কোন একটা উপলক্ষ্যে দাসমহাশয়ের সাক্ষাৎলাভ করিয়া প্রকৃত তথ্য সবিস্তারে বুঝিয়া লইবেন।

দুইচারিবার সাক্ষাতের পর নারায়ণী দেবী অভয়ানন্দকে বলিলেন, "বাবা, তোমায় ইহলোকে আবার ফিরিয়া পাইব, সে আশা কনখকরি নাই। এক দিনের কথা মনে পড়ে। চৈত্রসংক্রান্তির দিন সমস্তদিন কৃষ্ণ-প্রিয়ার সঙ্গে তোমার কথা কহিয়া তাহার কান্না থামাইয়াছি। রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম, গোবিন্দজী বালগোপালবেশে বলিতেছেন, 'ভয় কি? আবার তাকে পাইবি! ঐ দেখ, ভক্ত সন্ন্যাসী দণ্ডী দিতে দিতে আবার ঘরে ফিরিতেছে!' দেখিলাম, গেরুয়াবসন পরিয়া তুমি মস্ত একটা নদীর চর বুকে হাঁটিয়া পার হইলে। আমি কাঁদিয়া বলিলাম, 'এত কষ্ট কেন বাপ্?' তুমি হাসিয়া দূরে মহাদেবমূর্ত্তি দেখাইলে। স্বপ্নভঙ্গে মনে করিলাম, যদি কখন সুদিন হয়, তোমায় গাজনের সময় দণ্ডী দেওয়াইব।" রাধাচরণ কৈশোরে জলে-শ্বরের পথে অনেকবার সে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, মাতার নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন, আগামী চৈত্রসংক্রান্তির সময় তাঁহার আজ্ঞা অবশ্য পালন করিবেন।

সেই অঙ্গীকাররক্ষার জন্য রাধাচরণ বামনঘাটির জঙ্গলপথে রাইবনীগ্রামে আসিয়া-ছিলেন। দুর্গমধ্যে সেদিন তাঁহার পরিচিত কেহ ছিল না। মাতার নিমন্ত্রণে স্বয়ং রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে বনকুঞ্জে গিয়াছিলেন,—কুমার পদাঙ্কনারায়ণ তথা হইতে কি ভাবে দাসমহাশয়ের সহিত মিলিত হন, সে পরিচয় প্রথমেই দিয়াছি।

ইচ্ছা করিয়াই রাধাচরণ ইতিপূর্ব্বে এ পথে কখন আর আসেন নাই এবং শিবাপ্রসন্ন দাসের সঙ্গেও দেখা করেন নাই। তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাতের যে নিগূঢ় অভিপ্রায় দেবাদি-

দের মহাদেবের কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত ছিল, তাহার উপযুক্ত স্থান সেই সুবর্ণরেখার তপ্তমরুতুল্য দূরবিস্তৃত সৈকতভূমি। উপযুক্ত কাল,—সেই ভীষণ বন্যার প্রাথমিক অভিযান।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভাস্করপণ্ডিতের আশীর্ব্বচন লইয়া পদাঙ্ক-নারায়ণের উমাপুরে প্রত্যাগমনের অবসরে দাসগৃহিণী স্বামীর অনুসরণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। শিবাপ্রসন্ন অন্যান্যবার আকস্মিক বিপদ্‌কে আলিঙ্গন করিয়া যখন তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তখনই হাসিতে হাসিতে গৃহে ফিরিয়া হৃদয়ভাগিনীকে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। অতএব সৌদামিনী দেবীকে আর কখন এরূপ উৎকণ্ঠায় পড়িতে হয় নাই। মহারাষ্ট্রসেনাপতিকে নিমন্ত্রণ করিবার সময় তিনি যে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "ভগবানের কৃপায় পতি আমার নিরাপদে ফিরিবেন, কিন্তু সেজন্য অতিথি বিমুখ হইলে চলিবে না,"—বিশ্বাসবতী ভক্তিমতী স্বাধ্বীর সে উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য এবং আন্তরিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্নেহপ্রেম চিরদিন অমঙ্গল-আশঙ্কায় সজাগ—পুষ্পিত তরুর কণ্টকাকীর্ণতার মত তাহার একটা সম্পূর্ণ সার্থকতা আছে। কুমার ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, দুইখানি শিবিকা প্রস্তুত। তাঁহাকেও রাজঘাট-অঞ্চলে যাইতে হইবে।

অন্দরে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, গৃহকর্ত্রী তাঁহার অপেক্ষা না করিয়াই সেই বিপুল আহার্য্যের রাশি গ্রামের ঘরে ঘরে বিলাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। কুমারকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"এই ত মুরদ, কলারের জন্য পেটুক বামুনগুলোকেও ধরে' আন্‌তে পার্‌লি নে! সেটা আমি আন্দাজেই বুঝিয়াছি, কিন্তু গ্রামের লোকদের ডাকিয়া খাওয়ানর সময় আর নাই!" পদ তখন পণ্ডিতজীর আশীর্ব্বাদ ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে ঠাকুরাণীদিদির গোচর করিল। শুনিয়া একটু লজ্জিত হইয়া তিনি বলিলেন, "ভাই, ভাবিয়া দেখিলাম, আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য হয় না। অন্য সময় হইলে ভাবিবার তত কারণ ছিল না, কিন্তু লড়াইয়ের হাঙ্গামার দিনে তাঁকে একটু সাবধানে রাখাই ভাল। আমার সন্দেহ হচ্চে, যে ভক্তকে তিনি উদ্ধারের জন্য গিয়াছেন, সে কোন ছদ্মবেশী চর!"

কুমার এই আশঙ্কার কোন কারণ দেখিতেছিলেন না। উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "স্ত্রী-বুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী! ঠাকুরাণীদিদি তুমি বাঘের যোগ্য বাঘিনী বট, কিন্তু সব সময়ে নও। আমার ঠাকুরদাদাকে চর দিয়ে বিপথে নিয়ে যেতে পারে, দুনিয়ায় এমন কাহাকেও আমি দেখি নে। তবে তোমার যখন মন হয়েচে, চল, একবার রাজঘাট ঘুরে আসি। রাত্রিবাস আজ দেখ্‌চি বনকুঞ্জে দিদিমার বাড়ীতে লেখা ছিল!"

সৌদামিনী দেবী জেদ করিতেছিলেন, সমস্তদিন পদ ঘোড়ায় চড়িয়া শ্রান্তক্লান্ত হইয়াছে, এখন তাহাকে পাল্‌কীতে উঠিতে হইবে। সেইজন্য তিনি দুইখানি শিবিকার যোজনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কুমার কিছুতে তাহাতে সম্মত হইলেন না। "তোমার নাতি হ'য়ে যেতে রাজি আছি ঠাকুরাণীদিদি, নাত্‌বউ হ'য়ে নয়!" এই বলিয়া তিনি দাসগৃহিণীর সকল আপত্তি হাসিয়া উড়াইলেন। আকাশে অস্তগমনোন্মুখ চন্দ্রকিরণ নীলিমার উপর

একটা ক্ষীণ-সূক্ষ্ম রজতাবরণ বিস্তৃত করিয়াছিল, তাহাতে ফেনপুঞ্জময় বিশাল সুবর্ণরেথার বুকে ইন্দ্রধনুর সুষমাবৎ অনির্ব্বচনীয় রমণীয়তা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। আর বন্যাগর্জ্জন দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া নিবিড় বনানীর মৃগয়াকালীন প্রলয়ঙ্কর গাম্ভীর্য্য সূচিত করিতেছিল। পদাঙ্কনারায়ণ সশস্ত্রযোদ্ধৃবেশে এই দৃশ্যের ভিতর সর্ব্বাগ্রে উৎসাহে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ উচ্চকণ্ঠে সকল শব্দ ডুবাইয়া কে গান গাহিল —

ইস্ নগরীমে বোল্‌তাহে কোন্ বেপরোয়ানি
বাবা! বেপরোয়ানি।

কঙ্কর চুন্ চুন্ মহল বানায়া, লোক কহে ঘর মেরা!
ও না ঘর তেরা না ঘর মেরা চিড়িয়া নিয়া বাসেড়া!
বেপরোয়ানি বাবা! বোল্‌তা হে কোন্।
জান্ ভী যাগা, মাল ভী যাগা, যাগা খাসা মলমল,
আল্লাকি বানায়ি সুরত্ যাগা তেরি
হোগা বাবা জঙ্গল! মহাল হোগা জঙ্গল।
বেপরোয়ানি বাবা, ইস্ নগরীমে বোলতাহে কোন্।
মাট্টী ওড়না, মাট্টী বিছাওনা, মাট্টীকে শিরথানা,
আওর মাট্টীমে মিল যানা।
খোড়াসা বুন্দ পদলাপানি কেয়া মলমলিকা খোনা,
দাগ লাগিগে কুজ্‌রৎমে প্যারে কেয়া হাস্‌না
কেয়া রোনা।
বেপরোয়ানি বাবা, ইস্ নগরীমে বোলতাহে কোন্।

* * * *

সোনে কি দাণ্ডি তেরি রূপে জড়ি পাল্লে
পাল্লে পর নেকি বদি তৌলে মৌলা তেরি!
বেপরোয়ানি বাবা, ইস্ নগরীমে বোল্‌তাহে কোন্!

ক্রমশ।

প্রলয়ের শেষ।

দুঃখ দেবতার দান, তার যত ব্যথা,
দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুজল, আর্ত্ত কাতরতা,
লুকায়ে রেখেছি তাই তাঁহারি কারণে
আঁধার মনের মাঝে অতি সঙ্গোপনে!
সেই অন্ধকারমাঝে আছি আশা ধ'রে
তাঁহারি নয়নজ্যোতি কিছুকাল পরে
আমারে নূতন করি' করিবে সৃজন
মহাপ্রলয়ের শেষে পৃথ্বীর মতন।

পুণ্যক্ষয়।

তোমারে যে পেয়েছিনু দেবের প্রসাদ
জন্মান্তের পুণ্যফল, স্বর্গের সংবাদ।
সে পুণ্য হয়েছে ক্ষয়, গিয়েছ চলিয়া
ধরণীর ধূলিমাঝে একেলা ফেলিয়া।
কোথা আলো, কোথা আশা, নন্দনসৌরভ,
মুহূর্ত্তে মিলায়ে গেছে সকল গৌরব!

পাষাণ।

একবিন্দু অশ্রু যদি ফেলি কভু আমি,
অমনি বন্যার মত আসে দ্রুত নামি
অনন্ত শোকের মোর অবাধ প্লাবন
ভাঙ্গিয়া ধৈর্য্যের বাঁধ ভাসাইয়া মন।
তাই আছি স্তব্ধ জড় পাষাণের মত
প্রবল উৎসের মুখ রুধিয়া নিয়ত।

অশ্রু।

আর রুধিব না তোরে রে অশ্রু আমার
অবাধে নামিয়া আয় সুপবিত্র ধার
বিধাতার পাদধৌত মন্দাকিনীসম,—
ভাসিয়া চলিয়া যাক্ সর্ব্ব দর্প মম
স্বার্থ-শোক-দুঃখ-জ্বালা ঐরাবতপ্রায়,
তীর্থ হোক এ জীবন তোমার কৃপায়!
স্পর্শে তব সঞ্জীবিত হউক আবার
বহুদিন প্রাণহীন যত চিন্তাভার।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বঙ্গদর্শন।

মনীষা।

[মিশ্রকাব্য] *

প্রস্তাবনা।

কুমার শরৎচন্দ্র পুণ্যাহের মহোৎসবদিনে
প্রজাবৃন্দে নিমন্ত্রিয়া আনিলেন প্রমোদবিপিনে।
বিপুল বনভোজন—প্রভাত ভরিল বহুলোকে,
স্ত্রীপুত্র তাদের সাথে এল; সবাকার মুখে-চোখে
মধুর প্রশান্ত হাসি।—"কুমারের জয় জয় হোক,
তিনিই মোদের পিতা"—উল্লাসে কহিছে সর্ব্বলোক।
পঞ্চ সহপাঠী সাথে ছিলাম সেদিন আমি তথা
তাঁরি পুত্র প্রিয়বন্ধু নির্ম্মলের লইতে বারতা।

সঙ্গে ল'য়ে আমাদেরে দেখাইল প্রমোদভবন
সাদরে নির্ম্মল।—সজ্জিত নবাবী ধাঁজে। বিমোহন
পুষ্পকুল বিচিত্র বরণে-গন্ধে অলিন্দের মাঝে
মৃৎপাত্ররোপিত-শাখিশিরে কিবা দিব্যতর সাজে!
হর্ম্ম্যতলে হেরি চেয়ে ভগ্নশেষ পুরাণো মঠের—
শিলারাজি—উৎকীর্ণ তাহাতে লিপি কোন্ যুগান্তের।
সুবিপুল কূর্ম্মপৃষ্ঠ—গজদন্ত শুভ্র সুবিশাল
মান্ধাতা-প্রাচীন। ভিত্তিগাত্রে হেরি সর্ব্ব দেশকাল
একত্র মিশ্রিত আছে। বক্রশিঙা, দীর্ঘ হাতিয়ার,
করিপ্রস্তরের কৃষ্ণ সুবিপুল শুড়্ শুড়ি, আর

* Lord Tennyson প্রণীত "The Princess" হইতে।

খর বক্র-ব্যাঘ্রনখ। চীনের পুত্তলী সূক্ষ্ম-আঁখি,
স্ফটিকাক্ষমালা, আর মণিমুক্তাবিরচিত পাখী—
হস্তিদন্তবিনির্ম্মিত বিংশ-কৌটা, ভিতরে ভিতরে
অপূর্ব্ব শিল্পের পরিচয়। হেরি উচ্চ ভিত্তি'পরে
ঝুলিছে প্রকাণ্ড দুটি হরিণশৃঙ্গের মাঝখানে
পিতৃপুরুষের অস্ত্রবর্ম্ম-আদি সযত্নসম্মানে।

"এই যে দেখিছ বন্ধু তরবারি দু'ধার শাণিত,
অজেশী রাণার করে ছিল ইহা দৃঢ়পরিহিত।
বক্র ওই ব্যাঘ্রনখ—ছিল উহা বক্ষে শিবাজীর,
যুদ্ধের কৌশল আর পরাক্রমে যিনি একবীর
ভারতমণ্ডন। এই কীর্ত্তিগাথা" এতেক কহিয়া
বন্ধুবর গ্রন্থ আনি' খুলিলেন সসম্ভ্রম হিয়া
বীরত্বের পুণ্য ইতিহাস। পড়িনু মিলিয়া সবে
অজস্র বীরের কীর্ত্তি। পরে কুরুক্ষেত্র-মহাহবে
বীরেন্দ্রবৃন্দের রণরঙ্গ বর্ণিলাম জনে জনে
পুরাণের পত্রে পত্রে সুকীর্ত্তিত আছে যা ভুবনে।
কেমন করিয়া সবে অবহেলে দিল আত্মবলি
রক্তিম সংগ্রামরাগে জগদিতিহাসেরে উজলি'।
অবশেষে হৈল কথা রাঠোরের জাওয়াহীর বাই,
কোমলা রমণী তবু ধরাতলে তুল্য যাঁর নাই,
অদম্য উদ্যমে যুঝি' পরিশেষে রণে দত্তপ্রাণ
পড়িলেন সগৌরবে মেঘচ্যুত-বিদ্যুৎসমান।
ধন্য ধন্য বীরবালা—সুদুঃসহ প্রতাপে তোমার
লণ্ডভণ্ড অরিবৃন্দ,—তীক্ষ্ণতর তব অসিধার
উল্কাসম জ্বলি' তেজে মুহূর্ত্তেকে সাধিল প্রলয়
মৃত্যুর বিষাণে তাই আজো বাজে 'জয় তব জয়'।

এমনি কাহিনী যত নারীর বীরত্বে উজলিয়া
তাদেরি প্রভায় মোর ভোর হ'য়ে গেল সারা হিয়া।
"চল চল মঠে যাই" কহিলেন বন্ধুবর কথা,
আমার কনিষ্ঠা শান্তা দিদিমার সঙ্গে রঙ্গে তথা

ভোজন-উৎসব আদি হেরিবারে অন্তরাল হ'তে
গিয়াছেন কিছু অগ্রে। আমরাও উদ্যানের পথে
চলিলাম উৎসবপ্রাঙ্গণে। গ্রন্থ মুড়ি' করতলে
ধ'রেছিনু আমি তার অঙ্গুলি রচিয়া মধ্যস্থলে।
দেখিনু অপূর্ব্ব দৃশ্য—আনন্দের লেগেছে জোয়ার
অবকাশ-চন্দ্রোদয়ে—হাস্যে আস্য ভরি' সবাকার।
মক্ষিকার ঝাঁকসম একদিকে বহুশত জন
বিজ্ঞান-মধুর লোভে ঠেসাঠেসি করিছে গুঞ্জন,
জনৈক ইংরাজশিষ্য কৃতবিদ্য মান্য অধ্যাপক
দি'ছেন বিজ্ঞানশিক্ষা সযতনে ঔৎসুক্যজনক
বহু স্থূলবস্তুপরীক্ষায়। গূঢ়তত্ত্ব ফোয়ারার
বুঝাইতে উচ্চভূমে স্থাপি' মস্ত জলের আধার
স্থিতিস্থাপকের নল তলরন্ধ্রে সংযোজি' যতনে
সমকোণ স্ফটিকাগ্র ধরি' আছে সহাস্য-আননে
দূর নিম্নভূমে বসি'। ফিট্‌-ফিট্‌-ফুর্‌-ফুরি' জল
টুপ্‌টুপ্‌ টপাস্‌ ছলং কলকল্‌-ছলছল্‌
উঠি'-পড়ি বহে অবিশ্রাম। দেখিলাম কৌতূহলী
আরো নিম্নে বিদ্যুতের ক্রীড়া। কীমান উঠিল জ্বলি'
পিত্তলগুলিকাযুক্ত শিশি হ'তে স্পর্শিল যেমনি
ক্ষিপ্র অগ্নিকণা। তাহে সদ্য নিদ্রাবুদ্ধ প্রতিধ্বনি
বিশাল রিক্ত প্রান্তরপার হ'তে দিলেন উত্তর।
আঁখিটি রাখিয়া কেহ দূরবীক্ষণের ছিদ্র'পর
হেরিতেছে দূর বনচ্ছবি। হোথা হেরি চক্রাকার
বালকবালিকা বসি' হাতে-হাতে ধরি এ উহার,
সহসা বিদ্যুৎস্পর্শ বিযুক্ত করিল তাহাদের
চমকচপল হাস্যে। উত্তরেতে হেরিনু হ্রদের
বক্ষ দীরি' বহি চলে ক্ষুদ্র বাষ্পপোত—গতিবলে
দুলিয়া উঠিল যত প্রফুল্ল পদ্মিনী ছিল জলে।
উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ হ'তে ঝলিতেছে দীপ্তাগ্নির হাসি,
লৌহবর্ত্মে ক্ষুদ্র যান দ্রুত ধায় কৃষ্ণ ধূমরাশি
সঘনে উগারি'। দূরে শ্যাম কুঞ্জশির উল্লসিয়া
সহসা আকাশযান মণিখণ্ডসদৃশ ভাসিয়া

উঠে। সুগোল রেশমছত্র তাহা হ'তে সেই ক্ষণে
খসিয়া নামিল ধীরে। তাড়িতের সংবাদ সঘনে
পশিছে নকল আড্ডাঘরে। বিজ্ঞান এমনি করি'
ক্রীড়াসাথে শিশুদের বিতরেন জ্ঞান যত্নে ভরি'।
অন্যত্র কেবলি ক্রীড়া—কন্দুক লইয়া শিশুদল
লোফালুফি করিতেছে কলহাস্য তুলি' অবিরল।
ক্ষুদ্র ছেলে-মেয়ে হাসে আনন্দে হইয়া আত্মহারা
সাঁওতাল-নরনারী নৃত্যগীতে উৎসব-ফোয়ারা
দিয়েছে উন্মুক্ত করি'। মৃদঙ্গ বাজিছে একঘেয়ে
অবিরাম শব্দে তার বেসুরা সে গীতধ্বনি ছেয়ে।
প্রশস্তোচ্চ শ্যামশাখে নিকুঞ্জ রচিত ছায়াময়
গুঞ্জনে ঝঙ্কারে তার নিম্নতলে মর্ম্মরে মলয়।

বিজ্ঞানমন্দিরামন্ত্র হাস্যকেপোচ্ছল দীর্ঘ বেলা
কখন্ চলিয়া গেল রাঙাইয়া সে কৌতুকখেলা,
কেহ জানিল না। ভগ্ন মঠে মোরা প্রফুল্ল অন্তরে
আসিনু ফিরিয়া। দেখিনু স্তম্ভের সারি—তদুপরে
বিনির্ম্মিত বিচিত্র খিলান সূক্ষ্মশিল্পপরিচয়।
ভিত্তিগাত্রে ধ্বংস-রত কালের গহ্বর—দুই হয়
মধ্য দিয়া তার—উদ্যান-উৎসব লোকসমাকুল
সৌধখানি। হরিৎমণিসুশ্যাম প্রাঙ্গণ অতুল
পরশি' পড়িয়া আছে। শাস্ত্রী আর বিবিমার সনে
বসিনু সেথায়। এল পরিচিত কুটুম্বিনীগণে
হেথা-হোথা হ'তে। ভগ্ন নয় সেই মঠ—তবু তার
অভ্যন্তরে একটা দেউল খর্জ্জুরশাখায় আর
বিচিত্র নিশানে সাজায়েছে শাস্ত্রী পাগলিনী। মাঝে
তার রেখেছে শিবাজীমূর্ত্তি সজ্জিত বিচিত্র সাজে।
ধনু ও ধুতুরা পিনাক ত্রিশূল—ফোঁস্‌ফোঁস্ ফণী
কেশজালে—উগ্র রুদ্র-অবতার। নিশিত অশনি
নয়নে দুর্দ্ধর্ষদৃষ্টি। বাহিরের পুরু গালিচায়
বসিনু সকলে মেলি'—ভৃত্যগণ রেখে গেছে তায়

সুবর্ণ-আতরদান—উচ্চচূড় গোলাপের পাশ
ঝলিত ঝালরে। তাম্বূলকরঙ্কে পর্ণখিলিরাশ
সুরভি-মসলা-ভরা। দিদিমা প্রসন্নহাস্ত হাসি'
কহিলেন স্নেহস্বরে আমাদের সবারে সম্ভাষি'—
'অন্নদান শ্রেষ্ঠযজ্ঞ—এর চেয়ে পুণ্য নাহি আর—
পালিয়ো এ ব্রত চিরকাল।" ঢেউ উঠিল কথার
কতমত—শ্রীহর্ষবর্দ্ধন, শিবি আর উশীনর,
সর্ব্বস্বদক্ষিণাদত্ত রঘু ও হরিশ্চন্দ্রনৃপবর
হেরিলাম দুটি চক্ষু পুণ্যদীপ্তমূর্ত্তি বিধবার
মুক্ত করুণোৎসে উঠিল ভরিয়া। স্নেহকণ্ঠ তাঁর
অবিশ্বাসশুষ্ক আর অশ্রদ্ধার ধূলিবিমলিন
আমাদেরো চিত্তমাঝে বারিধারা বর্ষিল নবীন।

অবিশ্রাম চলিয়াছে কথা—সহসা দেখিনু চাহি
উর্দ্ধে সেই বীরমূর্ত্তি রমণী-সজ্জিত—অবগাহি'
গেল চিত্ত বীরত্বের পুণ্য মহিমায়। গ্রন্থে আর
পড়িলাম কত কথা, শীপ্রাত্রবঞ্চনা-চমৎকার
বীরেন্দ্রভাস্কর শিবাজীর। "রাঠোরের বীরাঙ্গনা
কেমনে যুঝিলা রণে লক্ষশত্রুব্যূহবিরচনা
হেলায় করিয়া দীর্ণ। ধন্য ধন্য বীরবালা তুমি!
কোমলহৃদয়রক্তে ধরারে করিলে স্বর্গভূমি!
সস্নেহে নিশ্চল ক'ন নিরখিয়া শান্তার বদনে
"হেন বীরাঙ্গনা আর এখন কি মিলে এ ভুবনে?"

অর্দ্ধসুপ্তাবিষ্টা শান্তা উচ্ছ্বসিত উঠিয়া অলাজে,
কহিল, "ভাবনা কিবা, হাজারো তেমন ধরামাঝে
রহিয়াছে বীরাঙ্গনা—হৃদিহীন মূঢ় দেশাচার
দেয় না উঠিতে তাহাদের। এস কথায় কিবা আর
কাজ? তোমরাই ক'রেছ এমন। ধন্য পুরুষত্ব!
নারীরে করিল নারী অপহরি' সকল মহত্ত্ব
দাসীত্বে মাত্র নিয়োজি'। প্রতিভায় জ্যোতির্ম্ময়ী কবি
হইতাম যদি—তবে পুরুষবৃন্দের মুখচ্ছবি

গর্ব্বোজ্জ্বল, করিতাম লজ্জায় আঁধার। হইতাম
ঐশ্বর্য্য-ঈশ্বরী রাজেন্দ্রনন্দিনী—তবে খুলিতাম
নূতন নালন্দধাম লোকালয়-সুদূরপ্রান্তরে
দর্শনবিজ্ঞান-আদি যাহা-কিছু, যার গর্ব্বভরে
বাড়িয়াছে স্পর্দ্ধা তোমাদের—সকল বিদ্যায় দ্বার
নারীদের দিতাম খুলিয়া—মোদের মেধার ধার
দশগুণ তোমাদের হ'তে।" এতেক কহিয়া বালা
চিত্তবেগে কবরীর ছিঁড়িয়া ফেলিল পুষ্পমালা।

স্থবির ঠাকুর্দ্দা এক হাসি' কয়, "হইত না মন্দ
মুগ্ধমুখী-ছাত্রীভরা নবযুগে নূতন নালন্দ;
এলোকেশে গুর্ব্বাসনে বসিবেন হরিণাক্ষীদল
গৈরিকবসনা; মাধুরীমণ্ডিত মুখে অবিরল
ছুটিবে রুচিরকান্তি ছন্দে ছন্দে অমৃতনির্ঝর
বিজ্ঞানসুস্বাদু — জ্ঞানার্থিনীগণ যৌবনদুর্ভর
বয়োবহ্নি জ্ঞানভস্মে আবরিয়া যাপিবে জীবন
বুঝি বা অক্লেশে—ভয় গণিতেছে কিন্তু মম মন,
শান্তাসম পক্ষিণীরা এ কুঞ্জে রাজিলে বহুতর
রাঙা টুকটুক,—তাহে পড়িবেই যুবার নজর
অব্যর্থ কহিনু।"

শুনিয়া উদ্দীপ্তা শান্তা পুষ্পশাখা
হস্ত হ'তে সুদূরে নিক্ষেপি' কঙ্কণঝঙ্কারমাখা
আস্ফালন সনে কহে—"শিখিয়াছ বিদ্রূপ কেবলি!
মৃত্যুদণ্ড দিব যদি পুরুষে পশিয়া সেই স্থলী
চাহে মাত্র আমাদের পানে।"

আপন চাপল্য স্মরি'
আপনি হাসিল শান্তা—কমলিনী উঠিল সুন্দরি'
যেন নবারুণরাগে। নির্ম্মল বিদ্রূপে স্নেহে আর
কনিষ্ঠা ভগ্নীর শিরে উপাধি বর্ষিল চমৎকার—
"দ্বিতীয়া তাড়কা তুই নরমুণ্ডভোজননিরতা
কৃতঘ্না কুমারী শুধু বিপরীত সাধিতে ক্ষমতা।"

আধ স্নেহে আধ বা বিদ্রূপে কহিল, "সকলি আছে
আমাদের বিদ্যালয়ে। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-মাঝে
খেলাধূলা নানামত—কত গল্প—কত অভিনয়—
স্ফটিকমণিরচিত মন্দিরে কতই না ভক্তিময়
বেদমন্ত্রপাঠ—কত কাব্য-আলোচনা ; স্তব্ধ আঁধার
রাত্রিমাঝে উদার প্রান্তরে ঊর্দ্ধনেত্রে তারকার
রহস্যনির্ণয়—বহুকণ্ঠে তুলি পূর্ণ উচ্চতান
মিলায়ে ত্রিতন্ত্রী সাথে সন্ধ্যাক্ষণে কত মধুগান—
কিন্তু যথা নাহি ফুটে শান্তাসম উদ্যানকমল
সেথা সব ব্যর্থ মনে হয়।" কহে শান্তা সুচপল —
"হাঁ হাঁ সত্য বটে—মোদেরি লাগিয়া তোমাদের যত
কিছু যেন—ঠেকিছে বিষম ফাঁকা—নাহি অন্যমত —
একেবারে ধ্রুবসত্য ইহা—অখণ্ডিত গোলাকার
যেমতি অভ্রান্ত সত্য।" নির্ম্মল অমনি মুখে তার—
তীব্রবেগে গোলাপের দিল পিচকারী—কহে আর—
"অবিশ্বাস করি' তুই মর্ম্মগত বচনে আমার
কেবলি করিলি রঙ্গ ! শোন্ তবে দিতেছি প্রমাণ—
এবার পূজাবকাশে গৃহে কেহ করি নি প্রয়াণ ;
বিদ্যালয়ে ছিনু পড়ি'—রুক্ষমর্ম্ম গুরু একজন
কেবলি জ্যোতিষ ল'য়ে মোদের করিত জ্বালাতন,
তিক্ত তাহা লাগিত বিষম। ঘুরি-ফিরি চারিধার
হেথাহোথা ভ্রমিতাম সবে মিলি বহি' চিন্তভার,
ভোজনসময়ে মনে কেবলিই পড়িত তোদের
যত্নে ভরা চেয়ে-থাকা—উদাসীন চিত্ত আমাদের.
ভাবিত কি কৌতুকক্রীড়ায় সবে মিলে কাল হরি।
দাবাপাশা খেলিতাম আনমনে বহুক্ষণ ধরি
অথবা সকলে মিলি বলিতাম অংশ অংশ করি
পালাক্রমে একটি কাহিনী দীর্ঘ।"

শান্তা গল্প স্মরি
কৌতুক মানিল চিত্তে। "এই শ্রেষ্ঠ সকল ক্রীড়ায়,
শীঘ্র বল, কৌতুকনাট্যই বল।" কহিল আবার

পরম বিস্ময়ে, "লোকে না জানি কেমনে গল্প করে
নির্নিদ্রা সভায় আপনা-আপনি।" তার বিম্বাধরে
বিদ্রূপের পড়িল কলঙ্করেখা। নির্ম্মল তখন
মোর মুখপানে চাহি কহে—"তবে আরম্ভি এখন
কথা। একে একে পালাক্রমে খণ্ড খণ্ড সবে তাঁরে
সমাপ্ত করিব। কিন্তু কিসের কাহিনী, বারেবারে
তাই ভাবি। পরী না দৈত্যের গল্প? অথবা ভূতের
কথা? ভরাসাঁঝে গাত্রশিহরিণী—বরষা-স্রোতের
দুর্দ্দাম প্রবাহে যবে ভেসে যায় শশিহর্ষতারা—
ধরার হৃদয়খানি কাঁদে যবে সর্ব্ববন্ধহারা
বিরহিণীবক্ষবালাসম।"

"সুখে মুখে রচ কথা
বিষয় যাহাই হোক্। বরষার যোগ্য সে বারতা
বসন্তেও মন্দ লাগিবে না। মনোরম বীররসে
ভরি' কহ কোনো রাজপুত্রকথা শুনিব হরষে"
কহিল দিদিমা। তাহে মুখভঙ্গি করিল নির্ম্মল
হেন রঙ্গে, উচ্চ হাস্যে হাস্যে শান্তা হইল বিকল।
দিদিমা কহিলা মোরে আশিষ-চাহনি-পাতে চুমি—
"কেমন যে হাস্যে পাওয়া নাতিটি আমার। তবে তুমি
আরম্ভিয়া দাও কথা, কাল বার্থ যায়। যদি কবে
রাজপুত্রকথা, নিজে সাজি রাজপুত্র কহ তবে
কথা।"

নির্ম্মল কহিল, "শান্তা রাজপুত্রী তবে, তারে
পক্ষিরাজ অশ্বে তুমি রাজপুত্র চল জিনিবারে।"
কহিলাম—"তবে আমি হইলাম তাই। এক এক করি
মোর পরে পালাক্রমে তোমরা এ কথা অনুসরি'
হইও নায়ক। শান্তা যোগ্যতমা রাজেন্দ্রনন্দিনী,
আপনার ওজোদর্পে সর্ব্বত্র সমান তেজস্বিনী
অথচ সারল্যে অমায়িকা। দেশকাল বিবেচিয়া
কোনো রাজকুমারের সাহসিক আখ্যান রচিয়া
এর সাথে সংযোজিলে মিত্রকাব্য হইবে মন্দ না।
আজিকার যোগাযোগ হইয়াছে কেমন দেখ না—

হেথা এই জয়মঠ, নবাবি প্রাসাদ হোথা তার
গগনচুম্বিত চূড়ে—শিষ্যকালসমালোচনায়
যোদের প্রসঙ্গ ভরা—তার সনে উন্নত সমাজে
রমণীর অধিকার। হোথা দীপ্ত মহিমার সাজে
বীরেন্দ্র-শিবাজী-মূর্ত্তিখানি অগ্নিবর্ণে চিত্তে আঁকে
জরজীর্ণ ভারতের অক্ষয় অতীত। ঝাঁকে ঝাঁকে
অজস্র বিজ্ঞানশিষ্য যন্ত্র হ'তে বিদ্যুৎ ধরিয়া
শিখিছে ডাকিনীবিদ্যা (গেছে বুঝি ওরা বিস্মরিয়া
প্রাচীন নিষেধবিধি—বিদ্যুৎতারকা আর গ্রহ
ইহাদের ঘাঁটাইলে ঘটে বংশলোপবিনিগ্রহ)।
এ সব পদার্থ ল'য়ে আজিকার চটবে রচনা
অপূর্ব্ব এ মিশ্রকাব্য। বরষায় মাধুরীবর্ণনা
কে বর্ণিবে কালিদাস বিনা—তবু সন্ধ্যা জমাইয়া
রচিব বর্ষার যোগ্য কথা। মাঝে মাঝে বিধ্বনিয়া
দিগ্‌দিগন্ত সরস নিকণে উঠুক মধুর তান
নারীকণ্ঠ হ'তে, আমা-সবে বিশ্রাম করিতে দান।"

আমি আরম্ভিনু কথা—অন্তে সবে মোর পাছে পাছে
রচে গল্প একে একে। কর্কশ-পুরুষকণ্ঠ-মাঝে
ধ্বনিল নারীর কণ্ঠ। যেমতি ঝটিকা-অবসানে
পাপিয়া গগন ব্যাপি' আপনার কণ্ঠসুধা ঢালে।
সে গল্প রচিব ছন্দে, উচ্চারিব সে গীতিকাচয়
ভিন্নদেশী-কবিকথা প্রকাশিতে মোর দেশময়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

আমাদের দৃষ্টিশক্তি।

গত আশ্বিনমাসে প্রয়াগের বৈশ্য-মহাসভার প্রধান সম্পাদক শ্রীযুক্ত লালা বৈজনাথ দেশের নানা স্থানে নানা ব্যক্তির নিকট কতকগুলি গুরুতর প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াছিলেন। নানা কারণে আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ইহার শিক্ষাদীক্ষা-আচারব্যবহারে পুরাতন হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। পুরাতন স্মৃতিশাস্ত্রদ্বারা বর্ত্তমান সমাজের সকল অবয়ব শাসিত করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যে জীবজাতি অবস্থাভেদে ব্যবস্থা করিতে না পারে, তাহার ধ্বংসের পথ মুক্ত হয়। তেমনই যে মানবজাতি আপনাকে বর্ত্তমানের যোগ্য করিবার চেষ্টা না করিয়া চক্ষু মুদিয়া কাল-স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়, তাহারও ভবিষ্যৎ আশাজনক নহে। আজি না হউক, কালি সমাজের হিতেচ্ছুগণকে আমাদের জীবনের জটিলপ্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। বৈশ্য-মহাসভাদ্বারা সম্প্রতি আর কিছু না হউক, সেই সকল প্রশ্নের আভাস পাইতেছি।

এখানে একটি ক্ষুদ্র প্রশ্ন আলোচনা করা যাইতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষার্থী বালক ও যুবকগণের দৃষ্টিশক্তি বাড়িতেছে, না কমিতেছে ?

এইরূপ প্রশ্নের মীমাংসার পক্ষে একটি অন্তরায় আছে। তুলনা করিতে গেলেই দুই পক্ষ চাই, এক পক্ষ দেখিয়া ভালমন্দ কিছুই বলিতে পারা যায় না। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশের বালক ও যুবকগণের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ কি প্রখর ছিল, তাহা জানিবার উপায় প্রায় নাই। কিন্তু এ নিমিত্ত অতি পূর্ব্বকালের ইতিহাস না পাইলেও চলে। শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমনই জিনিষ যে, তাহার বিকার দুইএক পুরুষের মধ্যেই কিছু-না-কিছু ধরা পড়ে। বিশপঁচিশবৎসর পূর্ব্বে আমরা কি দেখিয়াছি এবং এখন কি দেখিতেছি, তাহা মিলাইলেও ভবিষ্যৎসম্বন্ধে কতকটা অনুমান করিতে পারা যায়।

আজিকালি আমরা যত বালক ও যুবককে চশমা পরিতে দেখিতেছি, বিশপঁচিশবৎসর পূর্ব্বে তত দেখিতাম কি ?

আমার মনে আছে এবং মনে থাকিবার বিশেষ কারণও আছে, আমরা যখন কলেজের দ্বিতীয়বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমাদের প্রায় আশীজনের মধ্যে কেবল দুইজন চশমা চোখে দিতেন। এই দুইজন দূরের জিনিস দেখিতে পাইতেন না, তাঁহারা নিকটদৃষ্টি ছিলেন। আমার মনে থাকিবার কারণ এই, আমাকেও শীঘ্র তাঁহাদের দলে মিশিতে হইয়াছিল। কিন্তু চোখে চশমা দিতে কত লজ্জাবোধ করিতাম! পাছে কেহ মনে করে, বাহার দেখাইবার নিমিত্ত চশমা ; পাছে কেহ বলে, আহা এই বয়সেই অন্ধ! সে সময়ে, 'চোখে চশমা চাকা চাপদাড়ী রাখা' ইত্যাদি একটা গানও শুনিতে পাওয়া যাইত। এই সব

কারণে চশমা প্রায়ই লুকাইয়া রাখিতে হইত। অথচ দূরের জিনিব দেখিবার উপায়ও ছিল না। এই উভয়সঙ্কটে পড়িয়া এক বিচক্ষণ কবিরাজমহাশয়ের শরণাপন্ন হই। তিনি বলিয়াছিলেন, আয়ুর্বেদে এই নূতন রোগের চিকিৎসা নাই।

তখন চশমা চোখে দিতে কি দুঃখ ও লজ্জা পাইতাম! কিন্তু এখন! পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে!

এখন কলেজের যুবকগণের কথা দূরে থাক্, ইস্কুলের দুগ্ধপোষ্য ছেলেকে চোখে চশমা দিয়া নিঃসঙ্কোচে বেড়াইতে দেখা যায়। কারণ, কান-কাটার দেশে কর্ত্তিত-কর্ণের লজ্জা থাকে না। বাহারের তরে চশমা,—এ কথা ইঙ্গিতেও শুনিতে পাই না; বালকটির ভাগ্য দেখিয়াও কেহ 'আহা' করে না। সমাজ যেন স্বীকার করিয়া লইয়াছে, লেখাপড়া * করিতে গেলেই চক্ষুর মায়া কাটাইতে হইবে। বার-তের বৎসরের বালক চোখে চশমা না দিলে পঁচিশ-হাত দূরের লোক চিনিতে পারে না, ইস্কুলের কৃষ্ণপট্টে খড়ীতে লেখা অঙ্ক পড়িতে পারে না!

পূর্ব্বকালে এমন হতভাগা ছিল কি? অবশ্য ছিল। কিন্তু সংখ্যা বেশী ছিল কি? বোধ হয় না। থাকিলে আয়ুর্বেদে রোগের অন্ততঃ‡ একটা নাম থাকিত।§

মহাভারতে, সুশ্রুতে ও অন্যান্য গ্রন্থে দৃষ্টিশক্তি মাপিবার এক উপায় পাওয়া যায়। লিখিত আছে, বশিষ্ঠতারার অরুন্ধতী যে দেখিতে না পায়, তাহার মৃত্যু আসন্ন। এইরূপ, কৃত্তিকানক্ষত্রেরও উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, সেকালে এমন লোক অল্পই থাকিত, যাহারা অরুন্ধতীতারা কিংবা কৃত্তিকার একএকটি তারা দেখিতে পাইত না। অনেকে, বিশেষত যুবকে দেখিতে না পাইলে আসন্নমৃত্যুর কথা উঠিত না। বয়স বাড়িলে, জরা উপস্থিত হইলে, লোকে অন্ধপ্রায় হয়, কোন তারাই স্পষ্ট দেখিতে পায় না।

অর্থাৎ তখন যাহা বৃদ্ধবয়সে ঘটিত, এখন তাহা কিশোরবয়সেই ঘটিতেছে।

হয় ত সেকালে একালের মত এত বালক বিদ্যার্থী হইত না, হয় ত সেকালে ক্ষীণদৃষ্টি বালক কাচময় প্রতিচক্ষুর অভাবে অধ্যয়ন হইতে বিরত হইত। সেকালে দৃষ্টিশক্তিহীন বালক কিংবা অল্পদৃষ্টি বালক থাকিত না বলিতে

* চলিতবাঙ্লার পড়্ধাতুর দুই অর্থ আছে, (১) পতন, (২) পঠন। একই ধাতুর দুইপ্রকার অর্থ থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। সে গুইয়া পড়িয়া পড়িতেছে, এখানে পড়ার দুই অর্থ হঠাৎ মনে আসে না। সংস্কৃত-প্রাকৃতে পঠ্-ধাতু পড, এবং ওড়িয়া-হিন্দী-মরাঠিতে পঢধাতুই চলিত। এই সকল ভাষার সহিত সাদৃশ্যরক্ষার্থেও পঢ়া কিংবা পড়া করা ভাল। পঠ্ধাতু হইতে পঠিতে, পঠিবার, পঠিতেছি ইত্যাদি করিলে বাঙ্লাভাষা সংস্কৃত হইয়া পড়ে।—লেখক।†

† শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্লা বৈষ্ণবগ্রন্থে "পঢ়া" ও "পড়া," "পাঠ" এবং "পতন" অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্যে সে প্রভেদ রক্ষিত হয় নাই। বর্ণবিন্যাস যথাসম্ভব উচ্চারণের অনুরূপ হওয়াই বৈজ্ঞানিকপ্রথাসম্মত। প্রবন্ধলেখকের প্রবর্ত্তিত বানান এখনকার দিনে আর অনুমোদনীয় নহে।—বং সং।

‡ প্রবন্ধলেখক অন্তত, ক্রমত, স্বতন্ত ইত্যাদি শব্দে বিসর্গলোপ এবং বাঙালী, রাঙা, আঙুল ইত্যাদি শব্দের বাঙালী, রাঙা, আঙুল, ইত্যাকার বানানের পক্ষপাতী নহেন।—বং সং।

§ এক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বলিলেন, নিকটদৃষ্টির নাম নকুলান্ধ আছে। কিন্তু নিকটদৃষ্টি ও নকুলান্ধ এক কি?

পাওয়া যায় না। কম থাকিত বলিয়া বোধ হয়। কারণ চোখ-খোয়ান সভ্যতার একটি লক্ষণ। যে অসভ্য মানবকে দূর হইতে মৃগ অন্বেষণ করিতে হইত, নতুবা আহার জুটিত না; যাহাকে দূর হইতে শত্রু নিরীক্ষণ করিতে হইত, নতুবা রক্ষার উপায় থাকিত না; তাহার চক্ষু অবশ্য প্রখর ছিল। প্রকৃতির উন্মুক্ত ও বিরাট্ ক্রোড়ে যে লালিতপালিত হইয়া থাকে, প্রকৃতিই তাহার শক্তির বিকাশ করিয়া দেন। বিকৃতির ক্ষুদ্র কোটরে আবদ্ধ মানবের ভাগ্যে সে বিকাশ সম্ভবে না। বস্তুত জীবসৃষ্টির মধ্যে এক সত্য এই যে, যে যা চায় সে তা পায়, যে অঙ্গের যে শক্তি যে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার সে শক্তিলাভ হয়। যাহা চাই না, তাহা শীর্ণ হইয়া কালক্রমে লুপ্ত হয়। চীল উচ্চ আকাশ হইতে লক্ষ্য করিয়া বেগে নামিয়া ভক্ষ্যের উপর ছোঁ মারে, আর গৃহচটক খাদ্যের সমুখে না গেলে খাদ্য দেখিতে পায় না। মাগুর, শিঙী, কুঁচ্যা প্রভৃতি কর্দমচর মৎস্যের চক্ষু অতিশয় ক্ষুদ্র হইয়াছে, কিন্তু নির্মল জলচারী রোহিত ও কাতলের চক্ষু বৃহৎ। ইহাই নিয়ম, যে যা চায় না, যাতে যার প্রয়োজন নাই, সে তা পায় না। প্রকৃতিকে ফাঁকি দিতে গেলে প্রকৃতি আমাদিগকে ফাঁকি দেন। কাজেই নগরের গৃহকোটরে কৈশোর ও যৌবন কাটাইলে প্রকৃতির অবহেলার প্রতিশোধ পাইতে হয়। দিবারাত্রি ছোট ছোট অক্ষর চোখের কাছে রাখিয়া পড়িলে অল্পদৃষ্টিই লাভ হয়।

বিদ্যার্থী বালক ও যুবকদের অল্পদৃষ্টি হইবার ইহাই মুখ্য কারণ।

এই কারণ আছে, কলও ফলিতেছে। লেখাপড়ায় মত্ত না হইলে যে দৃষ্টিশক্তি কমে না, এমন নহে। অনেকে পূর্বজন্মফলে অল্পদৃষ্টি হয়, পিতামাতার কিংবা অন্য পূর্ব-পুরুষের দৃষ্টির অল্পতা সন্তানে চলিয়া আসে। এ সব কারণ না থাকিলেও হয়। এদেশেই দেখা গিয়াছে, পার্বত্যস্থানে ধনৈশ্বর্য্যশালীর কিশোরপুত্রের দৃষ্টি অল্প হইয়াছে।

চোখের দোষ একপ্রকার নহে। চল্লিশ পার হইলে লোকের চালিশ্যা ধরে। ইহার কারণ চল্লিশবৎসর নহে। বয়সে সকল অঙ্গই শিথিল হয়, চক্ষুর অবয়বসকলও হয়। চোখের পেশী বার্দ্ধক্যের পূর্বে আবশ্যকমত টান কিংবা ঢিলা করিতে পারা যায়, পরে পারা যায় না। ফলে, নিকটের ছোট জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই দোষের মূল বাল্যকাল হইতেই বর্ত্ত-মান থাকে। আমাদের চোখ এমনভাবে গঠিত যে, নিকটের বস্তু দেখিতে হইলে তাহাকে পীড়ন করিতে হয়। বাল্যে ও যৌবনে সে চেষ্টা আমরা বুঝিতে পারি না। চল্লিশ পার হইলে বুঝিতে পারি, পড়িতে গেলে বহি দূরে ধরিতে হয়, সূচে সূতা পরান দায় হয়।

চালিশ্যা ধরিলেই যে এই লক্ষণ দেখা দেয়, এমন নহে। কোন কোন বালকবালিকা জন্মাবধি দূরদৃষ্টি থাকে। নিকটের বস্তু দেখিতে গেলে তাহাদের কষ্ট হয়, চোখ লাল হয়, চোখ দিয়া জল পড়ে, মাথা ধরে, হয় ত গা বমিবমি করে। পড়িবার সময় এই দোষ সহজে ধরা পড়ে।

বস্তুত ইহাদের চোখ চেপটা। চোখের মধ্যে একটা অবয়ব আছে, যার ভিতর দিয়া আলো পশ্চাতের এক পটে গিয়া পড়ে। সেই-

খানে দৃষ্টবস্তুর একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ উৎপন্ন হয়। সেই অবয়ব বা চক্ষুর কাচ পটের যতদূরে থাকিবার কথা, ততদূরে থাকে না। সে চোখের পটে কেবল দূরের বস্তুর প্রতিরূপ স্পষ্ট পড়ে, নিকটের বস্তুর স্পষ্ট পড়ে না।

এরূপ চোখের উল্টা, লম্বা চোখ। সে চোখের কাচ হইতে পট পশ্চাতে দূরে থাকে। উভয়ের মধ্যে যত অন্তর থাকিবার কথা, তার অপেক্ষা বেশী থাকে। ফলে সে চোখের পটে নিকটের বস্তুর প্রতিরূপ স্পষ্ট পড়ে, দূরের বস্তুর স্পষ্ট পড়ে না।

চোখের ঐ দোষ আমরা অল্পচেষ্টায় বুঝিতে পারি। এই দুই ছাড়া আরও অনেকরকম দোষ ঘটে। কোন কোন চোখ সব দিকে সমান গোল না হইয়া কোনদিকে বেশী গোল, কোনদিকে কম। ফলে সেই ঢালু চোখে দৃষ্টবস্তুর প্রতিরূপ কোনদিকে কিছু ছোট হয়, কোনদিকে লম্বা হয়। অধিকাংশ চোখ স্বভাবত উর্দ্ধদিকে কিছু বেশী গোল।

ঠিক চোখ বড় সাধারণ নয়। প্রায়ই কোন-না-কোন দোষ থাকে। দুই চোখই ঠিক, এমন ভাগ্য অল্পেরই ঘটে। বিলাতে শতকরা পনরজনের দুই চোখ দৃষ্টিতে সমান। কোন কোন লোক লেটা হয়। তাহারা বাঁ-হাতে কাজ করিতে পটু। কোন কোন লোক বাঁ-পা আগে ফেলে। দুই পা, দুই হাত, দুই কান, দুই চোখ কদাচিৎ শক্তিতে সমান হয়।

বস্তুত প্রকৃতিতে অসমতাই নিয়ম, সমতা আকস্মিক। বিজ্ঞান এই অসমতা লক্ষ্য করে, অজ্ঞান সমতা খুঁজিয়া বেড়ায়। অসমতার মধ্যেই একটাকে আদর্শ ধরিতে হয়। সেই আদর্শ ধরিলে কোন চোখ ভাল, কোন চোখ মন্দ দাঁড়ায়। যে চোখ সেই আদর্শের মত হয়, তাহাকে ভাল বলি, স্বাভাবিক বলি; যে চোখ না হয়, তাহাকে মন্দ বলি, অস্বাভাবিক বলি। আমরা চোখ দিয়া বস্তুর আকার ও বর্ণ দেখি। চোখের এই দুই বৃত্তি এক নহে। আকার স্পষ্ট দেখিতে পাই, কিন্তু হয় ত স্বাভাবিক বর্ণ দেখিতে পাই না। অন্যপক্ষে, স্বাভাবিক বর্ণ দেখিতে পাই, হয় ত আকার স্পষ্ট দেখিতে পাই না।

তবে চোখের পরীক্ষা দুইরকমের করিতে হয়। নিত্য কাজে আকার দেখা পরীক্ষা হইতে থাকে। তাই আমরা চোখের দোষ বলিতে কেবল দৃষ্টিশক্তির অল্পতা বুঝি। যাদের কাজে জিনিষের রঙ্ দেখা আবশ্যক হয়, তাদের চোখের দ্বিতীয় পরীক্ষা হয়।

দৃষ্টবস্তুর সকল অবয়ব স্পষ্ট দেখিতে পাইলে আমরা বলি চোখ তীক্ষ্ণ। এই হিসাবে নিকটদৃষ্টি যুবকের চোখ তীক্ষ্ণ। চোখের কাছের জিনিষ সে বেশ দেখিতে পায়; এমন কি, যার চোখ ভাল, তার অপেক্ষাও সে ভাল দেখে। জিনিষ দূরে থাকিলেই তার বিপদ্। তেমনই যে দূরদৃষ্টি, সে চোখের দূরের জিনিষ বেশ দেখিতে পায়, জিনিষ কাছে থাকিলেই তার বিপদ্। যার চক্ষু স্বাভাবিক, সে দূরের জিনিষ যেমন স্পষ্ট দেখে, নিকটের জিনিষও তেমনই স্পষ্ট দেখে।

এরূপ চোখের শক্তিরও একটা সীমা আছে। সে সীমা দূরের জিনিষে নয়, কাছের জিনিষে। সে চোখে অসীম দূরের আকাশের তারা আলোকবিন্দু অপেক্ষা বড় দেখায় না। ইহাতেই সে চোখের তীক্ষ্ণতা। তারাগুলা বড় বটে, কিন্তু অসীম দূরে আছে বলিয়া

জ্যোতিঃকণা বই বড় দেখায় না। ভাল দূরবীণের পরীক্ষাও তাই। যে দূরবীণে তারার বিম্ব দেখায়, তাহা ভাল নয়। স্বাভাবিক চক্ষু অসীম দূরের জিনিষ দেখিতে পায়, কিন্তু খুব কাছের জিনিষ পায় না। অর্থাৎ চোখে লাগাইয়া কোন জিনিষই দেখিতে পাওয়া যায় না। চোখ হইতে অন্তত পাঁচ-ছয়-ইঞ্চি দূরে না ধরিলে ভাল চোখে জিনিষ স্পষ্ট দেখিতে পায় না। ইহাই ভাল চোখের নিকটসীমা।

নিকটদৃষ্টি চোখের নিকটসীমা আরও কাছে। চোখ হইতে দুই-তিন-ইঞ্চি দূরে বই ধরিয়া পড়িতে পারা যায়। তেমনই সে চোখের দূরসীমাও কাছে, পাঁচ সাত কি আট দশ ইঞ্চির বেশী নয়। যদি বই পড়িতে হয়, ইহারই মধ্যে বহি ধরিতে হইবে। যদি মানুষের মুখের অবয়ব দেখিতে হয়, ইহারই মধ্যে দেখিতে হইবে।

দূরদৃষ্টি চোখের নিকটসীমা কিছু দূরে, হয় ত দশ-বার-ইঞ্চি, হয় ত কুড়ি-বাইশ-ইঞ্চি। কিন্তু দূরসীমা অনন্ত। চালিশ্যার চোখও এইরকম। পড়িতে গেলে বই দূরে ধরিতে হয়।

যদি হতভাগ্যের তুলনা করিতে হয়, তাহা হইলে নিকটদৃষ্টিই বেশী হতভাগ্য। স্বাভাবিক দৃষ্টির সীমা পাঁচ-ছয় ইঞ্চি হইতে অনন্ত। দূর-দৃষ্টির সীমা কুড়ি-বাইশ ইঞ্চি হইতে অনন্ত। কিন্তু নিকটদৃষ্টির সীমা দুই-তিন-ইঞ্চি হইতে সাত-আট-ইঞ্চি মাত্র! ইহার তুল্য হতভাগ্য কে আছে? অজ্ঞান যুবক জানে না, তাই চোখে চশমা দিয়া স্বচ্ছন্দমনে বেড়াইতে পারে। দূরের দীপশিখা, আকাশের তারা হতভাগ্যের চোখে আলোর ফোঁটা বোধ হয়। সাধ্য কি, সে কৃত্তিকার তারা গণে, বশিষ্ঠ হইতে অরুন্ধতী পৃথক্ দেখে।

বাস্তবিক কৃত্তিকার তারা গণিয়া দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা মাপিতে পারা যায়। অনেক চোখে কৃত্তিকায় সাতটি তারা দেখে, কোন কোন চোখে আট দশ এগার চৌদ্দ পর্য্যন্ত দেখে। ছয়টি গণিতে পারিলে মন্দের ভাল। একটিও না পারিলে? নিকটদৃষ্টি চোখে এই-রকম। তেমনই যে চোখে অরুন্ধতী দেখা যায় না, সে চোখও গত।* কৃত্তিকায় সাতটি তারা কিংবা বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী পৃথক্ দেখিতে পাইলেই চোখ তীক্ষ্ণ বলা যায় না। বলা যায়, চোখ যায় নাই, আছে। এই হিসাবে প্রাচীনদিগের এই তারাপরীক্ষা ঠিক। আকাশ মেঘে কিংবা ধূলিতে আচ্ছন্ন হইলে তারাপরীক্ষা অবশ্য ঠিক হইবে না।

বস্তুত একই রকমের দুইটি জিনিষ কাছে কাছে থাকিলে সে দুইটি পৃথক্ দেখা কঠিন হয়। দুইটি জিনিষ যত দুইরকমের হয়, পৃথক্ দেখাও তত সোজা হয়। নীল আকাশে উজ্জ্বল শাদা তারা দেখা সোজা কথা। চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় ছোট তারা অদৃশ্য হয়, সূর্য্যের

* কৃত্তিকাতারাপুঞ্জকে কোথাও কোথাও সাতভেয়ে বলে। বৈশাখমাসে রাত্রি-আরম্ভে কৃত্তিকা আকাশের পশ্চিমে দেখা যায়। সপ্তর্ষি সে সময়ে আমাদের মাথার উপরে থাকে। সাতটি তারা খড়্গের আকারে সাজান। তন্মধ্যে খড়্গের মুঠির প্রান্ত হইতে দ্বিতীয় তারা বশিষ্ঠ। অরুন্ধতী চারি-পাঁচ-(?)-আঙুল দূরে। প্রাচীন আরবীয়েরাও অরুন্ধতীদ্বারা চক্ষুর পরীক্ষা জানিত। দুই বস্তুর মধ্যে এক-কলা অন্তর না থাকিলে উহাদিগকে পৃথক্ দেখিতে পাওয়া যায় না। বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর মধ্যে চৌদ্দ-কলা অন্তর।

আলোকে সব তারাই অদৃশ্য হয়। কখন-কখন দিনের বেলা শুক্রগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু আকাশের কোন্ জায়গায় আছে, তাহা না জানিলে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হয়।

ভাল চোখে কত দূরের জিনিষ দেখিয়া চিনিতে পারা যায়? জিনিষটা আছে কি না, দেখিয়া তাহা ঠিক করা, আর সেটা কি জিনিষ, তাহা ঠিক করা এক কথা নয়। কি জিনিষ, তাহা ঠিক করিতে পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা ও মনের অন্যান্য অনেক ব্যাপার আবশ্যক। 'দূরে বহি ধরিয়া পড়িতে পারাতেও এইরূপ ব্যাপার আসে। তথাপি লেখা পড়িয়া চোখের তীক্ষ্ণতা মোটা-মুটি মাপিতে পারা যায়।

একটা কলম চোখের সমুখে ধরিলে কলম-টির দুই প্রান্ত হইতে দুই রেখা চোখে গিয়া মিলিত হয়। এই দুই রেখার মধ্যে যে কোণ হয়, তাহাকে দৃষ্টি-কোণ বলা যায়। দেখা যায়, কলমটি যতই দূরে ধরি, দৃষ্টি-কোণও তত ছোট হয়। বহুদূরে লইলে দৃষ্টি-কোণ এত ছোট হয় যে, কলম আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কলম যত-ইঞ্চি লম্বা, তাহার প্রায় সাত-শতগুণ দূরে লইলে দৃষ্টি-কোণ পাঁচকলামাত্র হয়। ভাল চোখে অত দূরের কলম বেশ দেখিতে পায়। এমন কি, একহাজারগুণ দূরে লইলেও কোন কোন চোখে দেখিতে পায়। তখন দৃষ্টি-কোণ প্রায় তিন-কলা হয়। চোখের কিন্তু এত তীক্ষ্ণতা সাধারণ নহে। মোটের উপর যে চোখে পাঁচকলা দৃষ্টি-কোণে দেখিতে পায়, তাহা ভাল বলিতে পারা যায়। দৃষ্টি-কোণ পাঁচকলায় বেশী আবশ্যক হইলে চোখ ভাল নহে। এই 'বঙ্গদর্শন' যে অক্ষরে ছাপা হয়, সে অক্ষর ৪॥০ ফিট্ দূর হইতে পড়িতে না পারিলে চোখ ভাল নহে।

এখানকার কলেজের ও ইস্কুলের অনেক যুবক ও বালকের চোখের তীক্ষ্ণতা ঐ-রকম এক উপায়ে মাপা গিয়াছিল। এখানে পরীক্ষার ফল দেওয়া যাইতেছে। ইস্কুলের প্রথমশ্রেণীর বালকদের চোখ পরীক্ষা করা হয় নাই। অন্যান্য শ্রেণীর বালকেরা ৮।১০ হইতে ১৫।১৬ বছরের ছিল। এইরূপ ১৯০জন ছেলের মধ্যে ১৮জন ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই। অর্থাৎ শতকরা ৯।১০জনের চোখ ভাল নহে। তাহারা নিকটদৃষ্টি।

কিন্তু কলেজের ছেলেদের মধ্যে নিকটদৃষ্টির সংখ্যা অনেক বেশী। ৬৪জনের মধ্যে ১৯জন নিকটদৃষ্টি, অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৩০জন। এই ১৯জনের মধ্যে ৯জন এত নিকটদৃষ্টি যে, তাহারা চশমা লাগাইবার যোগ্য হইয়াছে। দুইচারিজন চশমা ধরিয়াছে। এত অল্প ছেলে লইয়া গড়পড়তা করা ঠিক নহে। তথাপি দেখা যাইতেছে, ইস্কুলে যত, কলেজে তার অন্তত দুইগুণ ছেলে নিকটদৃষ্টি! বলা আবশ্যক, কলিকাতার 'সভ্যতা' এখানে এখনও সম্পূর্ণ পৌছে নাই, এবং কলিকাতায় এখনও বিলাতের তুল্য শিক্ষাবিস্তার হয় নাই।

যে সকল ছেলের চোখ পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহাদের কতক ওড়িয়া, কতক বাঙালী। বড় আশ্চর্য্যের কথা, ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে নিকটদৃষ্টি ওড়িয়া-ছেলে যত আছে, বাঙালী-ছেলে তত নাই। কিন্তু কলেজে ওড়িয়া ও বাঙালী ছেলে প্রায় সমান দাঁড়াই-য়াছে। বরং বাঙালী-ছেলে কিছু বেশী হইয়াছে।

বিলাতের তুলনায় আমাদের দেশের ছেলেদের চোখ ভাল। লণ্ডনের ইস্কুলের ৮ হইতে ১০ বছরের ছেলেমেয়ের মধ্যে শতকরা ৬০জনের চোখের দোষ আছে। মোটের উপর বিলাতে নাকি শতকরা ৩৯জনের চোখ খারাপ—পাঁচকলা দৃষ্টি-কোণে দেখিতে পায় না।

বিলাতের তুলনায় এ দেশ এখনও ভাল বটে, কিন্তু এদেশেও আশঙ্কার কারণ আছে। ইস্কুলের চেয়ে কলেজে নিকটদৃষ্টির সংখ্যা বেশী কেন? একটা কারণ সহজে মনে হয়। কলেজের ছেলে বেশী পড়িয়াছে, ছোট ছোট অক্ষর বেশী দেখিয়াছে। অনেক ছেলে হয় ক্ষীণ আলোতে, না হয় কেরোসীনের প্রচণ্ড তাপ ও আলোতে পড়ে। প্রখর আলোতে পড়িতে পড়িতে চোখ ক্ষরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। কেহ কেহ ঝুঁকিয়া-পড়িয়া পড়িতে থাকে, মাথায়-চোঁখে রক্ত যায়। কলেজের কোন কোন যুবক দিনকে রা'ত এবং রা'তকে দিন করে। দিনের বেলা ঘুমাইয়া গল্প করিয়া কাটায়, রা'ত হইলে শোধ তোলে। কেহ কেহ বিছানায় শুইয়া পড়ে। এইরূপ নানা কারণে যে চোখ খারাপ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বাভাবিক অবস্থার যোগ্য হইয়া আমাদের চোখ সৃষ্ট হইয়াছে। অস্বাভাবিক অবস্থার যোগ্য হয় নাই। অবিরত এক রঙের ছোট ছোট অক্ষর দেখা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক। সৌভাগ্যের বিষয়, নাগরী-বাঙ্‌লা প্রভৃতির ছাপার অক্ষর খুব ছোট করিবার জো নাই। কিন্তু যুক্তাক্ষরের বাহুল্যে ফলে ছোট অক্ষরই দাঁড়াইয়াছে। দুইটা অক্ষর, তিনটা অক্ষর যুক্ত হইলে একএকটা অক্ষর অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। তত্ত ক্ষুদ্র অক্ষরের প্রত্যেক অংশ না দেখিলে পড়িতে পারা যায় না। ওড়িয়া, তেলুগু, তামিল, ফার্সী, যুক্তাক্ষরের একএকটি অক্ষর এত ছোট হয় যে, জানিলেও চোখকে বিলক্ষণ পীড়ন করিতে হয়। ইংরাজী ছাপার অক্ষরের পরিমাণ আমাদের আদর্শ হইতে পারে না। ইংরাজীতে যুক্তাক্ষর নাই। সব অক্ষর পৃথক্ পৃথক্ ছাপিতে হয়। যদি চোখের প্রতি মায়া থাকে, তাহা হইলে ছোট অক্ষর ত্যাগ করিতে হইবে। কোন কোন গ্রন্থপ্রকাশক বহির দাম সস্তা করিতে গিয়া পাঠককে সস্তার তিন অবস্থায় ফেলেন। অক্ষর ছোট, কাগজ পাতলা, কালী ফিঁকা, ছাপা ভাঙা ইত্যাদি নানা দোষ সস্তার বহিতে দেখা যায়। এ বিষয়ে মাহ্‌নের বহি চিরবিখ্যাত। শাদা চক্‌চকে কাগজে, চক্‌চকে কালীতে ছাপা বহিও চোখের অনিষ্ট করে। সেকালে হলদে কাগজে পুঁথী লেখা হইত। বেশ ব্যবস্থা ছিল। হাতের তৈয়ারী কাগজ ছিঁড়িতে জানিত না, হরিতালের গুণে পোকা লাগিত না, কজ্জলের গুণে দেশী কালী হলদে কাগজে বেশ মানাইত, কখনও ফিঁকা হইত না। অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি। কেবল ধোয়াতে নহে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রখর আলোতেও মলিনত্বং ন মুঞ্চতি। দেশী কালীর এই মস্ত গুণ। তার উপর অক্ষর গোটা-গোটা, পড়িতে কোন কষ্ট নাই। বাঙ্‌লাদেশে প্রচলিত অধিকাংশ বাঙ্‌লা ছাপার অক্ষর সরু। ইহা অপেক্ষা খ্রীষ্টানী ছাপাখানার অক্ষর মোটা ও দেখিতে সুন্দর। যাঁহারা বালকবালিকার পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করেন, পুস্তকের ছাপার দিকে মনোযোগ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

বাঙ্‌লায় কতকগুলি ছেলেভুলান হাসি-

তামাসার বহি হইয়াছে। অনেকে এই সকল বহির খুব প্রশংসাও করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এই প্রশংসার কোন হেতু পাই না। আমার অল্পবুদ্ধিতে এবং প্রচুর ধৃষ্টতায় বলিতে হইতেছে, এই সকল ছেলে-ভুলান বহি ছেলে-ভুলানই হইয়াছে, শিক্ষার সোপান হয় নাই। অধিকাংশের মধ্যে মাথামুণ্ড কোন আদর্শ পাই না। কতকগুলা রঙ্-বেরঙের চিত্র ছাপাইলেই যদি শিশুশিক্ষা সহজে হইতে পারিত, তাহা হইলে কেবল পট ছাপাইলেও চলিত। উপস্থিত প্রসঙ্গে বিশেষ আপত্তি, বহির লেখা সাজানতে, নানা রঙের কালীতে। শাদার উল্টা কাল বলিয়াই জানি। এই সকল বহিতে শাদার উল্টা নীল, সবুজ, হলদে, বেগুনে,* প্রায় সব রঙই দেখিতে পাই।

বাস্তবিক বর্ণজ্ঞানসম্বন্ধে আমরা উন্নতি করিতে পারি নাই। কএকবৎসর পূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে লিখিয়াছিলাম, অনেক লোক সবুজ, নীল ও কাল রঙের প্রভেদ বুঝিতে পারে না। আমার মনে হয়, ইহারই ফলে কৃষ্ণবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের গাত্রবর্ণ নীল, এবং মহিষমর্দিনীর প্রতিমার অসুরের গাত্রবর্ণ হরিৎ হইয়াছে, কৃষ্ণবর্ণ শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণের উপমা নবদূর্বাদলে দেখিতে হইয়াছে। চোখে বর্ণজ্ঞানের অভাব এই সব দৃষ্টান্তের মূল। চোখে বর্ণজ্ঞান মানুষের সৃষ্টি হইতেই হয় নাই। বর্ণজ্ঞানের ক্রমবিকাশ হইয়াছে। প্রমাণ, শিশুর বর্ণজ্ঞানের বিকাশে স্পষ্ট পাওয়া যায়। বর্ণজ্ঞান ও স্বরজ্ঞান প্রায় একই রকমের। কাহারও প্রকৃতিদত্ত স্বরজ্ঞান থাকে। সে অক্লেশে গান গাইতে শিখে। কেহ বা বহুকাল গর্দ্দভ-চীৎকার করিয়াও কানে স্বরের প্রভেদ ধরিতে পারে না। এরূপ বৈষম্য আছে এবং থাকিবে। প্রকৃতির দান মুক্তহস্তে নহে, সাধারণে সমান নহে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলেই হউক, আর সৃষ্টির নির্বাচন-সার অভিব্যক্তিতেই হউক, শেষ ফল একই। এইজন্য দেখা গিয়াছে, যে চিত্রকলাশালায় চিত্র আঁকিতে রঙ্ ফলাইতে শিখিয়াছে, সেও অতর্কিতভাবে সবুজকে নীল এবং নীলকে সবুজ মনে করিয়াছে। তথাপি শিক্ষাদ্বারা সারিগামা স্বর-জ্ঞান জন্মিতে পারে, বর্ণজ্ঞানও পারে।

এখানকার কলেজের যুবকদের বর্ণজ্ঞান পরীক্ষা করা গিয়াছিল। নানা রঙের উর্ণার গুছি লইয়া এই পরীক্ষা করা গিয়াছিল। ফল দেখিয়া আশ্চর্য্যবোধ হইয়াছে। ৬৯জনের মধ্যে দুই জন লাল-সবুজ-বর্ণান্ধ, ৩১জন ঈষৎ সবুজ ও ঈষৎ নীলের হঠাৎ প্রভেদ বুঝিতে অক্ষম। শেষোক্ত দলে ওড়িয়া-ছেলে বেশী।†

যার চোখ ভাল, তার কাছে আ-হরিৎ ও আ-নীল বর্ণে অনেক প্রভেদ। সেতার বাজানায় কলাবৎ যেমন রাগিণীবিশেষে মধ্যম সুরের একটু উচুনীচুতে কানে শূলবেদনা অনুভব করে, তেমনই যার বর্ণজ্ঞান আছে, সে আ-হরিৎ ও আ-নীলের মধ্যে মস্ত প্রভেদ দেখে।

যাহা হউক, এই পরীক্ষার পূর্ব্বে আমার মনে হয় নাই যে, আমাদের দেশেও বর্ণান্ধ লোক অন্তত শতকরা দুইজন হইবে। লাল-সবুজ-বর্ণান্ধের চোখে লাল ও সবুজ একই-রকম দেখায়। কেহ কেহ গাঢ় লাল ও গাঢ় সবুজ পৃথক্ করিতে পারে। কিন্তু ঈষৎ লাল ও

* হলদে, বেগুনে, চক্‌চকে, চালিশা ইত্যাকার বানানের আমরা পক্ষপাতী নহি।—বং সং।

† বিলাতে শতকরা ৪।৫জন লাল-সবুজ-বর্ণান্ধ। নীল-সবুজ-বর্ণান্ধ লোকও আছে, কিন্তু সংখ্যায় প্রায় ঐরূপ।

ঈষৎ সবুজ হইলেই মুস্কিলে পড়ে। যাহার বর্ণজ্ঞান স্বভাবত প্রখর, তাহাকে ভাবিতে হয় না, দেখিবামাত্র ঈষৎ লাল, ঈষৎ সবুজ, ঈষৎ নীল ইত্যাদি পৃথক্ করে, এবং পৃথক্ পৃথক্ নামও বলে।

বর্ণজ্ঞানের অভাবে সংসারের কাজকর্মে বড় একটা অসুবিধা হয় না। তাই বর্ণসম্বন্ধে কার চোখ ভাল, কার চোখ মন্দ, তাহা জানিবার সুযোগ হয় না। যারা চিত্রকলা শিখিতে চায় কিংবা রঙ্ লইয়া কাজ করিতে চায়, তাদের বর্ণজ্ঞান না থাকিলে চলে না। রসায়নশিক্ষার্থী এক যুবককে লইয়া একবার বড় মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছিল। কোন কোন দ্রব্য-বিনিশ্চয়ের নিমিত্ত বর্ণ তুলনা করিতে হয়। সে যুবক যে উপায়ে দ্রব্যবিনিশ্চয় করিতেছিল, তাহাতে সে দ্রব্যের রঙ্ ঈষৎ লাল হইবার কথা। কিন্তু তার চোখে সবুজ দেখাইতেছিল। আমি দেখিলাম স্পষ্ট লাল, তবু সে বলে সবুজ! শেষে মনে হইল, সে হয় ত লাল-সবুজ-বর্ণান্ধ। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, বাস্তবিক তাই। অতএব বর্ণজ্ঞানের অভাবে এক দেখিতে আর এক দেখিয়া বিপদ্ ঘটিতে পারে। কোকিলের স্বর পঞ্চম কি ধৈবত, তাহা না বুঝিলে হয় ত কবি ব্যতীত অন্যের চিত্তবিকার না ঘটিতে পারে, কিন্তু লাল কি সবুজ, ইহা না বুঝিতে পারিলে নদীতে জাহাজে-জাহাজে, রেলে গাড়ীতে-গাড়ীতে সংঘর্ষণ ঘটিতে পারে। বস্তুত চোখের তুল্য পরমসহায় আমাদের আর কোন্ ইন্দ্রিয় আছে?

অথচ আমরা চোখ লইয়া খেলা করি। কি করিয়া চোখকে ভাল রাখিতে পারা যায়, তাহা আমরা ভাবি না। খারাপ হইলে দৌড়িয়া-গিয়া চশমা কিনিয়া নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু হাজার চশমা আঁটি, চোখ গেলে আর পাই না। আধুনিক বিজ্ঞান চশমা গড়িতে পারে, দূরবীণ গড়িতে পারে। কিন্তু চশমা দিয়া কিংবা দূরবীণ দিয়া খারাপ চোখ ভাল চোখের তুল্য করিতে পারে না। এ কথা সকলেই জানে, তবু অল্প লোকেই চোখের তরে চিন্তিত হয়। এই কারণেই সেকরা, ঘড়ীওয়ালা, ঔষধ-বিক্রেতা, এমন কি ফেরীওয়ালাও চশমা লইয়া দোকান সাজাইয়া বসিতে সাহস পায়। কেহ কেহ এমন মূর্খ আছে, ঘড়ী সোনার না হইলে ভাল নয় মনে করে। তেমনই সোনার চশমা চোখে দিয়া মনে করে, চোখের যথোচিত যত্ন করা হইল। সেকরা সোনার ডাঁটি গড়িয়া দিতে পারে, কিন্তু সে কি চশমা ঠিক করিয়া দিতে পারে? চশমার মধ্যস্থল চোখের তারার সম্মুখে থাকা চাই। সে কি তাহা জানে? সাধারণ চশমাওয়ালাই কি এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখে? অনেকের চশমার এই দোষ দেখা যায়। যাদের চালিশ্যা ধরিয়াছে, তাদের কথা কিছু স্বতন্ত্র। যে চশমা দিয়া তারা ভাল দেখিতে পায়, সে চশমা তাদের ঠিক। কিন্তু কতজন বলিতে পারে, ভাল দেখিতেছে কি না? কথাটা শুনিতে নূতন ঠেকে, তথাপি পুনঃপুন দেখা গিয়াছে, অধিকাংশ লোকে জানে না, তাদের চোখের দোষ আছে কি না; জানে না, চোখে চশমা ঠিক হইয়াছে কি না। এ বিষয়ে শিক্ষা-অশিক্ষা, উচ্চশিক্ষা-নিম্নশিক্ষায় কোন প্রভেদ প্রায় দেখা যায় না। চশমা ত চশমা, যা-তা একটা লাগাইলে হইল। চশমা দিয়াও যদি দেখিতে না পায়, চশমা দিলে যদি মাথা ধরে, চোখ দিয়া জল পড়ে, চোখ ব্যথা করে,

তবেই জানে চশমা ঠিক হয় নাই, বদলান দরকার।

কেহ বলে, আমার চোখ খারাপ হইয়াছে, আমি ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা পড়িতে পারি না। কেহ বলে, রাত্রে লেখাপড়া করা দায় হইল, অক্ষর দেখিতে পাই না। অমনই চশমার দোকানে উপস্থিত! চক্ষুপরীক্ষা এমনই সোজা! চোখের কিরকম দোষে চশমা দেওয়া কর্ত্তব্য, কিরকম দোষে না দেওয়া কর্ত্তব্য, কেবল তাহা চক্ষুরোগ অভিজ্ঞ বিচক্ষণ চিকিৎসক বলিতে পারেন। বিচক্ষণ চিকিৎসকের উপদেশ না লইয়া চশমা দিয়া চোখের সঙ্গে খেলা করিলে চোখের বিলক্ষণ অহিত হইতে পারে। আমার নিজের অবস্থা বলি। দূরের জিনিষ দেখিতে পাই না; এজন্য কলিকাতার চশমার বড় এক দোকানে চশমা কিনিতে যাই। দোকানে একজন অনেক চশমা লইয়া একে-একে পরিতে বলিল। একজোড়া চোখে দিতে দূরের গাছপালা বেশ দেখিতে পাইলাম। বিক্রেতা সেই জোড়া আমার চোখে ঠিক হইয়াছে বলিয়া দাম লইয়া বিদায় করিল। চোখের সঙ্গে এই প্রথম পরীক্ষা। ফলে দুই-বৎসরের মধ্যেই বুঝিলাম, আগের চেয়ে চোখ খারাপ হইয়াছে। তখন ভয় হইল, দোকানদারের কাছে না গিয়া চক্ষুচিকিৎসকের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি অবস্থা দেখিয়া চশমা ফেলিয়া দিয়া পড়াশুনা কিছুদিনের তরে বন্ধ করিতে আদেশ করিলেন। অতএব চোখে দেখিতে অসুবিধাবোধ করিলেই চশমা দিতে হইবে, কিংবা চশমা না দিলে চোখ ভাল হইবে, এমন কোন কথা নাই।

যাহা হউক, আমি বুঝিয়াছিলাম, সেই প্রথম চশমা-বিক্রেতা আলস্যবশতই হউক, কি অজ্ঞানতাবশতই হউক, আমার চোখের পরকাল খাইয়াছে। যে নম্বরের চশমা দিলে চোখ থাকিত, তাহা না দিয়া বেশী নম্বরের দিয়াছি।

বস্তুত বিক্রেতার জ্ঞান কিংবা ধর্ম্মজ্ঞানের ভরসায় চোখ ছাড়িয়া দেওয়া মূর্খতা। বিক্রেতা নহে, প্রবীণ বিচক্ষণ চিকিৎসক একমাত্র সহায়। দৃষ্টিশক্তির সহিত শরীরের নানা অঙ্গের সম্বন্ধ আছে। অনভিজ্ঞ বিক্রেতা এ কথা জানিতে পারে না। কোন কোন বিক্রেতা চশমার নম্বরই জানে না, কেহ কেহ বলিতে চায় না। উদ্দেশ্য কি? পাছে হতভাগ্য পরে সে দোকানে না আসিয়া অন্য দোকানে চশমা কেনে,—মূলে এই আশঙ্কা বলিয়া বোধ হয়। *

চোখ ভাল রাখিবার উপায় কি? চালিশ্যা বন্ধ করিবার উপায় নাই। কিন্তু বালকের ও

* চশমার নম্বরের ভিতরে একটা ভয়ানক ব্যাপারও নাই। দূরদৃষ্টির ও চালিশ্যার চশমার মাঝখান পুরু। এই চশমা রোদে সূর্য্যের দিকে ধরিলে বিপরীত দিকে এক আলোকবিন্দু দেখা যায়। চশমা হইতে এই আলোকবিন্দুর অন্তর সম্পাতান্তর। যে চশমার সম্পাতান্তর ৪০ইঞ্চ, তার নম্বর ১; যার ২০ইঞ্চ, তার নম্বর ২; যার নম্বর ২॥, তার সম্পাতান্তর ১৬ইঞ্চ, ইত্যাদি। অর্থাৎ ৪০ইঞ্চ ÷ সম্পাতান্তর = নম্বর। চালিশ্যার চশমার নম্বর প্রায়ই ২ কি ২॥ হইতে দেখা যায়। নিকটদৃষ্টির চশমার মাঝখান পাতলা,—চালিশ্যার চশমার ঠিক বিপরীত। এরূপ চশমা রোদে ধরিলে আলোকবিন্দু পাওয়া যায় না। কিন্তু কৌশলক্রমে সম্পাতান্তর মাপিতে পারা যায়। তখন নম্বরও জানা যায়। এই দুইরকম চশমা পৃথক্ বুঝাইতে মাঝখান-পুরু চশমার নম্বরের আগে ধনচিহ্ন (+) এবং মাঝখান-পাতলা চশমার নম্বরের আগে ঋণচিহ্ন (−) দেওয়া হয়। যে চোখে—১, কি—২ নম্বরের চশমা লাগে, সে চোখ বেশী খারাপ নয়। নিকটদৃষ্টির চশমার নম্বর প্রায়ই —৫, ও — ৭ এর মধ্যে হইতে দেখা যায়। চালু চোখের চশমা আর একরকম। এক কথায় বলিবার নহে।

যুবার দূরদৃষ্টিতা ও নিকটদৃষ্টিতা অবহেলা করা উচিত নহে। বোধ হয়, এদেশে দূরদৃষ্টি বালক ও যুবার সংখ্যা কম। বিলাতে নাকি খুব বেশী। যাহাতে চোখ্ নিকটদৃষ্টি না হয়, সে বিষয়ে বালকের অভিভাবকের ও ইস্কুলের অধ্যক্ষের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বালককে ছোট বাড়ীতে ছোট ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিলে সে নিকট-দৃষ্টি হইতে পারে। বালক হউক; যুবা হউক, তাহাকে বাড়ীতে ও ইস্কুলে মিশিয়া ৮ঘণ্টার বেশী পড়িতে দেওয়া উচিত নহে। সে প্রচুর ঘুমাইবে, ফাঁকা জায়গায় প্রচুর খেলা করিবে, তবে তাহার স্বাস্থ্য ও চোখ ভাল থাকিবে। দূরের জিনিষ দেখিবে, ছোট অক্ষর পড়িবে না, চোখকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে না দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়িবে না, যথেষ্ট আলো থাকিবে, কিন্তু আলো প্রখর হইবে না, টেবিল কিংবা ডেস্ক খুব উঁচু কিংবা খুব নীচু হইবে না, ইত্যাদি নানা বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। একই রকমের জিনিষ দেখিতে দেখিতে চোখের ক্লান্তি আসে। কেবল চোখ বুজিয়া থাকিলে চোখের বিশ্রাম হয়, এমন নহে। নানা রঙের জিনিষ দেখায় বিশ্রাম হয়, বর্ণজ্ঞান নষ্ট হয় না। প্রকৃতির শোভা দেখায় কেবল কি মনের আনন্দ হয়? চোখের আনন্দ হয়, ইহাতেই চোখের ক্লান্তি যায়। রাত্রিকালে তারা দেখিলে চোখের উপকার হয়। অত দূরে আর কোন জিনিষ নাই, অমন সুখকর আলোও কোন জিনিষের নাই। ত্রিসন্ধ্যা উপাসনাসময়ে সূর্য্যনিরীক্ষণের বিধি আছে। বোধ হয়, ইহা দ্বারা চক্ষু প্রখর-আলোক-সহ হয়। যদি কৃত্রিম উপায় করিতে হয়, এবং জনাকীর্ণ নগরে কৃত্রিম উপায় আবশ্যকও বটে, তাহা হইলে বাড়ীর ও ইস্কুলঘরের দেওয়ালে ভাল ভাল রঙিন পট রাখা আবশ্যক। আমরা ফুলবাগানের, পটের গুণ বুঝি না। তাই ইস্কুলে ইস্কুলে ফুলবাগান দেখি না, ইস্কুলঘরের দেওয়ালে পট রাখি না। সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে নাককে আমরা অনাবশ্যক মনে করি। তাই ফুলের সুবাস খুঁজি না, নাকের দ্বারাও যে আনন্দ উপভোগ করিতে পারা যায়, তাহা মনে করি না। ইস্কুলে নাম লিখাইবার সময় অধ্যক্ষমহাশয় বালকের নাড়ীনক্ষত্র সকল বিষয়েরই সংবাদ লইয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, বালকের শরীরের দুর্ব্বলতা, কণ্ঠস্বরের নিম্নতা, চক্ষুকর্ণের শক্তির খর্ব্বতা, জিহ্বার অসাড়তা, বক্ষের ক্ষীণতা ইত্যাদি দেহের ব্যাপার জানিবার ও দোষের প্রতিকার করিবার আবশ্যকতা অনুভূত হয় না। মাথায় বিদ্যার বোঝা চাপাইয়া কি ফল, যদি বোঝার ভারে বিকলাঙ্গ হইতে হয়, শরীর ভাঙিতে হয়?

কোন কবি বলিয়াছেন,

বিকাশয়তি লোচনে স্পৃশতি পাণিনা কুঞ্চিতে
বিদূরমবলোকয়ত্যতিসমীপসংস্থং পুনঃ।
বহিব্র্রজতি চাতপে স্মরতি নেত্রযুক্তিং পুনাম্
জরাপ্রমুখসংস্থিতঃ সমবলোকয়ন্ পুস্তকম্ ॥

জরা-আরম্ভে লোকে পুস্তক পাঠ করিবার সময় কুঞ্চিত লোচনদ্বয় বিকশিত করে, তবু দেখিতে পায় না। হাত দিয়া চক্ষু প্রসারিত করে, তাহাতেও দেখিতে পায় না। পুস্তক একবার দূরে ধরে, একবার অতিনিকটে ধরে, কিছুতেই পড়া যায় না। মনে করে, ঘরে আলো কম, তাই বাহিরে যায়। সেখানেও দেখা যায় না। তখন রোদে ধরে, কিন্তু যে

অবস্থা সেই অবস্থাই থাকে। অবশেষে সে চক্ষুর বৃত্তি স্মরণ করে।

জরাতে লোকের চক্ষুর দশা এমনই হয়। কখন-কখন চোখে ছানি পড়ে, স্বচ্ছ চক্ষু অস্বচ্ছ হয়। প্রায়ই চালিশ্যা ধরে। তখন মনে হয়, অক্ষরগুলা বড় বড় হয় নাই কেন। নিকটদৃষ্টির কাছে অক্ষর বড় ও ছোট সবই প্রায় সমান। তথাপি প্রকৃতি নিকটদৃষ্টি যুবককে বার্দ্ধক্যে কবিকথিত যন্ত্রণা দেন না। প্রতিচক্ষু নইলে চালিশ্যা-ধরার পড়া চলে না।* কিন্তু বার্দ্ধক্যে নিকটদৃষ্টির চশমা না থাকিলেও পড়িতে কষ্ট হয় না। *এই আশায় নিকট-দৃষ্টি যুবক সান্ত্বনা পাইতে পারে।* কিন্তু এই পর্য্যন্ত। কারণ, যে চোখ যৌবনেই গিয়াছে, তাহা বার্দ্ধক্যে আর আসিতে পারে না। আসে, নিকটদৃষ্টিতার উপর জরার লক্ষণ,—চালিশ্যা।, যৌবনে যত নিকটে বহি পড়িতে পারা যাইত, জরাতে সে শক্তিও যায়। যৌবনের দৃষ্টির দূরসীমা বার্দ্ধক্যে এক-মাত্র সীমা হয়। আর হয়, নিকটদৃষ্টি লোকের সন্তানদিগকে পিতার কর্ম্মফল ভোগ করিতে।

কটকা—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বারাণসী-অভিমুখে।

৭

প্রভাতমহিমা।

যে সমভূমির উপর দিয়া প্রাচীন গঙ্গা প্রবাহিতা, যে তৃণসঙ্কুল বিস্তীর্ণ কর্দ্দমভূমি নৈশ-বাষ্পে এখনও কুয়াসাচ্ছন্ন, সেই ভূমির সুদূর-প্রান্ত হইতে সেই অনাদিকালের পুরাতন সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। এইরূপ তিনসহস্র বৎসর হইতে প্রতিদিনই তিনি তাঁহার প্রথম পাটল-কিরণ বিকীর্ণ করিতেছেন, প্রতিদিনই বারাণসীর প্রস্তরস্তূপ, রক্তিম মন্দিরচূড়া, চূড়ার স্বর্ণময় অগ্রবিন্দুচয়—সমস্ত পুণ্যনগরী তাঁহার সেই প্রথম-আলোক আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবার জন্য ও প্রাভাতিক মহিমায় বিভূষিত হইবার জন্য, অর্দ্ধমণ্ডলাকারে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেছে।

,ইহাই এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত সময়;

---

* চশমা সঙ্গে না থাকিলেও চালিশ্যা-চোখে দুইএক ছত্র পড়িবার উপায় আছে। মোটা কাগজে—যেমন পোষ্টকার্ডে—সূচ দিয়া একটি ছিদ্র করিয়া সেই কাগজখানিকে চশমাস্বরূপ করিতে হয়। চোখের নিকটে ছিদ্র রাখিয়া দেখিলে অক্ষর বড় দেখায়। কাজেই পড়িতে পারা যায়। বোধ হয়, এ দেশে বহু পূর্ব্বকাল হইতে চালিশ্যার প্রতিচক্ষু নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে। সেকালে উহা দুর্মূল্য ছিল, পুত্রকে পিতা বিষয়সম্পত্তির সহিত প্রতিচক্ষুও অর্পণ করিয়া যাইতেন। যাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্য আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা প্রমাণসংগ্রহ করিলে সন্দেহ যায়।

ব্রাহ্মণ্যযুগের আরম্ভ হইতেই এই সময়টি অতীব পবিত্র,—পূজা-অর্চনার মুখ্যকাল। বারাণসী যেন সহসা এই সময়েই তাহার সমস্ত জনতা, তাহার সমস্ত কুসুমরাশি, তাহার সমস্ত পুষ্পমাল্য, তাহার সমস্ত পশুপক্ষী স্বকীয় নদীর বক্ষে ঢালিয়া দেয়।

দিবাকরের উদয়কালে যে-কেহ জাগ্রত হইয়াছে, কি মনুষ্য কি ইতরপ্রাণী, ব্রহ্মার জীবমাত্রই ঘাটের সিঁড়ি দিয়া আনন্দে নদীর উপর যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। পুরুষেরা নাবিতেছে;—তাহাদের মুখে প্রহৃষ্ট গম্ভীরভাব; গোলাপী কিংবা হলদে কিংবা লাল শালে গাত্র আচ্ছাদিত। শুভ্রবসনা স্ত্রীলোকেরা নাবিতেছে;—মল্‌মল্‌-বস্ত্রে তাহারা অবগুণ্ঠিত। তাহাদের মসৃণ তাম্রঘড়া ও ঘটির লোহিত কিংবা পীত আভা চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে এবং তাহারই পাশে তাহাদের অসংখ্য বলয়, কণ্ঠহার, রজতনূপুর ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। দিব্য সাজসজ্জা, দিব্য মুখশ্রী—তাহারা যেন নগর-দেবতার মত চলিয়াছে—তাহাদের বাহু ও চরণের বলয়নূপুরাদির মধুর নিক্কণ শুনা যাইতেছে।

প্রত্যেকেই, গঙ্গাদেবীকে পুষ্পমাল্যের উপহার,—কেবলই পুষ্পমাল্যের উপহার দিতেই ব্যস্ত,—পূর্ব্বপূর্ব্ব দিনের উপহারগুলি—যাহা এখনও জলে ভাসিতেছে—তাহাই যেন যথেষ্ট নহে। জুঁইফুলে-গাঁথা গোড়েমালা,—দেখিতে আমাদের মহিলাদের গলায় জড়াইবার পালক্‌-আচ্ছাদনের মত; অন্যান্য শাদা ফুলের মালায় সোনালি হলদে ও জাফ্রানি হলদে এমনভাবে মিশ্রিত, যাহাতে বিভিন্ন আভার বৈষম্য বেশ ফুটিয়া উঠে; ভারতরমণীরা তাহাদের ওড়্‌নাতেও এইরূপ রং মিলাইতে ভালবাসে।

গৃহপ্রাসাদাদির সমস্ত 'কার্নিস্‌'-ঝালরের উপর যে-সব পাখীর ঝাঁক দীর্ঘরজ্জুর মত সারি-সারি বসিয়া ঘুমাইতেছিল, তাহারা জাগিয়াছে—কলরবে ও গানে মাতিয়া উঠিয়াছে।

ঘুঘু ও অন্যান্য ক্ষুদ্রপক্ষী স্নানের জন্য, আত্মবিনোদনের জন্য দলে-দলে আসিয়া বিশ্বস্তভাবে এই সব ব্রাহ্মণদের মধ্যে রহিয়াছে; কেন না, জানে, উহারা কখন জীবহত্যা করে না। সমস্ত দেবতার উদ্দেশে প্রভাত-সঙ্গীত দেবালয় হইতে নিঃসৃত হইতেছে;—ঝঞ্ঝা-নাদের মত ঢাকঢোলের বাদ্য, শানাইয়ের কাঁদুনি, পবিত্র তূরীধ্বনি শুনা যাইতেছে। উপরে, সমস্ত জালি-কাটা বলভী, মাল্য-ঝালর ও ক্ষুদ্র স্তম্ভসমন্বিত সমস্ত গবাক্ষ, গৃহের সমস্ত ছাদ, বৃদ্ধদের মস্তকে আচ্ছন্ন—ইহারা সেই দর্শকবৃন্দ, যাহারা ব্যাধি কিংবা জরাপ্রযুক্ত নীচে নামিতে অশক্ত অথচ যাহারা এই প্রভাত-আলোকে ও পূজা-অর্চনায় যোগ দিতে অভিলাষী। সূর্য্যের অলক্ত রশ্মিতে উহারা পরিপ্লাবিত হইতেছে।

লোকের হস্তধারণ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল নগ্ন শিশুর দল আসিতেছে। যোগী ও অলসগতি সন্ন্যাসীরা নাবিতেছে। নিরীহ পবিত্র গাভীবৃন্দ নাবিতেছে—প্রত্যেকেই তাহাদিগকে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিতেছে এবং তাজা তৃণ ও পুষ্পরাশি তাহাদের সম্মুখে অর্পণ করিতেছে। এই মধুরপ্রকৃতি পশুরাও সূর্য্যের উদয়োৎসব দেখিতেছে এবং এই সময়ের মাহাত্ম্য যেন বুঝিয়াই তাহাদের নিজের ধরণে পূজার্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।

মেষ ও ছাগল নাবিতেছে। ব্যস্তভাবে কুকুর নাবিতেছে, বানর নাবিতেছে।

রাত্রির শিশিরে বাতাস যেন শীতে জমাট হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে সূর্য্য—সহস্রকিরণ সূর্য্য সেই বায়ুতে শুভ উত্তাপ আনয়ন করিল। কুলুঙ্গি কিংবা বেদীর আকারে ছোট-ছোট পাথরের গাঁথুনি, সোপানের ধাপে-ধাপে সজ্জিত—কোনটাতে বিষ্ণুর বিগ্রহ, কোনটাতে বহুবাহুবিশিষ্ট গণেশের বিগ্রহ। এই সকল বিগ্রহের গাত্র এখনও শুষ্ককর্দ্দমে লিপ্ত; এবং মনুষ্যভস্মে পরিবিক্ত হইয়া ইহারা অনেকমাস যাবৎ ক্রুদ্ধ নদীর জলগর্ভে নিদ্রিত ছিল। এক্ষণে ইহাদের উপর সূর্য্য-রশ্মি পতিত হইয়াছে। এখনও সূর্য্য জলন্ত কিরণ বর্ষণ করিতেছে, তাই লোকেরা বড় বড় ছাতার তলে আশ্রয় লইয়াছে। ছাতাগুলা মাটীতে পোঁতা—দেখিতে বিরাট্ ব্যাঙের ছাতার মত। পবিত্র নগরীর পাদদেশে এইরূপ রাশিরাশি ছাতা উদ্ঘাটিত। এদিকে উর্দ্ধ-দেশে, পুরাতন প্রাসাদগুলা প্রভাতসমাগমে যেন নবযৌবনে উৎফুল্ল হইয়া জাগিয়া উঠি-য়াছে। মন্দিরের লোহিত চূড়াসকল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, চূড়ার স্বর্ণময় অগ্র-ভাগ, স্বর্ণময় ত্রিশূল ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

অসংখ্য ডিঙির উপরে এবং নীচের সোপানধাপের উপরে, ভক্তেরা তাহাদের পুষ্পমাল্য ও ঘটি রাখিয়া কাপড় ছাড়িতে লাগিল। শাদা ও গোলাপী রঙের বস্ত্র, বিবিধ রঙের শাল ইতস্তত ফেলিতে লাগিল কিংবা বাঁশের উপর ঝুলাইয়া রাখিল। তখন তাহাদের দিব্য নগ্নকায় বাহির হইয়া পড়িল —ঘোর কিংবা ফিকা পিত্তলের রং। পুরু-ষেরা যেমন ছিপ্‌ছিপে, তেম্‌নি পালোয়ানি-ধরণে বলিষ্ঠ; তাহাদের চক্ষু অগ্নিময়। উহারা পূতজলে আকণ্ঠ প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকেরা ততটা ত্যক্তবস্ত্র নহে, তাহাদের বক্ষ ও কটি-দেশ একখানা কাপড়ে ঢাকা; তাহারা গঙ্গার জলে শুধু তাহাদের পা ভিজাইতেছে —বলয়াদিবিভূষিত বাহু ভিজাইতেছে। তাহার পর একেবারে নদীর কিনারায় গিয়া ও অবনত হইয়া তাহাদের আলুলিত দীর্ঘ-কেশ জলের উপর আছড়াইতেছে; বক্ষের উপর দিয়া, স্কন্ধের উপর দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে; তাহাতে করিয়া তাহাদের রহস্য-প্রকাশক সূক্ষ্ম বস্ত্রখানি গায়ে একেবারে আঁটিয়া ধরিয়াছে; ঠিক যেন "পক্ষহীন বিজয়-লক্ষ্মী"। নগ্নাবস্থা অপেক্ষা এ মূর্ত্তি আরও যেন সুন্দর, আরও যেন চিত্তচাঞ্চল্যকর।

গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া পূজার অঞ্জলি-স্বরূপ, গঙ্গার বক্ষে পুষ্পগুচ্ছ, পুষ্পমাল্য চারিদিক্ হইতে লোকে অজস্র নিক্ষেপ করিতেছে। ঘটি ভরিয়া, ঘড়া ভরিয়া জল লইতেছে; এবং প্রত্যেকে অঞ্জলি ভরিয়া জল উঠাইয়া পান করিতেছে।

এই সময়ে এইখানে ধর্ম্মভাবের এরূপ সর্ব্বগ্রাসী প্রভাব যে, এই সমস্ত রমণীর নগ্নতার মেশামিশি ও ঘেঁষাঘেঁষিতেও কোন কুচিন্তার উদ্রেক হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। পরস্পরকে কেহই তাকাইয়া দেখিতেছে না; দেখিতেছে শুধু নদীকে, সূর্য্যকে, আলোকের ও প্রভাতের মহিমাকে; সকলেই ভক্তিমুগ্ধ, সকলেই পূজায় মগ্ন।

স্নানের দীর্ঘ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে পর, রমণীরা শান্তভাবে জল হইতে উঠিয়া গৃহাভি-

মুখে চলিল; পুরুষেরা তাহাদের ডিঙির উপরে, তাহাদের পুষ্পমাল্য—তাহাদের দূর্ব্বা-গুচ্ছের মধ্যে থাকিয়া পূজার আয়োজন করিতে লাগিল।

আহা! এই অতীতের লোকদিগের দৈনন্দিন জাগরণ কি চমৎকার! প্রতিদিন তাহারা ভগবানের আরাধনার্থে একত্র মিলিত হয়। ভাস্বর আকাশের নীচে, জলের মধ্যে পুষ্পগুচ্ছ ও পুষ্পমাল্যের মধ্যে, একজন দীন-হীন সামান্যলোকেরও একটু স্থান আছে।... পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য যে আমরা,—লৌহধূমযুগের লোক যে আমরা—আমাদের জাগরণ ধূলিময়. মলিন পিপীলিকার হেয় জাগরণ! আমাদের দেশের নিবিড় ও শীতল মেঘরাশির নীচে অবস্থিত আমাদের জনসাধারণ, সুরা ও ঈশ্বর-নিন্দার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া প্রাণঘাতী কল্‌কার-খানার অভিমুখে ব্যস্তভাবে চলিয়াছে!...

জল হইতে উঠিয়া গৃহাভিমুখে যাইবার সময় রমণীরা তাহাদের শুভ্র ও বিচিত্রবর্ণের বস্ত্রাদি আবার ঠিক্‌ঠাক্‌ করিয়া পরিয়া লয়; এবং বিশাল প্রস্তরাদির সম্মুখে যখন তাহারা ঘাটের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে থাকে, তখন প্রাচীন গ্রীসের উৎকীর্ণ-চিত্রাবলী মনে পড়িয়া যায়। তাহাদের কেশপাশ হইতে এখনও জল গড়াইয়া পড়িতেছে; তাহাদের নিবিড় ও আর্দ্র কেশগুচ্ছ, তাহাদের মল্‌মল্‌বস্ত্রের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেকেরই স্কন্ধের উপর একটি-একটি উজ্জ্বল ধাতুময় কলস; এবং এক একটি নগ্নবাহু উর্দ্ধে উত্তোলন করিবার ইহাই উপলক্ষ্য।

পুরুষেরা সকলেই গঙ্গার উপরে রহিয়াছে; এবং যোগানন্দে নিমগ্ন হইবার পূর্ব্বে, আসন-পীঁড়ি হইয়া বসিয়া ধর্ম্মবিহিত সমস্ত প্রসাধন-কর্ম্ম সমাধা করিতেছে; শিবের সম্মানার্থ ভস্মরেখায় স্বকীয় পিত্তলবর্ণ গাত্র চিত্রিত করিতেছে এবং ললাটে ভীষণ শৈবচিহ্নের ছাপ রক্তচন্দনে অঙ্কিত করিতেছে।

সেই শ্মশানের কোণটিতে—যেখানে প্রভাত-আলোকে চতুষ্পার্শ্বস্থ চিতাধূমকালিম পাথর-গুলা দেখা যাইতেছে—সেখানে এখন কোন শবেরই দাহ হইতেছে না। কাপড় দিয়া ঢাকা দুইটা শব ঐখানে পড়িয়া রহিয়াছে; কিন্তু তাহাদের লইয়া কেহই ব্যাপৃত নহে। একটা শব চিতার উপর শয়ান; আর একটি শবের অগ্নিসম্মানের অনুষ্ঠান চলিতেছে; তাহারই পাশে সুন্দর বলিষ্ঠ জীবন্ত লোকেরা স্নান করিতেছে। ডিঙির উপর, ঘাটের নীচেকার সিঁড়ির উপর, পূজা—বিপুল জনতার ব্যাপক পূজা আরম্ভ হইয়াছে। এই সময়ে আর সমস্ত কার্য্যই স্থগিত, এমন কি, চিতাতেও এখন আগুন ধরান হইতেছে না—শবেরা অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে।

সকলেরই মুখে কি-এক অপূর্ব্ব অন্যমনস্ক-ভাব; মুখাবয়বসকল যেন জমাটবদ্ধ, চোখ যেন কিছুই আর দেখিতেছে না! যুবা-পুরুষেরা ধ্যানে মগ্ন, হস্তদ্বয় মুখের উপর সংলগ্ন—দুইটি জলন্ত চোখের তারা ছাড়া মুখের আর কিছুই দেখা যাইতেছে না—সে চোখের দৃষ্টি সংসারের পরপারে; জপ-মালায় আচ্ছাদিত সন্ন্যাসিগণ—যাহাদের আত্মা ক্ষণকালের জন্য হৃতচৈতন্য জড়শরীরকে ছাড়িয়া গিয়াছে; ধূসর ভস্মচূর্ণে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত বৃদ্ধগণ—সকলেরই সেই এক ভাব।...

একজন জলের ধারে বসিয়া পূজা-অর্চনা করিতেছে; শাদা-শাদা চোখ: শাক্যসিংহের মূর্ত্তির মত পদ্মাসনবদ্ধ হইয়া মৃগচর্ম্মের উপর আসীন; এই আসনটি সন্ন্যাসীদেরই বিশেষ আসন। দুই পা পরস্পরের উপর আড়াআড়িভাবে ন্যস্ত, জানু মাটি ছুঁইয়া রহিয়াছে; এবং বামহস্ত—দীর্ঘ অস্থিসার বামহস্ত—দক্ষিণপদ ধরিয়া রহিয়াছে। ইনি একজন বৃদ্ধ। ইঁহার পরিচ্ছদ গায়ে আঁটিয়া ধরিয়াছে—জল গড়াইয়া পড়িতেছে। পরিচ্ছদের রং ফিঁকা গোলাপী নারাঙ্গী—যেন উষার মেঘরাশি।

ইনি নিশ্চল হইয়া পূজা করিতেছেন; ইঁহার ললাটে শৈবচিহ্ন অঙ্কিত; চোখের তারা কাচের মত; ইঁহার সীসা-কালিম মুখ জলন্ত সূর্য্যের দিকে ফেরান রহিয়াছে—জলন্ত সূর্য্যের কিরণে মুখ ঝিকমিক করিতেছে। মুখে এক-প্রকার অপরিসীম আনন্দের ভাব। একজন নগ্নকায় পালোয়ানি-ধরণের বলিষ্ঠযুবক, তাঁহার রক্ষিপদে ব্রতী হইয়া, মধ্যে-মধ্যে এক-এক-অঞ্জলি গঙ্গাজল লইয়া সেই জলে তাঁহার অরুণবর্ণের পরিচ্ছদকে প্লাবিত করিতেছে; এবং সেই বৃদ্ধসন্ন্যাসীর সম্মুখে মৃগচর্ম্মের উপর যে সকল পুষ্পমালা রহিয়াছে, সেই সব পুষ্পমাল্যের মলক্ষালন করিবার জন্য তাহার উপর জল ছিটাইয়া দিতেছে—মৃগচর্ম্ম-সংলগ্ন মৃগের মস্তক ও শৃঙ্গ জলে ভিজিয়া যাইতেছে। বোধ হয়, তাঁহার ধ্যানকে ঘনাইয়া তুলিবার জন্য, তাঁহার সম্মুখে সামান্য-ধরণের পবিত্র সঙ্গীত চলিতেছে; আর একটু উপরে, দুইজন বালক দুইটা পাথরের নোড়ার উপর বসিয়া প্রফুল্লভাবে মুহুমুহু হাসিতেছে; উহাদের মধ্যে একটি বালক, ভোঁ-ভোঁ-শব্দে শঙ্খ-নাদ করিতেছে; আর একটি, ডুগি বাজাই-তেছে; ইহা হইতে একপ্রকার চাপাশব্দ নির্গত হইতেছে। চারিধারে কাকেরা ইতস্তত বসিয়া আছে—মনোযোগসহকারে সন্ন্যাসীকে নিরীক্ষণ করিতেছে। যাহারা গৃহাভিমুখে চলিয়াছে—কি রমণী, কি বালক—তাহারা সকলেই আবার পথ হইতে ফিরিয়া এই সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিতেছে। নীরবে শুধু একটু সস্মিত অভিবাদন করিয়া, জোড়হস্তে শুধু প্রণাম করিয়া তাহারা সন্তর্পণে চলিয়া যাইতেছে—পাছে সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হয়—পূজার ব্যাঘাত হয়। রহস্যময় প্রাসাদ-অঞ্চল পর্য্যন্ত গমন করিয়া আমার নৌকা আবার ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিতে একঘণ্টা বিলম্ব হইল। ফিরিয়া-আসিয়া দেখি, সেই বৃদ্ধটি সেইখানেই রহিয়াছে। দীর্ঘনখবিশিষ্ট হস্তের দ্বারা স্বকীয় শীর্ণপদ ধরিয়া রহিয়াছে; তাহার দৃষ্টি সেইরূপ স্থির—আকাশের দিকে, জলন্ত সূর্য্যের দিকে নেত্র উন্মীলিত রহিয়াছে, তবু সেই খোলা-চোখ ঝলসিয়া যাইতেছে না। আমি বলিলাম—"বৃদ্ধটি কেমন স্থির হইয়া রহিয়াছে!"...মাজি আমার দিকে তাকাইল এবং কোন অবোধ শিশুর নিতান্ত সরল উক্তি শুনিয়া লোকে যেমন করিয়া থাকে—সেইরূপ আমার দিকে চাহিয়া সে একটু মৃদুহাস্য করিল। —"ঐ লোকের কথা বল্‌চেন?...কিন্তু...ও যে মৃত!"

কি! ও লোকটা মৃত!...আসল কথা,—আমি লক্ষ্য করি নাই, বালিশের উপর মাথা আট্‌কাইয়া রাখিবার জন্য, থুতির নীচে দিয়া

একটা চর্ম্মবন্ধনী গিয়াছে। আমি ইহাও লক্ষ্য করি নাই,—একটা কাক মুখের চারিধারে ও মুখের খুব কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; যে বলিষ্ঠকায় যুবকটি তাহার গেরুয়ারঙের পরিচ্ছদে ও জুঁইফুলের মালায় জলসেক করিতেছিল, সে সেই কাককে ভয় দেখাইবার জন্য ক্রমাগত একটুকরা কাপড় নাড়িতেছে।

গতকল্য সন্ধ্যার সময় ইনি মরিয়াছেন; ইঁহার অন্তর্জলী-অনুষ্ঠান-সমাপনান্তে যেরূপ যোগাসনে বসিয়া ইনি সমস্ত জীবন কাটাইয়াছেন, এক্ষণে এই পূর্ণ প্রভাতমহিমার মধ্যে ইঁহাকে সেই যোগাসনের ভঙ্গীতে বসান হইয়াছে। বন্ধনীর দ্বারা বদ্ধ করিয়া ইঁহার মস্তককে পিছনে একটু হেলাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—যাহাতে সূর্য্য ও আকাশ ভাল করিয়া দেখিতে পান।

ইঁহার দাহ হইবে না, কেন না, যোগীদের দাহ হয় না। যোগীদের পুণ্যজীবনের মাহাত্ম্যে যোগীদের শরীর পূর্ব্ব হইতেই পবিত্র হইয়া আছে। আজ সন্ধ্যাকালে, ইঁহার মৃতশরীরকে একটা মাটির গাম্লার মধ্যে সমাহিত করিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া হইবে। যে ভাগ্যবান্ পুরুষ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া—সংসারবন্ধন ছেদন করিয়া, সংসারচক্র হইতে চিরমুক্তি লাভ করিয়াছেন, জীবন ও মৃত্যুর অতলস্পর্শ রসাতল হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন, লোকেরা তাঁহাকে প্রফুল্লবদনে অভিনন্দন করিতেছে, অভিবাদন করিতেছে, সাধুবাদ করিতেছে।

একটা কুকুর শবের নিকটে আসিল, তাহার গা শুঁকিল, তাহার পর পুচ্ছ নত করিয়া চলিয়া গেল। তিনটা লালরঙের পাখী আসিয়া তাহারাও শবকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। একটা বানর নাবিয়া আসিল, শবের আর্দ্র পরিচ্ছদের তলদেশ স্পর্শ করিল এবং স্পর্শ করিয়াই একদৌড়ে ঘাটের মাথায় উঠিয়া বসিল। সেই রক্ষী যুবকটি ইহাদিগকে কিছুমাত্র নিবারণ করিতেছে না,—সব সহ্য করিতেছে। এদেশের লোকেরা পশুপক্ষীর অত্যাচার অকাতরে সহ্য করিয়া থাকে। সেই নাছোড়বন্দা কাকটা, পচা শবের গন্ধ পাইয়া পুনঃপুন ফিরিয়া আসিতেছে; এবং তাহার কালো ডানা, প্রায় মৃতযোগীর মুখ ঘেঁষিয়া যাইতেছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বর্গীয় কবিবর মধুসূদন দত্ত।*

১

আজ ৩৪বৎসর হইল, কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার সেই স্বর্গারোহণদিনস্মরণার্থ গত উনিশবৎসর আমরা এই সমাধিস্থানে আসিয়া তাঁহার প্রতি আমাদিগের প্রীতিভক্তি প্রদর্শন করিয়া আসিতেছি। মৃতকবির প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধা-

* এই প্রবন্ধ গত ২৯শে জুন (১৪ই আষাঢ়) কবির স্বর্গারোহণবাসরে তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে সভাপতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল।

ভক্তিপ্রদর্শন আমি একটি জাতীয়কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। যে জাতি প্রতিভার পূজায় উদাসীন, তাহাদিগের জাতীয়জীবন অসাড়, তাহারা কখনই উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিতে পারে না। এইজন্য যিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিরক্ষার্থ এই বাৎসরিক সভার সূত্রপাত করেন, তিনি আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তিনি আমাদিগের সুষুপ্ত জাতীয়জীবনকে কথঞ্চিৎ উন্মেষিত করিয়াছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, আজ তিনি আমাদিগের সহিত এই জাতীয়কর্ত্তব্যে যোগ দিবার জন্য উপস্থিত নহেন। যে লোকে আজ মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর আত্মা বিরাজ করিতেছে, এই স্মৃতিসভার অনুষ্ঠাতা উমেশচন্দ্র দত্তেরও আত্মা সেই লোকে প্রয়াণ করিয়াছে, তিনি সেখানে আজ কবির চরণে ভক্তিকুসুম অর্পণ করিতেছেন। জাতীয় কর্ত্তব্যকার্য্যে স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কিরূপ অদম্য অনুরাগ ছিল, তাহা আপনাদিগের অনেকেই অবগত আছেন। তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। সকলেই জানেন, মধুসূদনের নশ্বরদেহ যখন মাতা বসুন্ধরার অঙ্কে সমাধিস্থ হয়, তখন সেখানে কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হয় নাই, এমন কি, সামান্য ইষ্টকখণ্ডদ্বারা কবরটি আচ্ছাদিত পর্য্যন্ত করা হয় নাই। এইজন্য কয়েকবৎসর পরে সমাধিক্ষেত্রের অধ্যক্ষেরা তাঁহাদিগের নিয়মানুসারে কবির অস্থিপঞ্জর উত্তোলন করিয়া অন্যত্র নিক্ষেপ করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দেন। তখন উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ব্যাকুলহৃদয়ে আমার নিকট উপস্থিত হন এবং যাহাতে কবরের উপর একটি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহ করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। আমি তাঁহার অনুরোধ অনুসারে যথাসাধ্য অর্থসংগ্রহ করিয়া দিই ও এই স্মৃতিসভার সভাপতির পদ গ্রহণ করি। তিনি স্বয়ং এতাবৎ ইহার সহকারী সভাপতির পদে নিযুক্ত ছিলেন। কেবল যে কবি মধুসূদনের স্মৃতিরক্ষার জন্য তিনি আগ্রহপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি হেয়ার ও বেথুন সাহেবের স্মৃতিরক্ষার জন্যও বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। শুনিয়াছি, রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থানেও একটি স্মৃতিচিহ্নস্থাপনের জন্য তিনি উদ্যোগী হন। জানি না, এ বিষয়ে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে তিনি আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার অবর্ত্তমানে আমরা যার পর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। আশা করি, আপনাদিগের মধ্যে কেহ তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া এই সকল স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য যত্নবান্ হইবেন। এই সকল কার্য্যে তাঁহার এতদূর অনুরাগ ছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে মধুসূদনের স্মৃতিসভার কার্য্য যাহাতে যথারীতি সম্পন্ন হয়, সেজন্য বন্ধুগণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এইরূপ ঐকান্তিকমনে যিনি জাতীয়কর্ত্তব্যসম্পাদনে নিযুক্ত ছিলেন, আজ তাঁহাকে বিশেষরূপে স্মরণ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। আমার মনে হইতেছে, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতপ্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় সহকারী সভাপতি উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্থান

অধিকার করিবার যোগ্যপাত্র। তিনি যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রমে কবির জীবনের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ঘটনা পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে এই স্মৃতিসভার সহকারী সভাপতির পদে বরণ করিয়া সম্মানিত করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—যাঁহার স্মরণার্থ আজ আমরা এই সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি—বাঙালীজাতির একটি অমূল্যবস্তু। যে সময়ে বাঙ্‌লাসাহিত্য কতকগুলি সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদমধ্যে বদ্ধ ছিল, সেই সময়ে মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার অসামান্য-প্রতিভাবলে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যের সংমিশ্রণে যে নূতন কাব্যসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার সুমধুর রসাস্বাদনে বাঙালী চিরদিন আনন্দ অনুভব করিবে। মাইকেল কেবল যে বাঙ্‌লাভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ লিখিবার পূর্ব্বে বাঙ্‌লার নাট্যসাহিত্যে নবযুগের অবতারণা করেন। সে সময়ে এদেশে যে দুই-একখানি নাটক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কোনখানি সংস্কৃতনাটকের প্রাণশূন্য অনুবাদ, কোনখানি বা নীরস সমাজচিত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। নাটকে যে সকল রসের সমাবেশ থাকার প্রয়োজন, তাহাতে তাহার কোন লক্ষণই দেখা যাইত না। মাইকেল বেলগেছিয়ার বাগানে অভিনয়ের জন্য শর্ম্মিষ্ঠানাটক লিখিয়া ও তৎপরে পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি নাটক প্রণয়ন করিয়া নাটক-রচনার নূতন পদ্ধতি দেখাইয়া দিলেন। তাহার পর হইতেই বাঙ্‌লার নাট্যসাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। নাটকরচনার সহিত নাট্যশালার উন্নতিতেও তাঁহার সবিশেষ যত্ন ছিল। কলিকাতায় যখন প্রকাশ্য রঙ্গশালা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি তাহার অধ্যক্ষের অনুরোধে একখানি নাটক লেখেন—সে সময়ে তিনি রোগশয্যায় শয়ান, কিন্তু সে অবস্থাতেও কিরূপে রঙ্গালয়ের উন্নতি হইতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিতেন।

মধুসূদন কিরূপ স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, তাহার গ্রন্থগুলি হইতে আমরা তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাই। তিনি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান হইয়াছিলেন,—সে সময়ে যাঁহারা খৃষ্টান হইতেন, তাঁহাদিগের অনেকেই স্বদেশ ও স্বজাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু মধুসূদন স্বদেশকে কিরূপ ভালবাসিতেন, তাহা তাঁহার য়ুরোপযাত্রাকালীন কবিতাটি পাঠ করিলে বিশেষরূপে উপলব্ধি হয়। তিনি খৃষ্টান ছিলেন, কিন্তু ফ্রান্সে অবস্থিতিকালে আশ্বিনমাসে দুর্গোৎসবের কথা স্মরণ করিয়া কিরূপ আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কবিতাপাঠকদিগের অবিদিত নাই। এই-রূপ স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম যাঁহার হৃদয়ে বর্ত্তমান, তিনি যে-ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, তিনিই আমাদিগের ভক্তিভাজন। হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, ব্রাহ্ম হউন, খৃষ্টান হউন বা শিখ-পারসীক হউন, স্বদেশহিতৈষী স্বদেশপ্রেমিক ভারতবাসিমাত্রেই আমাদিগের শ্রদ্ধার পাত্র। এইরূপ অসাম্প্রদায়িকভাবে ভারতবাসিমাত্রকেই আদর করিতে না শিখিলে আমাদিগের জাতীয়জীবন সংগঠিত হইবে না। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াও যে স্বদেশ ও স্বজাতিকে ভালবাসা যায়, মাইকেল

মধুসূদন দত্তের জীবন জাজ্জল্যমানরূপে তাহার পরিচয় দিতেছে। তাঁহার যে কিছুমাত্র গোঁড়ামী ছিল না, তাঁহার ব্রজাঙ্গনাকাব্য তাহার সুস্পষ্ট পরিচয়। এইরূপে যে দিক্ দিয়া আমরা মধুসূদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি না করিয়া থাকিতে পারি না। তিনি স্বভাবকবি—বাগ্দেবীর বরপুত্র ছিলেন। বাঙ্‌লাভাষা যতদিন থাকিবে, বাঙালীজাতি যতদিন থাকিবে, ততদিন কবিবর মধুসূদনের নাম গৃহে গৃহে উচ্চারিত হইবে, বাঙালী সেই নাম স্মরণ করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিবে এবং তাঁহার এই সমাধিক্ষেত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিণত হইবে। আভন্‌নদীর তীরে শেক্‌স্পীয়রের জন্মস্থান ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড যেমন কাব্যামোদী জনগণের তীর্থস্থানের ন্যায় হইয়াছে, আমার আশা হয়, কালে কবি মধুসূদনের জন্মস্থান কবতক্ষতীরে 'সাগরদাঁড়ী' গ্রামও বাঙ্‌লার কাব্যপ্রিয় মহোদয়গণের তীর্থস্থানে পরিণত এবং সেখানেও কবির একটি স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপিত হইবে।

কবিবর মধুসূদন।*

২

স্বদেশবাসি-বন্ধুগণ,

নীরবতাই সাধারণত সমাধিক্ষেত্রের ভাষা; কিন্তু যখন আমরা কোন কীর্ত্তিমান্ পুরুষের স্মরণার্থ তাঁহার সমাধিমন্দিরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হই, তখন তাঁহার যশোগান করিবার জন্য স্বভাবতই আমাদিগের প্রবৃত্তি জন্মে। সেই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই আমি মধুসূদনের সম্বন্ধে দুইচারিটি কথা বলিতে অগ্রসর হইয়াছি। কি গুণে ও কি কার্য্যের জন্য মধুসূদন আমাদিগের সম্মান ও কৃতজ্ঞতার পাত্র, তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য। মধুসূদন বাঙ্‌লাভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তক ও মেঘনাদবধকাব্যের রচয়িতা বলিয়াই সাধারণত সম্মানিত। কিন্তু কেবল এই দুইটিরই জন্য কি তিনি আমাদিগের কৃতজ্ঞতার ও সম্মানের পাত্র? যাঁহারা বাঙ্‌লাসাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, মধুসূদনের কার্য্য কেবলমাত্র অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তনে বা মেঘনাদবধকাব্যরচনায় পর্য্যবসিত হয় নাই। তাঁহার প্রতিভা বাঙ্‌লাসাহিত্যের বিবিধ অংশ সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। একদিকে যেমন তিনি বাঙ্‌লাসাহিত্যে অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন, অপরদিকে তেমনই প্রাচ্যরীতির সহিত পাশ্চাত্যরীতির সম্মিলন করিয়া নূতন আদর্শের নাটকরচনার প্রথাও প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। বেলগেছিয়া নাট্যশালার জন্য রচিত শর্ম্মিষ্ঠানাটক হইতেই বঙ্গদেশের নাটকীয়সাহিত্যে এক নবযুগের

*মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যুর চতুস্ত্রিংশৎ সাংবৎসরিক সভায় তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে অভিব্যক্ত। ২৯এ জুন, ১৯০৭।

সূত্রপাত হইয়াছে। এখন যে আমরা বর্ষে বর্ষে এতগুলি নাটকনাটিকা দেখিতে পাইতেছি, মধুসূদনের প্রতিভাই তাহার মূল। বাঙ্লাভাষায় ব্যঙ্গাত্মক নাটকের বা প্রহসনেরও সৃষ্টি মধুসূদনের দ্বারা হইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বে অভিনয়যোগ্য কোন ব্যঙ্গাত্মক নাটক বাঙ্লাভাষায় ছিল না। তাঁহার রচিত বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া ও একেই কি বলে সভ্যতাই এ সম্বন্ধে পথ প্রদর্শন করিয়াছে। একেই কি বলে সভ্যতার আদর্শেই রায় দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার সধবার একাদশী রচনা করিয়াছিলেন। মধুসূদনের প্রতিভা বঙ্গের অনেক প্রতিষ্ঠাবান্ লেখকের শক্তি-উদ্দীপনে সাহায্য করিয়াছে। দীনবন্ধুবাবুর ন্যায় কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব হইতে বৃত্রসংহারের অনেক চিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের গৌরববর্দ্ধন করিতে যাইয়া এই দুই প্রতিভাবান্ পুরুষের গৌরব অপলাপ করা আমার অভিপ্রেত নয়। পশ্চাদ্গামী পুরুষদিগকে, স্বেচ্ছাক্রমে হউক বা অনিচ্ছাক্রমে হউক, কিরূপ পূর্ব্বগামী পুরুষদিগের অনুবর্ত্তন করিতে হয়, তাহাই বলা আমার অভিপ্রেত। কিন্তু মধুসূদন কেবল নাটকরচনাতেই নূতন রীতি প্রবর্ত্তন করেন নাই। বৈষ্ণবকবিদিগের অনুকরণে গীতিকাব্যরচনার প্রথাও, ইংরেজীশিক্ষিতদিগের মধ্যে, তাঁহারই দ্বারা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিদ্যাপতির ও চণ্ডীদাসের যে বীণাঝঙ্কারে সমগ্র বঙ্গদেশ একদিন মুখরিত হইয়াছিল, ব্রজাঙ্গনাকাব্যে আমরা তাহারই প্রতিধ্বনি শ্রবণ করি। বাঙ্লাভাষায় চতুর্দ্দশপদী কবিতারচনারও প্রথা মধুসূদনের দ্বারা প্রথম প্রবর্ত্তিত। কিন্তু এ সকলেরই অপেক্ষা মধুসূদনের মহত্তর কার্য্য আছে, আমি তাহা আপনাদিগের নিকট উল্লেখ করিতেছি। বাঙ্লাভাষাসম্বন্ধে মধুসূদনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য ইহার অন্তর্নিহিত শক্তির আবিষ্করণ। মেঘনাদবধরচনারও অপেক্ষা ইহা আমি তাঁহার প্রতিভার পক্ষে অধিকতর গৌরবজনক বলিয়া মনে করি। আপাতক্ষীণা বাঙ্লাভাষার অভ্যন্তরে যে এত শক্তি নিহিত ছিল, তাঁহার পূর্ব্বে কেহ তাহা জানিত না বা বিশ্বাস করিত না। যে অবস্থায় মধুসূদন অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আপনাদিগের মধ্যে অনেকেই তাহা অবগত আছেন। মহারাজা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্লাভাষার যেরূপ গঠন ও প্রবণতা, তাহাতে কিছুতেই ইহাতে অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন সম্ভবপর নহে। প্রত্যুত্তরে মধুসূদন বলিয়াছিলেন যে, আপনি বিস্মৃত হইতেছেন, বাঙ্লাভাষা সংস্কৃতভাষার দুহিতা; এরূপ জননীর কন্যার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। মধুসূদনের ভবিষ্যদ্বাণী—কল্পনামাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই। বাঙ্লাভাষার অভ্যন্তরে যে গূঢ়শক্তি নিহিত ছিল, এখন তাহার প্রত্যক্ষফল দর্শন করিয়া আমরা পুলকিত ও পরিতৃপ্ত হইতেছি। কাব্যে, ইতিহাসে, দর্শনে, এমন কি, বিজ্ঞানেও এরূপ কোন বিষয়ই নাই, যাহা বাঙ্লাভাষায় ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বাঙ্লাভাষার এই অন্তর্নিহিত শক্তির আবিষ্করণের জন্য মধুসূদনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরমহাশয়ের এবং বাবু অক্ষয়কুমার দত্তেরও নামোল্লেখ

আবশ্যক। প্রিয়বন্ধুগণ, যদি কোন পর্য্যটক বা কোন উদ্ভিদবেত্তা আমাদিগের জন্য এমন একটি নূতন পুষ্প বা এমন একটি নূতন ফল আবিষ্কার করেন, যাহার সুগন্ধে আমরা মোহিত হই এবং যাহার সুস্বাদে আমরা পরিতৃপ্ত হই, তাহা হইলে তাঁহার নিকট আমরা কতই না হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যদি কোন খনিবিদ্যাবিদ্ আমাদিগের জন্য এমন একটি রত্নের খনি আবিষ্কার করেন, যাহা আমরা বহুমূল্য মনে করি, তবে আমরা তাঁহার নিকট কতই না হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। কিন্তু মধুসূদন বঙ্গভাষাসম্বন্ধে আমাদিগের জন্য যাহা আবিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহা পুষ্পের অপেক্ষাও সুগন্ধ, ফলের অপেক্ষাও সুমধুর এবং রত্নের অপেক্ষাও সমুজ্জ্বল। কালক্রমে পুষ্প গন্ধহীন, ফল রসশূন্য এবং রত্ন ক্ষীণজ্যোতি হইতে পারে, কিন্তু মধুসূদনের অনুষ্ঠিত কার্য্যের কখন সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই; তাহা চিরসুরভি, চিরমধুর এবং চিরজ্যোতির্ম্ময়। আমি সেইজন্যই বলিয়াছি, কি গুণে ও কি কার্য্যের জন্য মধুসূদন আমাদিগের সম্মান ও কৃতজ্ঞতার পাত্র তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু মধুসূদন যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কি অনায়াসাধ্য ও অযত্নসুলভ? তাহা নয়। ইহার জন্য মধুসূদনকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। মধুসূদনের কোন কোন ব্যবহারে ক্রটি ছিল সত্য, কিন্তু মাতৃভাষার সেবারূপ ব্রতপালনসম্বন্ধে তাঁহার কখন কোন ক্রটি ছিল না। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, রোগে-শোকে, কখন তিনি মাতৃভাষার সেবাসম্বন্ধে ঔদাসীন্যপ্রকাশ করেন নাই। যেদিন তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মাতৃভাষার সেবা ভিন্ন তাঁহার পক্ষে স্থায়িগৌরবলাভের সম্ভাবনা নাই, সেই দিন হইতেই তিনি উদ্দেশ্যসাধনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি যখন মান্দ্রাজে অবস্থান করিতেন, সেইসময় তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—"এরূপ বৃথা সময়ক্ষেপ করা তোমার কর্ত্তব্য নয়; তুমি যদি তোমার শক্তি ও সামর্থ্য মাতৃভাষার সেবায় নিযোজিত করিতে, তাহা হইলে তাহা কতই ফলপ্রদ হইত।" প্রত্যুত্তরে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন—"আমার জীবন এখন বিদ্যালয়ের বালকের অপেক্ষা কার্য্যে ব্যস্ত। আমার কার্য্যপ্রণালী এইরূপ; —৬টা হইতে ৮ পর্য্যন্ত হিব্রু; ৮ হইতে ১২টা পর্য্যন্ত স্কুলে অধ্যাপনা; ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত গ্রীক্; ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত তেলেগু ও সংস্কৃত; ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত লাটিন এবং ৭টার পর হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ইংরেজী। ইহার পরও কি তুমি বলিবে যে, আমি আমার মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি না।"* সৎকর্ম্মে সাধনাশীল ব্যক্তিমাত্রই সমাজের সম্মানার্হ; যিনি আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম বিস্মৃত হইয়া এরূপভাবে মাতৃভাষার সাধনা করিয়াছিলেন এবং

* মধুসূদনের লিখিত পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

My life is more busy than that of a schoolboy. Here is my routine; 6—8 Hebrew; 8—12 school; 12—2 Greek; 2—5 Telegu and Sanskrit; 5—7 Latin; 7—10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers?

যিনি তাঁহার সেই সাধনার ফল তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তিনি যে আমাদিগের সম্মান, কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধার পাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সমাধিক্ষেত্র দোষোন্মেষের স্থান নয়, সুতরাং মধুসূদন যদি জীবনে কোন ভ্রমপ্রমাদ করিয়া থাকেন, তবে এখানে সে কথার আলোচনা না করাই সঙ্গত। মধুসূদন জীবনে যে ত্রুটি করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অতি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপের মুক্তি হয়, সুতরাং মধুসূদনের ত্রুটির কথা স্মরণ রাখিবার বা তজ্জন্য ক্ষোভ বা বিরক্তি প্রকাশের এক্ষণে কারণ নাই। তিনি যে দুষ্কর্ম করেন, তাহার ফল তিনি নিজেই ভোগ করিয়াছিলেন, কু-দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি কাহাকেও কুপথে প্রেরণ করেন নাই। কিন্তু তিনি যে সুকর্ম করিয়াছিলেন, তাহার অমৃতময় ফল এক্ষণে আমরা সকলে ভোগ করিতেছি এবং যুগ-যুগান্তর সমগ্র বঙ্গবাসী তাহা ভোগ করিবে। প্রকৃতি তাঁহাকে যে দুর্লভ শক্তি দান করিয়াছিলেন, প্রাণপাত পরিশ্রমে তিনি তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। রোগশোক, সুখদুঃখ, আহারনিদ্রা বিস্মৃত হইয়া তিনি যে বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থসমূহে আমরা তাহার প্রত্যক্ষফল দর্শন করি এবং তাঁহার সেই বহু পরিশ্রমের এবং বহু আয়াসের গুণেই আমরা তাঁহার গ্রন্থে মিল্টনের গাম্ভীর্য্য, হোমরের ওজস্বিতা এবং দান্তের অতিমানুষী কল্পনা দেখিতে পাই। বঙ্গভাষার অন্তর্নিহিত শক্তির আবিষ্কার করিয়া মধুসূদন আমাদিগের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, আমি পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। পৌরুষ পুরুষোচিত ভাষার সহচর, মধুসূদনের পুরুষোচিত ভাষা যদি আমাদিগকে পৌরুষলাভে সহায়তা করে, তবে তাঁহার কার্য্য যে অতি মহৎ কার্য্য, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

বন্ধুগণ, আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে, আর দুইচারিটি কথা বলিয়া আমি উপসংহার করিব। যে প্রতিভাবান্ পুরুষের সমাধি-স্থলে আমরা সকলে দণ্ডায়মান, তাঁহার কার্য্য-দ্বারা বঙ্গভাষা উপকৃত, সুতরাং আমরা সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাঋণে বদ্ধ। আসুন, আমরা সকলে ভগবানের নিকট তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি। আসুন, আমরা ভগবানের নিকট বলি—"স্বর্গ-মর্ত্ত্যের অধীশ্বর, ইহপরকালের সুহৃদ্, আমরা আজ যাঁহার সমাধিমন্দিরের পার্শ্বে দণ্ডায়মান, তিনি নিজের কার্য্যের দ্বারা আমাদিগের সকলের সম্মান, কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধার পাত্র। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতেছি। প্রভো! সে প্রার্থনা শ্রবণ কর। তিনি এক্ষণে কোথায়, কি-ভাবে অবস্থান করিতেছেন, তাহা আমরা অবগত নই। মাতৃভাষার সেবারূপ পুণ্যফলে যদি তিনি এক্ষণে কোন সুখময়, আনন্দময় লোকে বিরাজিত থাকেন, তবে আমরা সেজন্য আনন্দপ্রকাশ করি। আর যদি কর্ম্মবশে তিনি এক্ষণে কোন নিকৃষ্টলোকে অবস্থিতি করিতে থাকেন, তবে কৃপাময়, তাঁহাকে সে লোক হইতে মুক্ত কর। আমাদিগের কাহারও এমন পুণ্যসম্ভার নাই যে, আমরা তাহার বিনিময়ে তাঁহার মুক্তিকামনা করিতে

পারি। তবে যদি আমাদিগের মধ্যে কাহারও না কাহারও কোনরূপ সুকৃতি থাকে, তবে প্রভো, তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া আমাদিগের সেই উপকারী, কৃতজ্ঞতাভাজন পুরুষের আত্মার সদ্গতি কর। তিনি জীবনে বহুদুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে শান্তিদান কর। আকাশ তাঁহার উপর অমৃতবর্ষণ করুক, মেঘ তাঁহার উপর অমৃতসেচন করুক, বায়ু অমৃতহিল্লোলে তাহাকে তৃপ্ত করুক, বৃক্ষলতা তাঁহাকে অমৃতময় ফলপুষ্প দান করুক, আর সর্ব্বোপরি,— প্রভো! তুমি তাঁহাকে তোমার অমৃতময় ক্রোড়ে স্থানদান কর।" বন্ধুগণ, কোন সহৃদয় ব্যক্তি মধুসূদনের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"নামে মধু, হৃদে মধু, বাক্যে মধু যার।
এ হেন মধুরে ভুলে সাধ্য আছে কার॥"

মধুসূদনকে বিস্মৃত হওয়া সুম্ভবপর নয়। তাঁহার স্মৃতি চিরদিন আমাদিগের হৃদয়ে মধুময় থাকিবে। আসুন আমরা বলি, শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ; মধু, মধু, মধু। জগৎ শান্তিতে পূর্ণ হউক, মধুধারায় অভিসিঞ্চিত হউক। আমাদিগের প্রিয়কবি তাহার মধ্যে চিরসুখে, চিরানন্দে বিরাজিত থাকুন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

রাজতপস্বিনী।

[জীবনীপ্রসঙ্গ]

১৬

বাঙ্লায় "পরিবর্ত্তনযুগ" বলিলে সচরাচর রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার পরবর্ত্তী পঞ্চাশবৎসরের মোটামুটি ইতিহাস বুঝায়। যে মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব এই যুগের প্রধান বিশেষত্ব, তাহার বীজ বস্তুত রাজার জীবদ্দশায় উপ্ত হইয়াছিল মাত্র। স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় একটি গল্প করিতেন, তাহার আলোচনায় এই কথা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। খ্যাতনামা অধ্যাপক ডেরোজিওসাহেব একদিন হিন্দুকলেজের উচ্চশ্রেণীতে পড়াইতে গিয়া দেখেন, ছাত্রদের ভিতর ঘোর তর্কবিতর্ক চলিয়াছে, শিক্ষাসম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায় যে আবেদনপত্র গভর্ণর-জেনারেলের নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহার লেখক স্বয়ং রাজা কি না? সকল শুনিয়া ডেরোজিও বলিলেন, "তোমরা সব মানুষ, না অচেতন লোষ্ট্রখণ্ডমাত্র? দেশে শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনের কথা উঠিয়াছে। কোথায় তাহার ভালমন্দ বিচার করিবে, না ব্যক্তিবিশেষের লিপিকুশলতার কথায় তন্ময় হইয়া আছ? রাজা রামমোহন ইংরেজীতে কেমন সুপণ্ডিত ও সুলেখক, জানিলে এ সংশয় তোমাদের মনে উঠিত না।" ফলত পাশ্চাত্যশিক্ষাদীক্ষার নববর্ষায় বন্যা-

প্রবাহবৎ যে উদ্দাম চিন্তা এবং উচ্ছৃঙ্খল ভাবস্রোত বঙ্গে তখন হইতে দেখা দিয়াছিল, তাহার আবিলতা এখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই। বঙ্গীয় যুবকদের সাধারণ রীতি এবং চরিত্র ইহার প্রমাণ।

বঙ্গকুললললনাদের সম্বন্ধে তেমন নিঃসংশয়ে কিছু বলা চলে না। তবে পাশ্চাত্যসভ্যতার দুর্দ্দমনীয় প্রভাব যে অল্পবিস্তর তাঁহাদিগকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, ইহা অস্বীকার করার জো নাই। দেখিয়া-শুনিয়া বর্ষীয়ান্ হিন্দু সমাজহিতৈষীরা প্রমাদ গণিতেছেন। তাঁহাদের ভিতর অনেককে বলিতে শুনিয়াছি, সেকালের ও একালের স্ত্রীচরিত্রের একটা সামঞ্জস্যবিধান করিতে পারিলে এই স্রোত ফিরিতে পারে। কিন্তু ইহা কি সম্ভব?

মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর জীবনে সেকাল ও একালের হিন্দুমহিলাচরিত্রের একটা সমন্বয়চেষ্টা দেখা যায়। ছত্রিশবৎসরমাত্র বয়সে তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। ইহারি ভিতর যে জীবন তিনি যাপন করিয়াছিলেন এবং যে সকল কার্য্য তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতেই এই সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ সম্ভবপর বোধ হয়।

শ্রাবণমাসে একদিন বেলা ১১টার সময় রাজবাড়ীতে গেলাম। মহারাণীমাতাকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখি, ছোট-তরফের পুরাতনবাটীর কোন স্থান হইতে একটি শালগ্রামশিলা পাওয়া গিয়াছে, তিনি তাহার পবিত্রীকরণ লইয়া ব্যস্ত। তাঁহার ঘরের বাহির "হলে" পুরোহিতমহাশয় পাঁজি-পুঁথি লইয়া সেই-সম্পর্কীয় ব্যবস্থা নির্ণয় করিতেছেন। মহারাণী অন্তরাল হইতে অন্যের দ্বারা তাঁহাকে অনেক প্রশ্ন করিলেন। শেষে স্থির হইল, শিলাটি ছোট-তরফের ঠাকুরবাড়ীতেই রাখা হইবে। মা বলিলেন, যখন ছোটবাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে, তখন ইহা নিশ্চয় যে, উহা রাজসংসারের ঠাকুর, অন্যের নহে। প্রতি পদে তিনি আশঙ্কা করিতেছিলেন, পাছে ইহাতে কোন অধর্ম্ম স্পর্শে।

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রধানবিচারপতিপদে উন্নীত হওয়ার খবর প্রচার হইলে বঙ্গের সর্ব্বত্র সভাসমিতি হইয়াছিল। পুটিয়ায় সেজন্য আনন্দোৎসব হইল। উদ্যোগীরা তাঁহার অনুমতি লইতে গিয়া শুনিলেন, মাতা তদুপলক্ষে কতকগুলি ভদ্রলোককে একদিন রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

কোন আত্মীয়ের গৃহ হইতে একদিন প্রাতে প্রাচীনা এক পরিচারিকা তাঁহাকে দেখিতে আসিল। মা, কোন অল্পবয়স্কা আত্মীয়া কি করিতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর—"প্রাতে দেখিয়া আসিয়াছি, বই লইয়া বসিয়াছেন, বলিলাম—'কুকি, বইয়ের জন্য কত হয়েচে, আবার!'" ইহাতে তাহার স্বামীর স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিরাগের কথা উঠিল। বালিকার পাঠের জন্য কি কি বই আনাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, মাতা আমায় সুধাইলেন। আমি "মেজ বউ", "সুরুচির কুটীর" এবং "বঙ্গমহিলা"র নাম করিলাম। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাসম্বন্ধে তাঁহার ধারণা এরূপ বলবতী ছিল যে, কেহ তাহাতে সংশয়প্রকাশ করিলে তিনি বিস্মিত হইতেন। পুটিয়ায় আমি একবার বালিকাবিদ্যালয়সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলাম। স্থানীয় ভদ্রলোকদের সহায়তাপ্রাপ্তি দূরে থাকুক, অনেকেই তাহাতে

খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। কেবল মহারাণী-মাতার উৎসাহ ও সহানুভূতির বলেই আমি তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

রাজবাটীতে বিস্তর ইংরেজী বাঙ্‌লা সংবাদ-পত্র আসিত। আমি মহারাণীমাতার নিকট প্রস্তাব করিলাম, রাজবাড়ীর বাহিরে একটি ঘরে সেগুলি রক্ষিত হইলে সাধারণের পড়াশুনার সুবিধা হইতে পারে। মাতা ইহার অনুমোদন করিয়া কর্ম্মচারী ও দ্বারবান্ নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং সেই পাঠাগারে তাঁহার সমস্ত পুস্তক দান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

মাঝে মাঝে তিনি কথাপ্রসঙ্গে আমাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম কি, তাহার কয়টি সম্প্রদায়, কোন্ সম্প্রদায় কি কাজ করিতেছে? ধর্ম্ম এবং সমাজ সংস্কা-রের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির আলোচনাও সাধারণ সমাজের লক্ষ্য শুনিয়া আগ্রহে তিনি অনেক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবাদ স্বভাবতই তাঁহাকে বেশী আকৃষ্ট করিত।

একদিন প্রাতে মাতা সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন, তাঁহার শিশু ভাগিনাপুত্র কাছে বসিয়া দুষ্টামি করিতেছিল। তাহার চাপল্যে মা ঈষৎ বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "ছি কোকন!" আমি বলিলাম, "মা আপনি উহা নিবারণ করিতে পারিবেন না, আর ছেলে-বেলায় একটু দুষ্টামি ভাল, বরং ঐ অবস্থাতেই মুখে মুখে সব শিখাইতে হয়। আমিও বোধ হয় ঐরূপ কত আপনাকে বিরক্ত করিতাম।" মা হাসিলেন, "না, তুমি বেশ শান্ত ছিলে।" প্রাচীনা ভগবতী দাসী মাকে ব্যজন করিতেছিল, বেশী কথা কহা তাহার স্বভাব নহে, মৃদুভাবে বলিল, "না, আপনি বড় সুবুদ্ধি ছিলেন, আমরা সকলে কোলে লইতাম।" এই দাসী মহারাণী ও তাঁহার ভগিনীকে মানুষ করিয়াছিল। সে বলিত, মা ছেলেবেলা হইতে তাহার উপর কখন রাগ করেন নাই। কোকনের আমার প্রতি বালকসুলভ অসংখ্য প্রশ্ন শুনিয়া মা খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে ঈষৎ হাসিতেছিলেন। কথায় কথায় আমি জানাই-লাম যে, পদচ্যুত গুইকুমারের মৃত্যু হইয়াছে। মা বলিলেন, "বাঁচিয়াছেন! আহা, কার কপালে কি হয়, বলা যায় না!" জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে পড়িলে?" আমি—"ইংলিশ-ম্যানে।" মাতা—"সোমপ্রকাশে পড়িতেছিলাম যে, গুইকুমার সংশয়াপন্ন কাহিল।" তার পর আমার মুখে ঢাকায় আত্মশাসনের সভা উপ-লক্ষে বিশহাজার লোক সমবেত হওয়ার কথা শুনিয়া তিনি আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইলেন।

একদিন যাত্রাগানের কথা হইতেছিল। আমরা উহার কৃত্রিমতা লইয়া কঠোর সমা-লোচনা করিতেছিলাম। কেহ বা কালুয়া-ভুলুয়ার সংএর কথায় নিন্দা করিতেছিলেন। মা বলিলেন, "সে খারাপ, কিন্তু বাসুদেব আমা-দের ভাল লাগিত, এখন তা নাই।"

আর একদিন একটা বিবাহের সম্বন্ধের কথা হইতেছিল। পাত্রীর পিতামহ, মহা কুলীন কিন্তু দরিদ্র ও গণ্ডমূর্খ পাত্র স্থির করিতেছিলেন, পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়দের তাহাতে অমত। সকল শুনিয়া মহারাণীমাতা শেষোক্তদের বলিলেন, "তোমাদের বুঝি ইচ্ছা যে, মেয়েটি যেখানে সুখে থাকে, সেইখানে বিবাহ দাও? সেই ত ভাল!"

তিনি যখন বিষয়ভার কুমারের হস্তে দিয়া কাশীবাস করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন জেলার মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর রডাক্‌সাহেব বর্ষার সময় জলপথে পুটিয়ায় আসিলেন। ইংরেজীনবীশ রাজকর্ম্মচারীরা কেহ সদরে উপস্থিত ছিলেন না। তজ্জন্য মহারাণীমাতার তরফ হইতে সাহেবকে বোট্ হইতে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আনার ভার আমার উপর পড়িল। মা আমার প্রতি বিশেষভাবে আজ্ঞা করিলেন, সাহেবের সঙ্গে দেখা হইলে আমি যেন তাঁহার নামে বলি যে, কুমার প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক হইলেন। এ অবস্থায় তিনি যদি চেষ্টা করিয়া কুমারের হস্তে ষ্টেট্ অর্পণ করাইয়া মহারাণীকে বিষয়ভার হইতে মুক্ত করেন, তবে তিনি বড় উপকারবোধ করেন। তাহা হইলে যেখানে ইচ্ছা গিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে পারেন। বলিলেন, "তুমি বেশ গুছাইয়া সব বলিও, + + ফলত দেখিও, আমায় যদি মুক্ত করিতে পার।" তাঁহার নিকট আর একদিন শুনিয়াছিলাম, পূর্ব্বে গঙ্গাস্নানে গেলেও কালেক্টরসাহেবকে বাঙ্‌লায় আরজী লিখিয়া যাইতে হইত।

একবার দেশ হইতে ফিরিয়া গিয়া দেখি, মহারাণীমাতার বসিবার ঘরে আর্টস্কুলের নূতন কতকগুলি ছবি টাঙানো রহিয়াছে। মদনভস্মের মূর্ত্তিও ছিল। দেখিয়া মাতা বলিতেছিলেন, শিবকে যেন গুলিখোর করিয়া আঁকিয়াছে! আমি আমাদের অধ্যাপক পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺কালীকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চিত্রিত অপূর্ব্ব হরসম্মোহনমূর্ত্তির কথা তুলিলাম। তেমন সুন্দর চিত্রপট দেশীয় শিল্পী কেহ লিখিতে পারেন, না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। কুমারসম্ভবের তৃতীয়সর্গ যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাহার সমস্ত গৌরবে এবং সৌন্দর্য্যে সেই ক্ষুদ্র আলেখ্যটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শুনিয়া মহারাণী তাহার সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের সহিত অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এই চিত্রপট আমি কবিরত্নমহাশয়ের কলিকাতাস্থ বাসস্থান তদানীন্তন ২৫নম্বর বেনিয়াটোলার গৃহে দেখিতাম। পূজনীয় আচার্য্যকে যতবার প্রণাম করিতে যাইতাম, অনিমেষনেত্রে দুইদণ্ডকাল সে ছবি না দেখিলে আমার তৃপ্তি হইত না।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

গৌড়-কাহিনী

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন।

হিমালয়ের দক্ষিণে, পদ্মাবতীর উত্তরে, কামরূপরাজ্যের পশ্চিমে এবং মিথিলার পূর্ব্বে যে জনপদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই পুরাতন নাম—পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। এক সময়ে তাহার নাম ভারতবর্ষের সকল স্থানেই সুপরিচিত ছিল। পুরাতন সংস্কৃতসাহিত্যে এখনও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই রাজ্য শিক্ষা ও শিল্পবাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। শিল্পের মধ্যে কৌষেয়বস্ত্রশিল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই প্রদেশের লোকে তাহার জন্য এখনও প্রশংসালাভ করিয়া আসিতেছে। এক-শ্রেণীর লোকের পক্ষে কোষকীটপালন করাই জীবিকার্জ্জনের প্রধান পথ। তাহারা "পৌণ্ড্র" বা "পুণ্ড্রীক" নামে পরিচিত। জাতিতে হিন্দু,—কৃষিকার্য্যে সুনিপুণ, কেহ কেহ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অন্যান্য কার্য্যেও ব্যাপৃত হইয়াছে। মালদহজেলায় ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ইহাদিগের বিশ্বাস,—পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ইহাদিগেরই পুরাতন রাজ্য,—ইহারাই তাহার অধিপতি বলিয়া সুপরিচিত ছিল।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে পৌণ্ড্রদিগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা প্রসিদ্ধিলাভ না করিলে, তাহাদের নাম ভারতবিখ্যাত হইত না। হরিবংশে, কথাসরিৎসাগরে এবং শব্দরত্নাবলীতেও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের উল্লেখ আছে।

যাহারা একদা এরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহারা কৃষকজাতিতে পরিণত হইল কেন,—তাহা একটি ঐতিহাসিক কৌতূহলের ব্যাপার। সে কৌতূহল সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করিবার উপায় নাই। ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতার বচন ধরিয়া এই পরিবর্ত্তনের কারণপরম্পরার কিছু-কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ওড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ-দিগের ন্যায় পৌণ্ড্রগণও "ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়" বলিয়া উল্লিখিত। ব্রাত্য হইয়া এই সকল জাতি আর্য্যসমাজ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা একদিনের কথা নহে,—ক্রমে ক্রমে সাধিত হইয়া থাকিবে। ক্রিয়ালোপে,—ব্রাহ্মণগণের অদর্শনে,—দিনে দিনে ইহারা "ব্রাত্য" হইয়া পড়িয়াছিল। অন্তত মনুসংহিতায় এইরূপই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "ব্রাত্য" হইবার পূর্ব্বে ইহারা আর্য্যসমাজ-ভুক্ত ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত ছিল। "ব্রাত্য" হইবার পর ক্রমে ক্রমে আর্য্যাচার পরিত্যাগ করিয়া "পতিত" হইয়া থাকিবে।

যাহারা এইরূপে সমাজচ্যুত হইয়াছিল, যাহারা তজ্জন্য অদ্যাপি আর্য্যসমাজে চতুর্বর্ণের নিম্নে স্থান প্রাপ্ত হইতেছে, তাহারাই কিন্তু এক সময়ে আর্য্যাভিযান সুবিস্তৃত করিয়া যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা নানা দিগ্দেশে আর্য্যসাম্রাজ্যবিস্তারকার্য্যে জীবনপাত করিয়া, কখন বা অনার্য্যসংঘর্ষে বিপর্য্যস্ত হইয়া, সভ্যতাবিস্তারের পথপ্রদর্শক বলিয়া পূজিত হইতে পারিত। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত নবরাজ্যে ব্রাহ্মণাগমনের অভাবে, তাহারা ক্রিয়ালোপে "ব্রাত্য" হইয়া পড়ায়, দিনদিন হীন হইয়া অনার্য্যসহবাসে আর্য্যাচার বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল।

পৌণ্ড্রগণ এইরূপ "ব্রাত্য"-ক্ষত্রিয়,—প্রাচ্যরাজ্যে আর্য্যসাম্রাজ্যবিস্তারের প্রথম পথপ্রদর্শক,—কালক্রমে কৃষকশ্রেণীতে পরিণত হইয়া অগৌরবে কালযাপন করিতেছে। যাহারা এইরূপে স্বজাতিস্বধর্ম্মের বিস্তার-সাধন করিতে গিয়া সমাজচ্যুত হইয়াছিল, ইতিহাসের অভাবে তাহাদের আত্মত্যাগ-কাহিনী লোকসমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সে দিন চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আর্য্য-বিজয়যাত্রার রথচক্রচিহ্নে বসুন্ধরা "রথক্রান্তা" হইয়া রহিয়াছেন। একদিন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে যে

বিজয়রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা ভারতসীমা অতিক্রম করিয়া দ্বীপোপদ্বীপেও প্রভাববিস্তার করিয়াছিল। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সঙ্গে সেই সূত্রে ভারতসাগর এবং প্রশান্তসাগরের দ্বীপপুঞ্জের যে বাণিজ্যসংস্রব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। এখনও নানা দ্বীপের নানা দেবমন্দিরে তাহার অভ্রান্ত নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পূর্ব্বসীমায় করতোয়া নদী, —"ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা,"—একটি সুপরিচিত পুণ্যতীর্থ বলিয়া উল্লিখিত। তাহার সে খরস্রোত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; যাহা আছে, তাহা শৈবালশাদ্বলে সমাকীর্ণ হইয়া কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতেছে! সেকালের করতোয়া এরূপ ছিল না; এখনও তাহার পুরাতন খাতের চিহ্ন দেখিলে সেকালের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে। করতোয়াতীরে বহুসংখ্যক প্রান্তদুর্গ বর্ত্তমান ছিল। কোন কোন প্রান্তদুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে।

করতোয়াতীর বহু বিপ্লবের লীলাভূমি। করতোয়া উত্তীর্ণ হইয়া, কামরূপেশ্বর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন আক্রমণ করিতেন;—করতোয়া উত্তীর্ণ হইয়া, গৌড়েশ্বরগণ কামরূপ বিধ্বস্ত করিয়া আসিতেন। কখন বা এই চিরপরিচিত আক্রমণপথের সন্ধানলাভ করিয়া, চীন, হূণ প্রভৃতি পার্ব্বত্যদল পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আপতিত হইয়া রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিত। এই সকল আক্রমণবেগ প্রতিহত করিবার জন্য প্রথম হইতেই পৌণ্ড্রবীরগণ দলে দলে করতোয়াতীরে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শৌর্য্যবীর্য্যের কথা লোকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু "করতোয়ামাহাত্ম্য"-নামক পুরাতন সংস্কৃতপুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়,—পৌণ্ড্রগণের "নিত্যপ্লাবনকারিণী" বলিয়া করতোয়া মাহাত্ম্যশালিনী।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন "নদীমাতৃক" দেশ। ইহার দক্ষিণে পদ্মাবতীর প্রবল তরঙ্গভঙ্গ, পশ্চিমে মহানন্দার মন্থর প্রবাহ, পূর্ব্বে করতোয়ার খরস্রোত;—মধ্যস্থলে আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, বারাহী,—কত দিকে কত নদী—কত খালবিল, —তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পদ্মাবতীর দক্ষিণে বাগ্‌ড়ী বা সমতটপ্রদেশ, তাহার দক্ষিণে অনন্ত লবণাম্বুরাশি! এই সকল কারণে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন শস্যসম্ভারে ভারতের অনন্তভাণ্ডার বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাণিজ্যবিস্তারের পক্ষেও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অনেক সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এরূপ অনুকূল প্রাকৃতিকসংস্থান প্রাপ্ত হইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ্য সহজেই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সমৃদ্ধির কথা দেশবিদেশে ব্যাপ্ত হইবার পর নানা দেশের সহিত বাণিজ্যসংস্রব সংস্থাপিত হইয়াছিল। এইরূপে বঙ্গোপসাগরতীরে ত্রিকলিঙ্গ নামে তিনটি বাণিজ্যবন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়। সকল কলিঙ্গই নৌবিদ্যাপ্রভাবে ভুবনবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন তাহার কথা স্বপ্নকাহিনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে!

এই বর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যের ইতিহাস গৌড়ীয় বিজয়গৌরবের ইতিহাস। সে ইতিহাসে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন জ্ঞানগৌরবে, শিল্পবাণিজ্যগৌরবে, শৌর্য্যবীর্য্যগৌরবে চিরগৌরবান্বিত ও ভারতবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। সংস্কৃতশিক্ষাই তাহার প্রধান কারণ। তাহার জন্য

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের আর্য্যশিক্ষকগণ স্বতন্ত্রভাবে যে সাহিত্যরচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এক-সময়ে তাহার রচনারীতি "গৌড়ীয়রীতি" নামে সুপরিচিত ছিল;—তাহা সুললিত-পদবিন্যাস-কৌশলে অনন্যসাধারণ,—সমুচিত-শব্দাড়ম্বর-কৌশলে শ্রুতিমধুর,—অদ্যাপি তাহা পাঠ করিতে করিতে রচনামোহে অভিভূত হইতে হয়।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রাচ্যরাজ্যের সর্ব্বপ্রথম আর্য্যোপনিবেশ। এই পথেই সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডে আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। উপনিবেশমাত্রের বিশেষ লক্ষণ—স্বাতন্ত্র্য। যাহারা উপনিবেশ সংস্থাপিত করে, তাহারা বাধ্য হইয়াই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহারা আত্মনির্ভরশীল, স্বাধীনতাপ্রিয়, আত্মোন্নতিলোলুপ। তাহারা সঞ্চয়ী, মিতব্যয়ী, শ্রমসহিষ্ণু, অধ্যবসায়শীল। এই সকল গুণ না থাকিলে, উপনিবেশবাসিগণ আত্মরক্ষা করিতে পারে না। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অধিবাসিগণ এই সকল কারণে আত্মনির্ভরশীল হইয়া পাশ্চাত্য আর্য্যসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের স্বাধীনতাপ্রিয়তা জলবায়ুর সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি মুসলমান, কেহই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়া পশ্চিমভারতের অধীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হয় নাই। তজ্জন্য পুরাকাল হইতেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন স্বাধীনতার লীলাভূমি বলিয়া সুপরিচিত ছিল। স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অধিবাসিগণকে বাহুবলে রাজ্যরক্ষা করিতে হইত, শাসন-কৌশলে অনার্য্যদমন করিতে হইত, জ্ঞান-গৌরবে প্রতিষ্ঠারক্ষা করিতে হইত। এই স্বাধীনতাপ্রিয়তা রাজধানী হইতে ক্ষুদ্র পল্লী পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ্যের শিক্ষাদীক্ষা, আচারব্যবহার, শিল্পবাণিজ্য,—সকল বিষয়েই—স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতবর্গের মতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বহু পুরাতন স্থান। তাহার তুলনায় সমতট-প্রদেশ আধুনিক। বৈদিকযুগে মিথিলা পর্য্যন্ত বিজয়রাজ্য বিস্তৃত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎকালে সেই পর্য্যন্তই ভাগীরথীতীর বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহার জন্য মিথিলার নাম "তীরভুক্তি" হইয়াছিল। তাহাই এখন "ত্রিহুত" নামে কথিত হইয়া থাকে। তীরভুক্তির পূর্ব্বে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি, তাহার পূর্ব্বে কামরূপরাজ্য। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তি কখন-কখন পূর্ব্বপশ্চিম উভয় দিকেই অঙ্গবিস্তার করিয়া মিথিলা ও কামরূপকে অন্তর্ভুক্ত করিত। মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের নাম বৈদিকসাহিত্যে সুপরিচিত। তিনি রাজা, তিনি ঋষি, তিনি শিক্ষা ও কৃষি-কার্য্যের উৎসাহদাতা। তাঁহার আদর্শই পুরাতন প্রাচ্যসমাজের আদর্শ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল। তজ্জন্য পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি পুরাকাল হইতে কৃষিশিল্পবাণিজ্য ও শিক্ষাদীক্ষার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়া আসিয়াছে।

বৈদিকযুগ বিজয়যুগ। সে যুগের আর্য্য-সমাজ বিজয়কামনায় তপস্যাপরায়ণ। সকল তপস্যারই এক লক্ষ্য—লোকজয়। লোক তিনটিমাত্র, দেবলোক, পিতৃলোক, মনুষ্য-লোক। লোকত্রয় জয় করিবার জন্য সকলেই লালায়িত। তজ্জন্য সেকালের আর্য্যসমাজকে

অনার্য্যসংগ্রামে দেহপাত করিতে হইত। মনুষ্যলোক জয় করিতে না পারিলে পিতৃলোক বা দেবলোক জয় করিতে পারা যায় না। সুতরাং সেকালের আর্য্যসমাজ মনুষ্যলোকজয়ে উদাসীন থাকিতে পারিতেন না। শিক্ষায় পিতৃলোক এবং যজ্ঞাদিসম্পাদনে দেবলোক জয় করিতে হয়। কিন্তু মনুষ্যলোক জয় করিতে না পারিলে, তাহা কদাচ সাধিত হইতে পারে না। বৈদিকযুগের আর্য্যসমাজ তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া লোকজয়ের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। অনার্য্যগণ দুর্ব্বলহস্তে অস্ত্রধারণ করিত না; তাহারা সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ অসভ্য বলিয়াও পরিচিত ছিল না। তাহারা আর্য্যাভিযানের গতিরোধ করিবার জন্য যজ্ঞ নষ্ট করিত, আর্য্যোপনিবেশ বিধ্বস্ত করিয়া গ্রামনগর বিজনবনে পরিণত করিত, পরাভূত হইলে পলায়ন করিয়া গিরিগহ্বরে আত্মরক্ষা করিত।

মধ্যপ্রদেশ অপেক্ষা আর্য্যসাম্রাজ্যের প্রান্তদেশেই আর্য্য-অনার্য্যের তুমুল সংঘর্ষ সমধিক প্রবলপ্রতাপে আত্মবিকাশ করিত। যাহাদিগকে নিরন্তর এই সকল প্রবল সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইত, তাহারা যে স্বাধীনতাপ্রিয় বলিয়া সুপরিচিত হইবে, তাহাতে সংশয় হইতে পারে না।

রাজধানী কোথায় ছিল? এখন তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইতে পারে না। কত স্থানে কত স্মৃতিচিহ্ন পড়িয়া রহিয়াছে,—পরিখা, প্রাচীর, দুর্গ, দুর্গদ্বারের ধ্বংসাবশেষ,—পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি মালদহের অন্তর্গত "পাণ্ডুয়া"-নামক স্থানই পুরাতন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রধান রাজধানী বলিয়া বোধ হয়।

এই রাজ্যে যত নদনদী প্রবাহিত ছিল, তাহার তীরে তীরে অসংখ্য সম্পন্ন গ্রামনগর দেখিতে পাওয়া যাইত। এখনও অনেক স্থানে তাহার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। এই প্রদেশ নানা সময়ে নানা নামে কথিত হইয়াছে;—পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নাম সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। এই নাম এখন আর লোকসমাজে পরিচিত নাই। এখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অধিকাংশ ভূমি বরেন্দ্রভূমি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বরেন্দ্রভূমির মৃত্তিকা রক্তাভ, অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে অবস্থিত, এবং "বহুশস্যপূর্ণ" বলিয়া পুরাকাল হইতে সুবিখ্যাত।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে নানা যুগ কল্পিত হইয়া থাকে। প্রথম যুগ "বৈদিকযুগ" নামে পরিচিত। সে যুগের কোন লিখিত ইতিহাস বর্ত্তমান নাই। তাহার ইতিহাসসঙ্কলনের একমাত্র উপাদান—বৈদিকসাহিত্য। ভূমণ্ডলের অন্য কোন মানবসমাজে এত পুরাতন সাহিত্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল পুরাতন বলিয়াই ইহার মর্য্যাদা স্বীকৃত হয় নাই। যেমন পুরাতন, সেইরূপ সমুন্নত। কোন পুরাকালে ভারতবর্ষে মানবসভ্যতা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার কালনির্ণয় করিবার উপায় নাই।

বৈদিকযুগে মিথিলারাজ্য বেদরক্ষার জন্য নানা আয়োজন করিয়া ভারতবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। মিথিলাধিপতি জনকগণ তাহার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। 'জনক' শব্দ কুলোপাধিবিজ্ঞাপক;—মিথিলার অনেক রাজা এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি জনকের নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার সময় হইতেই

মিথিলা ও তাহার পূর্ব্বাঞ্চলের আর্য্যসমাজে বৈদিকশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়া-থাকিবে।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ্যে কোন্ সময়ে বৈদিক-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার কোন ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই প্রদেশ যে বেদাঙ্গের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্য ভারত-বিখ্যাত হইয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভারতবর্ষে যে সকল দেশভাষা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বঙ্গভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-মাত্রায় সংস্কৃতভাষার অনুকরণ করিয়া আসি-তেছে। যে দেশে বঙ্গভাষা প্রচলিত আছে, তাহা যে একসময়ে সংস্কৃতশিক্ষার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তাহাতে সংশয় উপস্থিত হয় না।

এই সকল কারণে গৌড়কাহিনী বঙ্গ-কাহিনী। এই সকল কারণে গৌড়কাহিনীতে সৌন্দর্য্যগাম্ভীর্য্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন। যাহা আছে, তাহা বৃহৎ এবং সুন্দর। যাহা লোক-লোচনের অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহাও সেই-রূপ—বৃহৎ এবং সুন্দর।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

রাইবনীদুর্গ।

[ঐতিহাসিক উপন্যাস]

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শিবাপ্রসন্ন দাসের সহিত কল্যাণপণ্ডার বন্ধুত্ব অনেকদিনের। অতএব পাঠানসেনানীর সহিত কথোপকথন ও সেই গোপনীয় চিঠি পাঠ করিয়া পণ্ডামহাশয় শিহরিয়া উঠিলেন। মনোভাব সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া দার্ঢ্যের সহিত তিনি বলিলেন, "এই রাজঘাটে আমিই ময়ূর-ভঞ্জাধিপের প্রতিনিধি। দেওয়ানজী আমার বরাবর 'খৎ' না পাঠাইয়া যেভাবে আপনা-দের যোগে উহা প্রেরণ করিতে সাহস করিয়া-ছেন, তাহাতে স্বয়ং রাজাধিরাজ চক্রাধিপভঞ্জ-কেই অবমাননা করা হইয়াছে।" সেই ক্ষুদ্র সেনার নায়ক মনসবদারখাঁ সমজদার লোক, সে দেখিল, মীরহবীবের কাজটা ঠিক্ আদব-কায়দাসঙ্গত হয় নাই। কাজেই "তাঁবে-দার" বং মাথা নাড়িয়া বারংবার বলিল—"দুরুস্ত! দুরুস্ত!" পণ্ডাজী কতকটা বিদ্রূপের স্বরে আবার বলিলেন, "অভয়ানন্দগিরি কোথায় আছেন জানি না, তিনি দেওয়ানজীর দোস্ত ও হিতকারী হইতে পারেন, কিন্তু ময়ূরভঞ্জরাজের নিমকের খাতির কতটা রাখেন, এই 'খৎ' পড়িয়া অন্তত বুঝা যায় না। উহা আমি অবিলম্বে ঘোড়সওয়ার-সহায়ে হরিহরপুরে পাঠাইয়া দিব। কিন্তু রাজীদেশের অপেক্ষায় 'ক্ষুদ্র বিশ্বস্ত সেনা'কে সুবর্ণরেখার পারে দুইচারিদিন সবুর করি-তেই হইতেছে।" বিশুদ্ধ উর্দ্দুতে যেরূপ দৃপ্ততার সহিত পণ্ডামহাশয় আপন বক্তব্য শেষ করিলেন, তাহাতে কাহারও ভুল বুঝি-বার সম্ভাবনা রহিল না। মনসবদারখাঁ

নবাবদরবারের শিক্ষিত লোক। উত্তরীয়মাত্রপরিহিত তেজস্বী ব্রাহ্মণের পরিষ্কার কণ্ঠস্বরে তিনি "আস্‌রফি"র খাস্‌ আওয়াজ চিনিতে পারিলেন—মেকি সোনায় সে গভীর মধুর সুর বাজে না! পুনরায় বারবার শিরঃসঞ্চালন করিয়া "দুরুস্ত দুরুস্ত", কখন বা "সহি" বলিয়া পণ্ডাজীর প্রতি খাতির দেখাইলেন এবং তিনি প্রত্যুদ্গমনের জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইলে ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া তাঁহাকে সেলামের উপর সেলাম করিলেন।

সেলামের ঘটা দেখিয়া কল্যাণপণ্ডা মনে মনে হাসিলেন এবং বুঝিলেন যে, ঔষধ ধরিয়াছে। তথাপি নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিবার জন্য বাসায় না ফিরিয়া একেবারে রাজসৈন্যনিবাসে দেখা দিলেন। তথায় কেবল রক্ষীরা নিঃশব্দে আপন-আপন নির্দ্দিষ্টস্থানে স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল—তাঁহাকে দেখিয়া অভিবাদন করিল। তখন নদীতে বান ডাকিয়াছে।—দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া নিমিষে নিমিষে বিপুল সলিলরাশি সুবর্ণরেখার কূলে কূলে পূরিয়া উঠিতেছিল। ছোট বড় সৈনিকের দল নদীতীরে সারি দিয়া তাহা দেখিতেছিল। পণ্ডামহাশয় সৈন্যাধ্যক্ষকে ডাকিয়া একটু নিভৃতে লইয়া গেলেন। পরামর্শ হইল, নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সৈনিক দিকে দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সেই পাঠানফৌজের প্রতি অতর্কিতে লক্ষ্য রাখিবে। আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রচারিত হইল।

কল্যাণপণ্ডা আর একটি কাজ করিলেন। শিবাপ্রসন্নকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য একজন প্রাচীন বিশ্বাসী ঘোড়সওয়ার দেখিতে দেখিতে উন্নাপুরে রওনা হইয়া গেল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গল্প আছে, এক নদীর ধারে এক শশক, আর এক কচ্ছপ বাস করিত। দীর্ঘকালের প্রতিবাসী বলিয়া তাহাদের মধ্যে সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। কিন্তু শশক কিছুতে ভুলিতে পারিত না যে, সে বড় দ্রুতগামী এবং তাহার বন্ধু ঠিক তাহার উল্টা। রঙ্গপ্রিয় লম্বকর্ণের বিদ্রূপবাণ যখন-তখন কূর্ম্মটিকে ব্যথিত করিত। একদিন ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া সে মিত্রের কাছে প্রস্তাব করিল যে, বাজি রাখিয়া তাহারা নির্দ্দিষ্টসময়মধ্যে অদূরের প্রকাণ্ড প্রান্তর পার হইবে। শশক ত হাসিয়াই আকুল। পরদিন প্রাতে তাহারা যাত্রা আরম্ভ করিল। শশক এক দৌড়ে অর্দ্ধেক মাঠ পার হইয়া গেল এবং কচ্ছপ কিছুতে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে সেখানে পৌঁছিতে পারিবে না স্থির জানিয়া বটগাছের শীতল ছায়ায় একটি মনোমত বিবর পাইয়া সমস্ত দুপুরবেলাটা সেখানে "বৈকালিক নিদ্রায়" কাটাইল। যখন তাহার ঘুম ভাঙিল, তখন বেলা একেবারে পড়িয়া গিয়াছে এবং সে মর্ম্মে মরিয়া গিয়া দেখিল, মন্দগতি কূর্ম্মবর প্রান্তর পার হইয়া হেলিতে-হেলিতে দুলিতে-দুলিতে আবার ফিরিয়া আসিতেছেন।

এ সংসারে নানা ক্ষেত্রে এবং নানা ভাবে অহরহ এই ক্ষুদ্র কাহিনীটির অভিনয় আমরা দেখিতে পাই। ঘরের কাছের কথায় বুঝিতে হইলে হিন্দুমুসলমানের ইতিহাস দিয়াই দেখ না কেন। হিন্দুজাতি চিরদিন নিজের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিটুকুর উপর এরূপ একান্ত নির্ভর করিয়াছে যে, জীবনসংগ্রামের বিপুল

প্রান্তরে আত্মপ্রতারণা অনেকসময় অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে।

কল্যাণপণ্ডা দেওয়ান মীরহবীবের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য ব্যবস্থার কোন ত্রুটি করিলেন না সত্য, কিন্তু তাঁর ভারি একটা ভুল হইয়া গেল। সেই গোপনীয় "খৎ"খানির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিয়া তিনি ঠিক্ করিলেন যে, প্রেরিত পাঠানফৌজের সংখ্যা দশের অতিরিক্ত নহে। আসলে কিন্তু পঁচিশ-জন আসিয়াছিল এবং ৪।৫ক্রোশ দূরে গড়পদার জমিদারগৃহে আতিথ্যগ্রহণ করিয়া বাকী পনরজন আহারনিদ্রায় দিনমান সেখানে কাটাইয়া দিল। মনসবদারখাঁর আদেশে সন্ধ্যার পর একে একে যাত্রা করিয়া বিপথে তাহারা রাজঘাটের অদূরে বনকুঞ্জ এবং উমাপুরের মধ্যপথে ক্ষুদ্র বনের ভিতর আশ্রয় লইল।

কল্যাণপণ্ডায় এবং মীরহবীবে পার্থক্য এইখানে। যাহাকে বিশ্বাস করিয়া গুরুতর রাজকার্য্যভার দিয়াছেন, কোনরূপ সন্দেহের কারণ উপস্থিত না হইলেও কেবল রাজনীতির খাতিরে দেওয়ানপ্রবর তাহার সহিত বাক্যে-কার্য্যে সঙ্গতিরক্ষা আবশ্যক বিবেচনা করি-লেন না। কেন না, সংসারের হাটে তাঁহার কেবল কেনাবেচার সম্বন্ধ। মনুষ্যজাতির সহিত কারবারে—তা সে কেন পিতামাতা বা স্ত্রীপুত্র হউক না—ষোলআনা হৃদয় উন্মুক্ত কেবল বোকাকুবেরাই করে, ইহাই তাঁহার ধ্রুবজ্ঞান ছিল।

পণ্ডামহাশয়ের সকল কথায় "সহি" দিয়া মনসবদারখাঁ তখন কতকটা খালাস হইলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের রকম-সকমে তিনি যথেষ্ট ভয় পাইয়া গেলেন। রাত্রিটা ভালোয়-ভালোয় কাটিবে, ইহা তাঁহার মনে লইতেছিল না। সন্দেহ উদ্রিক্ত করার আশঙ্কায় সৈন্য-দশজনকে যথাস্থানে ঠিক্ রাখিয়া ঘোড়ার সহিসের দ্বারা তিনি বাকী ফৌজের কাছে সংবাদ পাঠাইলেন, তাহারা যেন প্রস্তুত থাকে। ইহার ফলে সেই পঞ্চাদশ সেনানী একটা সংঘর্ষ স্থিরনিশ্চয় করিয়া উন্মুখ হইয়া রহিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্ধুকৃত্য যথাসাধ্য শেষ করিয়া কল্যাণ-পণ্ডা বন্যাপ্রপীড়িতদের উদ্ধার এবং সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্ত পরিদর্শন জন্য ধর্ম্মশালার দিকে গেলেন। গঙ্গাদীনকে দাসমহাশয়ের অনেকদিনের বিশ্বাসী ভৃত্য জানিয়া অন্যের অশ্রাব্যস্বরে তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহার প্রভুকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশে পাঠানসৈন্য ঘুরিতেছে, অতএব তাঁহার নাম লইয়া বেশী হৈচৈ না করে। পরহিতব্রতে উৎসর্গীকৃত-জীবন শিবাপ্রসন্ন নিত্য এই বন্যাবিভ্রাট এবং তার চেয়ে অনেক সঙীন বিপদে অভ্যস্ত, পণ্ডা-মহাশয় বিশেষরূপে ইহা জানিতেন। সেজন্য কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইলেন না। বরং গঙ্গাদীন কিছু বাড়াবাড়ি করিতেছিল বলিয়া তাঁহার কাছে ধমকের উপর ধমক খাইল।

এখন গঙ্গাদীন চতুর্ব্বেদী ওরফে চৌবেজী প্রভু শিবাপ্রসন্নকে অনেকবার অনেক বিপদ্ উত্তীর্ণ হইয়া আসিতে দেখিলেও এক্ষেত্রে একটু বেশীরকম "ঘাবড়াইয়া" গিয়াছিল। বিশাল শোণনদের তীরে বাস করিয়া চৌবেজী আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসের দৃশ্য বাল্যকাল হইতে অনেক দেখিয়াছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত

ক্ষুদ্রপরিসর সুবর্ণরেখার কুক্ষিতলে গৈরিক-প্রবাহ যে উদ্দাম বন্যার সৃষ্টি করে, তাহা ভূত-প্রেতিনীর কীর্ত্তি বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছিল। দেশে থাকিতে সে শুনিতে পাইত "হুড্রু ঘাগ্"* বড় বিষম স্থান, সেখানে লহমায় লহমায় লাখ্ লাখ্ মণ "রুই" (তুলা) আকাশ হইতে বর্ষিত হইতেছে এবং স্বর্গমর্ত্ত্য-পাতালের যত পিশাচপিশাচী, তাহাই সংগ্রহ করিতে আসে। স্বর্গে তুলার চাষ কম হইলে তাহাদের লজ্জানিবারণের ব্যাঘাত ঘটে এবং তখনই সুবর্ণরেখায় বান ডাকে! প্রভু সেই বন্যায় ইচ্ছা করিয়া ঝাঁপ দিয়াছেন, তাঁহাকে আর কি পাওয়া যাইবে? বিশেষ গঙ্গাদীন শুনিয়াছে, কোন দেবতা ছলনা করিয়া দণ্ডী দিতে দিতে তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। পণ্ডাজীর ভৎ‍র্সনার উত্তরে গঙ্গাদীন কিছু বলিতে পারিল না বটে, কিন্তু মনে মনে সে ভাবিতেছিল, দিন পাইলে মাঠাকুরাণীকে দুঃখ জানাইবে।

দাসমহাশয় রাজঘাটে যখন উত্তীর্ণ হইলেন, গঙ্গাদীন তখন তাঁহার অন্বেষণে নদীর তীরে তীরে একদল লোক লইয়া প্রায় ক্রোশদুই অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। পণ্ডাজী তাহাদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য ঘোড়সওয়ার রওনা করিয়া বন্ধুসম্ভাষণে গেলেন।

ততক্ষণ দাসমহাশয় যুবাভক্তের অজ্ঞানাবস্থা দূর করিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন। কল্যাণপণ্ডার চর সর্ব্বত্র। একজন ইহারই ভিতর তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিল, মজ্জনোন্মুখ যুবাপুরুষ আর কেহ নহেন—স্বয়ং অভয়ানন্দ গিরি।

কাজেই কল্যাণপণ্ডা সহসা শিবাপ্রসন্নকে দেখা না দিয়া একটু অন্তরে অন্তরে রহিলেন। ইহা কি সম্ভব, ছদ্মবেশে অভয়ানন্দ গিরি দাসমহাশয়কে আবদ্ধ করার জন্য হীন কৌশলজাল বিস্তার করিতেছেন? দেওয়ান মীরহবীরের চিঠি পণ্ডাজীর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছিল। তিনি স্থির করিলেন, দাসমহাশয়ের সমক্ষেই উহা অভয়ানন্দকে অর্পণ করিবেন। তার পর গিরিমহাশয় যদি দাসজীর গ্রেফ্‌তারির আদেশ দেন, তখন বোঝাপড়া আছে।

সঙ্কল্প যদি স্থির হইল, তবে আর কল্যাণপণ্ডার গতিরোধ করে কে? যেখানে একান্তে শিবাপ্রসন্ন দাস অভয়ানন্দের প্রণামলাভ করিয়া সস্নেহপ্রশ্নে তাঁহার পরিচয়-উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছিলেন, দূত আসিয়া সেখানে সংবাদ দিল, রাজঘাটদুর্গের প্রধান কর্ম্মচারী সাক্ষাৎ-প্রার্থনায় উপস্থিত আছেন। গিরিমহাশয় সেরূপভাবে আত্মপ্রকাশসম্ভাবনায় ইতস্তত করিতেছিলেন। কিন্তু দাসজী কৌতূহলী হইয়া বলিলেন—"ক্ষতি কি? তাঁহাকে লইয়া এসো।"

ক্রমশ।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

* সুবর্ণরেখার জলপ্রপাত। এইখানে সমগ্র সুবর্ণরেখানদী পাহাড় হইতে প্রায় পাঁচশত ফীট্ নীচে পড়িতেছে। স্থিতিস্থান—রাঁচির আন্দাজ ২০।২৫মাইল উত্তরপশ্চিমে। ভূপ্রদক্ষিণকারীদের মতে শুনিতে পাই, উচ্চতায় এরূপ জলপ্রপাত আর নাই। নায়েগ্রাপ্রপাত বিস্তৃতিতে মাত্র ইহার চেয়ে বড়।

দুর্দ্দিন।

ঐ আকাশ'পরে আঁধার মেলে' কি খেলা আজ খেল্‌তে এলে।
তোমার মনে কি আছে তা জান্‌ব না।
আমি তবুও হার মান্‌ব না, হার মান্‌ব না।
তোমার সিংহভীষণরবে
তোমার সংহার-উৎসবে
তোমার দুর্যোগে দুর্দ্দিনে—
তোমার তড়িৎ-শিখায় বজ্রলিখায় তোমায় লব চিনে;—
কোনো শঙ্কা মনে আন্‌ব নাগো আন্‌ব না!
যদি সঙ্গে চলি রঙ্গভরে কিম্বা পড়ি মাটির 'পরে
তবুও হার মান্‌ব না, হার মান্‌ব না।

কভু যদি আমার চিত্তমাঝে ছিন্নতারে বেসুর বাজে,
জাগে যদি জাগুক্‌ প্রাণে যন্ত্রণা—
ওগো না পাই যদি নাই বা পেলেম সান্ত্বনা।
যদি তোমার তরে আজি
ফুলে সাজিয়ে থাকি সাজি,
প্রদীপ জেলে থাকি ঘরে—
তবে ছিঁড়ে গেলে পুষ্প, প্রদীপ নিবে গেলে ঝড়ে,
তবু ছিন্ন ফুলে কর্‌ব তোমার বন্দনা।
তবু নেবা-দীপের অন্ধকারে কর্‌ব আঘাত তোমার দ্বারে
জাগে যদি জাগুক্‌ প্রাণে যন্ত্রণা।

আমি ভেবেছিলেম তোমায় ল'য়ে যাবে আমার জীবন ব'য়ে,
দুঃখতাপের পরশটুকু জান্‌ব না—
তাই সুখের কোণে ছিলেম পড়ে আনমনা।
আজ হঠাৎ ভীষণবেশে
তুমি দাঁড়াও যদি এসে,

তোমার মত্ত চরণভরে
আমার যত্নে-গড়া শয়নখানি ধূলায় ভেঙে পড়ে
আমি তাই বলে' ত কপালে কর হান্‌ব না।
তুমি যেমন করে' চেনাতে চাও তেম্‌নি করে' চিনিয়ে যাও,
যে দুঃখ দাও দুঃখ তারে জান্‌ব না।

তবে এস, হে মোর সুহৃঃসহ, ছিন্ন করে' জীবন লহ,
'বাজিয়ে তোলো ঝঞ্ঝাঝড়ের ঝঞ্ঝনা,
আমায় দুঃখ হ'তে কোরো না আর বঞ্চনা !
আমার বুকের পাঁজর টুটে
উঠুক্ পূজার পদ্ম ফুটে,
যেন প্রলয়বায়ুবেগে
আমার মর্ম্মকোষের গন্ধ ছুটে বিশ্বে উঠে জেগে !
ওরে আয় রে ব্যথা সকল-বাধা-ভঞ্জনা !
আজ আঁধারে ঐ শূন্য ব্যেপে কণ্ঠ আমার ফিরুক্ কেঁপে,
জাগিয়ে তোলো ঝঞ্ঝাঝড়ের ঝঞ্ঝনা !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজভক্তি।

আমরাও বলি, অপরেও বলে যে, আমরা চিরদিনই বড় রাজভক্ত। কথাটার দৌড় কত, সকল সময় ঠিক বুঝিয়া ওঠা যায় না।

আপাতত একটা কথা, এর মধ্যে বড়ই সত্য বলিয়া মনে হয়। সে কথাটা এই যে, আমরা কখনো রাজদ্রোহী হই নাই। ভারতের ইতিহাসে রাজায় রাজায় বাদ-বিসংবাদের কথা অনেক শোনা যায়, কিন্তু রাজায় প্রজায় কখনো হাতাহাতির উপক্রম হইয়াছে, এমনটা বড় জানা নাই।

তবে সত্য কথা বলিতে গেলে, ভারত-বর্ষের ইতিহাসের কথা আমরা কি-ই বা এমন জানি? আমরা জানি না, এমন হয় ত অনেক রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছিল।

প্রাচীনকালে যে এরূপ বিপ্লব কখনো কখনো ঘটিয়াছে, বেণরাজার উপাখ্যান তার প্রমাণ। আর মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে, ক্ষিপ্ত কুক্কুরকে যেমন লোকে একত্র হইয়া বধ করে, অত্যাচারী ও অধর্ম্মাচারী রাজাকে প্রজাগণ সেইরূপ সমবেত শক্তিদ্বারা হনন

করিবে,—এ উপদেশও দেখিতে পাওয়া যায়। ফলত এরূপ দুর্ঘটনা ঘনঘন ঘটিত বলিয়া মনে হয় না; তবে কখনো ঘটিতে পারে, এ আশঙ্কা না থাকিলে রাজনীতির উপদেশে এ অনুজ্ঞা কখনো স্থান পাইত না। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এরূপ কখনো ঘটুক বা না ঘটুক, এই উপদেশে আমাদের রাজভক্তির মূল প্রকৃতি বড় সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। ইহার মর্ম্ম এই যে, আমাদের রাজভক্তি চিরদিনই ধর্ম্মানুগত ছিল।

এই ধর্ম্মানুগত কথাটার একটু নিগূঢ় অর্থ আছে।—ধর্ম্ম বলিতে আমরা, সংস্কৃতে বিবিধ বিধিনিষেধাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সম্বন্ধ ও অনুষ্ঠানাদি বুঝিয়া থাকি। কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়। রাজধর্ম্ম বলিতে রাজকর্ম্ম বুঝায়। রাজভক্তি রাজধর্ম্মের অনুগত; ইহার অর্থ এই যে, এই ভক্তির প্রতিষ্ঠা রাজার কর্ম্মের উপরে যেমন, প্রজার প্রাণেও ঠিক সেইরূপ। রাজার কতিপয় কর্ত্তব্য আছে, সে সকলই রাজধর্ম্ম, সে সকল কর্ত্তব্যের উপরে প্রজার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত; আর সেই সকল কর্ত্তব্যোৎপন্ন রাজাপ্রজার যে সম্বন্ধ, তাহারই উপরে রাজভক্তি প্রতিষ্ঠালাভ করে। রাজা স্বধর্ম্মচ্যুত বা স্বকীয়কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হইলে, প্রজার সঙ্গে ধর্ম্মানুমোদিত যে সম্বন্ধ, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই ধর্ম্মোচিত সম্বন্ধের বিলোপে, রাজভক্তিও বিলোপ প্রাপ্ত হয়।

যে সকল বিদেশী লোকে স্বার্থের জন্যই হউক, আর অজ্ঞতানিবন্ধনই হউক,—আমাদিগকে রাজভক্ত বলিয়া প্রচার করে, তাহারা আমাদের এই পুরাতন, এই পিতৃপুরুষাগত ভক্তিবস্তু যে কি, ইহা কিছুই জানে বলিয়া মনে হয় না। আমরা নিজেরাও যে সকল সময় বুঝি, এমনও নহে।

মোট কথা এই যে, আমাদের সমাজের আদিছাঁচ কি, আমাদের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে, কি প্রণালীতে, কি আদর্শে সামাজিক সম্বন্ধসকল গড়িয়া উঠিয়াছে, হিন্দুরাজনীতির বিশেষত্ব চিরদিন কি ছিল,—এ সকল প্রশ্নের বিচার না করিয়া আমাদের এই চিরাভ্যস্ত রাজভক্তি মূলে বস্তুটা যে কি, ইহা নির্ণয় করা কখনই সম্ভব নহে।

আর্য্যজাতির অপরাপর শাখাপ্রশাখাতে যেরূপ, ভারতীয়-আর্য্যগণ-মধ্যেও সেইরূপ,—সমাজগঠন অতি প্রাচীনকাল হইতেই সাধারণ-তন্ত্রের আকার ধারণ করিয়া আছে। আর্য্য-সমাজে, কি ভারতে, কি গ্রীশে বা জর্ম্মাণীতে, কুত্রাপি ঐকান্তিক একতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। গোষ্ঠীপতি বা দলপতি বা সমাজপতি, ইঁহারা সকলেই স্ববর্গের সকলের প্রতিনিধিরূপে আপন-আপন পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। রাজা আপনার ইচ্ছায় নহে, কিন্তু প্রজাবর্গের অভিমতানুসারে রাজপদে অভিষিক্ত হইতেন। আর তিনি রাজ্যের কর্ম্মকর্ত্তা বা দণ্ডধারক মাত্র ছিলেন, কিন্তু শাসনবিধিপ্রণয়নের অধিকার তাঁহার কখনো ছিল না।

এই যে রাজ্যশাসনের দুই অঙ্গ, এক বিধি-প্রণয়ন, অপর দণ্ডধারণ;—এই দুই অঙ্গ যেখানে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুই আধারে প্রকাশিত হয়, সেখানেই প্রকৃত-

পক্ষে রাজনীতিক্ষেত্রে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। রাজবিধিপ্রণয়নে রাজার যদি কোনো অধিকার না থাকে, তবে রাজা আর স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন না। প্রজা যেমন রাজার বশে থাকে, রাজাকেও সেইরূপ রাজকীয় বিধিব্যবস্থার অধীনতা স্বীকার করিয়া চলিতে হয়। ইংলণ্ডে রাজা আইন-কানুন প্রণয়ন করেন না,—আইনকানুন-রচনায় তাঁহার কোনো অধিকার নাই। কিন্তু তিনি স্বাক্ষর না করিলে, কোনো আইনই দেশে প্রচলিত হইতে পারে না। ভারতে, হিন্দুতন্ত্রে, রাজার এ অধিকারটুকুও ছিল না। তিনি যে আইনকানুন রচনা করিতেন না, কেবল তাহাই নহে;—ইংরেজ-রাজের যে অধিকার এ বিষয়ে আছে, হিন্দু-রাজার সে অধিকারটুকুও ছিল না। আইনের রচনায় বা প্রবর্ত্তনে তাঁহার কোনো হাত ছিল না। যথাবিধি প্রজা-পালন করাই তাঁহার একমাত্র ধর্ম্ম ছিল।

রাজধর্ম্মে রাজাপ্রজার সম্বন্ধ বোঝায়। সম্বন্ধ বলিলেই, যে যে বস্তুর পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, তত্তদ্‌বস্তুর অতীত একটা-কিছু সাধারণভূমি বুঝায়, যে ভূমিতে ইহারা সম্মিলিত হয়, এবং যাহার বিধি-নিষেধাদির বশ্যতা স্বীকার করিয়া, উভয়ে পরস্পরের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধকে আয়ত্ত করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে ব্রিটিশ কন্‌ষ্টিটিউশন্ বলিয়া যে বস্তু আছে—তাহা রাজা ও প্রজা উভয়ের অতীত। ঐ বস্তুই ব্রিটিশরাজকে ব্রিটনের প্রজাপুঞ্জের সঙ্গে এক নিগূঢ় ও শতমুখ রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই কন্‌ষ্টিটিউশন্ নষ্ট হইলে, রাজাপ্রজার সম্বন্ধের আর কোনো আশ্রয় বা অবলম্বন থাকে না, সুতরাং তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। তখন রাজার প্রতি প্রজার কোনো কর্ত্তব্য থাকে না; প্রজার প্রতি রাজার কোনো দায়িত্ব থাকে না। তখন রাজা প্রজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, প্রজা রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, এবং রাষ্ট্রবিপ্লবের শক্তিতে বিজয়ী দল আপনার অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাবে, নূতন রাজব্যবস্থা বা কন্‌ষ্টিটিউশন্ গঠন করিয়া রাজাপ্রজার সম্বন্ধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া তোলে।

ইংরেজরাজতন্ত্রে, রাজা যখনই ব্রিটিশ কন্‌ষ্টিটিউশন্‌কে নষ্ট করিতে গিয়াছেন, তখনই রাজাপ্রজার সমুদায় সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া,—রাষ্ট্র-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। রাজা প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ডে—ইংরেজ আপনার প্রকৃত রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। শেষ স হন্তব্যঃ—এই মহাভারতীয় উপদেশ তখন তাহারা প্রতিপালন করিয়াছিল। ইংরেজী ইতিহাসে এই বিপ্লবকে রাজদ্রোহিতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে,—ভারতের সনাতন আদর্শে ইহা এই নামে কলঙ্কিত হইত না। যে রাজা আপন কর্ত্তব্যসাধনে বিমুখ হয়, যে ধর্ম্মরক্ষা করিতে অপারগ হয়,—তাহার প্রতি প্রজার কোনো দায়িত্ব কর্ত্তব্য নাই। রাজার অধিকার ধর্ম্মে, সিংহাসনেও নহে, সিপাইশাস্ত্রিতেও নহে। যে রাজা ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করে, সে আত্মাধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। প্রজার বশ্যতার উপরে তাহার আর কোনো দাবীদাওয়া নাই। সে তখন রাজা নহে, আততায়ী মাত্র।

তাহার বিরোধী হইলে রাজদ্রোহিতা হয় না। ইহাই হিন্দুর আদর্শ। এই আদর্শের উপরেই মহাভারতের ঐ অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত। এই আদর্শ অনুসারে প্রথম চার্লসের বিরুদ্ধে ব্রিটিশপ্রজাবর্গের অস্ত্রধারণ,—রাজদ্রোহিতা-পদবাচ্য কদাপি হইতে পারে না।

রাজাপ্রজার সম্বন্ধ ধর্ম্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই ধর্ম্ম সনাতন, এই ধর্ম্ম নিত্য, এই ধর্ম্ম অপৌরুষেয়। এইখানেই য়ুরোপীয় তন্ত্রের ও য়ুরোপীয় রাজনীতিতন্ত্রের সঙ্গে ভারতীয় রাজতন্ত্রের ও রাজনীতির মৌলিক পার্থক্য। প্রাচীনকালে য়ুরোপেও, এমন কি, গ্রীশে এবং রোমে পর্য্যন্ত একটা সনাতন, একটা নিত্য, একটা দৈব বিধানের উপরে রাজকীয় বিধি-ব্যবস্থাদি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানুষপ্রণীত বিধানাদিও প্রবর্ত্তিত হইত। গ্রীশে ও রোমে, উভয়ত্রই দেশের নেতৃবর্গ প্রজাপ্রতিনিধিসভায় সমবেত হইয়া রাজ-কার্য্যপরিচালনার বিধিব্যবস্থাদি প্রণয়ন করিতেন, এবং তাঁহারাই ঐ সকল বিধিব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিয়া যথোপযুক্তভাবে রাজ্যশাসন করিবার জন্য লোক নির্ব্বাচিত বা নিযুক্ত করিতেন। সেখানেও বিধি-প্রণয়ন ও রাজ্যশাসন, রাজশক্তির যে এই বিবিধ কর্ত্তব্য, ইহারা সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র আধারে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

হিন্দুভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতেই, এই স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইজন্য এক অর্থে হিন্দুভারতের রাজনীতির মূল প্রকৃতি ও আদর্শ য়ুরোপীয় বর্ত্তমান রাজনীতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিল বলিয়াই মনে হয়। য়ুরোপে আজ পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্রই, কোনো-না-কোনো আকারে, অতি সামান্য-মাত্রায় হইলেও, রাজ্যশাসনসম্বন্ধীয়-বিধি-ব্যবস্থা-প্রণয়নে রাজার বা রাজার প্রতিনিধি-স্বরূপে যে সকল রাজমন্ত্রী রাজ্যশাসন করেন, তাঁহাদের কিছু-না-কিছু অধিকার আছেই। ইহাকে ঠিক পূর্ণমাত্রায় কন্‌ষ্টিটিউশন্যাল্ শাসনতন্ত্র বলা যায় না।

হিন্দুভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতেই আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে—legislative এবং executiveএর মধ্যে—সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা বিধিদান করিতেন, রাজা সে বিধি কার্য্যে পরিণত করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ্যবিধানের উদার-সূত্রে রাজা ও প্রজা উভয়েই সমভাবে আবদ্ধ ছিলেন। ঐ বিধানপ্রতিপালনের উপরে উভয়ের পরস্পরের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত, ছিল। ঐ বিধান হইতেই রাজধর্ম্ম ও প্রজাধর্ম্ম উভয়ের উৎপত্তি হইত, এবং ঐ বিধানের বিকাশে বা বিলোপে, রাজধর্ম্ম ও প্রজাধর্ম্ম উভয়ই বিলোপপ্রাপ্ত হইত।

ব্রাহ্মণেরা বিধি প্রচার করিতেন মাত্র, কিন্তু প্রণয়ন করিতেন না। তাঁহারা আইন-কর্ত্তা ছিলেন না, কিন্তু আইনব্যাখ্যাতা ছিলেন। যে বিধানে রাজ্য শাসিত হইত, যাহার উপরে রাজাপ্রজার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইত,—সে বিধান মানুষের নহে, বিধাতার। সে বিধান ঐশ। এইজন্য সে বিধান শুদ্ধ সামাজিক বা রাজনৈতিক পদবাচ্য নহে,—কিন্তু ধর্ম্মপদবাচ্য হইত। সে বিধান সনাতন, অপৌরুষেয়। ঐশ্বরীয় বলিয়া, ধর্ম্ম বলিয়া, রাজবিধানও সর্ব্বথা সম্পূজ্য ছিল। রাজ-বিধানের অবজ্ঞায় এইজন্য অধর্ম্ম হইত।

ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মের মর্ম্মব্যাখ্যা করিতেন, এইজন্য তাঁহারাও পূজার্হ ছিলেন। রাজা এই ধর্ম্ম-বিধান প্রতিষ্ঠা করিতেন, এই ধর্ম্মবিধান রক্ষা করিতেন, এই বিধানের আশ্রয় ও অবলম্বন-রূপে রাজা জনমণ্ডলীমধ্যে বিহার করিতেন, —এইজন্য তিনি ধর্ম্মাবতার;—জনসমাজে ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে অধিষ্ঠিত,—এইজন্যই তিনিও পূজার্হ।

ধর্ম্মাবতাররূপেই রাজা পূজনীয়। ধর্ম্ম-রক্ষকরূপেই তিনি বরণীয়। হিন্দুর রাজ-ভক্তির মূল এই ধর্ম্মে। এই রাজভক্তি রাজদেহ ও রাজপদকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাহার উপজীব্য রাজার শরীরও নহে, রাজার পদও নহে, কিন্তু রাজার ধর্ম্ম। এইজন্যই রাজভক্তি আমাদের মধ্যে ধর্ম্মরূপে পরিগণিত।

আর এইজন্যই যে ধর্ম্মের খাতিরে রাজাকে ভক্তি করিতে হয়, রাজা যদি বেণের মত সে ধর্ম্মকে পরিত্যাগ ও সে ধর্ম্মের অবমাননা করেন, তখন প্রজা স্বয়ং ধর্ম্মরক্ষক হইয়া রাজাকেও কঠোর দণ্ডবিধান করিবে,—শাস্ত্রের এই অনুজ্ঞা।

হিন্দু রাজভক্ত এইজন্য যে, সে ধর্ম্মভক্ত। হিন্দু রাজভক্ত এইজন্য যে, রাজা তাহার চক্ষে ধর্ম্মাবতার। হিন্দুর রাজভক্তি রাজার উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে, ধর্ম্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুর রাজাকে এইজন্য সর্ব্বদা ধর্ম্মভীরু হইয়া চলিতে হয়; কারণ, রাজা যদি ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করেন, রাজভক্তি আশ্রয়হীন হইয়া, তাঁহাকেও নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিবে। যে রাজভক্তি রাজধর্ম্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যে রাজধর্ম্ম রাজাকে ধর্ম্মভীরু ও প্রজাহিতব্রতে রত ও যাহাতে প্রজাকে রাজবিধানের অনুগত করে,—তাহাই হিন্দুর মতে প্রকৃত রাজভক্তি ও প্রকৃত রাজধর্ম্ম।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

চিরসঙ্গী।

ওগো তুমি দূরে নহ, হৃদয়নিহিত
কত না আশ্বাসসুখ কর সঞ্চারিত
অবিরাম জীবনমাঝারে, প্রতিদিন
মোর ভগ্ন ভ্রষ্ট ছিন্ন সম্পূর্ণতাহীন
ব্যর্থ ত্যক্ত হতাশ্বাস হৃদয়মাঝারে
সুন্দর সম্পূর্ণ করি তোল আপনারে;
দীর্ণমেঘ আকাশের চন্দ্রের মতন
পরিপূর্ণ সুষমায় উজ্জ্বল শোভন।

চিরসঞ্চিত।

ফিরে এস ফিরে তুমি এস একবার
হে উদার দানশীল হে রাজা আমার,
কত দিয়েছিলে তুমি, তব দানভারে
ব্যাকুল করিয়াছিলে দরিদ্রজনারে।
কিছুই পারি নি দিতে, আজ এস, হায়
সঞ্চয় করেছি যাহা দিব তা তোমায়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

বঙ্গদর্শনের অধ্যক্ষ স্বয়ং হাতে করিয়া, আমার হাতে ৩খানি বিচিত্র পুস্তক দিয়াছেন; অনুরোধ, আমি সমালোচনা করি,—বঙ্গদর্শনের জন্য। কিন্তু দেশকালপাত্র বিবেচনা করিলে, অনুরোধটি দাঁড়াইয়াছে, বঙ্গদর্শনের জন্য নহে রঙ্গদর্শনের জন্য।—বঙ্গদর্শনের আদি-যুগের একটা কথা মনে পড়িল: বহরমপুরে নূতন বঙ্গদর্শন বাহির হইয়াছে, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। আমিও তখন বহরমপুরে থাকি। সম্পাদকের নিজস্ব নম্বরখানিতে শ্রীমতী কর্ত্রী-ঠাকুরাণী সদর-পৃষ্ঠায় যে বড় বড় অক্ষরে বঙ্গদর্শন ছাপা আছে, তাহারই 'ব'র নীচে কখন্ একটি 'শূন্য' বসাইয়া দিয়াছেন। সম্পাদকের কনিষ্ঠা কন্যা তখন সবেমাত্র দ্বিতীয়ভাগ পড়িতেছেন, তিনি সেই বঙ্গদর্শন-খানি লইয়া তাড়াতাড়ি পিতার কাছে আসিয়া অনুযোগ করিলেন, "বাবা, তুমি যে বলিয়াছিলে 'বঙ্গদর্শন', এ যে 'রঙ্গদর্শন'?" বঙ্কিমবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার গর্ভধারিণীর গুণে রঙ্গ হইয়াছে, আমি কি করিব মা!" এখন আমার কপালগুণে দেখিতেছি—বঙ্গদর্শন আবার রঙ্গদর্শন হইয়া পড়িল। বুঝাইয়া বলিতেছি।

১। প্রথম পুস্তকখানি শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত দেবীযুদ্ধ, ১৩০৭ সালে প্রকাশিত। গ্রন্থকার এই পুস্তক সেই সময়েই উপহার দেন, আমি আমার যথাজ্ঞান ও পোষ্টকার্ডের যথা-মান, উহার সমালোচনা করিয়াছিলাম। গাম্ভীর্য্যের, মাধুর্য্যের ও গাঁথুনির গুণপনার প্রশংসা করিয়াছিলাম। আর এখনকার দিনের একটা সর্ব্বনেশে কথা তখন হয় ত বলিয়া থাকিব,—বলিয়া থাকিব যে, গ্রন্থকার স্বজাতিবৎসল। সেই গ্রন্থ এখনকার দিনে, এই রাজনীতিভীতিগ্রস্ত বৃদ্ধকে সমালোচনা করিতে অনুরোধ করা—কেবল কি রঙ্গদর্শনের জন্য নহে? সর্ব্বাংশর সঞ্চয়

পাঠকবর্গ, আপনারাই বুঝুন না কেন,—আমি যদি এখন বলি, এই গ্রন্থের আরম্ভেই, রাজ্যচ্যুত দেবগণ অসুরহস্ত হইতে পুন রাজ্য-উদ্ধারের জন্ম পরামর্শ করিতেছেন—সে কথাটা, তাহা হইলে, এখনকার দিনে কি অনর্থ না ঘটায়? ১৩১৪ সালে, এ সকল কথার সমালোচনা কি চলে? প্রথম পৃষ্ঠাতেই আছে—

পথে ঘাটে সদা দৈত্যের প্রহরা;
যুড়ি তিন লোক দানবের থানা,
দেবের কপালে যথেচ্ছ বিহার,
কথোপকথন পরস্পরে মানা!

'তিনলোক' বলিতে নিশ্চয়ই তিনটি জেলা—বরিশাল, ময়মনসিং, আর কমিল্লা, এইরূপ ব্যাখ্যা যদি কোন বিবৃতি-বিশারদ রায় বাহাদুরে করেন, তখন কি দিয়া তাঁহার মুখ বন্ধ করিবে বল দেখি?—৪র্থ পৃষ্ঠায়—

স্বর্গমন্দাকিনী ত্রিলোকতারিণী,
দেবলোক তৃপ্ত সলিলে যাঁহার,
অসুরের ত্যক্ত মলমূত্রে হায়
আজি সে সলিল অপবিত্র তাঁর!

যদি কোন ব্যাখ্যানবীশ বলেন যে, এ কেবল সেপ্টিক্ ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে লোককে উত্তেজিত করা। কি করিয়া সে ব্যাখ্যার অন্যথা করিবে বল। ১১শ পৃষ্ঠায়—

দেবাসুরে যুদ্ধ বাধিবে দেখিয়া
আগেই অসুর হরিল তাঁহারে;
দেবতাপূজিত সুরগুরু আজ
বন্দী অসহায় দৈত্যকারাগারে।

যদি বিচক্ষণ বিদ্যাবাগীশ বলেন যে, এখানটা আশঙ্কিত শিখগুরু অজিতসিংহের নির্ব্বাসনে কারাবাসের কথা—তা হ'লেই ত বিষম কাণ্ড বাধিবে! না, এ সকল কথা এখনকার দিনে ভদ্রলোকের মুখে আনিতে নাই—সমালোচনা ত দূরমাস্তাম্। না, এ সকল দৈত্য-দানবের কথা আর তুলিব না, বলিব না। অধ্যক্ষের রঙ্গদর্শনের ইচ্ছা থাকিলেও আমি রঙ্গমঞ্চে উঠিব না। তবে honest স্বদেশী বড়লাটের ছাড় পাইয়াছে, কাব্য হইতে তাহারই দুইচারি কথা তুলিলে ক্ষতি কি?

যেখানে সকলে পরের মঙ্গলে
আপনার সুখ আত্মকথা ভুলে;
ভাবে স্বজাতিরে এক পরিবার,
সুখী দুঃখী হয় সুখে দুঃখে তার;
একের শরীরে লাগিলে আঘাত,
অন্যের নয়নে হয় অশ্রুপাত;
লাগিলে আঁচড় একের শরীরে,
বিঁধে তার জ্বালা জাতীয় অন্তরে;
যেখানে জনেক লভিলে গৌরব,
ঘরে ঘরে হয় জাতীয় উৎসব;
যেখানে একের হ'লে অপমান,
মর্ম্মাহত হয় সকলের প্রাণ;
স্বজাতির স্বার্থ, স্বজাতির মান
রাখিতে যেখানে স্বার্থবলিদান;
সাধিতে মঙ্গল স্বজাতির তরে,
রাজ্য-ধন-যশে ভ্রূক্ষেপ না করে;
পাইতে জাতীয় ক্ষুদ্র অধিকার
ধনপ্রাণ সবে ছাড়ে আপনার;
জাতীয় কল্যাণে যেখানে সকলে
একপ্রাণে খাটে, এক মন্ত্রে চলে;
সকলের প্রাণে বিঁধে এক ব্যথা,
একই চিন্তায় ঘুরে সব মাথা,
যেখানে নীচতা নাহি পায় স্থান,
চরিত্রের বলে সবে বলীয়ান্;
প্রতিজ্ঞায় সবে অচল অটল,
পবিত্র সঙ্কল্প স্থির হিমাচল;
যেখানে বারেক বাহিরিলে কথা
প্রাণান্তে তাহার ঘটে না অন্যথা;

বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, দেহ, প্রাণ, বল,
নিযুক্ত যেখানে পরার্থে কেবল ;
সেই পুণ্যভূমি, ধন্য সেই জাতি,
শক্তি সুপ্রসন্ন সে জাতির প্রতি।

২। দ্বিতীয় পুস্তকখানিতে আর একরূপ বিড়ম্বনা! গ্রন্থের নাম ষোড়শী। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। তা ষোড়শী আমার কাছে কেন? এইরূপ কৈফিয়তের উত্তর দিবার জন্যই যেন ভূমিকার প্রথমেই গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—এই গ্রন্থে আমার ষোলটি গল্প প্রকাশিত হইল, তাই ইহার নাম ' রাখিলাম "ষোড়শী"। আমরা কিন্তু বোধ করি, অশ্লীলতানিবারণী সভার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য, গ্রন্থকার এইরূপ চতুরতা করিয়াছেন। সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশই ষোড়শী, রূপসী লইয়া ঘটনাগ্রন্থন। ষোলটি গল্পের আটটিতে ষোড়শীই "জান"। দলিলি প্রমাণ দেখাইয়া দেওয়াই ভাল।

১ম গল্প (১ম পৃষ্ঠায় শেষ ছত্রে) "গৃহে ষোড়শী স্ত্রী রহিয়াছে"। এই ষোড়শীকেই তাঁহার স্বামীর চুরি করার গল্প। গল্প ভাল; লেখা বেশ।

৩য় গল্প (৫০ পৃষ্ঠায়) "তরঙ্গিণী সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী"। বৈচিত্র্যের জন্ত বোধ হয় এক-বৎসর বাড়ান হইয়াছে।

৫ম গল্প (৮৬ পৃষ্ঠায়) "এই বয়সেই বেচারি বিদেশে স্বামিঘর করিতে আসিয়াছে।" কোন্ বয়সে, তাও কি আর বলিতে হয়?

৬ষ্ঠ গল্প (১২৪ পৃষ্ঠায়) স্বামীর "কি দুঃখ শুনিবার জন্ত চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা ব্যাকুল হইয়া উঠিল।" এবার দুভিক্ষী কম।

৭ম গল্পের প্রথমেই "হারাধন চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিমার মত কন্যা মনোরমা পনেরো বৎসরের বেলায় বিধবা হইয়া গেল।" কাজেই পনর-বৎসর ষোড়শী বিধবা। গল্পের শেষ কথাগুলি শুনিলেই বুঝিবেন, ব্যাপার কি?

"কলিকাতায় বিদ্যাসাগরমহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বর ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।" এই গল্পের সমালোচনা গ্রন্থকার নিজেই করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, "শশীর পিতামাতা বড় অদূরদর্শী। * * * * ইহাদের নিভৃত সাক্ষাতের অবসর দেওয়া অবশ্যই তাঁহাদের উচিত ছিল না।" আর তাঁহার কলুগিন্নী এইরূপ সাক্ষাতের পরিণাম (বিধবা-বিবাহ) লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছে—"কলিকালে আবার ধর্ম্ম আছে, না নিষ্ঠে আছে। * * * যে আগুনে হাত দেবে, সে নিজেই পুড়ে মরবে।" আমাদেরও সমালোচনা উহাই।

আর খতিয়ান করিব না। এখন জিজ্ঞাসা করি, কেন তোমরা কুমারী, সধবা, বিধবা, বহুধবা ('সচ্চরিত্র' গল্পে গ্রন্থকার তাহাদেরও ছাড়েন নাই) ষোড়শী লইয়া কারকারবার করিবে? এখন বুড়াবয়সের দোষে এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি, তাহা নহে। ভোর 'যুবত্ব'সময়ে বঙ্কিমবাবুকে বলিয়াছিলাম, বিক্টর্ হুগো যেমন নাণ্টী থ্রীতে একটি মাতৃছবি দিয়াছেন, আপনি কেন সেইরূপ কিছু দেন না? সতীশবাবুর মা একটুকুয়া কমলমণিকে পাইয়া আমাদের ত আশা মিটে না। বঙ্কিমবাবু কার্য্যত কোন উত্তর দেন নাই। কিন্তু তাঁহার পরে, তোমরা অনেকেই দেখিতেছি গল্প লিখিতে অগ্রসর; "ষোড়শী"র গ্রন্থকার প্রভাতবাবু (বড় দুঃখের বিষয় যে, তাঁহাকে চিনি না) বেশ

ভাবুক, সামাজিক অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ, লিখনপটু; তাঁহার লেখায় সুন্দর ভঙ্গি আছে; ফল্গুস্রোতের মত বিদ্রূপের গতি আছে। তাঁহার যখন এত গুণ, তখন তিনি কেন কেবল ষোড়শী আর ষোড়শী করিবেন, কেন বর্ষীয়সী বাঙালী মার চিত্র অঙ্কন করিবেন না? ভালবাসা ত আর দাম্পত্যপ্রণয়ের, বা যৌবযোজনার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। বরং এমনও অনেকে বলেন যে, মার ভালবাসাই ভালবাসা। অনেকসময় মাতা প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখেন না। ব্যভিচারিণী "কাশীবাসিনী"র গল্পে সেই কথাই গ্রন্থকার একরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু ষোলটি গল্পের মধ্যে একটি কুলটা মার কাহিনীই কি যথেষ্ট? কখনই না।

বাঙালী বহুকাল হইতেই মাকে চিনিয়াছিল। ইংরেজিসাহিত্যসেবনে বিকৃতমস্তিষ্ক হইবার পূর্ব্বে 'মা মা' করিয়া বাঙালী পাগল হইত। আর ছড়া, গানে,—যাত্রায়, পাঁচালিতে—কি মাতৃগাথাই না গাঁথিয়া রাখিয়াছে! মহাশক্তি মা—কিন্তু সেই মার উপর আর একডিগ্রী মা বাঙালী চড়াইয়াছে। গিরিরাণী মেনকা বাঙালীর অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সংস্কৃতসাহিত্যের যশোদা বাঙালীর হস্তে কত মোলায়েম, কত ভাবময়ী, তাহাও কি আবার লিখিয়া বলিতে হইবে? যশোদাকে না দেখিলে, ভূতভাবন ভগবান্‌কে কি কেহ নীলমণি গোপাল বলিয়া কোলে টানিতে সাহস করিত? রামপ্রসাদ মার নামে যে জীবনী শক্তি দিয়া গিয়াছেন, তাহারই প্রসাদে বাঙালী এখনও নড়িতেছে। আর সেই মাকে, তোমরা, তোমাদের সাধের সাহিত্য হইতে বিতাড়িত করিয়া রাখিবে? তুমি পথে-ঘাটে বলিবে, বন্দে মাতরম্; আর সাহিত্যে কেবল লিখিবে, বন্দে ষোড়শীং রূপসীং প্রেয়সীম্! ছি! তুমি আপনাকে আপনি চিন না। ইংরেজিসাহিত্যের কুহকের মোহে তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ঐ মোহ কাটাইতে যত্ন কর। সাহিত্যে মাকে ভুলিও না। যে রাম বসু কিশোরকিশোরীর বিরহগীতি গাহিয়াছেন, তিনিই ত আগমনীগানে, মেনকা-উক্তিতে, নানাবিধ মাতৃছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। তুমিও যত্ন করিলে, সেইরূপই করিতে পারিবে, তবে কিনা একবার চোখে-মুখে জল দিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিতে হইবে, দারুণ মোহ ভাঙিতে হইবে।

৩। সমালোচনার জন্য তৃতীয় পুস্তক জিজ্ঞাসা, শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। গ্রন্থকার সাহিত্যজগতে সুপরিচিত, আমার নিকট ত বটেই। তিনি পণ্ডিত। তাঁহার কৃত এই গ্রন্থ, কতকগুলি দার্শনিক প্রবন্ধের সমষ্টি; গ্রন্থের নামকরণ বুঝাইবার জন্য ত্রিবেদী বলিয়াছেন, "গ্রন্থকারের এই প্রয়াস জিজ্ঞাসামাত্র।" ইহাতেই বুঝিয়াছি যে, এই তত্ত্ব গ্রন্থের সমালোচনাও আমার পক্ষে বিষম বিড়ম্বনা। দার্শনিকের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে আমার সম্ভাবনা কোথায়? জীবনসমস্যার অধিকাংশ বিষয়ে, আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর নির্ভর করি; এই গ্রন্থ শাস্ত্রসীমা স্পর্শ করে নাই। বল, কি বুদ্ধিতে আমি এই বিজ্ঞানগ্রন্থ নাড়াচাড়া করি? ভরসার মধ্যে এই,—গ্রন্থকার জিজ্ঞাসায় নিরস্ত হন নাই;—তিনি অনেক কথা নিঃসংশয়ে প্রচার করিয়াছেন। কিরূপ, তাহা দেখাইতেছি:—জড় ও জীবের মধ্যে যে ব্যবধান, "আজ

বিজ্ঞান তাহা লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ, কিন্তু দুই দিন পরে, এই ব্যবধান লঙ্ঘিত হইবে, তাহার সংশয় অল্প। * * * পার্থক্য কেবল জটিলতায়। জটিলতার শৃঙ্খল মুক্ত হইবে, সংশয় নাই।" এরূপ স্থলে গ্রন্থকার যে জিজ্ঞাসু নহেন, তাহার সংশয় নাই। বলিতে গেলে বলা যায়, গ্রন্থকার এই সকল স্থলে 'দেহাত্মবাদী'; এখন পাঠকের পক্ষে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, তাই কি? সাংখ্যে ও বেদান্তের শাঙ্করভাষ্যে, জড় ও জীবের মধ্যে পার্থক্য স্বীকৃত নহে, বলিলেও চলে। এই গ্রন্থে ও অন্যান্য লেখায়, ত্রিবেদী সাংখ্য-বেদান্ত অনুশীলনের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। গোতমের ন্যায়শাস্ত্রে জড়জীবের পার্থক্য স্বীকৃত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ত্রিবেদী পণ্ডিত, তবে তাঁহাতে গোতমসূত্র-পাঠের পরিচয় না পাইব কেন? এও ত জিজ্ঞাসা। ত্রিবেদী বলিতেছেন, "এই এক এব সদ্বস্তু, ইহার স্বরূপ কি? ইহা—সৎ, ইহা অস্তি, ইহা সত্যপদার্থ—তথাস্তু। ইহা চিৎ, ইহা চিন্ময়পদার্থ—mindstuff—তথাস্তু। ইহা—আনন্দ—তাই কি?" এই যে জিজ্ঞাসা, দর্শন-বিজ্ঞান কি ইহার উত্তর দিতে কখন পারিবে? উত্তর আছে, কেবল তোমাদেরই কাছে—ব্রাহ্মণের কাছে। তোমাদের মুখেই শুনিয়াছি—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন। বারবার বলিতেছি, আমার দ্বারা এ সকল কথার আলোচনা সম্ভবে না, তবে ধরে'-ভদ্র ঘটাইলে আর কি করা যায়? গ্রন্থকার একস্থলে মীমাংসা করিয়াছেন, "সৌন্দর্য্যপিপাসা মনুষ্যত্বের অঙ্গ।" ঠিক কথা। এই সৌন্দর্য্যপিপাসা বুঝিলেই, ও ভাবিয়া দেখিলেই অনেক কথা বুঝা যায়। এদিকে, আমার প্রাণে যেমন সৌন্দর্য্যের পিপাসা, ওদিকে তেমনই সুন্দর বিরাজমান; সেখানে একে অনেক; একত্বে বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যে একত্ব—আর এক দিক্ দিয়া বুঝিলেই বুঝা যায় যে, বিশৃঙ্খলায়,—শৃঙ্খলা। আবার সেইটি আর একরূপে দেখিলে, দেখা যায় যে, অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গলের আধিপত্য। এই যে সৌন্দর্য্য, শৃঙ্খলা, মঙ্গল,—ইহার উপলব্ধিতেই আনন্দ; সৌন্দর্য্যপিপাসা যেমন মনুষ্যত্বের অঙ্গ, এই সৌন্দর্য্য, শৃঙ্খলা, মঙ্গলের উপলব্ধিও মনুষ্যত্বের অঙ্গ। ইহার একরূপ ক্রম আছে;—বিভাগ আছে;—পশু হইতে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য মনের মধ্যে সৌন্দর্য্য বোধ করেন। তাহাই আনন্দের প্রথম সোপান। দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে বুঝেন শৃঙ্খলা। তাহাই আনন্দের দ্বিতীয় সোপান। আর ধার্ম্মিক আপনার আত্মাতে উপলব্ধি করেন,—মঙ্গল! পূরামাত্রায় পান আনন্দ। মঙ্গল না বুঝিলে, ধর্ম্ম বুঝা যায় না। শিষ্যকে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে শিখাইবে; শৃঙ্খলা বুঝাইয়া দিবে; দেখাইবে, মঙ্গলময়ের রাজ্যে মঙ্গলেরই লীলাখেলা। তবে ধর্ম্ম দাঁড়াইবে;—প্রকৃত আনন্দ আসিবে।

সচ্চিদানন্দের আনন্দে (জিজ্ঞাসা) সংশয়-উত্থাপন হওয়াতে এত কথা মনে আসিল। ধর্ম্মহীন বিজ্ঞান কখন এই আনন্দে পৌঁছিবে কি না, জানি না। তবে আমরা হিন্দু,—শাস্ত্র-বাদী, কাষ্ঠ বিজ্ঞান কি বলিবে, না বলিবে, তাহাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

আর একটা বড়-কথায়, দুইটা ছোট-কথা

বলিব। ডার্‌উইনের পর, প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন (বা natural selection) দর্শন-বিজ্ঞানের "জান" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই গ্রন্থেরও অনেকস্থলে প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনের দোহাই আছে। তবে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের আলোচনায় প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন যে কোন স্থান পাইতে পারে না, তাহাও গ্রন্থকার সুন্দর দেখাইয়াছেন।

তবে যেন বোধ হয়, 'প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন' এই কথাটার মোহ তিনি একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। দুইটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি ;—

(১) "যাই হোক, সৌন্দর্য্য ও তদনুভবজাত সুখ নইলে মানুষের জীবনযাত্রা দুঃসাধ্য হয় ; তাহাতেই মানুষের এই সৌন্দর্য্যসৃজনে ক্ষমতা জন্মিয়াছে, এই অনুমান, বোধ করি, অসঙ্গত নহে।"

(২) "এই হিসাবে মানুষের মন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে, অসুন্দরকে সুন্দর মূর্ত্তি দেয়। সৌন্দর্য্য কোন বস্তুর প্রকৃতিগত ধর্ম্ম নহে। এই হিসাবে প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনই জগৎকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।"

মানুষের ইচ্ছা ও সেই ইচ্ছাকে ফলবতী করিবার জন্য চেষ্টা—এই দুইটাকে জড়াইয়া প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন নাম দিলে, আমরা বিশেষ আপত্তি করি না। কিন্তু এইরূপ প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনের মধ্যে জীবনসংগ্রাম (বা struggle for existence) আছে, এইরূপ বলিলেই আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে। উনবিংশ শতাব্দীর কতকগুলি কুপের জীব পেটের দায়ে পৃথিবীময় দৌড়াদৌড়ি-হুড়াহুড়ি করিয়াছে, এবং তাহারা আপনা-আপনি আপনাদিগকে উন্নত বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়াছে—বলিয়াছে যে মারামারি-কাটাকাটিই উন্নতির মূল,—এ কথা একেবারেই স্বীকার করা যায় না। কলাবিদ্যা বা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, পেটের দায়ে মারামারিতে, হয় নাই। গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন, "সৌন্দর্য্যপিপাসা মনুষ্যত্বের অঙ্গ।" সেই পিপাসার নিবৃত্তি মারামারি-হুড়াহুড়িতে হয় না। প্রত্যুত শান্তিতেই হইয়া থাকে। দাম্পত্যদায়ে কতকটা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সমস্ত বুঝান যায় না। বাকিটা বুঝাইবার জন্য আর যাহা বলিতে হয়, বল, কিন্তু জীবনসংগ্রাম তাহার মূল,—বলিও না। গ্রন্থকার তাহা বলেনও নাই ; তবে নাকি সৌন্দর্য্যতত্ত্বে তিনি একরূপ প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন আনিয়াছেন, তাহাতেই দুটা কথা বলিতে হইল।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

পন্থা! "পন্থা" পন্থা!

দশমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিষয়ক উচ্চশ্রেণীর

মাসিক পত্রিকা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জলতম রত্ন সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল,

ও

"প্রচারের" সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল ও দার্শনিক লেখক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মুন্সেফ মহোদয় দ্বয়ের সম্পাদকতায়

"বঙ্গীয় ব্রহ্মবিদ্যা সমিতির" তত্বাবধানে পরিচালিত রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী রায় বাহাদুর এম, এ, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল মজুমদার এম, এ এসিষ্টাণ্ট একাউণ্টাণ্ট জেনারেল, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন ব্যারিষ্টার-য্যাট-ল, বাঁকিপুরের গবর্ণমেণ্ট প্লিডার শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ এম, এ, বি, এল, সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ সম্পাদক ও সর্ব্বজন পরিচিত প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বিজয়কেশব মিত্র এম, এ, বি, এল, শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের এসিষ্টাণ্ট ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কলিকাতার মিউনিসিপালটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম, ডি, সংস্কৃত কলেজের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত হরিচরণ রায় এম, এ, এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ লেখকগণের সুগভীর গবেষণাপূর্ণ সুপাঠ্য ও সুলিখিত প্রবন্ধে পন্থার কলেবর প্রায়ই পূর্ণ থাকে।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গূঢ়তত্ব সমূহ জনসাধারণের বহুল প্রচার করাই পন্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। সর্ব্বসাধারণের সুবিধাকল্পে আবার পন্থার মূল্যও অতীব অল্প স্থিরীকৃত হইয়াছে। পন্থার আকার ডিমাই আটপেজি ৫ ফর্ম্মা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০ এক টাকা চারি আনা। মফঃস্বলে ১৷৵০ টাকা ছয় আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।—প্রকাশক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

৮৭ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গদর্শন।

কামনা।

ইমনকল্যাণ—ঝাঁপতাল।

বিপদে মোরে রক্ষা কর এ মোর নহে প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়!
দুঃখশোকে ব্যথিতচিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়!
সহায় কোনো না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের প্রাণে না যেন মানি ক্ষয়!

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ মোর নহে প্রার্থনা
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।
নম্রশিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে,
দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশ্বের পরিণাম।

কিছুদিন হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মনে একটা ভয়ানক আতঙ্ক আসিয়াছে,—বুঝি বা বিশ্বের শক্তি ক্রমেই নিশ্চল ও অক্ষম হইয়া আসিতেছে। শক্তির ধ্বংস নাই বলিয়া আধুনিক বিজ্ঞানে যে একটা কথা আছে, তাহা অতি সত্য। বিশ্বরচনাকালে বিধাতা যে শক্তি দিয়া তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কাহারো সাধ্য নাই, তাহার অণুমাত্র ক্ষয় করে। তুমি একখণ্ড ইট্ লইয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিলে। হয় ত মনে করিলে, তুমি একটা শক্তির সৃষ্টি করিয়া, তাহার দ্বারাই ইট্খানিকে সচল করিয়া দিলে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়, ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল শক্তিরাশির যে এক অতি ক্ষুদ্র অংশ তুমি আহার্য্যাদির সহিত দেহস্থ করিয়াছিলে, তোমার দেহ তাহাই ইষ্টকখণ্ডে প্রয়োগ করিয়াছিল। ইষ্টক আবার সেই শক্তির কতক অংশ বাতাসের ঘর্ষণে তাপ উৎপন্ন করাইয়া এবং মাটিতে আঘাত দিয়া তাহাকে একটু গরম করাইয়া নিশ্চল হইয়া গেল। সুতরাং ইট্ ছুঁড়িয়া তুমি যে শক্তিকে মিছামিছি নষ্ট করিলে বলিয়া মনে করিতেছ, সত্য কথা বলিতে গেলে তাহা নষ্ট হইল না। বাতাস ও মাটিকে গরম করিয়া সেই শক্তিই আবার কতকগুলি নূতন কার্য্য সুরু করিয়া দিল।

বলা বাহুল্য, ঐ ঢিল-ছোঁড়া বিশ্বের বিচিত্র শক্তিলীলার একটা তুচ্ছ উদাহরণ। কিন্তু মেঘবৃষ্টি, জন্মমৃত্যু, ক্ষয়বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডের খুব বড়-বড় কাজগুলাও ঐ ঢিল-ছোঁড়ার মতই চলিয়া থাকে। সকলেই বিশ্বের ভাণ্ডার হইতে একএকটু শক্তি সংগ্রহ করিয়া, এবং তাহাকেই নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রকৃতির বিচিত্র লীলা দেখায়। ইহাতে শক্তির ব্যয় হয় বটে, কিন্তু ধ্বংস হয় না। এক আধার ত্যাগ করিয়া আধারান্তরে পৃথক্ আকারে আশ্রয়গ্রহণ করাই শক্তির কাজ। বৈজ্ঞানিকগণ আশঙ্কা করিতেছেন, সম্ভবত দূর ভবিষ্যতে বিশ্বের এই শক্তিলীলার অবসান হইবে।

আশঙ্কাটির কারণ কি, এখন আলোচনা করা যাউক। আমরা যখনি শক্তি আহরণ করিয়া তাহার দ্বারা কাজ করাইয়া লই, শক্তির অতি অল্প অংশই সেই কাজে ব্যয়িত হয়, অবশিষ্টটা নানাপ্রকারে তাপে পরিণত হইয়া পড়ে। মনে করা যাউক, কয়লা পোড়াইয়া ও তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিকে মুক্ত করিয়া, আমরা রেলগাড়ি চালাইতে যাইতেছি। এই শক্তির সমস্তটা কখনই গাড়ি চালাইবার কাজে ব্যয়িত হইবে না। অধিকাংশই রেল ও চাকায় সংঘর্ষণ করাইয়া ও নানাপ্রকার শব্দের তরঙ্গ তুলিয়া অনাবশ্যক তাপে পরিণত হইয়া পড়িবে।

তাপ উৎপন্ন হইলে তাহাকে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ রাখা বড় সহজ ব্যাপার নয়। পার্শ্বের শীতল পদার্থকে গরম করিয়া সকলকে সমভাবে উষ্ণ রাখিবার জন্য তাপমাত্রেরই এক প্রবল চেষ্টা দেখা যায়। জল যখন উঁচুস্থানে থাকে, কেবল তখনি নীচে আসিবার জন্য

তাহার চেষ্টা হয়, এবং এই সুযোগে তাহার দ্বারা আমরা নানাপ্রকার কাজ করাইয়া লই। তাপের কার্য্যটাও অবিকল তদ্রূপ,—এক স্থানে সঞ্চিত তাপের পরিমাণ যখন পার্শ্বস্থ স্থানের তাপ অপেক্ষা অধিক হয়, তখন সেই সঞ্চিত তাপ পার্শ্বের শীতল পদার্থকে গরম করিবার জন্য ছুটাছুটি আরম্ভ করে, এবং এই সুযোগে আমরা তাহার দ্বারা কাজ করাইয়া লই; কারণ, সকলের উষ্ণতা সমান হইয়া দাঁড়াইলে, তাপ-চলাচল বন্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাপের কাজও রোধ পাইয়া যায়।

বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, জগতের প্রত্যেক কার্য্যে নানাপ্রকারে যে 'অনাবশ্যক তাপ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা সমগ্র বিশ্বটার উষ্ণতা সমান করিবার জন্য ব্যয়িত হইয়া যাই-তেছে। উচ্চস্থানে জল একবার নীচের সমতল ক্ষেত্রে নামিলে তাহা যেমন স্থির হইয়া দাঁড়া-ইয়া থাকে, এবং কোনপ্রকার কাজ করে না, বিশ্বের ভাণ্ডারস্থ শক্তির অবস্থা ক্রমে সেই-প্রকার হইয়া দাঁড়াইতেছে। যে শক্তিরাশি তাপাকার প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বের সমগ্র পদার্থকে সমোষ্ণ করিতে যাইতেছে, তাহাকে আমরা চিরদিনের জন্য হারাইতেছি। তাহাকে উদ্ধার করিয়া কাজে লাগাইবার সত্যই আর কোন উপায়ই নাই।

জলবায়ুর প্রবাহ, প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্ম-মৃত্যু, কলকারখানার কাজকর্ম্ম প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই প্রকৃতির সক্ষমশক্তির কিয়দংশ প্রতি মুহূর্ত্তেই তাপে পরিণত হইয়া পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে অক্ষমশক্তিতে পরিণত হইয়া পড়ি-তেছে। কিন্তু এদিকে প্রকৃতির শক্তির পরি-মাণ সসীম। এইজন্য ভয় হইতেছে,—বিশ্বকে সমোষ্ণ করিবার জন্য সক্ষমশক্তি কণায় কণায় ক্ষয় পাইয়া যেদিন প্রকৃতির শক্তি-ভাণ্ডারকে শূন্য করিয়া দিবে, তখন বিশ্বের আর কোন বৈচিত্র্যই থাকিবে না। সমগ্র শক্তিরাশি একমাত্র তাপেই পরিণত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত পদার্থকে সমোষ্ণ করিয়া রাখিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সৃষ্টি নিশ্চল ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িবে। শক্তিসম্পন্ন হইয়াও প্রকৃতি তখন শক্তিহীন হইয়া দাঁড়াইবে।

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বৈজ্ঞানিকদিগের পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কাটি কি প্রকৃত? ব্রহ্মাণ্ড কালে সমোষ্ণ হইবে নিশ্চিত, কিন্তু তাহাতে কি সত্যই প্রাকৃতিক কার্য্যগুলি বন্ধ হইয়া যাইবে?

এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বহু পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষায় তাপের কার্য্যসম্বন্ধে যে কয়েকটি সাধারণ-নিয়ম (Laws of Thermo-dynamics) আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা সত্য হইলে বলিতে হয়, বৈজ্ঞানিকদিগের আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নয়। ইঁহারা তাপের কার্য্য পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কোন জিনিষের সর্ব্বাংশের উষ্ণতা একই হইলে, ইহার এক অংশের তাপ কখনই আপনা হইতে অপর অংশে আসিয়া সঞ্চিত হইতে পারে না। এ অবস্থায় তাপচলাচল সম্পূর্ণ লোপ পায়। কাজেই এখানে সেই তাপদ্বারা কোন কাজ পাইবার সম্ভাবনা থাকে না, পাইতে হইলে বাহির হইতে কোনপ্রকার শক্তি পদার্থের উপর প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়।*

* The second law of Thermo-dynamics

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নানা পদার্থের ভিতরকার শক্তির পার্থক্যই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মূলকারণ। কোন জিনিষ অধিকপরিমাণ শক্তি আহরণ করিয়া, যখন অল্পশক্তিসম্পন্ন অপর পদার্থের উপর তাহার প্রভাব দেখাইতে আরম্ভ করে, আমরা তখনি এক-একটি প্রাকৃতিক ঘটনা দেখি। সুতরাং কালক্রমে প্রকৃতির সমগ্রশক্তি সমভাবে বিতরিত হইয়া, যখন পদার্থমাত্রকেই সমোষ্ণ করিবে, তখন সেই শক্তিতে আর কোন কাজই হইবে না। কাজ করাইয়া লইতে হইলে, তাহার উপর আবার কোন শক্তিপ্রয়োগ আবশ্যক। কিন্তু ঐ অবস্থায় কণামাত্র শক্তি বাহিরে থাকিবে না, সকলই তাপে পরিণত হইয়া বিশ্বের সর্ব্বাঙ্গে সমভাবে অবস্থান করিবে। সুতরাং তাপ ও তাহার কার্য্যের পূর্ব্ববর্ণিত নিয়মটির (The second law of Thermo-dynamics) উপর বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, দূর ভবিষ্যতে বিশ্বের সমগ্র শক্তিকে তাপাকারে দেহস্থ করিয়া প্রকৃতি নিশ্চয়ই নিশ্চল ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িবে।

সমোষ্ণ পদার্থের তাপদ্বারা কাজ করাইতে হইলে যে বাহিরের শক্তি একান্ত আবশ্যক, সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্লার্ক-ম্যাক্স্‌ওয়েলসাহেব তাহা স্বীকার করিতে চাহেন নাই। আবদ্ধ পাত্রে কোন বায়বীয় পদার্থ রাখিয়া তাপ দিলে, তাপের বৃদ্ধির সহিত তাহার চাপের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। এই চাপবৃদ্ধির কারণ-প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিকগণ একটি সিদ্ধান্ত (Kinetic theory of gases) খাড়া করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায়, বায়বীয় পদার্থের অণুগুলি সর্ব্বদাই ভীমবেগে ছুটাছুটি করে, এবং আবদ্ধ হইয়া পড়িলে পরস্পরকে ধাক্কা দিয়া ও পাত্রের গায়ে আঘাত করিয়া একটা চাপের সৃষ্টি করিতে থাকে। ইহাই বায়বীয় পদার্থের চাপ। তাপের মাত্রাবৃদ্ধি করিলে ঐ আণবিক বেগের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়, কাজেই তখন ধাক্কাগুলিও খুব প্রচণ্ডভাবে চলিতে থাকে, ও সঙ্গে সঙ্গে চাপও অধিক হইয়া দাঁড়ায়। হিসাব করিলে দেখা যায়, নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় বায়বীয় পদার্থের অণুর গতি গড়পড়্তায় ঠিক্ একই থাকে, কিন্তু প্রত্যেক অণুর গতি পরীক্ষা করিলে কাহারো গতি কম ও কাহারো বেশী হইতে দেখা যায়।

সমোষ্ণ বায়বীয় পদার্থের অণুগুলিকে এই-প্রকারে বিবিধ গতিতে চলিতে দেখিয়া, সমোষ্ণ করিলেই যে সেই তাপ অক্ষম হইয়া গেল, তাহা ম্যাক্স্‌ওয়েলসাহেব স্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, সমোষ্ণ বায়বীয় পদার্থ হইতে দ্রুতগামী অণুগুলি যদি পৃথক্ হইয়া দাঁড়ায়, তবে নিশ্চয়ই দুইদল বিচ্ছিন্ন অণুরাশির মধ্যে দ্রুতগামীর দ্বারা কিছু কাজ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং সমোষ্ণপদার্থস্থ শক্তি যে একবারে অক্ষম, তাহা বলা যায় না।

ক্লার্ক-ম্যাক্স্‌ওয়েলসাহেবের পূর্ব্বোক্ত সুযুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদটিকে সকলেই যথার্থ বলিয়া অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু কেবল বায়বীয় পদার্থের অতি সূক্ষ্ম লক্ষলক্ষ অণুর গতি লইয়া যে সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা, তাহা প্রকৃতির বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যে খাটিবে কি না, এবং কোন চতুরশিল্পী ঐ সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করাইবার জন্য যন্ত্র-

নির্ম্মাণে সক্ষম হইবেন কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। কাজেই ম্যাক্‌স্‌ওয়েল-সাহেবের প্রতিবাদসত্ত্বেও বিশ্বের ভয়াবহ পরিণামের আশঙ্কা অক্ষুণ্ণই রহিয়া গিয়াছিল।

ইউরেনিয়ম্ ও রেডিয়ম্ প্রভৃতি কয়েকটি ধাতুর বিয়োগ ও তেজোনির্গমন (Radio-activity) আবিষ্কার হওয়ার পর, পদার্থ-তত্ত্বের উপর যে এক নূতন আলোক আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার কথা পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। এই সকল আবিষ্কার হইতে জানা গেছে, পদার্থমাত্রেই বিয়োগধর্ম্মী ও তেজোনির্গমনক্ষম। অর্থাৎ হাইড্রোজেন, অক্সিজেন্, লৌহ, তাম্র, সীসক প্রভৃতিকে যে আমরা মূল জড়পদার্থ বলিয়া আসিতেছিলাম, তাহারা মূল-পদার্থ নয়। সকলেই ইলেক্ট্রন্-(Electron)-নামক এক অতিসূক্ষ্ম পদার্থ ত্যাগ করিয়া বিয়োগ প্রাপ্ত হইতেছে, এবং যে শক্তিতে ইলেক্ট্রন্‌গুলি জোট্ বাঁধিয়া নানা পদার্থের উৎপত্তি করিয়াছিল, তাহাও বিয়োগকালে তাপাকারে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। এই ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদিগের মনে আর এক নূতন আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছে। সকলে ভাবিতেছেন, বুঝি দূর ভবিষ্যতে সমগ্র বিশ্বটা জড়ের মূল উপাদান সেই ইলেক্ট্রনে পরিণত হইয়া যায়।

এই আশঙ্কার সঞ্চার হইলে বৈজ্ঞানিকগণের মনে হইয়াছিল, গুরুভারবিশিষ্ট পদার্থ যেমন শক্তিত্যাগ করিয়া ইলেক্ট্রনে বিযুক্ত হইয়া পড়িতেছে, সেইপ্রকার ঐ বিচ্ছিন্ন ইলেক্ট্রন্‌গুলি সেই পরিত্যক্ত শক্তি আহরণ করিয়া নূতন পদার্থ উৎপন্ন করিতে পারে না কি? অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছিল, এবং সম্প্রতি বিয়োগজাত ইলেক্ট্রন্ হইতে পদার্থের পুনর্গঠনের সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে।

পাঠক অবশ্যই জানেন, রশ্মিনির্ব্বাচন-যন্ত্র-(Spectroscope)-সাহায্যে অতি দূরবর্ত্তী নক্ষত্রজগতেরও খবর আমরা ঘরে বসিয়া জানিতে পারি। জ্যোতিষ্কগুলির প্রাকৃতিক অবস্থা কিপ্রকার এবং তাহাতে কোন্ কোন্ পদার্থ প্রজ্বলিত হইতেছে, ঐ যন্ত্রদ্বারা তাহা স্পষ্ট ধরা পড়ে। অনেক নীহারিকাময় জ্যোতিষ্ক (Nebulae of meteorites) পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে, সেগুলির জটিল উপাদান তাপসাহায্যে বিযুক্ত হইয়া পড়িলে, যন্ত্রে কতকগুলি সরল পদার্থের লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং কালক্রমে তাহাই শীতল হইয়া পড়িলে নানা জটিলপদার্থের চিহ্ন দেখা যায়। সুতরাং এখানে কতকগুলি মৌলিক-জড়পদার্থ একবার বিযুক্ত হইয়া সেই বিয়োগজাত পদার্থ হইতে যে আবার নানা মৌলিকপদার্থের উৎপত্তি করে, এ কথা স্বীকার করিতেই হয়। এই ব্যাপার ছাড়া সুবিখ্যাত রসায়নবিদ্ র‍্যাম্‌জে-(Sir William Ramsay)-সাহেব কয়েকটি পরীক্ষায় মৌলিক-পদার্থকে স্পষ্ট পদার্থান্তরে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি সত্যই বিশ্বের উপাদানের বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পুনর্গঠন চলিতেছে? সত্য হইলে বলিতে হয়,—বিশ্বস্থ পদার্থ সমোষ্ণ হইয়া আর সৃষ্টিনাশ করিতে পারিবে না। কিন্তু প্রশ্নটির স্পষ্ট উত্তর কোন বৈজ্ঞানিকই অদ্যাপি দিতে পারেন নাই। জ্যোতিষ্কপর্য্যবেক্ষণ ও অধ্যাপক র‍্যাম্‌জের পরীক্ষায় পদার্থের পুনর্গঠনের আভাস-

মাত্র পাওয়া গেছে। ইহার উপর নির্ভর করিয়া এখন স্পষ্ট উত্তর দেওয়া অসম্ভব। সমোষ্ণ-পদার্থস্থ শক্তির কার্য্যক্ষমতার কথা ক্লার্ক-ম্যাক্স্‌-ওয়েলসাহেব বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেটি এত অপরীক্ষিত ব্যাপার, যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়াও কোন কথা বলা চলে না। কাজেই এই প্রশ্নের সুমীমাংসার জন্য কিছুদিন কোন-এক ভবিষ্য আবিষ্কারের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। প্রতীক্ষাকাল প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। মহাবিষ্কারটির ছায়া দেখা দিয়াছে, শীঘ্রই তাহার সুস্পষ্ট পূর্ণমূর্ত্তি দেখা যাইবে। যে সকল মহাসত্যের সাক্ষাৎ পাইয়া আমাদের অতি প্রাচীন ঋষিরা বলিয়াছিলেন --

"ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্‌"

"আত্মৈবেদং সর্ব্বম্‌"

আজ বহুসহস্রবৎসর পরে পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ বিজ্ঞানালোকে সেই সত্যকে দেখিয়া বলিবেন, জগতের স্রষ্টা যেমন অনন্ত এবং জরামৃত্যুরহিত, তাঁহার সৃষ্টিও সেই-সকল-গুণসম্পন্ন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

হারামণির অন্বেষণ।

৩

ব্যক্তাব্যক্তরহস্য।

যাত্রাকালে পথযাত্রীর পক্ষে দুইটি কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ সমান আবশ্যক। প্রথমে দেখা চাই—কাজের সামগ্রীগুলি সমস্তই মোট বাঁধিয়া সঙ্গে লওয়া হইয়াছে কি না; তাহার পরে দেখা চাই—যে-সময়ের জন্য যাহা প্রয়োজন, সেই সময়ে তাহা ঝট্‌পট্‌ খুঁজিয়া পাইতে পারিবার মতো সুন্দর প্রণালীতে সমস্ত ব্যবহার্য্য-দ্রব্য গুছাইয়া রাখা হইয়াছে কি না। প্রথম কার্য্যটি (অর্থাৎ মোটবাঁধা-কার্য্যটি) একপ্রকার হইয়া চুকিল মন্দ না—প্রাণ, মন, জ্ঞান, এই তিন বৃহৎ প্যাঁটরা'র মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পুরিয়া ফ্যালা হইল। এখন, দ্বিতীয় কার্য্যটি (দ্রব্যাদি ভাগ-ভাগ করিয়া সুপ্রণালীতে গুছাইয়া রাখা কার্য্যটি) হইয়া-চুকিলেই নির্ঝঞ্ঝাট হওয়া যায়। তাহাতেই প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বিশাল অরণ্যে যে অগ্নি কোথায় লুকাইয়া থাকে, তাহা জানিতে পারা ভার, দাবানলের আরম্ভকালে সেই অগ্নিই (অরণ্য-দারুর অন্তর্নিগূঢ় অগ্নিই) শাখাগুলা'র ঝুটো-'পুটি'র উপদ্রবে উত্ত্যক্ত হইয়া হেথা-হোথা-সেথা ছিন্নছিন্নভাবে ফুটিয়া বাহির হয়; ক্ষণপরে আবার সেই অগ্নিই প্রচণ্ডবেগে সমস্ত অরণ্যের আপাদমস্তক অধিকার করিয়া আকাশে জয়পতাকা উড্ডীয়মান করে। আমাদের মধ্যেও অগ্নি আছে; সে অগ্নি আধ্যাত্মিক অগ্নি; তাহার নাম চেতন।

যে-চেতন আমাদের প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থার

আমাদের ভিতরে কোথায় লুকাইয়া থাকে, তাহা আমরা জানিতেও পারি না, আমাদের স্বপ্নাবস্থায় সেই চেতনই বাসনাবশে ছিন্ন-ছিন্নভাবে ফুটিয়া বাহির হয়; আবার, আমাদের জাগরণকালে সেই চেতনই আমাদের অন্তঃকরণের আপাদমস্তক অধিকার করিয়া মুক্ত চিদাকাশে ঈশনার জয়পতাকা উড্ডীয়মান করে।

তিন অবস্থার অগ্নি যেমন তিনপ্রকার, তিন অবস্থার চেতনও তেম্নি তিনপ্রকার। নিদ্রাবস্থার অব্যক্ত-চেতন কাষ্ঠের অন্তর্নিগূঢ় তাপাগ্নি; স্বপ্নাবস্থার অর্দ্ধস্ফুট-চেতন তপ্তাঙ্গারের গা-ঘঁ্যাসা দাহাগ্নি; জাগরিতাবস্থার সুব্যক্ত চেতন আকাশ-লেলিহ্যমান শিখাগ্নি।

প্রথমাবস্থার অব্যক্ত-চেতনের সংক্ষিপ্ত নাম **প্রাণ**; মাঝের অবস্থার অর্দ্ধস্ফুট-চেতনের সংক্ষিপ্ত নাম **মন**; তৃতীয় অবস্থার সুব্যক্ত-চেতনের সংক্ষিপ্ত নাম **জ্ঞান**।

প্রাণ অব্যক্তসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ঘুমের ঘোরে বাঁধা-পথে চলে। শাস্ত্রে অব্যক্ত-সংস্কারের নাম আছে ঝুড়ি-ঝুড়ি; প্রাক্তন-সংস্কার, অদৃষ্ট, নিয়তি, কর্ম্মবিপাকাশয়, এ সব নাম তাহারই নাম। পরন্তু কেহ যদি ঐ সব ধেড়ে-ধেড়ে নামের বোঝা তোমার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিয়া তোমার কাছে পারিতোষিক মাগে, তবে তুমি যে তাহাকে কিরূপ পারিতোষিক প্রদান কর, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে; অতএব তাহাতে কাজ নাই। "সংস্কার" বলিতে কি বুঝায়, তাহা আমরা সকলেই জানি;—উপস্থিত কার্য্য-নির্ব্বাহের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। প্রাণ অব্যক্তসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ঘুমের ঘোরে বাঁধাপথে চলে; মন বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া কল্পনাস্বপ্নের কাল্পনিক সত্তাতে অবগাহন করে; জ্ঞান ঈশনায় ভর করিয়া দাঁড়াইয়া বস্তুসকলের বাস্তবিক সত্তাতে অবগাহন করে, এক কথায়—সত্যে অবগাহন করে।

তিন অবস্থার তিনপ্রকার অগ্নি শুধু যে কেবল একটার পর আরেকটা পরে-পরে আবির্ভূত হয়, তাহা নহে, পরন্তু একটার পর আরেকটা পরে-পরে আবির্ভূত হইয়া স্তরে-স্তরে উপর্য্যুপরি সন্নিবেশিত হয়। দাবানলের প্রজ্বলিত অবস্থার অগ্নির মধ্যে তুমি যদি অনুসন্ধান-দৃষ্টি চালনা কর, তবে সবা'র উপরের স্তরে দেখিবে মুক্ত আকাশে উত্থান করিতেছে প্রজ্বলিত শিখাগ্নি; মাঝের স্তরে দেখিবে কাষ্ঠভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতেছে দাহাগ্নি; নীচের স্তরে ঘুমাইয়া রহিয়াছে দেখিবে দগ্ধাবশিষ্ট ভস্মরাশির অন্তর্নিগূঢ় তাপাগ্নি। তেম্নি আবার তুমি যদি তোমার জাগরিতাবস্থার সুব্যক্ত-চেতনের ভিতরে উঁকি দিয়া দেখ, তবে উপরের স্তরে রহিয়াছে দেখিবে জ্ঞানের দিবালোকে দেদীপ্যমান ঈশনার জাগ্রতভাব; মাঝের স্তরে রহিয়াছে দেখিবে অর্দ্ধস্ফুট-চেতনের সান্ধ্যচ্ছায়ায় পরিবৃত বাসনার স্বপ্ন; নীচের স্তরে রহিয়াছে দেখিবে প্রাণের অমানিশায় অবগুণ্ঠিত ঘুমন্ত-সংস্কার।

সে কথা যা'ক্! তুমি একটু পূর্ব্বে যাঁহার কথা বলিতেছিলে—তোমার সেই পুরাতন বন্ধু দেবদত্ত কি সরেস লোকই ছিলেন! আজিকের বাজারে তাঁহার মতো সদাশয় লোক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি আজ তিনবৎসর হইল তোমার নিকট

হইতে বিদায় লইয়া সেই-যে-সেই দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত ঘুণাক্ষরেও তাঁহার কোনো সংবাদ তুমিও পাও নাই, আমিও পাই নাই। তুমি তো জানি সহরের মধ্যে একজন সেরা চিত্রকর; তোমার মন থেকে দেবদত্তের একখানি ছবি যদি তুমি আমাকে আঁকিয়া দিতে পার, তবে তোমাকে আমি কত যে ধন্যবাদ দিই, তাহা বলিতে পারি না; কেন না, দেবদত্ত আমারও পরম বন্ধু ছিলেন। তাহা তুমি কিছুতেই পারিয়া উঠিবে না, তাহা জানি; তাহা জানিয়াও, এটা আমি সুনির্ঘাত বলিতে পারি যে, দেবদত্তের দিব্য একখানি ছবি তোমার প্রাণের চোর-কুটুরার ছবির আল্‌মারিতে গুছানো রহিয়াছে; আর, সে যে ছবি, তাহা দেবদত্ত বিশবৎসর পূর্ব্বে যেমনটি ছিলেন, তাহারই মতো অবিকল। তার সাক্ষী—এইমাত্র তুমি আমাকে বলিলে যে, গতরাত্রের স্বপ্নে দেবদত্তকে তুমি দেখিয়াছ—ঠিক্ সেই বিশবৎসর পূর্ব্বের দেবদত্ত যেন তোমার সম্মুখে মূর্ত্তিমান্। ব্যাপারটা যাহা ঘটিল, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে প্রাণের অব্যক্ত-সংস্কার মনের বাসনাতে সোয়ার হইয়া কল্পনার রঙ্গভূমিতে দেবদত্তবেশে সাজিয়া বাহির হইল।

এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে তুমি যদি জানালার ফাঁক দিয়া হঠাৎ দেখ যে, একটি অর্দ্ধপ্রবীণ-গোচের পথযাত্রী বৃষ্টির ভয়ে রাস্তার ও ধারের ঐ ময়রার দোকানটার দ্বারের গোড়ায় দাঁড়াইয়া বৃষ্টি-ধরিয়া-যাওনের অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে, আর, তিনি যদি তোমার সেই পুরাতন বন্ধু দেবদত্ত হ'ন্, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমার মন বলিবে—"ভদ্রলোকটি না-জানি কে?" ইহারি নাম জিজ্ঞাসা। তাহার পরে তোমার গতরাত্রের স্বপ্নের প্রফুল্ল যুবা সম্মুখস্থিত বিমর্ষভাবাপন্ন অর্দ্ধপ্রবীণ ব্যক্তিটির সহিত মিশিয়া যাইতে চেষ্টা করিবে, আর, সে চেষ্টার প্রথম উদ্যমে তুমি দেবদত্তকে চেন' চেন' করিয়াও চিনিতে না পারিয়া ক্রমাগতই তাঁহার মুখাকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকিবে; ইহারই নাম অনুসন্ধান। তাহার পরে তুমি সেই অর্দ্ধপ্রবীণ ব্যক্তিটির মুখচক্ষুর আকারপ্রকার-ভাবভঙ্গীর ভিতরে কয়েকটি পূর্ব্বপরিচিত অভিজ্ঞানচিহ্ন খুঁজিয়া পাইয়া আচম্বিতে বলিয়া উঠিবে—"এ কি! দেবদত্ত যে!" ইহারই নাম অনুমান। এই যে তোমার মনোমধ্যে জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান, এবং অনুমান একটার পর আর একটা পরে-পরে আসিয়া স্ব স্ব কার্য্যে কোমর বাঁধিয়া বসিয়া গেল—এ তো দেখিতেছি একপ্রকার গরিবী চাল; যে-ওস্তাদ পিছনে থাকিয়া চাল চালিতেছে, তাহাকে তো কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না; খুঁজিয়া পাইব কেমন করিয়া? সে যে অব্যক্ত-সংস্কার; অব্যক্তসংস্কার আপনাকে ধরিতে-ছুঁইতে দিবার পাত্র নহে তাহা কেবল ফলেন পরিচীয়তে।

গতরাত্রের স্বপ্নে তোমার মনোমধ্যে জিজ্ঞাসাও ছিল না, অনুসন্ধানও ছিল না; গতরাত্রে শুদ্ধ-কেবল বাসনার মন্ত্রের চোটে অর্দ্ধস্ফুট-চেতনের ঝাপ্‌সা আলোকে দেবদত্তের প্রতিমূর্ত্তি তোমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দেখা দিয়াছিল। বাসনা অব্যক্তসংস্কারের এক-ধাপ-উপরের স্তরে নবপ্রসূত পক্ষিশাবকের ন্যায় ক্ষণে ওড়ে, ক্ষণে ভূমিতে লুণ্ঠন করে,

এক কথায়—উড়ু উড়ু করে। বাসনা প্রাণঘ্যাঁসা ইচ্ছা বা প্রাণঘ্যাঁসা মন। গতরাত্রের স্বপ্নে তোমার অর্দ্ধস্ফুট-চেতন শুদ্ধকেবল বাসনাতে ভর করিয়া সম্মুখবর্ত্তী বিষয়ের কাল্পনিক সত্তায় অবগাহন করিয়াছিল। আজ তুমি জাগরিতাবস্থার সুব্যক্ত-চেতনের দিবালোকে সুপ্রত্যক্ষ বিষয়ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা এবং অনুসন্ধান চালনা করিয়া জানিতে পারিলে যে, দেবদত্ত তোমার সম্মুখে বিরাজমান। আজ্‌কে'কার এই যে তোমার জাগ্রতভাবের জিজ্ঞাসা এবং অনুসন্ধান, ইহার ভিতরে ঈশনার হস্ত স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ঈশনা আর-কিছু না—জ্ঞানঘ্যাঁসা ইচ্ছা বা জ্ঞানঘ্যাঁসা মন। গতরাত্রে তোমার মনের বাসনার নীচের স্তরে প্রাণের অব্যক্তসংস্কার তলে-তলে কার্য্য করিয়াছিল; আজ তোমার জ্ঞানের ঈশনার নীচের স্তরে মনের বাসনা এবং তাহারো নীচের স্তরে প্রাণের অব্যক্তসংস্কার তলে-তলে কার্য্য করিয়া তোমার জ্ঞানের আনুমানিক সিদ্ধান্তে বলসঞ্চার করিল। তবেই হইতেছে যে, তোমার জাগরিতাবস্থায় জ্ঞান, মন এবং প্রাণ, তিনই একজোট হইয়া কার্য্য করে; স্বপ্নাবস্থায় মন এবং প্রাণ একজোট হইয়া কার্য্য করে; নিদ্রাবস্থায় প্রাণ একাকী কার্য্য করে। যেমন রাজা এবং সেনা একজোট হইয়া যুদ্ধ করিতেছে বলিলেই বুঝায় যে, রাজা, সেনাপতি এবং সেনা, তিনই একজোট হইয়া যুদ্ধ করিতেছে, তেম্‌নি জ্ঞানবান্ জীবের জাগরিতাবস্থায় জ্ঞান এবং প্রাণ একজোট হইয়া কার্য্য করিতেছে বলিলেই বুঝায় যে, জ্ঞান, মন এবং প্রাণ, তিনই একজোট হইয়া কার্য্য করিতেছে। তা ছাড়া, যেমন রাজা এবং সেনাপতি দুইকে একসঙ্গে ধরিয়া বলা যাইতে পারে—সৈন্যের অধিনায়ক, তথৈব, সেনা এবং সেনাপতির অধীনস্থ সর্দারদিগকে একসঙ্গে ধরিয়া বলা যাইতে পারে—সেনা; সেইরূপ ন্যায়ে—স্থলবিশেষে আবশ্যক হইলে জ্ঞান এবং জ্ঞানঘ্যাঁসা মন দুইকে একসঙ্গে ধরিয়া সংক্ষেপে বলা যাইবে জ্ঞান, তথৈব, প্রাণ এবং প্রাণঘ্যাঁসা মন দুইকে একসঙ্গে ধরিয়া সংক্ষেপে বলা যাইবে প্রাণ। এরূপ-স্থলে জ্ঞান এবং প্রাণ একজোট হইয়া কার্য্য করিতেছে বলিলেই জ্ঞান এবং প্রাণের মাঝের জায়গায় মনও যে কার্য্য করিতেছে, তাহা আপনা আপনিই বুঝাইয়া যাইবে, আর, তাহা হইলেই স্বতন্ত্ররূপে মনের নামোল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

ক্ষেত্র দেখ :—

সংক্ষিপ্ত নামকরণ।

জ্ঞান { জ্ঞান, ঈশনা }
প্রাণ { বাসনা, প্রাণ }
ঈশনা, বাসনা } মন (উহ্য)

আপাতত এখানে আমি মাঝের অঞ্চলের মনের ব্যাপারটিকে ঐরূপে উহ্য রাখিয়া— বলিতে চাই এই যে, আমাদের জাগরিতাবস্থায়, জ্ঞান এবং প্রাণ কর্ত্তাগৃহিণীর ন্যায় একজোট হইয়া একত্রে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের পরিচালনাকার্য্যে নিযুক্ত থাকে; পরন্তু নিদ্রাবস্থায় জ্ঞানের অনুপস্থিতিকালে প্রাণ একাকী ঐ কার্য্য সুনির্ব্বাহ করে। তোমার এই যে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ঘড়ি'র কলের ন্যায় বাঁধা-নিয়মে অষ্ট-প্রহর চলিতেছে—তাহা চালাইতেছে, কে?

তোমার প্রাণেরই তাহা কাজ, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। এটাও কিন্তু দেখিতেছি যে, তোমার প্রাণের সে যাহা কাজ, তাহার উপরে তোমার জ্ঞানের বিলক্ষণ কর্তৃত্ব চলে; দেখিতেছি যে, তুমি সজ্ঞানভাবে নিশ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করিতেও পারো, কমাইতে-বাড়াইতেও পারো, ইচ্ছামাত্রেই। এইজন্যই আমি বলিতেছি যে, যেমন কর্ত্তাগৃহিণী উভয়ে একজোট হইয়া ঘরসংসার চালা'ন, তেম্নি জ্ঞান এবং প্রাণ উভয়ে একজোট হইয়া তোমার নিশ্বাসপ্রশ্বাস চালাইতেছে। আবার, এটাও দেখিতেছি যে, কার্য্যপ্রণালী দোঁহার দুইরূপ। যেমন—বাঁধা-নিয়মে ছোটো-ছোটো ছেলেদের মানুষ করিয়া তোলা গৃহিণীরই কাজ, তা বই, কর্ত্তা সে কার্য্যে নিতান্তই অপটু; তেম্নি বাঁধা-নিয়মে অষ্টপ্রহর নিশ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা করা প্রাণেরই কাজ; তা বই, জ্ঞান তাহাতে নিতান্তই অপটু। পক্ষান্তরে, যেমন—ছেলেদের শিক্ষার জন্য নূতন কোনোপ্রকার বৈজ্ঞানিক-নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে কর্ত্তাই তাহা পারেন, তা বই, গৃহিণী তাহাতে নিতান্তই অপটু, তেম্নি নিশ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করিয়া কুম্ভক করিতে হইলে, অথবা নিশ্বাস-প্রশ্বাস কমাইয়া-বাড়াইয়া রেচকপূরক করিতে হইলে জ্ঞানই তাহা পারে, তা বই, প্রাণ তাহাতে নিতান্তই অপটু। কিন্তু জ্ঞান যতই কেন প্রাণের উপরে কর্তৃত্ব করুক না, প্রাণকে সে চটাইয়া প্রাণের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র-ভাবে কোনো কার্য্যই করিতে পারে না। প্রাণায়াম সাধন করিবার সময় জ্ঞান ধীরে-ধীরে প্রাণকে বশ করিয়া আপনার অভিপ্রেত পথে বাগাইয়া আনে, তা বই, প্রাণকে তুচ্ছ-তাচ্ছীল্যও করে না, আর, প্রাণের উপরে যথেচ্ছ বলপ্রকাশও করে না। জ্ঞান সব-সময়েই প্রাণের সহিত সদ্ভাবে মিলিয়া কার্য্য করে,—প্রাণের সহিত আড়াআড়ি করিয়া কোনো কার্য্যই করে না। জ্ঞান যখন ঈশনা খাটাইয়া প্রাণায়াম সাধন করে, তখনও প্রাণ জ্ঞানকে আপনার বাঁধা-পথের বেশী বাহিরে যাইতে দেয় না। প্রাণ যেমন কতকমাত্রা জ্ঞানের অভিপ্রায়ের সঙ্গে গোড় দিয়া চলে, জ্ঞানও তেম্নি কতকমাত্রা প্রাণের অভি-প্রায়ের সঙ্গে গোড় দিয়া চলে, আর, উভয়ের সেরূপে চলিবার কারণ শুদ্ধ-কেবল পরস্পরের প্রতি মনের ভালবাসা, কেন না, মন জ্ঞানপ্রাণের মধ্যস্থস্বরূপ। জ্ঞান এবং প্রাণের মধ্যে কোনো সূত্রে দাম্পত্যকলহ বাধিলে মন মাঝে পড়িয়া বিবাদ মিটাইয়া দিতে চেষ্টা করে। ফলে, জ্ঞান এবং প্রাণের মধ্যে কলহ যাহা সময়ে-সময়ে বাধিতে দেখা যায়, তাহা হরগৌরীর কন্দল বই আর কিছুই নহে। জ্ঞানবান্ জীবের জাগরিতাবস্থায় জ্ঞান এবং প্রাণ উভয়ে একজোট হইয়া ঘরসংসার করে—এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু নিদ্রাবস্থায় কি হয়, সেটাও দেখা চাই। সুব্যক্ত-চেতন যখন শ্রমক্লমে অবসন্ন হইয়া ঈশনা গুটাইয়া-লইয়া অব্যক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তখন সে প্রাণের হস্তে চাবির গোছা ফেলিয়া-দিয়া দিব্য আরামে নিদ্রা যায়। জ্ঞান যখন নিদ্রায় ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়, তখন মন জ্ঞানকে বলিতে পারে যে, "তুমি হ'চ্চ ঘরের কর্ত্তা; ঘরের কর্ত্তা ঘরে না থাকিলে ঘরের দশা হইবে কি?" তা যদি বলে, তবে জ্ঞান তাহার উত্তর দিবে এই যে, "কোনো চিন্তা নাই—ঘরে

প্রাণ রহিলেন ; আমার থাকাও যা, আর, প্রাণের থাকাও তা, একই ; গৃহিণী গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তুমি কি তা জানো না !" প্রাণের প্রতি জ্ঞানের কি অগাধ বিশ্বাস ! এম্নি অগাধ বিশ্বাস যে, তুমি যদি বলো "প্রাণ অচেতন", তবে জ্ঞান তোমার সে কথায় কখনই সায় দিবে না ; জ্ঞান বলিবে যে, "প্রাণ আমার দ্বিতীয় আমি—প্রাণকে অচেতন বলাও যা, আর, আমাকে অচেতম বলাও তা', একই।"

প্রকৃত কথা এই যে, প্রাণ অচেতন নহে ; প্রাণ অব্যক্ত-চেতন ! চেতনের অব্যক্ত অবস্থার নামই নিদ্রাবস্থা ; অব্যক্ত-চেতনের নামই নিদ্রা, আর তাহারই আরেক নাম প্রাণ। নিদ্রা প্রাণই ! ইংলণ্ডের ডুবুরী কবি কি বলিতেছেন, শ্রবণ কর :—

" * * * The innocent sleep,
Sleep that knits up the ravelled
sleeve of care,
Death of each day's life,
sore labour's bath,
Balm of hurt minds, great nature's
second course,
Chief nourisher in life's feast.

নির্দ্দোষ নিদ্রা ! ভাবোদ্বিগ্ন কর্ম্মধন্দা'র গলিতস্খলিত বাহুচ্ছদ * সে যে নূতন করিয়া গাঁথিয়া তোলে ! দৈনিক জীবনের দৈনিক মৃত্যু ! শ্রমপীড়া'র শান্তিবারি ! ব্যথিত চিত্তের ধন্বন্তরি ! মহাপ্রকৃতির দ্বিতীয় গতিপর্য্যায় ! জীবনের ভোগোৎসবের বলপুষ্টিপ্রদায়িনী সেরা-ভোগের সামগ্রী !"

শুনিলে কবিবাক্য ! নিদ্রা দৈনিক মৃত্যু বটে, কিন্তু মৃত্যু-সে সাক্ষাৎ প্রাণ ! পূর্ণিমা-রজনী যেমন জ্যোৎস্নার গুণে জ্যোৎস্নাময়ী, অব্যক্তচেতনা নিদ্রা তেম্নি প্রাণের গুণে প্রাণময়ী।

চেতনের ব্যক্তাব্যক্তরহস্য যাহা আমরা আমাদের আপনাদের মধ্যে দেখিতে পাই, তাহাই আমি এতক্ষণ ধরিয়া বিবৃত করিলাম।

আমরা দেখিলাম যে, আমাদের আপনাদের ভিতরে যে চেতন আছে, তাহা বস্তু একই ; সেই একই চেতন যখন আপনার অব্যক্ত অবস্থায় সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া ঘুমের ঘোরে বাঁধা-নিয়মে বাঁধা-পথে চলিতে থাকে, তখন তাহার নাম হয় প্রাণ ; তাহা যখন আপনার অর্দ্ধস্ফুট অবস্থায় বাসনায় ভর করিয়া কল্পনাস্বপ্নের কাল্পনিক সত্তায় অবগাহন করে, তখন তাহার নাম হয় মন ; আবার, যখন তাহা আপনার সুব্যক্ত অবস্থায় ঈশনাতে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া বস্তুসকলের বাস্তবিক সত্তায় অবগাহন করে, তখন তাহার নাম হয় জ্ঞান।

এটাও দেখিলাম যে, জ্ঞানের সুব্যক্ত অবস্থার নামই জাগরিতাবস্থা ; জ্ঞানের অর্দ্ধস্ফুট অবস্থার নামই স্বপ্নাবস্থা ; জ্ঞানের অব্যক্ত অবস্থার নামই নিদ্রাবস্থা। চাহিয়া দেখ :—

* আবার আস্তিন। know এবং জ্ঞ (gna) যেমন একেরই সন্তান, knit এবং গাঁথ=(গ্রন্থন) এ দুই শব্দেরও বোধ হয় তেম্নি এক কুলে জন্ম। আস্তিন গাঁথিয়া তোলা, আর, আস্তিন সেলাই করিয়া তোলা, এ দুই কথার ভাবার্থ একই। কিন্তু মোজা প্রভৃতি যেরূপে তৈয়ারি করা হয়, তাহা একপ্রকার গ্রন্থন-ক্রিয়া—সীবন-ক্রিয়া নহে (সেলাই নহে)। গেঞ্জিক্‌রাবের আস্তিনও সেইভাবে গাঁথিয়া তোলা হয়।

চেতন	নাম	অবস্থা
সুব্যক্ত	জ্ঞান	জাগরণ
অর্দ্ধব্যক্ত	মন	স্বপ্ন
অব্যক্ত	প্রাণ	সুষুপ্তি

আর একটি রহস্য দেখিলাম এই যে, চেতনের সুব্যক্ত অবস্থায় (অর্থাৎ জ্ঞানবান্ জীবের জাগরিতাবস্থায়) তিন অবস্থার চৈতনই একত্রে কার্য্য করে; উপরের স্তরে জ্ঞান কার্য্য করে, মাঝের স্তরে মন কার্য্য করে, নীচের স্তরে প্রাণ কার্য্য করে; সবাই একজোট হইয়া কার্য্য করে, কেহই স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করে না। তবেই হইতেছে যে, আমাদের জাগরিতাবস্থার মধ্যেও সুষুপ্তি, স্বপ্ন এবং জাগরণ, তিনই রহিয়াছে; প্রাণাধিষ্ঠিত অব্যক্তসংস্কারের সুপ্তভাব রহিয়াছে; মনোধিষ্ঠিত বাসনার স্বপ্ন রহিয়াছে; জ্ঞানাধিষ্ঠিত ঈশনার জাগ্রতভাব রহিয়াছে।

ব্যক্তাব্যক্তরহস্য এ যাহা দেখা গেল, ইহার সঙ্গে আরেকটি রহস্য জড়ানো রহিয়াছে; সেটা হ'চ্চে ত্রিগুণরহস্য; এ রহস্যটিরও অন্ধিসন্ধি ভেদ করা আবশ্যক। আগামী বারে তাহাতেই প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বারাণসী-অভিমুখে।

৮

স্বর্ণমন্দিরের নিকটস্থ একজন ব্রাহ্মণের গৃহে।

"অলৌকিক কাণ্ড!...এখানকার সন্ন্যাসীরা পূর্ব্বে বোধ হয় অলৌকিক কার্য্যসকল দেখাইতে পারিত, কেহ কেহ হয় ত এখনও দেখাইতে পারে...কিন্তু আমাদের মনীষীরা এই উপায়ে লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করা হেয় জ্ঞান করেন'...না,—গভীর ধ্যানধারণাই ভারতীয় পন্থা; ধ্যানধারণাই আমাদিগকে সত্যের পথে লইয়া যায়..."

যিনি আমাকে এই কথা বলিলেন, তিনি একজন বৃদ্ধব্রাহ্মণ; তাঁহার "পণ্ডিত" উপাধি। অর্থাৎ তিনি সংস্কৃতভাষায় ও সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। অলৌকিক ব্যাপারের প্রতি সেই নিস্তব্ধ ক্ষুদ্র গৃহের তত্ত্বজ্ঞানীদের যেরূপ অবজ্ঞা, ইহারও দেখিলাম সেইরূপ অবজ্ঞা।

সন্ধ্যার সময়, বারাণসীর অন্তরদেশে তাঁহার পুরাতন গৃহের ছাদের উপর বসিয়া আমরা বাক্যালাপ করিতেছি। ছাদটি ক্ষুদ্র, বিষণ্ণ ও চারিদিকে বদ্ধ; একটা বাহিরের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়; একটা সরু রাস্তা হইতে সিঁড়িটা উঠিয়াছে। আমার দোভাষী জাতিতে 'পারিয়া', সুতরাং এখানে তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ; সে বাহিরের সিঁড়ির

সর্ব্বোচ্চ ধাপে দাঁড়াইয়া রহিল। যখন সে আমাদের কথা ভাষান্তর করিয়া বুঝাইতেছিল, তখন মনে হইতেছিল, যেন সন্ধ্যার শব্দবাহী নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া দূর হইতে তাহার কণ্ঠস্বর আসিয়া পৌঁছিতেছে। অনুবাদের কার্য্যে মাতিয়া উঠিয়া ভ্রমক্রমে যদি কখন সে দরজার চৌকাঠে পা রাখে, অমনি বৃদ্ধব্রাহ্মণ তাহাকে চিরন্তন লোকাচারের কথা স্মরণ করাইয়া দেন, সেও পিছু হটিয়া যায়। তিনি থিয়সফিষ্ট-সমাজভুক্ত নহেন,—তাই বর্ণভেদপ্রথার নিয়ম তিনি লঙ্ঘন করেন না।

এই ছাদের উপর হইতে আর কিছুই বড় দেখা যায় না,—দেখা যায় শুধু চতুর্দ্দিক্‌স্থ কতকগুলা জরাজীর্ণ প্রাচীর—যাহার পলস্তারা রৌদ্রে ফাটিয়া গিয়াছে; আর দেখা যায়, আকাশে কাকের ঝাঁক উড়িয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু এই জরাজীর্ণতার মধ্য হইতে, এই সমস্ত ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে, খুব নিকটেই একটা আশ্চর্য্য জিনিষ মাথা তুলিয়া রহিয়াছে; স্বর্ণকারের হাতের একটি অতুলনীয় কারুকার্য্য; ইহা অস্তমান সূর্য্যের শেষরশ্মির গতিরোধ করিতেছে, এবং এই সময়ে ইহার উপর যত টিয়াপাখী আসিয়া জড়ো হইয়াছে। ইহা "স্বর্ণমন্দিরের" একটা গম্বুজ।

আমি মধ্যে-মধ্যে এই শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তাঁহার ধন-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে একটি পুস্তকাগার ও শতশত-বর্ষ পুরাতন কতকগুলি পুঁথি। বারাণসীর যে অংশটি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও পবিত্র, সেই-খানে তাঁহার গৃহ। একাকারের মহাপ্রবর্ত্তক রেল যেখান দিয়া গিয়াছে, সেই ইতর অবজ্ঞ আধুনিক অঞ্চল হইতে এই স্থানটি বহুদূরে অবস্থিত। ইহার পারিপার্শ্বিক দৃশ্যে কোনই পরিবর্ত্তন ঘটে নাই; সুতরাং এইখানে আসিলে পুরাকালের ভাব মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে, বারাণসীর সেই গুহ্যধর্ম্মের রহস্যময় ভাবে চিত্ত পরিপ্লাবিত হয়, চিত্তকে যেন দূর অতীতে পিছাইয়া আনে, অনিত্য সংসারকে ক্রমাগত স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং চিন্তাপ্রবাহকে সংসারের পরপারে লইয়া যায়। সেই ধবলগৃহের তত্ত্বজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন, —কতকগুলি স্থানের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে; এরূপ কতকগুলি নগর আছে—যথা বারাণসী, মক্কা, লাসা, জেরুসালেম,—যে সকল নগর আধুনিক সংশয়বাদের আক্রমণসত্ত্বেও, দেবারাধনার ভাবে এরূপ ভরপুর যে, সেখানে পার্থিব মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কতকটা অসীমের সান্নিধ্য উপলব্ধি করা যায়। তাঁহারা বলেন,—"এমন কি, শুধু মন্দিরাদির বৃহত্ত্ব,—শুধু অনুষ্ঠানাদির আড়ম্বরও কতকটা আত্মার উপর প্রভাব প্রকটিত করে। উহার কিছুই নিষ্ফল নহে।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নমস্কার।

ওঁ

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর।

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার!
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণী-মূর্ত্তি তুমি! তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই, কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি! আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ব্ববাধাহীন,—
যার লাগি নর-দেব চিররাত্রিদিন
তপোমগ্ন; যার লাগি কবি বজ্ররবে
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে
গিয়েছেন সঙ্কটযাত্রায়; যার কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে;
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয়;—সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠদান—আপনার পূর্ণ অধিকার—
চেয়েছ দেশের হ'য়ে অকুণ্ঠ আশায়,
সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়,
অখণ্ড বিশ্বাসে। তোমার প্রার্থনা আজি
বিধাতা কি শুনেছেন? তাই উঠে বাজি
জয়শঙ্খ তাঁর? তোমার দক্ষিণ করে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
দুঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার
জলিয়াছে, বিদ্ধ করি দেশের আঁধার
ধ্রুবতারকার মত? জয়, তব জয়!
কে আজি ফেলিবে অশ্রু, কে করিবে ভয়,

সত্যেরে করিবে খর্ব্ব কোন্ কাপুরুষ
নিজেরে করিতে রক্ষা! কোন্ অমানুষ
তোমার বেদনা হ'তে না পাইবে বল!
মোছ্‌রে, দুর্ব্বল চক্ষু, মোছ্ অশ্রুজল!

দেবতার দীপহস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে! বন্ধনশৃঙ্খল তার
চরণবন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা। রুষ্ট রাহু
বিধাতার সূর্য্যপানে বাড়াইয়া বাহু
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্ত্তেক পরে
ছায়ার মতন। শাস্তি! শাস্তি তারি তরে
যে পারে না শাস্তিভয়ে হইতে বাহির
লঙ্ঘিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর,
কপট বেষ্টন;—যে নপুংস কোনোদিন
চাহিয়া ধর্ম্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলেনি অন্যায়; আপনার
মনুষ্যত্ব, বিধিদত্ত নিত্য অধিকার,—
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভামাঝে; দুর্গতির করে অহঙ্কার;
দেশের দুর্দ্দশা ল'য়ে যার ব্যবসায়,
অন্ন যার অকল্যাণ, মাতৃরক্তপ্রায়;
সেই ভীরু নতশির চিরশাস্তিভারে
রাজকারা বাহিরেতে নিত্য-কারাগারে।

বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্ত্তি, কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
মহাতীর্থযাত্রীর সঙ্গীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর। ভারতের বীণাপাণি,

হে কবি, তোমার মুখে রাখি দৃষ্টি তাঁর
তারে তারে দিয়েছেন বিপুল ঝঙ্কার,—
নাহি তাহে দুঃখতান, নাহি ক্ষুদ্র লাজ,
নাহি দৈন্য, নাহি ত্রাস! তাই শুনি আজ
কোথা হ'তে ঝঞ্ঝাসাথে সিন্ধুর গর্জ্জন,
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্ত্তন
পাষাণপিঞ্জর টুটি,—বজ্রগর্জ্জরব
ভেরিমন্দ্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব।
এ উদাত্ত সঙ্গীতের তরঙ্গমাঝার,
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার!

তার পরে তাঁরে নমি, যিনি ক্রীড়াচ্ছলে
গড়েন নূতন সৃষ্টি প্রলয়-অনলে,
মৃত্যু হ'তে দেন প্রাণ, বিপদের বুকে
সম্পদেরে করেন লালন, হাসিমুখে
ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টক-কান্তারে
রিক্তহস্তে শত্রুমাঝে রাত্রি-অন্ধকারে।
যিনি নানা কণ্ঠে কন নানা ইতিহাসে,
সকল মহৎ কর্ম্মে, পরম প্রয়াসে,
সকল চরম লাভে—"দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব্ব ভয়;
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার,
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার!
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির,
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির!"

৭ই ভাদ্র, ১৩১৪

সেকাল ও একাল।

ইংরাজিশিক্ষা যখন প্রথম এদেশে পাশ্চাত্য-সভ্যতার মোহিনী মূর্ত্তি উপস্থিত করিয়াছিল, তখন তাহার মধ্যে এক নবীন রশ্মিচ্ছটার উন্মেষ দেখা গিয়াছিল। আমাদের সে সময় জন্ম হয় নাই, কিন্তু সে সময়ের যেটুকু ইতিহাস কাল রাখিয়া দিয়াছে, তাহা হইতে তখনকার শিক্ষিত-সমাজের মনের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। তাহার ফলে আমাদের প্রাচীন সমাজের সঙ্গে নবীন সমাজের যে বিচ্ছেদ ঘটে, তাহা কেবল সেই মোহের জন্য নহে, নিজেদের মধ্যে সচেতন একপ্রাণতার অভাবই তাহার কারণ। ইউরোপের ঐক্য বল, জ্ঞান বল তাই তখন এক অপূর্ব্বরশ্মি এই অন্ধদেশের উপর বিকীর্ণ করিল।

ইহার কারণ মনুষ্যপ্রকৃতি যন্ত্রের কাছে আপনাকে ধরা দিতে চায় না। যে সময়ে আমাদের সমাজযন্ত্রে প্রাণ ছিল, সে সময়ের বিধিব্যবস্থা সেই প্রাণেরই অনুকূল ছিল, সেই প্রাণ হইতেই তাহা সম্ভূত হইত। তাই তখন সে সকল বিধিব্যবস্থা আচার ও প্রথাপালন মাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই, তাহা কেহ বাহির হইতে চাপাইয়া দেয় নাই, তাহা ভিতরের প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং যে গ্রহণবর্জ্জনের নিয়ম প্রকৃতির ও জীবনমাত্রেরই পক্ষে প্রযুজ্য, তাহাকে স্বীকার করিয়া লইল। তখনকার সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করা চলে না।

পাশ্চাত্যসভ্যতার ঐক্যমন্ত্র তজ্জন্য সমাজের মধ্যে নব অরুণোদয়ের ন্যায় হইল। তাহা বলিল যে, individual অর্থাৎ ব্যক্তি-মাত্রেই স্বাধীন,—তাহার ধর্ম্ম, বুদ্ধি, আচার ও রীতিনীতির উপর অপর কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই। সমাজ একটা ঢেউয়ের মত, হাওয়া যে দিকে সঞ্চালিত হয়, সেদিকেই সে যায়। অতএব হাওয়ার গতি পরিবর্ত্তন করিলেই সমাজের চেহারা ফিরিয়া যাইবে।

কথাটা অতীব সত্য, কিন্তু সত্য ভিন্ন আধারে ভিন্নরকম খাটে। আমার প্রকৃতি এবং বিদেশীর প্রকৃতি যে একই, তাহা নহে। সুতরাং আমার প্রকৃতি অনুসারে আমাদের দেশের যে একটি ভাব গঠিত হইয়া উঠিয়াছে,—যে ভাব মিলনমূলক, যাহা নানাকে একের মধ্যে ক্রমাগত আনিবার চেষ্টা পাইয়াছে, সেই ভাব এক উপায়ে ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দিয়াছে, ইউরোপ অন্য উপায়ে দিয়াছে। তাই কথাটা সত্য, কিন্তু খাটিতেছে বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন ভাবে। এই দুই স্বাধীনতা কি, তাহা পরে আলোচ্য।

এ কথাটা বোধ করি শিক্ষিতসমাজ তখন ভুলিয়া গিয়াছিল। তজ্জন্য, বেশ, আচারব্যবহার, কথাবার্ত্তাতেও দেশপ্রচলিত রীতিপ্রকৃতি উল্টাইয়া দিবার দিকে সে যত্ন

পাইয়াছিল। তাহার কারণও বলিয়াছি। কারণ, বাহির হইতে তখন সমাজ সকল বিষয়েই সাড়া দিতেছিল, ভিতরের প্রাণশক্তি নিতান্ত নির্জ্জীব ছিল। সবলে আপনার উপায়ে আপনার পথ কাটিয়া লইবার শক্তি তাহার ছিল না।

চেষ্টা করিলেও প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলা যায় না। জগতের এই অলঙ্ঘনীয় নিয়মকে কেবল যে প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান প্রমাণ করিতেছে, তাহা নহে, মনুষ্যবিজ্ঞানও করিতেছে। ইতিহাসে যে সকল লোকপূজ্য মহৎ ব্যক্তি দেখিতে পাই, যাঁহাদের শক্তি জগতের সভ্যতাকে অগ্রসর করিয়াছে, আকার দিয়াছে ও মহিমা দিয়াছে, তাঁহাদের মহত্ত্ব স্বাভাবিক,—আপনার মধ্যেই তাহা ছিল, চেষ্টা করিয়া তাহা হয় নাই। নেপোলিয়ন, শেক্‌স্‌পীয়র কি গেটে, যে দিকেই যিনি বড় হউন না, তাঁহাদের প্রতি কার্য্য, প্রতি ব্যবহার এমন অদ্ভুতরূপে স্বাভাবিক, যে তাহাতে কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই। তাহার কারণ, তাঁহারা তাঁহাদের প্রকৃতি মানিয়া চলিয়াছেন, কলগড়া মানুষ তাঁহারা নন। প্রকৃতিতে ছোট-বড় সমস্ত শক্তিরই সার্থকতা আছে,—কৃষকও যেমন শস্য জন্মাইতেছে, কবিও তেম্‌নি ভাবের ফসল জোগাইতেছেন, কোনটাই বাদ দিবার নয়। কিন্তু, মানুষের হাতে সেই প্রকৃতির সহজ ভাবটি অসহজ হইয়া উঠিয়াছে, তজ্জন্য মানবসভ্যতার ইতিহাসে এমন বিকৃতির দশা মাঝে মাঝে দেখা দেয়,—যখন সবলতা, সচেষ্টতা ও সপ্রাণতার কোন পরিচয়ই থাকে না।

ইউরোপ কল ভালবাসে। কারণ, যতই স্বাধীন মনুষ্যত্বের কথা সে বলুক না, আমরা জানি, সে তাহার পুঁথির কথা। তাহার সমাজ কলে চলে। তাই তাহার কলে স্কুল করিতে হয়, গির্জ্জা করিতে হয়, ও প্যাপার সোসাইটি করিয়া দানচর্চ্চা করিতে হয়। এগুলি বোঝা। দান এবং গ্রহণ জিনিষটা স্বভাবসঙ্গত নিয়মেই হওয়া উচিত, কলের মধ্যে দিয়া হওয়াটা কিছুমাত্র আনন্দের নহে। কোথায় দান করিব, সকলে মিলিয়া কোথায় দেশহিতকর কর্ম্মে ব্যাপৃত হইব, এ করিলে কেবল unhappy benevolence আনন্দহীন দয়াচর্চ্চা করা হয়, তাহাতে সার্থকতা নাই।

তেমনি ধর্ম্মসম্বন্ধে এক গির্জ্জা করিবার চেষ্টা ইংলণ্ড করিয়াছে—ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের প্রয়োজনকে স্বীকার করে নাই, ধর্ম্মজিনিষটা যে সম্পূর্ণত একলার, তাহা প্রেমে, সেবায় ও জ্ঞানে যে প্রতি মুহূর্ত্তে মনুষ্যমধ্যে সজীব আকার পাইতে চায়, তাহা দেখে নাই।—তাহার দর্শনসাহিত্যে যতই কেন সে কথা লেখা থাক্‌ না।

আমাদের দেশে যখন এইগুলি প্রবেশ করিয়াছে, আমরা যখন কলের হাতে আত্মসমর্পণ করাকেই মনুষ্যত্বের উন্নত অধিকার ভাবিতে শিখিয়াছি, তখনই জানি যে, বিদেশের মোহিনী মূর্ত্তি আমাদের কেবল ভুলাইয়াছে, আমাদের যথার্থ প্রকৃতির আনুকূল্য করে নাই।

আঘাতসংঘাতে সহসা সচেতন হইয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আমাদের দেশের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি আমাদের জন্য এতদিন যে নিত্যবস্তু রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, তাহা কতখানি! তাহার সাধনা

নিষ্ফল নয়। তাহা কি, আমরা একালে নানান্ দিক্ হইতে তাহারই সন্ধানে এক্ষণে ব্যাপৃত আছি।

আমরা, মানুষ যে জায়গায় প্রকৃতই স্বাধীন, সেস্থলে স্বাধীনতা তাহাকে দিয়াছি; যেস্থলে অধীনতা তাহার পক্ষে কল্যাণকর, সেস্থলে স্বাধীনতা অর্থাৎ স্বৈরচারিতাকে প্রশ্রয় দিই নাই। তাই আমাদের সমাজবন্ধন এমন সুদৃঢ়। কিন্তু নিয়ম যদি অন্তর হইতে উদ্ভূত না হয়, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা লোককে বিদ্রোহী করিয়া তোলে। যখন দেখিব যে, আমাদের বিধিব্যবস্থা আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের পক্ষেই কল্যাণকর, তখন তাহার অধীনতা স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে।

তাই এখন অনেক পর্ব্ব, অনেক উৎসব, যাহা পূর্ব্বে নিতান্ত কুৎসিত লাগিয়াছিল, তাহার অনেক কুসংস্কার ও আবর্জ্জনা বাদ দিয়া তাহার বিশুদ্ধ স্বরূপে তাহাকে দাঁড় করাইলে আমরা তাহার মধ্য হইতে রস পাইব, বল পাইব এবং স্বাস্থ্য পাইব। দৃষ্টান্তস্থলে উল্লেখ করি, জন্মাষ্টমীর উৎসব। সেদিন—যিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন বর্ণকে, ধর্ম্মকে ও তত্ত্বকে এক মিলনমহাযজ্ঞে এক করিয়াছেন, বর্ত্তমান ভারতবর্ষের যিনি এক হিসাবে আদর্শ-পুরুষ—এবং প্রেমেরও যিনি একটি মধুর লীলার দিক্ উৎসের মত খুলিয়া দিয়াছেন, যে নির্ঝরধারায় স্নান করিয়া গৃহসম্বন্ধগুলি ও বহিঃপ্রকৃতি বাঙালীর এত প্রিয় হইয়াছে,—সেদিন তাঁহাকে স্মরণ করিবার দিন। ইহাকে প্রচলিত সংস্কারের উপর, ঐতিহাসিক আলোকে উজ্জ্বল করিয়া তোলা আমাদের কাজ। এমন অনেক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানকে সংশোধিত করিয়া বর্ত্তমান ধর্ম্মের পক্ষে উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। প্রাচীন সকল রীতিনীতি বর্জ্জন করিলেই চলিবে না। সকল দিকেই ফিরিয়া আসিতে হইবে।

ফিরিবার কথা শুনিয়া অনেকে উপহাস করেন এবং বলেন reactionary principles ধাঁ করিয়া হওয়াটা কাজের নয়। তাহাতে দোষ এই যে, সংস্কার জন্মে বুঝি বা দেশের সবই ভাল। কিন্তু ফিরিয়া আসিতেছি কোথায়? বিশ্বমানব যে—'One far off divine event'—এক অতি সুদূর মহান্ পরিণামের দিকে লক্ষ্য করিয়া তাহার সমস্ত পুঞ্জীভূত জ্ঞানবিজ্ঞান, তাহার সৌন্দর্য্যবোধ ও প্রেমের নব বিকাশ, নব লীলারসমাধুর্য্য, তাহার অদ্ভুত কর্ম্মবল ও বিচিত্র শক্তি লইয়া চলিয়াছে—সেইদিকে যাইবার জন্যই আমাদের বহুকালসঞ্চিত পাথেয়মাত্র আমরা সংগ্রহ করিতেছি। শক্তি কেবল বর্ত্তমানকে লইয়া নয়, মহাসমুদ্রের মত প্রকাণ্ড অতীত আমাদের পশ্চাতে অভয়ঘোষণা করিতেছে, তাহার ভাষা ভাষা দিতেছে, তাহার পুঞ্জীভূত জ্ঞান ও প্রেমের শক্তি ও রস নূতন জ্ঞান ও প্রেমরসকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে—এইবারে যে প্রকাণ্ড সমন্বয় আমরা গড়িয়া তুলিব—ধর্ম্মে-কর্ম্মে, আচারে-উৎসবে, বিধিতে-ব্যবস্থায়,—তাহাতে সকলেই পরম স্বাধীনতার আস্বাদ পাইব এবং যথার্থ মনুষ্যনামের যোগ্য হইব।

কারণ, স্বাধীনতা কোনকালেই ব্যক্তিগত খেয়াল নহে। বিশ্বমানবের আদি, গতি ও

পরিণতির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করার নামই মনুষ্যস্বাধীনতা। যে সমাজ সেই স্বাধীনতার অন্তরায়, তাহা মনুষ্যত্বকে ছোট করে, তাহা মরিয়া যায়। যে সমাজ উত্তরোত্তর সেই স্বাধীনতাকে সচেতন ও সক্রিয় করিয়া তুলিতে চেষ্টা পায়, তাহা মনুষ্যকে সর্ব্বোচ্চ সুখে উন্নীত করে। আমাদের সমাজ যতদিন বেড়া দিয়া আমাদিগকে রাখিতেছিল, ততদিন সেই স্বাধীনতা যে আমাদের মধ্যেই আছে, সে সংবাদ আমরা পাই নাই; আজ আমাদের শাস্ত্রসাহিত্য আমাদের সাম্নে উন্মুক্ত, তাই আমাদের পরিচয় পাওয়া আমাদের পক্ষে শক্ত হইবে না।

আপনার শক্তিতে একটা জিনিষকে আত্মসাৎ করা ও নিজের শক্তি ভুলিয়া অন্ধভাবে একটা জিনিষের দাসত্ব স্বীকার করায় প্রভেদ আছে। ইউরোপের দাসত্ব ছাড়িয়া, এক্ষণে তাহাকে আমরা নিজের নিয়মে গ্রহণ করিব। তাহার জ্ঞানবিজ্ঞান, তাহার শাস্ত্রসাহিত্য, কিছুই আমাদের বাধা দিবে না—আমরা তাহা গ্রহণ করিয়া আমাদের প্রাণকে আরও বলশালী ও সম্পৎশালী করিব—যেদিন নিজের উপায়ে তাহাকে গ্রহণ করিতে শিখিব, সেদিনই মানুষ হইব—নহিলে অনুকরণ মানুষনামের অযোগ্য আমাদিগকে উত্তরোত্তর করিয়া তুলিতেছে ও তুলিবে!

শ্রীঃ—

কালিদাসের সীতা।*

মহাকবি কালিদাস সীতাচরিত্রচিত্রণে প্রধানত বাল্মীকির পদচ্ছায়ানুসরণ করিয়াও স্বীয় অলৌকিক প্রতিভার প্রচুর নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। লোকাতীত প্রতিভার কার্য্যই ত এই। জগতের সাহিত্যে ইহার, বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। এই মহাকবিরই উপমা একটু বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া বলিতে হয় যে, ভগবান্ সহস্রাংশু যেমন স্বীয়প্রখরকরজালবিস্তারে সমুদ্র প্রভৃতি হইতে পৃথিবীর রস শোষণ করিয়া সহস্রধারায় বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করেন, বজ্রসমুৎকীর্ণ মণির রন্ধ্রে যেমন সহজে সূত্র সঞ্চারিত হয়, রঘুবংশের মহাকবিও সেইরূপ মহর্ষি বাল্মীকির লোকত্রয়বিশ্রুতা ত্রিলোকপাবনী পুণ্যপ্রবাহিনী রামায়ণী গঙ্গার খাতে সেই স্রোতোনুসারী হইয়া আপনার মহাকাব্যতরণী ভাসাইয়া দিয়াছেন। রঘুবংশের প্রাচীন-নবীন অনেক ভাষ্যকারটীকাকারদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কি পুষ্পকরথারোহী বিমানচারী রাজদম্পতির আকাশমার্গে ভ্রমণ-

*ব্রজমোহন কলেজহলে বরিশাল বান্ধবসমিতির বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

কালীন সমুদ্র প্রভৃতি দৃশ্যের বর্ণনায়, কি সীতা-নির্ব্বাসনে, কি তাঁহার পাতালপ্রবেশ-ব্যাপারে, কি অযোধ্যার রাজসভায় লবকুশের রামায়ণগানের কথায়, সর্ব্বত্রই কালিদাস বাল্মীকির অনুকরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্পষ্টাক্ষরে না বলুন, এরূপ অনুকরণ যে কবির অক্ষমতার পরিচায়ক, এরূপ ইঙ্গিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। এইরূপ অতিবুদ্ধিদের তর্কপ্রণালী খণ্ডন করিতে যাওয়া নিরর্থক, তবে সাধারণ পাঠকদের মধ্যে কেহ যদি সেরূপ ভ্রমাত্মক ধারণা পোষণ করেন, তাঁহাকে এখানে এ কথা বলা ভাল যে, কাব্যাংশে হীনতর হওয়া দূরে থাকুক, অনেকস্থলে কালিদাস মহর্ষির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নূতনচিত্রসমাবেশে বিচিত্রতর, মৌলিক ও অপূর্ব্ব ভাবোন্মেষে নবীনতর, অপূর্ব্ব রসাবতারণায় মধুরতর ও নূতন রশ্মিপাতে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছেন। রঘুবংশের রসগ্রাহী পাঠকেরা এ কথা অস্বীকার করিতে পারেন না। বস্তুত ইহাই প্রতিভার কার্য্য। ক্ষমতার তারতম্যানুসারে অনুকরণ অনেকস্থলে হীন অপহরণ ও অনেকস্থলে নবীকরণে পরিণত হয়।

কালিদাসবর্ণিত সীতাচরিত্র এ কথার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রঘুবংশের ১০ম হইতে ১৫শ সর্গে প্রধানত রামের কথার প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তি আছে। অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেরই অবিদিত নাই যে, এই মহাকাব্যের ঘটনাবলীর পর্য্যায়ক্রমবর্ণনে মুখ্যত মহর্ষির পদাঙ্কানুসারী হইয়াও ঘটনার নির্ব্বাচন ও বিষয়বর্ণনাস্থলে কবি কিরূপ কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। সীতাচরিত্র-অঙ্কনেও তাঁহার সেই ক্ষমতা সম্পূর্ণ পরিলক্ষিত হয়। রামের অদ্ভুত জন্মবিবরণ, তাড়কাবধ, অহল্যা-উদ্ধার, হরধনুর্ভঙ্গ, রামের বিবাহ, জামদগ্ন্য-মিলন প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া রামের অশ্বমেধযজ্ঞ, স্বর্ণময়ী সীতামূর্ত্তির স্থাপনা, অযোধ্যার রাজসভায় লবকুশের রামায়ণগান ও সীতার পাতালপ্রবেশ ইত্যাদি ঘটনা এই কয় সর্গের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়, কিন্তু এই সব ঘটনার অবতারণা ও বর্ণনায় কালিদাসের চিত্রাঙ্কণী প্রতিভা কেমন সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে! রামের বাল্যজীবন, রামের লোকাতীত-বিক্রমকাহিনী, তাঁহার বিবাহে যে শৌর্য্য প্রতিফলিত, তাঁহার আকস্মিক নির্ব্বাসনে যে শোকবন্যায় সমগ্র রাজপুরী উদ্বেল, সে উত্তাল তরঙ্গের অনুমানমাত্রও কালিদাসের এই মহাকাব্যে পাই না। মহর্ষি এই সব শোকচিত্রে কি এক মহতী নৈতিকসম্পদ্ যোজনা করিয়াছেন! সসাগরা ধরণীর একচ্ছত্র সিংহাসন আসন্ন অভিষেকের মঙ্গলবাসরে কেবল সত্যপালনের জন্য পরিত্যাগ; তাহাও আবার স্বকৃতসত্যপালন নহে! আর সীতার মত পতিপ্রাণা প্রণয়িনীকে প্রজার মঙ্গলমন্দিরে বলিদান জগতের সাহিত্যে একবারমাত্র ঘটিয়াছে; তাহা অযোধ্যায় ও তাহা মহর্ষির এই মহাকাব্যে। সেই শুভদিনে, সেই মঙ্গলোৎসবে, সেই গন্ধদীপামোদিত, অগুরুগুগ্গুল-সুরভি, মুরলী-রবাব-মৃদঙ্গ-মুখরিত, মঙ্গলতূর্য্য-শব্দিত, কদলী ও আম্রপল্লবশোভিতদ্বার রাজপ্রাসাদে,—যেখানে আসন্ন আনন্দাভিষেক সম্রাট্ দশরথের সমৃদ্ধ রাজপুরীকে এক উজ্জ্বল অভিনব মঙ্গলশ্রী প্রদান করিয়াছে—সেই বিশাল রাজপ্রাসাদে, সেই শুভমুহূর্ত্তে রাজ্ঞী

কৈকেয়ীর ভীষণ পণ হাস্যামোদমত্ত রাজধানী ও রাজপুরীকে মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘোর বিষাদের নৈরাশ্যান্ধকারে নিমজ্জিত করিয়া দিল! কোথায় রহিল সেদিনকার বিপুল জনসংঘ—কোথায় রহিল তাহার আনন্দকোলাহল—কোথায় রহিল দীপাবলীশোভিত বিবিধ-পুষ্পমাল্যসজ্জিত উজ্জ্বল নাট্যশালার মত সুন্দরী রাজপুরীর সেই অনুপমশ্রী!—যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের কুহকময় মায়াদণ্ডের স্পর্শে এক লহমার ভিতর তদানীন্তন জগতে সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্যবৈভবে অতুলনীয়া সেই রাজনগরীর অভিনব রাজ্যাভিষেকের উচ্ছ-লিত উদ্বেল আনন্দস্রোত, এক মুহূর্ত্তে শুকাইয়া গেল। কৈকেয়ীর দারুণ পণে—

"রাজপুরীমাঝে উঠে হাহাকার
প্রজা কাঁদিতেছে পথে সারেসার
এমন বজ্র কখনো কি আর
পড়েছে এমন ঘরে?
অভিষেক হবে উৎসবে তার
আনন্দময় ছিল চারিধার,
মঙ্গলদীপ নিবিয়া আঁধার
শুধু নিমেষের ঝড়ে! *"

তার পর কৌশল্যার ভর্ৎসনা, দশরথ-বিলাপ ও তাঁহার শোকাবহ মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনার চিত্র মহর্ষি কি দুরপনেয় শোক-রেখায় অঙ্কিত করিয়াছেন! স্বামীর সহিত স্বেচ্ছাসুখে বনগমনকালীন সীতার বল্কলবাস-পরিধানে অক্ষমতায় কি কোমলতা, স্বীয় প্রিয়সখীবর্গের মধ্যে অলঙ্কারবিতরণে কি সহৃদয়তা ও কারুণ্য এবং সেই কোমলতা, মধুরতা ও শালীনতার মধ্যেও সাধ্বীচরিত্রের কি মহিমা প্রস্ফুটিত হইয়াছে! সীতাসদৃশী তন্বঙ্গী সুকুমারীর পক্ষে ঋক্ষ-সিংহ-শার্দ্দূল-প্রভৃতি-হিংস্র-বন্যজন্তু-অধ্যুষিত, এবং নিশাচর-রাক্ষসাদিসমাকীর্ণ ভীষণ অরণ্যপ্রদেশে অনিদ্রা ও অনশনে কিরূপ অনন্যমেয় ক্লেশ হওয়া সম্ভব, রামচন্দ্র সে ভীতিচিত্র উদ্ঘা-টন করিলে জানকী কিরূপ ঘৃণার সহিত সে সব উপেক্ষা করিয়াছিলেন—স্বামীর সাহচর্য্য-সুখের জন্য ঐ সকল দারুণ ক্লেশ, বনবাসরূপ অতি কঠোর তপশ্চর্য্যাও সেই ক্ষীণাঙ্গী আজন্মসুখলালিতা রাজকুমারী ও রাজবধূর পক্ষে লোভনীয় এবং সুখসেব্য বোধ হইয়াছিল। বরঞ্চ, এ সব ভয়প্রদর্শনের জন্য তিনি ক্রুদ্ধা হইয়া রামচন্দ্রকে ভীরু, স্বীয় ধর্ম্মপত্নীর রক্ষণে অক্ষম বলিয়া তিরস্কার করিলেন। রামচন্দ্র কি তাঁহাকে কেবল শয্যাসঙ্গিনী স্থির করিয়াছেন?—তিনি কি তাঁহাকে তাঁহার সুখদুঃখের চিরসহচরী ধর্ম্মপত্নী মনে করেন না? রামচন্দ্র ইতরসাধারণের মত তাঁহাকে যাকে-তাকে বিলাইয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন নাকি?—শৈলূষ ইব মাং রাম পরেভ্যো দাতু-মিচ্ছসি? তিনি সীতাকে সাধারণ স্ত্রীর মত স্থির করিয়াছেন নাকি?—কিন্তু রাম যেন তাঁহাকে পুরাণপ্রথিতা সাধ্বী নৃপতি অশ্ব-পতির দুহিতা ও রাজা সত্যবানের পত্নী সতীশিরোমণি সাবিত্রীর মত মনে করেন—দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সত্যব্রতমনুব্রতাম্। সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি—এ সব গর্ব্বিতবাক্যে সতীত্বের কিরূপ তেজোমহিমা বিস্ফুরিত হই-য়াছে! বনবাসের বিবিধ দুঃখক্লেশও প্রেমের মঙ্গল-আলোকে কিরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠি-য়াছে! বস্তুত বনবাসকালীন এই রাজ-দম্পতির প্রণয়চিত্র তাঁহাদের রাজচিত্র

* রবীন্দ্রনাথ।

অপেক্ষা সমধিক মনোরম। শান্তরসাস্পদ তপোবনে, সাধুপুষ্পিত কর্ণিকার ও কন্দলী-কুসুমকুঞ্জে, প্রসন্নসলিলা তটিনীর তীরে, নির্জ্জন কাশকুসুমধবলিত নদীপুলিন ও নিভৃত কুসুমিত গিরিপথে যে প্রেম স্বতই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা এই বেতসবনসমাচ্ছন্ন, কমল-কুমুদকহ্লারময়, কলহংসকারণ্ডবাদিবিহঙ্গমা-ভিরাম পম্পাসরোবরের ন্যায় কমনীয়, এই সরোবরতীরচারী রথাঙ্গমিথুনের ন্যায় অনন্য-সহায়, এই গদগদনাদী গোদাবরীর শীকরবাহী সমীরণের ন্যায় মনোরম ও সুখসেব্য, এই সব সুগন্ধি সপ্তপর্ণের ক্ষীরস্রাবের ন্যায় নৈসর্গিক ও এই কদম্বকেশরের ন্যায় পূর্ণবিকশিত। অযোধ্যার রাজসিংহাসন ইহা অপেক্ষা কোন্ অংশে সুখকর ও সমৃদ্ধ? অযোধ্যার অন্তঃপুরে গুরুজনবর্গের একান্ত সান্নিধ্যের শালীনতায় ও অযোধ্যার রাজসভায় অমাত্য-বর্গের কার্য্যভারে যে প্রেম সঙ্কুচিত ও অলব্ধপ্রসর—চিত্রকূট, দণ্ডকারণ্য, পম্পা-তীর ও পঞ্চবটীর সুরম্য কাননে সে অবাধ প্রেমোৎস সম্পূর্ণ উৎসারিত। বস্তুত সংসারে বিশাল জনসংঘের মধ্যে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরের অবাধ প্রেমচর্চ্চার যোগ্য অবসর কোথায়? যে স্থানে জগতের অতুলনীয় এই প্রেমিকদম্পতি নির্ব্বিবাদে সাহচর্য্যরূপ স্বর্গ-সুখ ভোগ করিতে পারেন, সে স্থানই বন-প্রদেশ।

অরণ্যের সুরসাল ফলমূল, নির্ঝরের অমৃত-স্রাবী পয়োধারা যে খাদ্য ও পানীয় সঞ্চিত করিয়া রাখে, দিনান্তে ইঙ্গুদীতরুমূলে তৃণ-শয্যায় যে সুখ, অযোধ্যার মণিমাণিক্যখচিত রাজপালঙ্ক ও রাজভোগ তদপেক্ষা কোন্ অংশে সমৃদ্ধতর? ভবভূতি রামের মুখে এরূপ একদিনের সুখের চিত্র দেখাইয়াছেন—নিবিড় ভুজবন্ধনে আশ্লিষ্ট সম্মিলিতকপোল যখন এই দম্পতি প্রেমিকসুলভ নানাবিধ অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন কথাপ্রসঙ্গে ত্রিযামার দীর্ঘ যামগুলি কখন্ কি রকম করিয়া অতি-বাহিত হইয়া যাইত, জানিতে পারিতেন না!—

> কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগা-
> দবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ।
> অশিথিলপরিরম্ভব্যাপৃতৈকৈকদোষ্ণো-
> রবিদিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ।

কালিদাস এ সব ব্যাপার আদৌ বর্ণনা করেন নাই। কালিদাস বিলক্ষণ বুঝিয়া-ছিলেন যে, মহর্ষির এ সব শোকচিত্রের উপর কারিগরি করা অন্যের পক্ষে অসম্ভব। সে-জন্য যে সব স্থানে তাঁহার চিত্রাঙ্কণী প্রতিভা বিশেষ কার্য্যকরী হইবে, তাহাদেরই বর্ণনা করিয়াছেন। সীতার পরীক্ষার পর যখন পুষ্পকরথে লঙ্কা হইতে অযোধ্যা আসিতে-ছিলেন, সেই সকল চিত্রের বর্ণনায় কালিদাসের নির্ব্বাচনশক্তি সবিশেষ বিস্ময়কর। একবার সেই বিষয়সংস্থাপনের কথা স্মরণ করুন। দীর্ঘ বিরহের পর চির-বাঞ্ছিত মিলন—সেই বিজন সমুদ্রকূল, সেই বায়ুগামী দেবরথ পুষ্পক, সেই অনন্য-নির্ভর অনন্যসহায় জগতের অতুলন দাম্পত্য-প্রেম—রঘুনাথের যে বিচ্ছেদজনিত ক্রোধা-নলে ত্রিভুবনবিজয়ী বীর দশাননের ত্রিলোক-প্রথিত মহাবীরভূয়িষ্ঠ রাজবংশ তৃণের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। কোন কবি প্রেমের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, বিরহ ও মিল-নের তুলনায় তিনি বিরহকেই শ্রেষ্ঠস্থান

দিতে প্রস্তুত; কারণ, মিলনে যে প্রিয়তমের মূর্ত্তি এক, বিরহে তাহা ত্রিভুবনে ছড়াইয়া পড়ে। রসকলাকোবিদদের মতে বিরহে মিলনের পরিপাক ও গাঢ়তা আনিয়া দেয়। কিন্তু জগতের এমন কি মহানিধি আছে, যাহার সহিত জীবনের এই অনন্ত মুহূর্ত্তের, এই প্রেমিকযুগলের সুদীর্ঘবিরহাবসানের পর পুনর্ম্মিলনের মুহূর্ত্তের সহিত বিনিময় হইতে পারে? রাজদম্পতির জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। রামের মত পত্নীবৎসল স্বামী ও ব্রতসাধনের ধন পতিব্রতা সীতার সহিত পুনর্ম্মিলন! কালিদাসবর্ণিত এই সব ঘটনার, পরবর্ত্তী সীতানির্ব্বাসনবর্ণনার কারুণ্যে বিগলিত হইয়া যিনি রামচরিত্রে নিষ্ঠুরতার আরোপ করেন, তাঁহাকে পুনরায় রঘুবংশের ত্রয়োদশসর্গ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। যদি 'রামহৃদয়রূপ অতলস্পর্শ সমুদ্রের গভীরতার সীমানির্দ্দেশ করিতে চাও,' তবে তাহার তটান্তলীন শ্যামায়মান তালতমালাদি-বৃক্ষশোভী বনরাজির এই কান্ত শ্যামশ্রী চিত্তপটে মুদ্রিত করিয়া লও। বিষয়-নির্ব্বাচনপটুতায় এজন্য রঘুবংশের ১৩শ সর্গের সহিত উত্তরচরিতের প্রথম অঙ্কের তুলনা করা যাইতে পারে। উভয়স্থলেই বর্ণিত ঘটনার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। উভয়স্থলই দুই মহাকবির প্রতিভানুকূল বিষয়নির্ব্বাচনের উৎকৃষ্ট পরিচায়ক। সে যাহা হউক, সুদীর্ঘ বিরহের পর রামচন্দ্র যখন পুষ্পকরথমধ্যে পুনর্মিলনের চিরবাঞ্ছিত নিভৃত অবসর পাইলেন, তখন স্রোতঃপথরোধকর প্রস্তরখণ্ড সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলে যেমন গিরিনদী প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, তাঁহার বহুদিনের রুদ্ধ প্রেমস্রোত সেইরূপ শতধারায় উচ্ছলিত হইয়া উঠিল! কালিদাসের আর একটি বিশেষত্ব এস্থলে অনুধাবনযোগ্য। সমগ্র ত্রয়োদশসর্গে রামচন্দ্র প্রাকৃতিকবর্ণনা-চ্ছলে কত কথায়, কত উপমায় সীতাকে প্রণয় জানাইয়াছেন—কিন্তু মৈথিলী সে সব স্থলে নির্ব্বাক্। ইহার দুইটি কারণ থাকা সম্ভব। প্রথম হইতে পারে যে, প্রতীচ্য মহাকাব্যের নায়কদের মত সংস্কৃতমহাকাব্যের বর্ণনায় বিভিন্ন বক্তা আসিয়া কাব্যরস বিচ্ছিন্ন করে না। আবার ইহা হওয়াও সঙ্গত যে, সচরাচর প্রণয়-সম্ভাষণে স্ত্রীজাতি পুরুষের অপেক্ষা প্রগল্ভ। এই মহাকবির আর একটি অতুলনীয় কাব্যে এ কথার প্রমাণ আছে। তিনি মেঘদূতে বিরহী যক্ষের বিরহদুঃখ প্রতি শ্লোকে স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, সে সব স্থলে যক্ষপত্নীর মুখে কবিত একটি শ্লোকও দেন নাই! রামচন্দ্র, যে সব দৃশ্যের সহিত বহুদিনের বনবাসস্মৃতি জড়িত, সেই সেই স্থান পুষ্পক হইতে প্রিয়তমাকে দেখাইতে লাগিলেন। সে সব স্মৃতি—বনবাসের অতীতের সে সব সুখস্মৃতির পুনরালোচনায় মনের এ অবস্থায় উভয়ের কত সুখ! এই ত সেই সমুদ্র? শরতের নির্ম্মল তারকামণ্ডিত আকাশকে ছায়াপথ যেরূপ দ্বিধা বিভক্ত করে, সেইরূপ মলয়াচল হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রনির্ম্মিত সেতু এই উত্তালতরঙ্গময় ফেনমণ্ডিত পয়োনিধিকে বিভক্ত করিয়াছে। কবি স্পষ্ট বলেন নাই, ইঙ্গিতমাত্র করিয়াছেন—কিন্তু এই সেতুনির্ম্মাণের উল্লেখে কি দম্পতির মনোমধ্যে বিগত শত সুখদুঃখের কথা মনে পড়ে নাই? পরবর্ত্তী একটি শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্র বিভিন্নমার্গবাহী

বায়ুগতি পুষ্পকরথের সহিত স্বীয় মনোরথের তুলনা করিয়াছিলেন। "যথাবিধো মে মনসোহভিলাষঃ"—আমাদের বোধ হয় সমগ্র ত্রয়োদশ-সর্গই এইরূপ প্রণয়ীর বিভিন্নস্মৃতিজনিত মনোভাবের আভাসে পরিপূর্ণ। যে সব সূক্ষ্মভাব বর্ণনায় এড়াইয়া যায়, এইরূপ আভাসে সে সব স্ফুটতর, উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। সহস্রশীর্ষা বিরাট্‌পুরুষ প্রলয়ান্তকালে এই সমুদ্রের অনন্তশয্যায় সুখশয়ান;—দুর্ব্বহ বাড়বাগ্নির আশ্রয়স্থান, চন্দ্রের জন্মস্থলী এই অনন্ত সমুদ্রের অনন্ত বিষ্ণুর দশদিগ্‌ব্যাপী বিরাট্‌ শরীরের মত কে সীমানির্দ্ধারণ করিতে পারে? প্রণয়ী প্রণয়িনীকে শতপ্রকার ভূষণে ভূষিত করিয়াও তৃপ্তিবোধ করেন না। শক্রগৃহে নৃত্যোৎসবে শক্রকন্যা জুলিয়েৎকে প্রথম দেখিয়া বিহ্বল হইয়া ছদ্মবেশী রোমিও বলিয়া উঠিলেন!—

"O, she doth teach the torches to burn bright!
It seems she hangs upon the cheek of night
Like a rich jewel in an Ethiop's ear;
Beauty too rich for use, for earth too dear!"

শত সুন্দর উপমাপ্রয়োগেও রোমিও প্রণয়িনীর সৌন্দর্য্যবর্ণনা করিয়া তৃপ্তিবোধ করিতেছেন না।—এই পুনর্ম্মিলনের সময় যখন রঘুনাথের প্রেমবন্যা উদ্বেল, তখন সীতার সৌন্দর্য্যের প্রশংসায় রামচন্দ্রের কত সুন্দর উপমাই মনে পড়িতেছে।

ভগবান্‌ কিন্তু প্রলয়ান্তে বরাহাবতারে যখন সমুদ্রনিমগ্না ধরিত্রীকে বিশাল দশনাগ্রভাগদ্বারা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তখন এই জলধির প্রলয়প্রবৃদ্ধ স্বচ্ছজল ধরণীর অম্বরস্বরূপ হইয়াছিল। প্রগল্‌ভা নদী নিজে সাগরকে তরঙ্গাধর পান করিতে দিতেছে, নিজেও সাগরের মুখচুম্বন করিতেছে, আহা, ইহাদের কলত্রবৃত্তি অসামান্য! এই উপমাগত ভঙ্গীতে যে সোহাগ অন্তর্নিহিত, উহার রস সহজবোধ্য! কোথায় মাতঙ্গাকার নক্রেরা সমুদ্রফেনধবলিতকপোল হইয়া শোভা পাইতেছে,—যেন তাহাদের কর্ণে চামর শোভিত হইল। সমুদ্রশোভাবর্ণনায় কালিদাসের লেখনী কিরূপ সিদ্ধহস্ত! সমুদ্রতরঙ্গে বৃহৎ বৃহৎ সর্পগুলি কিরূপ তীরের বায়ুসেবনাভিলাষে জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে, আপাতদৃষ্টে বৃহৎ তরঙ্গের মত বোধ হয়,—কেবল সূর্য্যকিরণে তাহাদের ফণাস্থ মণি প্রতিফলিত হওয়াতে সর্প বলিয়া প্রতীতি হয়। তরঙ্গাভিহৃত শঙ্খযূপ প্রবালাঙ্কুরে বিদ্ধ দেখিয়া সীতার সুকোমল লোভনীয় অধরের কথা রামচন্দ্রের মনে পড়িতেছে। সমুদ্রের সম্বন্ধে একটি উপমা অতি সুন্দর এবং বোধ হয় অনেকের উহা স্মরণ থাকিতে পারে—

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

দিগ্‌গজ ঐরাবতের মদগন্ধসুরভি মন্দাকিনীশীকরশীতল বায়ু মাধ্যাহ্নিক উষ্ণতা জন্য জানকীর মুখকমলের ঘর্ম্মবিন্দু অপহরণ করিতেছে, রাম সেদিকে সস্পৃহলোচনে নিরীক্ষণ করিতেছেন। সীতা তরুণবয়সসুলভ কৌতূহলবশত রথের বাতায়নপথে হাত বাহির করিতে তাঁহার সুন্দর হস্ত বিদ্যুদ্রূপ বলয়ের দ্বারা কিরূপ পরিশোভিত

হইয়াছে, রামচন্দ্র মুগ্ধনেত্রে দেখিতেছেন। সাগরতীরবর্ত্তী কেতকীপুষ্পপরাগবাহী বায়ু জানকীর বিম্বাধরে সংলিপ্ত হইয়া প্রসাধন-অসহিষ্ণু রামচন্দ্রের নর্ম্মসাহচর্য্যের কারণ হইয়াছিল। ক্রমে রথ সীতাহরণস্থানের নিকটবর্ত্তী হইল। অদূরে জনস্থানপ্রদেশ—যেখানে সীতার পাদপদ্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিরহ-ম্লান নূপুরযুগ্ম ভূতলে পড়িয়া রামকে বিচলিত করিয়াছিল—লতার শাখা নতপল্লব হইয়া ও পরিত্যক্তদর্ভকবল মৃগযূথ দীর্ঘলোচনের অনিমেষদৃষ্টিতে সীতার উদ্দেশ যেন ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করিতেছিল। সম্মুখে অভ্রংলিহ মাল্যবান্ গিরি,—যেখানে জল-ধারায় সিক্ত ক্ষুদ্র জলাশয়ের গন্ধে ঈষৎ প্রস্ফুটিত কদম্বপুষ্পে ও ময়ূরের কেকারবে প্রিয়াবিরহিত রামচন্দ্রের মনে সীতার বিরহ-যন্ত্রণা দ্বিগুণিত করিয়াছিল। রঘুবংশের নব্য একজন টীকাকার তাঁহার ইংরেজী-টীকায় এ শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, সমস্ত বাহ্যপ্রকৃতি তখন সীতাবিরহিত রামের মনে তুল্যরূপে অসারবোধ হইতে-ছিল। এ কথা সম্পূর্ণ যথার্থ। মহাকবি স্বীয় নিপুণ তুলিকার কতকগুলি রেখাপাতে বিরহী রঘুনাথের যে শোকচিত্র অঙ্কিত করিয়া-ছেন, অন্য কোন ন্যূনক্ষমতাশালী কবি শত-শ্লোকেও তাহা চিত্রিত করিতে পারিতেন না। মাল্যবান্ গিরির গুহান্তলীন মেঘধ্বনি গুহা হইতে গুহান্তরে প্রতিধ্বনিত হইত,—যেখানে মেঘগর্জ্জনভীরু সীতার স্বেচ্ছাদত্ত সোৎকম্প আলিঙ্গনের সুখস্মৃতি সীতার বিরহ-কালীন রামচন্দ্রের মন আরও ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল। যে গিরির সানুপ্রদেশ বিকশিত-নবকন্দলীপুষ্প-সমাকীর্ণ বৃষ্টিজলার্দ্র ভূমি হইতে উদ্গত বাষ্পে সীতার বিবাহ-ধূমে রক্তবর্ণ লোচনের অরুণিমা অনুকরণ করিয়া রামকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে বেতসবনসমাচ্ছন্ন চঞ্চল-সারসপংক্তিশোভিত পম্পাসরোবরের নির্ম্মল সলিলকে "দূরাবতীর্ণা পিবতীব খেদাৎ" রঘু-নাথের ক্লান্তদৃষ্টি শ্রমের জন্যই যেন পান করিতেছিল। সীতাহরণসময়ে ইহার তীরস্থ রথাঙ্গমিথুন যখন পরস্পর পরস্পরকে পদ্ম-কেশর প্রদান করিত, সেদিকে রামচন্দ্র তখন সস্পৃহলোচনে চাহিয়া থাকিতেন! এই শ্লোক ও পরবর্ত্তী শ্লোকের বর্ণনায় অভিজ্ঞ পাঠককে কুমারসম্ভবের মদনভস্মের বর্ণনায় কুসুমৈক-পাত্রে মধুপানবিহ্বল মধুকরযুগলের ও ঈষৎস্তনভারনম্রা সঞ্চারিণী লতার সদৃশী সুকুমারী পার্ব্বতীর চিত্র স্মরণ করাইয়া দিবে। ক্রমে অনুগোদপ্রদেশে দেববিমান উপনীত—এই সেই পঞ্চবটী, যেখানে কৃশমধ্যা মৈথিলী স্বয়ং আম্রবৃক্ষের আলবালে জলসেচন করি-তেন। রথে যাইবার সময় সীতাপালিত সহকারবৃক্ষ ও মৃগশিশুগুলি তাঁহারই জন্য কিরূপ উন্মুখ হইয়া আছে, রামচন্দ্র সাদরে প্রিয়াকে তাহাই দেখাইতেছেন। এই গোদাবরীতীরে কতবার তিনি মঞ্জুল বেতস-গৃহে সীতার উৎসঙ্গে নিভৃতে শয়ন করিয়া গোদাবরীতরঙ্গশীকরশীতল মন্দানিলের দ্বারা ব্যজনিত হইয়া মৃগয়াশ্রম অপনোদন করিতেন। এ শ্লোকে আমাদের ভবভূতির 'কিমপি কিমপি মন্দং' এই শ্লোক মনে পড়ে। এস্থানে বলা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, গোদাবরীর তীরবর্ত্তি-প্রদেশ-বর্ণনে ভবভূতি কালিদাসের

অপেক্ষাও সিদ্ধহস্ত। ক্রমে সুতীক্ষ্ণ, রাজা নহুষ, শরভঙ্গ ও শাতকর্ণি ঋষির—"পঞ্চাপ্সরো নাম বিহারবারি"—পঞ্চাপ্সরা-নামধেয় ক্রীড়াসরোবর অতিক্রম করিলেন।—কুশাঙ্কুরমাত্রভোজী যে মহাঋষির উগ্র-তপস্যাভীত দেবরাজ পঞ্চসংখ্যক অপ্সরা প্রেরণ করিয়া তাহাদের 'যৌবনকূটবন্ধে' কঠোরতপা ঋষিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ক্রমে রথ অযোধ্যার সন্নিহিত হইল। এস্থলে প্রয়াগসঙ্গমের বর্ণনা—কালিদাসের জগৎপ্লাবিত মহাকাব্যের একটি অতি সুন্দর বর্ণনা—আমাদের কেবল সংক্ষেপে উল্লেখ করিবার মাত্র স্থান হইবে। যিনি প্রয়াগসঙ্গমের অতুলনীয় প্রাকৃতিকসৌন্দর্য্য বহুবার মুগ্ধনেত্রে দেখিয়াছেন, তিনিই ছত্রে ছত্রে কবির এ বর্ণনার সৌন্দর্য্য অনুভব করিবেন। যমুনার নিজপ্রবাহে মিশ্রিত হইয়া গঙ্গাপ্রবাহ মুক্তাপংক্তিমধ্যস্থ ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় অনুমিত হইতেছে। যেমন শ্বেতপদ্ম নীলপদ্মের দ্বারা গ্রথিত, যেমন মানসবিহারী রাজহংসরাজি কৃষ্ণহংসের দুইচারিটিতে মিশ্রিত বোধ হয়, যেমন ভূতলে চিত্রিত শ্বেতপদ্মের আলেপনে কৃষ্ণচন্দনদ্বারা পত্ররচনা করা হয়, যেমন চন্দ্রের কিরণ ছায়াতে লীন অন্ধকারে চিত্রিত হইয়া থাকে—"কচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভিশ্ছায়া-বিলীনৈঃ শবলীকৃতেব" অন্যত্র, যেন শুভ্র শরতের মধ্য দিয়া নীল আকাশ শোভমান—"শুভ্রা শরদভ্রলেখা রন্ধ্রেষ্বিবালক্ষ্যনভঃপ্রদেশা।" ক্রমে অযোধ্যা আরও নিকটবর্ত্তী হইল। সরযূ দেখিয়া রঘুনাথের মনে ভূতপূর্ব্বের কত স্মৃতিই উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। ব্রহ্মসরোবরই সরযূর জন্মস্থান—অবশ্য আধুনিক ভৌগোলিকেরা কালিদাসের ভৌগোলিকজ্ঞানের এস্থলে তীব্র সমালোচনা করিবেন, আশঙ্কা করি। আমি যখন তাঁহার কাব্যের সমালোচনা করিবার ধৃষ্টতা করিয়াছি, তখন এ প্রশ্নের উত্তরে কৈফিয়ৎস্বরূপে আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, ইহা কবির ভূগোল—ইহা আধুনিক ভৌগোলিকবিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্য বিপর্য্যস্ত করিয়া আপনার কবিপ্রতিভার রাজকর আদায় করিয়া লয়। সত্যসত্যই ব্রহ্মসরোবর নামে কোন সরোবর আদৌ আছে কি না বা ঐ সরোবরই সরযূর উৎপত্তিস্থল কি না, আমরা জানি না। কবির লিপিকৌশলে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমরা ভুলিয়া যাই—যক্ষযুবতীদের জলকেলির সময় এই সরোবরজাত কনক-কমলের পরাগে তাঁহাদের পয়োধর অনুরঞ্জিত হয়, কবির এ কথায় আমরা আশ্বস্ত থাকি। কখন বা কালিদাস কোন উপমায় নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা আমাদের পূর্ব্বোক্ত কালিদাসসম্বন্ধীয় প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি যে, কবি হিন্দুদর্শন, বিশেষত সাংখ্যদর্শনে বিশেষ অভিজ্ঞ। কবি এ মহাকাব্যে কেন, তাঁহার অন্যান্য কাব্যনাটকাদিতেও তাহার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীহর্ষের মহাকাব্যের ন্যায়কণ্টকিত যুক্তিতর্ক স্থান কাল, বা পাত্র নিরপেক্ষ হইয়া পাঠকের মনে হাস্যরসের উদ্রেক করে,—কালিদাসের কাব্যে সেরূপ অক্ষমতার পরিচয় নাই। শ্রীহর্ষবর্ণিত হংসের মুখে দীর্ঘ ন্যায়শাস্ত্রের তর্কের কথা স্মরণ করিলে এ কথা বুঝা যায়। আমরা অবান্তর কথাপ্রসঙ্গে কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। সরযূতীরে উপনীত হইয়া রাম-চন্দ্রের কত পুরাতন স্মৃতিই মনে জাগরিত

হইতেছে। এই সেই সরযূ, ব্রহ্মসরোবর যাহার উৎপত্তিস্থল। তাহার পর সেই সাংখ্য-দর্শনের সুন্দর উপমা। দুঃখের বিষয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কালিদাসের অতুলনীয় মহাকাব্যের এ কয় সর্গ যাঁহাদের পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে, 'তাঁহার' কাব্যনিহিত অপর অনেক সৌন্দর্য্যের মত এ সৌন্দর্য্যের গূঢ়ত্ব সে সব ছাত্রেরা কতদূর উপলব্ধি করেন, সে কথা তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরদর্শী কর্ত্তৃপক্ষেরাই অবগত আছেন। সে উপমাটি এই।—যেরূপ অব্যক্ত বা প্রকৃতি বুদ্ধিতত্ত্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মার মানসকল্পিত এই ব্রহ্মসরোবরকে ঋষিরা সরযূর উৎপত্তিস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অভিজ্ঞ পাঠকেরা কবির এ উপমার সৌন্দর্য্য ও সার্থকতা অনুভব করিবেন। এই সেই সরযূ, যাহার স্বতঃপবিত্র সলিল ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতিগণের যজ্ঞমেধান্ত স্নানে পবিত্রতর হয়, যাহার তীরদেশে যজ্ঞীয় যূপসকল নিখাত রহিয়াছে, যাহার সৈকতরূপ উৎসঙ্গে আরোহণ করিতে রামের মন চিরাভ্যস্ত। ইনি উত্তরকোশলপতিগণের সাধারণমাতৃস্বরূপা। আমাদের বঙ্গীয়কবি মধুসূদন কপোতাক্ষনদের কথায় বলিয়াছেন—"দুগ্ধরূপী স্রোত যেন জন্মভূমিস্তনে।"—সেই "দুগ্ধরূপী স্রোত" দেখিয়া কত কথাই রামের মনে পড়িতেছে। পতিবিধুরা নারী যেমন প্রবাসী পুত্রের আশাপথ চাহিয়া থাকেন ও সেই পুত্রসমাগমে তাহাকে যেরূপ সাদরে আলিঙ্গন করেন, রাজ্ঞী কৌশল্যার ন্যায় এই সরযূও শীতলসমীরণান্দোলিত তরঙ্গরূপ হস্তদ্বারা তাঁহাকে যেন আলিঙ্গন করিতেছিল। ক্রমে 'বিরক্তসন্ধ্যাকপিশং পুরস্তাৎ', লোহিতবর্ণা সন্ধ্যার ন্যায়, সম্মুখে তাম্রবর্ণ ধূলিজাল উড়াইয়া বল্কলধারী ভরত সৈন্যগণকে পশ্চাতে ও গুরু বশিষ্ঠকে পুরোভাগে করিয়া পদব্রজে অর্ঘ্যহস্তে রামচন্দ্রকে প্রত্যুদ্গমন করিতে আসিলেন। 'বিমান হইতে তীরস্থ, তরঙ্গাকারে বিনির্ম্মিত স্ফটিকসোপানে অবতরণ করিলে, প্ররোহনির্গমে যেরূপ বটবৃক্ষ জটিল হয়, সেইরূপ রামনির্ব্বাসনদুঃখে বহুবৎসরের অসংস্কৃত প্রবৃদ্ধ শ্মশ্রুরাজিতে বিবৃতাননন বৃদ্ধমন্ত্রীরা তাঁহাকে প্রণাম করিলে, তিনি শুভদৃষ্টিপাতৈঃ, বার্ত্তানুযোগমধুরাক্ষরয়া চ বাচা" কৃপার্দ্র দৃষ্টিপাতে ও কুশলপ্রশ্নসমন্বিত বাক্যে অনুগৃহীত করিলেন। ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে আলিঙ্গনপ্রণামাদির পর সকলে যথাযোগ্য যানবাহনে আসীন হইলেন। ইহার পর. চিরদুঃখিনী জানকীর অভিনন্দনের পালা। রাম, ভরত ও লক্ষ্মণের সহিত সম্মিলিত হইয়া পুনরায় সেই কামগামী রথে—"দোষাতনং বুধবৃহস্পতিযোগদৃশ্যস্তারাপতিস্তরল-বিদ্যুদিবাভ্রবৃন্দম্"—বুধ ও বৃহস্পতি সম্মিলিত শুভতরদর্শন চন্দ্র সন্ধ্যাকালের বিদ্যুদ্দামদীপ্ত মেঘপুঞ্জে আরোহণ করিলে যেরূপ শোভমান হন, সেইরূপ শোভিত হইলেন। সেই শোভা ভগবান্ আদিবরাহকর্ত্তৃক প্রলয়োদ্ধৃত ধরণীর ন্যায় ও শরৎকালের মেঘপিণ্ডকবলিত অপ্রনষ্ট চন্দ্রকান্তির ন্যায়—"তত্রেশ্বরেণ জগতাং প্রলয়াদিবোর্ব্বীং" আর, "বর্ষাত্যয়েন রুচমভ্রঘনাদিবেন্দোঃ!"—যিনি বাসবজিজয়ী লঙ্কেশ্বরের প্রণামকেও তুচ্ছ করিয়া নিজের পাতিব্রত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন—"লঙ্কেশ্বরপ্রণতিভঙ্গদৃঢ়ব্রতং"—সেই জনকনন্দিনীর সর্ব্বজনবন্দনীয়

শ্রীপাদযুগলে সাধু ভরত স্বীয় জটাযুক্ত মস্তক স্থাপন করিলেন। জানকী চিরকালই দীনা, নম্রস্বভাবা। তিনিই যে কঠোর, অন্যের দুশ্চর্য্য সতীধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ও ভয়াবহ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাতিব্রত্যের যজ্ঞানলে পূর্ণাহুতি দিয়াছিলেন, সতীকুলের আদর্শস্থানীয়া সে কথা ভুলিয়া "আমিই সেই পতির ক্লেশের নিদান অলক্ষণা সীতা"—"ক্লেশাবহা ভর্ত্তুরলক্ষণাহং সীতেতি নাম স্বমুদীরয়ন্তী"—এই বলিয়া শ্বশ্রূদিগের পাদবন্দনা করিলেন! এই কয়টি কথায় মহাকবি এই সতীকুলসাম্রাজ্ঞীর মধুর বিনীতস্বভাবের কিরূপ সুন্দর রেখাপাত করিয়াছেন!

ক্রমে আমরা সীতানির্ব্বাসনের অশুভ মুহূর্ত্তের বর্ণনা করিতে অগ্রসর হইতেছি। সে আসন্ন দুঃখকাহিনী বর্ণনা করিতে আমাদের হৃদয় মুহ্যমান ও নেত্র অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু যখন মাতার নির্ব্বাসন-বর্ণনারূপ কার্য্যভার অবিমৃশ্যকারিতায় গ্রহণ করিয়াছি, তখন সে কার্য্য পরিসমাপ্ত করিতেই হইবে। লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় ফিরিবার পথে দেববিমানে রাজদম্পতির এই অতুলনীয় প্রেমালাপচিত্রের পর জানকীর নির্ব্বাসনের শোকচিত্র ভাববৈপরীত্যে সমধিক মনোরম ও কালিদাসের চিত্রাঙ্কণী প্রতিভার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নৃপতি ডন্‌কানের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বে Porter Sceneএর হাস্যরস অনেক সমালোচকের মতে বিসদৃশ ও ভাববৈপরীত্যে ইহা সেই অপূর্ব্ব নাট্যকলাকুশলীর একটি নাট্যগত দোষস্থল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অনেক পণ্ডিত সমালোচক আবার সে দৃশ্য ঐ মহাকবির অদ্ভুত নাট্যকলাপ্রতিভার দৃষ্টান্তস্থল বোধ করিয়াছেন। কিন্তু রঘুবংশের পুষ্পকরথবর্ণনার পর সীতানির্ব্বাসনের রসবৈপরীত্য সমধিক বিস্ময়কর। এ সম্বন্ধে কোন সমালোচকের মতদ্বৈধ হইতে পারে বোধ হয় না। এস্থলে উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্কের আলেখ্যদর্শনের অতুলনীয় প্রেমচিত্রের পর দুর্ম্মুখের মুখে সীতাচরিত্রে পৌরগণের দোষারোপ শুনিয়া রামচন্দ্রের সীতানির্ব্বাসনপ্রতিজ্ঞা ও রামের হৃদয়ার্দ্রকারী বিলাপ ভাববৈপরীত্যে তুলনীয়। যদিও বর্ত্তমান প্রবন্ধে সীতাচরিত্রই আমাদের প্রধানত সমালোচ্য, তথাপি প্রাসঙ্গিকভাবে এস্থলে এ কথা বলা বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, এই নির্ব্বাসনব্যাপারের বিষয়-সংস্থানজনিত রসবৈপরীত্যে রঘুবংশের ১৪শসর্গ পাঠককে ভবভূতির ঐ চিত্র স্মরণ করাইয়া দেয় বটে, কিন্তু উক্ত দুই মহাকবির চিত্রিত রামচরিত্রের মধ্যে এ স্থলে কালিদাসের রামচন্দ্রের উপর পাঠকের মনে সমধিক শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম উদ্রিক্ত হয়। বাল্মীকির মূলচিত্রানুসরণে এখানে কালিদাসই অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ভবভূতির রাম যেখানে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়াছেন, কালিদাস সেখানে আসন্ন সীতানির্ব্বাসনের শোকে বিদীর্ণহৃদয় রামচন্দ্রকে কিরূপ অটল, অচল, নির্ব্বাতপ্রদেশের জলধিবক্ষের ন্যায় বিক্ষোভশূন্য বর্ণনা করিয়াছেন—কিরূপ সুদৃঢ় ধৈর্য্যকঞ্চুকে তাঁহার চরিত্র সংবৃত করিয়াছেন! আমরা অবান্তরপ্রসঙ্গে কিছুদূর আসিয়া পড়িয়াছি। সে যাহা হউক, যখন পুষ্পকে রামচন্দ্রের সোহাগে তিনি গলিয়া পড়িতেছিলেন বা কর্ণীরথে পুরপ্রবেশকালীন

অযোধ্যার সৌধরাজির গবাক্ষপথে পুরমহিলাদের প্রোৎফুল্ল নয়নেন্দীবরে ও অঞ্জলিবদ্ধ প্রণামের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছিলেন অথবা শরত্তুণের ন্যায় পাণ্ডুর মুখশ্রীতে পরিশোভমানা স্নিগ্ধবিলোচনা আসন্নদোহদচিহ্নধারিণী স্বামীর নয়নানন্দদায়িনী কৃশাঙ্গীকে যখন রাম স্বীয় অঙ্কে আরোপণ করাইয়া সাদরে তাঁহার মনের অভিলাষ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন বনবাসের কথা কে ভাবিয়াছিল? সীতাও যখন সলজ্জভাবে যেখানে বন্যজন্তুরা ভিক্ষুকাদির জন্য আহৃত নীবারধান্য চর্ব্বণ করে, যেখানকার তপস্বিকন্যাদের সহিত তিনি পূর্ব্ব হইতেই সখীসম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই হরিদ্বর্ণকুশপরিশোভিত গঙ্গাতীরবর্ত্তী তপোবনে ভ্রমণাভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তখন তিনি কি ঘুণাক্ষরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই বনভ্রমণরূপ সুখের আলোক—

"— ——সুখমুপরি দারুণং দুঃখম্।
কৃষ্ণালোকং তরলা তড়িদিব বজ্রং নিপাতয়তি।" *

ক্রমে নির্ব্বাসনের অশনিসম্পাতে পরিবর্ত্তিত হইয়া অতর্কিতভাবে তাঁহার মস্তকে পতিত হইবে। যখন বাল্মীকির তপোবনপ্রদেশে লক্ষ্মণকর্ত্তৃক নীত হইলেন, তখন মনে আশা করিয়াছিলেন যে, এত দুঃখের পর বিধি বোধ হয় পুনরায় প্রসন্ন হইলেন! যখন, "অপাং তরঙ্গেষিব তৈলবিন্দুম্"—জলে নিপতিত তৈলবিন্দু যেমন তরঙ্গ হইতে তরঙ্গান্তরে প্রসারিত হয়, অযোধ্যাবাসীদের মধ্যে ক্রমে প্রসার্য্যমাণ সীতার অপবাদ যখন শ্রীরামচন্দ্রের কর্ণগোচর হইল, তখন "অয়োঘনেনায় ইবাভিতপ্তং বৈদেহিবন্ধোর্হৃদয়ং বিদত্রে"—যেমন উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড লৌহমুদ্গরদ্বারা আহত হইলে বিদীর্ণ হয়, রামচন্দ্রের হৃদয়ও তদ্রূপ পত্নীর অপবাদমূলক এ গুরু অখ্যাতিতে ব্যথিত হইয়া বিদীর্ণ হইল! নিজের নিন্দাকে তুচ্ছজ্ঞান করিবেন বা "জায়ামদোষামুত সন্ত্যজানি"—সীতার মত আজন্মশুদ্ধা পত্নীকে পরিত্যাগ করিবেন, এই দুই মহাসমস্যার মধ্যে উপনীত হইয়া ক্ষণকাল 'দোলাচলচিত্তবৃত্তিঃ'—রামের 'চিত্ত দোলার ন্যায় পর্য্যাকুল হইয়াছিল। † কিন্তু মনের এ ভাব ক্ষণকালের নিমিত্ত। কুমারসম্ভববর্ণিত মদনের সম্মোহনশরাহত তপস্বী শিবের মন যেরূপ ক্ষণিকের জন্য বিচলিত হইয়াছিল, পুনরায় যেমন তিনি "পুনর্বশিত্বাৎ বলবন্নিগৃহ্য" মহাসংযমী বলিয়া তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়াছিলেন, রামচন্দ্রও তদ্রূপ এ মানসিক দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এখানে কালিদাসের সঙ্গে আমরা একটু কলহ করিব। রাম সীতাবিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, কেন না—

"অপি স্বদেহাৎ কিমুতেন্দ্রিয়ার্থাৎ
যশোধনানাং হি যশো গরীয়ঃ"—

যাঁহারা যশকেই পরমধন বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগের নিকট যশ নিজের দেহ হইতেও গুরুতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ্যবস্তু হইতে যে গুরুতর বোধ হইবে, তাহাতে বিস্ময় কি? এখানে দুইটি

* শ্রীহর্ষচরিত।

† নব্য টীকাকার সারদারঞ্জনবাবু 'দোলাচলচিত্তবৃত্তিঃ' এ কথার অনুবাদে "চিত্ত দোলার ন্যায় চলিতে থাকিল" করিয়াছেন—ইহার অর্থ কি?—দোলার ন্যায় দুলিতে লাগিল, এ অনুবাদ বরং একদিন সঙ্গত হইত।—লেখক।

বিষয়ের জন্য কবির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিব। প্রথম এই যে, রামসীতার আদর্শপ্রেম কবির কাছে কি কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সুখের মধ্যে পরিগণিত ও তত্তুল্য অসার—এই জগতে অতুলনীয় দাম্পত্যপ্রেম অসার ইন্দ্রিয়বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিশ্চয়ই কি অতীন্দ্রিয় বিষয়ে পৌঁছায় নাই?—দ্বিতীয়, কালিদাসবর্ণিত রাম, সীতা-হেন বস্তুকে অক্লেশে নিজের শরীরের অপেক্ষা নিম্নতর স্থান দিতে পারিলেন—(নচেৎ কবি কালিদাসের এ "অপি স্বদেহাৎ," এ শব্দপ্রয়োগের 'অপি'কথার সার্থকতা কি?)—যে সীতা অন্য এক মহাকবির কথায়—

ইনি লক্ষ্মী গৃহে মোর নয়নের অমৃত-অঞ্জন
ও অঙ্গপরশে গাত্রে মাখা হয় স্নিগ্ধ চন্দন।
ওই বাহু কণ্ঠে মোর মুক্তাহার মসৃণ-শীতল
প্রিয়ার সকলই প্রিয় অসহ্য সে বিরহ কেবল। *

এক শ্লোকে চরিত্রচিত্রণে এই দুই বিষম অসঙ্গতি কালিদাসের মত সুনিপুণ শিল্পীর লেখনীমুখে বাহির হইয়াছে, ইহা কেমন বিসদৃশ বোধ হয়। রামের জীবনে এখন সেই পরম অশুভ মুহূর্ত্ত আসিয়াছে—প্রজার মঙ্গলমন্দিরে যখন তাঁহার আত্মবলি, আত্মবলি বা কোন্ ছার, আপনার অপেক্ষা সহস্রগুণ প্রিয় যদি কিছু থাকে, এমন বস্তু চিরবিসর্জ্জন দিতে হইবে। কারণ, কবি এ শ্লোকে অতর্কিতভাবে যাহাই বলুন, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণনায় এ কথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, সীতানির্ব্বাসনে রামচন্দ্রের হৃৎপিণ্ড যেন সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। কালিদাসের কাব্যের এই স্থল অবহিতচিত্তে যিনি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন, সেরূপ সহৃদয় পাঠককে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, এ কথা সত্য কি না? নিশ্চয়ই তিনি আমাদের এ কথা সমর্থন করিবেন, আশা করি। এই সীতানির্ব্বাসন লইয়া রামচরিত্র-সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন। সে সব মতসমুদ্রে প্রবেশ করিতে অবসর ও অভিলাষ নাই। তবে তিনি যে যুগাবতার, এ বিশ্বাস আমার আছে—কেবল চরণে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিতে ইচ্ছা করে যে, লীলাময়, এ কি লীলা করিলে! সীতার নির্ব্বাসনকালে রামচন্দ্রের মুখে কালিদাস যে কথা বসাইয়াছেন, সেও কিরূপ বোধ হয়—

"অবৈমি চৈনামনঘেতি কিন্তু
লোকাপবাদো বলবান্ মতো মে"—

"সীতাকে চিরবিশুদ্ধচরিত্রা বলিয়া জানি, কিন্তু আমার মনে হয়, লোকাপবাদ বড় বলবান্"—এ কথার সমর্থনে চন্দ্রের কলঙ্কসম্বন্ধে যে উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন, উহা অতি সুন্দর, কালিদাসেরই যোগ্য, কিন্তু এ কি উত্তর! এ উত্তরে প্রভুকে দোষ দিতে ইচ্ছা করে। তাঁহার এমন যে ত্রিলোকবিখ্যাত চরিত্র, সেই নিষ্কলঙ্কচরিত্রে যেন ইহাতে মসীমলা পড়িয়াছে। কিন্তু আমরা দুর্ব্বলচিত্ত নর—দেবচরিত্রের রহস্য কি করিয়া বুঝিব! তপোবনে বিসর্জ্জিতা রোরুদ্যমানা জানকীকে প্রবোধ দিয়া বাল্মীকি বলিয়াছিলেন যে, যদিও "রামচন্দ্র রাবণাদি দুর্দ্ধর্ষ ত্রিভুবনের কণ্টক উন্মূলিত করিয়া জগতের পরম হিতসাধন করিয়াছেন, যদিও তিনি একান্ত সত্যনিষ্ঠ ও আত্মশ্লাঘাবিরহিত, তথাপি বিনা কারণে তোমার প্রতি যে এরূপ গর্হিতাচরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য—"অস্ত্যেব মন্যুর্ভরতাগ্রজে মে"—

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথবাবুর অনুবাদ।

তাঁহার উপর আমার ক্রোধ হইতেছে। কবির সহিত আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা করে —"অন্ত্যেব মন্যুর্ভরতাগ্রজে মে"। এ স্থলে মহাকবি কালিদাস মহর্ষিচিত্রিত চরিত্রে নূতন আলোক প্রক্ষেপ করিয়াছেন, সন্দেহমাত্র নাই। বরাবর বাল্মীকির পদানুসারী হইয়া কালিদাস এ শ্লোকে যেন আপনাকে ধরা দিয়াছেন। আমাদের যতদূর স্মর। হয়, মূল রামায়ণে মহর্ষি সীতানির্ব্বাসনের ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার করেন নাই, এ শ্লোকে বাল্মীকির মুখের কথায় কালিদাসের মনের রোষ পরিব্যক্ত হইয়াছে! সে যাহা হউক, লক্ষ্মণ অবিচলিত-ভাবে এই অশনিসম্পাতসদৃশ নির্ব্বাসনাজ্ঞা গ্রহণ করিলেন—এই হৃদয়ের মর্ম্মতন্তুচ্ছেদী ভীষণ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইবে শুনিয়া দ্বিরুক্তি করিলেন না। চতুর্দ্দশ সুদীর্ঘ-বৎসর বনে বনে অনশনে অনিদ্রায় ফলমূলাশী হইয়া ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিয়া ছায়ার মত যে ভ্রাতার অনুগামী হইয়াছিলেন —সেই মাতৃকল্পা ইষ্টদেবীরূপিণী ভ্রাতৃজায়াকে সেই গুরুর আজ্ঞায় বিসর্জ্জন করিতে হইল! সহৃদয় পাঠক লক্ষ্মণের মনের অবস্থা অনুভব করিবেন। সীতার রথ ক্রমে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনসন্নিহিত হইলে সীতা মনে করিতে-ছিলেন যে, প্রিয়তম আমার দোহদ-ইচ্ছা-পরিপূরণ-মানসে এই সব রুচির প্রদেশ প্রদর্শনার্থ পাঠাইয়াছেন; তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার স্বামী তাঁহার প্রতি কল্পতরুর ভাব পরিত্যাগ করিয়া এখন অসিপত্রবৃক্ষে পরিণত হইয়াছেন! এই সময় লক্ষ্মণ যে নিষ্ঠুর সংবাদ এতাবৎ সযত্নে গোপন করিয়া আসিতে-ছিলেন, সীতার দক্ষিণাক্ষিস্পন্দনরূপ দুর্নিমিত্ত যেন সে ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিল—হায়, সে নয়নের পক্ষে প্রিয়তম রামচন্দ্রের মুখারবিন্দদর্শন চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছিল! এ অমঙ্গল-সূচনায় বৈদেহীর মুখারবিন্দ পরিম্লান হইল, নিতান্ত ছলছলনেত্রে তিনি সানুজ প্রিয়তমের মঙ্গলকামনা করিতে লাগিলেন। এই এক কথায় কবি এই পতিগতপ্রাণার চরিত্রে কিরূপ উজ্জ্বল আলোক সম্পাত করিয়াছেন! অমঙ্গলা-শঙ্কায় প্রথমে সাধ্বীর মনে তাঁহার প্রাণাপেক্ষা শতগুণে প্রিয়তর রামচন্দ্রের অমঙ্গলের ভাবনা উদিত হইল। তিনি এজন্য বারংবার যাহাতে সানুজ প্রিয়তমের মঙ্গল হয়, দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করিলেন। মানবের সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতিও সমবেদনা করিতেছে, কালিদাসের কাব্যনাটকে এ ভাব বহুস্থানে পরিস্ফুট। পতিগৃহগামিনী শকুন্তলার, পত্নী-বিয়োগবিধুর বিক্রম, অজ বা মদনের বা তপ-শ্চারিণী পার্ব্বতীর কথা স্মরণ করুন। এস্থলেও লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের কঠোরাদেশ প্রচার করিতে উদ্যত হইলে জাহ্নবী বীচিহস্ত উত্তোলন করিয়া যেন তাঁহাকে এ নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করিল। সত্যপ্রতিজ্ঞ লক্ষ্মণ গঙ্গার সহিত যেন ভ্রাতার নিকট প্রতিশ্রুত জানকী-নির্ব্বাসনরূপ কুলিশকঠোর প্রতিজ্ঞার পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। সে আজ্ঞা লক্ষ্মণকে শূলের ন্যায় বিদ্ধ ও বজ্রাগ্নির ন্যায় প্রখর জ্বালায় তাঁহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছিল। কিন্তু কি করেন—একদিকে ইষ্টদেবতুল্য অগ্রজের আজ্ঞা, অপরপক্ষে মাতৃকল্পা নিরপরাধা ভ্রাতৃ-জায়ার বিসর্জ্জন! লক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতৃবৎস-লতা ও ভ্রাতৃজায়ার প্রতি অবিচলিত ভক্তি লইয়া যদি এ জগতে কাহারও আসা সম্ভব

হয়, তবে তিনিই লক্ষ্মণের এসময়কার মর্ম্ম ব্যথা অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন। বাষ্প-গদ্গদকণ্ঠে তিনি ভ্রাতৃ-আজ্ঞা অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত করিয়া 'দেবি ক্ষমস্ব'—'হে দেবি আমাকে ক্ষমা করুন' এই অর্দ্ধোক্তিতে বিরত হইয়া, ইষ্টদেবীর চরণে সাধক যেমন আত্ম-নিবেদন করে, সেইরূপ দীনার্ত্তকণ্ঠে পূর্ব্বোক্ত কথাকয়টি উচ্চারণ করিয়া সীতার সর্ব্বজনবন্দনীয় শ্রীপাদযুগলে পতিত হইলেন। এ কথার মর্ম্ম অনুভব করিয়াই সীতার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল। ঝটিকাবেগে কোমলপ্রাণা স্বর্ণ-লতিকা যেরূপ ভূলুণ্ঠিতা হয়, রঘুকুলের অলঙ্কারস্বরূপা রামের লোচনানন্দদায়িনী স্বর্ণ-লতিকাও সেইরূপ ভূলুণ্ঠিতা হইলেন। যখন পুনরায় চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলেন, তখন সীতা বলিলেন—বিষ্ণু যেমন অগ্রজ উপেন্দ্রের অনুগামী, লক্ষ্মণও তদ্রূপ অগ্রজের আজ্ঞানুবর্ত্তী, অতএব "প্রীতাস্মি তে বৎস চিরায় জীব" এই আশীর্ব্বচনে লক্ষ্মণকে আশ্বস্ত করিয়া যে কয়টি শ্লোক রামের উদ্দেশে বলিলেন, তাহা জগতের সাহিত্যে অতুলনীয়। যিনি এস্থলে মূল-রামায়ণ ও কালিদাসের কাব্য অবহিতভাবে অনুসরণ করিয়াছেন, তিনিই দেখিবেন, সীতা-চরিত্রে এস্থলে কালিদাস কিরূপ উজ্জ্বলতর আলোকপাত করিয়াছেন। প্রবন্ধও দীর্ঘ হইয়াছে, বর্ণনীয় বিষয়ও বড় শোকাবহ, সুতরাং সংক্ষেপে সে বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

প্রথমে পুত্রবৎসলা জানকীর গর্ভস্থ সন্তানের কথা মনে পড়িয়াছে। পতিপরিত্যক্তার এই চিন্তাই প্রথমে মনে উদিত হয়। আমি বিনা দোষে পরিত্যক্ত হইয়াছি, তজ্জন্ত আমার নিরপরাধ পেটের বাছা, সেও কি পরিত্যক্ত হইবে? জননীর মনে প্রথমে এই আশঙ্কা হয়। গর্ভস্থ সন্তানের কথা এস্থলে প্রথমে উল্লেখ করিবার এই এক কারণ। আর এক কারণ বোধ হয় এই যে, চিরনির্ব্বাসন-দুঃখে বিদীর্ণহৃদয়া সীতা যখন চতুর্দ্দিকে আশার অবলম্বনমাত্র খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, এই করুণ কথায় শ্বশ্রূদিগের হৃদয় আর্দ্র করিবার জন্য তাঁহাদিগকে মর্য্যাদানুসারে যথাক্রমে প্রণাম বিজ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের পিণ্ড-দাতা বংশধর, সীতার গর্ভস্থ শিশুর, সর্ব্বান্তঃকরণে মঙ্গলকামনা করিতে বলিতেছেন। তখনি আবার নিরপরাধা সাধ্বীর মনে স্বামীর নিষ্ঠুরতার কথা মনে পড়িতেছে। অভিমানে বলিতেছেন—'বাচ্যস্ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা' 'তুমি আমার কথানুসারে সেই রাজাকে বলিবে'—'স্বামী' বলিলেন না, 'রাজা'শব্দ ব্যবহার করিলেন—এই একটি শব্দের ব্যবহারে কালিদাস চরিত্রচিত্রণের কি নিপুণতা দেখাইয়াছেন!—সীতার মত আজন্মশুদ্ধা, অগ্নি-পরীক্ষোত্তীর্ণা সাধ্বী স্ত্রীকে তিনি লোকাপবাদ মিথ্যা জানিয়াও পরিত্যাগ করিলেন! সেই প্রজারঞ্জক কর্ত্তব্যপরায়ণ নৃপতিকে বলিও যে, ইহা কি তাঁহার ত্রিলোকখ্যাত বংশের উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে? 'আমার কথানুসারে'—কেন না, লক্ষ্মণের যে অতুলনীয় ভ্রাতৃভক্তি, তাহাতে তিনি সেই অগ্রজের নিকট অত্যন্ত অন্যায় হইলেও নিজে হইতে ভৎর্সনার কোন কথা বলিতে পারিবেন না—হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও ভ্রাতৃ-আজ্ঞা তাঁহাকে পালন করিতেই হইবে। এই কথা বলিয়াই এই সতীকুলসাম্রাজ্ঞীর মনে হইল যে, এ কথা পতিনিন্দার স্বরূপ, সুতরাং পাছে কিছু

প্রত্যবায় ঘটে, এজন্ত পুনরায় সংশোধন করিয়া বলিতেছেন যে, রামচন্দ্রের কল্যাণ-সাধিনী বুদ্ধি সহসা যে সীতানির্ব্বাসনরূপ নিদারুণ কার্য্যে রত হইল, তাহার কারণ সীতার পূর্ব্বজন্মের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত!* কবি সুকৌশলে এই এক শ্লোকে সীতার দেবী-চরিত্রে একটু মানবিকতার আভাস দিয়াছেন। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্রদের জন্য যাঁহারা কালিদাসের কাব্যের টীকা লেখেন, তাঁহারা এস্থলে ও পরবর্ত্তী শ্লোকের "কল্যাণবুদ্ধে" ইত্যাদি উক্তি উপলক্ষ্য করিয়া অদৃষ্টবাদ, কর্ম্মবাদ, বিচারক হইয়া ধর্ম্মাধি-করণে যিনি অন্যায় বিচার করেন তাঁহার পাপপুণ্যের কথা ইত্যাদি অনেক উৎকট বিষয়ের নিরর্থক অবতারণায় সীতাচরিত্রের কোন্ অংশ ছাত্রকে বুঝাইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন! তাহার পর যেখানে স্ত্রীজনসুলভ সারল্যের সহিত বলিতেছেন যে, পূর্ব্বে রাজ-লক্ষ্মীকে উপেক্ষা করিয়া রামচন্দ্র যে পত্নীর সহিত বনেগমন করিয়াছিলেন, জানকীর সেই স্বামিসৌভাগ্যজনিত ঈর্ষায় ঈর্ষান্বিতা রাজলক্ষ্মীর কোপে সীতাকে এখন নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিতে হইতেছে। এস্থলে উক্ত টীকাকারেরা বলিতেছেন যে, "The idea of the sloka is purely conventional"—অর্থাৎ এ শ্লোকের ভাব একটি প্রচলিত বদ্ধমূল কুসংস্কারের উপর সংস্থাপিত! কি অদ্ভুত মন্তব্য! হৌক কুসংস্কার, এ কথা এ সময় কতটা সীতার মুখে শোভা পাইয়াছে, ইহাই এস্থলে প্রধান বিচার্য্য নহে কি? সে যাহা হউক, মাতা জানকী বিলাপ করিতেছেন যে, যদি আমার গর্ভে তোমার পিতৃলোকের উদ্ধারকর্ত্তা বংশধর সন্তান না থাকিত, তাহা হইলে তোমার চিরবিচ্ছেদকাতর এ দগ্ধ-জীবন পরিত্যাগ করিতাম। যে স্বামী তাঁহাকে আজন্মশুদ্ধা পতিপ্রাণা জানিয়াও পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, সীতা তখনও তাঁহারই ধর্ম্মরক্ষার্থে ব্যগ্র—(কারণ পুত্রাভাবে পিতৃপিণ্ডলোপে নিরয়গামী হইতে হয়, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম)—এরূপ ব্যবহার জগতে কেবল সীতার মত স্ত্রীরই সম্ভবে। কিন্তু মিতভাষিণী সর্ব্বাপেক্ষা যে কয়টি মধুর কথার উল্লেখ করিয়াছেন, সেই কথাকয়টি কালিদাসের অতুলনীয় ভাষায় উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না—

> সাহং তপঃ সূর্য্যনিবিষ্টদৃষ্টি-
> রূর্দ্ধং প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে।
> ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি
> ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ।

এই উক্তির সৌন্দর্য্য জগতের কাব্য-সাহিত্যে অতুলনীয়! এরূপ চরিত্রের আদর্শও অমৃতময় সংস্কৃতসাহিত্য ব্যতীত কোনো দেশের কোনো সাহিত্যে আছে কি না, সন্দেহ!

নির্ব্বাসিত হইয়াছেন বলিয়া এতকালের এত প্রিয়সম্পর্ক কি দূর হয়! সীতা বিলাপ করিতেছেন যে, পূর্ব্বে তপোবনে তাপসেরা নিশাচরকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলে তাপসপত্নীরা মহাবীর রামচন্দ্রের সাহায্যাভিলাষিণী হইয়া সীতার শরণ লইতেন। সেই অক্ষুণ্ণপ্রতাপ স্বামী

* এই শ্লোকের সীতাচরিত্রের এ অংশ—এই দেবীত্বে মানবিকতার সৌন্দর্য্য—সভাস্থলে মাননীয় শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় উল্লেখ করিয়া লেখককে উপকৃত করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে তাঁহার অনাথিনী ধর্ম্মপত্নী এক্ষণে কাহার শরণ লইবে। এরূপ মধুর কথা বৈষ্ণব-সাহিত্যে আছে।—কৃষ্ণবিরহিণী রাধিকা, ব্রজনাথের মথুরাপুরীগমনে গোপীরা কিরূপ অনাথিনী হইয়াছেন, পূর্ব্বেই বা তাঁহাদের কত সোহাগ-আদর ছিল, ইঙ্গিতে বলিয়াছেন—

"তোমার গরবে গরবিণী আমি
রূপসী তোমার রূপে—"

সীতাও শোকবিহ্বলা হইয়া আক্ষেপ করিতেছেন যে, এখন প্রণয়িণী পত্নী বলিয়া নয়—তাঁহার প্রজাসাধারণের মধ্যে একজন তাঁহার মঙ্গলার্থিনী তপশ্চারিণী বলিয়া—'তপস্বিসামান্যমবেক্ষণীয়া'—যেন রামচন্দ্র তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখেন; কারণ, মনুর মতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন রাজারই প্রধান কর্ত্তব্য! অকূলপাথারে মজ্জমান ব্যক্তি তৃণমাত্রকেও অবলম্বন করিয়া প্রাণরক্ষায় ব্যগ্র হয়—আসন্ন-চির-বিচ্ছেদবিধুরা এরূপ করুণ খেদোক্তিতে রামচন্দ্রের হৃদয়াকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

লক্ষ্মণ 'তথাস্তু' এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে সীতাদেবীর বাক্যগুলি শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া বিদায় হইলেন। অন্য কোন অক্ষম কবি হইলে লক্ষ্মণের মুখে এ সময় একটি দীর্ঘ বক্তৃতা জুড়িয়া দিতেন। কিন্তু কালিদাস বিলক্ষণ জানিতেন যে, সীতাকে বিসর্জ্জন দিতে লক্ষ্মণের মত দেবরের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে—তাহার উপর দেবীর ঐরূপ হৃদয়দ্রাবী বিলাপ—সে সময় নীরবতাই যথার্থ উত্তর—শোকোন্মত্তের উত্তর কোথায়? লক্ষ্মণ দৃষ্টিপথের অতীত হইলে মাতা অসহ্য শোকাবেগে—"চক্রন্দ বিগ্না কুররীব ভূয়ঃ"—ভয়চকিতা কুররীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বহিঃপ্রকৃতি কিরূপ মানবের অন্তঃপ্রকৃতির বিভিন্ন ভাবের প্রতিবিম্ব, কালিদাস এ সত্য স্বীয় কাব্যাদিতে অনেকস্থলে দেখাইয়াছেন, এ কথার দৃষ্টান্ত আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই সীতাবিলাপই তাহার আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সীতার ক্রন্দনে সেই অরণ্যানী যেন শোকবিহ্বল হইয়া উঠিল—

ময়ূর নাচে না আর, তরু হ'তে ঝরে পুষ্পদল
হরিণীর মুখ হ'তে খসি পড়ে দর্ভের কবল।

এমনসময়, এই শোকমথিত অরণ্যানী-মধ্যে এই শোকার্ত্তা সাধ্বীর সমক্ষে, সেই আদিকবি, যাঁহার "নিষাদবিদ্ধাণ্ডজদর্শনোত্থঃ শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ"- ব্যাধবিদ্ধ-ক্রৌঞ্চদর্শনে উৎপন্ন যাঁহার শোকবেগ ছন্দোময়ী বাণীতে পরিণত হইয়াছিল, সেই দয়ার্দ্রহৃদয় কবিগুরু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাল্মীকি আসিয়া সীতাকে পিতৃজনোচিত আশীর্ব্বচনে পরিতৃপ্ত করিলেন,—তাঁহার দারুণ-বেদনাক্লিষ্ট হৃদয়কে শান্ত করিলেন। স্বামী স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এ নির্ম্মম কথা-স্বীকারের অব-মাননা কেবল হিন্দু স্ত্রীই বুঝিতে পারেন, বিশেষত সীতার মত স্ত্রী। সে সময় সকলের পূজনীয় পিতৃকল্প যদি কেহ আসিয়া বলেন—আমি তোমাকে চিরকাল জানি—তুমি এমন বিশুদ্ধা যে, সর্ব্বপাবক অগ্নিও তোমাকে বিশুদ্ধতর করিতে পারেন না; "ধুরি স্থিতা ত্বং পতিদেবতানাম্"—তুমি পতিব্রতাদের অগ্রগণ্যা; আমার কাছে স্বচ্ছন্দে নির্ব্বিঘ্নে বাস কর, আমি তোমার পিতার সখা,—

পিতৃস্থানীয়;—এরূপ সান্ত্বনা ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের পক্ষে কি অমৃতপ্রলেপস্বরূপ!—অসহায়া জানকী তমসাতীরে বাল্মীকির তপোবনে তাপসকন্যা ও তাপসবধূদের সাহচর্য্যে সে অমৃত লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সেই পবিত্র তপোবনে, যে ঋতুর যে ফুল ও ফল এবং পূজাকার্য্যোপযোগী নীবারধান্য সংগ্রহ ও ক্ষুদ্রবৃক্ষের আলবালে জলসেচন করিয়া জানকী ভাবী অপত্যস্নেহের আভাস পাইয়াছিলেন। আশ্রমে থাকিতে রাজধানী অযোধ্যায় রাজচক্রবর্ত্তী রামচন্দ্র স্বীয় অনুষ্ঠিত যজ্ঞে ও যে সীতার হিরন্ময়ী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সে কথা লোকপরম্পরায় শ্রুত হইলে সীতা বিরহদুঃখ যেন নূতন করিয়া অনুভব করিলেন। আশ্রমে যেদিন দেবর শত্রুঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সে রাত্রে জানকী যুগল সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। শত্রুঘ্নের নিকট জানকী কোন কথা বলিলেন কি না, জানিতে কৌতুহল হয়—কিন্তু কবি সে দৃশ্যের উপর যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন। লবকুশ বড় হইয়া মধুর রামনামগানে যে মাতার বিরহব্যথা দূর করিত, সে কথা উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই!

সীতার আর এক মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই। লবকুশের রামায়ণগান শুনিয়া অযোধ্যার রাজসভায় সকলে অতিমাত্র বিস্মিত—রাজা একান্ত বিমুগ্ধ, পূর্ব্বস্মৃতিবিহ্বল। বাল্মীকি—যাঁহাকে কালিদাস কবিদের "প্রথম আদর্শ বলিয়াছেন—সেই মহাকবির অতুলনীয় রামায়ণগান কুশলবের মধুরকণ্ঠে গীত হইলে "হিমনিষ্যন্দিনী প্রাতর্নির্বাতেব বনস্থলী" যেমন বনভূমি প্রভাতে বায়ুবিরহে নিস্পন্দ ও প্রতি বৃক্ষে তুষারধারায় বিগলিত হয়, সেইরূপ সেই রাজসভার সদস্যগণের লোচন হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। বাল্মীকি পরে তথায় উপস্থিত হইয়া সেই অদ্ভুত সুনিপুণ বালক গায়কদ্বয়ের পরিচয় দিয়া জানকীকে পুনর্গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সীতা সভাস্থলে আনীতা হইয়াছেন। তিনি কাষায়বস্ত্রধারিণী, স্বকীয় চরণে নিবদ্ধদৃষ্টি—তিনি যে পরমা সাধ্বী, তাঁহার শান্তমূর্ত্তিতেই প্রকাশ। বাল্মীকি, সীতা যাহাতে পুনরায় গৃহীতা হন, সে বিষয়ে একান্ত যত্নবান্ কিন্তু ভবিতব্যতার লিপি কে রোধ করে? পৌরজনে আবার পরীক্ষা চাহিল—সীতা আর সহিতে পারিলেন না—তিনি প্রার্থনা করিলেন যে—

> বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচারো যথা ন মে।
> তথা বিশ্বম্ভরে দেবি মামন্তর্দ্ধাতুমর্হসি॥

সতীবাক্য বিফল হয় না। তৎক্ষণাৎ পৃথিবীগর্ভ বিদীর্ণ হইয়া বিদ্যুন্মণ্ডলমধ্যগা, সমুদ্ররসনা ফণিফণাসিংহাসনশায়িনী মূর্ত্তিমতী বসুন্ধরা তনয়ার দুঃখে কাতর হইয়া সীতাকে কোলে করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

> সা সীতামঙ্কমারোপ্য ভর্তৃপ্রণিহিতেক্ষণাম্।
> মা মেতি ব্যাহরত্যেব তস্মিন্ পাতালমভ্যগাৎ॥

তখনও 'ভর্তৃপ্রণিহিতেক্ষণাম্'—এই একটি কথায় মহাকবি কালিদাস কি অপূর্ব্ব রস সঞ্চার করিয়াছেন!

এই সতীকুলেশ্বরীর মহান্ আলেখ্য হিন্দুস্থানের নারীসমাজকে উন্নত করিয়াছে—অলক্ষ্যে সে সমাজে অপূর্ব্ব সতীত্ববুদ্ধি সঞ্চারিত করিয়াছে। আমরা যেন সেই

মহান্ আদর্শ ছাড়িয়া বিদেশের ক্লিওপেট্রা-হেলেনের জন্য উদগ্রীব না হই। যেন আমাদের গৃহে গৃহে সীতার এই নমস্য মূর্ত্তি চিরবরণীয় থাকেন।

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

রাইবনীদুর্গ।

[ঐতিহাসিক উপন্যাস]

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রামনবমীর দোল হইতে মহাবিষুবসংক্রান্তির লক্ষ্মীপূজা পর্য্যন্ত নারায়ণীদেবীর গৃহে রোজ পূজাপার্ব্বণ। অন্যান্য বারের মত এ বৎসরও কুমার পদ্মাঙ্কনারায়ণ মাতামহী এবং মার কাছে পর্ব্বের কয়টাদিন কাটাইয়া মধ্যাহ্নের পর সেদিন দাঁতনের মেলায় দাদামহাশয়ের সহিত মিলিত হইবার জন্য অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে গঙ্গাদীন চৌবে। সে পদব্রজে যাইতেছিল।

দিদিমা বলিলেন, "পদ্মভাই, তোমার মামার আজ এখানে আসার কথা, মেলা দেখেই এখানে ফিরে এসো,—আজ আর উমাপুরে যেও না!"

কতক গঙ্গাদীনের শিক্ষামত, কতক বা নিজে হইতে মা কহিলেন, "পদ্ম অপথে ঘোড়া ছুটিয়ে যেও না বাবা! কোথায় কোন্ উপদেবতা থাকেন। কি জানি, কি অপরাধ হবে!"

কথাকয়টি বলিতে রাণী কৃষ্ণপ্রিয়ার চক্ষু ছলছল হইল! দেখিয়া পদ্মাঙ্কনারায়ণ উচ্চ-হাস্য করিল। বলিল—"গঙ্গাদীনভাইয়া, বুড় হ'চ্চে চল্লো, আজও তোমার ভূতপেত্নীর ভয় গেল না। পথে যেতে আমার কতবার যে জ্বালাবে, তার ঠিকানা নেই! তা আবার মাকে কাঁদান কেন? মা, তোমার বাপু কথায় কথায় চক্ষে জল! দিদিমার মেয়ে 'হ'য়ে কি করে' তুমি এত ভীতু হ'লে, তাই আমি ভাবি।" এই বলিয়া কুমার মাতামহীর দিকে অপাঙ্গহাস্যে চাহিলেন।

নারায়ণীদেবী হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা ঠাকুরদাদা, আর বুড়োমি কর্‌তে হবে না। মার যে তুমিই সর্ব্বস্ব—তাই তোমার জন্য সদাই ভাবনা। এখন সকাল-সকাল ফিরে আস্‌তে আজ্ঞা হয়। না এলে কানমলা খাবে!"

মাতামহীর কথা শেষ হইতে না হইতে কুমার ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। গঙ্গাদীন করজোড়ে নিবেদন করিল, "রাজঘাটের খেয়া-ঘাটে জল অল্প, সেইখানে নদী পার হইতে হইবে।" সে কথা, তিনি প্রথমে কানে তুলিলেন না। কিন্তু গঙ্গাদীনবুড়া সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছে দেখিয়া একটু মায়া হইল। কুমার অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—"আচ্ছা গঙ্গাদীন-ভাইয়া, তাই হবে, কিন্তু এমন কর্‌লে তোমার কথা শুন্‌বো না। আজ তুমি ঘোড়া আন নি

কেন? রাজঘাটে একটু শীগ্‌গির গিয়ে পণ্ডাজীর কাছ থেকে একটা ঘোড়া আমার নাম করে' নিয়ে ওপারে এসো। আমি ততক্ষণ ধীরে ধীরে এইটুকু চলে যাই!"

এখন, অশ্বপৃষ্ঠে একবার সমাসীন হইলে পদাঙ্কনারায়ণের সুপথ-কুপথ জ্ঞান থাকে না, কিছুতে তাহার গতিরোধ হয় না। আজ সাহস পাইয়া গঙ্গাদীন বলিল—"মহারাজ, আমি ঘোড়সওয়ার হইয়া আসিলে হুজুর আরো সোজারাস্তা খোঁজেন, শ্মশানভূমি পর্য্যন্ত বাদ দেন না। কিন্তু সেখানে সব ভূতের আস্তানা! আর ভূত কি কেবল মানুষ মরিলেই হয়?—জীব জানোয়ারও মরিয়া প্রেতযোনি লাভ করে।"—এই গল্প জমিয়া গেলে অদৃষ্টে আজ আর মেলাদর্শন নাই বুঝিয়া কুমার অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। —"এইজন্যে, গঙ্গাদীনভাইয়া, কোথাও তোমায় নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে না। ভূতের গল্প ছেলেবেলায় অনেক তোমার কাছে শুনেচি, কই আজ পর্য্যন্ত কোথাও ত একটা দেখ্‌লাম না। তা তুমি একটু চট্‌পট্‌ চলে যাও। কোথাও দেরি করো না যেন। বেশীক্ষণ তোমার জন্যে অপেক্ষা করব না বল্‌চি! ভূতপেত্নী দেখ্‌লেও নয়!"

গঙ্গাদীন চলিয়া গেলে পদাঙ্কনারায়ণ কতকটা অতর্কিতভাবে পথের ধারে ঘনচ্ছায়াচ্ছন্ন বট কি আম্রবৃক্ষ দেখিলেই তাহার নীচে একএকবার ঘোড়া দাঁড় করাইতেছিলেন। সঙ্গে শিকারোপযোগী অস্ত্রশস্ত্রের অসদ্ভাব ছিল না—এবং মাঝে মাঝে শাখান্তরালে বিশ্রামরত হরিয়াল-ঘুঘুর দল দেখিয়া সে প্রবৃত্তি জাগিয়া না উঠিতেছিল, এমত নহে। কিন্তু মাতামহীর কাছে তাহা হইলে মিথ্যাবাদী হইতে হয়। কুমার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন সময়ে দূরে যুগপৎ অসংখ্য অশ্বপদধ্বনি মুখরিত হইয়া উঠিল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কুমার পদাঙ্কনারায়ণ অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া উঠিলেও বুঝিতে পারিলেন, অশ্বারোহিগণ যাহারাই কেন হোক্‌ না, রাজঘাটের রাজপথ ত্যাগ করিয়া গোপনে অপথে নদী পার হওয়া তাহাদের মত্‌লব। তিনি আর দেরি না করিয়া সেইখানেই সুবর্ণরেখা উত্তীর্ণ হওয়া বিধেয় মনে করিলেন। ইচ্ছা, পরপারে অপেক্ষা করিয়া উহাদের অভিযান দর্শন করেন।

চৈত্র-বৈশাখ-মাসে সুবর্ণরেখা অন্যান্য পার্ব্বত্যনদীর মত শীর্ণা এবং স্বল্পতোয়া হইলেও সর্ব্বত্র উহার স্রোত বড় প্রখর। কুমারের সুশিক্ষিত ঘোড়াটি তাহাতে অভ্যস্ত—প্রায় নিত্য এই সাগরগামিনীর কোন-না-কোন দিক্‌ তাহাকে পার হইতে হয়। কিশোর অশ্বারোহী অবলীলাক্রমে দেখিতে দেখিতে বিস্তীর্ণ সৈকতভূমি উত্তীর্ণ হইল, ইহা প্রবীণ যোদ্ধ্‌বেশী সদ্যঃসমাগত সওয়ার একজনের বিস্ময় উৎপাদন করিল। তিনিও সেই ক্ষুণ্ণপথে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তেমন সহজে জমিতে পারিলেন না। ততক্ষণ তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী অশ্বারোহী সৈনিকশ্রেণী—সংখ্যায় প্রায় পাঁচশত—আসিয়া পৌঁছিল এবং পার হইবার আদেশের অপেক্ষায় দলে দলে বিভক্ত হইয়া সারি দিয়া দাঁড়াইল।

কুমার চিনিলেন, প্রবীণ অশ্বারোহী মহারাষ্ট্রসেনাপতি ভাস্করপণ্ডিত স্বয়ং! বামন-

বাটির বিশাল কাননপ্রান্তে শিকার করিতে গিয়া কয়মাস পূর্ব্বে তিনি তাঁহার নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। পদাঙ্কনারায়ণ সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। রাজপুত্রের সুলক্ষণাক্রান্ত মূর্ত্তি এবং ভক্তিবিনয়ে সুগঠিত মধুর চরিত্রে প্রথম দর্শনেই সেনাপতি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তেমন কোমলবয়সে কুমার অশ্ববিদ্যায় সুন্দর পারদর্শিতা লাভ করায় আজ বারংবার তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পণ্ডিতজী পদাঙ্কনারায়ণের অনুরূপ সুদর্শন কিশোরসন্তান বাটীতে রাখিয়া আসিয়াছেন—কুমারকে দেখিয়া গৃহের কথা বিশেষভাবে মনে পড়িয়া গেল। বাৎসল্যরস উছলিয়া উঠিল। তখন আর নেতৃত্বাধীন আদেশপ্রার্থী সৈনিকদল তাঁহার মনে স্থান পাইতেছিল না। কিন্তু রাজপুত্র কথোপকথনের অবসরেও পরপারের সেনাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন। একটু পরে সেনাপতিকে বালসুলভ কৌতূহল এবং সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহারা কি দোষ করিয়াছে যে, এমন প্রখর রৌদ্রে তিনি নদীর তীরে তাহাদের দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছেন ?

এই প্রশ্নের ভিতর যে মধুর শ্লেষটুকু বক্তার অজ্ঞাতে নিহিত ছিল, তাহা অনুভব করিয়া ভাস্করপণ্ডিত উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। তখন ক্ষুদ্র শিঙা বাদন করিয়া সৈন্যদিগকে নদী পার হইতে আদেশ দিলেন।

কুমার পুনশ্চ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকময় সরলতার সহিত সেনাপতিকে বলিলেন, "আপনি গাছের ছায়ায় একটু বিশ্রাম করুন, আমি অগ্রসর হইয়া সৈন্যদের পথ দেখাইয়া আনি।" পণ্ডিতজী আবার হাসিয়া উঠিলেন—কিন্তু পদাঙ্কনারায়ণ ছাড়িবার পাত্র নহেন। কিশোর কার্ত্তিকেয়ের মত অবলীলাভঙ্গে সেই উত্তপ্ত বালুকার উপর ঘোড়া ছুটাইয়া তিনি পূর্ব্বপথে দেখিতে দেখিতে জলের ধারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নেতৃত্বে অপেক্ষাকৃত সহজে সওয়ারের দল নদী পার হইয়া সেনাপতির সম্মুখীন হইল। যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতা এবং দার্ঢ্যের সহিত কুমার এই কার্যটি সম্পন্ন করিলেন, তাহাতে সৈন্যেরা প্রশংসমান-দৃষ্টিতে সেই বালক সেনানায়কের প্রত্যেক গতি লক্ষ্য করিতেছিল। ভাস্করপণ্ডিত বারংবার সাধুবাদ করিয়া সকলের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়াই যেন বলিলেন—"বৎস, বিধাতা তোমায় আজন্ম মানবনায়ক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি দীর্ঘজীবন লাভ কর, তোমা হইতেই এ প্রদেশে হিন্দুপ্রাধান্য আবার জয়যুক্ত হইবে—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই আকাঙ্ক্ষা এবং আশীর্ব্বাদ। আমরা যে আজ এখানে আসিয়াছি, ভগবৎপ্রেরিত হইয়া সেই সিদ্ধির পথ খনন করিবার জন্য কি না, কে বলিতে পারে ?"

পদাঙ্কনারায়ণ আত্মপ্রশংসা শুনিয়া লজ্জায় মুখ নত করিলেন। ইহাতে তাঁহার কমনীয় আননশ্রী আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেখিয়া সেনাপতি হর্ষোৎফুল্ল হইলেন এবং যাত্রার জন্য প্রস্তুত সৈন্যদের আদেশ দিলেন—"বল, কুমারসাহেবকি জয়!" পাঁচশত বীরকণ্ঠে ঘনঘন সে জয়বাদ উচ্চারিত হইয়া নদী-হৃদয় কম্পিত করিয়া তুলিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই মুহূর্ত্তে গঙ্গাদীন আসিয়া পৌঁছিল এবং

প্রভুর আদেশের জন্য করজোড়ে তাঁহার অদূরে দাঁড়াইল। কুমার সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন, তাঁহারা জঙ্গলমহলের দিকে যাইবেন মেদিনীপুরের পথে নহে। কুমারের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া স্বয়ং তিনি মেলাস্থলে যাইতে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু স্থির হইল, জলেশ্বর পার হইলে সওয়ারেরা গঙ্গাদীনের প্রদর্শিত বনপথে উমাপুরের দিকে অগ্রসর হইবে। এইসংক্রান্ত আদেশ পদ্মাক্ষনারায়ণ বৃদ্ধ গঙ্গাদীন চোবেকে এরূপ দৃপ্ত, পরিষ্কার অথচ স্বল্প কথায় বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ ভাস্করপণ্ডিত আবার নূতন করিয়া বিস্মিত হইলেন। এই রাজপুত্রের শিক্ষাদীক্ষার পরিচালক শিবাপ্রসন্ন দাস, তাহা প্রথম আলাপে তিনি জানিয়াছিলেন। কুমারের সহিত আজ পরিচয় ঘনীভূত হইলে তাঁহার ধারণা হইল যে, দাসমহাশয় নিশ্চয়ই অলৌকিক ব্যক্তি। প্রতি কথায় কুমার তাঁহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া সেনাপতির বিস্ময় বর্দ্ধিত করিতেছিলেন।

মেলাক্ষেত্রে সেদিন উভয়ের সম্মিলনদৃশ্য ইতিপূর্ব্বে আমরা চিত্রিত করিয়াছি। এক্ষণে গোড়ার কথা সকলই বলিলাম। কেবল মহেশ্বর এবং ভবানীমূর্ত্তি সমক্ষে দুইজনে যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় বাকী রহিল। কথাটা গুরুতর,—এই আখ্যায়িকার মেরুদণ্ডস্বরূপ। সময়ে তাহা পরিস্ফুট হইবে।

এদিকে কুমার বাটীর বাহির হইলেই রাণী কৃষ্ণপ্রিয়ার রুদ্ধ অশ্রুপ্রবাহ আর বাধা মানিল না। ছেলেকে কোথাও বিদায় দিবার সময় প্রতিবারই তিনি বড় অধীর হইতেন। অসংযত মাতৃস্নেহে প্রতিবারই তাঁহার মনে হইত, সেই শেষ দেখা,—তাঁর সর্ব্বস্বধনকে আর ফিরিয়া পাইবেন না! এজন্য মাতার কাছে অনেকসময় রাণী মৃদু ভৎর্সিত হইতেন। নারায়ণী দেবী আজ আবার অনুযোগ করিয়া বলিলেন—"ছি মা, চোখের জল ফেলিয়া ছেলের অকল্যাণ করিও না। তোমার সবে ঐ একমাত্র সন্তান উহার উপর-ভরসা কি মা? আমার জীবনে কত শোকদুঃখ গিয়াছে—শেষে তুমি মাত্র পুঁজি! আগে ভাবিতাম, তোমায় ছেড়ে একদণ্ড থাকিতে পারিব না। সেইজন্য চিরদিন তোমায় কাছে কাছে রাখিব ভাবিয়াছিলাম। বিধাতার ইচ্ছায় অন্যরূপ হইল। এখন ভাবিয়া দেখি, ভাগ্যে গোবিন্দজীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম! সকলের সার বস্তু তিনিই—আমি কি আর তোদের কাহারও উপর মায়া করি! যতদিন তোমাই জীবন-সর্ব্বস্ব ছিলি, একটুতে অধীর হইয়া উঠিতাম—শান্তি পাইতাম না। এখন সে জ্বালা নাই। তোকে আর পদ্মকে তাঁর চরণারবিন্দে সমর্পণ করে' আমি নিশ্চিন্ত আছি। কারু ভরসা আর করি নে!" বলিতে বলিতে আবেগভরে বৃদ্ধা চক্ষু মুছিলেন। কন্যার মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া নারায়ণী দেবী আবার বলিলেন—"মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখি, পদ্ম উৎকলের একচ্ছত্র রাজা হয়েচে—আমার আহ্লাদ দেখে কে যেন মনের ভিতর হ'তে বলে' উঠে, এখনও এত আশাভরসা! তোর ঐ ক্ষুদে পুঁজিটুকুর ভরসা কি? ঠিক্ কথা, কোন ভরসা নেই। মা, তুমি একান্তমনে গোবিন্দজীর পূজা কর। তাঁর উপর ভক্তি বাড়িলে সংসারমায়াবন্ধন শিথিল হবে।"

রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া বিবর্ণ-বিহ্বল হইয়া রোদন করিতেছিলেন, মাতার কথায় আরো অভিভূত হইলেন। মা বলিলেন, "কৃষ্ণপ্রিয়া, সন্তানের প্রতি মায়া কার নেই? কিন্তু অত ভাল নয়। তুমি গোবিন্দে ঐ স্নেহমায়া অর্পণ করে' ছেলেকে কেবল নিমিত্তমাত্র মনে কর্‌তে শেখ মা। আমার গুরুদেব বলিতেন, যার প্রাণে যে ভাব প্রবল, সেই ভাবে সে ভগবানের পূজা করুক! তাতেই তার বৈকুণ্ঠলাভ হবে। ব্রজের রাখাল শ্রীদাম-সুদামাদি সখাভাবে তাঁর পূজা করিতেন, মাতৃরূপিণী যশোদা বাৎসল্যভাবে, গোপিকারা পতিভাবে। সত্য কথা! নহিলে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মেটে না। উঠ মা, মনকে দৃঢ় কর।"

ক্রমশ।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

মনীষা।

প্রথম সর্গ।

আমি ছিনু রাজপুত্র কৃষ্ণচক্ষু প্রসন্নবদন,
মধুর হৃদয়খানি, ধরা'পরে বসন্ত যেমন
প্রথম প্রকাশে। ঘন কৃষ্ণকেশ দীর্ঘ তরঙ্গিত,
মোর জন্মলগ্ন'পরে বৃহস্পতি ছিলেন সুপ্রীত।

আমাদের বংশগত কিংবদন্তী আছিল প্রাচীন
(শুনিয়াছি মার মুখে) লুপ্ত অতীতের কোনদিন—
পিতৃপিতামহ নাকি ছায়াহীন এক যাদুকরে
প্রেত মানি বধিলেন জীবন্তে দাহিয়া। মৃত্যুভরে
হানিলা সে শাপ—এ বংশের কেহ নারিবে বুঝিতে
অশরীরী শরীরীর বিন্দুভেদ;—হইবে যুঝিতে
মরণান্ত কঠিন সংগ্রাম প্রেত সাথে একজনে।
বস্তুত ঘটিল তাই,—এই বংশে জাগ্রত স্বপনে
সবারে পাইল কিছু কিছু। জাগিয়া জাগিয়া আমি
অদ্ভুত খেয়াল কত দেখিতাম সারা দিনযামি',
কি যে তা জানেন বিধি। ফুল্ল দিবাভাগে একদিন
জনপূর্ণ গৃহদ্বারে আমারে পাইল বস্তুহীন

কি-এক স্বপনে। মনে হ'ল লক্ষলক্ষ ছায়ামূর্ত্তি
কবন্ধমূরতি মোরে হীহী করি দেখাইছে ভয়;—
মনে হ'ল আমিও তাদেরি একজন,—কোথা আছি—
কেন আছি ঘোলাইয়া গেল সব। ল'য়ে পুঁথিপাঁজি
আসিলেন রাজবৈদ্য রাজপুরে নব ধন্বন্তরি।
আপাদমস্তক মোর পরীক্ষিয়া বহুক্ষণ ধরি'
কহিলেন —"প্রেতগ্রস্ত"। কাঁদিয়া আকুল মা আমার
পূজা আর হত্যা দিয়া ধরিলেন মন্দিরের দ্বার
যেথা যত ছিল। আমার মাতারে সর্ব্বজন
দেবতা মানিত তাঁর গুণাবলি করিয়া দর্শন।
পিতা কিন্তু ভাবিতেন—"রাজা রবে অটল উন্নত
কাটাইয়া ধরণীর আত্মীয়তাডোর"—এমনি সতত
কঠোর বিচারাসনে বসিতেন রাজদণ্ড ল'য়ে;—
আসমুদ্র প্রজা সদা কম্পমান ছিল তাঁর ভয়ে।

এখন দৈবের ক্রমে ছিনু যবে কুসুমকিশোর
রাজকন্যাসাথে এক বিবাহপ্রসঙ্গ হ'লে মোর
হইলা সে বাগ্‌দত্তা অষ্টম-বয়সী। শুনিতাম
ভাটমুখে দিব্যকান্তি তার রূপগাথা—মনস্কাম
পূরিত না তাহে; কবে সে ফুল্লেন্দীবরনয়নার
মুখশশী বক্ষে ধরি' উথলিবে প্রেমপারাবার—
তাই শুধু ভাবিতাম বসি। তার প্রতিকৃতিখানি
ক্ষুদ্র ফলকেতে আঁকা—রেখেছিনু বহুমূল্য মানি'
ঝুলায়ে হীরকহারে—যেন সে জীবন্ত প্রেমমুখ
অনিসম ঘেরি' তারে ঘুরত আমার লক্ষ সুখ।

বিবাহের দিন যবে ঘনাইয়া এল অবশেষে,
সোপহার ধনরত্নে পিতা মোর প্রেরিলা সে দেশে
তাহারে আনিতে শত দূত। তারা ফিরিল সত্বর
বিনিময়-উপহারে বহু-সূচিশ্রম-মনোহর
আনি' এক পট্টবাস। ভাঙা-ভাঙা উত্তর-কথায়
তা'র সাথে,—গেল তারা রাজার দর্শনে, উপহার

গ্রহি' তিনি বলিলেন—"সত্য বটে হয়েছিল কথা
কন্যা করিবেন দান, কিন্তু এক নূতন বারতা
কন্যার অনিচ্ছা তাহে, ইথে তাঁ'র কিবা অপরাধ ?
বালিকা সে—তার মনে অদ্ভুত কতই উঠে সাধ,—
সে নাকি থাকিবে একা—মিলি শুধু সহচরী সনে ;
এই তার লাগে ভাল—বধূ নাহি হবে এ জীবনে।"

দরবারগৃহে আমি ছিনু উপস্থিত সে প্রভাতে,
নিকুঞ্জ মন্মথ আর দুই বন্ধু ছিল মোর সাথে ;
নিকুঞ্জ দরিদ্রীভূত পিতৃকৃত অপব্যয়দোষে—
তবুও আমোদপ্রিয়, অন্তরে বিষাদ নাহি পোষে।
মন্মথ হৃদয়বন্ধু অর্দ্ধ চিত্ত কৈল অধিকার
হরি-হর-আত্মা ছিল একাধারে তাহার আমার।

দূতেরা কহিলা বার্ত্তা—হেরিলাম পিতার বদন
হইল রোষরক্তিম, পূর্ণশশী উদয়ে যেমন
দীপ্ত বিবর্দ্ধিত। সিংহাসন ত্যজি' তিনি ক্রোধভরে—
বেগে উঠি রাজপত্র কুটিকুটি ছিঁড়ি ভূমি'পরে
ফেলিলেন নিষ্ঠীবন-সম। সে শিল্প-বিস্ময়-খণ্ড
ক্ষিপ্রহস্তে ফাঁই-ফাঁই চীরি' করিলেন লণ্ডভণ্ড।
কহিলা প্রোচ্চণ্ড গর্জ্জি'—লক্ষসৈন্য প্রেরিয়া অচিরে
যুদ্ধঘূর্ণা উঠাইয়া আনিবেন রাজনন্দিনীরে।
এই অপমানকথা রাখিলেন জ্বলন্ত অন্তরে
জাগাইয়া চিন্তি' চিন্তি' বারবার, মন্ত্রণার ঘরে
সেনাপতি ডাকি' পরামর্শে।

আমি কহিলাম কথা—
"পিতা মোরে আজ্ঞা দিন যাই আমি আনিতে বারতা
কীর্ত্তিমন্ত সে নৃপতি এরূপ যে দিবেন উত্তর
বিশ্বাস না হয় মোর—মানি আমি ইহার ভিতর
প্রমাদ অবশ্যই আছে। পাত্রীরেও হেরি একবার
চক্ষুকর্ণে মিটাই বিবাদ, ক্ষোভ হইবে অপার
ভাটমুখে শ্রুত তার কাহিনী অত্যুক্তি যদি হয়।"
মন্মথ কহিল—"মোর কনিষ্ঠা ভগিনী সেথা রয়

রাজকন্যাসখী হ'য়ে। জানা আছে সে কথা তোমার—
তথা এক ধনী সাথে হয়েছিল সম্বন্ধ তাহার,
পরিণয়ে কিন্তু ঘোর দেখাইল আপত্তি ললনা
এ রহস্যভেদ বুঝি করিতে পারিবে সেইজনা।"

নিকুঞ্জ কহিল মৃদু—"ল'য়ে চল মোরেও সেথায়
(হাসিয়া). কি জানি যদি খেয়ালে তোমারে সেথা পায়।
ভূতে আর সত্যে ভেদ কে তোমারে চিনাইবে কহ,
আমি ত' পারিব ভাল,—তাই বলি মোরে সাথে লহ।
আলস্য-মরিচা-ধরা জরজর হয়েছে জীবন
ঘুরি-ফিরি আসি একবার।" তুলি' জলদগর্জ্জন
আজ্ঞা দিলা নরপতি—"হইবে না যাইতে তোমারে
কুমারী-কল্পনা তার চূর্ণ গুঁড়াইব শিলাভারে
এই রাজহস্তে করি ;—সভাভঙ্গ হউক এক্ষণে।"

সভাভঙ্গে বাহিরিয়া চলিলাম নগরান্ত বনে
ভ্রমিতে ভ্রমিতে। নির্জ্জন দেখিয়া সেথা একস্থানে
চিত্র তার বহিষ্করি' পুষ্পগুচ্ছে রাখি সাবধানে
হেরিলাম বসন্ত মঞ্জরীভরা তরুহরিচ্ছায়া
সযতনে অভিষেক করিল তাহার সর্ব্বকায়া।
ভাবিতেছি কি কল্পনা গুপ্ত তার ভেদিব কিহেতু ?
মূর্ত্তি এ যে তীব্রাধরা। হেনকালে তুলি জয়কেতু
দক্ষিণপবন এল মহাহর্ষে দিয়ে তীব্র ঝাঁকা
একত্রে কাঁপায়ে দিল সনিঃস্বনে সর্ব্বতরুশাখা
কূজনে গুঞ্জনে মিশাইয়া, গাগাইয়া দৈবভাষা
"চল চল রাজপুত্র জিনিবে, পূরিবে তব আশা।"

সে পক্ষে দ্বিতীয়াশশী পূর্ণিয়া না উঠিতে উঠিতে
নিকুঞ্জ-মন্মথ-সাথে বাহিরিনু আমি অলক্ষিতে
প্রাসাদ ত্যজিয়া। আমরা মার্জ্জারগতি চলিলাম
রাজপথ বাহি'—কেহ দেখে পাছে। যেন শুনিলাম
ধ্বনি নীরব নিশীথ ভেদি' আসে—না না কিছু নহে।
নগরান্তে উত্তরিয়া মহান্ উদ্বেগে আর ভয়ে

লঙ্ঘিয়া প্রাচীর নামিলাম রশ্মিযোগে—সূত্রভরে
ঊর্ণনাভ যথা। রাজ্য-উপকণ্ঠ অতিক্রমি' পরে
স্রুততর প্রবাহ বাহিয়া উত্তরিনু রম্য ধরা
প্রান্তর শস্তাল মাঠ ফুল্ল ঝোপ বনপুষ্পে ভরা
কতই না এড়াইয়া লভিলাম মোরা তিনজন
দুর্গস্ফীত রাজধানী, নৃপগৃহে নৃপদরশন।

অগ্নিমিত্র তাঁর নাম। বয়োভগ্ন কণ্ঠের আওয়াজ
মিষ্ট আর মৃদু! মধুহাস্য মুখে করিত বিরাজ
আকুঞ্চন-রেখা আঁকি' আঁকি' ফুল্লরক্ত কৌতূহলে,
পবনকম্পন যথা পড়িয়া স্ফটিকস্বচ্ছ জলে
কম্পিত করিয়া তারে দেয়। দেহ তাঁর খর্ব্ব-ক্ষীণ
মুখে নাহি রাজচিহ্নলেশ—মহাযত্নে তিনদিন
দিলেন মোদের বহু ভোজ— গত হ'লে দিনচারি,
আগমনহেতু কহি' উল্লেখিনু সম্মুখে তাঁহারি
মোর প্রণয়িনীকথা। হাত নাড়ি' অঙ্গুরীয়প্রভা
ঝলকিয়া কহিল নৃপতি, "আজ মোর রাজসভা
ধন্য কৈলে নিজ আগমনে হে কুমার! পড়ে মনে
প্রেমের সে মধুরতা আমাদেরো প্রথম যৌবনে।
বহুপূর্ব্বে বাক্য দিছি কন্যারে অর্পিব হাতে তব—
তুমি তা'র পতি হ'লে তৃপ্তি মোর হ'ত অপূরব।
হেথায় ছিলেন কিন্তু কুমারী যুবতী দুইজন
চন্দ্রা আর সুলোচনা—কাছে কাছে ফিরি সারাক্ষণ
উদ্ভট ধারণা যত চিত্তে দিল জাগায়ে কন্যার;—
তারা নাকি বলিয়াছে "রমণীর কোনো অধিকার
নহে অন্য পুরুষ হইতে—শিক্ষা হ'লে যথারীতি
নারীনর উভয় সমান।" ভাবিত ইহাই নিতি—
গোপনে মন্ত্রণা করি উদ্বাহ না করিল দু'জনে
"নারী না হইবে ভৃত্য" এই উচ্চ সাধ ধরি' মনে।
পণ্ড হ'ল প্রীতিভোজ,—নৃত্যপরা নটীর চরণ
তর্কজালে বাঁধিল সহসা। শুনি যখন-তখন

এক (ই) কথা ঝালাপালা হ'ল কান। কহিল সুহিতা—
জ্ঞান জগতের আলো—সে আলোকে হইয়া বঞ্চিতা
শিশুসম যাপিছে জীবন—শিশুতায় পরিহরি
মহীয়সী নারী হ'বে মহত্বে ধরণী আলো করি।
শুন বৎস, তার পরে রচিল কবিতা কত শত—
বিষয় স্মরিলে যার ভয় পাই মনে অবিরত।
"নিশ্চয় করিতে হবে শিশুত্ববর্জ্জন"—শ্লোক তারা
এই মর্ম্মে রচে নানা—প্রস্তাবি' তাহাতে সৃষ্টিছাড়া
অদলবদল। এই সব কবিতায় দিয়া সুর
গাহিত তাহারা। মোর চিত্ত তাহে সুধা-ভরপূর
হইয়া উঠিত। শেষে সে করিয়া বহু আবদার
গ্রীষ্মাবাসখানি নিল যাচি' যাচি' নিকটে আমার,
বারবার বাধাসত্বে। তব পিতৃরাজ্যসীমান্তের
সন্নিকটে আছে সে প্রাসাদ। সেইখানে নারীদের
শিক্ষাতরে স্থাপিবে অভূততর বিশ্ববিদ্যালয়।
তারি লাগি উন্মত্তসমান চলে' গেছে। মহাশয়!
আর কিছু নাহি বার্ত্তা—এইটুকু শুনিয়াছি কথা
নরমুখ তারা দেখে না কখন—লয় না বারতা
সহোদর অরুণের—যে তাহারে প্রাণসম ভালবাসে।
তাই আর নাহি ইচ্ছি কলহ পাঠায়ে তার বাসে
শান্তিভঙ্গ করি আপনার। বাঁধা আছি আমি পণে—
ভাব কিন্তু যদি যুবরাজ, লিপি দিব তব সনে।
কিন্তু সত্য বলিতে কি—জড়ায়েছ নিজ আশালতা
অসত্য-অবস্তু'-পরে।"

অগ্নিমিত্র কহিলেন কথা।

মোলায়েম ভদ্রতায় সভ্যভঙ্গপ্রয়াসে তাহার
বিরক্ত হইনু মনে। শত বাধা প্রাণে অনিবার
ফুটায়ে তুলিল প্রেমমুখ। পুন দুই বন্ধু সাথে
বাহিরিনু প্রিয়ার উদ্দেশে। উত্তরের হাঁহাঁ-বাতে
ফিরিয়া আসিনু বহুক্রোশ। গিরি হ'তে হেরিলাম
মম আশাপুরী। সন্ধ্যার অঞ্চল ধরি নামিলাম

গ্রাম্যশোভাবহুল-নগরীকোলে। চুমি' প্রান্ত তার
আঁকাবাঁকা নদীখানি ছুটিয়া চলেছে খরধার।
লইলাম বাসা সেই বিদ্যালয়-প্রাচীর-নিকটে,—
আশ্রয়দাতারে ডাকি মন্ত্রণায় সব অকপটে
কহি' তারে দিনু সুরাপাত্র ভরি প্রীতি-উপহার
নূতন সখ্যের,—রাজপত্রখানি দেখাইনু আর।

"একি কথা ?" এত বলি শিহরিয়া উঠি বন্ধুবর
স্তম্ভিত রহিল কিছুকাল। কহিল ক্ষণেক পরি
(সুরাস্রোত উঠিলে মস্তকে)—"রাজা দিয়াছেন পত্র
কি কাজ লইয়া অনুমতি ? রৌদ্র খর হয়, ছত্র
দিয়ে তিনি রক্ষিবেন মাথা।" (তীব্র মাদকতা তার
সর্ব্বগাত্রে ব্যাপ্ত হ'লে) কহে—"দাও যদি যোগ্য পুরস্কার,
তবে ত এ কাজে লাগে মন। হেরিয়াছি তারে একবার
মোদের ওদিকে। কর্ণ জুড়াইয়া গেছে শুনি তার
সুধাবাণী। কিন্তু ভীত হইয়াছি হেরিয়া ভ্রুকুটি
কুটিল নয়নছুটি ভরা। হেন আর নাই ছুটি
এ ধরণীতলে। কি গম্ভীর মুখচ্ছবি! সে কামিনী
পূজনীয়া প্রভু মম বহুতর কল্যাণদায়িনী।
হের বন্ধু এ প্রদেশে পুরুষের নামগন্ধ নাই,
প্রাচীরে বেষ্টিত আছে রমণীর রাজ্য হেথা তাই।
হের হেথা পথে পথে ঠিকাগাড়ি টানিছে ঘোটকী
নারীরা বেহারা হ'য়ে শাজাদির বহিছে পালকী।
নির্ব্বাসিত বৃষকুল—গাভীগণে চসিতেছে মাঠ,
যতেক কপোত ছিল উড়ে গেছে ত্যজি প্রেমনাট।"

এমনি করিল ব্যঙ্গ। সহসা পড়িল মোর মনে
অপ্সরা ও বনদেবী সেজেছিনু মোরা তিনজনে
ভবন-উৎসব-অভিনয়ে। পাঠাইনু বন্ধুবরে
নারীবেশ কিনিবারে। সাজসজ্জা আসিল সত্বরে ;
কত না কৌতুকে ব্যঙ্গে সাজায়ে মোদের নারীবেশে
কহে,—"তিন বৃহন্নলা যাবে কোন্ বিরাটের দেশে

খেলিবারে কি নূতন খেলা।" দিনু তারে বহু ধন,
গুপ্ত যাহে রাখে কথা। অশ্বপৃষ্ঠে করি আরোহণ
সকৌতুকে চলিলাম রাজ্যে সেই নব প্রমীলার।

নদীতীর অবলম্বি বহি' বহি' পথ অনিবার
গভীর নিশীথে হেরি বহুদূরে জ্বলে দীপমালা
সেই বিদ্যাসৌধভালে—যেন অজস্র-খদ্যোতজ্বালা-
তরুরাজি-ঘেরা গ্রামখানি। এড়াইনু সিংহদ্বার,
পক্ষিরাজ-অশ্ব-'পরে-নারীমূর্ত্তি ভালে শোভে তার
চতুর্ভুজা—উচ্চ শির তুলি ব্যোমপানে—জ্বলে যথা
লক্ষ তারা। প্রস্তরফলকে নিম্নে লেখা আছে কথা,
অন্ধকারে লক্ষ্য নাহি হ'ল। অগ্রসরি উপজিনু
উদ্যানগৃহের কঙ্করখচিত পথে। বাজিছে শুনিনু
ঘড়িঘণ্টা ঠংঠং—যেন রৌপ্যহাতুড়ির ঘায়
পিটিছে কে স্বর্ণখণ্ড। শুভ্রবারি উঠি ফোয়ারায়
উচ্ছ্বসিয়া ঊর্দ্ধপানে নিম্নভূমে পড়ে ছিটাইয়া
যূথি ও গোলাপ ঝাড়ে। গীতিসুধা ছড়ায়ে পাপিয়া
উড়িয়া ফিরিছে শূন্যে ফাঁদ পাতা জানে না সে হায়!
আপনি বিভোর আছে আপনার সঙ্গীতধারায়।

দ্বিতীয়-দুয়ার-শিরে হেরি যুগ্ম স্ফটিকগোলক,
ধরা আর নভ আঁকা, জ্বলে তাহে তীব্রালোক,
সরস্বতীমূর্ত্তি তদুপরে। প্রবেশি দিলাম সাড়া—
মোটাসোটা দাসীসাথে সহিসী আসিল করি তাড়া
নামাইল আমাদের। নম্র নারী অতিথিবৎসলা
পালভরা-নৌকাসম পূর্ণদেহে গতি অচঞ্চলা
পিছে আসি সঙ্গে ল'য়ে গেল পুষ্পাকীর্ণ কক্ষতলে।
এ কথা সে কথা সাথে জিজ্ঞাসিনু তারে কৌতূহলে—
"শিক্ষয়িত্রী আছেন কাহারা?" "চন্দ্রা আর সুলোচনা"
উত্তরিলা নারী। "অমায়িকা কোন্ রামা অতুলনা
রূপে?" "চন্দ্রা।" একত্রে কহিনু—"মোরা শিষ্য তবে তাঁর।
লিখিলাম লিপি এক নারীহস্ত করি অনুকার
আঁকাবাঁকা ছাঁদে—

"উত্তর হইতে তব কীর্ত্তি স্মরি'
আসিয়াছি মোরা তিন নারী। মহারাণী শিষ্য করি'
লউন মোদের দেবী চন্দ্রার অধীনে।"
সযতনে
মুড়িলাম লিপি। পশ্চাতে আঁকিনু চিত্র,—ফুলবনে
কাঁদে রতি একাকিনী কীর্ণকেশে। ত্বরিতে প্রেরিনু
যত্নে-রচা লিপি। পশিনু শয়নে। স্বপনে হেরিনু
তটলগ্ন পুষ্পবনে ধেয়ে চলে যেন জলনিধি
মেঘে-ঢাকা চন্দ্র হেরি উথলে উথলে তার হৃদি।

গান।

ফলেছিল যবে দেশ ভরি সোনা
মাঠে গিয়েছিনু দুজনে
প্রিয়ারে হেরিয়া ধানভরা ক্ষেতে
চুমিনু তাহার বদনে।
জীবনে ছিলাম একা যে
জানি না কেমনে দেখা যে
ভালবাসা-ভরা দেখা পেয়ে তার
কত সুখ হৃদে বহে গো
নয়নে আসার ঝরে বারবার
নহে দুঃখে তাহা নহে গো।
কোথায় গেল সে খোকা আমাদের
হারায়েছি তারে কবে গো
ওই বুঝি হোথা শ্মশানধূলায়
সে মধুমূরতি হবে গো।
হারাণো শিশুর সুধাভরা মুখ
পড়ে মনে পড়ে সঘনে
নয়ন-আসার বরষি' বরষি'
চুমিনু প্রিয়ার বদনে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

রাজতপস্বিনী।

[জীবনীপ্রসঙ্গ]

১৭

মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর চরিত্রে যে সকল দেবোপম গুন সহজাত সংস্কারের মত মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল, সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন এবং অসাধারণ সহিষ্ণুতা তাহাদের অন্যতম। বৈষয়িক ব্যাপারে অনেক সময়ে ইদানীং তিনি নিজে কিছু করিতেন না।—তাঁহার নামে কুমারমহাশয় "এবং কোম্পানির" আদেশই চলিয়া যাইত। ইহাতে অনভিজ্ঞ লোকেরা না বুঝিয়া তাঁহার বৈষয়িক বুদ্ধির দোষ দিতেন। কিন্তু এই সময়ে আপনার সকল স্বার্থ বলি দিয়া, রাজকার্য্যে নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে যে দুর্লভ মানসিক শক্তির পরিচয় নিত্য তাঁহাকে দিতে হইত, যথার্থই তাহা বিস্ময়কর। তাহাই প্রকৃত বীরত্ব—এবং স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে অনুদিন চারিত্রপূজার নিদানীভূত।

একদিন রাজান্তঃপুরে গিয়া দেখি, মাতা কতকগুলি কাগজে দস্তখৎ করিতেছেন, তাঁহার বাল্যকালের শিক্ষক বৃদ্ধ ঈশান সেন মহাশয় তাহাতে মোহরের ছাপ দিতেছেন। কি কথায় মহারাণী বলিলেন, "কেহ আমার মোহর লইয়া কোন অনিষ্ট করিবে, এ সন্দেহ কেন বা আমার মনে স্থান পায় না। আমার মোহর ঈশান সেন আমার সাক্ষাতে-অসাক্ষাতে এ-বাড়ীতে এবং ও-বাড়ীতে করিয়া থাকে। সে-বার কে একজন জালিয়াৎ এই মোহর জাল করিয়া * * ও * * এর নাম করিয়াছিল।"

ফলত সকলের প্রতি বিশ্বাস তাঁহার জীবনের অন্নপান ছিল। দুঃখের বিষয়, কাহারও কাহারও ব্যবহারে সেই বিশ্বাস শেষের দিকে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। মাতা সাংসারিক-বৈষয়িক সকল কথাই আমায় বলিতেন। কুমারের দলের প্রধান কোন ব্যক্তির কথায় একদিন আমি বলিলাম যে, "তাঁর কথাবার্ত্তা শুনিয়া বোধ হয় যে, উদ্দেশ্য ভাল, তবে বুঝিতে না পারিয়া যা করুন।" মা বলিলেন যে, "পূর্ব্বে আমি বড় বিশ্বাস করিতাম, কিন্তু * * হইতে বিশ্বাস একেবারে গিয়াছে। রাজসংসারের হিতকারী হইতে পারে, কিন্তু আমার অহিতকারী। খালিসার সেলামী তহবিল যে আমার হাত হইতে লওয়া হইল, উহার পরামর্শ ব্যতীত তাহা হইতে পারিত না। * * * আমায় ক্ষমতাশূন্য করা তাহার ইচ্ছা, তাহা সফল হইয়াছে।" তাঁহার অনুগত চির-উপকৃতেরা পর্য্যন্ত মহারাণীকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতেছে বুঝিয়া আমি বড় দুঃখিত হইলাম। বলিলাম,

"শেক্‌স্‌পীয়রের ওথেলো-নাটকে নায়িকা ডেস্‌ডিমোনা সখীকে কহিয়াছিলেন, সংসারে কি অবিশ্বাসের ভাব থাকিতে পারে ? মার সাক্ষাতে বোধ হয় বলা উচিত হয় না, কিন্তু অনেক সময়ে তাঁহার ব্যবহারে ডেস্‌ডিমোনার সেই কথা আমার মনে পড়ে। অতএব তাঁর মনে যখন সন্দেহ হইয়াছে, তখন ব্যাপার সহজ নহে।" মা বিষাদের হাসি হাসিলেন এবং ডেসডিমোনার বাক্যের প্রশংসা করিলেন। বলিলেন, "পাপের ভাব মনে আসে না, এমন কেহ নাই, তবে তাহা দমন করাই মহত্ত্ব।"

কুমারবাহাদুরের শ্বশুরমহাশয় প্রথম-প্রথম জামাতার কাছে প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তদীয় দলবলের প্রভাবে তাহা ভাসিয়া গিয়াছিল। কুমার আর তাঁর কোন কথা শোনেন না দেখিয়া শেষে তিনি আমায় ধরিয়া বসিলেন যে, মহারাণীকে তাঁহার পক্ষ হইতে সকল বৃত্তান্ত বলিতে হইবে। কথাবার্ত্তা আমার যোগে হইলে মন্ত্রভেদের সম্ভাবনা থাকিবে না, অথচ আমি সকল কথা বুঝাইয়া মহারাণী-মাতাকে বলিতে পারিব, ইহাই অবশ্য তাঁর মনের ভাব। আমি কিন্তু একটি সর্ত্তে এই ব্যাপারে লিপ্ত হইতে অঙ্গীকার করিলাম—অনুরোধ ন্যায়-সঙ্গত এবং মহারাণীমাতার হিতজনক হওয়া চাই। আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর তিনি আমার দ্বারা মাতার নিকট এক পত্র পাঠাইলেন। পড়িয়া তিনি বলিলেন, "তুমি যা বলিয়াছিলে সত্য, সার কথা আছে বটে। বিশেষ কয়টিতে আমার নিজের মঙ্গলের কথা আছে। কিন্তু আমি কি করিব ? আর উহাতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা নাই। এখন উঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু প্রথমে অন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তখন এরূপ করিলে আর এমন হইত না।" অন্যান্য কথার পর বলিলেন, "রায়মহাশয়ের কথার উত্তর কাল দিব। একটু সকালে চারিদণ্ডের সময় তুমি আসিও।"

পরদিন প্রাতে রাজবাটীতে গিয়া শুনিলাম, বধূরাণী মার কাছে আছেন। তিনি নিজের প্রকোষ্ঠে গেলে আমায় অন্তঃপুরে যাইবার আদেশ হইল। মহারাণীমাতা কল্য যে কথা বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। আমায় বুঝাইলেন যে, কুমারের শ্বশুরের কথায় সার আছে সত্য বটে, কিন্তু এক্ষণে তিনি নিজে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন যে, আর ফিরিতে পারেন না। লোকে মনে করিতে পারে যে, মহারাণী নির্ব্বুদ্ধিতাবশত নিজের বিপদ্ নিজে ঘটাইয়াছেন ; তাহা সত্যও হইতে পারে। কিন্তু তিনি নিজে পূর্ব্ব হইতে সকলই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। কেবল পাছে বিবাদ বাধে, পাছে কুমার কিছুতে অসন্তুষ্ট হয়, এইজন্যই তিনি বরাবর কিছুতেই আপত্তি করেন নাই। ইহা তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনি একটু বক্র হইলে সকলই ফিরিতে পারে। কিন্তু আর তাহা করিতে তিনি ইচ্ছুক নহেন।—এতদূর এক্ষণে অগ্রসর হইয়াছেন যে, আর পশ্চাদ্গামী হওয়া অসম্ভব। মা আবার বলিলেন, "রায়মহাশয় পূর্ব্বে ঠিক্ বিপরীত চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কুমার ত আগে জমিদারী কাজকর্ম্মে বড়-একটা আসিত না।

কেবল কুশিক্ষায় এখন সকল শিখিয়াছে।" মহারাণী অনুরোধ করিলেন যে, আমি মিষ্ট করিয়া সকল কথা যেন তাঁহাকে বুঝাইয়া বলি। প্রথমে যখন কথা হইতেছিল, তখন * * সান্যালের মাতা কাছে ছিলেন। তিনি দুএকটি কথা বলিতে লাগিলেন। মহারাণীমাতা একবার বলিলেন,—"কুমার আমার অবাধ্য নহে। আমি একাকী থাকিলে এ কথা বলিতেন না, কিন্তু অন্যের সমক্ষে না বলিলে সংসার টিকে না। সান্যালের মাতা হাসিলেন, বলিলেন, "কর্ত্তা, আপনি ও কথা বলিলে শুনিব কেন? অবাধ্য আর কাহাকে বলে? আপনি বলিয়াই সকল শোভা পাইল।" মা অপ্রতিভের হাসি হাসিলেন।

জেলার মাজিষ্ট্রেট্ কলেক্টর যেদিন আসিয়াছিলেন, সেইদিনকার কথা। আমি অন্যদের সহিত মার কাছে বসিয়া আছি, সংবাদ আসিল, সাহেব ইংলিশ্ম্যান্ চাহিয়াছেন। তাহা পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইয়া গেলে পর প্রচণ্ডমহাশয়ের পুত্র মার পাঠের জন্য চিঠির ফাইল লইয়া আসিল। তাহাতে তিনি বলিলেন, "এ সব পত্র ত আমি কয়মাস হইতে দেখি না, তবে আবার কেন?" পত্রের ফাইল হাতে লইয়া প্রচণ্ডমহাশয়ের একখানি চিঠি দেখিতে পাইলেন। আবার বলিলেন, "হাঁ, একখানি চিঠি দেখিবার যোগ্য বটে।" পরে আমায় কহিলেন, "আমি বলিয়া দিয়াছি যে, নাটোরের রাণীদের, প্রচণ্ডমহাশয়ের, ছোট-তরফের এবং কাশীর বাড়ীর দরুণ কোন কথা থাকিলে শ্রীনাথ ভাদুড়ীর পত্র যেন আমায় পড়িতে দেওয়া হয়।"

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

চিরশূন্য।

তোমার অসীম শূন্যে জাগে গ্রহতারা
সৌরভে আনন্দে মুগ্ধ মত্ত দিশাহারা
অঙ্গে বহি নিখিলের স্নেহ-আলিঙ্গন
ছুটে আসে উচ্ছ্বসিত অনন্ত পবন
মুহূর্ত্ত বিরামহীন, তাই শূন্য তব
শূন্য নহে কভু, সে যে নিত্য অভিনব
আনন্দসাগর, আমি শুধু আছি নাথ
মহাশূন্যতায়, নিমেষ কিরণপাত
নাহিক হেথায় কোন ক্ষীণ আলোকের,
রুদ্ধ অন্ধকারে দ্যুলোকের ভূলোকের
কোন বার্ত্তা নাহি, স্তব্ধ অচেতন প্রাণ
ভুলিয়াছে সুখ-আশা স্মৃতি-সুখ গান।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

বঙ্গদর্শন।

শিবাজী-উৎসব।*

গতবর্ষে "বঙ্গদর্শনে" শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের "শিবাজী-উৎসব ও ভবানীমূর্ত্তি" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কিছু সমালোচনা আবশ্যক। এই শিবাজী-উৎসব বঙ্গদেশে আজ কয়েকবৎসর ধরিয়া হইয়া আসিতেছে। প্রথমত কলিকাতায়, তার পর মফস্বলে এবং এ-বৎসর প্রায় নগরে নগরে এমন কি অনেক পল্লিগ্রামেও ইহার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কিন্তু এ-বারের উৎসবের বিশেষত্ব এই যে, কলিকাতায় এই উপলক্ষে বেশ একটি দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে। আশঙ্কা হইতেছে, এই বিবাদ স্থায়ী হইলে আমাদের উন্নতির পথে বিঘ্ন জন্মাইবে। আমি মফস্বলবাসী, সুতরাং কলিকাতার দলাদলির সহিত আমার বিশেষ কোন সংস্রব নাই। কিন্তু শিবাজী-উৎসবের উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল যে একটি অভিনব মতের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াসী হইয়াছেন, উহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি কি না, এবং আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ঐরূপ একটি মত প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান্ হওয়া আদৌ উচিত কি না, তাহাই বিশেষ বিবেচনা-সাপেক্ষ।

শিবাজী-উৎসবের আবশ্যকতা কি এবং কেনই বা এ উৎসব এ দেশে প্রচলিত করিবার চেষ্টা হইতেছে, সেইটি সর্ব্বাগ্রে বুঝা যাউক।

শিবাজী-উৎসব, প্রতাপাদিত্য-উৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠান আমাদের দেশে কিছুদিন পূর্ব্বে ছিল না। কেহ এ সকলের কোন প্রয়োজনও অনুভব করেন নাই। আমরা বহুদিন ধরিয়া পরের দাসত্ব করিয়া স্বদেশসেবার মাহাত্ম্য একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তাই আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যখন দেশের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহারা প্রাণের ভিতরে একটা অভাবনীয় আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতে লাগিলেন। এই আকাঙ্ক্ষার ফলে জাতীয়-মহাসমিতি প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। ভারতবর্ষের নানা জাতি এবং নানা বর্ণের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা এবং উদ্যোগ ঐ আকাঙ্ক্ষা হইতেই প্রসূত। এইরূপ আকাঙ্ক্ষা সকল

* এই প্রবন্ধ কয়মাস পূর্ব্বে আমাদের হস্তগত হইয়াছিল,—কিন্তু এতদিন ইহা প্রকাশের সুবিধা হয় নাই। শিবাজী-উৎসবের সময় পুনরায় সমাগত, একণে উহার আলোচনায় লাভ আছে। বস।

দেশে প্রথমে কবিহৃদয়ে প্রতিভাত হয়, বাঙলাদেশেও হইয়াছিল। তাই প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে কবি গাহিয়াছিলেন—

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ়পণ এ মহীমণ্ডলে,
তুলিতে আপন মহিমাধ্বজা।

* * * *

* * * *

যিনি এই সঙ্গীত গাহিলেন, তিনি হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ। ইহা হইতেই বুঝা যায়, ভারতবাসী কিসের জন্য লালায়িত। জপতপ, পূজা-অর্চ্চনা, এ সকলের অভাব এ দেশে এই বিংশ শতাব্দীতেও নাই। কিন্তু ভারতবাসী অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছে যে, এই নিদ্রিত ভারতকে জাগাইতে হইলে কেবল জপতপ, কেবল ধ্যানধারণা লইয়া বসিয়া থাকিলে আর চলিবে না। পরন্তু যাহাতে জনসাধারণের হৃদয়ে প্রকৃত শক্তি জাগিয়া উঠে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতবাসী এককালে শক্তিশালী ছিল, কিন্তু সে শক্তি আজ হারাইয়াছে। সেই নিদ্রিত শক্তিকে জাগাইবার জন্যই জাতীয় উৎসবাদির আয়োজন। নিদ্রিত ভারতের প্রথম জাগরণের প্রকাশ দেখিতে পাই জাতীয়-মহাসমিতিতে।

জাতীয়-মহাসমিতি কি উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া সৃষ্ট হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে কি না এবং কোনদিন হইবে কি না, তাহার আলোচনার স্থান এ নহে। কিন্তু জাতীয়-মহাসমিতির প্রশস্ত মণ্ডপে মাতৃভূমির কল্যাণকল্পে যখন বাঙালী এবং মারাঠী, পঞ্জাবী এবং মাদ্রাজী, ব্রাহ্মণ এবং মুসলমান, পারসীক এবং খৃষ্টিয়ান একই মহামন্ত্রে উদ্বোধিত হইয়া সমবেত হন, সে দৃশ্যে প্রাণে আশা এবং বলের সঞ্চার হয় বটে। এই আশা কোনদিন ফলবতী হইবে কি না, তাহা একমাত্র অন্তর্যামীই বলিতে পারেন। কিন্তু এই আশাকে ফলবতী করিবার একমাত্র উপায়—ভারতবর্ষে একতাস্থাপন। যাঁহারা এই একতাস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রাণপাত করিতেছেন, তাঁহারাই দেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী। অতীত আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে, আমরা পরস্পরের সহিত মিলনের একসূত্রে আপনাদিগকে বাঁধিতে পারি নাই বলিয়াই আমরা আজ হেয়। এ হীনতা আমাদের পানভোজনের সহিত, আমাদের শয়ন এবং ভ্রমণের সহিত, আমাদের অন্তরে এবং বাহিরে, আমাদিগকে এমনই জড়াইয়া ধরিয়াছে যে, তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করা এখন অতি আয়াসসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই অব্যাহতি-লাভের ইচ্ছা আমাদিগকে অতি প্রবলরূপে তাড়না করিতেছে এবং এই ইচ্ছার তাড়নাতেই আমরা আজ স্বদেশী আন্দোলনে নিযুক্ত। যাঁহারা ভাবুক, তাঁহারা বলিতেছেন, স্বদেশী আন্দোলন বিধাতার প্রেরণা। আমাদের দুঃসময় দেখিয়া করুণাময় পরমেশ্বর অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগকে দেখাইলেন —"ঐ পথ। ঐ পথে অগ্রসর হও, তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" এই বাণী বাঙালীর অন্তরে প্রতিধ্বনিত হইল। এই স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর দিয়া আমরা কিরূপে আমাদের অভীষ্টলাভ করিব, এখন আমাদের

সকলেরই এইটিই বিশেষরূপে চিন্তার বিষয় হইয়াছে। আমাদের মধ্যে যত-প্রকারের যত ভেদ থাকুক না কেন, একটি বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতদ্বৈধ নাই। সেটি এই যে, আমাদের ধর্ম্মগত, জাতিগত, বর্ণগত, শিক্ষা এবং সংস্কারগত যতপ্রকারের বৈষম্য থাকিতে পারে এবং আছে, তাহারই মধ্য দিয়া একটি দ্বৈধভাববর্জ্জিত একতার সূত্র অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে জাতীয়জীবনের সফলতা লাভ করিতে হইবে। এ জাতীয়জীবন হিন্দুর একার সম্পত্তি নহে, ইহা মুসলমানেরও নহে, ইহা বাঙালীর বা মারাঠীর নহে, পরন্তু ইহা সমগ্র হিন্দুস্থানের জাতীয়জীবন। এই জাতীয়জীবনকে প্রকৃত জীবনী শক্তি প্রদান করিতে হইলে যে শিক্ষা, যে উপদেশ, যে দীক্ষার প্রয়োজন, আমাদিগকে এক্ষণে তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ শিক্ষা এবং উপদেশের অভাব বোধ হইয়াছে বলিয়াই জাতীয়বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইল। নতুবা এতবড় একটা বিশ্ববিদ্যালয় থাকিতে পুনরায় আমাদের নূতন একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার কি প্রয়োজন ছিল? এই শিক্ষা এবং উপদেশ জনসাধারণকে দিবার জন্য কথকতা, বক্তৃতা প্রভৃতির প্রয়োজন এবং যাহাতে আমাদের জাতীয় জীবনী শক্তির বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহার অনুকূল উৎসবাদিরও অনুষ্ঠান আবশ্যক। শিবাজী-উৎসব যাঁহারা প্রথমে প্রবর্ত্তিত করেন, অনুমান করি, এই উদ্দেশ্য লইয়াই তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। শিবাজী-উৎসবের অন্য কোন সার্থকতা আছে বা থাকিতে পারে, তাহা এ পর্য্যন্ত বুঝি নাই, শ্রীযুক্ত বিপিনবাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়াও বুঝিতে পারিলাম না।

বিপিনবাবু বলিতেছেন—"শিবাজীর বীরচরিত্র ও স্বদেশপ্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা এবং শিক্ষিতসাধারণকে যথাসম্ভব শিবাজীচরিত্র-লাভে সাহায্য করা, ইহাই শিবাজী-উৎসবের মূল উদ্দেশ্য।" যদি ইহাই মূল উদ্দেশ্য হয়, তবে ভবানীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাদ্বারা সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কতকটা সাহায্য হইল কিংবা তৎপক্ষে কোন্ ব্যাঘাত ঘটিল, ইহাই বিচার্য্য বিষয়। মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্তের উপাসনা লইয়া স্মরণাতীত কাল হইতে মতভেদ এবং দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে। উভয় মতের পোষকতায় প্রচুর গ্রন্থাদিও লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সাকারবাদী ও নিরাকারবাদীর কলহের মীমাংসা হয় নাই, কখন হইবে এরূপ দুরাশাও অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকেন। যিনি সাকারোপাসনায় রত, তিনি নিরাকারবাদীকে উপহাস করেন; আবার যিনি নিরাকারের উপাসনা করিয়া থাকেন, তিনি সাকারোপাসককে একটু অব-জ্ঞার চক্ষে দেখেন। পরস্পরের প্রতি এইরূপ ভাব যে কেবল অশিক্ষিতের মধ্যেই নিবদ্ধ, তাহা নহে। যাঁহারা পণ্ডিত, যাঁহারা শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও এই ভাবটি বিলক্ষণ রহিয়াছে এবং বোধ হয় পৃথিবীতে যতদিন ভগবানের উপাসনা প্রচলিত থাকিবে, ততদিন এ বিরোধ অবশ্য-ভাবী। ব্রাহ্মধর্ম্ম এ দেশে যখন প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন হইতেই আমাদের দেশের শিক্ষিতসমাজেই এই বিরোধের

সৃষ্টি হইয়াছে। বিপিনবাবু যে ভাবে সাকারবাদী এবং নিরাকারবাদীদের মধ্যে সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন, শিক্ষিত-সম্প্রদায় সে ভাবটি কখন চিন্তা করিয়া দেখেন নাই, কেমন করিয়া বলিব। তথাপি দেখিতে পাই, এই বিরোধ রহিয়াছে। জানিয়া-শুনিয়া এই বিরোধকে নূতন করিয়া জাগাইয়া দেশের কি উপকার হইবে, বুঝিতে পারি না। বিপিনবাবু যদি মনে করেন মূর্ত্তিপূজায় দোষ নাই, তিনি মূর্ত্তিপূজা করুন। আরও অনেকে করিয়া থাকেন, আমরাও করিয়া থাকি, তাহাতে কেহ আপত্তি করে না। করিবার কারণও নাই। কিন্তু জনসাধারণের শিক্ষার জন্য যে উৎসবের সৃষ্টি হইল, সর্ব্বসাধারণে যাহাতে সে উৎসবে যোগদান করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত নহে কি? জাতীয়শিক্ষার জন্য যে উৎসবের সৃষ্টি, একটা অঙ্গ বাদ দিলে যদি প্রকৃতপক্ষেই তাহা জাতীয় উৎসবে পরিণত হইতে পারে, তাহা হইলে ব্যক্তি-বিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের মতস্থাপন-কল্পে সেই অঙ্গটি বজায় রাখিয়া মহোৎসবের জাতীয়তা নষ্ট করা কি সঙ্গত? জাতীয়তা নষ্ট করা বলিতেছি এইজন্য যে, সর্ব্ব শ্রেণীর, সর্ব্ব বর্ণের, সর্ব্ব সম্প্রদায়ের ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিতে পারিতেছে না। বিপিনবাবুই বলিতেছেন—শিবাজী-উৎসব অহিন্দুর জন্য নহে, আবার হিন্দুর মধ্যেও যাহারা শিক্ষিত এবং ভাবুক নহে, তাহারা শিবাজী-উৎসবের ত্রিমূর্ত্তির গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না। তাহা হইলে জনকতক দার্শনিক হিন্দুর জন্যই কি শিবাজী-উৎসবের বড়-একটা আবশ্যকতা বোধ হইয়াছিল? যাঁহারা ভাবুক, যাঁহারা মূর্ত্তিপূজা করিয়া থাকেন এবং মূর্ত্তিপূজার তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহাদের জন্য এ উৎসবের কি প্রয়োজন, জানি না। এই উৎসবে প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিত্রয়-দ্বারা যে গূঢ়তত্ত্ব বুঝাইতে চাহিতেছেন, সে তত্ত্ব বুঝিবার জন্য মেলায় গিয়া প্রতিমা-দর্শনের বিশেষ আবশ্যকতা তাঁহারা অনুভব করেন, এরূপ বোধ করি না। সে যাহা হউক, দেখা যাইতেছে, শিবাজী-উৎসবে অহিন্দু বাদ পড়িল। হিন্দুর মধ্যেও আবার প্রাকৃতজনের উপযোগী হইল না। তবে তত্ত্বদর্শী হিন্দুদের জন্যই কি এই উৎসবের অবতারণা? তাহাও তো হইতে পারে না। কারণ, ভবানীমূর্ত্তির পূজাই যদি এই উৎসবের অঙ্গ হয়, তাহা হইলে যাঁহারা শক্তি-উপাসক নহেন, তাঁহারা কদাচ ঐ উৎসবে যোগদান করিবেন না। তাহা হইলে এই তত্ত্বদর্শী জন-কতক হিন্দুর মধ্যেও আবার বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি বাদ পড়িতেছে। আর যাঁহারা ব্রহ্মোপাসক, তাঁহারা যদিও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহারা বাদ পড়িতেছেন। এখন কেবল বাকি রহিলেন শাক্তসম্প্রদায়। তাঁহারা এই পূজায় যোগদান করিতে পারেন কি? শিবাজী-উৎসবের মেলায় সিংহবাহিনীর মূর্ত্তিপূজা এবারে কোন্ পদ্ধতি অনুসারে হইয়াছিল, আমি জানিতে পারি নাই। কিন্তু এ কথা বোধ হয় উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, যদি আমাদের শাস্ত্রানুসারেই পূজার ব্যবস্থা হইয়া থাকে, তবে ঐ পূজা শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের দ্বারা হওয়া উচিত, নতুবা শক্তির

উপাসক হিন্দুগণই বা তাহাতে যোগদান করিবেন কেন? প্রতিমাতে কোন দেবতার পূজা করিতে হইলে তাহাতে পূজক সর্ব্বাগ্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। যখন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল, তখন তিনি আর মৃন্ময়ী প্রতিমা নহেন, তখন তিনি স্বয়ং মূর্ত্তিমতী ভগবতী। যতক্ষণ প্রাণপ্রতিষ্ঠা না হয়, ততক্ষণ তিনি মৃন্ময়ী প্রতিমা মাত্র এবং পূজা-অন্তে বিসর্জ্জনের পরও তিনি মৃন্ময়ী প্রতিমা। যদি শিবাজীমেলায় এইরূপে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করিয়া মায়ের পূজা হইয়া থাকে, তবে যাঁহারা শক্তির উপাসক, তাঁহাদের মধ্যে হয় ত কেহ কেহ এই পূজার সার্থকতা অনুভব করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেছি এইজন্য যে, যাঁহারা আবার আচারবান্ হিন্দু, তাঁহারা কদাচ এই শিবাজীমেলার পূজায় যোগদান করিবেন না। কেন না, যাঁহারা এই পূজার উদ্যোগকর্ত্তা, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আচারভ্রষ্ট, শাস্ত্রোক্ত বিধি মানেন না এবং কেহ কেহ হিন্দুসমাজের অন্তর্গতও নহেন। সুতরাং এরূপ পূজায় সদাচারসম্পন্ন হিন্দুগণ কেন যোগদান করিবেন? অনেক ব্রাহ্মণ, শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ বা প্রতিমাকে প্রণাম করেন না। সুতরাং শিবাজী-উৎসবসমিতির স্থাপিত মূর্ত্তির সমক্ষে তাঁহারা প্রণত হইবেন না, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যদি এইরূপই অবস্থা হয়, তাহা হইলে "জনমণ্ডলীর" মধ্যে শিবাজীর বীরচরিত্র ও স্বদেশপ্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা এবং "শিক্ষিতসাধারণকে" যথাসম্ভব শিবাজীচরিত্রলাভে সাহায্য করার যে উদ্দেশ্য, তাহা সফল হইতেছে কৈ? শিবাজী-উৎসবটি এমনভাবে গঠিত করা হইতেছে যে, "জনমণ্ডলী" এবং "শিক্ষিতসাধারণের" নিকট হইতে টানিয়া-লইয়া ইহাকে একটি গণ্ডীর মধ্যে স্থাপন করা হইতেছে,—যে গণ্ডীর মধ্যে "জনমণ্ডলীর" এবং "শিক্ষিতসাধারণের" প্রবেশ নিষেধ। বিপিনবাবু বলিতেছেন—"সকলে ভবানীমূর্ত্তিকে পছন্দ না করিতে পারেন। আমরা যে ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, তাহাই কি সকলে পছন্দ করেন? সকলে এই প্রতিমাপূজায় যোগদান করিতে পারেন না। আমাদের উপাসনাদিতেই কি সকলে যোগ দিয়া থাকেন?" না, সকলে যোগ দেন না। কিন্তু তাহাতে কাহার কি আসে-যায়? ব্রহ্মোপাসনায় কেহ যোগ দিল কি না দিল, তাহাতে ব্রহ্মোপাসনার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু শিবাজী-উৎসবে সকলে যোগ দিতে পারিল না, ইহা শিবাজী-উৎসবের পক্ষে ক্ষতির কথা। কেন না, উৎসবের উদ্দেশ্যই বিফল হইয়া যাইতেছে। আর এক কথা। ব্রহ্মোপাসনার স্থান ব্রাহ্মমন্দির। আজ ব্রাহ্মমন্দির ছাড়িয়া যদি আপনি জাতীয়মহাসমিতির মণ্ডপে অথবা স্বদেশীসভার প্রাঙ্গণে আপনার ব্রহ্মোপাসনার বক্তৃতা করিতে যান, তবে জাতীয়মহাসমিতির এবং স্বদেশীসভার উদ্দেশ্য সফল হইবে কি? সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে উদ্দেশ্যে শিবাজী-উৎসবের অবতারণা, ভবানীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা-দ্বারা সে উদ্দেশ্যের সফলতা হইতেছে না, পরন্তু বিঘ্ন হইতেছে। শিবাজী-উৎসব ভারতবাসীর জাতীয়-উৎসব-রূপে পরিগণিত হইতেছে না। বিপিনবাবু ইহাকে হিন্দুজাতীয় উৎসব বলিতেছেন। এই "হিন্দুজাতীয়"শব্দের মর্ম্ম ঠিক গ্রহণ করিতে পারি

নাই। যদি ইহা দ্বারা কেবল উৎসবটির শ্রেণীনির্ণয় করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাকে হিন্দুজাতীয় উৎসব বলা যাইতে পারে, কেন না ভবানীপূজা কদাপি মুসলমান বা খৃষ্টিয়ানের জাতীয় উৎসব হইতে পারে না। কিন্তু ইহাকে যদি হিন্দুর জাতীয় উৎসব বলিয়া পরিচয় দিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সে ইচ্ছা ফলবতী হইতেছে না। কারণ, ইহাতে সকল শ্রেণীর হিন্দু যোগদান করিতে সক্ষম নহে। সুতরাং এ কোন্-জাতীয় হিন্দুর জাতীয় উৎসব, তাহাও নির্ণয় করা কঠিন।

বিপিনবাবু বলিতেছেন—"শিবাজীমহারাজ স্বয়ং ভবানীর উপাসক ছিলেন। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে ভবানীকে ছাড়িলে চলিবে না।"

ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না। মনুষ্যজাতির মধ্যে অধিকাংশ মানুষই ভগবান্‌কে কোন-না-কোন প্রকারে উপাসনা করিয়া থাকে। কেহ ভগবানের একটা আকার কল্পনা করিয়া, আবার কেহ বা নিরাকারস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, কেহ বা এই দৃশ্যজগতের অণুতে অণুতে তাঁহার ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি করিয়া,—নানা জনে নানারূপে তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। শিবাজীমহারাজও তাঁহার ইষ্টদেবীকে ভবানীমূর্ত্তিতে কল্পনা করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। আমাদের মধ্যেও যাঁহারা দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই আপন-আপন ইষ্ট দেবদেবীর মূর্ত্তি ধ্যান ও পূজা করিয়া থাকেন। প্রত্যেকেই যথাসাধ্য আপন-আপন ইষ্টমন্ত্রের সাধনা করেন—গুরুর উপদেশ অনুসারে গুরুকথিত পদ্ধতিক্রমে সাধনায় অগ্রসর হইতে থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া এই সকল ব্যক্তির চরিত্র বুঝিতে হইলে তাঁহাদের ইষ্টদেব বা ইষ্টদেবীকে বাদ দিয়া বুঝিতে পারিব না, এ কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। আপন-আপন ইষ্টদেবতাকে সংগোপন করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। যিনি সাধক, তিনি আপন ইষ্টমন্ত্র অথবা ইষ্টদেবের মূর্ত্তি কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। অন্য কেহ তাহা জানিবার অধিকারীও নহে। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষকে বুঝিতে হইলে তাঁহার উপাস্য দেবতাকেও বুঝিতে হইবে, ইহা স্বীকার করিতে পারি না। বিপিনবাবু স্বয়ংই বলিতেছেন, শিবাজী-উৎসবের মূল উদ্দেশ্য শিবাজীর "বীরচরিত্র" ও "স্বদেশপ্রীতির" উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা। শিবাজীর সাধনপদ্ধতির নিগূঢ়তত্ত্বের সমালোচনা করা শিবাজী-উৎসবের নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য নহে। ব্যক্তিবিশেষকে বুঝিতে হইলে তাঁহার চরিত্রের কোন্ দিক্‌টা আমরা বুঝিতে চাই, সেইটিই দেখা আবশ্যক। আমরা শিবাজীচরিত্রে তাঁহার বীরত্ব ও স্বদেশপ্রীতিই বিশেষভাবে বুঝিতে চাই—আধ্যাত্মিক জগতে তিনি কতদূর উন্নত হইয়াছিলেন, পরকালের কাজ তিনি কতদূর করিয়াছিলেন, তাহা দেখিবার জন্য আমরা ব্যস্ত নহি। শিবাজীর চরিত্র আমরা আয়ত্ত করিতে চাই, শিবাজীর ন্যায় বীরত্ব এবং স্বদেশপ্রীতি লাভ করিবার কামনায়;—তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পদ্ লাভ করিবার জন্য নহে। আধ্যাত্মিক উন্নতির দৃষ্টান্তের জন্য বা প্রকৃত সাধকের সাধনপদ্ধতি বুঝিবার জন্য বর্গীর দেশে

যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের আপন ঘরেই এ তত্ত্ব বুঝিবার আমরা যথেষ্ট উপকরণ পাইয়া থাকি।

বাঙালী ভীরু, বাঙালী কাপুরুষ, বাঙালীর সৎসাহস নাই, এইরূপ জনপ্রবাদ আছে। আমাদের তেত্রিশকোটি দেবতা আছেন। আমরা জপতপপরায়ণ, আমরা আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতিলাভ করিবার জন্য জীবন অতিবাহিত করি, তাই আমরা জীবনসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া ক্রমশ হীনবল এবং বীর্য্যশূন্য হইয়া পড়িতেছি—ইহাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। এ অপবাদ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বীরচরিত্রের আলোচনাদ্বারা বলবীর্য্যাদি বীরোচিত গুণসকল যাহাতে আমরা লাভ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আবশ্যক, এ সম্বন্ধে প্রায় সকলেরই একমত। এই আবশ্যকতাবোধেই আমরা শিবাজী, প্রতাপাদিত্য, সীতারাম প্রভৃতি বীরগণের চরিত্র আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং তজ্জন্য উৎসবেরও প্রয়োজন বোধ করিয়াছি। শিবাজীচরিত্রের প্রকৃত বিকাশ তাঁহার স্বদেশপ্রীতিতে, স্বদেশের জন্য অসাধারণ স্বার্থত্যাগে এবং বীরত্বপ্রকাশে —ভবানী-উপাসনায় নহে। তিনি ভবানীর উপাসনা করিতেন নিজেকে বলীয়ান্ করিবার জন্য,—নিজের নৈতিকবল বাড়াইবার জন্য। আবার, উপাসক যেরূপ উপাস্যদেবতার নিকট প্রাণের আবেগ এবং সকলপ্রকারের আবেদন জানাইয়া থাকেন, শিবাজীও তাহাই করিতেন। উপাসক যেরূপ উপাসনাদ্বারা আপন হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকেন, শিবাজীও সেইরূপ করিতেন। ইহাতেই শিবাজীচরিত্রের বিশেষত্ব নহে। শিবাজীচরিত্রের বিশেষত্ব তাঁহার স্বদেশবাৎসল্যে। রামপ্রসাদকে বুঝিতে হইলে তাঁহার উপাস্যদেবতা "কালী"কে বাদ দিয়া বুঝিতে পারি না, কারণ রামপ্রসাদ সাধক ছিলেন। তাঁহার সাধনার বস্তুকে বাদ দিলে তাঁহার রামপ্রসাদত্বই থাকে না। রামপ্রসাদকে বুঝিতে চাই তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পদের রহস্য বুঝিবার জন্য এবং এই কারণে তাঁহার সাধনপ্রণালী, তাঁহার উপাসনা প্রভৃতিই বুঝিবার বস্তু। তাঁহার চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব। তাঁহার চরিত্রের প্রকৃত বিকাশ তাঁহার সাধনায়। সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে তাঁহার সাহিত্যগৌরব বাদ দিলে তাঁহাকে বুঝা যাইবে না। কিন্তু তিনি কোন্ দেবতার উপাসনা করিতেন এবং কোন্ পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিতেন, তাহা বুঝিবার প্রয়োজন হয় না। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথকে বুঝিতে হইলে তাঁহার স্বদেশবাৎসল্যই বুঝা আবশ্যক, তাঁহার চরিত্রের অন্যান্য অংশ বুঝিবার কোন প্রয়োজন হয় না। বিপিনবাবুর যুক্তি এই যে, "যে দেবতাকে যীশু সর্ব্বদা পিতা নামে অভিহিত করিতেন,—সেই 'স্বর্গস্থ পিতাকে' ছাড়িয়া যীশুচরিত্র বুঝিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। যে দেবতাকে মোহম্মদ আল্লা নামে ডাকিতেন, তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া মোহম্মদের চরিত্র ধ্যান করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। রাধাকৃষ্ণকে ছাড়িয়া শ্রীচৈতন্যকে বুঝিতে যাওয়া মূর্খতা।" তাহা স্বীকার করি। কেন না, এই স্বর্গস্থ পিতাকে ডাকা এবং লোকসমাজে প্রকাশ করাই যীশুর একমাত্র ব্রত ছিল,

আল্লার নাম প্রচার করিবার জন্যই মোহম্মদ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেম মনুষ্যকে বিলাইবার জন্যই মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল। এইগুলিই ইঁহাদের জীবনের একমাত্র কার্য্য। এই কার্য্য গুলি বাদ দিলে ইঁহাদের জীবনচরিত বুঝা হইল না, কারণ ইঁহাদের জীবনের এই দিক্‌টা বাদ দিলে আর কোন বিশেষত্বই থাকে না;—যীশুর যীশুত্ব, মোহম্মদের মোহম্মদত্ব এবং চৈতন্যের চৈতন্যত্বই থাকে না। ঠিক এইভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, শিবাজীর স্বদেশবাৎসল্য বাদ দিলে শিবাজীর আর কোন বিশেষত্বই থাকে না;—তাঁহার শিবাজীত্বই লোপ পায়। শিবাজী স্বদেশের স্বাধীনতালাভের জন্য যেভাবে বিপৎসাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলেন এবং অতি প্রবল রাজশক্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাহাই শিবাজীচরিত্রের বিশেষত্ব এবং তাহাতেই শিবাজীচরিত্রের প্রকৃত বিকাশ। ইহা বুঝিবার জন্য তাঁহার বীরত্বের কাহিনী শোনা আবশ্যক, তাঁহার স্বার্থত্যাগের বিবরণ জানা আবশ্যক, তাঁহার অসাধারণ সাহস এবং শক্তিজ্ঞাপক ঘটনাগুলির বিষয় আলোচিত হওয়ার প্রয়োজন। শিবাজীর শিবাজীত্ব তাঁহার স্বদেশসেবায়, তাঁহার ভবানীপূজায় নহে। শিবাজীকে সাধকরূপে দেখিতে চাই না। সে উদ্দেশ্যে এই উৎসবের অবতারণা হয় নাই। অন্তত সর্ব্বসাধারণে তাহাই মনে করে। শিবাজীর স্বদেশপ্রীতি ও তাঁহার বীরচরিত্র বুঝিবার জন্যই তাঁহাকে বাঙলাদেশে প্রতিষ্ঠা করিতে চাই,—অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে। আমরা শিবাজীকে একজন প্রকৃত কর্ম্মিরূপে দেখিতে চাই। বাস্তবিক শিবাজীকে সাধকরূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। সাধক তাঁহার সাধনার বস্তু লাভের জন্য ধ্যানধারণা করেন। ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোনপ্রকারের আকাঙ্ক্ষা সাধকের হৃদয়ে থাকে না। যিনি প্রকৃত সাধক নামে অভিহিত হইবার যোগ্য, তিনি কামনাশূন্য। কিন্তু শিবাজীকে সেই শ্রেণীর মনুষ্যরূপে কল্পনা করিতে কেহ প্রস্তুত আছেন কি? শিবাজীর উপাসনা সম্পূর্ণ সকাম। শিবাজী উপাসনা করিতেছেন মা ভগবতীকে পাইবার জন্য নহে, তাঁহার কৃপালাভ করিয়া তাঁহার শক্তিতে আপনাকে শক্তিমান্ করিয়া স্বদেশউদ্ধারের জন্য। প্রতাপাদিত্য যশোরেশ্বরীর পূজা করিতেন—তাঁহাকে লাভ করিয়া মুক্ত হইবার আশায় নহে;—যশোরেশ্বরীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া স্বদেশব্রতপালনের শক্তি বাড়াইবার জন্য। শিবাজীকে ধ্যানস্থ যোগিরূপে না আঁকিয়া অসি-এবং-বল্লম-শোভিত সশস্ত্র সৈনিকরূপে চিত্রিত করিলে—তাঁহার বীরচরিত্র অধিকতর সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠে না কি?

শিবাজী ভবানীর উপাসনা করিতেন, ইহাতে এইটুকু তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব বুঝিতে পারি যে, তিনি ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। ইহা বীরের একটি সদ্‌গুণ। ইহাতে বীরহৃদয়ের নৈতিকবল বৃদ্ধি করে, তাঁহাকে সুখদুঃখশীতোষ্ণ প্রভৃতি সহিবার শক্তি প্রদান করে এবং তাঁহাকে অধিকতর কার্য্যক্ষম করে। কিন্তু তাই বলিয়া ভবানীকে বাদ দিয়া শিবাজীচরিত্র কেন বুঝিতে

পারিব না, তাহার কোন যুক্তি পাই না।

আর একটি কথা আছে। বিপিনবাবু লিখিয়াছেন—"আমাদের আজকালকার ভাব ও ভাষায় শিবাজীর 'এই উদ্দীপনা ও প্রেরণাকে ব্যক্ত করিতে গেলে আমরা ইহাকে জাতীয়শক্তি নামে হয় ত অভিহিত করিব" * * * * "এই জাতীয়শক্তি, এই Spirit of the Raceই শিবাজীর নিকটে ভবানীরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন।"

এ যুক্তিটা বোধ হয় আজকালকার স্বদেশীভাবপ্রণোদিত যুবকগণের মনোরঞ্জনার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে। ইহা শিবাজীর ভবানী-উপাসনার "স্বদেশী" ব্যাখ্যা হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুর হৃদয় বোধ হয় এই দার্শনিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে। আমরা যখন শিবাজীকে ভবানীর উপাসকরূপে দেখি, তখন তিনি জগন্মাতা আদ্যা শক্তির উপাসনা করিতেছেন, তাহাই মনে করি;—অন্য কোন ভাবে আমরা তাঁহার ভবানী-উপাসনাকে গ্রহণ করিতে পারি না। জাতীয়শক্তিই বলুন বা race-spiritই বলুন বা libertyই বলুন, এরূপ কোন নামে তাঁহার হৃদয়স্থিত অমূর্ত্তশক্তিকে অভিহিত করিতে কোন হিন্দুই প্রস্তুত হইবেন না। হিন্দু বিশ্বাস করে যে, আদ্যা শক্তির উপাসনাদ্বারা তাঁর কৃপালাভ করা যায়। তিনি অসহায়ের সহায়, তিনি দুর্ব্বলের বল, তিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। শিশু যখন বিপদাপন্ন হয়, তখন "মা মা" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। মা সে ডাক শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। তিনি ত্বরিতগতিতে আসিয়া শিশুর দুঃখনিবারণ করেন। তাই বিশ্বজননীকে যিনি যেরূপে ভজনা করিয়া তৃপ্ত হন, তিনি সেইরূপেই ডাকেন, সেইরূপেই তাঁহার উপাসনা করেন। গুরু এই উপাসনার পথটি দেখাইয়া দেন; কি উপায়ে মাকে ডাকিলে তিনি সাড়া দিবেন, সেই উপায়টি তিনি শিখাইয়া দেন। শিবাজীকে ভবানী-উপাসনার সময় এই চক্ষে দেখিতেই আমাদের ভাল লাগে। এই সুন্দর ভাবটি ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তিকে অন্য কোন ভাবে বর্ণনা করিলে, আর যাহাই হউক, তাহা হিন্দুর নিকট আদরণীয় হইবে না এবং শিবাজী-উৎসবের তাৎপর্য্য অন্যরূপ হইলে তাহাকে হিন্দুজাতীয় উৎসব বলা সঙ্গত নহে।

বর্ত্তমান আকারে শিবাজী-উৎসবের আর একটা দিক্ আছে, সেটা অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না। শিবাজী-উৎসবে ভবানী-মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার যে ফল আমরা হাতে-হাতে পাইলাম, তাহা ভুলিয়া যাইতে পারি না। সে ফল সাক্ষাৎসম্বন্ধে নেতাদের মধ্যে দলাদলি। ভগবৎকৃপায় কিছুদিন ধরিয়া আমাদের দেশের কর্ম্মবীরগণ সকলেই এক মনে এক প্রাণে মাতৃসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আমাদের স্বদেশী আন্দোলনে যাহা-কিছু ফললাভ হইয়াছে, তাহাও এই একপ্রাণতার জন্য। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা বিধাতাই জানেন। বোধ হয়, বাঙালীজাতির উন্নতি তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তাই কর্ম্মীদের মধ্যে শিবাজী-উৎসবের ন্যায় একটা অবান্তর ব্যাপার লইয়া বিরোধ বাধিয়া গেল এবং এই বিরোধ তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যেই এক্ষণে পরিস্ফুট

হইতেছে। শিবাজী-উৎসবসমিতি যদি মনে করিয়া থাকেন যে, ভবানীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাদ্বারা তাঁহারা হিন্দুদের সহানুভূতি পাইবেন, তাহা হইলে মনে করিব, তাঁহারা বড়ই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃত হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এবং শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলেন, তাঁহারা ঐ শ্রেণীর উৎসবে যোগদান করিবেন না। আমাদের সমাজে যে সকল পুরাণোক্ত উৎসবাদি প্রচলিত আছে, তাহার অতিরিক্ত আর কোন উৎসবের প্রয়োজন কেহ কোনদিন অনুভব করেন নাই। শক্তিসাধনার জন্য শক্তিপূজা আবশ্যক হইয়া থাকে। হিন্দুর মহাতীর্থ এবং পীঠস্থান কালীঘাট রহিয়াছে, সেই স্থানে গিয়া আমরা মায়ের পূজা করিব, বাঙালীর জাতীয় উৎসব দুর্গোৎসবের সময় মায়ের নিকট প্রণত হইয়া শক্তিভিক্ষা করিব, শিবাজীর মূর্ত্তি তুলিয়া তাহার সম্মুখে ভবানীকে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিব কেন? যে পূজার কোন বিধি বা নিয়ম পুরাণে বা তন্ত্রে নাই, সে পূজা কোন্ পদ্ধতি অনুসারে হইবে?

তবেই দেখা যাইতেছে, হিন্দুদের জন্যও এ উৎসব নহে। তবে কাহার জন্য এ উৎসব? যে উৎসবে দেশবাসিগণ সকলে যোগ দিতে পারিল না, সে উৎসবের প্রয়োজন কি?

শেষ আর একটি কথা। যদি ভবানীমূর্ত্তি বাদ দিয়াও শিবাজীচরিত্রের যে অংশ বুঝিতে চাই, তাহা বুঝিবার কোন বাধা না হয় এবং ভবানীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা যদি মুষ্টিমেয় কয়েকটি ব্যক্তির নিকটই অতি প্রয়োজনীয় বোধ হয়, তাহা হইলে যে অঙ্গটুকু বাদ দিলে সকল শ্রেণীর লোক এই উৎসবে যোগদান করিয়া জাতীয়জীবনকে বীরধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, শিবাজী-উৎসব সেইভাবে সম্পন্ন করিলেই বা ক্ষতি কি? আর যদি এভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে এ উৎসবটি উঠাইয়া দিলে দেশের মঙ্গল বৈ অমঙ্গল দেখি না।

শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মনীষা।

[মিশ্রকাব্য]

দ্বিতীয় সর্গ।

প্রভাত হইলে নিশি বেশ ল'য়ে আসিল কিঙ্করী
গৈরিক রেশম—কণ্ঠ হ'তে আগুল্ফ-লম্বিত। পরি'
সেই ছাত্রীবেশ সাজিলাম মোরা তাপসিনীদ্বয়
আশ্রমদীক্ষার তরে যেন। তখন সে সবিনয়

কহিল—"রাজনন্দিনী মনীষা মোদের প্রতীক্ষায়
রয়েছেন কক্ষে বসি'।" অবিলম্বে চলিনু সেথায়—
শ্রেণী বাঁধি,—অগ্রে আমি,—পিছে মোর চলিল দু'জন ;
অতিক্রমি' সমুদ্বেগে মণিময়-পুষ্প-সুশোভন
চিত্রিত দীর্ঘ অলিন্দ, উত্তরিনু রাজসভামাঝে,—
মর্ম্মররচিত শুভ্র ভিত্তিগাত্রে তাহার বিরাজে
কত-মত কারুকার্য্য। যুগ্ম স্তম্ভ তাহে শত শত
নানামণিপুষ্পহারে ঝলমল করে অবিরত।
ঝক্‌ঝক্ শুভ্র মেঝ, বিম্ব ধরে মুকুর যেমন—
কোণে কোণে গোলাপের স্ফুরিছে ফোয়ারা স্বনস্বন্
সৌরভপ্রবাসী। ছত্রিশ রাগিণী-মূর্ত্তি সুগঠিত
মর্ম্মরপ্রস্তরে, প্রতি যুগ্মস্তম্ভমাঝে প্রতিষ্ঠিত
অপূর্ব্ব কৌশলে। চতুঃষষ্টিকলামূর্ত্তি খর্ব্বতরা
বিরাজিছে ঊর্দ্ধভিত্তি'পরে। বীণা-বেণু-সপ্তস্বরা-
মুরজ-মৃদঙ্গ-আদি হেথা-হোথা রয়েছে পড়িয়া।
হেরি' হেরি' এই সব— সোপান বহিয়া কম্পহিয়া
উত্তরিনু রাজকক্ষে।

স্বর্ণসিংহাসনে সুবদনী
হেরিনু অপূর্ব্ব নারী সুবৃহৎ পরি' শিরোমণি,
গ্রন্থ আর বিত্তায় বেষ্টিত। সিংহাসন-দুই-পাশে
পোষা যুগ্ম বাঘিনী শায়িত। মরি কোন্ চন্দ্রাবাসে
এমন লাবণ্য ছিল—নামিল রে এ মর্ত্ত্যজগতে!
কি মদিরা ঝরঝরে আকর্ণবিস্তৃত আঁখি হ'তে
সর্ব্বসভা লালসে উলসি'! দাঁড়াইয়া মধুস্বনে
কহিলেন রাজবালা—"স্বাগত স্বাগত বরাঙ্গনে!
শিক্ষাদীক্ষা চিত্তবল হেরি' তোমাদের, বহুপ্রীতি
জাগে মনে! দূর হ'তে তোমরাই প্রথম অতিথি
এ নব বিত্তার রাজ্যে। তোমাদের নাম মোর সাথে
একত্রে জলিতে রবে মহত্বের ইতিহাসপাতে,—
অতীতের নারীলোক-অন্ধকার উজ্জ্বল করিয়া
জাগিবে মুক্তির দীপ্তি অন্তহীন ভবিষ্য ভরিয়া

একত্রে প্রকাশি' আমা' সবে। একি হেরি? তব দেশে
নারী এত দীর্ঘাকারা?" নিকুঞ্জ কহিল মৃদু হেসে
নতনম্র মুখে—"মোরা আসিয়াছি রাজপুরী হ'তে।"
"রাজপুরী হ'তে? তবে যুবরাজে জান ভালমতে?"
কহিল নিকুঞ্জ—"তিনি একালের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার,
হের রাজ্ঞি! তবু তিনি শ্রেষ্ঠতম আদর্শ তোমার
পূজেন অন্তরে নিত্য।" উত্তর দিলেন রাজবালা—
"ভাবি নি শুনিতে হবে শূন্যগর্ভ এই খ্যাতিঢালা
তোষামোদ-রজতটুঙ্কার এ মোর প্রাসাদে বসি'।
বুঝিলাম গ্রন্থশূন্য অরণ্য ত্যজিয়া—অভিলষি'
জ্ঞানামৃত আসিয়াছ হেথা। কিন্তু শিশুর সমান
বাক্য তব। নৃপসুত এ চিত্তে না পায় তিল স্থান।
যেদিন গ্রহিনু এই মহাদর্শে জীবনের ব্রত,
সেইদিন পণ কৈনু উদ্বাহে না হইব সম্মত
যাবত জীবন। তোমরাও লহ দীক্ষা—কর পণ
হেথায় প্রবেশসাথে নারীপনা করিবে বর্জ্জন।
ক্রীড়নক নহি মোরা রঞ্জিতে নরের অবকাশ—
মনে রেখো এই কথা। চিত্তে স্থির যদি অভিলাষ—
প্রভুত্বগর্ব্বিত যত পুরুষেরা নারীগণে দলে
সর্ব্বসাথে লহ সম অধিকার বাঁটি' শক্তিবলে।"

সলজ্জ (পুরুষ মোরা) হর্ম্ম্যতলে চাহিনু তখন
খুঁটিতে খুঁটিতে নখ। নারী-কর্ম্মচারী একজন
উঠিয়া করিল পাঠ নিয়মসমূহ সেথাকার—
তিনবর্ষ ধরি কেহ না লইবে গৃহসমাচার,
তিনবর্ষ ধরি কেহ সৌধগণ্ডি নাহি উত্তরিবে,
তিনবর্ষ ধরি নাহি নরসাথে আলাপ করিবে।
এমনি এমনি পাঠ করিল সে আরো বিধি কত—
স্বাক্ষর করিয়া তাহে প্রবেশিনু মোরা রীতিমত
বিদ্যালয়ে। "এখনো অপরিপক তোমাদের মন
সাবধানে রেখো—কীট নাহি যেন পরশে কখন।"

কহিলেন রাজ্ঞী। "দেখ চাহি এ প্রাসাদে কারা ফিরে—
এরা ত' আচ্ছন্ন নহে দাসীত্বের অনন্ত তিমিরে।
এদের মস্তিষ্ক পটু নহে মাত্র ভূষা-উদ্ভাবনে
খর্ব্বমেধা-নারীসম প্রাচ্য আর প্রতীচ্য ভুবনে।
হের চাঁদবিবি হোথা ফিরাল যে মোগলবাহিনী
আপনি নেতৃত্ব ল'য়ে—এই মূর্ত্তি জিনিয়া রোহিণী,
চিতোরপদ্মিনী রাজে। দেখ চেয়ে হোথা বীরাঙ্গনা
দৃপ্তচক্ষু অগ্রণীনা—শাস্ত্র-আর-শস্ত্র-বিভূষণা।
দাসী নহে নারী—এ সব নারীরে স্মরি' স্থির মনে
বুঝি' দেখ। মুক্ত দাসীভাব—কর ইঁহাদের সনে
বসবাস—পরিহরি' তুচ্ছ লোকাচার—ধন্য করি
মানবজনম, নারীচিত্ত উর্দ্ধে তুলি'—অনুসরি'
নারী-মুক্তি-পথ। আর রুদ্ধ নহে জ্ঞানের নির্ঝর
রমণীর ভাগে। জ্ঞানসুধা মুক্তিসুধা পান কর
কণ্ঠ ভরি'—যাক্ যাক্ কেটে যাক্ দাসীত্বের বিষ।
হীনতা, আলস্য আর ক্ষুদ্রকাজ, যাহে অহর্নিশ
বদ্ধ আছে নারী—ঘুচুক্ এ শুভক্ষণে। জন্ম যা'র
কীর্ত্তিধন্য নহে ধরণীর তলে—মৃত্যু শ্রেয় তা'র।
এক্ষণে বিদায় লহ বিশ্রামের তরে। আজি সাঁঝে
বক্তৃতা দিবেন চন্দ্রা নব-আগন্তুক সভামাঝে
বক্তৃতামণ্ডপে—যথা আসিয়াছে নব অনুরাগে
মক্ষিকার ঝাঁকসম অতিথি আজিকে দিবাভাগে।"

পদ্মকোরকের মত দুটি হস্ত জুড়িয়া রূপসী
জানাইল আমন্ত্রণ। সভাগৃহ বহি মোরা পশি'
চন্দ্রা দেবীর ভবনে হেরিলাম মুগ্ধ ছাত্রীদল
চেয়ে আছে নির্নিমেষে—মিশি শত প্রফুল্ল কমল
অলিযুক্ত শোভে যথা! চন্দ্রারে হেরিনু ফুল্লাননে
সভাগৃহ উদ্ভাসিয়া বসি কৃষ্ণাজিন-আস্তরণে—
রক্তগণ্ডে কৃষ্ণচক্ষে বিংশবর্ষ নাচে টলটল্
হর্ষরাগে। বামে ভগ্নীপুত্রী কণা কনকপ্রোজ্জ্বল
সজ্জিত ষুমায়—যুগল-বসন্ত-বয়া। সভাকোণে
বসিনু আমরা—চন্দ্রা দেখিলেন চাহি'। মৃদুস্বনে

সতর্ক মন্মথ মোর কর্ণে লোল কহিলেন বাণী
"উনি ভগ্নী মোর।" "হেমি চিত্তে বড়ই বিস্ময় মানি"—
"চুপ্—চুপ্" মন্মথ কহিল। চন্দ্রা আরম্ভিলা বাণী,
ভূত, বর্ত্তমান আর ভবিষ্যের রহস্য বাখানি'—

"আদিতে ছিল না কিছু—এই পঞ্চভূত-উপাদান
শূন্যে ব্যাপ্ত ছিল পরমাণুরূপে। বিধাতৃ-বিধান-
ক্রমে মিশাইয়া মহাপিণ্ডাকারে উঠিল ঘুরিয়া
তাহা ঘোর রোলে মহাতূর্ণবেগে—দৃপ্ত বিকিরিয়া
তপ্ততেজ, অন্ধকার-মহাশূন্য-মাঝে ;—তাপভারে
বিশ্ব-উপাদান-চয় দ্রবিয়া মিশা'ল একাকারে।
ক্রমে তাপক্ষয়সাথে সেই দ্রব হইয়া কঠিন
দৃপ্তশ্বাসে গ্রহতারা লক্ষ লক্ষ উগারে নবীন ;
ঘোর-রোলে-ঘূর্ণমান প্রত্যেক যে জ্যোতিগ্রহ হ'তে
নবতর লক্ষ গ্রহ জনমি' ছুটিল ব্যোমপথে।
তা'র পরে জীবসৃষ্টি—প্রথমত দৈত্য ও দানব,
ক্রমে বিজ্ঞতর হাতে সৃজিলেন বিধাতা মানব,—
উলঙ্গভরা—চর্ম্মপরা—রুক্ষমূর্ত্তি—জ্ঞাতিহত্যারত
কোল-ভিল-আদি ছিল অনার্য্য ভারতে যেইমত।"

এত কহি' বালা সেই অম্বুদার অতীতের কথা
সংক্ষেপে আবৃত্তি কৈল। আমেজন-নারী যুদ্ধব্রতা
ছিল সে প্রাচীন গ্রীসে—মহাকবি হোমর তাহার
চিত্রিলা কি মহাচিত্র! হ'ত নারীনামে গোত্র আর
বংশের প্রতিষ্ঠা লিসিয়ার উপদ্বীপে। রামাদল
একত্র মদিরাপানে পুরুষের সাথে সভাস্থল
তুলিত মুখরি'। পারসীক, গ্রীসীয়, রোমক—সর্ব্ব
রাজনীতিমাঝে হেন নারী-অধিকার করি' খর্ব্ব
কে শয়তান জাগাইল মাথা? ক্রমে উত্তেজনাভরে
ঘৃণাস্রোতে ভাসাইয়া সভা কহিলা—"কোন্ বর্ব্বরে
হেন বিধি দিলা—কন্যা যাহে বংশচ্যুত অপমানে
চিরতরে নির্ব্বাসিত হয়? দেখ চীননারীপানে

চেয়ে—লৌহপাদুকায় ক্ষুদ্র বদ্ধ শৈশবচরণে
নিজ ইচ্ছামত চলিতে না পারে। শাণিত বচনে
নিন্দিলেন মহম্মদে—যাঁর মতে অনন্ত নিরয়
গভীর আঁধারকূপে প্রধানত ছিল নারীময়।
পরে বীরত্বের যুগে লভে নারী পূজার আসন
হইলেও অতি ক্ষুদ্র—সেইক্ষণে আশার কিরণ
প্রথম জাগিল চাহি'। রঙ্গিম তাহারি বক্ররেখা
পড়িল প্রতিজ্ঞাভূমে—শুভফল তূর্ণ দিবে দেখা।
ধন্ত সেই বীরাঙ্গনা—উপেক্ষিয়া জীর্ণ লোকাচার,
পণ করিলেন যিনি নারীজন্ম করিতে উদ্ধার
প্রথাজাত এ দাসীত্ব হ'তে।—'নারী-নর সৃষ্টি যাঁর
সেই অদ্বিতীয়-এক বিনা কেহ না হইবে আর
নারীর আরাধ্য বিশ্বে।'—এই যুক্তি রাজ্ঞী মনীষার,—
কার্য্যে তা'রে গড়ি তোলা—তোমা-'পরে রহিল সে ভার।
পুরুষের সর্ব্বশিক্ষা হেথায় শিখিবে নারীগণ,
ভয় নাই—'রমণীর স্বল্প মেধা' মিথ্যা এ বচন।
সকল পুরুষ নহে প্রতিভা-উজ্জ্বল, নীচ উচ্চ
আছে তাহাদের। তেমনি রমণীমাঝে নহে তুচ্ছ
সর্ব্বজনে। প্রতিভা তা'দেরো মনে রাজে। খর্ব্ব নারী—
কিন্তু রূপে আলো—পুরুষ কর্কশ দীর্ঘ—শক্তিধারী
তেমনি আবার—তুল্যমূল্য এ উভয়। কিন্তু শুন
কহি—বুদ্ধি সর্ব্বজনে পারে অর্জ্জিবারে—পুনঃপুন
অভ্যাসিয়া। দীর্ঘাকৃতি শ্রেষ্ঠ যদি মানিতেই হয়,
তবে তাহা চেষ্টাগুণে—ইথে আর নাহিক সংশয়।
কর্ম্মক্ষেত্রে প্রথম নেমেছে নর। বৃথা হরি' কাল
কর্ম্ম পণ্ড কৈল নারী—হারাইল প্রতিষ্ঠা বিশাল।
কিন্তু নারী বাড়ে শীঘ্রতর—দীর্ঘ পরমায়ু তা'র,—
সত্য বটে নাহি বহু—আছে কিন্তু রমণী মেধার
দীপ্ততারা হেথায়-হোথায় দু'চারিটি—সগৌরবে
ঝক্‌ঝক্ নারীকীর্ত্তি জ্বলিতেছে সমুজ্জ্বল ভবে।
কিন্তু তবু দেখ বুঝি'—মহত্ত্ব নরের পরিমাণ—,
পশুশক্তি নহে।—চেঙ্গিস্-তৈমুর নহেক প্রমাণ

তা'র কাণ্ডাকাণ্ডহীন। লোকপূজ্য হের জ্ঞানবীর
বুদ্ধ, ব্যাস, হোমর, বাল্মীকি। নারীকীর্ত্তি পৃথিবীর
তেমনি সর্ব্বত ব্যাপ্ত। সাম্রাজ্ঞী রিজিয়া রাজকাজে—
যুদ্ধে চাঁদরাণী—লীলাবতী বিদ্যাপরায়ণা। রাজে
এমনিই বহুনারী—তুল্যমূল্য পুরুষের সনে।
এঁদের নহেন উন, যিনি এই বিশাল বিজনে
বাঁধিলেন বিদ্যাসৌধ—ত্যজি' নিজ সর্ব্বসুখসাধ,
প্রাচীন প্রথায় পাছে নারীজন্মে হানে পরমাদ।

অবশেষে কহিলেন ভবিষ্যৎ বাণী প্রচারিয়া—
বিশ্লেষিয়া মূলতত্ত্ব—'দ্বৈত র'বে এ বিশ্ব ঘেরিয়া।
মন্ত্রণাসভায় নারী—নারী-নরে সংসারবন্ধন,
হইবে জটিল কর্ম্ম-আবর্ত্তের মাঝেও তেমন
বুদ্ধিদাত্রী নারী। হবে পুণ্য-ধর্ম্মে প্রভাব দোঁহার
সমতুল। এখন পুরুষ—কিন্তু নারীও এবার
নামিবেন জ্ঞানার্ণবে মনোময় দীপ্তখনিমাঝে
রত্ন-আশে। গীতি, চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, সর্ব্বকাজে
ধরিবে ধরিত্রী ক্রমে নারী আর পুরুষ হইতে
সমসংখ্য শিল্পী কবিদল—যার শিল্পে-গীতে
নবতর শৌর্য্যে-বীর্য্যে ভরিবে ধরণী।"

সমাপন

করি' বাক্য—করিলেন ইঙ্গিতে মোদেরে সম্ভাষণ।
শ্রোত্রীদল করিলে প্রস্থান, মিষ্টালাপ আরম্ভিতে
যেমনি কবে'ন কথা আমাদের সনে—আচম্বিতে
বিস্মিত-অধীরকণ্ঠে রুদ্ধভাবে কহিল সুন্দরী—
"দাদা? তুমি হেথা?"—"হাঁ বোন্।" "কি সয়তানী বুদ্ধি ধরি'
প্রবেশ করিলে হেথা? সর্ব্বনাশ! ধরি নারীবেশ
কা'দের এনেছ সঙ্গে? নাহি কি গো তব মর্ম্মলেশ?
নারীর যতনে-রচা মনঃকুঞ্জে আগুন লাগাতে
আসিয়াছ সঙ্গী ল'য়ে? তব উর্ব্বর পুরুষমাথে
কুচক্র কি সহজে জাগিল? দুর্গা! দুর্গা! একি পাপ!
একি নীচ হিংসাবৃত্তি? ধিক্ ধিক্ নাহি পরিমাপ

এ পুরুষ-চিত্ত-নরকের। "হে কোন্ সর্ব্বনাশ ?"
"কিছু নহে—কোনো ফন্দি চিত্তে নাই।" "সর্ব্বনরত্রাস
দেখনি কি দ্বারে তাম্রলিপি—'মৃত্যুদণ্ড-হবে তা'র
যে পুরুষ প্রবেশিবে এই বিদ্যাসৌধের দুয়ার' ?"
"দেখেই যদ্যপি থাকি—পারি কি ভাবিতে কভু মনে
স্বাপস্মিত্রীদল এর চির স্নেহকোমলা ভুবনে
ছদ্মবেশা রাক্ষসীর প্রায় ভুঞ্জিবে অনন্ত সুখ
নররক্ত লেহি' লেহি' ?" "হেরিলেই সে কঠিন মুখ
প্রতিভাত হবে সব—বিদ্রূপের নহে ইহা স্থান,—
ব্যাঘ্রিণীর সঙ্গে রঙ্গে কোন্ নর পায় পরিত্রাণ ?
কঠিন কর্ত্তব্য মোর জিহ্বায় বসিয়া কবে কথা—
কি যে হবে পরিণাম রাজ্ঞী মোর শুনিলে বারতা
ভাবিতে না পারি। অহো! সে যে স্থির নিয়তির মত
সুকঠিন!" "তবে চন্দ্রা! কয় মোরে স্বহস্তে নিহত
প্রবেশদুয়ারশিরে ঝুলাইয়া রাখ্ মোর দেহ
দস্যুর ভাণ্ডারদ্বারে কাসেমের শবসম—কেহ
ভয়ে না পশিবে হেথা। না হয় ও ফটকের ধারে
অহিন্দুর মত করি গোর দিস্ অভাগা দাদারে,—
লিখিস্ ডালায় তার—'নারীর কল্যাণ-অভিলাষে
সহোদরা-হস্ত-হত সহোদর এ সমাধি-বাসে
রয়েছে শয়ান।" নিকুঞ্জ কহিল—"কোন্ আশে আর
আমিই বাঁচিয়া থাকি', দেখি'-শুনি শোভনা চন্দ্রার
রূপ আর সুধাবাণী ?" থাকিতে নারিনু আমি আর,—
কহিলাম—"জন্মিয়াছি রাজপুত্র যে দেশে তোমার
পিতৃগৃহ। জান তুমি বাক্যদত্তা মনীষা আমার
হৃদয়-যমুনা-তীরে প্রেমোন্মত্ত-কদম্ব-সম্ভার
সৌরভে ভরিবে। সে আছে হেথায়—প্রতারণা সহ
এ কুঞ্জে পশেছি তাই—আর কি উপায় আছে কহ ?"
"হে কুমার! প্রভু মোর! নাই নাই স্বদেশ আমার—
থাকে যদি এই তাহা—পিতৃগৃহ অন্য নাহি আর।
ছিনু যাহা—নহি তাহা—কদমের চায়াগাছসম
এখন হেথায় লগ্ন—লভিয়াছি জন্ম নিরুপম।"

বাগ্‌দত্তা বলিলে না প্রভু! নহে ইহা লীলাস্থলী
প্রেম-অভিনয়-তরে—তবে হায় কেমনেই বলি—
'রহ হেথা সবে?' হোথায় উদ্যতবজ্র অগ্নিমূর্ত্তি
জলে ধ্বক্‌ধ্বক্ স্তম্ভিত নির্ব্বাক্—এ গোপনস্ফূর্ত্তি
পাবেই আমার মুখে।—ধর সবে শিরে বজ্রাঘাত।"
"ভেবো না ভেবো না চন্দ্রা—দ্বারদেশে ওই তাম্রপাত
অর্থহীন কহিনু তোমায়—মাত্র দেখাইতে ভয়,
বংশখণ্ড বৃক্ষশিরে পট্‌পট্‌-মহাশব্দময়,
ফলপ্রেপ্সু পক্ষিগণে যথা। তা'র বেশী যদি হয়,
বাড়াবাড়ি করে রাজ্ঞী—যুদ্ধ তবে ঘটিবে নিশ্চয়।
জয় তাহে যার(ই) হোক্—নিষ্ঠুর সে তূর্য্যের নিনাদ
ধ্বনিবে বজ্রের মত—মুহূর্ত্তেকে পাড়িয়া প্রমাদ
চূর্ণ করি' কবিত্ব তোমার—শক্তিহীন ভিত্তিহীন
অদ্ভুত খেয়াল তব গল্পমাত্রে হইবে বিলীন
বৃদ্ধা ঠাকুমার মুখে।" চন্দ্রা কহে—"সে বিচারভার
আপনি লবেন রাজ্ঞী—আমি মাত্র আজ্ঞাদাসী তাঁর।
আসি তবে রাজপুত্র—আসি মহাশয়! নমস্কার,
কে জানে কি সর্ব্বনাশ ঘনায়ে আসিছে অন্ধকার।"

আমি কহিলাম—"চন্দ্রা! ঘটেছে কি বিস্মৃতি তোমার?
ভুলিলে দাক্ষিণ্যনয়া—বহুবিধ সদ্‌গুণসম্ভার
তব বংশ মণ্ডিত যাহাতে? বৃদ্ধপিতামহ তব
স্বর্গত কোশলরাজ অর্জ্জিলেন কি কীর্ত্তিবিভব
হৃতরাজ্য ছদ্মবেশে ভ্রমিতে ভ্রান্তে যবে বনে
দানপ্রার্থী বণিকের তরী-মগ্ন-দৈন্য-দিগ্ধ-মনে
আপনি দিলেম ধরা শত্রুরাজপাশে যাচি পণ
নিজমুণ্ডবিনিময়ে—দয়াগর্ব্বদৃপ্ত সে বদন
প্রশান্ত বিমলদ্যুতি—এখনো চিত্রিত আছে মম
সৌধভিত্তি'পরে—হায় নারি, তুমিই কি শ্রেষ্ঠতম
সেই বংশভবা? সেই চিত্র হেরি হেরি ভাবি মোরা
'এ রক্ত এখনো আছে ধরায় নবীন শিরাভরা,'—
এই তাঁর পরিচয়?"

রণজিৎ কহিল রুদ্ধস্বনে—
"আমার শৈশবসহচরি চন্দ্রা অয়ি! ভেবে দেখ্ মনে
খেলেছি দুজনে কত খেলা—শিপ্রাতরঙ্গিণীতীরে
নীরব তপনকান্তি ঝলকিত প্রভাতসমীরে—
পাড়িয়া দিতাম তোরে করবীর সুদীর্ঘ পাতা
প্রজাপতিডিম্বসাথে—তুই হ'য়ে স্নেহময়ী মাতা
সযত্ন-গোপনে রাখি' দেখিতিস্ প্রতিদিন প্রাতে,
অবশেষে একদিন ডাকিতিস্ ধরি' মোর হাতে
'এসে দেখ, ফুটেছে সুন্দর প্রজাপতি'—স্নেহব্রতা
সে চন্দ্রা আমার—আজ সে কি এই? কহিতিস্ কথা
বসি মোর রুগ্ণশয্যাশিরে সুধাকণ্ঠে—ঢালিতিস্
ফেণোচ্ছল অন্নমিশ্র সযত্ন আগ্রহে—জ্বালিতিস্
সন্ধ্যাদীপ মোর কারাগৃহে—সে চন্দ্রা হইলি একি?
নিকুঞ্জ কহিল—"চন্দ্রা, সেই তুমি, নিত্য যা'রে দেখি
আমার হৃদয়কুঞ্জে,—চিরদিন এই নারীবেশে
রহিব হেথায় কাল—তুমি যদি কথা কহ হেসে।"

ক্রমশ।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

ত্রিদোষ।*

সাহেব। আপনি কি বলিতে চাহেন, আপনাদের ধর্ম্মের কি সমাজের কোনোরূপ সংস্কারের প্রয়োজন নাই?

অনাথনাথ। না, আমি এমন কথা বলিতেছি না। আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ ৭০০ বৎসর দাসত্বের ফলে একরাশি আবর্জ্জনায় চাপা পড়িয়াছে। আমরা এখন ধর্ম্মের ও সমাজের নামে সেই আবর্জ্জনা ঘাঁটিয়াই মরিতেছি। আর কিছুদিন এভাবে চলিলে কেবল আমাদের সমাজ ও ধর্ম্ম নহে, আমরাও লুপ্ত হইব। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংস্কারের নিতান্ত প্রয়োজন। তবে সংস্কার করিবে কে? পূর্ব্বে রাজা করিতেন। এখন রাজা বিদেশী ও বিধর্ম্মী, আর আমরা?—আমরা ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষা করিব কি, আমাদের জীবনরক্ষাই বিষম সমস্যা হইয়া

---

* দশবৎসর পূর্ব্বে কবিবর নবীনচন্দ্র যখন তাঁহার ভানুমতী উপন্যাস রচনা করেন, তখন তিনি রাজকার্য্যে লিপ্ত। নানা কারণে গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে অনাথনাথ ও সাহেবের কথোপকথন কতকাংশে এইজন্য মুদ্রাঙ্কনকালে তারকাচিহ্ন দিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছিল। ইহাই সেই অংশ—নবীনবাবু এক্ষণে অবসরপ্রাপ্ত—ঐ গ্রন্থেরও এই অংশসহ পুনর্মুদ্রণ হইতেছে। বঙ্গদেশীয়গণের তাঁহার সুচিন্তিত পুরাতন মতামত প্রণিধানযোগ্য। ব স।

পড়িয়াছে। আমাদের কাহারো ঘরে অন্ন নাই, পুষ্করিণীতে জল নাই। এই অন্নজলের হাহাকারে দেশ পরিপূর্ণ।

সা। তাহার কারণ কি ?

অ। কারণ বৃটিশরাজ্যের ত্রিদোষ,—কারণ তিনটি প্রণালী। তিনটি tion—Foreign Competition, Litigation এবং Education—অবাধ-বাণিজ্য-প্রণালী, বিচার-প্রণালী ও শিক্ষাপ্রণালী। অবাধ-বাণিজ্যে ভারতের তাঁতী, কামার, কুমার, সর্ব্বপ্রকার শিল্পীর অন্ন মারিয়াছে। ভারতবাসী সকলেরই কৃষি বা মাটিমাত্র সম্বল হইয়াছে। এরূপে মাটির ব্যবসায়ী বাড়িয়াছে, কিন্তু মাটি ত বাড়ে না। দীঘি-পুষ্করিণীর পার পর্য্যন্ত লোকে চসিয়া ফেলিয়াছে। তাহার ফলে দেশের গরুবাছুর মারা যাইতেছে। তাহাদের চরিবার স্থানমাত্র নাই। সাহেব, হিন্দুরা কি সাধে গাভীকে মা ভগবতী বলিয়া পূজা করে এবং গোমাংসভক্ষণ মহাপাতক মনে করে ? দেশের বিশকোটি হিন্দু যদি গোখাদক হইত, তবে এই কৃষিজীবী দেশের গোজাতি লুপ্ত হইয়া কি শোচনীয় অবস্থা হইত ? অবাধ-বাণিজ্যের ফলে একদিকে এরূপে দেশীয়-শিল্প ধ্বংস হইয়াছে।* অন্যদিকে কৃষি-সংখ্যা বাড়িয়াছে, এবং দেশের গরু কঙ্কাল-সার ও খর্ব্বাকৃতি হইয়া ধ্বংস হইতেছে। মোট কথা, এখন ত্রিশকোটি ভারতবাসীর ব্যবসায় চাষ ও চাকরি। অন্নজলের জন্যে হাহাকার করিবে না কেন ?

সা। বিচারপ্রণালীতে কি ক্ষতি হই-তেছে ? এমন সুশাসন ও সুবিচার কি ভারতবর্ষে কখনো ছিল ?

অ। সাহেব, আমাদের ভাষায় আদালত, দেওয়ানি, ফৌজদারি, মকদ্দমা, উকিল, মোক্তার, এ সকল কথা নাই। এ সকল এ দেশে ছিল না। আপনি 'এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের' ইতিহাস পড়িয়াছেন,—ছিল গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত। গ্রামের প্রধান ৫জনে মিলিয়া কেবল ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া গ্রামের সমস্ত বিবাদ মিটাইত। গ্রামের কোন্ জমি কাহার, কাহার সঙ্গে কাহার কি কারবার, কি কথা লইয়া মনান্তর, এই ৫জনে প্রত্যক্ষভাবে জানিত। অতএব কোনো বিবাদ মিটাইতে সাক্ষী, দলিল, কোর্ট-ফি, প্রোসেস্ ফি, উকিল, মোক্তার ও জটিল আইন, কিছুই আবশ্যক হইত না। তাহারা গ্রামের সকল অবস্থা জানিত বলিয়া এবং তাহাদের কাছে বিচার হইত বলিয়া বিবাদও কম হইত। দেশময় শান্তি ও সদ্ভাব বিরাজ করিত। যিনি রাজা হোন না কেন, তাঁহাকে কেবল গ্রামের রাজস্ব দিলেই হইল। গ্রামে চোরডাকাত পড়িলে তাহাদের ধরিয়া রাজ-কর্ম্মচারীর কাছে পাঠাইলেই হইল। এই-জন্যেই ভারতে রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির

* আমাদের কোনো কবি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

"ভারতের তন্ত্ত নীরব সকল ;
দুঃখিনীর লজ্জা রক্ষে ম্যাঞ্চেষ্টার।
লবণাম্বুরাশিবেষ্টিত যে স্থল,
জন্মে লিভারপুলে লবণ তাহার।"

কখনো সংঘর্ষণ হয় নাই। রাজা নিজেও সিংহাসনে সন্ন্যাসিমাত্র ;—প্রজারঞ্জন তাঁহার একমাত্র কর্ম্ম ও ধর্ম্ম। প্রজা জানিত—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"। তাহার ধর্ম্ম--রাজভক্তি। বলুন দেখি, এমন সবল ও সুন্দর স্বায়ত্তশাসন (Home Rule or Republic), এমন রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির সামঞ্জস্য জগতে কোথায়ও আছে কি? আর এখন বিচারক বিদেশী। বিচারালয় গ্রাম হইতে বহুদূরে,—বিদেশে। বিচারক স্থানীয় অবস্থা কিছুই জানেন না। বিচারে যাহার টাকা আছে, যে মিথ্যা সাক্ষী ও ভাল উকিল ও ব্যারিষ্টার দিতে পারে, তাহারই জয়! আইন জটিল। মকদ্দমা মাদকের মত উত্তেজক, এবং তাহার পরিণাম জুয়াখেলার মত অনিশ্চিত। যে একবার ধর্ম্মাধিকরণের ত্রিসীমায় পদার্পণ করে, একবার উকিল, মোক্তার, টর্ণী ও আমলার পাল্লায় পড়ে, তাহার ধর্ম্ম ভ্রষ্ট, অর্থ নষ্ট, মনঃকষ্ট, এ ত্রিবর্গই লাভ হয়। গ্রামে গ্রামে মকদ্দমা, গ্রামে গ্রামে দলাদলি। মকদ্দমায় মকদ্দমায় দেশ উৎসন্ন ও দরিদ্র হইতেছে। অন্নজলের জন্যে হাহাকার উঠিবে না কেন?

আর শাসনপ্রণালী?—তাহার ফলে ভারতবর্ষ নিরস্ত্র। বন্যপশু হইতে কৃষি ও জীবন রক্ষা করিতে ভারতবাসীর সামান্য অস্ত্র পর্য্যন্ত নাই। ভারত ইতিমধ্যেই এরূপ নির্বীর্য্য হইয়াছে যে, আপনাদের নেপাল হইতে সৈন্য-সংগ্রহ করিতে হইতেছে। বীরভূমি পঞ্চনদ ও রাজস্থান আজ বীরহীন। অন্যদিকে ভারতের ৭০কোটি রাজস্বের মধ্যে প্রায় ৫০কোটি বিলাতের ব্যয়ে, সৈন্যবিভাগের ও সিবিল্‌বিভাগের ব্যয়ে প্রত্যেক বৎসর বিলাত চলিয়া যাইতেছে। তাহার উপর অবাধ-বাণিজ্যে ও ঋণে বৎসর কত কোটি যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এরূপে ভারতবর্ষের মত একটি দরিদ্রদেশের উপার্জ্জনের অর্দ্ধাধিক অংশ ভিন্নদেশে চলিয়া গেলে, সে দেশে অন্নজলের হাহাকার উঠিবে না কেন? সে দেশে নিত্য দুর্ভিক্ষ এবং কোটি কোটি লোক দুর্ভিক্ষগ্রাসে মরিবে না কেন? আপনাদেরই অঙ্কপাত—১০বৎসরে ৮০০০০০০ লোক দুর্ভিক্ষে মরিতেছে!

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

ত্রিগুণরহস্য।

পৃথিবীর দুই প্রদেশে দুই তত্ত্ব বিজ্ঞানের চূড়াস্থানীয় মহাতত্ত্ব বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ, পাশ্চাত্যপ্রদেশে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব এবং প্রাচ্যপ্রদেশে ত্রিগুণতত্ত্ব। দোঁহার মধ্যে প্রামাণিক বলবত্তার কিরূপ ইতরবিশেষ, তাহা জানিতে পারা কঠিন নহে। একের গোটাদুই ললাটচিহ্নের সহিত অপরের গোটাদুই ললাট-চিহ্ন জোঁকা দিয়া মিলাইয়া দেখিলেই তাহা জিজ্ঞাসুব্যক্তির জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। অতএব দেখা যা'ক্‌।

মাধ্যাকর্ষণের বলবত্তা স্থূলভূতের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ। স্থূলভূতের গণ্ডির এক-পা বাহিরে যেখানে ঈথরসমুদ্র সূর্য্যচন্দ্রতারকার করাঘাতে মৃদঙ্গধ্বনির ন্যায় তালে-তালে তরঙ্গিত হইতেছে, সেখানে (অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতের অধিকারক্ষেত্রে) মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব হালে পানি পায় না। পক্ষান্তরে, ত্রিগুণতত্ত্বের বলবত্তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আপাদমস্তক এবং অন্তরবাহির জুড়িয়া সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। আবার, কাঙালের কথা যেমন বাসী হইলেই ফলে, ধনোন্মত্ত ব্যক্তির কথা তেম্নি বাসী হইলেই বাঁচিয়া যায়। কোন্ দিন কোন্ আবিষ্কর্ত্তা মাধ্যাকর্ষণের পুরাতন মত উল্টাইয়া-দিয়া কোন্ অশ্রুতপূর্ব্ব নূতন মত বাহির করিবেন—তাহা কেহই জানে না; তখন হয় তো রাজাসুদ্ধ * সবা'রই মুখ হইতে এইরূপ এক নূতন বুলি বাহির হইতে থাকিবে যে, মাধ্যাকর্ষণ একপ্রকার চুম্বক-আকর্ষণ, অথবা তাহা একপ্রকার তৈজস-ব্যাপার বা বৈদ্যুতিক-ব্যাপার বা ঐথরিক-ব্যাপার। পক্ষান্তরে, ত্রিগুণতত্ত্ব যদি উল্টাইবার হইত, তবে এতদিনে উল্টাইয়া-গিয়া মৃত্তিকাগর্ত্তে বিলীন হইয়া যাইত। তাহা হইতে পারে না এইজন্য—যেহেতু ত্রিগুণতত্ত্বের উপদেষ্ট্রী প্রকৃতিমাতা স্বয়ং; চন্দ্রসূর্য্য যতদিন না উল্টায়, ততদিন তাহা উল্টাইবে না—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও। মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব দুই নৌকায় পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—এক নৌকা পরীক্ষা, আর-নৌকা কল্পনা। পক্ষান্তরে, ত্রিগুণতত্ত্বের মধ্যে কোনোপ্রকার কল্পনার গোঁজামিলন নাই—কৃত্রিম কারীকুরি নাই; তাহা ঝর্‌ঝরে পরিষ্কার সাঁচা সামগ্রী। ত্রিগুণতত্ত্বের ভিতরের খবর যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের চক্ষে তাহা কল্পনার স্বপ্ন বই আর কিছুই না। যাঁহাদের চক্ষে আপাতদর্শিতার ঘুমের ঘোর অষ্টপ্রহর লাগিয়া আছে, তাঁহাদের চক্ষে তাহা স্বপ্ন তো বটেই; কিন্তু আমি দেখাইব যে, অপরের চক্ষে ঠিক্ তাহার বিপরীত; দেখাইব যে, জাগ্রৎ-জ্ঞানের চক্ষে তাহা একটা কড়াক্কড় নিক্তির ওজনের প্রামাণিক তত্ত্ব—খাঁটি বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব। অতএব প্রণিধান কর—

আমাদের দেশের একটি প্রাচীন বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধার সহিত মনোনিবেশ করিয়া তোমাকে আমি দেখিতে বলিতেছি এই যে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সত্ত্ব, রজো এবং তমো †, এই তিন গুণের ক্রীড়াক্ষেত্র।

* সংস্কৃত 'সার্দ্ধং' হইতে প্রাকৃত 'সুদ্ধ' জন্মলাভ করিয়াছে। "সার্দ্ধং" কিনা সহিত। "সর্ব্বসুদ্ধ" কিনা সর্ব্বসমেত। "শুদ্ধ-কেবল" বা "শুধু কেবল"—এ শুদ্ধের শ তালব্য শ। এ-শুদ্ধের অর্থ বিশুদ্ধ বা অমিশ্র, ও-সুদ্ধের অর্থ সমেত বা সহিত; প্রভেদ দ্রষ্টব্য।

† বিষদাঁত-ভাঙা সর্পের যেমন ফোঁস্-ফাঁস্ শোভা পায় না, বঙ্গভাষায় তেম্নি শব্দের অন্তস্থিত বিসর্গের উচ্চারণ শোভা পায় না। এ কথাটি পণ্ডিতেরা বোঝেন না বটে-চ, কিন্তু আর সবাই বোঝে। কোনো দরিদ্রসন্তান যদি রাজার কৃপায় সহসা ধন-ঐশ্বর্য্যে ফাঁত হইয়া-উঠিয়া ধরা'কে সরা-জ্ঞান করিতে থাকে, তবে লোকে বলে "উঁহার তমো হইয়াছে।" বাল্যকালে আমি একজন কথকের মুখে শুনিয়াছিলাম "অশ্বথামা হতো ইতি গজো"। আসল সংস্কৃত হ'চ্চে "অশ্বথামা হতঃ—হতি গজঃ"; আর, আসল উচ্চারণ হ'চ্চে "অশ্বথামা হতহ্‌—ইতি গজহ্‌।" "হত" অপেক্ষা হতো হতহ্‌-শব্দের সহিত বেশী মিল খায়, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। এরূপস্থলে পণ্ডিতানুমোদিত প্রথা অপেক্ষা লোকানুমোদিত প্রথা বেশী শুদ্ধ। আমি অশুদ্ধ পণ্ডিতি প্রথা অপেক্ষা বিশুদ্ধ লৌকিকপ্রথা বেশী পছন্দ করি, তাই বলিবার সময় বলি এবং লিখিবার সময় লিখি তমো, রজো, মনো, সরো ইত্যাদি।

প্রশ্ন। সত্ত্বগুণের সত্ত্ব-শব্দটা গুণের কোটায় উড়িয়া-আসিয়া-জুড়িয়া বসিয়াছে, তাহা তো দেখিতেছি; কিন্তু কোথা হইতে যে তাহা আসিল, তাহার বাষ্পও আমি বুদ্ধিতে হাৎড়াইয়া পাইতেছি না।

উত্তর। সত্ত্ব-শব্দ কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহা চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই তো পারো; তবে কেন চক্ষু বুজিয়া এদিক্-ওদিক্ হাৎড়াইয়া বেড়াও? সত্ত্বশব্দ কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহাই যেন তুমি জানো না; কিন্তু মনুষ্যত্ব কোথা হইতে আসিয়াছে—তাহা তো আর তোমার অবিদিত নাই। মনুষ্যের যেমন মনুষ্যত্ব, সতের তেমনি সত্ত্ব। এমন যদি কোনো গুণ থাকে, যাহার বিদ্যমানতার বলেই মনুষ্য মনুষ্য, আর যাহার অবিদ্যমানে মনুষ্য মনুষ্য হইয়াও মনুষ্য নহে, তবে তাহারই নাম যে মনুষ্যত্ব—এটা অবশ্য তুমি জানো; এটাও তেম্নি তোমার জানা উচিত যে, এমন যদি কোনো গুণ থাকে, যাহার বিদ্যমানতা'র বলেই সৎ সৎ, এবং যাহার অবিদ্যমানে সৎ সৎ হইয়াও সৎ নহে, তবে তাহারই নাম সত্ত্বগুণ। সৎ যদি মূলেই প্রকাশ না পা'ন; না তাঁহার আপনার নিকটে, না অন্যের নিকটে, কাহারো নিকটে, কস্মিন্‌কালেও যদি তাঁহার প্রকাশের সম্ভাবনা না থাকে, তবে তিনি থাকিয়াও নাই। সংশব্দের মূলধাতু অস্‌ধাতু, অস্‌ধাতুর অর্থ থাকা; যিনি আছেন, তিনিই সৎ; আর, তিনিই সংরূপে প্রকাশ পা'ন; তিনি যদি মূলেই প্রকাশ না পা'ন, তবে তিনি থাকিয়াও নাই—সৎ হইয়াও সৎ নহেন। তবেই হইতেছে যে, প্রকাশই সেই গুণ, যাহার বিদ্যমানতায় বলে সৎ সৎ এবং যাহার অবিদ্যমানে সৎ সৎ হইয়াও সৎ নহেন। অতএব এটা স্থির যে, সতের প্রকাশই সতের সত্ত্ব, প্রকাশগুণই সত্ত্বগুণ। শাস্ত্রে বলেও তাই। সব শাস্ত্রই একবাক্যে বলে যে, প্রকাশই সত্ত্বগুণের বৈশেষিক পরিচয়লক্ষণ।

এই সঙ্গে আর-দুইটি কথা দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, নৈশ অন্ধকারের প্রতিযোগে যেমন দীপালোক পরিস্ফুট হয়, অপ্রকাশের প্রতিযোগে তেম্নি প্রকাশ পরিস্ফুট হয়; আবার রাত্রিকালে শয়নঘরের প্রদীপ নিভিয়া যাইবার সময় আলোকের প্রতিযোগে যেমন অন্ধকার পরিস্ফুট হয়, তেম্নি প্রকাশের প্রতিযোগে অপ্রকাশও প্রকাশ পাইয়া উঠে। ঘনঘটাচ্ছন্ন দ্বিপ্রহর নিশীথে যেমন বিদ্যুৎস্ফুরণের সঙ্গে-সঙ্গে আলোক এবং অন্ধকার দোঁহে দোঁহার প্রতিযোগে অভিব্যক্ত হয়, আর, সেই সময়ে যেমন ভেকধ্বনির উত্থান-পতনের সঙ্গে-সঙ্গে ধ্বনি এবং নিস্তব্ধতা দোঁহে দোঁহার প্রতিযোগে অভিব্যক্ত হয়, তেম্নি, প্রকাশ এবং অপ্রকাশ দোঁহে দোঁহার প্রতিযোগে অভিব্যক্ত হয়। পৃথিবীর যেমন একপিঠে আলোক, আর-এক পিঠে অন্ধকার, প্রকাশমাত্রেরই তেম্নি একপিঠে প্রকাশ, আর-এক পিঠে অপ্রকাশ; তা বই, ন্যূনাধিক অপ্রকাশের সহিত একেবারেই সম্পর্কশূন্য শুধু-প্রকাশ অসম্ভব। তোমার নয়ন-মন যদি জন্মাবধি একাল পর্য্যন্ত নিদ্রা, তন্দ্রা, পলকপাত, আলস্য এবং অবসাদ কাহাকে বলে, তাহা না জানিত; তোমার চক্ষু যদি মীনচক্ষু'র ন্যায় চিরোন্মীলিত হইত, আর সেই সঙ্গে তোমার মন যদি রাজদ্বারের সিপাহীর ন্যায় অনবরত তোমার চক্ষুর

দেউড়িতে দাঁড়াইয়া অপ্রমত্তভাবে পাহারা দিত; আর, যদি তোমার সেই চিরাবহিত নয়নের সম্মুখে জলস্থল-আকাশ-অন্তরীক্ষ হইতে, তথৈব স্থাবর-জঙ্গম, নির্জ্জীব-সজীব, চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং বসনভূষণ হইতে ক্রমাগতই হ্রাসবৃদ্ধি-বিহীন, ছায়াবিহীন, বৈচিত্র্যবিহীন একরঙা আলোক বাহির হইত, তাহা হইলে তোমার এখনকার এ অবস্থায় তুমি এই যে বলিতেছ—

"যেমন চোক তেম্নি আলো
জুড়ি মিলিয়াছে ভালো!"

তাহা তো তুমি বলিবেই; কিন্তু তোমার তখনকার সে অবস্থায় তুমি দেখিতে যে কিরূপ দৃশ্য—সেইটিই জিজ্ঞাস্য। অন্ধের নিকটে যেমন দিবা-রাত্রি দুইই সমান, তোমার সে-অবস্থায় তোমার নিকটে তেম্নি আলোক-অন্ধকার দুইই সমান হইত। কোনো পাগল যদি চুনকাম-করা ধব্‌ধবে প্রাচীরের গায়ে শাদা খড়ি দিয়া বাড়ীর নম্বর দাগে, তাহা হইলে যেমন শাদা'য় শাদা ডুবিয়া মরে, তেম্নি তোমার সে-অবস্থার চক্ষের সাম্‌নে আলো'য় আলো ডুবিয়া মরিত—তাহার কণামাত্রও তোমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ভোগে আসিত না। তাহা হইলে ফলে দাঁড়াইত এই যে, তুমি চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, আর, জগৎসংসার আলোকের মাঝখানে থাকিয়াও অন্ধকার। অতএব এটা স্থির যে, প্রকাশের সঙ্গে কোনো-না-কোনো অংশে অপ্রকাশের অঞ্জন বা বিপ্রকাশের রঞ্জন লাগিয়া থাকা চাই-ই-চাই, তা নহিলে প্রকাশের প্রকাশত্ব রক্ষা পাইতে পারে না।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, বিহিত প্রকরণ-পদ্ধতির সোপান না মাড়াইয়া কোনো বিষয়ই অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে সমুত্থান করিতে পারে না। তুমি যদি কিলাইয়া কাঁঠাল পাকাইতে যাও, তবে কিছুতেই তাহা তুমি পারিয়া উঠিবে না। কিরূপ প্রক্রিয়ার যোগ-সাযোগে কাঁঠাল পাকাইতে হয়—কাঁঠাল-গাছই তাহা জানে, আর, সেইজন্য তাহারই তাহা কাজ। সব গুণই যেমন ক্রিয়া'র ফল (সংক্ষেপে—কর্ম্মফল), প্রকাশ এবং অপ্রকাশ গুণও তাই। যাহা প্রকাশ হয়, তাহা ক্রিয়া-যোগেই প্রকাশ হয়; যাহা অপ্রকাশ হয়, তাহা কর্ম্মোদ্যম গুটাইয়াই অপ্রকাশ হয়। প্রকাশিতব্য বিষয়ের আপাদমস্তক সব'টাই যদি এক উদ্যমেই প্রকাশ পাইয়া চোকে, তাহা হইলে অপ্রকাশ একা'ই যে কেবল ঘুচিয়া যায় তাহা নহে, অপ্রকাশের প্রতিযোগিতার অভাবে প্রকাশের প্রকাশত্বও সেইসঙ্গে ঘুচিয়া যায়। ঘোড়সোয়ার যদি ঘোড়া'র রাশ একেবারেই ছাড়িয়া দ্যায়, তবে ঘোড়া উচ্ছৃঙ্খলবেগে ছুটিতে আরম্ভ করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া ফেলিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে; আবার, ঘোড়সোয়ার যদি মাত্রাতীত বলের সহিত রাশ টানিয়া ধরিয়া থাকে, তাহা হইলে ঘোড়া চলৎশক্তিরহিত হইয়া যায়। এইজন্য ঘোড়সোয়ার পরিমাণসঙ্গত বলের সহিত রাশ টানিয়া-ধরিয়া উদ্যমের পিছনে সংযমের এবং সংযমের পিছনে উদ্যমের ভার লাগাইতে থাকে; আর, সেইরূপ যথাসঙ্গত উদ্যম এবং সংযমের পর্য্যাবর্ত্তনের প্রভাবে ঘোড়া ঠিক্-পথে চলিতে থাকে। এইরূপ লাগ্‌মাফিক পর্য্যায়ক্রমে উদ্যম এবং সংযম খাটাইয়া প্রকাশকে অপ্রকাশের ব্যাড়া দিয়া সীমার

মধ্যে বাঁধিয়া রাখা চাই, তবেই প্রকাশের, প্রকাশত্ব অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। প্রকাশকে যখন যথাবিহিত সীমার মধ্যে আগলাইয়া-রাখিয়া তাল-মান-লয়-সঙ্গত শোভনভাবে চলিতে দেওয়া হয়, তখন প্রকাশের অভাবের (অর্থাৎ অপ্রকাশের) প্রতিযোগে প্রকাশের ভাব প্রকাশ পায়; প্রকাশের সদ্ভাবের প্রতিযোগে প্রকাশের অভাব প্রকাশ পায়; আর, প্রকাশের ভাব এবং অভাব দুয়েতেই ক্রিয়াশক্তির প্রভাব প্রকাশ পায়;—প্রকাশের আবির্ভাবে ক্রিয়াশক্তির উদ্যম প্রকাশ পায়; প্রকাশের তিরোভাবে ক্রিয়াশক্তির সংযম প্রকাশ পায়। আবির্ভাব-তিরোভাব ভাবাভাবেরই ওলোট্-পালোট্; অভাব হইতে ভাবে উত্থান করার নাম আবির্ভাব; ভাব হইতে নামিয়া-পড়িয়া অভাবে পরিসমাপ্ত হওয়ার নাম তিরোভাব। এই প্রসঙ্গে একটি উদ্ভট শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না; শ্লোকটি অতি চমৎকার; তাহা এই—

"মণিনা বলয়ং বলয়েন মণির্মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ।
পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ।
শশিনা চ নিশা নিশয়া চ শশী শশিনা নিশয়া চ বিভাতি নভঃ।
কবিনা চ বিভুর্বিভুনা চ কবিঃ কবিনা বিভুনা চ বিভাতি সভা।

বলয়ে শোভয়ে মণি, মণিতে বলয়।
বলয়ে মণিতে শোভে করকিশলয়॥
কমলে সলিল শোভে সলিলে কমল।
কমলে সলিলে শোভে সরো নিরমল॥
সুধাকরে শোভে রাতি, রাত্রে সুধাকর।
নিশি'তে শশি'তে শোভে বিমল অম্বর॥*
নৃপপাশে শোভে কবি, কবিপাশে ভূপ।
কবি-নরনাথে সভা শোভে অপরূপ॥"

শোভার সম্বন্ধে এ যেমন বলিলেন কবি, প্রকাশের সম্বন্ধে তেমি বলিতে পারে সত্যের সেবক—

ভাবে ভায় অভাব, অভাবে ভায় ভাব।
সর্ব্ব ভাবাভাবে ভায় সত্যের প্রভাব।

কিন্তু তুমি ডাক্তারমানুষ; তুমি কবিতা চাও না—তুমি চাও হাড়মাস-কাটা বৈজ্ঞানিক-প্রমাণ: তা বেশ্! আমার পাথেয়-সম্বলের থল্‌লিতে পথ-চলতি-গোচের বৈজ্ঞানিক-প্রমাণও কতক-কতক সংগ্রহ করা আছে; তাহা দেখাইতেছি, প্রণিধান কর—

সমুদ্রের তরঙ্গ মাথা উঁচু করিয়া তট-ভূমিতে ঢু হানে, ঢু হানিয়াই অবনতমস্তকে পাছু হটে। ঢু-প্রহারের সংরম্ভ-কালে গর্জ্জনধ্বনি উত্থিত হয়; ঢু-প্রহারের বিরাম-কালে গর্জ্জনধ্বনি থামিয়া যায়; ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, একা কেবল গর্জ্জনধ্বনি নহে—পরন্তু গর্জ্জনধ্বনিও যেমন, গর্জ্জনধ্বনির বিরামও তেমি—দুইই একজোট হইয়া পালাক্রমে মুহুর্মুহু কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, আর, সেই গর্জ্জনধ্বনির ভাবাভাবের সমবেত কার্য্যকারিতায় গর্জ্জনধ্বনির অবিরত ধারা শ্রোতার শ্রবণগোচরে প্রকাশ পাইতে

* লৌকিকপ্রথার অনুরোধে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে 'নিশা'র স্থানে 'নিশি' হয়, এবং "শশী'তে"র স্থানে শশি'তে হয়।

থাকে। বিজ্ঞানের এটা একটা ধ্রুবসিদ্ধান্ত যে, বায়ুর তরঙ্গ শ্রবণপটহে হিল্লোল হানিবার সময়—ঠিক্ যেন সমুদ্রের তরঙ্গ ঢু হানিতেছে, আর ঢু হানিয়াই পাছু হটিতেছে—এইভাবে একবার এগোয় এবং একবার পিছোয়; ইহাতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ধ্বনির প্রকাশ ধ্বনির ভাবাভাবের (অর্থাৎ হওয়া-যাওয়ার) মুহুর্মুহু পর্য্যাবর্ত্তনের উপরে (অর্থাৎ ওলোট্‌পালোটের উপরে) ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আলোকের প্রকাশও যে, ঐরূপ ভাবাভাবরূপী দুই নৌকায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ এই যে, বায়ু-তরঙ্গের এগোনো-পিছোনো'র ন্যায় ঈথর-তরঙ্গের উত্থানপতনও ক্রিয়াশক্তির উদ্যম সংযমের ওলোট্‌পালোট্। এইরূপ দেখা যাই-তেছে যে, প্রকাশগুণের সঙ্গে আর-দুইটি গুণ অপরিহার্য্যরূপে জড়িত রহিয়াছে; একটি হ'চ্চে অপ্রকাশ অর্থাৎ প্রকাশের প্রতিবন্ধক-রূপী জড়তাগুণ, * এবং আর-একটি হ'চ্চে শক্তির প্রভাব অর্থাৎ প্রকাশের সোপানরূপী ক্রিয়াগুণ। এই যে তিন গুণ—প্রকাশ, ক্রিয়া এবং জড়তা, ইহাই পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রে সত্ত্বরজস্তমোগুণ নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে (সাধনপাদ ১৮শ সূত্র দেখ)। এতক্ষণ ধরিয়া যাহা পর্য্যালোচনা করা গেল, তাহাতে এটা বেশ্ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, প্রকাশ-মাত্রই শাদা-কালো জুড়ি হাঁকাইয়া মনোদ্বারে উপনীত হয়; আর, সেই সময়ে সারথি একহাতে রাশ বাগাইয়া ধরিয়া থাকে এবং আর-এক হাতে চাবুক মুঠাইয়া-ধরিয়া তাহা মৃদুমন্দভাবে তালে-তালে হেলাইতে থাকে। জুড়িঘোড়া হ'চ্চে প্রকাশের ভাবাভাব, আর সারথি হ'চ্চে শক্তির প্রভাব; চাবুক এবং রাশ আর-কিছু না—ক্রিয়ার উদ্যম এবং সংযম। মোট কথা এখানে যাহা দ্রষ্টব্য, তাহা এই যে, নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সত্ত্ব, রজো এবং তমোগুণের অর্থাৎ প্রকাশ, ক্রিয়া এবং জড়তা'র (inertia'র) যোগাযোগের ব্যাপার; আর, সেই সঙ্গে এটাও দ্রষ্টব্য যে, এক অদ্বিতীয় ধ্রুবসত্যের শক্তির প্রভাব সেই যোগাযোগের প্রবর্ত্তক এবং নিয়ামক। একই অদ্বিতীয় সত্যের শক্তির প্রভাব অনাদি ভূত-কাল হইতে প্রত্যেক বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত একই নিয়মে কার্য্য করিয়া আসিতেছে, এবং সেই একই নিয়মে প্রত্যেক বর্ত্তমানকাল হইতে ভবিষ্যতে পদনিক্ষেপ করিয়া চলিতেছে। সেই যে একই নিয়ম, তাহা একই মহাজ্ঞানে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত, আর, প্রতি বর্ত্তমান হইতে সেই যে ভবিষ্যতে পদনিক্ষেপ, তাহা একই মহাশক্তির নিত্য-ক্রিয়া। পৌরাণিক ভাষায়—ধ্রুবজ্ঞানরূপী শিবের বক্ষে বা অটল মহাকালের বক্ষে, মহাশক্তি বা কালতরঙ্গরূপিণী কালী নৃত্য করিতেছেন। ফলে, বর্ত্তমানমাত্রই হওয়া হইতে যাওয়াতে এবং যাওয়া হইতে হওয়াতে, আবির্ভাব হইতে তিরোভাবে এবং তিরোভাব হইতে আবির্ভাবে ক্রমাগতই ঘুরিয়া বেড়ায়; আর, ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়াই তাহার নাম হইয়াছে বর্ত্তমান। "বর্ত্তমান"

* সাংখ্যের মতে কার্য্য এবং কারণের মধ্যে বস্তুত কোনো প্রভেদ নাই; এইজন্য সাংখ্য-পাতঞ্জলের দৃষ্টিতে, অপ্রকাশরূপী অন্ধকার এবং প্রকাশের প্রতিবন্ধকরূপী জড়তা যাহা সেই অপ্রকাশের কারণ, এ দুয়ের একটিও যা, আর-একটিও তা, একই; অপ্রকাশও যা, জড়তাও তা, একই।

কিনা বৃত্তিমান্। বর্ত্তম, আবর্ত্তন, আবর্ত্ত (=vortex=বর্ত্ত ex), বৃত্ত (=চক্র), বৃত্তি, এ সমস্তই বৃৎধাতুর সন্তান-সন্ততি। বৃৎ-ধাতুর মৌলিক অর্থ একপ্রকার চক্রবর্ত্তন অর্থাৎ চক্রবৎ ঘুরিয়া বেড়ানো, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। বৃত্তিমাত্রই (ক্রিয়ামাত্রই) উদ্যম হইতে অবসানে এবং অবসান হইতে উদ্যমে চক্রবৎ ঘুরিয়া বেড়ায়। বর্ত্তমানমাত্রই চল্‌তি-নৌকা। কোনো বর্ত্তমানই নোঙর করিয়া একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নাই। এক বর্ত্তমান হইয়া যাইতেছে, আর-এক বর্ত্তমান হইয়া দাঁড়াইতেছে, তৃতীয় বর্ত্তমান হ'ব-হ'ব করিতেছে। সব বর্ত্তমানের মধ্যে যিনি এক-বর্ত্তমান, তিনিই নিত্য-সত্য। বর্ত্তমানে বর্ত্তমানে যাহা যাহা প্রবর্ত্তিত হইতেছে, সেই নব নব ক্রিয়ার নব নব উদ্যম চিরবর্ত্তমান জ্ঞানের নিয়মে নিয়মিত হইতেছে। একই জ্ঞানের নিয়মে এবং একই শক্তির প্রভাবে প্রতি বর্ত্তমান প্রবর্ত্তিত হইতেছে; বর্ত্তমান ক্রিয়ার উদ্যম প্রতিক্ষণে জড়তাশৃঙ্খলদ্বারা বিহিত সীমার মধ্যে বাঁধিয়া রাখা হইতেছে। ক্রিয়াশক্তি একবার উদ্যম প্রকাশ করিয়া বাধা অতিক্রম করিতেছে, একবার উদ্যম সংবরণ করিয়া বাধা'কে আপনার উপরে কার্য্য করিতে দিতেছে। এইরূপে সংসমুদ্রে ক্রিয়াতরঙ্গের উত্থান-পতন হইতেছে; আর, সেই ক্রিয়াতরঙ্গের মস্তকের উপরে উত্থান-পতনের সন্ধিস্থলে প্রকাশরূপী ফেণরাজি উদ্বেল হইতেছে। একই অখণ্ড অনাদ্যন্ত জ্ঞানের সর্ব্বতঃপ্রসারিত বক্ষের উপরে একই মহাশক্তি সত্বরজস্তমোগুণের ত্রিপদীছন্দে নৃত্য করিতেছেন। এক-দিকে অনাদ্যন্ত অখণ্ড মহাকাল, এবং আর একদিকে অচিন্ত্য আদি হইতে অচিন্ত্য অন্ত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান-মুহূর্ত্তের তরঙ্গমালা, এ দুই বৃহৎ ব্যাপার দুই নহে, পরন্তু একই; সাঙ্কেতিক ভাষায়—

অনাদ্যন্ত অখণ্ড মহাকাল = অচিন্ত্য আদি ... + মুহূর্ত্ত + মুহূর্ত্ত + মুহূর্ত্ত + ... অচিন্ত্য অন্ত।

দুয়ের অচিন্ত্য ভেদাভেদ অস্বীকার করিবারও উপায় নাই, ধারণার মধ্যে আঁক্‌ড়াইয়া পাইবারও উপায় নাই। এই অচিন্ত্য ভেদাভেদের সঙ্গমতীর্থে যোগী মহাপুরুষেরা আনন্দে ভোর হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া যান।

নদীনালার মৎস্যের পক্ষে অগাধসমুদ্রে সাঁতার খেলিয়া বেড়ানো বেশীক্ষণ চলে না; এইজন্য, বিদ্যালয়ের বালক যেমন ক্ষুদ্র মানচিত্রে চক্ষু বুলাইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ সহজ প্রণালীতে একটি অতি যৎ-সামান্য ক্ষুদ্র বিষয়ের আদি-অন্ত-মধ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সত্বরজস্তমোগুণের বিশ্বব্যাপী পর্য্যাবর্ত্তন-প্রণালীর ভাব বুঝিতে চেষ্টা করা যা'ক।

এটা সকলেরই জানা কথা যে, অতি একটি ক্ষুদ্রবিষয়ও যখন আমাদের ধারণাতে প্রকাশলাভ করে, তখন তাহা যথাবিহিত প্রকরণপদ্ধতির সোপান মাড়াইয়াই প্রকাশে উত্থান করে, তা বই, হুড়ুত করিয়া প্রকাশে চড়িয়া বসে না।

প্রশ্ন। তোমার ও-কথাটিতে আমার মন সহসা সায় দিতে পারিতেছে না। একটি প্রত্যক্ষ-ঘটনা তোমাকে শুবে বলি; পরের সাক্ষাতে যদি-চ তাহা প্রকাশ করিতে বারণ, কিন্তু তুমি তো আর আমার পর নহ—তোমার সাক্ষাতে তাহা বলিতে দোষ নাই। আমার

মনে পড়ে—যখন আমাদের কুলগুরু আমার কর্ণে হ্রীংমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তখন হ্রীং-শব্দটি একই অখণ্ড মুহূর্ত্তে আমার শ্রবণ-গোচরে প্রকাশলাভ করিয়াছিল, তা বই, কোনোপ্রকার প্রকরণপদ্ধতির সোপান মাড়াইয়া তাহা আমার ধারণাতে অধিরূঢ় হয় নাই।

উত্তর। আমাদের দেশের প্রাচীন দর্শন-শাস্ত্রে একটি প্রসিদ্ধ ন্যায়ের উল্লেখ মাঝে-মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার নাম "উৎপল-শতপত্র-ভেদ ন্যায়।" কথাটা এই—একশত পদ্মপত্র গায়ে-গায়ে মিলাইয়া লপেট্‌ভাবে উপর্য্যুপরি বিছাইয়া-রাখিয়া সেই শতপত্রের গুচ্ছটাকে যদি একটা তীক্ষ্ণ লৌহ-শলাকা দিয়া এক মুহূর্ত্তে এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া বিঁধিয়া ফ্যালা যায়, তাহা হইলে প্রশ্ন একটি উত্থাপিত হইতে পারে এই যে, ঐ পত্র-শতকের মধ্যস্থিত পৃথক্-পৃথক্ এক-একটি পত্রের দু-ফোঁড় হইয়া যাইতে সময় লাগিয়াছে কতটুকু? এ কথা তুমি বলিতে পারো না যে, তাহাতে একটুও সময় লাগে নাই; অবশ্যই তাহাতে একটু-না-একটু সময় লাগিয়াছে; তবে কিনা, তাহা এত অল্পসময় যে, তাহা ধারণাতে উপলব্ধি করা তোমারও কর্ম্ম নহে, আমারও কর্ম্ম নহে; কিন্তু সেই ধারণাতীত অল্পসময়টুকুও যে কালাংশ, তাহা যে, এক মুহূর্ত্তের শতাংশের একাংশ, সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই। এখন, দেখিতে হইবে এই যে, যেমন ১০০ পত্র = ১+১+১+১+ইত্যাদি, তেম্নি হ্রীং = হ্ + র্ + ঈ + ং। এই সঙ্গে আর-একটি কথা দ্রষ্টব্য এই যে, দুই হ্রস্ব ই যেমন সন্ধিসূত্রে গ্রথিত হইয়া এক দীর্ঘ ঈ হয়, তেম্নি দুই দ্রুত ই (অর্থাৎ গিট্‌কিরি খেলাইবার সময় গায়ক যেরূপ দ্রুতবেগে ই উচ্চারণ করে, সেইরূপ দ্রুতবেগে উচ্চারিত দুই ই) সন্ধিসূত্রে গ্রথিত হইয়া এক হ্রস্ব ই হয়। দ্রুত ই সাঁটে লেখা যা'ক্ (ই্) এইরূপ করিয়া। এমতে দাঁড়াইতেছে ঈ = ই + ই = ই্ + ই্ + ই্ + ই্, তবেই হই-তেছে যে, হ্রীং = হ্ + র্ + ই্ + ই্ + ই্ + ই্ + ং। হ্রীং শব্দের ঐ সাতটি অবয়ব (হ্, র্, ই্, ই্, ই্, ই্, ং এই সাতটি অবয়ব) একটার পর আর-একটা তোমার কর্ণকুহরে পরে-পরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। অতএব, তুমি এই যে মনে করিতেছ—হ্রীংশব্দ এক অখণ্ড মুহূর্ত্তে তোমার শ্রবণে প্রকাশলাভ করিয়াছিল, এটা তোমার ভ্রম বই আর কিছুই নহে। ঘটিয়াছিল যাহা, তাহা এই—

মন্ত্রগ্রহণের পূর্ব্বক্ষণে হ্, (অর্থাৎ হসন্ত হ) তোমার শ্রবণগোচরে উপস্থিত ছিল না। মন্ত্রোচ্চারণের প্রথম উপক্রমেই হ্ (হসন্ত হ) তোমার শ্রবণগোচরে আবির্ভূত হইল—আবির্ভূত হইয়াই তিরোভূত হইল। তিরোভূত তো হইল, কিন্তু তিরোভূত হইয়া—গেল কোথায়? সর্প যেমন সাপুড়িয়ার হস্ত হইতে সরিয়া-পলাইয়া চুব্‌ড়িতে ঢুকিয়া বিশ্রাম লভে, হসন্ত-হ তেম্নি ধারণার হস্ত হইতে সরিয়া-পলাইয়া সংস্কার-গহ্বরে ঢুকিয়া বিশ্রাম লভিল। এইরূপে হ্রীংশব্দের সাতটি সৃষ্টি-অবয়ব একে-একে আবির্ভূত-তিরোভূত হইয়া সংস্কার-গহ্বরে নিলীন হইল; তাহাদের কোনোটাই স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ লভিতে পারিল না; স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ লভিবে কেমন করিয়া?

হ্, র্, ই্ বা ং স্বতন্ত্ররূপে উচ্চারণ কর দেখি ;—সহস্র চেষ্টা করিলেও কিছুতেই তাহা তুমি পারিয়া উঠিবে না। যাহা স্বতন্ত্ররূপে মুখে উচ্চারণই করা যায় না, তাহা স্বতন্ত্ররূপে ধারণাতে প্রকাশ পাইবে কেমন করিয়া ? কেমন করিয়া তবে হ্রীংশব্দ ধারণাতে প্রকাশ-লাভ করিল ? ইহার উত্তর এই যে, যেমন করিয়া ছোটো ছেলেরা পাঠ্যশব্দ বানান করিয়া পাঠ করে—তেম্নি করিয়া! কালিদাস-শব্দ পাঠ করিবার সময় ছেলেরা বলে —"ক'এ আকার কা, ল'এ ইকার লি, দ'এ আকার দা, দন্ত্য স, কালিদাস।" পড়ুয়া-বালক যখন বলিতেছে "ল'এ ইকার লি", তখন "ক'এ আকার কা" তাহার মন হইতে সরিয়া পলাইয়াছে ; যখন বলিতেছে "দ'এ আকার দা", তখন "ক'এ আকার কা, ল'এ ইকার লি" তাহার মন হইতে সরিয়া পলাইয়াছে ; যখন বলিতেছে "দন্ত্য স", তখন "ক'এ আকার কা, ল'এ ইকার লি, দ'এ আকার দা" তাহার মন হইতে সরিয়া পলাইয়াছে। এইরূপে যখন সব ক'টা অক্ষরই সংস্কার গহ্বরে পলাইয়া বসিয়া রহিল, তখন বালকটি পিছন ফিরিয়া তাহাদিগকে সংস্কারের অন্ধকূপ হইতে স্মরণে টানিয়া-তুলিয়া সব-ক'টাকে যোগসূত্রে বাঁধিয়া একচোটে বলিল "কালিদাস।" কখনো-কখনো এমনও ঘটে যে, একটি অন্যমনস্ক ছেলে দন্ত্য স বলিয়াই খেই হারাইয়া-ফেলিয়া "কালিদাস" গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না। তেম্নি, গুরু যখন তোমার কানে মন্ত্র দিতে-ছিলেন, তখন যদি তোমার মন আর-এক দিকে থাকিত, তাহা হইলে তুমি তাহা শুনিয়াও শুনিতে পাইতে না। সমগ্র কালিদাসশব্দ যেমন করিয়া পড়ুয়া-বালকের ধারণাতে অধিরূঢ় হয়, হ্রীংশব্দ ঠিক্ তেম্নি করিয়া তোমার ধারণাতে অধিরূঢ় হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। হ্রীংশব্দের ব্যষ্টি-অবয়বগুলা তোমার মন হইতে একে-একে সরিয়া-পলাইয়া তোমার প্রাণের (অর্থাৎ অব্যক্ত চেতনের) যে জায়গাটিতে মাথা গুঁজিয়া লুকাইয়া ছিল, সেই তমোগুণপ্রধান সংস্কার-গহ্বরে সত্ত্বগুণপ্রধান জ্ঞানের আলোক নিপতিত হইবামাত্র ঐ ব্যষ্টি-অবয়বগুলা একযোগে হ্রীংবেশে সাজিয়া বাহির হইয়া তোমার ধারণাতে সোয়ার হইয়া বসিল। সত্ত্বগুণের আলোকরশ্মিকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার কর্তা কে ? তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার কর্তা সেই জ্ঞানর্ঘ্যাসা মন—ইতিপূর্ব্বে যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে ঈশনা। আনুপূর্ব্বিক তিনটি বিষয়ের সন্ধান পাওয়া গেল এইরূপ—

(১) প্রকাশিতব্য বিষয়ের ব্যষ্টি-উপাদান-গুলি প্রথমে প্রাণের অব্যক্ত-চেতনে তমো-গুণের জড়তাশৃঙ্খলে বাঁধা থাকে। এই অবস্থায়, সেই ব্যষ্টি-উপাদানগুলি অব্যক্ত-সংস্কারমাত্র। তা'র সাক্ষী—হ্, র্, ই্, ং এই ব্যষ্টি-উপাদানগুলির কোনোটিই স্বতন্ত্ররূপে মুখে উচ্চারণ করাও যায় না, শ্রবণে উপলব্ধি করাও যায় না।

(২) রজোগুণের ক্রিয়াচাপল্যে সেই অব্যক্ত ব্যষ্টি-উপাদানগুলি মনের অর্দ্ধস্ফুট-চেতনে একে-একে আবির্ভূত-তিরোভূত হইয়া প্রকাশে উত্থান করিবার জন্য উড়ু-উড়ু করিতে থাকে। তার সাক্ষী—হসন্ত হ (হ্) যখন আবির্ভূত হইয়াই তিরোভূত হইল, তখন

তাহা প্রকাশে ওঠো-ওঠো করিয়া উঠিতে পারিল না। একা কেবল হ্‌ না, হ্‌, র্‌, ই্‌, ই্‌, ই্‌, ই্‌, ং এই সাত ব্যষ্টি-উপাদানের সবস্ক'টাই ঐরূপ প্রকাশে ওঠো-ওঠো করিল; কিন্তু উহাদের স্থিতিকালের ক্ষণিকত্ব-এবং-অস্থিরতা-গতিকে উহাদের কোনোটাই প্রকাশে আসন জমাইয়া বসিতে অবসর পাইল না। প্রকাশে উঠিবার জন্য এই যে উড়ু-উড়ু ক্রিয়া—ইহা রজোগুণপ্রধান প্রাণঘঁ্যাসা মনের বাসনামাত্র।

(৩) রজোগুণপ্রধান বা ক্রিয়াপ্রধান প্রাণঘঁ্যাসা মনের বাসনা উড়ু-উড়ু করিতে-করিতে যখন সত্ত্বগুণের প্রকাশালোকের সংস্পর্শ লাভ করে, তখন তাহা জ্ঞান-ঘঁ্যাসা ঈশনামূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্যষ্টি উপাদান-গুলিকে সংযোগসূত্রে গাঁথিয়া-ফেলিয়া জ্ঞানের সুব্যক্তচেতনে উঠাইয়া লয়। তার সাক্ষী, হ্‌+র+ই্‌+ই্‌+ই্‌+ই্‌+ং=হ্রীং। সুব্যক্ত, অর্দ্ধব্যক্ত এবং অব্যক্ত চেতনের সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা দেখানো হইয়াছে, আর, সত্ত্ব, রজো এবং তমোগুণের সম্বন্ধে এক্ষণে যাহা দেখানো হইল, তাহাতে এটা বেশ্‌ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সুব্যক্ত-চেতন-ক্ষেত্রে সত্ত্বগুণের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব, অর্দ্ধস্ফুট-চেতন ক্ষেত্রে রজোগুণের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব, অব্যক্ত চেতন-ক্ষেত্রে তমোগুণের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব। ইহার একটি চুম্বক হস্তলিপি এইরূপ—

চেতন-ক্ষেত্র	গুণ	পরিচয়লক্ষণ
সুব্যক্তচেতন—জ্ঞান	সত্ত্ব	প্রকাশ
অর্দ্ধস্ফুটচেতন—মন	রজো	ক্রিয়া
অব্যক্তচেতন—প্রাণ	তমো	জড়তা

সত্ত্বরজস্তমোগুণের সম্বন্ধে দুইটি কথা সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, সত্ত্বগুণের প্রকাশ-ক্ষেত্রেও যেমন, রজোগুণের ক্রিয়াক্ষেত্রেও তেমনি, তমোগুণের জড়তাক্ষেত্রেও তেমনি, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনগুণ একসঙ্গে বাস করে এবং একসঙ্গে কাজ করে; প্রভেদ কেবল এই যে, সত্ত্বগুণের প্রকাশক্ষেত্রে সত্ত্বগুণ অপর দুই গুণকে মাথা তুলিতে না দিয়া আপনি তাহাদের মাথা হইয়া দাঁড়ায়। রজোগুণের ক্রিয়াক্ষেত্রে রজোগুণ অপর দুই গুণকে দাবিয়া-রাখিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। তমোগুণের জড়তাক্ষেত্রে তমোগুণ অপর দুই গুণের উপরে প্রভু হইয়া দাঁড়ায়। একসঙ্গে থাকে সবাই সর্ব্বত্র;—তবে কিনা, কোথাও বা কেহ সিংহাসনের পায়ের নীচে, কোথাও বা কেহ সিংহাসনের মাথার উপরে, কোথাও বা কেহ সিংহাসনের মাঝের জায়গায়, আসন পাড়িয়া বসিয়া যায়। যেখানে যে গুণ সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠান করে, সেখানে সেই গুণেরই নাম কীর্ত্তিত হয়, অপর দুই গুণ গণনার মধ্য হইতে বাংকৃত হয়। এমতে দাঁড়াইতেছে এই যে, সত্ত্বপ্রধান ত্রিগুণই সত্ত্বগুণশব্দের বাচ্য, রজঃ-প্রধান ত্রিগুণই রজোগুণশব্দের বাচ্য, তমঃ-প্রধান ত্রিগুণই তমোগুণশব্দের বাচ্য। ব্যক্তাব্যক্ত চেতনের সম্বন্ধেও তেমনি বলা যাইতে পারে যে, মনোবৃত্তিমাত্রেই জ্ঞান, মন এবং প্রাণ, তিনই একসঙ্গে বর্ত্তমান থাকে; প্রভেদ কেবল এই যে, কোথাও বা জ্ঞানের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব, কোথাও বা মনের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব, কোথাও বা প্রাণের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব। এখানেও তাই, জ্ঞানপ্রধান অন্তঃ-

করণবৃত্তি জ্ঞানশব্দের বাচ্য, মনঃপ্রধান অন্তঃকরণবৃত্তি মনঃশব্দের বাচ্য, প্রাণপ্রধান অন্তঃকরণবৃত্তি প্রাণশব্দের বাচ্য। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে—চক্ষু জ্ঞানপ্রধান বা সত্ত্বগুণপ্রধান, কর্ণ মনঃপ্রধান বা রজোগুণপ্রধান, রসনাদি প্রাণপ্রধান বা তমোগুণপ্রধান।* কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে—বাক্ জ্ঞানপ্রধান, হস্তপদ মনঃপ্রধান (যেহেতু হস্তপদ কর্ম্মপ্রধান, আর, কর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রজোগুণপ্রধান ইচ্ছা বা মন), উদরাদি প্রাণপ্রধান। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় জ্ঞানপ্রধান, কর্ম্মেন্দ্রিয় মনঃপ্রধান, শ্বাসাদির পরিচালক প্রাণেন্দ্রিয়, প্রাণপ্রধান। ভৌতিকরাজ্যে, তেমি, আলোক, অন্ধকার এবং গতিক্রিয়া, এ তিনের মধ্যে আলোক সত্ত্বগুণপ্রধান, অন্ধকার তমোগুণপ্রধান, গতিক্রিয়া রজোগুণপ্রধান। কোনো আলোক অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল, কোনো আলোক অপেক্ষাকৃত মলিন; পীতবর্ণের আলোক অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল, নীলবর্ণের আলোক অপেক্ষাকৃত মলিন। আবার, কোনো আলোকে গতিক্রিয়ার মাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশী, কোনো আলোকে তাহা অপেক্ষাকৃত কম। তেমি আবার, কোনো অন্ধকার অপেক্ষাকৃত বেশী নিবিড়, কোনো অন্ধকার অপেক্ষাকৃত কম নিবিড়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আলোকের মধ্যেও মাত্রাবিশেষে অন্ধকার এবং গতি রহিয়াছে; তদ্বৎ, অন্ধকারের মধ্যেও আলোক রহিয়াছে, আর, আলোক যখন রহিয়াছে, তখন গতিও রহিয়াছে। গতিক্রিয়া আবার, জড়বস্তুর আশ্রয় ছাড়িয়া একমুহূর্ত্তও স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না, কাজেই বলিতে হয় যে, গতিক্রিয়ার মধ্যেও ন্যূনাধিকপরিমাণে জড়তা বর্ত্তমান। উত্তাপও আবার গতিক্রিয়ার সঙ্গের সঙ্গী। শৈত্য যেমন বস্তুসকলের জড়তা'র নিদান, উত্তাপ তেমনি বস্তুসকলের জড়তা'র প্রতিহন্তা। তা ছাড়া, উত্তাপ আলোকের কনিষ্ঠ-সহোদর। আলোক এবং উত্তাপ, দুইই প্রকাশধর্ম্মী; প্রভেদ কেবল এই যে, আলোক দৃষ্টিক্ষেত্রে প্রকাশলাভ করে, উত্তাপ স্পর্শক্ষেত্রে প্রকাশলাভ করে। ফলে, গতির সঙ্গে জড়তা এবং জড়বিরোধিতা, শৈত্য এবং উত্তাপ, দুইই ন্যূনাধিকপরিমাণে জড়িত থাকে।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, প্রকাশগুণের প্রাদুর্ভাবকালে প্রকাশগুণ নিজেও প্রকাশ পায়, আর, সেই সঙ্গে ক্রিয়াগুণ এবং বাধাগুণ, যাহা পূর্ব্বে অপ্রকাশ ছিল, তাহাও প্রকাশ পায়; প্রকাশের ছাপায় পড়িয়া অপ্রকাশও প্রকাশ পায়। তার সাক্ষী—জাগরণকালে, জাগরণ যে কিরূপ, তাহাও প্রকাশ পায়, আর সেই সঙ্গে সুপ্তি যে কিরূপ, তাহাও প্রকাশ পায়; পক্ষান্তরে, সুপ্তিকালে জাগরণও প্রকাশ পায় না, সুপ্তিও প্রকাশ পায় না। এইজন্য,

* দেখা যে জ্ঞানপ্রধান, তাহার প্রমাণ এই যে, "দেখ্ চ মা, তোমাকে উনি সৎপথে বাগাইয়া আনিতে চেষ্টা করিতেছেন," এ কথার অর্থ—বুঝিতেছ না ইত্যাদি। "গুরু যাহা তোমাকে বলেন, তাহা তোমার শোনা উচিত"—অর্থাৎ তাহাতে মন দেওয়া উচিত, ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে—শ্রবণ মনঃপ্রধান বা ইচ্ছাপ্রধান। রসনা অর্থাৎ খাদ্যাদির আস্বাদনের [illegible] জন্য;—তাই বলি যে, তাহা প্রাণপ্রধান।

ত্রিগুণের সমবেত কার্য্যকারিতা কিরূপ, তাহার সন্ধান পাইতে হইলে সত্ত্বগুণের প্রকাশক্ষেত্রেই অনুসন্ধান চালনা করা কর্ত্তব্য।

ব্যক্তাব্যক্তরহস্য এবং ত্রিগুণরহস্যের সঙ্গে বোঝাবুঝি করিয়া, যে জায়গাটি ধারণার [illegible] করিলাম, তাহার একটা মানসচিত্র দেখাইতেছি, প্রণিধান কর—

অন্তঃকরণ	চেতন	অবস্থা	গুণ	গুণের পরিচয়লক্ষণ
জ্ঞান	সুব্যক্ত	জাগ্রৎ	সত্ত্ব	প্রকাশ
মন	অর্দ্ধব্যক্ত	স্বপ্ন	রজো	ক্রিয়া
প্রাণ	অব্যক্ত	সুষুপ্তি	তমো	জড়তা

ইহার পরে [illegible] চাওয়া এবং পাওয়ার যোগাযোগের কাণ্ড। আগামী বারে দেখা যাইবে, তাহা কিরূপ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দয়া।

ছায়ানট—একতালা।

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই,
বঞ্চিত করি বাঁচালে মোরে;
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভরে'।
না চাহিতে তুমি যা করেছ দান
আকাশ আলোক তনুমনপ্রাণ,
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়
সে মহাদানেরি যোগ্য করে'
অতি-ইচ্ছার সঙ্কট হ'তে
বাঁচায়ে মোরে।

আমি কখনো বা ভুলি, কখনো বা চলি
তোমার পথের লক্ষ্য ধরে',
তুমি, নিষ্ঠুর, সম্মুখ হ'তে
যাও যে সরে'।
এ যে তব দয়া, জানি জানি, হায়,
নিতে চাও বলে' ফিরাও আমায়,
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন
তব মিলনের যোগ্য করে'
আধা-ইচ্ছার সঙ্কট হ'তে
বাঁচায়ে মোরে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বারাণসী-অভিমুখে।

১

বারাণসীতে যদৃচ্ছাভ্রমণ।

বিহগকূজনবিখণ্ডিত নিস্তব্ধতার মধ্যে, অতীব নূতন ও ভীষণ আকারে, অনন্তের ভাব যেস্থানে আমার মনে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই তত্ত্বজ্ঞানীদের গৃহ হইতে চলিয়া আসিবার পর, অনন্তের চিন্তায় আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। তাই এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র মরীচিকার মধ্যে আবার ফিরিয়া-আসা আবশ্যক বোধ করিলাম।

আমার ক্ষুদ্র গৃহ হইতে বাহির হইবার পর হইতে প্রাচ্যদেশের পরীদৃশ্য বরাবর আমার নেত্রসম্মুখে রহিয়াছে, কিন্তু আমার নিকট আর তাহার আকর্ষণ নাই। বিশেষত এই বারাণসীনগরে, পরীদৃশ্যের সহিত কি-যেন একটা অলোকসামান্য রহস্যের ভাব জড়িত; অন্যান্য স্থানেরই মত এই বারাণসী, কিন্তু তবু যেন আর সকল হইতে ভিন্ন।...

অন্যত্র যেরূপ দেখা যায়, এখানেও সেই একই ভারতীয়-ধরণের গলিঘুঁজি রাস্তার গোলকধাঁধা, গৃহের সেই ঝালোর-বিভূষিত গবাক্ষ, সেই স্তম্ভশ্রেণী, সেই সব রংচং; বিশেষত সেই একই ধরণের পাতলা-ওড়না-পরা সুন্দরী রমণীরা পথ দিয়া চলিতেছে; সঙ্কীর্ণ রাস্তার ছায়ার মধ্যে,—উহাদের ধাতুময় নূপুরের উপর, বলয়ের উপর, কণ্ঠমালার উপর, রূপালি-জরির নক্সা-কাটা গোলাপী, জর্দ্দা, সবুজ শাড়ীর উপর, কদাচিৎ দুই-একটি সূর্য্যরশ্মি পতিত হইতেছে; তখন, পুরাতন ধূসর প্রাচীরের মধ্যে, উহাদিগকে জ্যোতির্ম্ময়ী পরীর মত দেখিতে হয় এবং তখন যদি উহারা তোমার উপর দৃষ্টি-নিক্ষেপ করে, তোমার মনে হইবে, যেন তাহাদের সমস্ত বেশভূষার উজ্জ্বলতা, সমস্ত দেহের লাবণ্যপ্রভা,—তাহাদের নেত্রের সেই অনিচ্ছাকৃত কোমল কটাক্ষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।...

আবার এখানে যোগীরাও চতুষ্পথের উপর উবু হইয়া বসিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়; উহারা দেবারাধনা ও মৃত্যুকে সহসা স্মরণ করাইয়া দেয়; চারিদিকেই পবিত্র শিলাখণ্ডসকল রহিয়াছে—সেই সব গঠনহীন সাঙ্কেতিকচিহ্ন, যাহার উৎপত্তি-কালও কেহ জানে না, তাৎপর্য্যও কেহ বুঝে না। উহাদিগকে আর কাহারও স্পর্শ করিবার জো নাই; কতকগুলি বিশেষ-বর্ণের লোকেরাই উহাতে হাত দিতে পারে;—তাহারা উহাদিগকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করে। কতকগুলি দেবতা গরাদের পিছনে কারাবদ্ধ হইয়া দেয়ালের কুলুঙ্গির মধ্যে বাস করিতেছেন। চারিদিকেই প্রস্তরময়-

চারিদিক্ রুদ্ধ চত্বরের মত একটা স্থান—তাহার উপর রাশীকৃত প্রাচীর ও ভগ্নাবশেষ স্থাপিত; ইহাই বলিতে গেলে স্বর্ণমন্দিরের অঙ্গন অথবা আধারপীঠ; কিন্তু ইহা ঠিক মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত নহে; মন্দিরের দ্বারদেশে যাইতে হইলে আবার একটা সঙ্কীর্ণ অন্ধকেরে গলির ভিতর দিয়া যাইতে হয়। এই স্থানটি অতীব পবিত্র, সাধুসন্ন্যাসীরা এখানে নিয়ত বাস করে। এখানকার কোন জিনিষ স্পর্শের দ্বারা কলুষিত না হয়, এইজন্য বিদেশীকে সর্ব্বদাই বিশেষরূপে সতর্ক থাকিতে হয়। এখানে-ওখানে, দেয়ালের মধ্যে খোদিত কুলুঙ্গি রহিয়াছে;—কুলুঙ্গিগুলা জালিকাটা পিতলের কপাটে বদ্ধ—তাহার মধ্যে মসৃণ শিলাখণ্ডসকল সারি সারি অধিষ্ঠিত; এই শিলাখণ্ডগুলা, জন্ম ও মৃত্যু, এই দুই মহারহস্যের সাঙ্কেতিকমূর্ত্তি। বড়-বড় বন্যপশুকে যেরূপ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়, সেইরূপ ধাতুময়-স্থূল-গরাদে-বিশিষ্ট পিঞ্জর ভীষণদর্শন বিগ্রহে পরিপূর্ণ; এবং একএকটা ছায়াময় কোণে,—ন্যাক্ড়া-কানি ও হলদে ফুলের মালায় পরিবেষ্টিত ভাঙা-চোরা ভীষণ গণেশমূর্ত্তি,—ভক্তবৃন্দের ভক্তিপূর্ণ হস্তের ঘর্ষণে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। শুষ্ক ফুলের মালা মাটীর উপর ছড়ান রহিয়াছে; তাহার সহিত বহুবর্ষসঞ্চিত ধূলারাশি মিশিয়াছে। মধ্যে-মধ্যে পবিত্র গরুদের গোময়ের উপর পা পড়িয়া যায়; এই গাভীবৃন্দ সমস্তদিন ইতস্তত জনতার মধ্যে বিচরণ করিয়া সন্ধ্যার সময় আবার এইখানে ফিরিয়া আইসে। এই স্থানটি তীর্থযাত্রীদিগেরও একটা আড্ডা। চতুষ্পার্শ্বস্থ তপোবনের ধর্ম্মনিষ্ঠ তপস্বী, দিব্যভাব-পরিব্যক্ত সুন্দর মুখশ্রী, অরুণবস্ত্রধারী, শুদ্ধচিত্ত যোগী,—রুদ্রাক্ষ ও কড়ির মালায় সর্ব্বাঙ্গ সমাচ্ছন্ন—ইহারা একটা প্রস্তরময় চতুষ্কমণ্ডপের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। পুরাকালে, ইহাদেরই জন্য এই সকল মণ্ডপ নির্ম্মিত হয়। ইহাদের চতুষ্পার্শ্বে এখানকার নিত্যনিবাসী ভিক্ষু সন্ন্যাসী, মৃগীরোগগ্রস্ত সন্ন্যাসী, জ্বরবিকারীর ন্যায় রক্তনেত্র ধরালুণ্ঠিত কঙ্কালমূর্ত্তি, যাহারা ভিক্ষার জন্য লুপ্ত-অঙ্গুলী হস্ত বাড়াইয়া দেয়, সেই সব কুষ্ঠরোগী...এই সকল জড়বৎ অচল ভস্মলিপ্ত ছদ্মবেশী লোক—যাহাদের সমস্ত জীবন যেন চোখের তারার মধ্যেই সংকেন্দ্রিত,—ইহারাই মন্দিরের আশপাশে যেন একটা অস্পষ্ট বিভীষিকার ছায়া বিস্তার করিয়া রহিয়াছে; কতকগুলা বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, যাহাদের জটাকলাপ স্ত্রীলোকের খোঁপার মত মস্তকের চূড়াদেশে উঁচু করিয়া বাঁধা;—ইহাদের দৃষ্টিপথে একবার যে পতিত হয়, ঐ ভীষণ মূর্ত্তি উপচ্ছায়ার ন্যায় তাহাকে নিয়ত অনুসরণ করে—সে কখনই তাহা ভুলিতে পারে না।

স্বর্ণমন্দিরের মধ্যে কোন বিধর্ম্মী প্রবেশ করিতে পায় না। কিন্তু দ্বারদেশের সম্মুখে, পুরোহিতদিগের একটি সেকেলে-ধরণের গৃহ আছে; এই গৃহ ও স্বর্ণমন্দির—এই উভয়ের মধ্যে একটা সরু গলি-পথ। এই পুরোহিত-গৃহের উপরে সকলেই অবাধে উঠিতে পারে। এখানে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় মৃত্যুদেবতার নিকট শোকসঙ্গীত হইয়া থাকে; তাহার সঙ্গে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ঢাক-ঢোল বাজিতে থাকে। এবং যেখানে বসিয়া তূরীবাদকেরা তূরীনাদ করে, সেই গবাক্ষ-বারণ্ডাটি এমন জায়গায় অবস্থিত যে, সেখান

হইতে মন্দির-গম্বুজের অসীম ঐশ্বর্য্য, খুব নিকট হইতে দেখা যায়। এই মন্দিরের তিনটি গম্বুজ। একটা গম্বুজ কালো-পাথরের—উহা পিরামিড্‌-আকারে সজ্জিত দেবদেবীর মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। আর দুইটি একেবারেই সোনার;—খোদাই-কাজ-করা পুরু সোনার পাতে গঠিত; তা ছাড়া, ইহার একটি অসাধারণত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়;—এই পুরু খাদহীন সোনার পাতের যে উজ্জ্বলতা, তাহা যুগযুগান্তরেও ম্লান হয় নাই। কোন কৃত্রিম উপায়ে কোন সোনার কাজে ঐরূপ উজ্জ্বলতার অনুকরণ করা অসম্ভব। এই সকল সোনার কারুকার্য্যের খোঁচ্‌-খাঁচের মধ্যে টিয়ারা বাসা বাঁধিয়া সপরিবারে বাস করিতেছে;—কেহই তাহাদের বাধা দেয় না; উহা যেন পূর্ব্ব হইতেই একপ্রকার বোঝাপড়া হইয়া আছে। স্বর্ণপুষ্প, স্বর্ণ-পল্লবের মধ্যে এই সকল অসংখ্য টিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; ইহাদের স্বাভাবিক সবুজ রং, সোনার জমির উপর পড়িয়া আরও যেন সবুজ দেখাইতেছে।

প্রায় সকল রাস্তাই গঙ্গায় আসিয়া শেষ হইয়াছে; গঙ্গার ধারে আসিয়া আরও কলাও—আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; এই গঙ্গার ধারেই বারাণসীর বিরাট্‌ মহিমা যেন সহসা আবির্ভূত,—বড়-বড় প্রাসাদ, দীপ্ত আলোকের তরঙ্গলীলা। এই গঙ্গার জন্যই, নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, জম্‌কাল সোপান প্রস্তুত হইয়াছে—সেই সোপান দিয়া গঙ্গার পূতজলে অবতরণ করা যায়; এমন কি, যখন জল শুকাইয়া নদীর তল নিম্ন হইয়া পড়ে (যেমন এই সময়ে), নদীর গভীর গর্ভে যে-সকল ভগ্নাব-শেষ নিমজ্জিত থাকে, এই সময়ে যখন বাহির হইয়া পড়ে, তখনও ঐ সোপান দিয়া নদীর জলে নাবা যায়। এবং সোপান-ধাপের স্থানে-স্থানে ছোট-ছোট পাথরের ঘর রহিয়াছে, সেইখানে বিভিন্ন মন্দিরের বিভিন্ন দেবতার ক্ষুদ্রাকার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রতিবর্ষ বর্ষাগমে এই সকল মূর্ত্তি জলের মধ্যে দীর্ঘকাল নিমজ্জিত থাকে এবং জলের বেগকে প্রতিহত করিবার জন্য এই সকল ক্ষুদ্র মূর্ত্তি গুরুপিণ্ডাকারে নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই নদীই বারাণসীর জীবন—মাহাত্ম্যের মুখ্যহেতু। কি প্রাসাদ, কি অরণ্য—সকল স্থান হইতেই লোকেরা এই জাহ্নবীর পুণ্য-তীরে মরিবার জন্য আইসে; বৃদ্ধ ও রুগ্ণ ব্যক্তিগণ দূর হইতে সপরিবারে এখানে আইসে, উহাদের মৃত্যু হইলে পরিবারস্থ লোকেরা আর ফিরিয়া যায় না। এখানকার লোকসংখ্যা এখনই ত তিনলক্ষ,—এই সংখ্যা আবার প্রতিবৎসর এইরূপে আরও বর্দ্ধিত হয়; যাহাদের অন্তিমকাল আসন্ন, তাহারা এই স্থানকে আগ্রহের সহিত আকাঙ্ক্ষা করে।...

কাশীধামে মৃত্যু! গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ! গঙ্গার জলে মৃতদেহের অন্তিম অবগাহন, গঙ্গাজলে শেষ ভস্মনিক্ষেপ—আহা! সে কি সৌভাগ্যের কথা!...

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রেখাক্ষর-বর্ণমালা।

চক্ষুযোগ।

চোকো'র যে চোক। সর্ব্বনাশ!
শুদ্ধ রেখায় লাগায় ফাঁস॥

চোকো খেয়ে চোকের মাথা
নোখো'র নখে পড়ে গাঁথা॥

ব'সে আছে নোখো হাতটি মেলে'।
হাত মুঠা করে শিকার পে'লে॥

বিশেষ বিধি।

চোকো অসি প'লে নোখো'র ফাঁদে
নখের আগায় পুঁটুলি বাঁধে ॥

নখি-নখে অঙ্করেখা।

নখি-নখ-বঁড়শীতে অঙ্কমীন কোনো
সহজে না যদি বাধে, কি করিবে শোনো ॥
যেমতি মোচড়ায় গোঁফ নবীন ভাবুক,
তেমতি মুচড়িয়া দিবে বঁড়শীর মুখ ॥

থ থ থনন | ত থ থ তথন | ম থ থ মথন | ক থ থ কথন

ভ ভ ভকত | ক থ থ কথক | ফ ফ ফল

স ফ ফ সফল | হ হ হনন | চ ল ল চলন

ঢ ঢ ঢঙ | র ণ ণ রণমদ

ঢ ঢ ঢ ঢ | ঢকঢক | ঢুল ঢল

সহজেই বাধে যদি রেখামৎস্য কাণা,
বঁড়শীর আগা তবে মুচড়িতে মানা।

থ থগ থর | ল লকলক হর | থথথথথ | লললকললল

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজতপস্বিনী।

[জীবনীপ্রসঙ্গ]

১৮

সেকালে ইংরেজ রাজপুরুষেরা সম্ভ্রান্ত জমিদার-গৃহে দর্শন দিলে উভয়পক্ষে বাস্তবিক যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বস্তভাবের আদানপ্রদান হইত, গত বিশবৎসরের ভিতর দেখিতে দেখিতে তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। কারণ যাহাই হউক, সদ্ভাববিনিময়ের সেরূপ সুযোগ ও উপলক্ষ্য এখনকার দিনে অন্তত পূর্ব্বেকার মত আর আপ্যায়ন এবং উৎসাহের সঞ্চার করে না। মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী নিজের অলৌকিক দানশীলতা এবং চরিত্রগুণে গভর্মেণ্টের সম্মানলাভ করিয়াছিলেন,— কখন তাহার ভিখারী ছিলেন না। সরকারের দত্ত উপাধিতে ভূষিত হইয়া কিরূপ অনাসক্তভাব তিনি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় একাধিকবার আমরা দিয়াছি। অতএব রাজপুরুষদের অনুকূলদৃষ্টির জন্য কখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু দেশীয় প্রকৃত ভাল-লোকদের প্রতি তাঁহার যেমন অকপট শ্রদ্ধা ছিল, সজ্জন বিদেশী রাজকর্ম্মচারীদিগকেও তেম্‌নি তিনি মান্য করিতেন। তাঁহারা পুটিয়ায় আসিলে মহারাণী আত্মীয়সমাগমতুল্য প্রীতিলাভ করিতেন।

সম্ভ্রান্তবংশীয় রাজপুরুষদের কেহ কেহ সস্ত্রীক তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে যাইতেন। সুপ্রীম্‌কোর্টের প্রসিদ্ধ জজ্‌ সার্ মোডিমন্ ওয়েলসের ভ্রাতুষ্পুত্র ওয়েলসসাহেব রাজশাহীর মাজিষ্ট্রেট-কলেক্টর হইয়া আসিলে একবার স্বীয় সহধর্ম্মিণী সহ পুটিয়ায় আগমন করেন। এই মহিলা চব্বিশপরগণার ভূতপূর্ব্ব কর্ত্তব্যনিষ্ঠ জজ নাটোরসাহেবের কন্যা এবং দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বালবিধবা মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার কথায়-বার্ত্তায় ইনি পরম আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। তখন মাতার বয়ঃক্রম বিশবৎসরের অনধিক। মেমসাহেব তাঁহার কমনীয়মূর্ত্তি এবং মধুর চরিত্রে এরূপ প্রীত হইলেন যে, হৃদয়াবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া বসিলেন—"রাণীসাহেব, আপনি কেন বিবাহ করুন না!" হাসিয়া মহারাণী তাঁহার অপার্থিব মাধুর্য্য এবং সারল্যের সহিত গৃহাগতা বিদেশিনীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, হিন্দুমহিলার পক্ষে সে চিন্তাও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ।

রেভিনিউ বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব মেম্বর স্বর্গীয় গ্রম্‌লিসাহেব মহারাণীমাতাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন এবং সর্ব্বদা সুখে-দুঃখে তাঁহার সংবাদ লইতেন। কুমারের মৃত্যুতে এবং মহারাণীর পরলোকগমনের পর তিনি যেরূপ শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পরমাত্মীয়ের পক্ষেই সম্ভব। জেলার কলেক্টর-

রূপে গ্রম্‌লি সর্ব্বত্র গরিব প্রজার মা-বাপ ছিলেন, কখন কাহারও রুজি মারিতেন না এবং বিস্তর লোকের অন্নসংস্থান করিয়া দিতেন। এই সকল গুণে মহারাণী তাঁহাকে আজীবন আন্তরিক সম্মান করিতেন।

প্রসঙ্গক্রমে গ্রম্‌লিসাহেবের কথা যদি উঠিল, তবে তাঁহার সম্বন্ধে আরো কিছু না বলিলে এই চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সাহেব যখন হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট, বঙ্কিম-বাবু তখন দিনকতক তাঁহার অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। কাছারীর কাজ শেষ হইলে রোজ তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসিতেন, হাবড়ায় পৃথক্ বাসা করেন নাই। একদিন একটা খুনী আসামীর একরার লইবার জন্য সন্ধ্যার পর বঙ্কিমচন্দ্রের তলব পড়িল। কিন্তু তিনি যাইতে পারেন নাই, উপরন্তু আদেশ-বাহক চাপরাসীটাকে কি কটুকাটব্য বলিয়া-ছিলেন। মাজিষ্ট্রেট্ ইহাতে চটিয়া-গিয়া আদেশ দিলেন, তাঁহাকেও অন্যান্য ডেপুটিদের মত হাবড়ায় বরাবর থাকিতে হইবে। ইহা লইয়া দুজনের ভিতর দিনকতক খুব মনো-মালিন্য ঘটিল। ভিতরের কথা তখন আমি জানিতাম না, বরং রাজশাহীতে গ্রম্‌লির সহিত কথাপ্রসঙ্গে বুঝিয়াছিলাম, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের একজন অনুরক্ত ভক্ত পাঠক। কাজেই বঙ্কিম-বাবু কথায়-কথায় যখন একদিন আমায় বলিলেন, "সাহেবটার তুমি অত সুখ্যাতি কর—আমার সঙ্গে বড় লাগিয়াছে," তখন আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। কিছুদিন পরে আপনা হইতে আবার তিনি বলিলেন, "তোমার কথাই ঠিক, গ্রম্‌লিসাহেব দিব্য লোক। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া সব ভার আমাকেই দিতেছেন!" এই সদ্ভাব যে ক্রমে বন্ধুতায় পরিণত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার রাখালকে পত্র দিয়া সাহেবের কাছে প্রেরণ করাতে আমি বুঝিয়াছিলাম। কেন না, সহজে এবং সাধারণত বঙ্কিমচন্দ্র সাহেবসুবার সইসুপারিসের ধার ধারিতেন না।

তিনি (গ্রম্‌লিসাহেব) পুটিয়ার রাজ-বাড়ীতে এই ক্ষুদ্র লেখকের পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তার পর রাজকার্য্যে নানা-স্থানে আমাদিগকে মিলিত হইতে হইয়াছে, কিন্তু অধঃস্তন কর্ম্মচারী হইলেও পর্ব্বের সে সম্ভ্রম বরাবর আমার প্রতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলি-তেন। আমার মনে হইত, মহারাণীমাতার স্মৃতির প্রতি সম্মানই তাহার যথাকারণ। তবে ইহা বলা আবশ্যক, গ্রম্‌লিসাহেবের সহৃদয়তা ছোট-বড় সকলকেই আকৃষ্ট করিত। এরূপ ঘটিয়াছে, আমি কাছারী হইতে পদব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি, সাহেব—তখন বিভাগীয় কমিশনর—হঠাৎ সে পথ দিয়া যাইতে যাইতে আমায় দেখিতে পাইলেন এবং গাড়ি থামাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "Come up, I shall drive you." তার পর আমায় গাড়িতে তুলিয়া-লইয়া গল্প করিতে করিতে বাসায় পৌঁছাইয়া দিলেন। গৃহে সাক্ষাৎ করিতে গেলে কি যত্ন যে করি-তেন, তাহার আর কি বলিব। গার্ডেনপার্টি (Garden party) প্রভৃতিতে বড় বড় সাহেব-সুবাদের সহিত এরূপ সমকক্ষভাবে আমাকে পরিচিত করিতেন যে, তাহাতে আমার খানিকটা অপ্রস্তুত হইতে হইত। দেখা হইলে অন্যান্য কথার পর সাহিত্যালোচনার কথা তুলিতেন এবং জিজ্ঞাসা করিতেন, "এ দেশের সাধারণ গান ও গল্প (folk-lore) সম্বন্ধে

কিছু লেখ না কেন?" আমি অবসরাভাবের ওজর করিলে হাসিয়া উঠিতেন,—তাঁহার কেমন ধারণা ছিল যে, রাজকর্ম্মচারীরা ইতিহাস এবং সাহিত্যাদির গবেষণা করিলে তাহাতে শাসনকার্য্যেরই সহায়তা হয়। তিনি অধঃস্তন বিচারকদের দৃঢ় স্বাধীনভাবকে উৎসাহ দিতেন এবং তোষামোদ দুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। মুণ্ডা-বিদ্রোহের প্রথম আমলে কোন-এক মকদ্দমায় উপরিওয়ালার জেদ থাকিলেও একজন এদেশীয় বিচারক যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে অভিযুক্তদের ছাড়িয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহাকে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। গৃমলিসাহেব তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "আপনার উপরিওয়ালা এই মকদ্দমার বাদী মাত্র। আপনি যথার্থই সুবিচার করিয়াছেন।" একবার এক জেলা পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া-আসার পর পার্সনেল এসিষ্টাণ্টের সহিত সাহেব নানা গল্প করিতেছিলেন। একজন কর্ম্মচারীর অতিরিক্ত চাটুকারিতায় বড় বিরক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাহার কথা তুলিয়া বলিলেন —"He is a Darbari of Darbaris—a matter very greatly to be regretted." (ভারি দুঃখের বিষয় যে, লোকটা বড় দরবারী।) ইঁহার সুন্দর লিপিকুশলতার সঙ্গে ভাবুকতা এবং রসিকতার সমাবেশ হওয়ায় মণিকাঞ্চন-যোগ হইয়াছিল। ছোটনাগপুর হইতে বোর্ডে আসার অনতিপূর্ব্বে রাঁচি ইংরেজী-স্কুলগৃহে বিদ্যাসাগরমহাশয়ের প্রতিমূর্ত্তি-উন্মোচন উপলক্ষে ইনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক কথায় সুলেখক ও সুবক্তাসুলভ এই গুণগুলি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ছেলেদের প্রাইজ-বিতরণ করিবার সময় বলিলেন, "দেখিতেছি, নিয়মিতরূপে স্কুলে আসার জন্যও একটি বালককে পুরস্কৃত করা হইয়াছে। সে হিসাবে আমারও একটা পুরস্কার পাওয়া উচিত। কেন না, গত সাতবৎসর এইরূপ উৎসবে আমার ন্যায় কেহ ধারাবাহিকরূপে যোগ দেয় নাই।" ঐ দিন অপরাহ্নে স্কুলের প্রধান-শিক্ষকমহাশয় কোন কার্য্যোপলক্ষে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কমিশনার হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "Oh, you have survived my speech?" (আমার বক্তৃতার পরও আপনি বাঁচিয়া আছেন?) আর একবার রাঁচি মিউনিসিপ্যালিটির ভাইসচেয়ারম্যান আয়কাৎমহাশয় চিঠি লিখিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তাড়াতাড়িতে চিঠির শিরোনামায় গৃমলির পরিবর্ত্তে গমলে লেখা হইয়া গিয়াছিল। আয়কাৎমহাশয়কে দেখিয়া সাহেব হাসিয়া সুধাইলেন, "আবকারিমহাশয়, আছেন কেমন?" নিজেকে কলীব্যবসায়ীর মত সম্বোধিত হইতে শুনিয়া তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন এবং গম্ভীরভাবে বিভাগের হর্ত্তাকর্ত্তাকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলেন যে, তিনি আবকারি নহেন, আয়কাৎ। গৃমলি-সাহেব সহাস্যে বলিলেন, "জানি, কিন্তু আমিও গৃমলি—গমলে নহি।"

বর্ষাকালে একবার কলেক্টর বড়াক-সাহেবের পটিয়া প্রদর্শনের কথা বলিতেছিলাম। ইংরেজীনবিশ কর্ম্মচারী তখন সদরে কেহ উপস্থিত ছিলেন না, তবে পিতৃদেব দোকান লইয়া পুটিয়াতেই ছিলেন। আমার সমক্ষেই

মহারাণীমাতা কুমারকে অনুযোগের ভাবে বলিলেন, "তোমার রাজসংসারে এমন লোক এখন কেহ নাই যে, সাহেবের সঙ্গে কথা কয়।" কুমার উত্তর করিলেন—"কেন দেওয়ানজী আছেন, শ্রীশবাবু আছেন।" মা হাসিলেন,—"মনে কর, ইঁহারা যদি এখানে উপস্থিত না থাকিতেন!" কুমার অপ্রতিভ হইলেন।

পরদিন খুব ভোরে হস্তীতে আরোহণ করিয়া আমি কলেক্টরসাহেবকে লইয়া আসার জন্য পাইকপাড়ায় তাঁহার বোটে উপস্থিত হইলাম। সাহেব মহারাণীর ও কুমারের এবং আমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার সসম্পর্কীয় সঙ্গীটির সহিত হাতীতে উঠিলেন। পথ প্রায় দুইমাইল, নানা কথাবার্ত্তায় দেখিতে দেখিতে আমরা রাজবাড়ীতে পৌঁছিলাম। সেখানে কলেক্টরকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য পিতৃদেব উপস্থিত ছিলেন। কুমারকে সাহেব যে-সব কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতাঠাকুর ও আমি উভয়ে তাঁহার নিকট শুনিয়া তাহার উত্তর ইংরেজীতে দিলাম। কথার অধিকাংশ মামুলি।—কেমন আছেন, ইংরেজী পড়িতেছেন কি না, ঘোড়া কেমন আছে, কয়টা ঘোড়া ইত্যাদি। বৈঠকখানায় স্বর্গীয় রাজাবাহাদুরের ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদের এক তৈলচিত্র লম্বিত ছিল। রাজার ও পিতৃদেবের তস্বীর দেখিয়া সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন। স্থির হইল, আগামী কল্য প্রাতে সাহেবের আত্মীয়টিকে লইয়া কুমার ব্যাঘ্রশিকারে বাহির হইবেন।

মহারাণীমাতার আদর-অভ্যর্থনায় প্রীত হইয়া কলেক্টরসাহেব থানার দিকে গেলেন। প্রথমত ডিস্‌পেন্‌সরি দেখিলেন। আমি বরাবর সঙ্গে। অবসর বুঝিয়া মহারাণীর আদেশমত বিষয়ভার কুমারের হস্তে দিয়া তাঁহার কাশীবাসের প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম। সাহেব অবহিত হইয়া সকল শুনিলেন এবং প্রতিশ্রুত হইলেন, ছোটলাট এবং কমিশনর আসিলে তিনি অবশ্য বিশেষ চেষ্টা পাইবেন।

ইহার পরে আমরা চারি-আনির রাজবাড়ীতে গেলাম। গভর্মেণ্টের পেন্‌শন্‌-প্রাপ্ত একজন রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে পিতৃদেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ছোটলাট টম্‌সনের আসন্ন রাজশাহীপরিদর্শনের কথা উঠিল। সাহেবের প্রশ্নোত্তরে পিতাঠাকুর মহাশয় বলিলেন যে, তিনি যখন রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের দেওয়ান, তখন বর্ত্তমান লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর বোয়ালিয়ার মাজিষ্ট্রেট্‌-কলেক্টর ছিলেন। তিনদিন তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কলিকাতার ওয়ার্ডস্‌ ইনষ্টিটিউট্‌ সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। টম্‌সন্‌-সাহেব তখন ওয়ার্ডস্‌ ইনষ্টিটিউটের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, আমরা বলিলাম, এতদিনে তাহার ফল হইয়াছে। সেখানে, কি জন্য বলা যায় না, সকলেই প্রায় দুর্নীতিপরায়ণ হইত। রাজেন্দ্রবাবু যোগ্যতায় দেশীয়দের মধ্যে অগ্রগণ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু সুশিক্ষক বলিয়া তাঁহার নাম ছিল না। সাহেব জমিদারের ছেলেদের স্কুলকলেজে পড়ার কত উপকারিতা, তাহা বলিয়া চারি-আনির পোষ্যপুত্র এবং রাজকন্যার পুত্রদ্বয়কে ডাকাইয়া আনাইলেন। তাহাদের সহিত কথায়-বার্ত্তায় তাঁহার খানিকটা বেশ আমোদে কাটিল।

বৈকালে মহারাণীমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কলেক্টরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা যাহা হইয়াছিল, জানাইলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন, লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর আসিলে কথাটা তাঁহার মনে করিয়া দিও। মাতার স্নেহে আবাল্য লালিতপালিত ত্রৈলোক্য এতক্ষণে আসিল এবং বলিল, "অমনি যা বলেন বলুন, সাহেবদিগকে কিছু বলাইবেন না।" মা বলিলেন, "যাহা এ পর্য্যন্ত বলাইয়াছি, সকলেই তা জানে। তোমরা * * র দোষ দিয়াছিলে, কিন্তু আমার সেই দরখাস্ত মহেন্দ্র সাক্সালের লেখা। * * র দ্বারা দ্বিতীয়বার নকল করাইয়া দিয়াছিলাম। মাজিষ্ট্রেটের পত্রোত্তর * * মৈত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন।"

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা।

শিক্ষাই সমস্ত উন্নতির মূলে। শিক্ষা না থাকিলে সমস্ত প্রযত্নই বিফল হইয়া যায়। কি প্রাচীন, কি আধুনিক, যে সকল জাতি অভ্যুদয়লাভ করিয়াছে, দেখা যাইবে, তাহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রভাব সবিশেষ বিস্তৃত। শিক্ষার দ্বারা যে উপকারলাভ হয়, সমগ্র সমাজের মধ্যে কতিপয়মাত্র ব্যক্তি শিক্ষিত হইলে, তাহা বিশেষ গণনার যোগ্য হয় না। এইজন্য সমাজের সমস্ত লোককে শিক্ষাদান করা উচিত।

আজকাল অভ্যুদয়শীল দেশসমূহে সমাজস্থ আপামর সকলকেই শিক্ষাপ্রদান করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। 'গণশিক্ষা'র (Mass education) আবশ্যকতা সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইতেছে। দেশাধিপতিগণ রাজশক্তির প্রভাবে তাহাকে 'নিয়ত' (Compulsory) করিয়া দিতেছেন। শুনা যায়, বর্ত্তমান জাপানসম্রাট্ এই গণশিক্ষাসম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, এখন হইতে সেইরূপভাবে শিক্ষা বিস্তৃত করিতে হইবে, যাহাতে গ্রামে অজ্ঞ পরিবার, অথবা পরিবারে অজ্ঞ লোক না থাকে।* আজকাল ইংরাজের কৃপায় আমাদের দেশে এই ভাবের অস্তিত্ব দেখা না গেলেও, পূর্ব্বের অবস্থা এরূপ ছিল না। ভারতের লোক গণশিক্ষা কাহাকে বলে, তাহা জানিত এবং তাহাকে নিয়ত করিতেও অনভিজ্ঞ ছিল না। যে কোন কারণেই হউক, আজ তাহার লোপসাধন হইলেও, চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় নাই।

আজকাল যে সকল স্থানে শিক্ষা নিয়ত, রাজশক্তি তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান; কেহ তাহাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবৃত্ত না হইলে, রাজশক্তি তখনই তাহাকে বলদ্বারা প্রবর্ত্তিত করিবে। প্রাচীনভারতের নিয়তশিক্ষার পশ্চাতে রাজশক্তি ছিল না, রাজার তাহাতে

* 'It is intended that henceforth education shall be so diffused that there may be not a village with an ignorant family, or a family with an ignorant man.—জাপানের কথা।

বিশেষ কিছু করিবার ছিল না, যাহা-কিছু করিতে হইত, সমাজই করিত।

ভারতের এই শিক্ষানিয়মের নাম 'উপনয়ন।' বর্ত্তমানের উপনয়নবিধি বিস্মৃত হইয়া পাঠকগণ অতীতের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন, দেখিবেন, এই উপনয়নের দ্বারা প্রাক্তন ঋষিগণ শিক্ষার কি সুন্দর অথচ সুগম উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন!

আজকাল 'উপনয়ন' বলিলে আমরা গলায় একখানা সূতা পরা ভিন্ন বেশী আর কিছুই বুঝি না, মাথা মুড়াইয়া দিনকত ঘরের মধ্যে থাকিয়া বাহির হইলেই উপনয়নের সমস্ত প্রয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া গেল! আমরা ইহাকে এইপ্রকারে বিপরিণত করিতে পারি, কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যগুলি এখনও বিনষ্ট হয় নাই, তাহারা এখনও উপনয়নের যথার্থ তাৎপর্য্য অন্বেষণকারীর নিকট প্রকাশ করিয়া দিবে। তাহারা বলিবে—উপনয়নের উদ্দেশ্য গলায় একখানা সূতা দেওয়া নহে। অন্যান্যস্থলে * যেমন উপবীত ধারণ করিতে হয়, এখানেও তাহাই। এই উপবীত যে সূত্র না হইলে হইবে না, তাহা নহে, কাপড়ের দ্বারাও হইতে পারে, কুশের দ্বারাও হইতে পারে। † তাহারা বলিবে, উপনয়নের ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য যে, বালককে গুরুগৃহে লইয়া গিয়া শিক্ষার প্রবর্ত্তিত করা। বালক সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া শিক্ষা করিবে। বর্ত্তমানের ন্যায় কেবল বিদ্যাগ্রহণ করিলেই তাহার সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করা হইবে না, তাহাকে যথাবিধি দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ সুখময় জীবনের পথ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। তাহাকে বাক্যে, মনে ও কর্ম্মে পবিত্র হইতে হইবে, দৃঢ় হইতে হইবে। তাহার পর তাহার গৃহপ্রত্যাগমনের সময় উপস্থিত হইবে। সে যখন গিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে, তখন সে তাহার শোক-দুঃখ, ভয়-শঙ্কা, বাদ-বিসংবাদ, জ্বালা-যন্ত্রণা—সকলেরই মধ্য দিয়া লক্ষ্যস্থলে যাইতে সমর্থ। তাহার এই গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনবিধির নামই 'সমাবর্ত্তন'। আজকাল আমাদের উপনয়নের কয়েক মিনিটের পরেই গুরুকুল হইতে 'সমাবর্ত্তন' হইয়া থাকে!

সমাজে উপনয়নবিধি এরূপ কৌশলে প্রসারিত হইয়াছিল যে, তাহা উল্লঙ্ঘন করিবার

---

* "উপাসনে গুরূণাং বৃদ্ধানামতিথীনাং হোমে জপ্যকর্ম্মণি ভোজনে, আচমনে স্বাধ্যায়ে চ যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ।" আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্র, ১. ৫. ১৫, ১; ইত্যাদি।

† "কৌশং সূত্রং বা ত্রিস্ত্রিবৃদ্‌যজ্ঞোপবীতম্"। বৌধায়ন-ধর্ম্মশাস্ত্র, ১. ৫. ৮. ৫

"যজ্ঞোপবীতং কুরুতে সূত্রং বস্ত্রং বাপি বা কুশরজ্জুমেব"। গোভিলগৃহ্যসূত্র, ১. ২. ১।

"বাসসা যজ্ঞোপবীতানি কুরুতে, তদভাবে ত্রিবৃতা সূত্রেণ"। নিগমপরিশিষ্ট।

শাস্ত্রীয় কার্য্য ভিন্ন অন্য সময়েও গৃহস্থকে উপবীত রাখিতে হয়; এ সম্বন্ধে আপস্তম্ব বলিয়াছেন—নিত্যমুত্তরং বাসঃ কার্য্যম্", "অপি বা সূত্রমেব উপবীতার্থে"—আপ-ধ-সূ.২.২.৫.২১—২২। "বাসোবিন্যাসবিশেষো যজ্ঞোপবীতম্," "বাসসোঽসম্ভবেঽমুকল্পং বক্ষ্যতি—অপি বা সূত্রমেবেত্যাদি"—আপ-ধ-সূ. ১. ৫. ১৫. ১. উজ্জ্বলকার.—হরদত্ত।

কার্পাস-ক্ষৌম-গোবাল-শণ-বল্কতৃণাদিকম্।

যথাসম্ভবতো ধার্য্যমুপবীতং দ্বিজাতিভিঃ।" দেবল।

উপায় ছিল না; যে যতদূর পারে, উপনীত হইয়া তাহাকে শিক্ষাগ্রহণ করিতেই হইবে। অন্যথা সমাজে তাহার স্থান কোথায়? যিনি যতই ধনী বা নির্ধন হউন, এ বিধান তাঁহাকে শিরোধার্য্য করিতে হইবেই।"

আর, এইজন্যই তাহা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল যে, কোন ধনব্যয় ছিল না। আজকাল উৎসব করিয়া উপনয়নে অনেক ব্যয় করা হইয়া থাকে, কিন্তু শাস্ত্রে তাহার যে পদ্ধতি আছে, তাহাতে বিশেষ ব্যয়ের কিছুই নাই; যে-কোন লোক তাহা করিতে পারে। এ ত উপনয়নের উৎসবের কথা, তাহার পর গুরুকুলে অবাস্থিতির সময়েও বালকের কোন ব্যয়ের সম্ভাবনা ছিল না। তখন আচার্য্যেরা বিদ্যা 'দান' করিতেন, 'বিক্রয়' করিতেন না।

যাঁহারা উপনয়নবিধি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন, ধনব্যয়ের সম্ভাবনা থাকিলে, তাহা সর্ব্বসাধারণের সুগম হইবে না, এবং এইজন্যই তাঁহারা তাহার মধ্যে কোন অর্থের সম্বন্ধ রাখেন নাই। কিন্তু তা বলিয়া তাঁহারা গৃহস্থ আচার্য্যগণের সংসারের দিকে একেবারে অন্ধ হইয়া ছিলেন না; তাঁহার সংসার চলিবার ব্যবস্থাও তাঁহারা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারিগণ প্রতিদিন নিয়মমত কিঞ্চিৎকাল ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন, আচার্য্যের চরণসমীপে উপস্থাপিত করিতেন। গৃহস্থগণ ব্রহ্মচারীকে আগ্রহের সহিত ভিক্ষা দিতেন,—তাঁহাদের ইহাতে গৌরববোধ হইত। এখনও এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। সেই ভিক্ষালব্ধ বস্তুর দ্বারা সপরিবার আচার্য্যের ব্রহ্মচারিগণের সহিত মহোৎসবে দিন চলিয়া যাইত। অধ্যয়ন শেষ হইলে ব্রহ্মচারী আচার্য্যের জন্য একটি ভাল দক্ষিণা সংগ্রহ করিতেন। ব্রহ্মচারীকে এজন্য বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইত না; রাজার নিকট উপস্থিত হইলেই তিনি সফলমনোরথ হইতেন। এই দক্ষিণার দ্বারা আচার্য্যের অনেক সুবিধা হইত। তদ্ভিন্ন, রাজার নিকট হইতে তাঁহারা অনেকসময়ে ভূমিবিত্ত প্রভৃতি লাভ করিতেন। শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে সময়ে-সময়ে তাঁহাদের যথেষ্ট প্রাপ্তি ছিল। এইরূপে বিনা ব্যয়ে বালক সম্পূর্ণ শিক্ষালাভের সুযোগ পাইত। এইজন্যই ত্রৈবর্ণিকের মধ্যে নিরক্ষর লোক দেখা যাইত না; কিছু-না-কিছু সকলেই শিক্ষা পাইত। এই উপনয়নবিধিই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আজকালও উচ্চবর্ণের, বিশেষত ব্রাহ্মণের মধ্যে যে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প, মনে হয়, তাহা ঐ প্রাচীন উপনয়নেরই ক্ষীণ ফল।

আজকালের সংস্কৃতচতুষ্পাঠীসমূহ ভারতের সেই প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিরই মলিন ছায়া দেখাইতেছে। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ এ বিষয়ে এখনও অনেক উচ্চে অধিষ্ঠিত। তাঁহারা এখনও অনেকেই বিদ্যা 'দান' করেন, 'বিক্রয়' করেন না। ছাত্র-পড়ান তাঁহারা 'ধর্ম্ম' বলিয়া বিবেচনা করেন। ছাত্রগণ আর ভিক্ষা করিয়া গুরুর সাহায্য করিতে পারেন না, অন্য কিছুও দেন না, কিন্তু গুরু তাঁহাদিগকে স্বয়ং ভিক্ষা করিয়াও অন্নদান ও বিদ্যাদান উভয়ই করেন। এই শ্রেণীর অধ্যাপকগণের সংখ্যা ক্রমশই কমিয়া আসি-

তেছে। পাশ্চাত্যপ্রথা তাঁহাদের মধ্যেও শনৈঃশনৈঃ প্রবেশ করিতেছে; নবদ্বীপ ও কাশীতে অধ্যাপকেরা অনেকেই আর বিদ্যার্থি-গণকে অন্নদান করিয়া পড়াইতে পারিতেছেন না। ইহা তাঁহাদের দোষ নহে, কালের দোষ।

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

রাইবনীদুর্গ।

[ঐতিহাসিক উপন্যাস]

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কি জাতীয় কি ব্যক্তিগত জীবনে মন্ত্রগুপ্তিই প্রথম এবং প্রধান সাধনা। তাহার অভাবে সিদ্ধিলাভ কেবল কথার কথা মাত্র। শাক্ত এবং বৈষ্ণব জগতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও যে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক বলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার মূল এই মন্ত্রগুপ্তি। এই সত্য পরীক্ষিত হইয়াছিল বলিয়াই বংশানুক্রমে লোকে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে যে, গুরু-মুখনিঃসৃত একটিমাত্র কথা শিষ্যের কর্ণকুহরে প্রবেশলাভ করিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে তাহাকে নূতন-জীবন দান করে।

সেদিন তখনও রাত্রি প্রহর উত্তীর্ণ হয় নাই। কিন্তু সেই স্থান এবং কালে দূরাগত বৈরাগ্যসঙ্গীত নিশীথে গীত মর্ম্মিমান্ বেহাগ-রাগের উদাসভাব প্রকটিত করিয়া তুলিতেছিল। বয়সের দোষে বা গুণে কুমার পদ্মাক্ষ-নারায়ণ তাহা কেবলমাত্র ফকিরের গান ভাবিয়া দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। ইচ্ছা, গায়কটার নাগাল পাইয়া ভাল করিয়া তাহার গানটা শুনিয়া লন। কিন্তু সে সুরে এবং স্বরে সৌদামিনী দেবীর হৃদয় লয় হইতেছিল। তাহাও বয়োধর্ম্মের ফল। পরিশ্রান্ত দিবামান যেমন গোধূলিমুখে সঙ্কুচিত হইয়া আসে, প্রৌঢ়বয়সে তেমনি জীবনের সকল আশাভরসা নির্দ্দিষ্টখাতে প্রবাহিত হয়। তখনই আমরা প্রথমে অনুভব করিতে আরম্ভ করি যে—

> কঙ্কর চুন চুন মহল বানায়া
> লোক কহে ঘর মেরা!
> ও না ঘর তেরা না ঘর মেরা
> চিড়িয়া নিয়া বাসেড়া!

কিন্তু সে গান ফকিরের হইলেও গায়ক ফকির নহে। কল্যাণপণ্ডার প্রেরিত অশ্বা-রোহী প্রবীণ সিপাহী সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী এবং সুগায়ক। অন্ধকার বনপথের একান্ত নিস্তব্ধতায় বিরক্তিবোধ করিয়া সময়বিনোদন জন্য সে ব্যক্তি গান ধরিয়াছিল। বন উত্তীর্ণ হইতে না হইতে কুমারের অশ্বপদশব্দ তাহার কানে গেল এবং দুই দিক হইতে দুইটা ঘোটকের যুগপৎ হ্রেষাধ্বনিতে নদীতট মুখরিত হইয়া উঠিল।

কুমার পদ্মাক্ষনারায়ণ রাজঘাট-অঞ্চলের সর্ব্বত্র সুপরিচিত, বিশেষত সেখানকার কেল্লার

সকল সিপাহীর সঙ্গেই প্রায় তাঁহার আত্মীয়-ভাব। অস্তগমনোন্মুখ-চন্দ্র-কিরণ বনানীশিরে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া নীচে ঘনান্ধকারের সৃষ্টি করিতেছিল—মুক্তপ্রান্তরেও তাহাতে দূরের কোন জিনিষ ভাল লক্ষ্য হইতেছিল না। সিপাহী কুমারকে চিনিতে পারে নাই; কিন্তু তরুণ চক্ষুকে প্রতারণা করা সহজ নহে। পদ্মাক্ষনারায়ণ বিষুণ-তেওয়ারিকে লক্ষ্য করিয়া মধুর উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। "কে ও, তেওয়ারিজি; আমি ভেবেছিলাম, কোন সন্ন্যাসি-ফকির ধূনী জালিয়ে গান ধরিয়াছে। বেশ গানটি, আমায় শিখিয়ে দিতে হবে। দাদামহাশয় গান এত ভালবাসেন, কিন্তু তিনি জানেন না তুমি এমন সুন্দর গাইতে পার তেওয়ারিজি! তাঁর সম্মুখে তোমায় একবার কালই গাহিতে হবে! দেখা পেলে আজই তাঁকে বল্‌বো।"

বিষুণ-তেওয়ারি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, রাত্রে জঙ্গলপথে এ অবস্থায় আপনি কেন? হিংস্রজন্তু সর্ব্বদা এখানে বাহির হয়, তা ছাড়া, আজকাল লড়াই উপলক্ষে দুষমন্ সর্ব্বত্র ঘুরিতেছে!" শেষের কথাকয়টি বলিবার সময় তেওয়ারিজি কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মৃদু এবং সংযত করিয়া আনিল। ইহাতে ভৃত্যের ভয় ভাবিয়া কুমার আবার হাসিয়া উঠিলেন।

"তা বেশ, আমিই না হয় ঠাকুরাণীদিদির মেয়েবুদ্ধিতে ভুলিয়া দাদামহাশয়ের খোঁজে এই রাত্রে বাহির হইয়া পড়িয়াছি। তা তোমার এ কর্ম্মভোগ কেন তেওয়ারি? ঐ শুন, বেহারার শব্দ শোনা যায়, ঠাকুরাণী-দিদিও আসিতেছেন।" এই বলিয়া কুমার তেওয়ারির সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিলেন। তাঁহার জেদে তেওয়ারিকে বলিতে হইল, এ রাত্রে কেন সে উমাপুরে যাইতেছিল। সাধারণত বুড়ারা মন্ত্রগুপ্তির মহিমা বুঝে,—অনেক দেখিয়া-শুনিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে, রহস্যের ছাপ অলক্ষ্যে সহজেই সর্ব্বাধারে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া যায়। সকল দেশের বৃদ্ধ-চাণক্যেরা সেইজন্য মন্ত্রণাগৃহের প্রাচীর-গুলাকেও সজীব মনে করেন। পক্বকেশ যোদ্ধ্‌ব্যবসায়ী বিষুণ-তেওয়ারি কিন্তু অত শত বুঝিত না। সে একটুমাত্র ইতস্তত করিয়া রাজপুত্রকে ভিতরের কথা বলিল। কুমার আবার তখনই ছুটিয়া-গিয়া তাহা সৌদামিনী দেবীর গোচর করিলেন। ইহার ফলে সেই লুক্কায়িত পাঠানসৈন্য কয়জন মন্ত্রভেদ সুনিশ্চয় বুঝিয়া মরিয়া হইয়া উঠিল।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

তাহাই বলিতেছিলাম, মন্ত্রগুপ্তি কখন নিরর্থক ভাবিও না। যে মন্ত্রণা সুচিন্তিত এবং সুপরিপক্ক নহে, কানাকানি-জানাজানিতে তাহা উদ্‌গারি-পদার্থের মত শুধু উবিয়া গিয়াই ক্ষান্ত হয় না।

সেই বনমধ্যে পঞ্চদশ পাঠানসেনানী একটা সংঘর্ষ স্থিরনিশ্চয় করিয়া উন্মুখ হইয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রাজকুমার এবং বিষুণ-তেওয়ারির কথাবার্ত্তা তেমন নিভৃতে ও যথাযোগ্য সতর্কতার সহিত হয় নাই, সে পরিচয়ও দিয়াছি। সেই কথোপকথনের অবসরে দাসমহাশয়ের নাম সুস্পষ্ট উচ্চারিত না হইলেও, ভাবভঙ্গিতে সিপাহীদের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাঁহারই লোকজন সেখানে সমবেত হইয়াছে। তাহাদিগকে রাজঘাটের দিকে আর অগ্রসর হইতে

দেওয়া উচিত কি না, ইহা লইয়া পাঠানদের ভিতর মতভেদ উপস্থিত হইল।

এতক্ষণে কর্ত্রীঠাকুরাণীর শিবিকা মশালের আলোকে বনের সঙ্কীর্ণ পথ উদ্ভাসিত করিয়া সেখানে প্রবেশ করিল। কুমার সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া সৈনিকবেশী দুইজন তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছে। তখন আর পরামর্শের সময় ছিল না,—কেন না, তাঁহাদের প্রত্যেক গতি সম্ভবত শত্রুপক্ষীয়ের দৃষ্টিগোচর হইতেছিল।

রাজকুমারের বালসুলভ কৌতূহল এবং কৌতুকপ্রিয়তা অনেকসময় যেমন তাঁহাকে বিপদে ফেলিত, তেম্নি তাহা আবার মাঝে মাঝে তদীয় অজ্ঞাতসারে উপকারেও না লাগিত, এমত নহে। কিন্তু আজিকার মত অভাবনীয় আপদ্ আর কখন তাঁহাকে বিচলিত করে নাই। চিত্ত স্থির করিয়া তিনি ছেলেমানুষী-সহায়ে আজ পাঠানদস্যুর কবল হইতে আপনাদিগকে বাঁচাইবার কৌশল আবিষ্কার করিলেন।

জঙ্গলে প্রবেশ করিতে না করিতে বাহকেরা শুনিল, কুমারসাহেব আদেশ দিতেছেন, পাল্কি নামাইয়া তাহারা সেইখানে একটু বিশ্রাম করুক। তিনি শুনিতে পান, বাঘেরা নিকটে জল খাইতে আসে, তাহা একবার না দেখিয়া যাইবেন না। শুনিয়া সৌদামিনী দেবী শিবিকার দ্বার খুলিয়া নাতিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি ইহাতে ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে পদাঙ্কনারায়ণ ঘোড়া ছুটাইয়া নদীতীরাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন। সঙ্গে অশ্বারোহী বিষুণ-তেওয়ারি। সেও অপ্রসন্ন-মনে স্বগত এই বালকতার সমালোচনা করিতে করিতে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিল।

ততক্ষণ লাঠিয়াল এবং বাহক পরিবৃত্ত হইয়া কর্ত্রীঠাকুরাণী একমনে দয়াল হরিকে ডাকিতেছিলেন। স্বামীর আসন্ন অভাবনীয় বিপদের সংবাদ পাইয়া তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন, পথের বিলম্ব সহ্য হইতেছিল না।

ক্রমশ।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

চিরমঙ্গল।

যে দুঃখমাঝারে স্থির তোমার আসন,
সে দুঃখ সুখের বেশী, নাহি প্রয়োজন
অন্য সুখে প্রিয়তম, যে দুঃখ নিয়ত
তোমার স্মৃতিরে দগ্ধ-সুবর্ণের মত

করিছে নির্ম্মলতর সুন্দর শোভন,
সেই ভাল, আর কিছু চাহেনাক মন।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

শরৎ ঋতু।

বসন্ত নিদাঘ বর্ষা চলি গেছে, এসেছে আশ্বিন!
অদূরে ধবল পৌষ! হের মম অর্দ্ধপক্ক কেশ
কহিছে—"হয়েছ বুড়া, অগ্নি প্রায় ভস্ম-অবশেষ;
জীবননলিনী তব রবে ফুল্ল আর কতদিন?

হে প্রবীণ! আশার দর্পণে এবে, সাজিয়ে নবীন,
কেন আর হের মুখ? ছাড় তব লালে-লাল বেশ
হোরি-খেলা সাঙ্গ তব; ঘরে নাই আবীরের লেশ;
হে প্রবীণ! কেন গাও? গেছে কণ্ঠ, ভাঙিয়াছে বীণ!"

জানি আমি সুন্দর এ শুভবাণী; তাই অমলিন
আমার এ 'শারদী'-আনন্দ! হের, পুলকবিহ্বলা
শারদী যামিনী আজি, স্বর্ণাম্বরা, কুসুমকুন্তলা;
জ্যোৎস্না হাসে, তরুণ শেফালি হাসে, অরুণ-নলিন!

অপূর্ব্ব আশ্বিনমাস;—মা আমার, হ'য়ে দশভূজা;
হাসিছেন হৃদিরাজ্যে! বারমাস একি দুর্গাপূজা!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

বঙ্গদর্শন।

মঙ্গলশক্তি।

মঙ্গলশক্তি বা ধর্ম্মবলের দ্বারা মনুষ্যসমাজ চালিত-রক্ষিত হ'তে পারে কি না, সে সম্বন্ধে অনেকেরই সংশয় আছে। অনেকের ধারণা, ধর্ম্মচর্চ্চার ফলে মনে একটি সুন্দর ও শান্তির ভাব উদয় হয় মাত্র,—তাতে কোন শক্তিলাভ হয় না, অতএব অধিকমাত্রায় ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত হ'লে লোকে শান্তিপ্রিয় হ'য়ে নিবীর্য্য হ'য়ে পড়্বে এবং এর দ্বারা মনুষ্যসমাজ ক্রমে ক্রমে অকর্ম্মণ্য হ'য়ে যাবে। এই ধারণার কারণ, ইঁহাদের সংস্কার আছে যে, শক্তিকে নষ্ট করাই ধর্ম্মের পথ, কিন্তু ধাতুর সামঞ্জস্য যেমন শারীরিক স্বাস্থ্যের মূল, মানসিক বা আভ্যন্তরিক শক্তি ও প্রবৃত্তির সামঞ্জস্যই সেইরূপ অন্তরের উন্নতি বা স্বাস্থ্যের মূল। শক্তিকে অবাধে ছুটিয়ে দেওয়াও যেমন ভুল, শক্তিকে সম্পূর্ণ রোধ করাও তেম্‌নি ভুল, শক্তির সাম্যই প্রকৃত ধর্ম্মের পথ। চাঞ্চল্য-বিনাশ হ'লে শক্তি প্রকৃতিস্থ হ'য়ে মঙ্গলশক্তিতে পরিণত হয়,—এই মঙ্গলশক্তির তেজই ব্রহ্মতেজ বা ধর্ম্মবল। শক্তির উদ্বোধন যে মানুষের উন্নতির উপায়, সকলেই জানেন, বোঝেন ও স্বীকার করেন এবং শক্তিচালনাই যে শক্তি-উদ্বোধনের উপায়, এও সকলেই জানেন—কিন্তু এই মঙ্গলশক্তির উদ্বোধনই যে মনুষ্যত্বলাভের একমাত্র উপায়, এ কথাটি বোধ হয় অনেকেই জানেন না অথবা বিশ্বাস করেন না। যথার্থ মঙ্গল মানুষের লক্ষ্য হ'লে, শক্তির বিশুদ্ধ অবস্থা বা মঙ্গলের শক্তি মনুষ্যের মধ্যে জাগ্রত হ'লে তার সফলতা ধ্রুব। যাঁর মধ্যে এই শক্তি জাগ্রত হয়েছে, তিনি নিজের কার্য্যসম্বন্ধে নিঃসংশয়। তিনি জানেন যে, এই শক্তি বর্ত্তমানে আমার মধ্যে স্থূল-হাতপা-মুখযোগে কার্য্য কর্‌ছেন, কিন্তু হাতপায়ের অর্থাৎ শরীরের পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হবেন না; আমার শরীর ধ্বংস হ'লেও, এই শক্তি ও তার কার্য্য অবিনাশী,—পরমাত্মা অনাদিকাল এই শক্তিরূপে আকাশে প্রকাশমান থেকে সৃষ্টিরক্ষা কর্‌ছেন।

বর্ত্তমান সভ্যজগৎ যে জ্ঞানের উপর চল্‌ছে, তাতে এ ভাব সহজে বিশ্বাস হবে না,—এ অবস্থাকে সত্য বলে' বোধ হবে না। বর্ত্তমানকালে ইউরোপীয় সভ্যতাই আদর্শ, এ ভাব, এ শিক্ষা, এর ফল ইউরোপীয়েরা ধারণাই কর্‌তে পারে না এবং সেইজন্যে আমাদের দেশের অনেক ইংরেজিশিক্ষিত লোকেরাও একে বিশ্বাস করেন না। ইউরোপীয়েরা জানে, ভাবের রাজ্য আলাদা, কাজের রাজ্য আলাদা—কিন্তু অন্তরে যিনি বা যাহা ভাবরূপে প্রকাশমান, তিনি বা তাহাই যে বাহিরে পূর্ণশক্তিযোগে কার্য্যে পরিণত হ'য়ে

জ্ঞানের সম্মুখে বস্তুরূপে প্রকাশমান, এ তাঁরা জানেন না। আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক যে একই যোগে বাঁধা, যিনি ভাবের আদর্শ তিনি যে কার্য্যেরও আদর্শ, এটি ভারতবর্ষীয় বিশ্বাস, ভারতবর্ষীয় ধারণা, ভারতবর্ষীয়ের কাছেই এই সত্যটি প্রকাশ পেয়েছিল :—ভারতবর্ষীয়েরাই জেনেছিলেন, অন্তরে পূর্ণভাবে যিনি আনন্দময়, বাহিরে পূর্ণশক্তিতে তিনিই মঙ্গলময়। যাঁর প্রকৃত ভারতবর্ষীয় হৃদয়, তিনি কখনো ইউরোপীয়ভাবে প্রতিপত্তিলাভ করে' তৃপ্ত হ'তে পারেন না। যাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গফল না হবে, যাতে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের একযোগে সাধন না হবে, তাতে ভারতবর্ষ কখনই সমস্ত হৃদয় দিতে পারবে না। এইটিই ভারতবর্ষের মর্ম্মগত, অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট ভাব। ভারতবর্ষের এটি ভাব বটে কিন্তু এই ভাব-অনুরূপ চলবার বিশুদ্ধশক্তির বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ অভাব। এই শক্তি উদ্বোধিত করারই এখন একমাত্র প্রয়োজন, এইটিই মনুষ্যের অন্তর্নিগূঢ় শক্তি ; এই বিশুদ্ধশক্তি বা মঙ্গলশক্তি উদ্বোধনের উপরই ভারতবর্ষের—শুধু ভারতবর্ষের নয়, মনুষ্যজাতির উন্নতি নির্ভর করছে।

বর্ত্তমানে আমাদের কর্ত্তব্য, কি উপায়ে আমাদের আভ্যন্তরিক শক্তি ও প্রবৃত্তিগুলি সামঞ্জস্য লাভ করে মঙ্গলশক্তিতে পরিণত হ'তে পারে, সে সম্বন্ধে অহরহ চিন্তা করা, মানুষমাত্রের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক অভাবকে সমভাবে দেখা, মানুষমাত্রেরই এই-তিনপ্রকার-অভাবমোচন-সম্বন্ধে অহরহ প্রস্তুত থাকা, এবং যখন যেটি উপস্থিত হবে, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বান্তঃকরণ তাতেই নিযুক্ত করা। যেরূপ মঙ্গলময় জীবন আমাদের আদর্শ,—আমাদের প্রার্থনীয়, উপরোক্তভাবে প্রস্তুত না হ'লে আমরা সে ফল লাভ করতে পারব না।

ভারতবর্ষের হৃদয় একেতে স্থাপিত, যেখানে সাকার-নিরাকার এক, যেখানে জড়-চেতন এক, যেখানে জ্ঞান-শক্তি এক, যেখানে ভাব বস্তু এক, স্থূল-সূক্ষ্ম এক, কার্য্য-কারণ এক, যেখানে জ্ঞান প্রেম-কর্ম্ম একত্র, এক কথায় সমস্ত দ্বন্দ্বের যেখানে সমন্বয়, এই বিশ্বরহস্যের যেখানে মীমাংসা, সেইখানেই ভারতবর্ষের জীবনী শক্তির মূল স্থাপিত, সেই স্থানটি স্পর্শ করতে না পারলে ভারতবর্ষ কখনই আত্ম-জাগ্রত হ'য়ে উঠবে না। আমাদের অন্তরেও ভাব বস্তু দুই আছে, বাহিরেও ভাব বস্তু দুই আছে ; অন্তরে ভাবের আধার বস্তু না থাকলে ভাব থাকতেই পারত না, বাহিরে বস্তুপ্রকাশের সঙ্গে ভাব না থাকলে বিশেষ বিশেষ রূপে বা বিশেষ বিশেষ ভাবে বস্তু প্রকাশ হ'ত না। এই উভয়ে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বত্র একত্র থাকা সত্ত্বেও সৃষ্টির বা প্রকাশের নিয়মানুসারে সাধারণত, স্থূলজ্ঞানে বাহিরে বস্তুবোধ হয়, ভাববোধ হয় না, অন্তরে ভাববোধ হয়, বস্তুবোধ হয় না ; অনুভবশক্তির বৃদ্ধিদ্বারা আমাদের অন্তরবাহ্যে মিলন হ'য়ে গেলে অন্তরবাহির পূর্ণ করে' যিনি বা যাহা আছেন, তিনি বা তাহাই পূর্ণরূপে প্রকাশ পাবেন এবং সেই প্রকাশে—ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ সচেতন হ'য়ে জাগ্রতভাবে আত্মসমর্পণ করে' নিজেকে, সমস্ত পৃথিবীকে, মনুষ্যজাতিকে উদ্ধার করবে, রক্ষা করবে ও কৃতার্থ করবে।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী।

গৌড়কাহিনী।

দেবকোট।

বরেন্দ্রমণ্ডলের একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর নাম "পুনর্ভবা।" তাহা প্রাচীনভারতের একটি পুণ্যতীর্থ বলিয়া সুপরিচিত ছিল।* সেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী দিনাজপুরপ্রদেশের একাংশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া, মালদহের অন্তর্গত রোহনপুরের নিকটে আসিয়া, "মহানন্দা"র সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সম্মিলনস্থানের নিকটে এখনও একটি বাণিজ্যবন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পার্শ্ব দিয়া "গোদাগাড়ী-কাটিহার"নামক নূতন রেলপথ নির্ম্মিত হইতেছে। পুরাকালে এই বন্দরটি বরেন্দ্রমণ্ডলের প্রধান বাণিজ্যদ্বার বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। এই পথে মিথিলার সহিত বরেন্দ্রভূমির পণ্যবিনিময় সাধিত হইত ;—এই পথে পালনরপালগণের সেনাপ্রবাহ বরেন্দ্র-মণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত ;—এই পথেই সেনরাজবংশের বিজয়ী বীরপুরুষবর্গের বিজয়-বৈজয়ন্তী কামরূপ পর্য্যন্ত প্রধাবিত হইত।

এই সকল কারণে পুনর্ভবাতীরে বিবিধ সম্পন্ন গ্রামনগর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। একটি রাজনগর এবং রাজদুর্গের শেষচিহ্ন এখনও সম্পূর্ণরূপে লোকলোচনের অন্তর্হিত হয় নাই। সে রাজনগরের নাম "গঙ্গারামপুর,"—রাজদুর্গের নাম "দেবকোট"। †

ইতিহাসের অভাবে গঙ্গারামপুরের এবং দেবকোটের নাম পর্য্যন্ত আধুনিক বাঙালীর নিকট অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে! বক্তিয়ার খিলিজি এদেশে রাজ্যবিস্তার করিবার সময় পর্য্যন্তও গঙ্গারামপুর এবং দেবকোট সকলের নিকট সুপরিচিত ছিল। বক্তিয়ার দেবকোটে সেনানিবাস সংস্থাপিত করিয়াছিলেন ; এবং দেবকোটেই তাঁহার জীবনলীলার অবসান হয়।

বক্তিয়ার খিলিজি দেবকোটে সেনানিবাস সংস্থাপিত করিবার পর দেবকোট "দমদমা" নামে কথিত হইতে আরম্ভ করে। ‡ এখনও সেই নাম প্রচলিত আছে। গৌড়পর্য্যটকগণ এখানে উপনীত হইবার জন্য ক্লেশস্বীকার করেন না। কিন্তু দেবকোট পরিদর্শন না

---

* "করতোয়া-মাহাত্ম্য"নামক পুরাতন সংস্কৃতগ্রন্থে "পুনর্ভবা" একটি পুণ্যতীর্থ বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই গ্রন্থ এক্ষণে বগুড়ানিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

† Professor Blochmann's Geography and History of Bengal as published in the J. A. S. B. for 1873 and 1874.

‡ Devkot, the chief place in Gangarampur (District of Dinajpur) is known by the name of "Damdama." Hamilton states that "it received its present appellation from its having been a military station during the early Mahomedan Government."—Thomas' Initial Coinage of Bengal, Part II., notes.

করিলে, গৌড়পরিদর্শন সম্পূর্ণ হইতে পারে না। বাঙালী স্বাধীনভাবে বাঙালীর ইতিহাসসঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলে, দেবকোটের পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের আয়োজন করিতে হইবে। তখন হয় ত দেবকোট আবার বাঙালীর নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠিবে।

দেবকোটের নিকটবর্ত্তী গঙ্গারামপুরের রাজনগর এখন একটি বিজনবনে পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষে এরূপ ভাগ্যবিবর্ত্তনের নিদর্শন দুর্লভ নহে। কত বীরবিক্রমের লীলাভূমি এইরূপে শ্বাপদনিবাসে পরিণত হইয়াছে! গঙ্গারামপুরের নাম মৃগয়ালোলুপ ইংরাজরাজপুরুষগণের নিকট সুপরিচিত। বনের মধ্যে এখনও একটি পুরাতন মস্‌জেদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা অযত্নে-অনাদরে ধীরে ধীরে লোকলোচনের অন্তর্হিত হইতেছে। কিন্তু তাহার কথা ঐতিহাসিক সমাজে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। কারণ, তাহাই এদেশের সর্ব্বপ্রাচীন মুসলমানমন্দির, সুলতান কাই কায়ুসের কীর্ত্তি বলিয়া উল্লিখিত। এই সকল কারণে গঙ্গারামপুর এবং দেবকোট বাঙালী হিন্দুমুসলমানের নিকট সমভাবে সমাদরলাভের যোগ্য। তাহার সহিত কত জয়পরাজয়ের পুরাকাহিনী সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। সে কাহিনী গৌড়কাহিনী,—বৃহৎ এবং সুন্দর!

মুসলমানগণ এদেশে আসিয়া সহসা গ্রামনগরের নূতন নামকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া, অনেকদিন পর্য্যন্ত পুরাতন নামানুসারেই রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। তজ্জন্য মুসলমানের ইতিহাসে দেবকোটের নাম পুনঃপুন উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান ইতিহাসলেখকগণ বলেন,—বক্তিয়ার খিলিজি লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়া তথায় বহুসংখ্যক মস্‌জেদ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না, তাহাতে নানা সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

প্রথম সংশয়,—লক্ষ্মণাবতীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বক্তিয়ারনির্ম্মিত কোন পুরাতন মস্‌জেদের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেরূপ কোন জনশ্রুতিও বর্ত্তমান নাই। মুসলমানগণের দেবমন্দির বিনষ্ট করিয়া মস্‌জেদ রচনা করিবার প্রমাণপরম্পরার অভাব নাই। মুসলমান ইতিহাসলেখকগণ পুণ্যকীর্ত্তির পরিচয়স্থল বলিয়া সগর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মুসলমানগণ পুরাতন মস্‌জেদ ভাঙিয়া নূতন মস্‌জেদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বক্তিয়ার লক্ষ্মণাবতীতে কোন মস্‌জেদ নির্ম্মিত করিয়া থাকিলে, তাহার চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইত বলিয়া বোধ হয় না। বরং মুসলমানকর্ত্তৃক তাহা সযত্নে সুরক্ষিত হইত। লোকসমাজ হইতেও তাহার জনশ্রুতি একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারিত না। মিনহাজ উদ্দীন লিখিয়া গিয়াছেন,—বক্তিয়ার লক্ষ্মণাবতীতে মস্‌জেদ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। এ কথার অন্য কোন প্রমাণ বর্ত্তমান নাই। পরবর্ত্তী ইতিহাসলেখকগণ সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া গিয়াছেন। মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করিতে হইলে যেরূপ নিশ্চিন্তভাবে রাজধানীতে বাস করা আবশ্যক, বক্তিয়ার একদিনের জন্যও সেরূপ নিশ্চিন্তভাবে লক্ষ্মণাবতীতে বাস করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি আদৌ লক্ষ্মণাবতীতে বাস করিয়াছিলেন কি না,

তাহারও প্রমাণাভাব। তখন বিপ্লবকাল,—নিয়ত যুদ্ধকোলাহল;—নিয়ত জয়পরাজয়;—নিয়ত যুদ্ধযাত্রা এবং প্রত্যাবর্ত্তন;—নিয়ত অশান্ত আস্ফালন!

দ্বিতীয় সংশয়,—লক্ষ্মণাবতীতে রাজকার্য্য পরিচালিত হইবার প্রমাণাভাব। সত্য বটে, বক্তিয়ারের লক্ষ্মণাবতী হইতে রাজমুদ্রা প্রচারিত করিবার কথা মিন্‌হাজের ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়া পরবর্ত্তী ইতিহাসে অবিকল উদ্ধৃত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু ইহাও সত্য যে,—আজ পর্য্যন্ত বক্তিয়ার খিলিজির নামাঙ্কিত বা তৎকাল-মুদ্রিত কোন রাজমুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই! তখন পুরাতন ভাঙিয়া নূতন গড়িয়া তুলিবার অকৃত্রিম আগ্রহ বক্তিয়ার খিলিজিকে দিগ্বিজয়ে ব্যাপৃত রাখিয়াছিল;—তাঁহাকে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবার অবসর প্রদান করে নাই। তজ্জন্য বক্তিয়ার কোন নির্দ্দিষ্ট রাজধানীতে অবস্থিতি করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে শিবিরে শিবিরে পরিভ্রমণ করিয়াই জীবনক্ষয় করিতে হইয়াছিল। লক্ষ্মণাবতী নামমাত্র রাজধানী;—যেখানে বক্তিয়ার যখন উপস্থিত থাকিতেন, তাহাই তখন প্রকৃতপ্রস্তাবে রাজধানী বলিয়া ব্যবহৃত হইত। তজ্জন্য সেকালের ইতিহাসে রাজধানীর উল্লেখ করিতে গিয়া লেখকগণ "লক্ষ্মণাবতী-দেবকোট" এই যুক্ত-নামের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

আর একটি সংশয়,—লক্ষ্মণাবতীপ্রদেশে অতি পুরাতন মুসলমান-জায়গীরের অভাব। বক্তিয়ার এদেশে আসিয়া জায়গীরদানে সেনানায়কগণকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। তাহা তৎকালের সুপরিচিত শাসননীতি হইয়া উঠিয়াছিল। তৎসূত্রে এদেশে খিলিজিবংশীয় সম্ভ্রান্ত বীরপুরুষগণ জায়গীরদাররূপে পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বশীভূত করিবার উপায়-উদ্ভাবনায় দিল্লীর সিংহাসনও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। খিলিজিদিগের এই সকল জায়গীর দেবকোটপ্রদেশে;—লক্ষ্মণাবতী-অঞ্চলে এরূপ জায়গীর দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রাকৃতিক-সংস্থান-গুণে দেবকোট দুর্গ-নির্ম্মাণের উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। নদীবহুল সমতলক্ষেত্রে দেবকোট যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিত বলিয়াই এরূপ হইয়া থাকিবে। কোন্ সময়ে তথায় রাজদুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার জনশ্রুতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তবে মুসলমানাধিকার প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই যে তথায় রাজদুর্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাতে সংশয়-প্রকাশের কারণ নাই। বক্তিয়ার তথায় দুর্গ-নির্ম্মাণ করিলে, তাহার নাম "দেবকোট" হইত না।

দেবকোটের রাজদুর্গ কি পালবংশীয় দেবপালদেবকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল? দেবপালের নামের সঙ্গে দেবকোটের নামের সাদৃশ্য এইরূপ একটি অনুমানের প্রশ্রয়দান করিয়া থাকে। পালবংশীয় নারায়ণপালদেবের প্রধানমন্ত্রী ভট্টগুরব দিনাজপুরপ্রদেশে পত্নীতলা-থানার অন্তর্গত "বাদাল"নামক স্থানে যে "গরুড়স্তম্ভ" প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার খোদিত লিপিতেও এরূপ অনুমানের ঐতিহাসিক ভিত্তির সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়।*

* "ঐতিহাসিক চিত্র" নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার লিপিকরপ্রমাদে আমার অমার্জ্জনীয় অনবধানতায় বাদাল "বোদাল" নামে মুদ্রিত হইয়াছিল। আমার সেই ভ্রমপ্রমাদ এখন বঙ্গসাহিত্যে অমর হইতে চলিয়াছে।

গরুড়স্তম্ভের শ্লোকাবলীতে যে পুরাকাহিনী খোদিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা কবিকল্পনাবলে কিয়ৎপরিমাণে অতিরঞ্জিত হইতে পারে, সর্ব্বথা অমূলক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এই স্তম্ভলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—ভট্টগুরবের প্রপিতামহ দর্ভপাণি মিশ্র একজন অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ রাজমন্ত্রী বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রণাকৌশলেই দেবপালদেব দিগ্বিজয়সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। পালনরপালগণ এদেশে রাজ্যবিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়া আপন-আপন নামানুসারে এদেশের অনেক গ্রামনগরের নামকরণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি অনেক গ্রামনগরে তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। দেবকোট এইরূপে দেবপালদেবের নামকে চিরস্মরণীয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কি না, তাহার তথ্যানুসন্ধান আবশ্যক।

বক্তিয়ার খিলিজির অষ্টাদশ অশ্বারোহীর অলৌকিক দিগ্বিজয়কাহিনী বঙ্গসাহিত্যে স্থানলাভ করিয়া, তথ্যানুসন্ধানের জন্য বাঙালীকে উৎসাহশূন্য করিয়া তুলিয়াছে। তথাপি তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, এই কাহিনীতে আস্থাস্থাপন করা যায় না। সেকালে দেবকোটের নিকটবর্ত্তী বরেন্দ্রমণ্ডলের একাংশেই কেবল খিলিজিপ্রাধান্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার প্রবেশদ্বারে (দেবকোটে) বক্তিয়ারের সেনানিবাসস্থাপন এবং তাঁহার অক্লান্ত রণশ্রম অষ্টাদশ অশ্বারোহীর অলৌকিক কাহিনীর সহিত সামঞ্জস্যরক্ষা করিতে পারে না। প্রকৃতপ্রস্তাবে সেকালের বরেন্দ্রভূমি বহুসংখ্যক সামন্তনরপতির অধীন ছিল। তাঁহারা পালনরপালগণের এবং সেননরপালগণের রাজসভায় শোভাবর্দ্ধন করিতেন; মহাসামন্তাধিপতি উপাধিযুক্ত এক সামন্তনরপালের কথা ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনেও উল্লিখিত আছে। সামন্তনরপতিগণ দুর্ব্বলহস্তে অসিধারণ করিতেন না।* তাঁহাদিগকে পরাভূত করিবার জন্যই বক্তিয়ার দেবকোটে সেনানিবাস সংস্থাপিত করিয়া আজীবন যুদ্ধকলহে ব্যাপৃত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিল তিল করিয়া বরেন্দ্রভূমি অধিকার করিতে হইয়াছিল, তথাপি সকল স্থান বক্তিয়ারের করতলগত হয় নাই। বক্তিয়ার খিলিজি যতদূর অধিকারবিস্তারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহাই এদেশের সর্ব্বপ্রথম মুসলমানরাজ্য। ইতিহাসে তাহা যে নামে কথিত হউক না কেন, তাহার প্রকৃত আয়তন অধিক ছিল না। মুসলমানের ইতিহাসে তাহা "বঙ্গ-

রং পুর-শাখাসভার "সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা"র ১৩১৩ সালের দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত কালাকান্ত বিশ্বাস মহাশয় "বোদাল" নামের ব্যবহার করিয়াছেন। আমার এতদ্বিষয়ক পূর্ব্বলিখিত প্রবন্ধের উল্লেখ না করিয়া, বিশ্বাসমহাশয় কিরূপে আমার অনিচ্ছাকৃত ভ্রমপ্রমাদ গ্রহণ করিলেন, তাহা কৌতূহলের ব্যাপার। কেবল তাহাই নহে, আমার উল্লিখিত প্রবন্ধের আরও অনেক ভ্রমপ্রমাদ বিশ্বাসমহাশয়ের প্রবন্ধেও স্থানলাভ করিয়াছে।

* বরেন্দ্রমণ্ডলের সামন্তগণ কিরূপে বক্তিয়ার খিলিজির গতিরোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অধ্যাপক ব্লক্‌ম্যান লিখিয়া গিয়াছেন;—

"The Rajas of Northern Bengal were powerful enough to preserve a semi-independence in spite of the numerous invasions from the time of Bakhtiar Khiliji, when Devkot, near Dinajpur, was looked upon as the most important military station towards" the north.—Geography and History of Bengal, J. A. S. B. 1873.

দেশ” বা “বাঙ্গালা” নামে পরিচিত ছিল না, —“লক্ষ্মণাবতী-দেবকোট” নামেই পরিচিত ছিল। সুতরাং দেবকোটই এ দেশের সর্ব্বপ্রথম মুসলমানরাজধানী।

দেবকোটের পুরাতন কাহিনী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বক্তিয়ার খিলিজির সমসাময়িক অনেক কাহিনী এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। বক্তিয়ার খিলিজির বিজয়লাভের কাহিনী নানাভাবে ভারতব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার আত্মীয়-অন্তরঙ্গ অনেকেই নবরাজ্যে আগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে দেবকোটের মুসলমানসেনানিবাস সহস্র সহস্র সেনা ও সেনানায়কে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। দেবকোটপ্রদেশে এইরূপে যে সামরিক শক্তি সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা রাজ্যবিস্তারে নিযুক্ত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। একদল মহম্মদ শেরানের অধীনে উৎকলাভিমুখে ধাবিত হইল; আর এক দল—দশসহস্র অশ্বারোহী—বক্তিয়ারের অধীনে পূর্ব্বোত্তরে বিজয়যাত্রা করিল।

পশ্চিমে মহানন্দা, পূর্ব্বে করতোয়া,—ইহাই বরেন্দ্রমণ্ডলের সুপরিচিত সীমা। তাহার বাহিরে,—পশ্চিমে মিথিলা, পূর্ব্বে কামরূপ। এই সীমাভুক্ত ভূভাগ বিবিধ শস্যসম্পদে পরিপূর্ণ ছিল; অদ্যাপি তাহা “বহুশস্যপূর্ণ” বলিয়া পরিচিত আছে। এখনকার ন্যায় সেকালেও বরেন্দ্রমণ্ডলের অধিবাসিবর্গ শিক্ষিত-অশিক্ষিত দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এখনকার ন্যায় তখনও শিক্ষিত অপেক্ষা অশিক্ষিতের সংখ্যাই অধিক ছিল। অশিক্ষিতগণ কোচ, মেচ, পলিয়া, পুণ্ড্রীক প্রভৃতি বিবিধ নামে আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করিত। তাহারাই সর্ব্বপ্রথমে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

মেচজাতীয় একজন প্রধানপুরুষ এইরূপে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বক্তিয়ার খিলিজির রাজ্যবিস্তারের পথপ্রদর্শক হইয়াছিল। বক্তিয়ার তাঁহাকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করাইয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন—আলি। সে মুসলমান হইয়াও, ইতিহাসে আলি নামে পরিচিত হইতে পারে নাই;—আলি মেচ নামে পরিচিত হইয়া রহিয়াছে।

আলিমেচের প্ররোচনায় বক্তিয়ার খিলিজি দশসহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে যে বিজয়যাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার শেষ বিজয়যাত্রা। জেনোফোনের ন্যায় ইতিহাসলেখক ছিলেন বলিয়া, গ্রীকজাতির “দশসহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন”কাহিনী সভাসমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। সেরূপ কোন ইতিহাসলেখক ছিল না বলিয়াই, বক্তিয়ার খিলিজির “দশসহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন”কাহিনী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! প্রসঙ্গক্রমে মিনহাজ উদ্দীন যাহাকিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই দেখিতে পাওয়া যায়,—দশসহস্রের মধ্যে একসহস্রও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে নাই,—অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী লইয়া বক্তিয়ার খিলিজি কোনরূপে দেবকোটে উপনীত হইয়াছিলেন।* কিরূপে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে, বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

আলিমেচ পথপ্রদর্শক হইয়া বক্তিয়ার খিলিজিকে করতোয়াতটে আনয়ন করিলে, বক্তিয়ার দেখিতে পাইলেন—করতোয়া বড় খরস্রোতা। সেকালের করতোয়া একালের

ন্যায় শীর্ণকায় ছিল না। তাহার তীরে যে সকল প্রান্তদুর্গ বর্ত্তমান ছিল, তাহার সামন্ত-নরপালগণও দুর্ব্বলহস্তে অসিধারণ করিতেন না। সুতরাং করতোয়াতটে উপনীত হইবামাত্র মহাস্থান, বর্দ্ধনকোট প্রভৃতি দুর্গমূলে মুসলমানসেনাকে বহু যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। বক্তিয়ার এই সকল স্থানে করতোয়া পার হইবার সুবিধা না পাইয়া, দশদিন পর্য্যন্ত উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। দশদিনের পর একটি প্রস্তরনির্ম্মিত পুরাতন সেতু দৃষ্টিপথে পতিত হইল।* তাহা উত্তীর্ণ হইলেই কামরূপরাজ্য।

কামরূপেশ্বর বক্তিয়ার খিলিজির তিব্বৎ-আক্রমণের আকাঙ্ক্ষার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে নিরস্ত হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন। বক্তিয়ার তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, সেতু উত্তীর্ণ হইয়া উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। যে অল্পসংখ্যক সেনা সেতুরক্ষার জন্য পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, তাহারা সেতুরক্ষা করিতে পারিল না। কামরূপেশ্বরের প্রকৃতি-পুঞ্জের আক্রমণে অনেকেই পঞ্চত্বলাভ করিল, কেহ কেহ পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। বক্তিয়ার ইহার সংবাদ পাইলেন না; তিনি তিব্বৎবিজয়ের সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া দার্জিলিঙের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে সেতু ভগ্ন করিয়া, নিকটস্থ গ্রামনগর ও শস্যক্ষেত্র ভস্মীভূত করিয়া, কামরূপনিবাসিগণ সুদূর স্থানে শিবির-সন্নিবেশ করিয়া রহিল।

বক্তিয়ার অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, পার্ব্বত্যসেনার প্রচণ্ড পীড়নে তাঁহার সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া সেতুর নিকট উপনীত হইবামাত্র তাঁহার ধৈর্য্য-বীর্য্য অন্তর্হিত হইয়া গেল। একপক্ষ কি কষ্টে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। কি অশ্ব, কি অশ্বারোহী, কাহারও পক্ষে খাদ্যলাভের উপায় নাই;—গ্রামনগর শস্যশূন্য, ক্ষেত্রসকল তৃণশূন্য,—চারিদিকে যেন মরুভূমির ন্যায় বিভীষিকার চিত্র বদনব্যাদান করিয়া মুসলমানসেনাদলকে গ্রাস করিতে আসিতেছে! †

বক্তিয়ারের সেনাদল অশ্বগুলিকে নিহত করিয়া, তাহার মাংসে উদরপূর্ত্তি করিতে আরম্ভ করিল। মুসলমানলিখিত ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়,—অশ্বগুলি ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুর জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিতে লাগিল। ‡ এরূপ ক্ষেত্রে সেতু-নির্ম্মাণ না করা পর্য্যন্ত বক্তিয়ার একটি পরিত্যক্ত দেবমন্দিরে আশ্রয়গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

মন্দিরে আশ্রয়লাভ করিয়াও, বক্তিয়ার খিলিজি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। কামরূপের প্রজাপুঞ্জ মন্দির বেষ্টন করিয়া বংশ-

---

* মুসলমানদিগের ইতিহাসে লিখিত আছে,—এই সেতু ২৯খিলানযুক্ত ছিল। যাঁহারা বলেন, মুসলমান আসিবার পূর্ব্বে এদেশের লোকে খিলাননির্ম্মাণের কৌশল জানিত না, তাঁহারা এই বর্ণনা পাঠ করিলে ভাল হয়।

† And since the inhabitants of those environs, setting fire to the fodder and food-grains, had removed their chattels to the ambuscades of the rocks, at the time of this retreat for fifteen days, the soldiers did not see a handful of foodgrains, nor did the cattle see one bushel of fodder.—*Riaz-us-Salateen.*

‡ From excessive hunger the soldiers devoured flesh of horses, and horses, prefer-ring death to life, placed their necks under their daggers.—*Ibid.*

প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা যে এইরূপে বক্তিয়ারকে সসৈন্যে অবরুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিবে, তাহা বুঝিতে আর ইতস্তত রহিল না। সম্মুখে খরস্রোতা করতোয়া, তাহা উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই; চারিদিকে শত্রুদল বংশপ্রাচীরনির্ম্মাণে নিযুক্ত, তাহা নির্ম্মিত হইলে আর বাহিরে আসিবার উপায় থাকিবে না। এরূপ অবস্থায় বক্তিয়ার মন্দির ত্যাগ করিয়া নদীতীরে আসিতে বাধ্য হইলেন। শত্রুসেনা পশ্চাদ্ধাবন করিল; মুসলমান অশ্বারোহিগণ নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইতে লাগিল। তীরে দাঁড়াইবার স্থান না পাইয়া বক্তিয়ার নিজেও নদীসন্তরণে প্রবৃত্ত হইলেন। যে দশসহস্র মুসলমানসেনা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একশত মাত্র বক্তিয়ার খিলিজির সহিত অপর তীরে উপনীত হইল।*

এইরূপে বিপর্য্যস্ত হইয়া, বক্তিয়ার খিলিজি দেবকোটে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অনাহারে, অনিদ্রায়, অচিন্তিতপূর্ব্ব চিত্তক্ষোভে বক্তিয়ারের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। লোকে তাহার জন্য সহানুভূতিপ্রকাশ না করিয়া, অবজ্ঞাপ্রকাশ করিতে লাগিল। যে সকল অশ্বারোহী এইরূপে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, তাহাদের স্ত্রীপুত্র বক্তিয়ারকে প্রকাশ্যভাবে ধিক্কার করিতে লাগিল। বক্তিয়ারের বীরহৃদয় কিছুতে বিচলিত হইত না; ইহাতে বিচলিত হইয়া উঠিল; তিনি বস্ত্রাভ্যন্তরে মুখ লুকাইয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন। সেই শয্যাই তাঁহার শেষশয্যা হইল।†

দেবকোটের মুসলমানশিবির এইরূপে নানা অন্তর্বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। যাঁহার অসীম সাহসমাত্র অবলম্বন করিয়া মুসলমানসেনা এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু মুসলমানের নূতন রাজধানীকে সমরক্ষেত্রে পরিণত করিল। দেবকোট এইরূপে বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠিল। বক্তিয়ার দেবকোটে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন,—সে কথা সকল ইতিহাসেই স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু কিরূপে তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হয়, তদ্বিষয়ে মতভেদের অভাব নাই।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

* Only Mahammed Bakhtiar with one thousand cavalry (and according to another account, with three hundred cavalry) succeeded in crossing over; the rest met with a watery grave.—*Riaz-us-Salateen.* এই বর্ণনা রিয়াজ উস্ সলাতিনে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মিনহাজ লিখিয়া গিয়াছেন, একশত মাত্র বক্তিয়ারের সহিত অপর তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। মিনহাজ প্রায় সমসাময়িক লেখক বলিয়া, তাঁহার উক্তিই সমধিক বিশ্বাসযোগ্য। রিয়াজের ইংরাজী অনুবাদক টীকাসংযোগে তাহাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যথা—

Tabaquat-i-Nasiri (Persian printed text, p. 156) states that Bakhtiar Khilji successfully swam across the river with only one hundred troopers, whilst all the rest of his army were drowned.

† After Mahammad Bakhtiar had crossed safely over the tumultuous river with a small force, from excessive rage and humiliation, in that the females and the children of the slaughtered and the drowned from alleys and terraces abused and cursed him, he got an attack of consumption, and reaching Devkot died.—*Riaz-us-Salateen.*

জন্মতত্ত্ব।

জীব হইতে জীবের উৎপত্তি হয়, কিন্তু অজৈব জিনিষ হইতে জীবের উৎপত্তি হইতে পারে কি না, এই প্রশ্নটি লইয়া প্রায় চাবিশত বৎসর ধরিয়া বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে খুব আলোচনা চলিতেছে। প্রতি বৎসরই এই ব্যাপারের নূতন নূতন তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে।

একটা কথা আছে—"নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"। আমাদের বৈজ্ঞানিকগণ ঋষি না হইলেও, যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা যে-কোন গতিকে একএকটা উদ্ভট সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়া তর্ককোলাহলের সৃষ্টি করিতে না পারেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে কেহ বৈজ্ঞানিক বলিয়াই মানে না। সেদিন একটা কাগজে পড়িতেছিলাম, আমেরিকাবাসী একজন ভদ্রলোক আমাদের পৃথিবীর এক-শ্চন্দ্রা-অপবাদ ক্ষালন করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, এবং ইহার ফলে তিনি নাকি আমাদের পৃথিবীর একটি দ্বিতীয় চন্দ্রের সন্ধান পাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, এইরকম আজগুবি সংবাদ বৈজ্ঞানিকভাসায় প্রকাশ করিয়া একটা গোলযোগ না বাধাইলে, আমরা ঐ ভদ্রলোকটির অস্তিত্বের কথাটি পর্য্যন্ত জানিতে পারিতাম না। যাহা হউক, যখন প্রশ্ন উঠিল,—জীব কি কেবল জীব হইতেই প্রসূত? তখন একদল পণ্ডিত তাহাতে "হাঁ" দিলেন, এবং আর কতকগুলি বৈজ্ঞানিক "না" বলিয়া একটা বৃহৎ দল গড়িয়া তুলিলেন।

জড়বিজ্ঞানের প্রথম যুগে ঐ "না"-বাদীর দলটিই খুব পুষ্ট ছিল। ইঁহারা উচ্চকণ্ঠে বলিতেন,—প্রাণীর জন্মের জন্য সকল স্থানে পিতৃমাতৃত্ব আবশ্যক হয় না, আমাদের সমক্ষে নিয়তই অজৈবপদার্থ হইতে আপনা হইতে জীবের জন্ম হইতেছে। ইহার উদাহরণ চাহিলে তাঁহারা বলিতেন, মৃতজীবের দেহ কিছুদিন রাখিয়া দাও, কয়েকদিন পরে দেখিবে, তাহাতে ছোটবড় নানাপ্রকার পোকা জন্মিয়াছে। এই সকল কীটকে কখনই মৃতজীবের বংশধর বলা যায় না, সুতরাং সেগুলি যে আপনা হইতেই গলিত জীবদেহে উৎপন্ন হয়, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে হেলমণ্ট-(Van Helmont)-নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক স্বতোজননবাদীদিগের মধ্যে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার অশেষ কীর্ত্তি আজও তাঁহার নানা পুস্তকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। স্বতোজননের উদাহরণ দিতে গিয়া ইনি বলিয়াছিলেন, একটি পাত্রে কতকগুলি ধান্য বা গোধূম রাখিয়া একখণ্ড অপরিচ্ছন্ন বস্ত্রদ্বারা যদি তাহার মুখ বন্ধ করা যায়, তবে একুশদিন পরে দেখিবে, বস্ত্রের দুর্গন্ধ বাষ্প শস্যের সহিত মিশিয়া বড়বড় মূষিক উৎপন্ন করিয়াছে। এই বৈজ্ঞানিকটি দুর্গন্ধকেই স্বতোজননের মূলকারণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। জলাভূমির নীচেকার দুর্গন্ধময় বাষ্পই ভেক, জোঁক ও

নানাজাতীয় মৎস্যাদি উৎপন্ন করে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে সময়ে হেল্‌মণ্টের ন্যায় বৈজ্ঞানিকগণ তর্কজাল বিস্তার করিয়া বিজ্ঞানজগতে আধিপত্য করিতেছিলেন, তখন সে বিজ্ঞানের কোন কথাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার মত ছিল না। যে দুইএকজন বৈজ্ঞানিক স্বতোজননের বিরোধী ছিলেন, হেল্‌মণ্টপ্রমুখ বৈজ্ঞানিকদিগের উচ্চ কোলাহলে তাঁহাদিগকে নির্বাক্ হইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

স্বতোজননবাদিগণের এই প্রাধান্য কতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল, তাহা ঠিক্ করিয়া বলা কঠিন। তবে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষকালে বিখ্যাত ইটালিয়ান্ বৈজ্ঞানিক রেডিসাহেব (Francesco Redi) উক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে যে ঐ দলের অধঃপতন হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত।

রেডিসাহেব একখণ্ড মাংস ও একখানি সূক্ষ্মবস্ত্র হাতে করিয়া বৈজ্ঞানিকসমাজে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, তিনি কেবলমাত্র ঐ দুটি জিনিষের সাহায্যে স্বতোজননবাদিগণের সিদ্ধান্তের ভ্রম প্রতিপন্ন করিবেন। মাংসখণ্ডটিকে একটি পাত্রে রাখিয়া, তাহার মুখ ঐ সূক্ষ্মবস্ত্রদ্বারা আবৃত করা হইল। মাংস গলিত হইয়া গেল, কিন্তু তাহাতে কীট উৎপন্ন হইল না।

এই সহজ পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিকসাধারণ বুঝিলেন, গলিত মাংস হইতে পোকা আপনা হইতে উৎপন্ন হয় না। নানাজাতীয় মক্ষিকা বাহির হইতে আসিয়া মাংসের উপর অণ্ডপ্রসব করিলে, তাহা হইতেই কীট উৎপন্ন হয়। স্বতোজননবাদিগণ এই পরীক্ষায় নির্বাক্ হইয়া পড়িলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন অণুবীক্ষণযন্ত্রের উদ্ভাবন হয় নাই। রেডিসাহেবের মৃত্যুর অনেকদিন পরে, বস্ত্রাবৃত পাত্রের গলিত-মাংস অণুবীক্ষণযন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছিল, মক্ষিকার গমনাগমন রোধ করায় মাংসে বড় পোকা জন্মিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাহাতে ছোট ছোট আণুবীক্ষণিক কীটের অভাব নাই। স্বতোজননবাদিগণ আবার এক সুযোগ পাইয়া গেলেন। তাঁহারা দল বাঁধিয়া বলিতে লাগিলেন, বাহিরের কীটাদি হইতে কখনো মাংসের কীট উৎপন্ন হয় না, নচেৎ বস্ত্রখণ্ডদ্বারা পাত্রের মুখ আবদ্ধ রাখিলেও সহস্র-সহস্র ক্ষুদ্র কীটদ্বারা মাংস আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে কেন। কিন্তু রেডির শিষ্যগণ আবার শীঘ্রই স্বতোজননবাদিগণের কণ্ঠরোধ করিয়াছিলেন। ইঁহারা মাংসখণ্ডটিকে কিছুকালের জন্য ফুটন্ত জলপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া, ঐ অবস্থায় পাত্রের মুখ গলিতধাতু বা কাচদ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। পরীক্ষায় দেখা গেল, মাংসখণ্ডে ক্ষুদ্রবৃহৎ কোনপ্রকার কীটই উৎপন্ন হইল না। গলিতমাংসস্থ কীটগুলি যে স্বতোজননজাত জীব নয়, এই পরীক্ষায় নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছিল।

রেডির শিষ্যগণ পূর্ব্বোক্তপ্রকার নানা পরীক্ষায় যখন স্বতোজননবাদের মূলোচ্ছেদের উদ্যোগ করিতেছিলেন, সে সময় জৈবপদার্থের পচনসম্বন্ধে একটি মতবাদ প্রচলিত ছিল। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বুফন্ (Buffon)-সাহেব এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি বলিতেন,

জৈব ও অজৈব পদার্থের উপাদানের মূলে একটা বড়রকমের পার্থক্য আছে। আমরা যাহাদিগকে জৈবপদার্থ বলি, তাহাদের প্রত্যেকটিই কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবাণুদ্বারা গঠিত। অজৈব জিনিষের গঠনে অবশ্য এই জীবাণু আবশ্যক হয় না। জৈব-জিনিষ যখন সজীব থাকে, তখন তাহাদের দেহের সেই জীবাণুগুলি বেশ জোট্ বাঁধিয়া থাকিতে পারে। কাজেই তখন আমরা তাহাদের অস্তিত্বলক্ষণ দেখিতে পাই না। জীব মরিয়া গেলে যখন তাহার গঠনোপাদান অর্থাৎ সেই জীবাণুগুলি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে আরম্ভ করে, তখনি তাহাদের কার্য্য দেখা যায়। বুফন্‌সাহেবের মতে, গলিত-মাংসস্থ আণুবীক্ষণিক কীটগুলি সেই বিচ্ছিন্ন জীবাণু ব্যতীত আর কিছুই নয়। রেডির শিষ্যগণের পরীক্ষায় যখন দেখা গেল, আবদ্ধ-মুখপাত্রস্থ মাংস গলিত হইলেও কীট উৎপন্ন করে না, তখন পূর্ব্বোক্ত মতবাদটির উপরেও ঘোর অবিশ্বাস আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লিবিগ্-(Liebig)-সাহেবের নাম পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। ইনি নানা পদার্থের পচন ও গেঁজানো (Fermentation) প্রসঙ্গে অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে স্থির হইয়াছিল, বায়ুর অক্সিজেন্‌বাষ্প উদ্ভিদ বা প্রাণীর মৃত-দেহের সংস্পর্শে আসিলে, অক্সিজেনের অণুসকল জীবদেহের অণুগুলিকে ভাঙিতে আরম্ভ করে, এবং ইহা দ্বারাই জীবদেহ বিশ্লিষ্ট হইলে আমোনিয়া (Ammonia) ও অঙ্গারকবাষ্প ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

বাতাসে উন্মুক্ত না রাখিলে কোন জিনিষেরি পচন সুরু হয় না, তাহা আমরা জানি। কিন্তু জৈবপদার্থমাত্রকেই বায়ুর সংস্পর্শে রাখিবামাত্র যে তাহারা পচিতে আরম্ভ করে, এ কথা ঠিক্ নয়। চিনি ও শ্বেতসার প্রভৃতি পদার্থ বায়ুতে বহুকাল উন্মুক্ত রাখিলেও সেগুলি বেশ ভাল অবস্থাতেই থাকে। কিন্তু তাহাতে কিণ্ব বা পচনবীজ (Yeast) সংযুক্ত করিলেই সেগুলি গেঁজিতে আরম্ভ করে। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া লিবিগ্‌সাহেব চিনি ও শ্বেতসার প্রভৃতি জৈবপদার্থকে প্রাণিদেহজ জিনিষ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, দধি, চিনি ও শ্বেতসার প্রভৃতি পদার্থকে যখন আমরা পচনবীজযুক্ত করি, তখন সেই বীজের অণুসকল ঐ সকল পদার্থের অণুগুলিকে ভাঙিয়া-চুরিয়া পদার্থান্তরে পরিণত করিয়া ফেলে, এবং তাহাতেই আমরা দুগ্ধ ও শর্করাকে দধি ও মদ্যে পরিণত হইতে দেখি।

রেডিসাহেবের শিষ্যগণ যখন স্বতোজনন-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহার মূলচ্ছেদের ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তখন লিবিগের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটি প্রচারিত হওয়ায়, তাঁহাদের সকল আয়োজন ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। স্বতোজননবাদিগণ এই সুযোগে তাঁহাদের দল বেশ পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং নবসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া নির্জ্জীব পদার্থ হইতে সজীবের উৎপত্তির কথা আবার নূতন করিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

স্বতোজননবাদীদিগের এই জয়োল্লাস

অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী-পণ্ডিত পাষ্টর্-(Pasteur)-সাহেব নানাজাতীয় কীটাণু ও জীবাণুর (Yeast) অদ্ভুত-কার্য্যের কথা প্রচার করিলে, তাঁহাদের দলের আবার নূতন করিয়া অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল। পাষ্টর্সাহেব লিবিগের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, দুগ্ধ ও চিনির দধি ও মদ্যে পরিবর্ত্তিত হওয়া বা মৃত জীবদেহের পচনব্যাপার অক্সিজেনের কার্য্য নয়। আকাশের বায়ুতে সর্ব্বদাই নানাজাতীয় অতি সূক্ষ্ম জীবাণু ভাসিয়া বেড়াইতেছে, এইগুলি যখন মৃত জীবদেহকে আশ্রয় করে, তখন সাধারণজীবের ন্যায় তাহারা বংশবৃদ্ধি করিয়া মৃতদেহটিকে গলিত করিয়া তুলে। দধি ও মদ্যের উৎপত্তিও জীবাণুর কাজ। দুগ্ধের দধিবীজ ও চিনি বা দ্রাক্ষারসের কিণ্ব সেই জীবাণু ব্যতীত আর কিছুই নয়। ঐ সকল জীবাণুর কয়েকটিমাত্র দুগ্ধ বা শর্করায় আশ্রয়গ্রহণ করিয়া সমস্ত জিনিষটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, এবং তাহারাই উক্ত জিনিষগুলির রাসায়নিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। পাষ্টর্সাহেব সুকৌশলে বায়ুস্থ সমগ্র জীবাণুকে নষ্ট করিয়া সেই বায়ুর ভিতরে মাংস ইত্যাদি পচনশীল পদার্থ রাখিয়াছিলেন। মাংসের অণুমাত্র বিকার দেখা যায় নাই।

যে সকল ব্যাপার অবলম্বন করিয়া প্রাচীন দল স্বতোজননের উদাহরণ দিতেন, পাষ্টর্সাহেব পূর্ব্বোক্তপ্রকারে নানা পরীক্ষায় একে একে প্রত্যেকটিরই নানা গলদ্ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল, সেগুলি কোনক্রমেই স্বতোজননের উদাহরণ নয়। স্ত্রীপুংসাহায্যে সাধারণজীব যে-প্রকারে জন্মগ্রহণ করে, ঐ সকল স্থলে অবিকল সেইপ্রকারেই তাহাদের বংশবিস্তার হয়।

বাষ্টিয়ান্ (Bastian) ও পুচেটের (Pouchet) নাম পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। ইঁহাদের দু'জনেরই গত শতাব্দীতে খুব বড় বৈজ্ঞানিক বলিয়া খ্যাতি ছিল। পাষ্টর্সাহেবের আবিষ্কারসমাচার প্রচারিত হইলে, তাঁহারা খুঁটিনাটি নানা বিষয় লইয়া উহার ভুল দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময়ে সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টিন্ডাল্-(Tyndal)-সাহেব পাষ্টর্সাহেবের সহিত যোগ দিয়াছিলেন, এবং ইঁহাদের সমবেত চেষ্টায় বাষ্টিয়ান্ প্রভৃতির সকল যুক্তিতর্ক খণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল। ইহার পর স্বতোজননবাদিগণের অধঃপতন চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহা হইতে আর উদ্ধারের আশা দেখা যাইতেছে না।

বার্ক-(Burke)-নামক জনৈক ইংরাজ বৈজ্ঞানিক স্বতোজনন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া একটা সংবাদ আজ দুইবৎসর ধরিয়া শুনা যাইতেছে। এই সংবাদ নানা বৈজ্ঞানিক-সমাজে পৌঁছিলে, বার্কসাহেবের পরীক্ষার আমূল বৃত্তান্ত জানিবার জন্য জীবতত্ত্ববিদ্মাত্রেই ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। শেষে জানা গিয়াছিল, মাংসের স্তূপে রেডিয়ম্ধাতুর (Radium) গুঁড়া ছড়াইয়া দেওয়ায়, দুইদিনের মধ্যে নির্জ্জীব স্তূপে কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছিল; এবং ক্রমে বড় হইয়া পড়িলে সেগুলিকে সাধারণ-জীবাণুর ন্যায় দ্বিধা বিভক্ত হইতে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু এইপ্রকারে বিভক্ত হওয়ার পর তাহাদের আর

পুনর্বিভাগ দেখা যায় নাই, অধিকন্তু সেগুলি ক্রমে একপ্রকার দানাময় পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছিল। বার্কসাহেব এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াই স্বতোজনন সম্ভবপর বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, ঐ পদার্থগুলি বুঝি কোনপ্রকার জীবাণু, এবং রেডিয়মের প্রভাবেই বুঝি তাহাদের উৎপত্তি।

অপরিণামদর্শী যুবক বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের আবিষ্কারদ্বারা সাধারণত যে সম্মান পাইয়া থাকেন, পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারদ্বারা বার্কসাহেবের ভাগ্যে তাহাই জুটিয়াছে। সার্-উইলিয়ম্-র‍্যাম্জে-(Sir William Ramsay)-প্রমুখ প্রবীণ রসায়নবিদ্‌গণের কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় যখন দেখা গেল, বার্কসাহেবের জীবাণুগুলিতে জীবাণুর কোন লক্ষণই নাই, এবং তাহারা জীবাণুর ন্যায় বংশবিস্তারে সক্ষম নয়, তখন তাঁহারা সকলেই আবিষ্কর্ত্তাকে ঘোর উন্মাদ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—তবে কি সত্যই স্বতোজনন অসম্ভব? পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে প্রশ্নের উত্তর দিলে বলিতে হয়, পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় সত্যই স্বতোজনন অসম্ভব ব্যাপার। আমাদের চারিদিকে প্রতিদিনই যে সহস্র-সহস্র জীবের উৎপত্তি হইতেছে, তাহাদের প্রত্যেকটির গোড়ার খবর লইলে দেখা যায়, স্ত্রীপুরুষসাহায্যে সাধারণ উপায়েই তাহাদের জন্ম হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের পৃথিবীতে জীবের স্বতোজনন যে কোনকালে চলে নাই, এ কথা সাহস করিয়া বলা যায় না। ইহা স্বীকার করিলে প্রাথমিক জীবের উৎপত্তিরহস্যের উদ্ভেদ হয় না। তবে বর্ত্তমানকালে যে স্বতোজনন চলিতেছে না, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

পরেশনাথ।

পরেশনাথপাহাড়ের নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। ইহার কিয়দংশ হাজারিবাগজেলায় ও কিয়দংশ মানভূমজেলায় অবস্থিত। পরেশনাথের দক্ষিণ দিকে, তাহার পাদমূলটি প্রায় স্পর্শ করিয়া, প্রাচীন "গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোড" (Grand Trunk Road) নামক রাজপথ চলিয়া গিয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কর্ড-লাইন্ (Chord Line) প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে, এই রাজপথ দিয়াই পরেশনাথে যাইতে হইত। পরে কর্ডলাইন্ প্রস্তুত হইলে, মধুপুরনামক ষ্টেশন হইতে গিরিডি পর্য্যন্ত একটি শাখা-লাইন্ খোলা হয়। গিরিডি হইতে পরেশনাথপাহাড় প্রায় দশক্রোশ দূরবর্ত্তী। সুতরাং পরেশনাথযাত্রিগণ গিরিডি হইতেই পরেশনাথে গমন করা সুবিধাজনক মনে করিতেন। পথিমধ্যে বরাকরনামক একটি বড় নদ আছে। বর্ষাকালে তাহা পার হওয়া কিছু কষ্টকর হইলেও, অন্যান্য সময়ে পার হইতে বিশেষ কিছু কষ্ট নাই। বরাকর একটি পার্ব্বতীয় নদ। বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ে

তাহা প্রায় বিশুষ্ক থাকে, কেবল এক ধারে স্বচ্ছ সলিলের একটি ক্ষীণ স্রোত প্রবাহিত হয় মাত্র। তাহা হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। গোযান ও "পুন্‌পুন্"নামক নরযানগুলি এই সময়ে নদের উপর দিয়া অনায়াসেই পার হইয়া যায়। বর্ষাকালে, বন্যার সময়, নৌকা ব্যতীত পারাপারের উপায় নাই।

সম্প্রতি, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের গ্রাণ্ডকর্ড লাইন (Grand chord line) খুলিয়াছে। এই লাইন্‌টি পরেশনাথের দক্ষিণ পাদমূল স্পর্শ করিয়া গয়াভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। গয়া হইতে এই লাইন্ মোগলসরাইনামক ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছে। কর্ডলাইন্ অপেক্ষা এই লাইন্‌টি দৈর্ঘ্যে অল্পতর হওয়ায়, এক্ষণে ইহারই উপর দিয়া অনেক ট্রেন্ যাতায়াত করিতেছে।

পরেশনাথ একটি অখণ্ড গিরি নহে। ইহা একটি গিরিশ্রেণী। এই গিরিশ্রেণী পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় পঁচিশমাইল দীর্ঘ। গ্রাণ্ড কর্ড লাইনের গোমা-নামক ষ্টেশন ইহার নিকট-বর্ত্তী। কিন্তু পরেশনাথের সর্ব্বোচ্চ চূড়া এখান হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। ইসরি-নামক ষ্টেশন হইতে ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখর অধিক দূরবর্ত্তী নহে। সুতরাং যাঁহারা পাহাড়ে উঠিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে ইস্‌রি-ষ্টেশনেই নামিতে হয়।

কিন্তু ইস্‌রি-ষ্টেশনের দিকে পরেশনাথে উঠিবার জন্য ভাল পথ নাই। যে পথ আছে, তাহা একান্ত দুরারোহ, দুর্গম ও বিপজ্জনক। অগত্যা পরেশনাথযাত্রিগণকে এই ষ্টেশনে নামিয়া, গোযান বা পুন্‌পুন্ আরোহণপূর্ব্বক পর্ব্বতের উত্তরভাগে মধুবননামক স্থানে যাইতে হয়। মধুবন ইস্‌রি-ষ্টেশন হইতে আট-ক্রোশ দূরবর্ত্তী এবং পর্ব্বতের ঠিক পাদমূলে অবস্থিত। এখান হইতে পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ-শিখর পর্য্যন্ত উঠিবার পথ আছে। এই পথ প্রায় আটমাইল দীর্ঘ।

এতক্ষণ পর্ব্বতে যাইবার পথের কথাই বলিলাম, কিন্তু পর্ব্বতসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলি নাই। পরেশনাথপাহাড় দ্রষ্টব্য কেন?—ইহার বিশেষত্বই বা কি? পাঠকবর্গের মনে এইরূপ প্রশ্নের উদয় হওয়া একান্ত স্বাভাবিক।

পরেশনাথপর্ব্বত জৈনধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি-গণের পক্ষে পরম পবিত্র তীর্থ। সমগ্র ভারতবাসী জৈন এই পবিত্র তীর্থস্থানটিকে দর্শন করা অতীব প্রয়োজনক কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। প্রতি বৎসর, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে দশসহস্রেরও অধিকসংখ্যক যাত্রী পরেশনাথপাহাড়ে আসিয়া থাকেন। জৈনসম্প্রদায়ের নরনারী, বালকবৃদ্ধ,—সক-লেরই পরেশনাথদর্শনের জন্য আগ্রহাতিশয় দেখা যায়। ইঁহারা পরেশনাথকে "শেখরজী" বা "সমেত শেখরজী" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। সমগ্র গিরিশ্রেণীকেই ইঁহারা পবিত্র মনে করেন। চর্ম্মপাদুকা পরিয়া কেহ পর্ব্বতে আরোহণ করেন না এবং পর্ব্বত-পরিভ্রমণকালে তদুপরি মলমূত্রও ত্যাগ করেন না। পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় তীর্থঙ্কর পরেশ-নাথস্বামীর একটি সুন্দর ও বৃহৎ মন্দির আছে। এতদ্ব্যতীত, ইহার অনেকগুলি শৃঙ্গে আরও অনেক মন্দির আছে। সেই সকল মন্দিরে তীর্থঙ্করগণের প্রস্তরময় পাদচিহ্ন স্থাপিত আছে। জৈনগণ সেই সকল প্রস্তর-

ময় পাদচিহ্ন দর্শন ও পূজা করা পুণ্যময় কর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এই কারণে, প্রতি বৎসর পরেশনাথপর্ব্বতে সহস্র সহস্র জৈনযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তদ্দ্বারা জৈনগণের চক্ষে পরেশনাথপর্ব্বতের পবিত্রতা সুস্পষ্টীকৃত হইল না। এই পর্ব্বতটি কেন তাঁহাদের প্রধান তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে, তাঁহাদের ধর্ম্মমতসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

হিন্দুদর্শনের ভাষায় বলিতে গেলে, জৈনেরা দ্বৈতবাদী। তাঁহারা পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বরে বিশ্বাস করেন বটে, কিন্তু তিনি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, ইচ্ছাহীন, অকর্ত্তা, সুখদুঃখাদির অতীত ইত্যাদি। তিনি চিরকাল আছেন এবং থাকিবেন; কিন্তু তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা অথবা কোনপ্রকার কর্ম্মের কর্ত্তা নহেন। তিনি যেরূপ অনাদি, সৃষ্টিও তদ্রূপ অনাদি। তিনিও চিরকাল আছেন, সৃষ্টিও চিরকাল আছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন ব্যাপারে তিনি লিপ্ত নহেন। জীব নিজ নিজ কর্ম্মবশেই এই সংসারে গতায়াত করিতেছে। কর্ম্মই জীবের উৎপত্তি, লয় ও সুখদুঃখের নিয়ামক। কর্ম্মও অনাদি। জীব এই কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেই মোক্ষ বা নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে। কিরূপে এই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধে অনেক উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে; তন্মধ্যে অহিংসা ও জীবে দয়া একটি। কোন জীবের প্রতি হিংসা করিবে না; কাহারও প্রাণনাশ করিবে না এবং কাহাকেও শারীরিক বা মানসিক কোনপ্রকার কষ্ট দিবে না। প্রাণিমাত্রেই জীব; উদ্ভিজ্জও জীব, যেহেতু তাহারও জীবন আছে। এই কারণে, জৈনধর্ম্মে অকারণে বৃক্ষচ্ছেদন করা নিষিদ্ধ। ভূমিও জীবময়ী; ভূমি খনন বা কর্ষণ করিলে লক্ষ লক্ষ জীবের প্রাণনাশ হয়। সুতরাং কৃষিকার্য্য এবং কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করা ধর্ম্মবিগর্হিত।* ভূমির অভ্যন্তরে যে সকল মূল উৎপন্ন হয়, তাহাও জীবময়, সুতরাং তাহাও অখাদ্য। এই কারণে, জৈনেরা কন্দ, মূলক, আলু প্রভৃতি খান না। যাঁহারা অহিংসাকে ধর্ম্মের মূলসূত্র বলিয়া মানে করেন, তাঁহাদের পক্ষে মৎস্যমাংসভোজন যে সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য, তাহা বলাই বাহুল্য। এই কারণে, জৈনেরা নিরামিষাশী। স্থূলত জৈনধর্ম্মের ইহাই আদর্শ। কিন্তু এই আদর্শানুসারে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা কার্য্য করা অসম্ভব। অগত্যা, জৈনেরা কূপ ও পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষচ্ছেদন এবং ভূমিকর্ষণও করাইয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ কার্য্য নিন্দনীয়। প্রাণিবধ ও মৎস্যমাংসাহার জৈনেরা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে আমিষাশী ব্যক্তি কেহ নাই বলিলেও চলিতে পারে।

* এতৎসম্পর্কে হিন্দুশাস্ত্রেরও উক্তি দ্রষ্টব্য—

কৃষিঃ সাধ্বিতি মন্যন্তে সা বৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতা।
ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হন্তি কাষ্ঠময়োমুখম্। মনু।
সংবৎসরেণ যৎ পাপং মৎস্যঘাতী সমাপ্নুয়াৎ।
অয়োমুখেন কাষ্ঠেন তদেকাহেন লাঙ্গলী। পরাশর।

ধর্মের আদর্শানুসারে সর্ব্বথা কার্য্য করা অসম্ভব হইলেও, যিনি তদনুসারে যত-দূর-সম্ভব চলিতে পারেন, তিনি ততই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত এবং মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে সমর্থ। এই কারণে, ধর্ম্মসাধনের নিমিত্ত আহারবিহারাদিসম্বন্ধে জৈনধর্ম্মশাস্ত্রে অনেক বিধি ও নিষেধ লিপিবদ্ধ আছে। লোভ-দমনের নিমিত্ত অনেকে অনেক আহার্য্য-বস্তুর ব্যবহার ত্যাগ করিয়া থাকেন; অনেকে উপবাস করেন; এবং প্রায় সকলেই তিথিবিশেষে শাকাদি উদ্ভিজ্জ এবং পক্ক ফলাদির ব্যবহার পরিত্যাগ করেন। পানীয়জলের মধ্যে অসংখ্য জীব আছে। এই কারণে, সকলেই জল ছাঁকিয়া পান করেন। ইঁহাদের বিশ্বাস যে, জল সিদ্ধ করিলে, তাহাতে একদিনের মধ্যে আর নূতন জীবের উৎপত্তি হয় না। এই কারণে, অনেকে জল সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে তাহা পান করেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যতি, তাঁহারা আজীবন কৌমার্য্য-ব্রত অবলম্বন করেন। তাঁহারা কখন স্বহস্তে খাদ্যদ্রব্য পাক করেন না, এবং জৈন গৃহস্থগণের গৃহে অন্নভিক্ষা করিয়া প্রাণ-ধারণ করেন। এই যতিগণ কখন চর্ম্ম-পাদুকা ব্যবহার করেন না, সর্ব্বত্র নগ্নপদে ও নগ্নশিরে ভ্রমণ করেন; অঙ্গে বস্ত্র ও উত্তরীয় ভিন্ন অন্য কোন পরিচ্ছদ ধারণ করেন না এবং কুক্ষিদেশে একএকটি গোপুচ্ছ বা চামরের ন্যায় কার্পাসসূত্র-নির্ম্মিত মার্জ্জনী (রজোহরণ বা ওঘা) ধারণ করেন। যে স্থানে ইঁহারা উপবেশন করেন, পূর্ব্বোক্ত মার্জ্জনীদ্বারা সাবধানে তাহা পরিমার্জ্জন করিয়া, পরে তাহাতে উপবেশন করাই নিয়ম। কিন্তু এই নিয়ম সর্ব্বত্র পালিত হয় কি না, তাহা স্বতন্ত্র কথা। এই যতিগণ ব্যতীত, জৈন সাধুবর্গও আছেন। বেশভূষায় ইঁহারা প্রায় যতিগণেরই তুল্য। অধিকন্তু, ইঁহারা যতিবর্গের অপেক্ষাও অধিক-তর ত্যাগী। ইঁহারা প্রায়ই স্নান করেন না; প্রায়ই ক্ষৌরকর্ম্ম করেন না; কখন কোন যানে আরোহণ করেন না; বর্ষা-কালে চাতুর্ম্মাস্যের আরম্ভ হইলে, ইঁহারা কখন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করেন না এবং মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ত্যাগ করিতে পারিলেই কর্ম্মবন্ধন শিথিল এবং জীব মোক্ষলাভে সমর্থ হয়, ইহাই জৈনগণের প্রধান বিশ্বাস। কিন্তু মোক্ষলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। জৈনগণের মধ্যে যে সকল মহাপুরুষ মোক্ষলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অনেক হইলেও তন্মধ্যে কেবল চতুর্ব্বিংশতি মহাপুরুষ বিখ্যাত। এই চতুর্ব্বিংশতি মহাপুরুষ "তীর্থঙ্কর" নামে অভি-হিত। ইঁহাদের মধ্যে কুড়িজন তীর্থঙ্কর এবং অগণ্য সাধু ও গণধর * এই পরেশনাথ-পর্ব্বতে মোক্ষ বা নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

* "তীর্থঙ্কর"শব্দের অর্থ এইরূপ—যে সকল মুক্ত মহাপুরুষ সাধু, সাধ্বী, এবং শ্রাবক ও শ্রাবিকা, এই চতুর্ব্বিধ আশ্রম বা তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারাই তীর্থঙ্কর। "গণধরে"রা তীর্থঙ্করগণের প্রধান শিষ্য ছিলেন। ইঁহারাও মুক্তপুরুষ। কিন্তু তীর্থঙ্করগণেরই সম্মান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

প্রধানত এই কারণেই, পরেশনাথপর্ব্বত জৈনগণের নিকট পরমপবিত্র তীর্থস্থান। ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্করের নাম স্বামী পরেশনাথ।* ইঁহারই নামানুসারে, অতি প্রাচীনকাল হইতে, পর্ব্বতের নামকরণ হইয়াছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পরেশনাথ-পর্ব্বতে যে সকল মন্দির আছে, তন্মধ্যে (কেবল একটি মন্দির ব্যতীত) কোন মন্দিরে তীর্থঙ্করগণের মূর্ত্তি নাই। মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে তীর্থঙ্করগণের পাষাণময় পাদচিহ্ন আছে। জৈনযাত্রিগণ এই সকল পাদ-চিহ্নেরই পূজা করিয়া থাকেন। কথিত আছে যে, এই সকল পাদচিহ্ন বহুকাল হইতে একএকটি "টুক্" বা শৃঙ্গে বিদ্য-মান ছিল। যেখানে যেখানে এই সকল পাদচিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সেই স্থানেই একএকটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। জৈন-দের বিশ্বাস এই যে, যে যে শৃঙ্গে তীর্থঙ্কর-গণ তপস্যা করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন, সেই সেই শৃঙ্গেই তাঁহারা নিজ নিজ পাদ-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। একএকটি "টুক্" বা শৃঙ্গও একএকজন তীর্থঙ্করের নামে অভি-হিত। এই শৃঙ্গগুলি ব্যতীত পর্ব্বতের নানা-স্থানে অসংখ্য সাধু ও গণধর মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সকল স্থান কোন বিশেষচিহ্নদ্বারা নির্দ্দিষ্ট নাই। অগত্যা জৈনেরা সমগ্র পর্ব্বতশ্রেণীকেই পবিত্র মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, পর্ব্বতের প্রত্যেক প্রস্তর, প্রত্যেক কঙ্কর, এমন কি প্রত্যেক মৃত্তিকাকণা পর্য্যন্ত পবিত্র। এই কারণেই তাঁহারা চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিয়া পর্ব্বতে আরোহণ করেন না এবং কোথাও নিষ্ঠীবন বা মলমূত্র ত্যাগ করেন না। এই পর্ব্বতশ্রেণীতে তাঁহাদের তীর্থঙ্করগণ, সাধুগণ ও গণধরবৃন্দ মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া সমগ্র পর্ব্বতশ্রেণীই তাঁহাদের পূজ্য।

জৈনেরা পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ হইলেও, তাঁহাকে উপাসনা বা পূজা করেন না। তিনি যখন নির্গুণ, নির্দ্বন্দ্ব ও সুখদুঃখাদির অতীত, তখন তাঁহাকে পূজা করিলেও তিনি সন্তুষ্ট হইবেন না এবং পূজা না করিলেও অসন্তুষ্ট হইবেন না। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশ তীর্থঙ্করেরই পূজা করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে মন্দিরনির্ম্মাণ করিয়া, তাঁহারা তন্মধ্যে তীর্থঙ্কর-গণের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই মূর্ত্তিগুলি যোগাসনে উপবিষ্ট ও ধ্যান-পরায়ণ। বৌদ্ধমন্দিরসমূহে বুদ্ধদেবের যেরূপ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তীর্থঙ্করগণের মূর্ত্তিও অনেকটা তদ্রূপ।

তীর্থঙ্করগণের এই মূর্ত্তিপূজা লইয়া জৈনগণের মধ্যে দুইটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। একটি সম্প্রদায়ের নাম "শ্বেতাম্বর", অপরটির নাম "দিগম্বর"। শ্বেতাম্বরসম্প্রদায় তীর্থঙ্করগণের মূর্ত্তিগুলিকে বসনাবৃত করিয়া রাখেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায় সেগুলিকে নগ্ন বা দিগম্বর করিয়া রাখেন। এই সম্প্রদায়ের যুক্তি এইরূপ—তীর্থঙ্করগণ যখন মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা

* জৈনেরা পরেশনাথস্বামীকে "পার্শ্বনাথস্বামী" বলেন। সাধারণত যে নামে তিনি অভিহিত, আমি সেই নামই অবলম্বন করিয়াছি।

বস্ত্রত্যাগ করিয়া দিগ্বসন হইয়াছিলেন। সুতরাং মুমুক্ষু জৈনমাত্রেরই তীর্থঙ্করগণের সেই দিগ্বসনা মূর্ত্তিরই উপাসনা করা কর্ত্তব্য। শ্বেতাম্বরসম্প্রদায় মূর্ত্তিগুলিকে বসনাবৃত ও হীরকাদি বহুমূল্য অলঙ্কারে সুশোভিত করেন। দিগম্বরগণের মতে, এইরূপ করা অন্যায়। তীর্থঙ্করগণ যখন সংসারী ছিলেন, তখন তাঁহাদের এইরূপ বেশভূষা ছিল বটে; কিন্তু তাঁহাদের সেই রাজতুল্য মূর্ত্তির পূজা করিলে, মোক্ষলাভ সহজসাধ্য হয় না। সেই মুক্তপুরুষগণের মুক্ত অবস্থার মূর্ত্তিরই পূজা করিলে মোক্ষপথে অগ্রসর হওয়া যায় এবং মোক্ষের আদর্শ মানসচক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বদা জাজ্বল্যমান থাকে। এই কারণে, দিগম্বরেরা মূর্ত্তিগুলিকে স্রক্‌চন্দন বা পুষ্পে বিভূষিত করেন না। কিন্তু শ্বেতাম্বরেরা এই নগ্নমূর্ত্তির পূজার একান্ত বিরোধী। এমন কি, তাঁহারা সাধ্যপক্ষে কখন দিগম্বরগণের মন্দিরমধ্যেও প্রবেশ করেন না। শ্বেতাম্বরগণের প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিগুলি দর্শন করিতে দিগম্বরগণের কোন আপত্তি না থাকিলেও, তাঁহারা তৎসমুদায়ের পূজা করেন না। এইরূপে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্নতা উপস্থিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই বিভিন্নতা হইতে পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট বিদ্বেষও উৎপন্ন হইয়াছে।

পরেশনাথপর্ব্বত শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই উভয় সম্প্রদায়েরই চক্ষে অতীব পবিত্র তীর্থস্থান। পর্ব্বতস্থ মন্দিরসমূহে তীর্থঙ্করগণের কেবলমাত্র পাষাণময় পাদচিহ্ন থাকায় মন্দিরে পূজা করিতে কোন সম্প্রদায়েরই কোন আপত্তি নাই। কিন্তু এই সমস্ত মন্দিরের পর্য্যবেক্ষণভার শ্বেতাম্বরগণেরই হস্তে ন্যস্ত আছে। তাঁহারা দিগম্বরগণকে এসম্বন্ধে কোন অধিকার দিতে অনিচ্ছুক। এই কারণে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলক্ষণ মনোমালিন্যও আছে।

পরেশনাথপর্ব্বতের বিশেষত্ব বুঝাইবার জন্যই আমাকে এতক্ষণ এত কথা বলিতে হইল। পরেশনাথপর্ব্বত সমগ্র ভারতবাসী জৈনগণের পবিত্র তীর্থস্থান; কিন্তু এখানে হিন্দুগণের কোন মন্দির বা তীর্থ নাই। না থাকিলেও, ইহা যে তাঁহাদেরও দ্রষ্টব্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি বঙ্গদেশের মধ্যে অনেকগুলি পর্ব্বতসঙ্কুল স্থান দর্শন করিয়াছি; কিন্তু উচ্চতায়, গাম্ভীর্য্যে ও সৌন্দর্য্যসম্পদে পরেশনাথের ন্যায় কোন পর্ব্বত দর্শন করি নাই। ইহা সমুদ্রের উপরিভাগ হইতে প্রায় ৪৭০০ফীট্ উচ্চ। মেঘমালা ইহার শৃঙ্গে শৃঙ্গে সংলগ্ন হইয়া, তাহাদের আকার ও বর্ণের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পর্ব্বতেরও আকার ও বর্ণের পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছে। কখন কোন শৃঙ্গ শ্বেত মেঘপুঞ্জে সমাবৃত হইয়া, তাহাকে হিমাচলের তুষারাবৃত শৃঙ্গবিশেষের ন্যায় প্রতীয়মান করিতেছে; কখন ধূসর মেঘমালা পর্ব্বতগাত্রকে সমাচ্ছন্ন করিয়া, তাহাকে স্বপ্নময় রাজ্যে পরিণত করিতেছে। পর্ব্বতের কোন কোন অংশে পার্ব্বতীয় জাতিগণের দুইএকটি বসতি এবং এক অংশে একটি চা-বাগান থাকিলেও, পর্ব্বতের উপরিভাগ এরূপ নীরব ও নির্জ্জন যে, মনে হয় যেন কোলাহলময় সংসারক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া সহসা কোন্ এক দেবরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। উপরিভাগ

হইতে কোন লোকালয় দৃষ্টিগোচর হয় না। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই মেঘমালার স্থায় দূরবর্ত্তিনী শৈলশ্রেণী ও শ্যামলবনাচ্ছন্ন ভূমি ও উপত্যকা নয়নপথে পতিত হয়। এই স্থানে অল্পক্ষণ থাকিতে থাকিতেই, মন সংযত, চিত্ত মার্জ্জিত এবং আত্মা প্রফুল্ল হইয়া উঠে। প্রাণের মধ্যে কি-এক অব্যক্ত মহৎ লক্ষ্য জাগিয়া-উঠিয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলে এবং ধ্যানের জন্ম আপনা-আপনিই নয়নযুগল মুদিত হইয়া আইসে। পরেশনাথপর্ব্বত প্রকৃতপ্রস্তাবেই তপস্যা করিবার স্থান। জৈন তীর্থঙ্করগণ, সাধু ও গণধরবৃন্দ যে জৈনধর্ম্মবিদ্বেষিগণের উৎপীড়ন ও অত্যাচার হইতে অব্যাহতিলাভ এবং নির্ব্বিবাদে ও নিশ্চিন্তমনে ধর্ম্মসাধনের নিমিত্ত পরেশনাথের স্থায় মনোরম পর্ব্বতশ্রেণীকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহাদের ধর্ম্মানুরাগ, সৌন্দর্য্যস্পৃহা ও দূরদর্শনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

পরেশনাথপর্ব্বতের সর্ব্বাবয়ব নিবিড়-বনাচ্ছন্ন। পর্ব্বতরাজির উপর পর্ব্বতরাজি সমুত্থিত হইয়া সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং পর্ব্বতে আরোহণ করিতে করিতে অনেকগুলি মনোরম অধিত্যকা ও উপত্যকাভূমি পার হইতে হয়। এই সমস্ত অধিত্যকা ও উপত্যকার অস্তিত্ববশত পর্ব্বতশ্রেণীর সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। পর্ব্বতে আরোহণ করিতে করিতে দুইটি নির্ঝরিণী পার হইতে হয়। চলিতকথায় ইহাদিগকে "নালা" বলে। একটী নালার নাম "সীতানালা," অপরটির নাম "গন্ধর্ব্বনালা"। দুইটি নালার উপরেই সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। পর্ব্বতের মধ্যে অজ্ঞাত ও নিভৃত স্থান হইতে এই নির্ঝরিণীদ্বয় নিঃসৃত হইয়া, ভীষণ শব্দে ও প্রচণ্ড বেগে প্রস্তর হইতে প্রস্তরান্তরে লম্ফপ্রদান করিতে করিতে বনাচ্ছন্ন গভীর খাতের (Ravines) মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে! কিন্ত প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূর হইতে, ইহাদের প্রপাতের প্রচণ্ডশব্দে কর্ণ বধির হইয়া যায়। নির্ঝরিণীদ্বয়ের বেগ, উল্লাস ও নৃত্য দেখিয়া মনোমধ্যে ভীতিবিস্ময়বিমিশ্রিত এক বিচিত্র ভাবের উদয় হয়। পর্ব্বতদুহিতৃদ্বয়ের স্ফূর্ত্তি, উল্লাস, একাগ্রতা ও চাঞ্চল্য দেখিয়া এই নির্জ্জনস্থানেও কর্ম্মজীবনের একটি সুন্দর চিত্র মনোমধ্যে অঙ্কিত হইয়া যায়।

পর্ব্বতজ বৃক্ষাবলীর মধ্যে শালবৃক্ষেরই প্রাধান্য অধিক। কিন্ত অন্যান্য বৃক্ষও অনেক আছে। নানাজাতীয় ফার্‌ন্‌-(Ferns)-নামক সুন্দর উদ্ভিজ্জ প্রচুরসংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লিলি-(Lily)-নামক পুষ্পবৃক্ষের অভাব নাই। Lilies of the Valley নামক পুষ্পবৃক্ষও দুর্লভ নহে।

পর্ব্বতের উপরিভাগের বায়ুরাশি সুশীতল, নির্ম্মল ও সুখসেব্য। সেই নির্ম্মল ও পবিত্র বায়ু সেবন করিতে করিতে দেহে স্ফূর্ত্তি ও লঘুতা আসিয়া উপস্থিত হয়। শুনিয়াছি, পর্ব্বতের উপরিভাগের জলবায়ু স্বাস্থ্যের একান্ত অনুকূল। কিন্ত পর্ব্বতের পাদমূল হইতে চতুর্দ্দিকের প্রায় ৫।৬মাইল স্থানের জলবায়ু একান্ত দূষিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি-যে, পর্ব্বতশ্রেণীর উত্তরপাদমূলে মধুবন নামে স্থান আছে। এইখানে শ্বেতাম্বর জৈনসম্প্র

দায়ের একটি এবং দিগম্বর জৈনসম্প্রদায়ের দুইটি ধর্ম্মশালা আছে। তন্মধ্যে শ্বেতাম্বরগণের ধর্ম্মশালাটিই বৃহৎ বলিয়া মনে হইল। প্রত্যেক ধর্ম্মশালার সংলগ্ন কতিপয় মন্দিরও আছে। জৈনযাত্রিগণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশালায় আসিয়া অবস্থান এবং এই স্থান হইতেই পর্ব্বতারোহণ করেন। মধুবনের জলবায়ু অতিশয় অস্বাস্থ্যকর। এখানে ম্যালেরিয়াজ্বরের এবং অন্যান্য রোগেরও প্রাদুর্ভাব আছে। জল সিদ্ধ না করিয়া পান করিলে, সহজেই পীড়াক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। হিন্দুগণের অবস্থানের জন্য কোন, স্থান এখানে নাই। যাঁহারা পরেশনাথদর্শনাভিলাষী, তাঁহারা সঙ্গে করিয়া তাঁবু আনিলে ভাল হয়। কিন্তু মধুবনে আমিষাহার নিষিদ্ধ।

পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের প্রায় ৩০০ফিট্ নিম্নে গবর্মেণ্টের একটি ডাকবাংলা আছে এবং তাহার নিকটে একটি ভগ্ন সৈন্যাবাসও (barracks) দেখিতে পাওয়া যায়। এই সৈন্যাবাসটি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে গোরাসৈন্যদের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। ডাকবাংলাটিও প্রায় সেই সময়েই নির্ম্মিত হয়। সৈন্যাবাসে জীবহত্যা হইবে বলিয়া জৈনেরা তাহার প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি উপস্থিত করেন এবং সেই কারণে গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিতেও প্রস্তুত হন। কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের কিছুদিন পরেই সৈন্যাবাস প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং সেই কারণে গবর্মেণ্টের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায়, জৈনেরা গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে কোন মকদ্দমা উপস্থিত করেন নাই। অধিকন্তু, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সৈন্যাবাসের জন্য গৃহগুলি সহসা পরিত্যক্ত হওয়ায়, বিবাদের কারণও মিটিয়া যায়। কিন্তু ডাকবাংলাটি প্রথম হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইংরেজ ভ্রমণকারী ও রাজপুরুষেরা মধ্যে মধ্যে এই ডাকবাংলায় আসিয়া বাস করেন। সেখানে জীবহত্যা বা আমিষাহার নিবারিত হয় নাই। জৈনেরা এ সম্বন্ধে বহুদিন উদাসীন থাকিয়া বর্ত্তমান সময়ে একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইন্ নির্ম্মিত হওয়ায়, পরেশনাথপর্ব্বতে গমনাগমন সহজসাধ্য হইয়াছে। কলিকাতা হইতে পরেশনাথের নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে আসিতে ৯।১০ঘণ্টা সময় লাগে। পরেশনাথের ন্যায় উচ্চপর্ব্বত বঙ্গদেশে আর নাই। সুতরাং বঙ্গদেশপ্রবাসী ইংরেজেরা পরেশনাথপর্ব্বতকে একটি শৈলাবাসে পরিণত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে জৈনদিগের ঘোরতর আপত্তি আছে। পরে তৎসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

গিরিজাসুন্দরী।

[বিশ্বধাত্রী মা দুর্গার মত লাবণ্যময়ী একটি কন্যাকে দেখিয়া এই কবিতাটি লিখিত হইল। কন্যাটির নামও গিরিজাসুন্দরী।]

আয় মা গিরিজা!—নয়নরঞ্জন
গিরিজার মত, সুন্দর বদন,
মুর্ত্তিময়ী প্রভা, বিশ্ব-আলো-করা,
পাদপদ্মস্পর্শে জুড়াক্ এ ধরা!
বহুকাল হ'তে আমারো এ প্রাণী
দাবদগ্ধ মা গো, শান্তি নাহি জানি!
তাই মা তাই মা, শান্তিনিকেতন,
ও তোর সৌন্দর্য্য-ঝরণা শোভন
নিরখি, জুড়াল ক্লান্ত দুটি আঁখি;
কোকিলের সাড়া পেয়ে জীর্ণশাখী
মুঞ্জরে যেমতি, গুঞ্জরিলে অলি
ফুটে উঠে যথা গোলাপের কলি!
রবিচ্ছবি আর নীরদপ্রকাশে
ইন্দ্রধনু যথা নীলাকাশে হাসে!
তরল কনক জ্যোৎস্না-নীহারে,
শারদী সরসী, কুমুদ-কহ্লারে
ভরি যায় যথা, মলিন পাণ্ডুর
দুঃখিনী বিধবা, হেরিয়া মধুর
একমাত্র শিশুপুত্রের সুমুখ?
পায় গো যেমতি বুক-ভরা সুখ!

* * *

অয়ি কন্যা! আজি হেরি ও বদন
বোধ হইতেছে, আপনার জন
তুই যেন মোর!—তোরে মা নেহারি,
দুটি বিন্দু কেন আনন্দের বারি
দেখা দিল আজি নয়নের কোণে?
একি মূর্ত্তি হেরি হৃদয়দর্পণে?
লো গিরিজা তুই মোর উমাশশী!
রূপের প্রভায় নয়ন ঝলসি
গেল গেল মোর!—কল্পনার বলে
আমিও সেজেছি মহা কুতূহলে
জননী মেনকা! বল্ মা ভবানি,
পাষাণের মেয়ে হ'লি কি পাষাণী?
মায়েরে ভুলিয়া, কোথায় না জানি
ছিলি এতদিন।—নেত্রে ঝরে পানি!
চারিধারে হেরি আঁধার রজনী,
কোথা ছিলি বল্ নয়নের মণি?

* * *

আয় মা গিরিজা! মোহিনী রূপসী
মা আমার তুই,—তোর মুখশশী
হেরি মা গো আমি আনন্দ-আকুল
দুর্লভ দুর্ম্মূল্য ডুমুরের ফুল
পেয়ে যেন, আমি হইয়াছি রাজা!
কল্পতরু তুই জননী গিরিজা!
ধর্ম্ম অর্থ কাম আর মোক্ষফল
সকলি যেন মা মোর করতল!
একবার ভাবি তুই মোর কন্যা,
আর বার ভাবি ধন্যা ও বরেণ্যা,
ঈশ্বরী তুই মা, রাজরাজেশ্বরী!
রাঙা পা-দুখানি (ইচ্ছা হয়) ধরি;—

একবার ভাবি তুই স্নেহপাত্রী,
আর বার ভাবি তুই বিশ্বধাত্রী।
তুই মহাদেবী, আমি মূঢ় নর,—
কেমনে মা করি সোহাগ-আদর ?

* * *

যা রে তোরা চলি, যা রে নামরূপ,—
আজি আঁখি ভরি, অতি অপরূপ,
হেরিব মায়ের বাসন্তী মূরতি,
পার্ব্বতীর বেশ ষোড়শী যুবতি
বিকসিতনেত্রা, হসিত-বয়ানে,
চলেছেন ধীরে শিবসন্নিধানে।
রঞ্জেছে অধর যেন রে কুঙ্কুম!
সোনালী কপোলে অতসী-কুসুম
বিছায়েছে যেন ফুলের বিছানা!
যেন শত অলি প্রসারিয়া ডানা,
রচিয়াছে চক্র মায়ের কুন্তলে।
মূর্ত্তিময়ী শোভা নেমেছে ভূতলে!
ফুলে ফুলে ফুল্লা, পদ্মরাগে জিনি,
লোহিত অশোকে সেজেছে মোহিনী!
কি শোভা উথলে সিন্ধুবার-হারে!
মুকুতাকলাপ হায় তাহে হারে!
কর্ণিকাকুসুম, কাঞ্চনবরণ,
আহা মরি মরি মায়ের বদন
করিয়াছে হের আরও সুমোহন!

* * *

হিমাদ্রিশিখর হয়েছে ফুলন্ত
চারিধারে মরি অকালবসন্ত
হাসিছে; উমার চরণপরশে
বিহ্বলা ধরিত্রী পুলকে হরষে।
হায় কবি তব একি মহাভুল!
তুমি কি ভেবেছ ভুবনে অতুল
কন্দর্প হইল ভস্ম-অবশেষ
শিবের ললাট-নয়ন-অনলে ?
জান না ?—মায়ের মাধুরী অশেষ
হেরিয়া মোহিত, এই মহাছলে,
ত্যজিল মদন নিজ ফুলধনু!
ত্যজিল লজ্জায় নিজ ফুলতনু!

* * *

অয়ি কন্যা, অয়ি লাবণ্যের সার,
তোরে হেরি আজি মায়ার বিকার,
জীবব্রহ্মভেদ, ঘুচেছে আমার!
ঘটাকাশ আজি মিশেছে আকাশে;
হৃদয়-আঁধার আজি অপসার
অনন্ত উদার জ্যোৎস্না প্রকাশে!
তুই মা গিরিজা, নয়নরঞ্জন,
গিরিজার মত, সুন্দর বদন,
মূর্ত্তিময়ী প্রভা, বিশ্ব-আলো-করা,
পাদপদ্মস্পর্শে জুড়ালো এ ধরা!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

মানসচর্চ্চা।

শিল্পজগতে প্রথম পদার্পণ করিতেই গুরুর আদেশ হইল Study nature এবং সাধ্যমত গুরু-উপদেশ অবহেলা না করিয়া গাছ-পালা, পশুপক্ষী, জীবজন্তু, স্থাবর-অস্থাবর, যা-কিছু দেখিলাম ও হাতের কাছে পাইলাম, তাহারই নকল লইতে লাগিলাম। তখন মনে হইয়াছিল, গাছটা, মানুষটা, গরুটা রং দিয়া, পেন্সিল দিয়া শাদা কাগজে ঠিক নকল করিতে পারিলেই এবং মানুষটা মানুষ দেখিয়া, গাছটা গাছ দেখিয়া নকল করিলেই Nature Study করিলাম ও artistনামের যোগ্য হইলাম। তখন মনে হইত, Natural objects-এর imitation অর্থাৎ কোন একটা জিনিষের অনুকরণটাই বুঝি artএর চরম! কিন্তু এখন দেখিতে পাই যে, ঠিক সেরূপটা করিলে অর্থাৎ নকল করিয়া চলিলে art হয় না। Natureএর interpretation ব্যাখ্যা দেওয়ারই নাম art অর্থাৎ Natureটা Study করিয়া সেটাকে আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, আমার মন Natureটাকে যে ভাবে গ্রহণ করিতেছে, তাহারই একটা সরল সুন্দর ছবি প্রকাশ করাই artistএর উদ্দেশ্য। বুঝিতেছি, মনের কথাটা পরিষ্কার করিয়া, সুন্দর করিয়া খুলিয়া দেখানোর নাম art। মানুষটার মনুষ্যত্ব, গরুটার গোভাব, পুষ্পের ভিতরকার কথাটুকু লইয়াই artistএর কারবার। এবং সে-ই যথার্থ artist, যে চর্ম্মচক্ষে যাহা দেখা যায় ও না যায়, মনশ্চক্ষে তাহার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া নিপুণহস্তে কাগজে-কলমে-তুলিতে কিংবা পেন্সিলে, কণ্ঠস্বরে অথবা অঙ্গভঙ্গীতে তাহা প্রকাশ করে।

Imitation যদি artএর চরম হইত, তবে পৃথিবীতে কবিগণের স্থান হরবোলায় অধিকার করিত,—সঙ্গীতাচার্য্যের স্থান Gramophone ও নর্ত্তকীগণের আসর কলের পুত্তলিকায় অধিকার করিত। কোকিলের কুহুস্বরটা কবিগণ অপেক্ষা হরবোলা তো আমাদের জলজীয়ন্তভাবে শুনাইয়া দেয়! যে বসন্তের ভাব আমাদের মনে আনিয়া দিতে কবিগণ ছন্দের পর ছন্দ, কথার পর কথা গাঁথিয়া চলেন, হরবোলা তো গলার জোরে সেটা সারিয়া লয়, তবে কেন না হরবোলাকে কবির আসন দিই, কেন না তাহাকে True poet বলিয়া ভক্তি করি?

টিয়াপাখীর স্বভাব নয় মানুষের স্বরে কথা কওয়া; হরবোলার স্বভাব নয় যে,পাখীর সুরে গান গাওয়া। দুই জায়গাতেই স্বভাবের অভাব, দুইটাই অনুকরণ এবং অনুকরণ বলিয়াই artহিসাবে নগণ্য। স্বভাবের অভাব যেখানে, artএরও অভাব সেখানে।

লোক ঠিক পাখীর ডাক ডাকিতেছে, পাখীটা ঠিক মানুষের বুলি বলিতেছে। ইহা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে মাত্র, প্রাণ স্পর্শ করে না, মনের দ্বার খুলিয়া দেয়

না। এই মনের দ্বার খুলিতে মনই একমাত্র চাবি। মন দিয়া তবে মন পাইতে হয়, সকল শিল্পেরই এই সার্থকতা মন পাওয়া; দর্শকের মন, শ্রোতার মন, পাঠকের মন আকর্ষণ করা। পৃথিবীতে ভাট অনেক আছে, কিন্তু এমন ভাট কয়জন, যার রূপবর্ণনা শুনিয়া বলা চলে—'খুলিল মনের দ্বার না লাগে কবাট'। তেম্‌নি পৃথিবীতে কতকাল ধরিয়া কত-না শিল্পী ছবি আঁকিয়া আসিতেছে, মূর্ত্তি গড়িয়া চলিয়াছে। জগতের সকল শিল্পী যদি একত্র হয়, তবে কলিকাতাসহরে স্থানসঙ্কুলান হয় কি না সন্দেহ। যদি যত কেম্বিস্, কাগজ, পেন্সিল, রং, তুলি, পাথর ইত্যাদি যাহা শিল্পিগণ এ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছে ও করিতেছে, একটা স্তূপ করিয়া রাখা হয়, তবে হিমালয় না হোক, ছোটখাট একটা পাহাড়-প্রমাণ হইয়া দাঁড়ায়,—কিন্তু ইহার কয়খানা কেম্বিস্ ছবিনামের যোগ্য হইয়াছে, কয়জন artiatএর কাজ আমাদের মন আকর্ষণ করিয়াছে? গণিয়া দেখিলে ••পঞ্চাশ-জন হয় কি না সন্দেহ। শিল্পী যদি চিত্রে কিংবা সঙ্গীতে, কাব্যে, অঙ্গভঙ্গিতে নিজের মন দিতে না পারিল, তবে তার পরিশ্রম বৃথা, সে কাহারও মন আকর্ষণ করিতে পারিবে না।

এই মন কেমন করিয়া দেওয়া যায়? উত্তরে এইটুকু বলা চলে, তোমার মন তুমি যে কেমন করিয়া দিবে, তাহা আমার শেখান, অসম্ভব। কাজেই artজিনিষটার সঙ্গে যখন মনের এত গূঢ় সম্বন্ধ, তখন সেটাও শেখান চলে না। এইটুকু বলা চলে—Go to Nature অর্থাৎ স্বভাবের শরণাপন্ন হও অর্থাৎ তুমি শিল্পী যেটা গড়িতে চাও, তাহার স্বভাব-টুকু বুঝিতে চেষ্টা কর এবং সেটুকু বুঝিয়া নিজের স্বভাব অনুসারে জিনিষটার ব্যাখ্যা দাও।

আমাদের চারিদিকের সহিত নিজের মনটা মিলানোর নামই Nature Study। Nature তোমার নিকটে কখনই ধরা দিবে না,—যদি মনের দর্পণে তাহার প্রতি-বিম্ব পড়িবার সুবিধা না দাও ও তাহার সুরে তোমার সুর মিলাইবার সুবিধা না দাও। এও একপ্রকার যোগবিশেষ,—ইহারও মূলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ। চিত্তের অত্যন্ত প্রশান্তির প্রতিকূল বৃত্তিসকলের নিরোধ করিয়া মন যখন স্থির সরোবরের মত স্বচ্ছতা লাভ করে, তখনই Natureএর প্রতিবিম্ব আমার মনে আসিয়া পড়ে; অস্থিরচিত্তের, অন্যমনার তাহা ঘটে না এবং সেইজন্য প্রকৃত Nature-Study তাহার পক্ষে অসম্ভব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, Nature Studyর অর্থ স্বভাবের ভাব বোঝা, Copy করিয়া চলা নয়; artএর অর্থ imitation নয়, interpretation; আমরা অনেক সময়ে বুঝিতে পারি না যে, জিনিষটা যেমন দেখিতেছি, তেম্‌নি করিয়া আঁকিলাম, অথচ আমি artist নয়; আর একজন ঠিক জিনিষটা না আঁকিয়াও artist বলিয়া চলিয়া যায় কেমন করিয়া! জিনিষ-টার ছাঁচ লওয়ার নাম যদি art হইত, তবে কোন তর্ক ছিল না—কিন্তু art যদি Nature এর interpretation ব্যাখ্যা হয়, যদি art-এর অর্থ অন্তরের কথা প্রকাশ করা বলিয়া স্থির হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, বহিরিন্দ্রিয়-দ্বারা যেটুকু আমরা দেখি, তাহা দেখাই নয়.

অন্তরিন্দ্রিয়ই শিল্পীর একমাত্র ভরসা। শিল্পীর স্বভাবই হচ্ছে imaginative অর্থাৎ চর্ম্মচক্ষুর অপেক্ষা মনশ্চক্ষে সে স্পষ্টতর দেখিতে পায় এবং এই মনশ্চক্ষে দেখিয়া সে যখন জিনিষটা গঠন করে, দর্শকের মন আকর্ষণ করা তখন তাহার পক্ষে সহজ হয়। আমরা চারিদিকে যাহা দেখি এই নিয়ত বিচিত্র জগৎসংসার, ইহার সহিত আমাদের মনের ও আমাদের মনের সহিত ইহার যে কিছু নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য এবং সেইজন্যই আমরা Nature Studyর অর্থ অন্য বুঝিয়া ভুল করি।

যাহারা Natureকে Study করে অর্থাৎ Natureএর ভাব বুঝিতে চেষ্টা করে, আর যাহারা Nature Studyর অর্থ Natureকে Copy করিয়া মুখস্থ করিয়া যাওয়া মনে করিয়া চলে, তাহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ডাক্তার আমার শরীরের কোথায় কোন্ অস্থি আছে, আমার জননীর অপেক্ষা অধিক জানেন—কিন্তু আমার মনের সন্ধান মা ছাড়া, শরীরটা শতখণ্ড করিলেও, ডাক্তারের পাইবার উপায় নাই। ডাক্তার চর্ম্মচক্ষে দেখেন, আর মাতা দেখেন মনশ্চক্ষে। Natureএর সহিত এই প্রিয়তর, নিকটতর সম্বন্ধ স্থাপনই Nature Studyর সার্থকতা,—ডাক্তারের মত শবচ্ছেদব্যাপার নয়। যাহার মনশ্চক্ষু খুলিয়া গেছে, স্বভাবের স্বভাব তাহার কাছে প্রিয়জনের কাছে প্রিয়ের স্বভাবের মত সহজে বোধগম্য। এই মনের বিকাশই শিল্পের বিকাশ। জগতের যা-কিছু সু-কু সুন্দর-অসুন্দর পঞ্চ ইন্দ্রিয়-পথে আমাদের মনের উপরে নিয়ত বর্ষিত হইতেছে, সেখানে সঞ্চিত হইতেছে। এই সঞ্চয় মধুর আকারে মধুচক্র হইতে মধু-বিন্দুর মত বিতরণ করাই শিল্পীর ধর্ম্ম এবং সেই ক্ষমতালাভের চেষ্টাই শিল্পীর সাধনা। এই সাধনার পথে অগ্রসর করিবার জন্য আমাদের শিল্পাচার্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন—

'প্রতিমাকারকো মর্ত্ত্যো যথা ধ্যানরতো ভবেৎ।
তথা নান্যেন মার্গেণ প্রত্যক্ষেণাপি বা খলু॥'

সেইজন্য জাপানশিল্পসম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় Parcival Lowell তাঁহার Soul of the East নামক পুস্তকে প্রাচ্য-শিল্পকে মানসপ্রতিমা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—It portrays and emotion called up by a scene and not the scene itself in all its elaborate complexity "প্রাকৃতিক কোন-একটা দৃশ্য দেখিয়া মনে যে ভাবতরঙ্গ ওঠে, ইহা তাহারই প্রতিরূপ, নিখুঁত দৃশ্যটা নয়"। 'It is the expression caught from a glimpse of the soul of nature by the soul of man.'—মানুষের মন প্রকৃতির মনের যেটুকু ধরিয়াছে, এটা তাহারই যেন প্রকাশমাত্র।

শিল্পীর মন শিল্পে পাই বলিয়া শিল্পের আদর করি, নচেৎ হিমালয়পর্ব্বতটা চতুষ্কোণ কয়েক ইঞ্চি-পরিমিত ফ্রেমে বাঁধাইয়া এবং সেটাকে দেওয়ালের গায়ে ঝুলাইয়া আমার কি লাভ! হিমালয় দেখিতে যাওয়া এত কি কঠিন ব্যাপার? হিমালয়ে মনের কথাটিরই দরকার। শিল্পীর সেই কাজ, সে মন দিয়া মনের কথাটি ধরিবে এবং সেই কথাটি আমার মনে গাঁথিয়া দিবে।

আমাদের চারিদিকে প্রকৃতি কত গন্ধ,

কত বর্ণ, কত আনন্দ, কত ঝড় বাতাস, শোক দুঃখ লইয়া উদ্দাম বিচিত্র অস্থির গতিতে ক্রীড়া করিতেছে, তাহার সন্ধান কে রাখে? আমরা কেহ টাকার থলি লইয়া ব্যস্ত, কেহ অন্নের চিন্তায় হাহা করিয়া বেড়াইতেছি, কেহ লালসায় মত্ত, কেহ স্বার্থ লইয়া ফিরিতেছি। এই যে গ্রীষ্মবর্ষা দুইটা শ্রেষ্ঠ ঋতুর সমস্ত সৌন্দর্য্য ও সুখদুঃখের পরিপূর্ণতা লইয়া কয়টি মাস আমাদের চোখের সম্মুখ দিয়া হাসিয়া-খেলিয়া-কাঁদিয়া গেল, আমরা তাহাদের দিকে কি ফিরিয়া দেখিয়াছি, না তাহাদের কথায় মনোযোগ দিয়াছি? অথচ আমরা art schoolএ আসিতেছি, artist হইতে চাহিতেছি। একটা গাছ, গোটাকত মানুষ, গরু, ঘটিবাটি আঁকিয়া মনে করিতেছি nature study করিতেছি, কিন্তু বাস্তবিক করিতেছি কি! আপনাকে বঞ্চনা করিতেছি, অমূল্য জীবনের দিনরাত্রিগুলা বৃথায় যাইতে দিতেছি এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরূপ, আত্মার বিকাশরূপ অমূল্যধন হেলায় হারাইতেছি! আমি এরূপ বলিতেছি না যে, শিল্পী কাজকর্ম্ম, খাওয়াদাওয়া, স্ত্রীপুত্র, সংসারচিন্তা ছাড়িয়া-দিয়া কেবল ফুলের মধু, দক্ষিণের বাতাস, মেঘের খেলা লইয়া জীবন কাটাইবে! তাহাকে কাজও করিতে হইবে, অন্নচিন্তাও করিতে হইবে, সংসারের ভাবনাও ভাবিতে হইবে, অর্থও রোজগার করিতে হইবে, কিন্তু সেগুলাকে পাথরের মত মনের দ্বার চাপিয়া বসিতে দিলে চলিবে না, মনকে সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখা চাই—'বন্ধু' কখন্ কোন বেশে আসেন ঠিক নাই, তিনি যেন দ্বার বন্ধ দেখিয়া ফিরিয়া না যান।

দুটি বন্ধুকে নির্দ্দেশ করিয়া আমরা অনেকসময় চলিতভাষায় বলিয়া থাকি 'দুইজনে খুব ভাব' অর্থাৎ এ উহার ও ইহার ভাব বেশ বুঝিয়াছে, দুই জনের স্বভাব দুজনে বেশ চিনিয়াছে এবং সেইজন্যই উভয়ের মন উভয়ের দিকে টানিতেছে। প্রকৃতির সহিত এই মনের পরিণয় শিল্পসাধনার চরম। প্রকৃতির সহিত বন্ধুতাস্থাপন করিতে পারিলে দেখিবে, তুমি অন্যমনা থাকিলেও ঠিক সময়ে প্রকৃতি আসিয়া অযাচিতভাবে তোমাকে জাগাইয়া দিয়া যাইবে। তখন আর ভাববিহঙ্গ ধরিবার জন্য তোমায় ব্যাধের মত জাল পাতিয়া আসার আশায় রহিতে হইবে না, পাখী আসিয়া আপনিই ধরা দিতে থাকিবে।

গ্রীক্‌শিল্পিগণের গঠিত যে সকল প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়া আমরা আজকার দিনে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকি, সেইগুলি এই প্রকৃতির সহিত মানবমনের বন্ধুতার ফল। গ্রীক্‌শিল্পী যাহারা এই আশ্চর্য্য মূর্ত্তিসকল গড়িয়াছিল, তাহারা বাতাস খাইয়া, ফুলের মধু চাহিয়া জীবনধারণ করিত না—স্ত্রীপুত্রের ভাবনা তাহারাও ভাবিত, অন্নচেষ্টা তাহারাও করিত, তাহা সত্ত্বেও তাহারা এ অপূর্ব্ব মূর্ত্তিসকল কোথা হইতে পাইল। সেকালের মানুষ কি এমনি সুন্দর ছিল, না এগুলা তাহাদের মনগড়া মূর্ত্তি! গ্রীকমূর্ত্তিগুলা যে মানুষের নকল নয়, সেটা স্থিরনিশ্চয়; সেগুলা যে কোন প্রাচীন মূর্ত্তিসকলের অনুকরণে গঠিত হয় নাই, তাহাও স্থির; তবে সেগুলার সৃষ্টি কেমন করিয়া হইল? গ্রীক্‌শিল্পী নিশ্চয়ই স্বভাবের সহিত ভাব করিতে শিখিয়াছিল, সে-স্বভাবকে অবারিতদ্বারে মনোমন্দিরে আসিতে দিতে শিখিয়াছিল এবং তাহারই ফলে দুর্লভ রত্নের অধিকারী

হইয়াছিল—যে স্পর্শমণির সন্ধানে আমরা চলিয়াছি।

গ্রীক্‌জাতি 'আয়োলিয়ান্ হার্‌প' (বায়ব্য বীণা) নামক এক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিল; সেটা তাহারা গৃহদ্বারে ঝুলাইয়া রাখিত। সে বীণা এমনি বিচিত্র যে, সামান্য বায়ুর তরঙ্গ তাহাকে আঘাত করিবামাত্র তাহা হইতে বিচিত্র সঙ্গীত বাহির হইত। শিল্পীর মনোবীণা এইরূপ চারিদিকের সহিত এমনি সমস্বরে বাঁধা থাকা চাই, যেন স্বভাবের সামান্য স্পর্শেই তাহা মুখরিত হইয়া উঠে; কাজে থাক, কর্ম্মে থাক, সুখে থাক, দুঃখে থাক, মনোবীণা যেন বিশ্বের সহিত একসুরে বাঁধা থাকে; কি সুখের আঘাতে, কি দুঃখের পীড়নে তাহা যেন সেই 'বায়ব্যবীণার' মত সঙ্গীত প্রসব করে; অন্নচেষ্টা করি, অর্থকামনায় ফিরি, কিন্তু মনোবীণা যেন বিরাট্ বিশ্বের ভাবতরঙ্গে ঝঙ্কৃত হইবার মত প্রস্তুত থাকে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজতপস্বিনী।

[জীবনীপ্রসঙ্গ]

১৯

সংস্কৃতসাহিত্য এবং পুরাবৃত্তে মৃগয়াব্যাপারের যেরূপ বিশদ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে শিকারপ্রিয় ইয়ুরোপবাসীদেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। ফলত এই "অহিংসা পরমো ধর্ম্মের" দেশে একদিন আমোদের জন্য জীবহত্যার আসক্তি ছোট-বড় সকল শ্রেণীর ভিতর এরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, শাস্ত্রের অনুশাসন পর্য্যন্ত তাহাকে একটা উৎকট ব্যসন বলিয়া ধিক্কৃত করিয়াছে। সভ্যতার কোন্ যুগে সেরূপ শোণিতপাত রাজচক্রবর্ত্তীদের মধ্যেও নিন্দনীয় হইয়া উঠে, পুরাতত্ত্ববিজ্ঞান তাহার মীমাংসা করিবে। কিন্তু ইহা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতে পারে, পাশ্চাত্যজাতিদের মানসিক ইতিহাসে এখনও তাহার রেখাপাত হয় নাই। ইহাতে যদি কেহ সংশয়প্রকাশ করেন, তাঁহাকে সাহেবদের সাধারণত রবিবাসরীয় কীর্ত্তিকলাপ আলোচনা করিতে হইবে। সেদিন খৃষ্টোপাসকদের ভিতর কয়জন বিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রেম হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য হন? বস্তুত রবিবারে মৃগয়াযাত্রা অন্তত এদেশে পাশ্চাত্যসভ্যতার অঙ্গীভূত হইয়া উঠিয়াছে। কয়বৎসর পূর্ব্বে কথায় কথায় এক পাদরীসাহেবের সঙ্গে এই সম্বন্ধে আমার আলোচনা হইয়াছিল। তিনি আমাদের মতে সায় দিয়া বলিয়াছিলেন, এমন অকার্য্য নাই যাহা ভগবান্‌কে বিশেষভাবে স্মরণ করিবার এইদিনে এক্ষণে আচরিত হয় না।

মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর জীবে দয়া কত গভীর এবং প্রসরণশীল ছিল, সে পরিচয় আমরা

দিয়াছি। কুমার একটু বড় হইয়া রাজবাটীর চৌকীতে একবার পাখী মারিতে উদ্যত হইলে মাতার কাছে ভর্ৎসিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে অনেকদিনের কথা। এখন হাতের চেয়ে আম বড় হইয়া উঠিয়াছিল। রডাক্-সাহেবের আত্মীয় শিকারে যাইবার প্রস্তাব করিলে কুমারমহাশয় উৎসাহে তাহাতে সম্মত হইলেন, মহারাণীমাতার আদেশের অপেক্ষা করিলেন না। অনিচ্ছায় পরে তাঁহাকে সম্মতি দিতে হইল।

পরদিন প্রাতে আমাকেও শিকারে কুমার-বাহাদুরের সঙ্গী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। নহিলে সাহেবের সঙ্গে কথা চলিবে না। পোষাক আঁটিয়া রাজবাড়ী গেলাম। গোবিন্দের বাড়ীতে যাত্রাগান হইতেছিল, সকলে সেজন্য ব্যস্ত। মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব আত্মীয় সহ আজও গজারোহণে দেখা দিলেন। হাসিয়া আমায় বলিলেন, তিনি ভরসা করেন যে, আমাদের উত্তম শিকার মিলিবে। ছোট-সাহেবের প্রশ্নোত্তরে আমি বলিলাম যে, জীবনে সেই আমার প্রথম মৃগয়াযাত্রা, পূর্ব্বে বন্দুক চালাইবার অভ্যাস করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সে অল্পদিনমাত্র। সাহেবটির ইচ্ছা ও অনুরোধ—আমি তাঁহার সঙ্গে থাকি। প্রথমে সম্মত হইয়াছিলাম, সুতরাং যখন তিনি প্রস্তাব করিয়া বসিলেন যে, "চারজনার" উপর হইতে ব্যাঘ্রশিকার ভাল হয় না, অতএব আমরা শুধু গদিতেই যাইব ; আমি তখন আর পশ্চাৎ-পদ হইতে পারিলাম না। সঙ্গে একখানি কিরীচমাত্র লইলাম। সেরূপ অরক্ষিতাবস্থায় যাইতে আমার ন্যায় শিকারে অব্যবসায়ীর সাহসে কুলাইত কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আমার মনে কোন আশঙ্কা হয় নাই। আমাদের আত্মীয় এদেশীয়দের মধ্যে প্রথম পুলিস সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সুপণ্ডিত জগদীশনাথ রায় মহাশয় বলিতেন, "আসল বল মনের বল। ইয়ুরোপে ফরাসীসেনার মত দক্ষ যোদ্ধা আর নাই। অন্যান্যদের তুলনায় তাহারা আমাদের মতই তালপাতার সিপাহী মাত্র, কিন্তু মানসিক বলেই সমরক্ষেত্রে বীরত্বে তাহারা অদ্বিতীয়। আমাদের মনের বীর্য্য বাড়ুক, শৌর্য্য আপনিই আসিবে।" এক্ষণে স্বর্গগত আত্মীয় তখনও জীবিত, সরকারী চাকরী হইতে অবসরগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেদিন তাঁহার কথাকয়টি দৈববাণীর মত আমার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

ছোটসাহেবটির নাম রস্। যাইতে যাইতে তাঁহার সঙ্গে নানা কথা হইল। তামাক-সেবনের কথায় মদ্যপানের প্রসঙ্গ উঠিল। তিনি বলিলেন যে, তিনি মদ্য স্পর্শও করেন না, মাতালদের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার চৈতন্য হইয়াছে। আমি কহিলাম, "শুনিয়াছি কিঞ্চিৎ মদ না হইলে ইংরেজের আহার সম্পূর্ণ হয় না, অন্তত একগ্লাস্ 'বিয়াব'ও চাই।" সাহেব—"সেটা ভুল, অনেকে মদ স্পর্শও করে না। আবার অনেকে এমন আছে, মদ নহিলে যাহারা জল পর্য্যন্ত পান করে না।" কুমার-বাহাদুরের হস্তী আমাদের কিছু অগ্রে যাইতে-ছিল, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া রস্‌সাহেব বলিলেন যে, রাজকুমারকে দেখিলেই মনে হয়, তিনি বড় অমিতাচারী। এই কথায় আমি কুণ্ঠিত বোধ করিতে লাগিলাম। কেন না, মহারাণীমাতা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন, শিকারোপলক্ষে মেশামিশি হইলে সদল

কুমারের শিক্ষা ও সংসর্গের কথা সাহেবদের প্রত্যক্ষীভূত হইবে।

ক্রমে আমরা পুটিয়াগ্রামের দক্ষিণদিকে জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলাম। অতি ভয়ানক নিবিড় বন। পুটিয়ার অত কাছে যে এরূপ বন থাকিতে পারে, ইহা পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল না। বনের সর্ব্বত্র তন্নতন্ন করিয়া খোঁজ করা হইল, বাঘ কোথাও মিলিল না। বাঘ দূর হউক, একটা শিয়ালও দেখা গেল না। যাহা হউক, পথ পরিষ্কার ও শিকারের অন্বেষণার্থ হস্তীরা যখন বড় বড় ডাল ও সমূলে কোন কোন গাছ উৎপাটিত করিতে লাগিল, সে দৃশ্য দেখিবার যোগ্য বটে। এতক্ষণে আমার মনে হইতেছিল, শিকারে বাস্তবিক একটা আমোদ আছে। সাহেবটিকে আশ্বস্ত করিবার জন্য আমি বলিলাম, "শিকার দেখা গেল না, দুঃখ নাই; সুখ উপায়ে, লক্ষ্যে নহে।" একটু পরে আবার বলিলাম, "আজিকার এই অভিযানে আমরা বুঝিতে পারিলাম, পুটিয়ার অস্বাস্থ্যকরতার প্রধান কারণ এই বন। তিনি মাজিষ্ট্রেটকে বুঝাইতে পারিবেন।" এসব 'মহীপালের গীত' ব্যর্থমনোরথ সাহেবের নিশ্চয়ই ভাল লাগিতেছিল না। তিনি শেষে পাখী মারিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। দুইটা ঘুঘু দেখিয়া মারিবার জন্য আমার হাতে বন্দুক দিলেন। আমার হৃদয় পূর্ণ হইল। পক্ষিজাতির ভিতর ঘুঘুদের দাম্পত্যপ্রেম আদর্শস্থানীয়। আমার হাত উঠিতেছিল না। শেষে দুইটা ঘুঁঘু দেখিতে দেখিতে উড়িয়া গেল, আমিও বাঁচিলাম। বাস্তবিক হিংস্রজন্তুদের নিধন লোকরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় হইলেও নিরীহ পক্ষীদের যথেচ্ছ হননকার্য্যের সমর্থন করা যায় না। শুনিয়াছি, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার মৃগয়াপ্রিয় পরমাত্মীয়দের অনুরোধ করিয়া থাকেন, "তোমরা শুক এবং পারাবত জাতীয় পক্ষীদের মারিও না। উহা অত্যন্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য।"

বেলা অধিক হইল দেখিয়া রস্‌সাহেব বোটে ফিরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কুমারের অভিপ্রায়, আমরা আরো খানিকটা অপেক্ষা করি, কিন্তু সাহেব সে অনুরোধ পালন করিতে সম্মত হইলেন না। কুমারমহাশয় ইহাতে রাজশাহীর খাঁটী বাঙ্গলায় যে তীব্র মন্তব্যটুকু প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইংরেজীতে অনুবাদিত হইলে উহা একটা হাতাহাতির সৃষ্টি করিত। অতএব বন হইতে ফিরিয়া আমি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। কুমার সদলে রহিয়া গেলেন। পথে আসিতে আমরা গোটাকতক বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছিলাম। মৃগয়াপ্রিয় রস্ সেজন্য বৈকালে আমায় চিঠি লিখিয়া জানিতে ঔৎসুক্যপ্রকাশ করিয়াছিলেন, আর কোন শিকার পাওয়া গিয়াছিল কি না?

প্রাতে মহারাণীমাতার সহিত সাক্ষাতের সময় ছিল না। সেজন্যও বটে, আর শিকারের খবর জানিবার জন্য তাঁহার একটা কৌতূহল ছিল বলিয়াও বটে, অপরাহ্ণে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলাম। মাতা যেরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহা যে অমূলক নহে, ইহা আমায় স্বীকার করিতে হইল। তিনি আবার বলিলেন, "কুমারের দল একেবারে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানবিহীন, সে কারণে 'কোকনের' জন্য সর্ব্বদা তাঁর ভয় করে।" বাস্তবিক

ভবিষ্যদ্বাণীর মত তাঁহার এই কথা পরে ফলিয়া গিয়াছিল। তাঁহার কতটা দূরদর্শন ছিল, ইহাতে কতক বুঝা যাইবে। সবই তিনি নখদর্পণে দেখিতেন এবং বুঝিতেন—তবে অত্যন্ত চক্ষুলজ্জাবশত সহসা কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন না।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

ধর্ম্মের অর্থ।

প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্।
যঃ স্যাৎ প্রভবসংযুক্তঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।
ধারণাৎ ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।
যঃ স্যাৎ ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।

মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।

যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ

বৈশেষিকদর্শন, ১।২

ধর্ম্মশব্দ আমরা নানা অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থসম্বন্ধে আমাদের ধারণা বড় অস্ফুট। ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত। ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রত্যেক বস্তুর বা প্রত্যেকজাতীয় বস্তুর যে বিশেষত্ব, যাহা সে ব্যক্তি বা জাতিকে অন্য বস্তু বা জাতি হইতে পৃথক্ করিয়া রাখে, তাহাই সে বস্তুর বা জাতির ধর্ম্ম। যাহা সেই বস্তুর বা জাতির বস্তুত্ব বা জাতিত্ব ধারণ করে, রক্ষা করে, পোষণ করে বা বর্দ্ধন করে, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। ধর্ম্ম তাহাদের অন্তর্নিহিত নিজস্বশক্তি।

জগতে প্রত্যেক বস্তুই উৎপন্ন হয়, ক্রমে বিকাশিত হয়, বর্দ্ধিত হয়, পরিণত হয়, অবশেষে তাহার ধ্বংস বা লয় হয়। সেই বস্তুর ধর্ম্ম বা তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিই তাহার সে প্রভব বা ক্রমে বিকাশ ও পরিণতির মূলকারণ। অন্য কারণ তাহার সহায় মাত্র; অন্য বস্তুর সহিত সংস্রবে না আসিলে, তাহার সহিত ঘাতপ্রতিঘাত দানপ্রতিদান না চলিলে, অবশ্য সে বিকাশ সম্ভব হয় না। সেই বিকাশের জন্য আনুষঙ্গিক বা অসমবায়ী কারণের প্রয়োজন। বীজে যে বৃক্ষধর্ম্ম আছে, উপযুক্ত ভূমি, অনুকূল জলবায়ু প্রভৃতির সাহায্য না পাইলে, তাহার সেই বৃক্ষধর্ম্মের বিকাশ সম্ভব হয় না। অন্য বস্তুর সহিত এইরূপ সম্বন্ধ হইতেই সে বস্তুর ধর্ম্মের বিকাশ ও পরিণতি হয়।

অতএব কোন বস্তুর ধর্ম্ম, তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি, সেই বস্তুর বস্তুত্ব। তাহা হইতেই সেই বস্তুর গুণ। এজন্য ন্যায় বা বৈশেষিক দর্শনে শক্তির স্বতন্ত্র উল্লেখ প্রায় নাই, ধর্ম্মই সেই শক্তিবাচক। ইহাই ধর্ম্মের মূল অর্থ, ইহাই ধর্ম্মের ধাতুগত অর্থ। ধর্ম্মের ধাতুগত অর্থ কি—তাহা আমাদের প্রথমে বুঝিতে হইবে। ধাতু হইতেই আমরা পদের মৌলিক অর্থ পাই; পরে সে অর্থের অনেক পরিবর্ত্তন হইতে পারে এবং পরিবর্ত্তন হইয়াও থাকে। কিন্তু মূল অর্থ হইতেই আমরা পদের প্রকৃত অর্থ ধারণা করিতে পারি।

ধারণার্থক ধৃ বা ধঙ্ ধাতু হইতে ধর্ম্ম। যাহা যাহাকে ধারণ করে, রক্ষা করে, তাহাই তাহার ধর্ম্ম ;—অগ্নির উষ্ণত্ব অগ্নির ধর্ম্ম, জলের দ্রবত্ব জলের ধর্ম্ম, পশুর পশুত্ব পশুর ধর্ম্ম, মানুষের মনুষ্যত্ব মানুষের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ব্রাহ্মণের বিশেষ ধর্ম্ম ইত্যাদি।

কেবল যাহা ধারণ করে বা রক্ষা করে, তাহাই ধর্ম্ম নহে। সকল বস্তুর বস্তুত্বের একটা কাল্পনিক আদর্শ আছে, ইংরেজিতে তাহাকে আইডিয়াল্ (ideal) বলে। গ্রীক্‌দার্শনিক প্লেতো তাহাকে মূলকল্পনা (idea) বলিয়াছেন। আমরা "সোহকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" এই শ্রুতি অনুসারে বলিতে পারি যে, ব্রহ্ম সৃষ্টির প্রারম্ভে এই বহু হইবার কল্পনা করিয়া পরা ও অপরা জাতির সম্বন্ধে যেরূপ আদর্শ বা type কল্পনা করেন, জগতে সেই কল্পনা নিত্য। তাহাই সেই জাতির বা জাতীয় প্রত্যেক বস্তুরই পরমাদর্শ। যাহা দ্বারা কোন জাতীয় বস্তু তাহার বিকাশের পথে বাধা অতিক্রম করিয়া সেই পূর্ণাদর্শে পরিণত হইতে থাকে, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। ইহার আরও এক নাম স্বভাব বা স্বরূপশক্তি।

অতএব, যাহা দ্বারা কোন জাতীয় বস্তুর স্বরূপ বা স্বভব রক্ষিত হয়, বিকাশিত হয়, তাহার কাল্পনিক আদর্শের দিকে ক্রমে পরিণত হয়, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। কোন জাতীয় বস্তুর মধ্যে সকলের এই ধর্ম্ম, এই কাল্পনিক আদর্শ সমানভাবে বিকাশিত হইতে পারে না। এই ধর্ম্মের বিকাশের তারতম্যেই সেই জাতীয় বস্তুর মধ্যে বিশেষত্ব, ব্যক্তিত্ব স্থাপিত হয়। এই ধর্ম্মবিকাশের প্রভেদ অনুসারে প্রত্যেকজাতীয় এক বস্তু বা ব্যক্তি, সেই-জাতীয় অন্য বস্তু হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে বিশেষত যে অন্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ, ঘাত-প্রতিঘাত বা আদানপ্রদান হেতু তাহার এই ধর্ম্মের বিকাশ সম্ভব হয়, সেই সম্বন্ধের বা ঘাতপ্রতিঘাতের পার্থক্যজন্যও একজাতীয় বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে তাহার সেইজাতীয় ধর্ম্ম-বিকাশের পার্থক্য হয়। এইজন্য নানাত্ব।

আমরা পূর্ব্বে বৃক্ষবীজে বৃক্ষধর্ম্ম নিহিত থাকার কথা বলিয়াছি। যাহা দ্বারা প্রধানত সেই বীজের বৃক্ষরূপে পরিণতি হওয়া সম্ভব হয়, তাহাই সে বীজের ধর্ম্ম। কোন বিশেষ-বৃক্ষরূপে পরিণতি হইবার শক্তিই তাহার ধর্ম্ম, তাহাই সে বৃক্ষকে বিকাশ করে, ধারণ করে, রক্ষা করে এবং অবস্থানুসারে তাহার যে পর্য্যন্ত সেই আদর্শে বৃক্ষে পরিণত হওয়া সম্ভব, ততদূর পরিণত করে। অশ্বত্থবৃক্ষবীজের ধর্ম্ম অনুসারে কেবল তাহা হইতে অশ্বত্থবৃক্ষই উৎপন্ন হইতে পারে। কোন আনুষঙ্গিক অবস্থা-পারবর্ত্তনের দ্বারা সে অন্যজাতীয় বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে না। এই অশ্বত্থবৃক্ষের উৎপত্তি, পরিণতি ও রক্ষার কারণ—তাহার ধর্ম্ম। অবস্থানুসারে যদি এ ধর্ম্মের অবনতি হয়, তবে অশ্বত্থবৃক্ষের অবনতি হইবে; আর যদি উন্নতি হয় বা পুষ্ট হয়, তবে সে অশ্বত্থবৃক্ষের উন্নতি হইবে। যে বীজ অপক্ব, রুগ্ন, অপরিণত বা অপরিপুষ্ট, তাহা হইতে অশ্বত্থবৃক্ষ উপযুক্তরূপে বিকাশিত হইতে পারে না।

সর্ব্বত্র এই নিয়ম। ধর্ম্মই সকলের স্বরূপত্ব রক্ষা করে, তাহাদিগকে বিকাশিত ও পরিণত করে। ইহাকে প্রত্যেক বস্তুর আত্মবিকাশোপযোগী অন্তর্নিহিত বিশেষ-শক্তি বলা যাইতে পারে। এই ধর্ম্মের হ্রাস-

বৃদ্ধিতেই সেই ধর্ম্মযুক্ত বস্তুরও বিকাশ এবং পরিণতির হ্রাসবৃদ্ধি হয়। সে ধর্ম্ম হীন-শক্তি হইলে সে বস্তুরও বিশেষ অবনতি হয়। ধর্ম্মের আপূরণে উন্নতি, আর ধর্ম্ম-ক্ষয়ে অবনতি। ইহার বিশেষ আপূরণে এক-জাতীয় জীব তাহা অপেক্ষা উন্নত অন্য-জাতীয় জীবেও পরিণত হইতে পারে। আবার ইহার বিশেষ অবনতিতে তাহার নিম্নতরজাতীয় জীবেও পরিণতি হইতে পারে। ধর্ম্মের এই উন্নতি ও অবনতির কারণ কি? আমরা দেখিয়াছি যে, এ জগতের মূল—বহুত্ব। ব্রহ্মের বহু হইবার কল্পনা হইতেই এ জগতের অভিব্যক্তি। প্রত্যেক এক বস্তু—প্রত্যেক অন্য বস্তু হইতে বিভিন্ন, আবার প্রত্যেক এক বস্তু—তৎসংসৃষ্ট প্রত্যেক অন্য বস্তুর সহিত কোন-না-কোনরূপে সম্বন্ধযুক্ত। সেই সম্বন্ধ হইতে পরস্পরে ঘাতপ্রতিঘাত হয়। প্রত্যেক বস্তুরই তাহার বিশেষধর্ম্ম ও সামান্যধর্ম্ম আছে। অতএব প্রত্যেক বস্তুর ধর্ম্মের সহিত তৎসংসৃষ্ট অন্যের ধর্ম্মের ঘাতপ্রতিঘাত হয়। ইহাতে প্রত্যেক বস্তুর ধর্ম্ম, হয় অভিভূত হয়—না হয় তাহার বিকাশের সহায়তা পায়। ইহা হইতেই সে বস্তুর অবনতি বা উন্নতি হয়। অশ্বত্থ-বৃক্ষবীজ হইতে বৃক্ষবিকাশের সময় যদি আনুষঙ্গিক অন্য বস্তুসকল তাহার বিকাশে সহায় হয়, যদি জলবায়ুভূমি প্রভৃতি তাহার অনুকূল হয়, তবে অশ্বত্থবৃক্ষধর্ম্মের বিকাশ হইয়া সে বীজ বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে। এস্থলে তাহার সংসৃষ্ট অন্য বস্তুর ধর্ম্ম তাহার বিকাশের সহায়। পক্ষান্তরে, যদি তাহার আনুষঙ্গিক বস্তুর ধর্ম্ম তাহার বিকাশের প্রতি-কূল হয়, তবে সে বৃক্ষের উপযুক্ত বিকাশ হইতে পারে না, হয় ত সে শীঘ্রই মরিয়া যায়।

অতএব প্রত্যেক বস্তু তৎসংসৃষ্ট অন্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে তবে তাহার ধর্ম্ম-বিকাশের সম্ভব হয়। সেই অন্য বস্তু তাহার বিকাশের বাধা জন্মাইলে তাহার ধর্ম্মের অবনতি হয়, আর সে বিকাশের সহায় হইলে তাহার ধর্ম্মের উন্নতি হয়। যাহা দ্বারা কোন বস্তুর ধর্ম্মের উন্নতি হয়, তাহা সে বস্তুর ধর্ম্মবিকাশের সহায় বা সাধক; যাহাতে তাহার অবনতি হয়, তাহা তাহার অন্তরায়।

আর এক কথা। কেবল মৌলিকবস্তু এই কার্য্যজগতে প্রায় নাই, প্রত্যেক পদার্থ বিভিন্ন মৌলিকবস্তুর সংযোগে বা সমবায়ে উৎপন্ন হয়; সুতরাং সে পদার্থে তাহার সমবায়ি-কারণ যে বিভিন্ন মৌলিকবস্তু, তাহার ধর্ম্ম নিহিত থাকে। সেই সকল বস্তুর মধ্যে কোন এক বস্তুর ধর্ম্মের বিশেষ বিকাশে অপরগুলির ধর্ম্ম অপেক্ষাকৃত অধিকাংশত থাকিতে পারে। ইহার কোন এক বস্তুর ধর্ম্ম হীনশক্তি হইলে সে পদার্থ হীনশক্তি হয়। আর সকল সমবায়িকারণের ধর্ম্মই যদি সমানরূপে বিকাশিত হয়, তবে সে দ্রব্যের ধর্ম্মেরও উন্নতি হয়।

অতএব কোন পদার্থের ধর্ম্মবিকাশের জন্য তাহার সমবায়িকারণাত্মক প্রত্যেক বস্তুর ধর্ম্মের বিকাশ ও পরস্পর সাহায্যের প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত তৎসংসৃষ্ট বাহিরের অন্য বস্তুরও সহিত সম্বন্ধ ও সহায়তার প্রয়োজন। মানুষের ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে ইহা বিশেষ মনে রাখিতে হইবে। মানুষের ধর্ম্ম মিশ্র,—তাহার আত্মধর্ম্ম ও প্রকৃতিধর্ম্ম আছে।

আত্মা বা পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ হইতে যেমন সমুদায় জগৎ, তেমনি মানুষ। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ আত্মা। আত্মধর্ম্মই মানুষের স্বধর্ম্ম। আত্মধর্ম্মের প্রকৃত বিকাশে ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রকৃতিধর্ম্মের উন্নতিতে বা আপূরণে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। কেন না, মানুষ প্রকৃত আত্মস্বরূপ। প্রকৃতি তাহায় স্বধর্ম্মবিকাশের সহায়মাত্র। ইহা পরে বিবৃত হইবে।

প্রকৃতির আপূরণেই জীবের বিকাশ। প্রকৃতির অবনতিতেই জীবের অবনতি। প্রকৃতিই জীবধর্ম্মবিকাশের সহায় বা অন্তরায়। আত্মধর্ম্মের বা আত্মস্বভাবের উন্নতি-অবনতি নাই। তৎসংশ্লিষ্ট প্রকৃতির ধর্ম্মের উন্নতিতে বা অবনতিতেই আত্মধর্ম্মের উন্নতি বা অবনতি বোধ হয়। প্রকৃতি মলিন হইলে আত্মধর্ম্ম আবরিত হয়। প্রকৃতি নির্ম্মল হইলে আত্মধর্ম্মের প্রকৃত বিকাশ হয়। প্রকৃতির উন্নতিতেই জীবের উন্নতি। প্রকৃতির অবনতিতে জীবেরও অবনতি হয়। এই প্রকৃতি অনুসারেই জীবের জীবত্ব। এক অর্থে এই প্রকৃতিধর্ম্মই জীবের ধর্ম্ম। মানুষের সম্বন্ধেও এই কথা। মানুষের পক্ষেও তাহার প্রকৃতির ধর্ম্ম অনুসারে তাহার ধর্ম্ম নিয়মিত হয়। প্রকৃতির আপূরণে তাহার ধর্ম্মের বিকাশ হয়। প্রকৃতির আপূরণে যে জাত্যন্তরপরিণাম হয়, তাহা পাতঞ্জলদর্শনে উল্লিখিত হইয়াছে।

"জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।" ৪।২

অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের যে প্রকৃতি আছে, তাহার আপূরণেই তাহার জাত্যন্তরপরিণাম হয়। ইহার জন্ত যে সহায় বা অসমবায়ী কারণ বা নিমিত্ত—তাহা কেবল সে পরিণামের পথে বাধা দূর করে মাত্র।

"নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।" ৪।৩

কেবল মানুষসম্বন্ধেই যে এ নিয়ম, তাহা নহে। সকলজাতীয় জীবের সম্বন্ধে এই কথা। অতএব ধর্ম্মের মূলার্থ কি, তাহা আমরা ইহা হইতে কতক বুঝিতে পারি। কিন্তু এই মূল অর্থ ব্যতীত অন্যরূপ অর্থেও এই ধর্ম্মশব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে, এতক্ষণ আমরা যে ধর্ম্মের কথা বলিতেছি, তাহা কারণধর্ম্ম। ইহা ব্যতীত গুণধর্ম্ম, কার্য্যধর্ম্ম এবং ফলধর্ম্ম উল্লিখিত হইতে পারে। আমাদের অথবা প্রত্যেক ব্যক্তির বা বস্তুর অন্তর্নিহিত ধর্ম্মশক্তির জন্য, অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর সংস্রবে বা ঘাত-প্রতিঘাতে, সেই শক্তির বা ধর্ম্মের যে লক্ষণ অথবা যে গুণ প্রকাশ পায়, তাহা হইতেই সে ব্যক্তির বা বস্তুর ধর্ম্ম আমরা বুঝিতে পারি। এজন্য সে লক্ষণ বা গুণকেও আমরা ধর্ম্ম বলি। অথবা যে লক্ষণ বা গুণ দেখিলে আমরা সেই অন্তর্নিহিত ধর্ম্মের বিকাশ হইতেছে বুঝি, তাহাকে আমরা ধর্ম্ম বলি। আবার যাহাতে সে শক্তির অবনতি হইতেছে দেখি, সে লক্ষণ বা গুণকে আমরা অধর্ম্ম বলি। মানুষের দয়া, শম, দম, অহিংসা, সত্য প্রভৃতি গুণ বা লক্ষণকে আমরা ধর্ম্মলক্ষণ বা এক-কথায় ধর্ম্ম বলি। সেইরূপ হিংসা, ক্রূরতা, মিথ্যাবাদিতা প্রভৃতিকে আমরা অধর্ম্ম বলি।

সেইরূপ অপরের সহিত ব্যবহারে সেই অন্তর্নিহিত ধর্ম্মশক্তির বশে আমরা যেরূপ কার্য্য করি—তাহার মধ্যে যে কার্য্য আমাদের সেই ধর্ম্মশক্তির বিকাশিত বা উন্নত অবস্থার পরিচায়ক, তাহাকেও আমরা ধর্ম্মকার্য্য বা

এককথায় ধর্ম্ম বলি। পরার্থ কর্ম্ম প্রভৃতিকেও ধর্ম্ম বলা হয়। সাধারণত কর্ত্তব্যকর্ম্ম ধর্ম্ম-নামে অভিহিত হয়। অন্যদিকে সেই ধর্ম্মশক্তি যে কার্য্যরূপে পরিণত হয়, তাহারই প্রতিঘাতে সেই ধর্ম্মশক্তির উন্নতি বা অবনতি হয়। যেরূপ কার্য্যের প্রতিঘাতে ধর্ম্মের বিনাশ-অভিমুখে গতি হয়; যে কার্য্য হইতে অদৃষ্ট-শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া আমাদের ধর্ম্মের আপূরণ করে, তাহাকেও আমরা ধর্ম্ম বলি। ইহাকে আমরা ফলধর্ম্ম বলিতে পারি। অতএব প্রত্যেক বস্তুর বা জীবের অন্তর্নিহিত স্বরূপশক্তি বা প্রকৃতিকে আমরা ধর্ম্ম বলি, তাহা দ্বারা তাহার যেরূপ গুণ প্রকাশ পায়, তাহাকেও আমরা ধর্ম্ম বলি। এবং তাহার অন্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইতে তাহার যেরূপ কর্ম্ম হয়,—তাহাকে আমরা ধর্ম্ম বলি। সে কর্ম্মের প্রতিঘাতে সেই ধর্ম্মের যে বৃদ্ধি হয়, তাহাকেও আমরা ধর্ম্ম বলি। এই-জন্য মানুষের সম্বন্ধে আমরা তাহার মনুষ্যত্বকে, অথবা যে অন্তর্নিহিত শক্তিবলে তাহার মনুষ্যত্ব তাহাকে, প্রধানত মনুষ্যধর্ম্ম বলি। তাহার এই অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম বা শক্তি হইতে অন্যের সহিত তাহার ঘাতপ্রতিঘাতে বা ব্যবহারে তাহার যে গুণের বিকাশ হয়, যে কর্ম্ম হয়, নিজের প্রতি ও তৎসংশ্লিষ্ট অপরের প্রতি যে ব্যবহার হয়, এবং সেই কর্ম্ম ও ব্যবহার দ্বারা তাহার ধর্ম্মশক্তি যেরূপে পরিপুষ্ট হয়, তাহাকেও গৌণভাবে আমরা ধর্ম্ম বলি।

সকল বস্তুতেই আমরা তিনপ্রকার পদার্থ দেখিতে পাই। দর্শনের ভাষায় তাহা-দিগকে—দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম বলে। প্রত্যেক দ্রব্যই গুণযুক্ত এবং কর্ম্মশক্তিযুক্ত। অতএব প্রত্যেক দ্রব্যের যে ধর্ম্ম আছে, তাহা তাহার গুণে ও কর্ম্মে প্রকাশ পায়। সুতরাং সেই দ্রব্যের ধর্ম্ম হইতেই তাহার গুণধর্ম্ম ও কার্য্যধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। অথবা দ্রব্যের যে মূলধর্ম্ম, তাহাই তাহার কার্য্যধর্ম্মের ও গুণধর্ম্মের কারণ। সুতরাং মূলধর্ম্মকে আমরা কারণধর্ম্ম বলিতে পারি। আর কার্য্যধর্ম্ম ও গুণরূপ ফলধর্ম্ম তাহা হইতেই উৎপন্ন—ইহাও বলিতে পারি। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরে উল্লিখিত হইবে। এই-হেতু মানুষের মধ্যে তাহার যে নিজস্বশক্তি আছে, যাহা দ্বারা তাহার মনুষ্যত্ব রক্ষিত, ধৃত ও বিকাশিত হয়, তাহাকে তাহার স্বরূপশক্তি বা স্বধর্ম্ম বা কারণধর্ম্ম বলিতে পারা যায়। আর এই ধর্ম্ম হইতে তাহার যে দয়া প্রভৃতি গুণের বিকাশ হয়, তাহাকে ফলধর্ম্ম বলা যায়। আর তাহা হইতে যে কর্ম্ম হয়, তাহাকে কার্য্যধর্ম্ম বলা যায়।

আরও এক কথা এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে। আমরা যে কর্ম্ম করি, তাহা হইতে আমাদের কর্ম্মশক্তি পরিপুষ্ট হয় বলিয়াছি। আমরা দেখিতে পাই যে, আমরা ব্যায়াম করিলে আমাদের শারীরিক বলের বৃদ্ধি হয়, শরীরের শিরাপেশী পরিপুষ্ট হয়। ধারাবাহিক চিন্তা করিলে চিন্তাশক্তি পরিপুষ্ট হয়। দয়ার কার্য্য করিতে করিতে আমাদের দয়াবৃত্তির বিকাশ হয়। অতএব অনেক কর্ম্মের অভ্যাস-দ্বারা সেই কর্ম্মশক্তি বিকাশিত ও পরিপুষ্ট হয়। এইরূপ অনেক কর্ম্ম আছে, যাহা সম্পাদন করিতে করিতে আমাদের মূলধর্ম্মের বিকাশ ও পরিপুষ্টি হয়। ইহাদের কার্য্যধর্ম্ম বলে। সেই কর্ম্ম হইতে বিশেষশক্তি অদৃষ্টরূপে সঞ্চিত

হয়। তাহার ফলে আমাদের ধর্ম্মের বিকাশ, বৃদ্ধি ও অভ্যুদয় হয়। বৈদিক যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা আমাদের ধর্ম্ম এইরূপে বিকাশিত ও বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের অভ্যুদয় করায়, একারণ তাহা ধর্ম্ম। এই বৈদিককর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিবার প্রকৃত কারণ কি? মৃত্যুতে ত মানুষের শেষ হয় না। মানুষের পরকাল আছে। যেমন ইহকালে সুখভোগ মানুষের বাঞ্ছিত, তেমনই পরকালে সুখভোগও তাহার অভীপ্সিত। তাহাই অনেকের পুরুষার্থ। সুতরাং যে কর্ম্মদ্বারা ইহপরকালে সেই সুখভোগ সম্ভব হয়, যাহা দ্বারা ইহপরকালে মানুষকে সেই সুখ ও ভোগের অবস্থায় ধারণ করিয়া রাখে, তাহাও মানুষের ধর্ম্ম। বৈদিককর্ম্মদ্বারাই ইহকালে এবং প্রধানত পরকালে এই সুখের অবস্থা, এই অভ্যুদয় সম্ভব হয়, এইজন্যই বৈদিক-কর্ম্মকে প্রধানত ধর্ম্ম বলে। ইহা কার্য্যধর্ম্ম। আর যাহা হইতে এইরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, তাহাও ধর্ম্ম। এইজন্য পূর্ব্বমীমাংসা অনুসারে—

"চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ।"

বৈশেষিকদর্শনেও উল্লিখিত হইয়াছে,

"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।"

ইহা পরে বিবৃত হইবে।

ইহা ব্যতীত ধর্ম্ম আরও অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা এস্থলে তাহার দুইএকটিমাত্র উল্লেখ করিব। শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মানুষের শক্তি ত্রিবিধ। মানুষের জ্ঞানশক্তি আছে, কর্ম্মশক্তি আছে, সুখদুঃখানুভূতিশক্তি আছে। মানুষ জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা। ইহা পূর্ণ বিকাশা-বস্থা—সচ্চিদানন্দময় অবস্থা। প্রকৃতির সহায়ে আমাদের এই ত্রিবিধ শক্তির বিকাশ হয়। প্রকৃতির গুণ বা শক্তি ত্রিবিধ। প্রকৃতির প্রকাশভাব, চঞ্চল বা কার্য্যভাব এবং আবরণ বা মোহ বা জড়ভাব আছে। এই তিন ভাব বা গুণ—সত্ত্ব, রজ ও তম নামে অভিহিত। তদনুসারে আমাদের জ্ঞানবৃত্তি, কর্ম্মবৃত্তি ও সুখদুঃখানুভূতিবৃত্তি—প্রকাশ বা সুখস্বভাব হইতে পারে, চঞ্চল বা দুঃখস্বভাব হইতে পারে, অথবা অভিভূত বা মুগ্ধস্বভাব হইতে পারে। আমাদের প্রকৃতিধর্ম্মের ক্রম-আপূরণে যখন এই সকল বৃত্তি প্রকাশশীল বা নির্ম্মল ও সুখ-স্বভাব হয়,—তখনই আমাদের ধর্ম্মের প্রকৃত বিকাশাবস্থা হয়, এইজন্য আমাদের অন্তঃ-করণের এই সাত্ত্বিক বা বিকাশভাবকে আমরা ধর্ম্ম বলিতে পারি। ইহা উল্লিখিত কারণধর্ম্ম বা গুণধর্ম্মের অন্তর্গত। আর যে অনুশীলন-দ্বারা আমাদের এই চিত্তবৃত্তির এইরূপ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইতে থাকে, তাহাকেও ধর্ম্ম বলা যায়। বঙ্কিমবাবু ইহাকে অনুশীলনধর্ম্ম বলিয়াছেন। ইহা কার্য্যধর্ম্মের অন্তর্গত।

আর এক কথা। আমরা জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তার ভাবে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে, বিষয় জ্ঞেয়, কার্য্য ও ভোগ্য হয়। এই বিষয়-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান প্রভৃতি বৃত্তির যেরূপ ভাব হয়, তাহারা যেরূপে পরিচালিত ও নিয়-মিত হয়, তদনুসারে আমাদের ধর্ম্ম কিরূপ বিকাশিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং এই বিকাশের বিশেষ অবস্থাকে ধর্ম্ম বলে। আমাদের জ্ঞেয় প্রভৃতি বিষয়— ঈশ্বর, আত্মা ও জড়জীবময় জগৎ। এই জ্ঞেয়বিষয়-সম্বন্ধে আমাদের চিত্তের অবস্থাবিশেষকে ধর্ম্ম

বলে। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি, সমস্ত চিত্ত-বৃত্তির ঈশ্বরাভিমুখ ভাব, সর্ব্বজীবে আত্মদর্শন, সমস্ত জগতে ব্রহ্মসত্তার অনুভব,—ইহাও ধর্ম্ম-নামে অভিহিত।

ধর্ম্ম এইরূপে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশেষত মানবধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদের সকলের সাধারণ ধারণা একরূপ নহে। বলিয়াছি ত, যাহা মানুষকে ধারণ করে, রক্ষা করে, তাহার মনুষ্যত্বকে বিকাশ করে ও তাহাকে পূর্ণ আদর্শের অভিমুখে লইয়া যায়, তাহাই মানুষের ধর্ম্ম। বলিয়াছি ত, যে কর্ম্ম-দ্বারা, যে গুণের বিকাশে মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষা পায় ও ক্রমোন্নত হয়, তাহাকেও মানুষের ধর্ম্ম বলে। এইজন্ত ধর্ম্মের এত বিভিন্ন অর্থ। এইজন্য ইংরেজিতে যাহাকে (religion) রিলিজন্ বলে, তাহার নাম ধর্ম্ম। যাহাকে সদাচার বা নীতি (morality) বলে, তাহারও নাম ধর্ম্ম। যাহাকে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম (duty) বলে, তাহার নামও ধর্ম্ম। মানুষের দয়া প্রভৃতি সদ্গুণের নাম ধর্ম্ম। আর সেই সদ্বৃত্তিপ্রণোদিত আচরণের নামও ধর্ম্ম। যাহা দ্বারা ইহপরকালে সুখ ও অভ্যুদয় হয়, তাহার নাম ধর্ম্ম। সুতরাং আমাদের বৈদিককর্ম্মে প্রবৃত্তি ও তাহার আচরণের নামও ধর্ম্ম। অন্যদিকে যাহাকে স্বভাব (nature) বলে, তাহার নামও ধর্ম্ম। আবার যাহা সমাজকে —সমাজশরীরকে ধারণ করে, যাহা সমাজে বিহিতকর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হয়, যাহা দ্বারা সমাজে পরস্পরের মধ্যে ব্যবহার বিহিত হয়, যে বিধানদ্বারা সমাজ রক্ষা হয় বা সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ রক্ষা হয়, তাহার নামও ধর্ম্ম (law)। এজন্য মানবধর্ম্মশাস্ত্র বা মনুসংহিতাকে Laws of Manu বলা হয়। বুদ্ধদেব যে সাধনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহার নাম ধর্ম্ম,—তাহা ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন বলিয়া অভিহিত।

কিন্তু সকলের মূলে সেই এক অর্থই নিহিত। যাহা আমাদিগকে বা আমাদের মনুষ্যত্বকে ধারণ করে, রক্ষা করে ও পূর্ণপরিণত করে, তাহাই ধর্ম্ম। প্রকৃতপক্ষে কিসে আমাদের এ মনুষ্যত্বকে ধারণ করে? মানুষের পরমাদর্শই তাহাকে ধারণ করে, উন্নত করে। তাহার সেই পরমাদর্শ তাহার ঈশ্বর। তিনি সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণ পরমপুরুষ। মানুষকে যাহাতে ঈশ্বরাভিমুখ করে, তাহাতেই মানুষের মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশ হয় ও তাহাতেই মানুষের পরমাদর্শের দিকে গতি হয়। আমাদের ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত—আমরা ব্রহ্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বভাব। "সোঽহং" এই মহাবাক্য আমাদের প্রকৃত পূর্ণ আদর্শকে দেখাইয়া দেয়। খ্রীষ্টধর্ম্মেও মানুষকে ঈশ্বরের পুত্ররূপে, অথবা খ্রীষ্টের কথায় "আমি ও আমার পিতা এক" ইহা, নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে সেই পরমাদর্শ ইঙ্গিত করিয়া দেয়। অতএব যাহাতে আমাদিগকে সেই ঈশ্বরের অভিমুখ করে, যাহাতে আমাদিগকে সেই পরমাদর্শ ঈশ্বরের দিকে বা ব্রহ্মের দিকে লইয়া যায়, তাহাই আমাদের প্রকৃতধর্ম্ম। যাহাকে ইংরেজিতে রিলিজন্ বলে, তাহাতে আমাদের এইরূপে ঈশ্বরাভিমুখ করে বলিয়া,—ঈশ্বরে পরানুরক্তি জন্মাইয়া তাঁহার দিকে আমাদের গতি করায় বলিয়া, তাহাই প্রধানত আমাদের ধর্ম্ম। যাহা আমাদিগকে ঈশ্বরের সহিত পুনঃসংযুক্ত করিয়া দেয়, তাহাই ধর্ম্ম—তাহাই রিলিজন্। রিলিজনের ধাতুগত

অর্থও তাহাই (*re-ligare* to bind)। সংসারের প্রবৃত্তি, সংসারের ভোগসুখানুরক্তি আমাদের ঈশ্বরাভিমুখ হইতে দেয় না—এজন্য তাহাকে অধর্ম্ম বলে। আমাদের এরূপ কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, যাহাতে আমাদের সংসারাভিমুখতার পরিবর্ত্তে আমাদিগকে ঈশ্বরাভিমুখ করে। এইরূপ কর্ম্মকেই ধর্ম্মাচরণ বলে—এককথায় তাহাদিগকেই ধর্ম্ম বলে। আমাদের প্রবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তি এরূপে নির্ম্মিত করিতে হয়, আমাদের এরূপ গুণের বিকাশ করাইতে হয়, যাহাতে আমরা এইরূপে ঈশ্বরাভিমুখ হইতে পারি। সুতরাং ইহাদিগকে ধর্ম্ম বলে। বলিয়াছি ত, ঈশ্বরই আমাদের পরমাদর্শ, আমরা ব্রহ্মস্বরূপ, আত্মস্বরূপ। অতএব যাহা আমাদিগকে এই পরম আদর্শের অভিমুখে ধারণ করিয়া রাখে, সেইদিকে আমাদের লইয়া যায়, তাহাই আমাদের ধর্ম্ম। যাহা আমাদিগকে ঈশ্বরের সহিত, ব্রহ্মের সহিত বা সেই পরম আদর্শের সহিত সংযুক্ত রাখে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের ধর্ম্ম। যে কর্ম্মে, যে আচরণে, যে ব্যবহারে, যে গুণের বিকাশে, আমাদের এই ঈশ্বরসংযোগের সাহায্য হয়, আমাদের ঈশ্বরসংযোগের দিকে গতি হয়,—তাহাই আমাদের ধর্ম্ম। এইজন্য ধর্ম্মের নামান্তর—যোগ। গীতায় এই ধর্ম্মকে যোগ বলা হইয়াছে। যাহা দ্বারা আমাদের ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধসূত্র দৃঢ়ীভূত হয়, সে সম্বন্ধ রক্ষিত হয়, যাহাতে আমরা পরিণামে ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইতে পারি, তাহাই যোগ। জ্ঞানযোগ বল, কর্ম্মযোগ বল, ভক্তিযোগ বল, কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ বল, ধ্যানযোগ বল, সকলই এই ধর্ম্মের নামান্তর। সকলই আমাদিগকে এই পরমাদর্শের অভিমুখে রক্ষা করে, ধারণ করে, এবং সেইদিকে ক্রমে লইয়া যায়। তাহাই প্রধানত আমাদের ধর্ম্ম। তাহাই মুখ্যধর্ম্ম। আর যাহার দ্বারা আমাদের এই পথের কণ্টক দূর হয়, এই পথের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা যায়, সংসারের আকর্ষণকে ক্রমে ক্ষীণ করা যায়, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ, তাহারই পথ প্রকৃত ধর্ম্মপথ। সকল ধর্ম্মই এই এক মূল উৎস হইতে নিঃসৃত।

মানুষ প্রথমত এই পরমধর্ম্ম বুঝে না। তাহার নিজের স্বরূপ, তাহার পরমাদর্শ সে আদৌ ধারণা করিতে পারে না। মানুষ প্রথমে সংসারে বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া, তাহা হইতে সুখদুঃখ অনুভব করে;—সুখদায়ক বিষয় গ্রহণ করিতে ও দুঃখকর বিষয় ত্যাগ করিতে চেষ্টা করে। তখন তাহার এই সাংসারিক সুখই পরমাদর্শ—পরমপুরুষার্থ থাকে। তখন সে অর্থকামকেই পরমপুরুষার্থ বুঝে। এইজন্য এই পুরুষার্থ লাভ করিতেই সে চেষ্টা করে। সে আপনার এই বিষয়ভোগজনিত সুখস্বরূপ অবস্থাকে তখন পরমাদর্শ ধারণা করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে আপনার ভ্রম না বুঝিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার প্রকৃত মনুষ্যধর্ম্মবিকাশের সময় হয় না। যাহাতে মানুষকে ভ্রান্ত ও সঙ্কীর্ণ আদর্শে ধারণ করে, রক্ষা করে ও তদভিমুখে লইয়া যায়, তাহা মানুষের ধর্ম্ম নহে। যাহা তাহাকে তাহার প্রকৃত পূর্ণ পরম আদর্শের দিকে লইয়া যায়, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। তাহাতেই তাহার ধর্ম্মের পূর্ণবিকাশ ও পরিণতি। তাহাই

তাহার প্রকৃত মনুষ্যত্বকে ধারণ করে, তাহার পরমাদর্শ ঈশ্বরের সহিত তাহাকে ধরিয়া বা সংযুক্ত করিয়া রাখে, এইজন্য তাহাই মানুষের প্রকৃত ধর্ম্ম।

সে যাহা হউক, যাঁহারা ঈশ্বর বা ব্রহ্ম স্বীকার করেন না, অন্তত ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে মানুষের পরমাদর্শ, তাহার পরমস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন না—মানুষের উন্নতির পথে—তাহার ধর্ম্মবিকাশের পথে ঈশ্বরের অনুগ্রহ বা সহায়তা স্বীকার করেন না, তাঁহারাও মানুষের একটা কাল্পনিক প্রকৃষ্ট আদর্শ ধারণা করিয়া নিজের চেষ্টায় তদভিমুখে অগ্রসর হইতে যত্ন করেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা মানুষের এই শ্রেষ্ঠ আদর্শ ধারণা করিয়া আপনার মনুষ্যত্বকে তদভিমুখে বিকাশ করিতে চেষ্টা করেন,—তাঁহারা সেই আদর্শে আপনাদিগকে ধরিয়া রাখিতে যত্ন করেন। তাহাতেই তাঁহাদের ধর্ম্ম বিকাশিত হয়। এইজন্য চার্ব্বাক-বৃহস্পতি প্রভৃতি ঋষিগণ বা মিল্‌-স্পেন্সর ডার্বিন্‌ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ নিরীশ্বর হইলেও ধাৰ্ম্মিক ছিলেন। বুদ্ধদেব, কপিলঋষি প্রভৃতিও ঈশ্বরবাদী না হইয়া পরম ধাৰ্ম্মিক ছিলেন। সিদ্ধশ্রেষ্ঠ কপিলঋষির ন্যায় যাঁহারা সাংখ্য যোগী, তাঁহারা মানুষকে কেবল "আত্ম"-স্বরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, আত্মাকে প্রকৃতির অতীত, শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব সিদ্ধান্ত করিয়া, সেই পরমাদর্শের দিকে আপনাকে ধরিয়া রাখা, ও সেইদিকে ক্রমে অগ্রসর হইয়া সেই আদর্শ লাভ করাই পরমপুরুষার্থ বা পরমধর্ম্ম সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু আমরা ঈশ্বরকে আমাদের পরম আদর্শ ধরিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করি, অথবা আত্মাকেই পরম আদর্শ ধরিয়া অগ্রসর হইতে যাই, উভয়েরই ফল এক। উভয়েরই গতি এক অর্থে, এক দিকে। উভয়ের ধর্ম্মাচরণ একরূপ,—উভয়ের সাধনাপথ পৃথক্‌ হইলেও একমুখ। কেন না, আত্মা ও পরমাত্মা এক। যাঁহারা ঈশ্বরকে পরমাদর্শ ধরিয়া তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হন, তাঁহারা ঈশ্বরযোগী। আর যাঁহারা আত্মস্বরূপলাভ পরমপুরুষার্থ জানিয়া তাহা লাভ করিতে অগ্রসর হন—তাঁহারা আত্মযোগী। যাঁহারা আত্মযোগী, তাঁহারা ঈশ্বর বা অন্য কাহারও সহায়তা বিনা কেবল নিজের চেষ্টায়, নিজের সাধনাবলে, নিজের উপর নির্ভর করিয়া—নিজের ধর্ম্ম বিকাশিত করিয়া অভ্যুদয়ের পথে, মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে যত্ন করেন। আর যাঁহারা ঈশ্বরযোগী, তাঁহারা এই ধর্ম্মের পথে, ভগবানের অনুগ্রহে, তাঁহার পরমা প্রকৃতির অনুকম্পায়, দেব, ঋষি, সিদ্ধগণ প্রভৃতির সহায়তায়, তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হন। আমাদের শাস্ত্র অনুসারে এই শেষোক্ত পথই সহজ ও সুখসাধ্য। কেন না, স্বয়ং ভগবানের ও তাঁহার পরা শক্তির এবং দেবগণের অনুগ্রহে ও সহায়ে সহজে সে পথের বাধাবিঘ্ন দূর হইয়া যায়। বিশেষত তাহাই সত্যপথ। যাহা হউক, ঈশ্বরযোগীই হউন, আর আত্মযোগীই হউন, আত্মস্বরূপ লাভ না করিলে, আত্মাকে প্রকৃতির নিগড় হইতে মুক্ত করিতে না পারিলে, আমাদের পরমাদর্শ লাভ হয় না, আমাদের নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয় না। নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি বা মুক্তিই আমাদের পরম পুরুষার্থ। তাহাতে ত্রিবিধদুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়,

সচ্চিদানন্দস্বরূপ লাভ হয়;—আমাদের পরম আত্মস্বরূপে বা ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান হয়। আদর্শ—প্রকৃত স্বরূপ সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মত্ব- যাহাতে বা যাহা হইতে এই নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি প্রাপ্তি—বা স্বারাজ্যসিদ্ধি হয়;—প্রকৃত হয়, তাহাই মুখ্যধর্ম্ম।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

মনীষা।

[মিশ্রকাব্য]

দ্বিতীয় সর্গ।

(শেষার্দ্ধ)

আমি পুন কহিলাম —"অয়ি ভদ্রে, সে চন্দ্রা কি তুমি
রাজকন্যাসখী হ'য়ে ত্যজিলে যখন পিতৃভূমি,
বল নাই রুদ্ধকণ্ঠে অশ্রুসিক্ত সকাতর ভাবে
(প্রণমি' পিতৃচরণে)—উত্তরিয়া নৃপতির বাসে
ভুলিবে না নিজজনে—বাধাবিঘ্ন ঘটিলে কাহার
র'বে সেথা একজন সাধিবারে তাদের উদ্ধার ?
হের মোরা আজিকে বিপন্ন যাচি শরণ তোমার।"
মন্মথ সুধাল' পুন—"সেই তুই চন্দ্রা কি আমার,
ভেবে দ্যাখ্ যবে দয়ামায়ালেশ ছিল তোর মনে
শরবিদ্ধ মৃগশিশু ছুটে এসে চকিতনয়নে
স্থাপিয়া শ্বসিত মুখ তোর কোলে কাঁদিল গুমরি—
কত না কাঁদিলি তুই রক্তসিক্ত দেহ বক্ষে ধরি'
তিতারিলি নিজ বাস—তবু সে মৃগের রক্ত, হায়!—
নহে অগ্রজের তোর—তাতেই কাঁদিলি উভরায়!
রে চন্দ্রা! কি ছিলি! এই শিশুটির দিব্য দিয়ে বলি
মূর্ত্তিমতী গাঙ্গধারা কি পাষাণময়ী আজি হলি!"
নিকুঞ্জ কহিল—"তুমি মাতৃস্বসা এ মাতৃহীনার,
মা বলিয়া জানে তোরে এই যে লতিকা জোছনার।"

তখন কহিল চন্দ্রা—"ক্ষান্ত হোক্ দুর্ব্বল ভাবণ,
সমগ্র নারীর তরে পারি না কি করিতে ছেদন
এ জীবন্ত মায়াপাশ ?—স্পার্টা-নারী-সম হেলাভরে
সমস্ত নারীর মহা চিরন্তন মঙ্গলের তরে
উৎপাটিব স্নেহবৃন্ত ;—কিম্বা সে রতন রাও রাজা
একমাত্র পুত্রে যথা অবহেলে দিল মৃত্যু-সাজা
ন্যায়-অনুরোধে—আমারো অসাধ্য নহে তা' জগতে।
ভেবেছ কি তুমি ভ্রষ্ট হ'ব আমি ন্যায়পথ হ'তে,
বাঁচাইতে রাজপুত্রে—বাঁচাইতে নিজ সহোদরে
নারীর উদ্ধারব্রত ভুলি ? পারি তবে তোমা'-তরে
করিবারে কিছু বিবেচনা ! হায় সমস্যা কঠিন,
কর্ত্তব্য ও স্নেহে দ্বন্দ্ব হ'লে ! দিনু দিন-দুই-তিন,
এই অবসরে সবে, যত শীঘ্র হোক্, হেথাকার
সান্নিধ্য ত্যজিয়া যাও—ব্যক্ত হবে কথা—অত্যাচার
ব্যাঘ্রীনারীদলমাঝে পূর্ণমাত্র পাইবে কুমার !
তাই আজি তব পাশে সানুনয় মিনতি আমার
কর পণ—এস্থান ত্যজিতে তূর্ণ।"

করিনু শপথ—

তখন হেরিনু চন্দ্রা পিঞ্জরের বিহঙ্গিনীমত
ইতস্তত ভ্রমিছে অস্থিরা। মন্মথের কাছে গিয়া
গললগ্নবাসে কহে হাত জুড়ি' মার্জ্জনা মাগিয়া—
"দেখেই চিনেছি তোমা'—দাদা ! দাদা ! ক্ষম অপরাধ,
কর্ত্তব্য কঠিন হ'য়ে পাড়িয়াছে আজি পরমাদ—
করিয়াছি ক্রুর আচরণ। তুমি ত' বুঝ নি মনে
আজি এ আশঙ্কা-হর্ষে বিজড়িত তব আগমনে
কি অধীরা সহোদরা তব ? এ কাপট্য আজিকার
কেবলি কর্ত্তব্য-অনুরোধে। স্নেহময়ী মা আমার
আছেন কুশলে ?"

এত কহি ভূমিষ্ঠ হইয়া বালা

প্রণমিল মন্মথেরে। সে দোঁহে অতীত স্মৃতিমালা
জড়া'ল বাঁধিয়া পুরাণো কথার লক্ষফাঁসে। কত
বাল্যস্মৃতি পুষ্পময়ী মাধুরী জড়ানো অবিরত

ভাবিল সাগ্রহ—নয়নকমলে ঝরিল শিশির-
বিন্দু-সারি ;—মুগ্ধ দোঁহে কথাবিষ্ট—আমরাও স্থির
চেয়ে আছি—সহসা শুনিনু কণ্ঠ—"পাঠালেন মোরে
সুলোচনা-দিদি বিশেষবারতা-বিজ্ঞাপন-তরে
তব ঠাঁই।" চমকিল চন্দ্রা—মোরাও হেরিনু ফিরি
সুলোচনা-ভগ্নী বেলা দাঁড়ায়েছে ওষ্ঠাধর দীরি'
নিজবার্ত্তা বিজ্ঞাপিতে। —ত্রয়োদশী সে সুতন্বী শ্যামা
আলুলিত-কৃষ্ণকেশা দীপ্তনেত্রা মন-অভিরামা
প্রফুল্লকমলকান্তি পাটলবসনপরিধানা
মূর্ত্তিমতী মধুরিমা—নিপুণ তুলিকামুখে টানা
চিত্রপটে চিত্রখানি যথা—বিস্মিত নয়নে তা'র
চিন্তারাশি--স্বচ্ছজলে জ্যোতিগ্রহমণ্ডিত উদার
যেমনি অনন্ত ঊর্দ্ধ।

দ্বারপ্রান্তে দাঁড়া'ল এমনি
সুহাসিনী। বিস্মিত চীৎকারে চন্দ্রা কহিল তখনি—
"বেলা! তুই! শুনেছিস্ কথা? করেছিস্ সর্ব্বনাশ?"
"আর্য্যে! আর্য্যে! ক্ষম মোরে—না ছিল তা' চিত্তে অভিলাষ—
অতর্কিতে শুনেছি সকলি। কিন্তু নহিক' পামরী—
ভেবো না মৃত্যুর গ্রাসে সঁপিব হৃদয়ে বজ্র ধরি'
এ অতিথি মহাজনে।" "তোরে নাহি অবিশ্বাস-বিন্দু—
শৈশবসঙ্গিনী তোর দিদিরে ভালই জানি কিন্তু,—
জানি তা'র ঈর্ষাভরা মন—তাই করি সাবধান—
করিস্ নে গুপ্ত ব্যক্ত। এ তপস্যাগৃহে বহ্নিদান
করিস্ নে যেন। মোদের সমুচ্চ শির হবে নত—
খর-খড়্গ-জিহ্বা মেলি' মৃত্যু আসি রাক্ষসের মত
মুহূর্ত্তে গ্রাসিবে তিনজনে—আর এ মনোমন্দির—
প্রত্যেক ইষ্টকস্তরে আছে যাহে হৃদয়রুধির
আমা' সবাকার—নিমেষে টুটিবে ঘোর ঘৃণাময়
কীর্ত্তিহীন অনাদরমাঝে।" "মাতঃ, করিয়ো না ভয়—
এ গুপ্ত করিলে ব্যক্ত ভানুমতী যদি হ'তে পাই,
তবুও তা' না করিব কভু।"—"বস্ বাছা, বস্ তাই—

হোক্ বিশ্বকোণে দিব্য নব মহী অগ্নির সঞ্চার
নারীর উত্তম। তাহে হোক্ যথা সমিধ্-সম্ভার
নারীর অপূর্ব্ব কীর্ত্তি, দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হোক্;
পুণ্যগন্ধ-ধূপসম হিল্লোলে প্লাবিয়া বিশ্বলোক
যুগান্তর আনন্দে ভরিয়া।”

'এ আত্রেয়ী তপোবনে”
নিকুঞ্জ কহিল, “লভিনু আতিথ্য তব বরাঙ্গনে!
যে অমৃতময়,—এ জীবনে ভুলিতে কি পারি আর?
তোমা'-হেন তপস্বিনী মোদের আশ্রমে একবার
পাই যদি সুহাসিনী—ঢালি ঢালি হৃদয়ের ঝারি
এ প্রাণদানের যোগ্য কৃতজ্ঞতা দেখাইতে পারি।
প্রাণ ত' দিয়েছ তুমি প্রাণদাত্রি। কি অমূল্য নিধি
তাহা ছাড়া দেছ আর—জানেন তা' অন্তর্যামী বিধি।”
চন্দ্রা কহে, “এস তবে—রেখো মুখ ঘোমটায় ঢাকা
হেথায় দর্শনছাত্রী যারা—বস্ত্রে মুখ ঢেকে রাখা
(চিত্তের সমাধিতরে) তাদের আচার। কবে কথা
নিতান্ত অল্পই—অন্য কারো নাহি লইবে বারতা—
ভুলো না প্রতিজ্ঞাবাণী—মন্দ কিছু না-ও হ'তে পারে।”

হইনু গমনোন্মুখ কোলে নিল নিকুঞ্জ কণারে
বিম্ব-রাগ গণ্ডদুটি যুগল-অঙ্গুলী-মাঝে ধরি
চক্ষে ধীরে হানিল ফুৎকার—চন্দ্রা নিরীক্ষণ করি
মৃদুহাস্য হাসিল মধুর।

ফিরিয়া মোরা তখন
ভ্রমিলাম সবে মেলি একে একে সব আয়তন
আসনে সজ্জিত। ক্ষণকাল ধরি বসি প্রতিঘরে
শিক্ষয়িত্রীমুখ হ'তে শুনিলাম ঝর-ঝর ঝরে
বাক্যধারা—শশিমুখ হ'তে সুধাসম। স্বনস্বন্
স্ফুরিছে মধুর ভাষা—শুভ্রমূর্ত্তি জাহ্নবী যেমন
রজতনিঃসারে—তীক্ষ্ণ উচ্চকণ্ঠে মাঝে মাঝে তা'র
খণ্ড-খণ্ড-মহামূল্য-পুরাণেতিহাস-বাক্যোদ্ধার—

বজ্রঘোষ-ভৈরবগম্ভীর-দীর্ঘসমাস-রচিত
মনোবিমোহন মণিমুক্তা দিয়ে করিল খচিত
মহাকাল-প্রসূত-অঙ্গুলে মহাবাক্য অঙ্গুরীয়
ঝলিবে যা নিত্যকালতরে। ঢালি' এমনি অমিয়
বিলা'ল অনন্ত জ্ঞান—ইতিহাস, মানবের চিত্ত,
রাজনীতি— গগনের গ্রহতারা, সুরক্ষিত বিত্ত
ধরাগর্ভে—খেচর ভূচর আর জলচর তত্ত্ব
চিন্তাভরা—রসায়ন বিদ্যুতের নিয়ম সমস্ত,
ফলফুল যাহা-কিছু জগতের জ্ঞাতব্য বিষয়
মন্ত্রমুগ্ধ শুনি মোরা মানিলাম অপূর্ব্ব বিস্ময়।
অবশেষে বাহিরিনু জ্ঞানামৃতপানে জরজর
শুদ্ধাচারী দ্বিজোত্তম যেইমত অষ্টাশীতিপর
শূদ্রসৌধে নিশিযোগে সমাংস পক্কান্ন করি গ্রাস
কণ্ঠ ভরি— ভোজনস্খলিতগতি ফিরে নিজবাস।

আমি কহিলাম, "কেন—ঠিক এ ত পুরুষেরি মত
করেছে ব্যাপার।" নিকুঞ্জ কহিল, "হাঁ হাঁ, গ্রন্থ যত
আলোড়ন করিয়াছে বটে—কিন্তু নব আবিষ্কার
হবে কি ও হাড়ে?" কহিল মন্মথ, "দুষ্ট কোথাকার!
চন্দ্রার বক্তৃতা হ'তে কিছুই কি পাইলে না সার?
আমি ত' বুঝি না তব কি-যে অর্থ শূন্য প্রশংসার—
ছিছি—মনে ব্যথা পেনু বড়।" সে কহিল, "শূন্য বটে,
কিন্তু বীজছাড়া নহে। কহি তবে তোমা অকপটে—
চন্দ্রা যে অনন্তজ্ঞানী—নাহিক সন্দেহবিন্দু তা'র—
বাগ্‌দেবী আপনি আসি' ঢালিতেন যদি এ মাথার
শুভ্র জ্ঞানধারা—তা'তেও হ'ত না তত—হ'ল যত
চকিত-চাহনি-মাত্র-পাতে। শুন বন্ধু! শতশত
চিত্তক্ষেত্র অনুর্ব্বর অযতনে পড়ে আছে হেথা—
মহোল্লাসে উড়ি' উড়ি' পশিছে বেদনাহীন যথা
কন্দর্পের লক্ষ ভস্মকণা। তাই বহে শূন্যশ্বাসে
হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা। কিন্তু আমি এ মরমফাঁসে

বাঁধিয়া এনেছি সেই অনঙ্গেরে জীবিত এবার
পঞ্চপুষ্প শরাসনে ভুবন মন্থন করে যার
নবনীত হস্তের পরশ— কণ্ঠে যার বিরাজিত
রতিবলয়াঙ্ক—সে দেবতা আজি সায়ক নিশিত
তূর্ণ ত্যজি' কাঁচলি ভেদিয়া মম বিঁধিলা হৃদয়।
ভাব কি মন্মথ তুমি আমিও কেবলি ছায়াময়
মূর্ত্তি হেরি' হয়েছি বিভোর রাজকুমারের মত?
আমা-'পরে নাহি অভিশাপ— ছায়া আর মূর্ত্তি যত
বেশ বুঝি তাহাদের ভেদ। বল দেখি কার পিছে
ছুটিয়া চলেছে চিত্ত—সে কি শুধু ছায়াময় মিছে?
ওই যে অনিন্দ্যকান্তি আঁখিযুগ্ম নীলোৎপলদল
মধুঝরা চকিতবীক্ষিত—ও কি ছায়াই কেবল?
না না, ও ত' ছায়া নয়, অতুল ঐশ্বর্য্যে মহীয়সী
ফুল্লারবিন্দবদনা দৈন্যহরা ষোড়শী প্রেয়সী
মোর! কত কথা গুমরিছে মনে—কহিতে না পারি—
কাঁচলীবন্ধনচাপে এ পুরুষচিত্ত এবে নারী
হ'য়ে আছে। বক্তৃগণে বর্ষিতে লাগিল জ্ঞান,
সুকুমারী শ্রোত্রীদল লাগিল শুনিতে—দেখি' প্রাণ—
তীব্র-কম্প্র ব্যথা-ভরে চেয়েছিল টুটি' ছদ্মবেশ
শতোচ্ছ্বাসে প্রকাশে আপনা—কিন্তু সে গোপন লেশ
প্রকাশিতে দিব না দিব না। ছদ্মবেশা গুপ্তিময়ী
কুহকরাজ্যের রঙ্গপ্রিয়া ললনা ছলনা অয়ি!
দেহ শক্তি হেন ছদ্মবেশভস্মে জ্বলন্ত এ মম
পুরুষহৃদয়বহ্নি সঙ্গোপনে রাখি। সুধাসম
সুস্বর বরষি দাও কণ্ঠে—এ মোর নয়নদ্বয়
হোক্ হোক্ তব বরে তীব্র-প্রেমোন্মাদ-রসময়
উর্ব্বশীকটাক্ষ তুচ্ছ করি'। মোর যুগ্মগণ্ড'পরে
প্রেমরাগ ফুটাও সুন্দরি! ফুল্ল যথা রবিকরে
ফুটায় সে রাঙা কমলিনী। শুন ভোজনপ্রহর
ডাকে কাংস্যকণ্ঠে—চল যাই।"

সবে উঠিয়া সত্বর
চলিলাম সারিসারি—শুভ্রহাস্যে রূপের জোয়ার

উথলি উঠিল মরি বসন্তসাগরে দুর্নিবার
আকুল প্রবাহে। কেহ বা অতসীশ্যামা, কমলিনী
সুবর্ণতপনদীপ্ত দিব্যবিম্বাধরা সুহাসিনী
কোনো রামা। আমার পৌরুষ চিত্ত লক্ষফুলশর-
পাতে কেমনে চেতন ছিল জানেন তা' স্মরহর
অধীর ধূর্জ্জটি। এমনি মথিত চিত্তে তুনয়ন
রেখেছিনু স্থির আপন-আদর্শ-মগ্ন সুনন্দন
মনীষার মুখে। শতশত-রমণীবদন-মাঝে
পদ্মসরোবর-হ্রদে শশিচ্ছবি সে মুখ বিরাজে
উথলিয়া সভাতল। পুন তর্ক ভাতিল নূতন
শিল্প আর বিজ্ঞানে জড়িত, বিচ্ছুরিয়া অগণন
নারীর প্রতিভা, যথা রৌদ্রে হীরকের জ্যোতিষ্কণা।
হেরিনু সহসা দূরে আছে বসি' বিগতযৌবনা
সুলোচনা সমুজ্জ্বলবসনে সজ্জিত, তীব্র-চোখে
স্থির চাহি' মোর মুখে, উদ্ভাসিত বহু দীপালোকে
সে সভার প্রান্তভাগে, শিকারে লক্ষিয়া তীব্রতর
মার্জ্জারী যেমতি চেয়ে থাকে।

শান্ততৃপ্ত অতঃপর

ভাঙিল সে নারীসভা। উদ্যানে ভ্রমণ-আশে
উত্তরিয়া হেরি মোরা হেথা-হোথা মনের উল্লাসে
ভ্রমিছে ভামিনীবৃন্দ। কেহ দীপ্ত-উদ্দীপনা-ভরে
"বীরাঙ্গনা-কাব্য" হ'তে নারী-উক্তি সুধা-তীক্ষ্ণ স্বরে
আবৃত্তি করিছে আনমনে। কেহ বা পড়িছে ধীর
এক হাতে গ্রন্থ ল'য়ে অন্য হাত বুলায়ে শিখীর
গ্রীবাদেশে। কেহ ক্ষুদ্র তরণী আরোহি গাহে গান—
"সাধের তরণী মোর কে দিল তরঙ্গে।" হাল্কা প্রাণ
কেহ বা প্রকাশে উচ্চহাসে। খেলে লুকোচুরি কেহ
পক্ক কমলার কুঞ্জবনে। সে গুরুনিতম্ব দেহ-
ভরে গভীরার্দ্ধ পদচিহ্ন দেখা যায় ধরণীর
বক্ষ'পরে। কেহ বা কন্দুক ল'য়ে খেলিছে অধীর
ক্ষিপ্র শ্রমে হাঁপাইয়া উচ্চহাস্যে। বসি যূথীবনে
বিংশোর্দ্ধবয়সীদল বিশ্রব্ধ-আলাপ-রত মনে

কহিতেছে—"জীবনের বসন্ত গেল যে! মিছা কেন
পাজিপুঁথী ল'য়ে ঘাঁটাঘাঁটি। পাণ্ডিত্য করিয়া হেন
কি রত্ন হইবে লাভ? এখন হয়েছে সাধ চিতে
বিদ্যারণ্য ত্যজি' নব সংসার-আশ্রম প্রবেশিতে
গৃহস্থালি পাতি' বিশাল এ ধরণীর খ্যাতিহীন
অন্ধকোণে বসি' পতিপ্রেমে এবার রহিব লীন,—
বড় সাধ জাগিয়াছে চিতে। বিদুষীরা নহে প্রিয়
পুরুষের।" মোরা ঢাকিলাম মুখ কৃষ্ণ-উত্তরীয়
আবক্ষলম্বিত করি'। ঘুরিতে লাগিল বেলা, রঙ্গে
আর বিদ্রূপে, বিঁধিয়া সবে। তখন দিবসভঙ্গে
মন্দিরে মঙ্গলস্বরে শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল
ধূপধুনামিশ্র পবন আন্দোলি'। নীরবে ফুটিল
বিশ্বহৃদে ভক্তিগন্ধি সন্ধ্যা-কোকনদ। উঠিলাম
উদ্যান ত্যজিয়া সবে।—বাঁধি রূপসারি জুটিলাম
শুভ্রপট্টবাসা ছয়শত নারী স্ফটিকমন্দিরে
জলে যথা শত ঝাড় উদ্ভাসিয়া সন্ধ্যার তিমিরে
বহুদূর ব্যাপি'। বাজিয়া উঠিল বীণা সপ্তস্বরা
মৃদঙ্গ মুরলী। অমনি গম্ভীরে উঠে প্রাণভরা
বেদমন্ত্রধ্বনি আশীর্ব্বাদ যাচি বিশ্ববিধাতার
ঠাঁই—ঝরে যেন স্বর্গ হ'তে অভিনব সুধাধার
নারীর এ মহাব্রতে। মন্দ্রিয়া তন্দ্রিত সন্ধ্যাবায়
আন্দোলি' আন্দোলি' ধ্বনি আরোহিল ঊর্দ্ধ অমরায়।

গান।

মৃদু-মধু-ঝর-ঝরে মৃদু-মধু-ঝর-ঝরে
বহ রে বহ রে আজি মলয়পবন
ধীরে ধীরে ধীরে অতি শ্বসিয়া নীরবগতি
আনন্দে বহ রে আজি মলয়পবন।
বিপুল তরঙ্গ দিয়া
ত্বরিত গোপনে গিয়া
প্রভাতশশীরে চুমি' ফিরে এসে বহ তুমি
ফিরাইয়া আন' মোর হৃদয়রতন
আমার প্রাণের খোকা আমার সোনার খোকা
ঘুমে নিমগন ॥

ঘুমাও সোনার যাদু ঘুমাও সোনার যাদু
আসিবেন তোর কাছে জনক তুহার
কোমল নিশ্চিন্ত সুখে শুয়ে থাক মার বুকে
আসিবেন তোর কাছে জনক তুহার।
ত্বরিতে খোকার তরে
আসুন জনক ঘরে
ওই বুঝি কালো জলে রূপালি চাঁদের তলে
তরীর রূপালি পাল কাতারে কাতার
ঘুমাও সোনার খোকা ঘুমাও প্রাণের খোকা
মাণিক আমার।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

রাইবনীদুর্গ।

[ঐতিহাসিক উপন্যাস]

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

নদীতীরে তরুগুল্মাদির তেমন প্রাচুর্য্য নাই, তাহার উপর ক্ষীণতর হইয়া আসিলেও চন্দ্রকিরণ পরিপূর্ণ-সুবর্ণরেখার বক্ষে বিচ্ছুরিত হইতেছিল। ইহাতে বনপথের ঘোরান্ধকার সেখানে পরিব্যাপ্ত হয় নাই। কুমার পদাঙ্কনারায়ণ তথায় উপস্থিত হইয়া বিষুণ তেওয়ারিকে সুধাইলেন, "নদীস্রোত যেরূপ প্রবলবেগে বহিতেছে, পটুসন্তরণকারী কেহ ইচ্ছা করিলে কতক্ষণে তাহাতে ভাটিয়ালমুখে রাজঘাটে পৌছিতে পারে?" তেওয়ারি রাজকুমারের ব্যাঘ্রদর্শনের ইচ্ছা কেবল একটা ভাণমাত্র মনে করিতে পারে নাই, অতএব সহসা আত্মসংবরণ করিয়া উত্তর করিতে পারিল না। তীক্ষ্ণবুদ্ধি পদাঙ্কনারায়ণের ইহা বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বাঘের জলপান দেখার ইচ্ছাটা অছিলামাত্র ভাবিয়াছ? তা ঠিক নয় তেওয়ারিজী। বাস্তবিক সে গল্প শিকারীদের মুখে অনেকবার শুনিয়া প্রথমেই আজ দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু বলিয়া ফেলিয়া পরে ভাবিলাম যে, বানের দিনে তারা আসিবে কেন? তা সে কথা যাউক। রাজঘাটে ঘোড়ায় যাইতে তোমার কতক্ষণ লাগে? স্রোতে ভাসিয়া গেলে তার আগে যাওয়া যায় কি না?"

তেওয়ারি প্রমাদ গণিল। রাজকুমারের মনোভাব বুঝিয়া সে বলিল, "আজিকার এই বন্যাস্রোত নক্ষত্রগতিকেও হারাইয়াছে। যেমন কেন সন্তরণকুশলী হউক না, উহাতে পড়িলে জলের ঘূর্ণায় তাহাকে বাঁচিতে হইবে না। ধর্ম্মাবতার, এ কথা মনেও স্থান দিবেন না। আপনি বিধবা রাণীমাতার একমাত্র সন্তান—রাজকুলের একমাত্র আশাভরসা—এমন অন্যায় সাহস করা কি আপনার উচিত? আর উহার দরকারই বা কি? আমার বিশ্বাস, পাঠানদস্যুরা সংখ্যায় বেশী নয়। অনায়াসে আমরা উহাদের পরাস্ত করিয়া চলিয়া যাব।"

কুমার চিত্ত স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বলিলেন, "তেওয়ারি, দাদামহাশয় ঘাড়ে একটা লোক লইয়া বন্যার প্রথম বেগেও নিরাপদে রাজঘাটে পৌঁছিলেন, আর আমি তাঁর চেয়ে বেশী সাঁতার জানিয়াও মারা যাব? বিশেষ আমার সঙ্গে পরিধেয় বস্ত্র একখানি-মাত্র থাকিবে, তাহাও মাথায় বাঁধিয়া লইব। দরকার বুঝিলে তাহাও ফেলিয়া দিব। তুমি অন্যায় সাহস করিতেছ। তুমি-আমি হইলে কোন কথা ছিল না—আমরা দস্যুদের পরাস্ত করিতে না পারিলে দাঁড়াইয়া মরিতাম। কিন্তু সঙ্গে স্ত্রীলোক, তাহা কি ভাবিতেছ না? দাদামহাশয় বলেন, গোঁয়ারতমি বীরত্ব নহে। চারিদিক্ ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজ করাতেই আসল মহত্ত্ব ও বীরত্ব। তুমি পাল্কীর কাছে ফিরিয়া দণ্ড-দুই কোনরূপে পাঠান-গুলাকে অন্যমনস্ক রাখিতে পারিলেই দেখিতে দেখিতে তাহারা ইঁদুরের মত কলে পড়িবে। সময় যায়—আমায় আর বাধা দিও না।"

কথা বলিতে বলিতে কুমার অশ্বপৃষ্ঠেই বস্ত্র উন্মোচিত করিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে ঘোড়াটাকে নিকটবর্ত্তী গাছের তলায় ছাড়িয়া-দিয়া তিনি তাহার পিঠ চাপড়াইলেন এবং আদর করিয়া বলিলেন, "যতক্ষণ আমি না ফিরি, এখান হইতে নড়িও না।" তখন পরিত্যক্ত পরিধেয়গুলি তাহার পৃষ্ঠে রক্ষা করিয়া অন্ধকারে রাজপুত্র অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিষুণ তেওয়ারি জলে একটা লম্ফদানের শব্দ শুনিতে পাইল। বায়ুবেগ অকস্মাৎ বাড়িয়া-উঠিয়া বৃক্ষশিরে সঞ্চারিত হইল। তাহার স্বন্‌স্বন্‌শব্দে একটা অস্ফুট "হায় হায়" রব বিষুণ তেওয়ারির কানে বাজিতেছিল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

কল্যাণপণ্ডা অভয়ানন্দের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া রাজপ্রতিনিধির যোগ্য সম্মান তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। শিবাপ্রসন্ন দাস কোন গূঢ় মন্ত্রণার প্রয়োজনানুরোধে পণ্ডাজীর আগমন-সম্ভাবনায় তাঁহার সে প্রকোষ্ঠে প্রবেশের পূর্ব্বেই অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং মীরহবীবের গোপনীয় পত্র লইয়া দুই রাজ-পুরুষের যে তর্কবিতর্ক হইল, তিনি তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না।

কল্যাণপণ্ডার সহিত গিরিমহাশয়ের এই প্রথম সাক্ষাৎ। পণ্ডা প্রবীণ রাজকর্ম্মচারীর যোগ্য সতর্কতার সহিত প্রতি কথা ওজন করিয়া তবে মতামত দিতেছিলেন।—শিবাপ্রসন্নদাসসম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে কিছু না বলিয়া তাঁহার অবরোধ স্বতঃপরত যে ময়ূরভঞ্জরাজ্যের প্রতি সেই সঙ্কটকালে জনসাধারণের বিরাগ উৎপাদন করিয়া একটা অনর্থ ঘটাইবে, ইহারই ইঙ্গিত করিতেছিলেন।

প্রেরিত পাঠানসৈন্তকয়জনের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবার জন্য যে ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ করিলেন।

সকল শুনিয়া অভয়ানন্দ স্থির করিলেন, স্বয়ং দাসমহাশয় যখন উপস্থিত, তাঁহার সমক্ষেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা ভাল। তিনি অলৌকিক ব্যক্তি, নিজের শুভাশুভের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া যথার্থ হিতকর যাহা, তাহারই পরামর্শ দিবেন, এ বিষয়ে গিরিমহাশয় এবং পণ্ডাজীর মধ্যে দ্বিমত হইল না।

তখন দাসমহাশয় উভয়ের আহ্বানে সে মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন। পণ্ডাজী রহস্ত করিয়া বলিলেন, "অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নাই, তাই আজ প্রিয়জনের উপহার লইয়া উপস্থিত হইয়াছি।" তখন সেই পত্রখণ্ড শিবাপ্রসন্নকে পড়িতে দিলেন।

হাসিতে হাসিতে দাসমহাশয় লিপিখণ্ড পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, হাসিতে হাসিতে তাহা শেষ করিলেন। দেখিয়া কল্যাণপণ্ডা বলিয়া উঠিলেন, "দাসজী, সুখে-দুঃখে সমভাব শোনা যায়, দেখিতে বড় পাই না। তোমাতে আজ তাই দেখিলাম। ধন্য তুমি!"

অভয়ানন্দ বিস্মিত হইয়া শিবাপ্রসন্নের প্রফুল্ল মুখ প্রতি চাহিয়া ছিলেন। অভ্যাস কি আত্মপ্রতারণা? পরার্থে জীবন যে উৎসর্গ করিয়াছে, রক্তমাংসের শরীরে সত্যসত্যই সে কি এতটা আত্মজয়ী হইতে পারে?

দাসমহাশয় উভয়কে লক্ষ্য করিয়া স্মিতমুখে বলিলেন—"সিমলিপাহাড় উত্তম স্থান। দিনকতক নির্জ্জনে সেখানে বাস করিয়া সংসারের জ্বালা জুড়াইতে পারি, সে ত ভাগ্যের কথা। আমি প্রস্তুত আছি পাঠানসৈন্তদের ডাকিয়া পাঠাও।"

গিরিমহাশয় এবং পণ্ডাজী একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "ইহা কখন হইতে পারে না। মীরহবীব আমাদের সহিত এই কার্য্যে সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াছে। আমরা পাঠানসৈন্তদের বন্দী করিয়া স্বয়ং নায়েব-নাজিমকে খবর দিব।"

সদানন্দ উচ্চহাস্ত করিলেন। "তোমরা অতি সঙ্কটকালে ময়ূরভঞ্জরাজ্যের কর্ণধার হইয়াছ—এত অধীরতা তোমাদের শোভা পায় না। নবাব আলীবর্দ্দী সঙ্গে শত্রুতা, আবার নবাব-নাজিমকেও শত্রু করিয়া তুলিবে? এখন কিছুতে তাহা হইতে পারে না। দেওয়ানজী আমার সম্বন্ধে যে আদেশ দিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করাই এখন তোমাদের কর্ত্তব্য। অরাজক সময়ে তোমরাই যদি আদেশভঙ্গ করিয়া অরাজকতার প্রশ্রয় দাও, তবে বিপ্লবের আর বাকী কি? আমার জন্ত এই সর্ব্বধ্বংসকর রাষ্ট্রবিপ্লব আমি কদাচ ঘটিতে দিব না। পাঠানসৈন্তেরা আমায় না-ই লইয়া যাক্‌, নিজে গিয়া আমি সিমলিপাহাড়ে ধরা দিব।"

এই আলোচনা সম্পূর্ণ হইতে না হইতে দ্বাররক্ষক আসিয়া সংবাদ দিল, কুমার পদাঙ্কনারায়ণ উপস্থিত। তিনি পণ্ডাজীর সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।

কুমার আসিলেন। নগ্ন পদ, গাত্রে কোন বস্ত্র নাই, কেবল কটিতট সামান্ত বস্ত্রখণ্ডে আচ্ছাদিত। শিবাপ্রসন্ন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আবেগভরে তাঁহাকে একেবারে কোলে তুলিয়া লইলেন।

ক্রমশ।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

বঙ্গদর্শন।

সমস্যা।

আমাদের বর্ত্তমান জাতীয়জীবনে একটা বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, ইহার একটা মীমাংসা চাই—অন্তত কিসে মীমংসা হইতে পারে, তাহা বুঝা চাই। সমস্যাটি এই—ভারতবাসী মানবোচিত সমস্ত অধিকার লাভ করিয়া আর দশ জাতির মত একটা জাতি হইবে, অথবা চিরদিন সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিয়া এ গুরু জীবনভার বহন করিবে? ভারতবাসিমাত্রেরই কথাটা তলাইয়া বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে; ছোট-বড় সাক্ষর-নিরক্ষর হিন্দু-মুসলমান কাহারও এ বিষয়ে উদাসীন থাকিবার অধিকার নাই। এই জীবনমরণের সমস্যায় উদাসীনতা ঘোর অধর্ম্ম।

সময় আইসে নাই, বা আমরা উপযুক্ত হই নাই, এ আমাদের কথা নহে, আমাদের চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্ত নহে; ইহা পরের কথা, অপরের স্তোভবাক্য, আমাদিগকে চিরদিন নিদ্রিত রাখিবার জন্য এ শুধু মোহের ছলনা। যেখানে জীবনমরণের সমস্যা, সেখানে সময় আর আসিবে কি? মরিয়া গেলে-জাতি বিলুপ্ত হইয়া গেলে কি সময় আসিবে? সময় ত প্রতি মুহূর্ত্তেই উপস্থিত, এখনই উপস্থিত। আসন্নমৃত্যু রোগীরই ঔষধসেবনের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, বাঁচিবার চিন্তা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। তখনও যাহাদের ঔষধ খাইবার প্রবৃত্তি নাই, বাঁচিয়া উঠিবার চিন্তা নাই, তাহারা ত বিকারগ্রস্ত,—বিষপ্রয়োগ ছাড়া তাহাদের আর চিকিৎসা নাই, জীবিত থাকিবার তাহাদের আর আশা নাই!

উপযুক্ততাসম্বন্ধেও ঐ কথা। বলি, সম্প্রতি লর্ড মিণ্টো এবং জন্ মর্লে যেভাবে ভারতে শাসনদণ্ডের পরিচালন করিতেছেন, সেভাবে সে কাজ করিবার উপযুক্ত বহু লোক এখনই কি ভারতে পাওয়া যাইতে পারে না? তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ঢের থাকিতে পারে; কিন্তু তাঁহারা যেভাবে কাজ করিতেছেন, তাহাতে প্রজাদমনের জন্য কতকগুলি সৈন্য, লেখাপড়ার জন্য কতকগুলি কেরাণী, আর হুকুম চালাইবার জন্য নাম সহি করিবার বিদ্যাই কি যথেষ্ট যোগ্যতা নহে?

অনেকে মনে করে, "সুখে-স্বচ্ছন্দে খাইতেছি-পরিতেছি, দশটাকা রোজগার করিতেছি, বেশ আছি। অধিকারের কথা বলিলে যদি ইংরেজ-মনিব রুষ্ট হন, তবে তাঁহাকে

চটাইয়া নানা অসুবিধায় পড়া ভিন্ন লাভ কিছু নাই। এ অসুবিধা ডাকিয়া আনিবার দরকার কি? অবশিষ্ট যে কয়টা দিন আছে, এইভাবেই চলিয়া যাউক। ছেলেপুলে লেখাপড়া শিখিয়া প্রস্তুত হউক, মানুষ হউক, তখন তাহাদের কথা তাহারা বুঝিয়া লইবে।" মূর্খতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা এবং নীচতা ইহার নীচে নামিতে পারে না। পঞ্চাশবৎসর যে লেখাপড়া শিখিয়া নিজে যেমন মানুষ হইয়াছ, সন্তানসন্ততি সেই লেখাপড়ায় সেইরূপ মানুষই হইবে। নিজে যে অধিকারের কথাটা মুখে বলিতে সাহস পাইতেছ না, তাহা লাভ করিবার ভার সন্তানের উপর রাখিয়া যাইবে, ধন্য আশা, ধন্য বুদ্ধি, ধন্য উদারতা, আর ধন্য সন্তানবাৎসল্য! তোমার সন্তানেরা লেখাপড়া শিখিয়া অধিকারলাভের জন্য প্রস্তুত হইবে, আর সেই অধিকারের বিরোধিগণ ততকাল ঘুমাইয়া থাকিবে—নাগপাশ গলায় লইয়া বসিয়া থাকিলে সাপ আপনা হইতে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, এই বুদ্ধি বুঝি গত অর্দ্ধশতাব্দীর শিক্ষার ফল? আর সন্তানবাৎসল্যের কথা, তাহার ত তুলনাই নাই! যে সন্তানের মঙ্গলের জন্য প্রকৃতিস্থ মনুষ্য—অনেক পশুপক্ষীও বটে—আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহার জন্য সমস্ত দুঃখবিপৎপরীক্ষার ভার সঞ্চিত রাখিয়া নিজে অক্ষতদেহে পলায়ন করিবে? ধন্য হৃদয়, আর ধন্য বীরত্ব! এরূপ মনের ভাব এখনই পরিত্যাগ কর;—তোমাদের সন্তানেরা যে মানুষের সন্তান, আত্মজীবনের দৃষ্টান্তে অন্তত তাহার পরিচয়টা সন্তানের কাছে রাখিয়া যাও।

ভারতের বর্ত্তমান অশান্তির মূলে একটা বিরোধ লক্ষিত হইতেছে; সেই বিরোধটা কোথায়, তাহা দেখা যাউক। অনেক ইংরেজ মনে করিতেছেন, রাজার সঙ্গে প্রজার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তাই তাঁহারা মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া, ন্যায়ধর্ম্মে বিচারবর্জ্জিত হইয়া, সোনার ভারতরাজ্য হস্তচ্যুত হইল ভাবিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন,—আমাদিগকে রাজদ্রোহী বলিতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক রাজার সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নাই। রাজা 'ভারতসম্রাট্' উপাধি লইয়াছেন, তাহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি, কৃতার্থ হইয়াছি। হিন্দুর মতে রাজা অষ্টদিক্‌পালের অংশসম্ভূত, সুতরাং তিনি দেবতা; তিনি যে কুলে, যে জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনি ভারতবাসীর নমস্য। বিশেষত আমাদের সম্রাট্ ভারতরাজ্যসম্পর্কে যেরূপ নির্লেপ, নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, তাহাতে তাঁহার সঙ্গে বিরোধের সম্ভাবনা কোথায়? তিনি ত প্রকৃতই দেবতা—একমাত্র ধ্যানগম্য। ভারতবাসীকে যাহারা রাজদ্রোহী বলে, তাহারা মিথ্যাবাদী। তাহারা ভারতবাসীর শাস্ত্র, প্রকৃতি বা রাজভক্তি কিছুই জানে না।

তবে বিরোধ কোথায় এবং কাহার সঙ্গে? বিরোধ দুইটা জাতীয় স্বার্থের মধ্যে। একদিকে বিদেশী বণিকের স্বার্থ, অপরদিকে ভারতবাসীর স্বার্থ, এই দুই স্বার্থে তুমুল সংঘর্ষ বাজিয়াছে; তদূর্দ্ধে রাজসিংহাসন, তদুপরি মহামান্য সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড উপবিষ্ট থাকিয়া তুল্যানুরাগে উভয় জাতির ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতেছেন। উভয় জাতির মধ্যে তাঁহার স্নেহানুরাগের কোন

পার্থক্য আছে, এমন মহাপাপের কথা যে কল্পনা করে, বোধ হয় সেও মহাপাপী। সুতরাং এ বিরোধ রাজায়-প্রজায় নহে।

বিদেশীর স্বার্থ—ভারতবাসীর অধিকার চিরদিনের জন্য সঙ্কুচিত করিয়া রাখা; আর ভারতবাসীর স্বার্থ—সমস্ত মানবোচিত অধিকার উপভোগ করিয়া মানুষের মত জীবনধারণ করা। সাধারণ ইংরেজ ভাবিতেছেন, তাঁহাদের এত ধনৈশ্বর্য্য, এত প্রতাপপ্রতিপত্তি, সে শুধু ভারতবাসী নিজের উন্নতির জন্য নিশ্চেষ্ট ছিল বলিয়া; ইহারা যদি একবার আত্মনির্ভরতার সুফল ভোগ করে, তবে আমাদের শক্তি বা প্রাধান্যের অবশিষ্ট আর কি রহিল? ভারতের নন্দন-কাননে আজ সাধারণ ইংরেজ যে ইন্দ্রত্ব উপভোগ করিতেছে, ইহাদের উন্নতির চেষ্টা সফল হইলে সে ইন্দ্রত্ব কোথায় থাকিবে? আর ভারতবাসী ভাবিতেছে, আমাদের এত ধনবল, জনবল, বুদ্ধিবল, সমস্তই ব্যর্থ, সমস্তই নিষ্ক্রিয়। আমাদের সমস্তই আছে, অথচ কিছুই আমরা রাখিতে জানি না; আমরা একটা অতুল প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী, অথচ আমরা ধনদারিদ্র্য এবং শক্তিদারিদ্র্যের জন্য জগতের চক্ষে হেয়, নগণ্য, নিস্পৃহ্য; মানবের জন্মগত এবং জাতিগত যে সকল অধিকার আছে, আমাদের সে সকল কিছুই নাই—জ্ঞানবিজ্ঞানের চিন্তা, কাব্যসাহিত্যের চিন্তা, ঐশ্বর্য্যগৌরবের চিন্তা, সুখসম্পদের চিন্তা, এক কথায় কোনপ্রকার উন্নতির চিন্তা করিবার অবসর আমাদের নাই; আমরা দিনরাত্রি খাটিয়াও অন্নচিন্তা ঘুচাইতে পারিতেছি না;—নিয়ত অন্নচিন্তা, দুর্ভিক্ষচিন্তা, দারিদ্র্যচিন্তা আমাদিগকে বংশপরম্পরায় দিনদিন নিস্তেজ, নিষ্প্রভ, নিরায়ু করিয়া ফেলিতেছে! আমাদের এ সকল অধিকার ইংরেজের স্বার্থের বিরোধী—আমাদিগকে সমস্ত অধিকারে বঞ্চিত রাখিয়াছেন বলিয়াই বিদেশী ভারতবর্ষ হইতে—আমাদের ঘর হইতে প্রতিবৎসর পাঁচশতকোটি টাকা * নিজের ঘরে লইয়া যাইতে পারিতেছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আমরা বিদেশীর আইন, বিদেশীর ব্যবস্থা, বিদেশীর উদারতা, বিদেশীর সহানুভূতি—কিছুরই সাহায্য পাইব না, বরং পদে পদে বাধা, পদে পদে বিরুদ্ধাচরণই পাইব। এ অবস্থায়, আমরা যদি নিজের হিত নিজে না বুঝি, নিজের ব্যবস্থা নিজে না করি, সর্ব্ববিষয়ে আত্মনির্ভরকে অবলম্বন করিয়া না দাঁড়াই, তাহা হইলে, দিনদিন আমাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইবে, অচিরেই আমাদের অন্তিমদশা দর্শন করিয়া জগতের পশুপক্ষী পর্য্যন্ত কাঁদিবে।

উভয়ের কথাই ঠিক, উভয়ের ভাবনাই স্বাভাবিক, উভয়ের পক্ষেই যুক্তিবাদ এবং হেতুবাদ যথেষ্ট রহিয়াছে; তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্যটুকু এই;—সাধারণ ইংরেজ চাহিতেছেন (এবং করিতেছেন) ভারতবাসীর অমঙ্গলে দৃক্‌পাত না করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধি; আর ভারতবাসী চাহিতেছে অমঙ্গলনিবারণ—আত্মরক্ষা। সুতরাং এই স্বার্থসংঘর্ষে ন্যায় এবং ধর্ম্ম কোন্ পক্ষে, তাহা কেহ বলিয়া না দিলেও বুঝা যায়।

এক রাজার অধীন দুই দেশ, দুই জাতি

* চব্বিশপরগণা জেলাসমিতিতে শ্রীযুক্ত মৌলবী মজিবর রহমন সাহেবের বক্তৃতা মনোযোগের সহিত দ্রষ্টব্য।

দুই নীতিতে পরিচালিত হইতেছে। এক জাতির হস্তে শাসনশক্তি প্রায় সম্পূর্ণরূপ থাকাতে অপর জাতির স্বার্থ পদদলিত হইতেছে, অথচ তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা সফল হইতেছে না, ইহাই হইতেছে সমস্যা।

এপর্য্যন্ত এই চেষ্টা কেবল আবেদন এবং নিবেদনেই নিবদ্ধ ছিল। ভারতবাসীর বিশ্বাস ছিল, সাধারণ ইংরেজেরা বুদ্ধিমান্ এবং উদার বলিয়া খ্যাত, সুতরাং যথেচ্ছ-শাসনের দোষ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিলে নিশ্চয়ই প্রতিকার হইবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ভারতবাসী এ পর্য্যন্ত যত আন্দোলন করিয়াছে, তন্মধ্যে সহবাস-সম্মতি আইন এবং বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হইয়াছে, তাহাই প্রধান। এই সকল আন্দোলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, কিন্তু অন্যান্তর সুফল-কুফল অনেক পাওয়া গিয়াছে। প্রথম ফল এই হইয়াছে যে, সাধারণ ইংরেজ যে নিজের স্বার্থরজ্জু শিথিল করিয়া আমাদের অধিকার, স্বার্থ এবং সুবিধা-অসুবিধা দেখিয়া আমাদের কাতরপ্রার্থনা রাজাকে বা যথাস্থানে গোচর করাইবেন, আমাদের প্রতি ন্যায়যুক্ত বিচারের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন, সে আশা এবং সে বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। আন্দোলনে প্রতিকারের আশা কাহারও নাই, তবে একদল বলিতেছেন, "না পাইলাম ফল, তবু আন্দোলন ছাড়ি কেন? রাজাকে দুঃখকষ্ট জানাইতে প্রজার যে একটা অধিকার আছে, সেটি পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিই কেন? না পাইলাম ফল, কিন্তু আন্দোলনে যে একটা বিচারবিতর্ক চলে, একটা সজীবতা লক্ষিত হয়, একটা একতার সুযোগ হয়, তাহা ছাড়িয়া লাভ কি?" আর একদল বলিতেছেন, "যাহার বিফলতা নিশ্চিত, বরং যাহার ফল বিপরীত, সেরূপ আন্দোলনে আর শক্তিক্ষয় করি কেন? আন্দোলনের অর্থ রাজকর্ম্মচারীদিগের কুব্যবহারপ্রতিকারের জন্য রাজার নিকট আবেদন—ক্রন্দন। কিন্তু যেখানে সে ক্রন্দন যথাস্থানে না পৌঁছিয়া বিদ্রূপ, উপহাস, তিরস্কার মাত্র লাভ করিয়া ফিরিয়া আইসে, সেখানে বিফল আবেদনের উপর বিফল আবেদনে একটা নীচতা, একটা অকর্ম্মণ্যতা, আত্মাবমাননার একটা বিড়ম্বনা নাই কি? বিফল ক্ষেত্রে সফলতালাভের পৌনঃপুনিক নিষ্ফল চেষ্টার পরিণামস্বরূপ অবশেষে একটা জাতীয় অবসাদ জন্মিতে পারে না কি? যদি এইরূপ অবসাদ একবার জন্মিয়া যায়, তবে আর শত চেষ্টাতেও যে ভারতের জাতীয়দেহে চেতনাসঞ্চার হইতে পারিবে না! অতএব পুনঃপুন বিফল আন্দোলনে আর অবসাদ—জাতীয়মৃত্যু ডাকিয়া না আনিয়া এখন সফল আন্দোলন করা যাউক—এখন প্রজাশক্তির নিকট আবেদন করা যাউক।"

বাস্তবিক এখন আর দুই দল নাই, একই দলের এ দুই কথা,—সমস্যার বিপৎসঙ্কুল দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ভারতবাসী এখন আপনাকেই আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছে—এ পথে যাই কি ও পথে যাই? সমস্যাস্থলে এরূপ প্রশ্ন স্বাভাবিক।

কিন্তু বাতাস কোন্ দিকে বহিতেছে, সমস্যার মীমাংসা কোন্ পথে চলিতেছে, বুদ্ধিমানের নিকট তাহা অবিদিত নাই।

সাধারণ প্রজা রাজনৈতিক অধিকার না বুঝুক, রাজপুরুষদিগের বিধিব্যবস্থার গৌণ-ফল না ভাবুক, কিন্তু দরিদ্রতার যে প্রতিকার চাই, সারাদিন পরিশ্রম করিয়া যে দুইবেলা পেট ভরিয়া খাওয়া চাই, দুর্ভিক্ষনিবারণ, শস্যগ্লানি-নিবারণ এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দমনের যে একটা উপায় চাই, ইহা তাহারা বুঝে। প্রজাশক্তিকে কেন্দ্রীভূত এবং কার্য্যোন্মুখ করিতে হইলে, সর্ব্বসাধারণে যাহার উপযোগিতা বুঝে, তাহা লইয়াই কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। স্বদেশীগ্রহণ এবং বিদেশীবর্জ্জন প্রজাশক্তির নিকট প্রথম আবেদন—প্রজার আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইবার প্রথম চেষ্টা। এই আবেদন কতদূর সফল,—এই আত্মনির্ভরের চেষ্টা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, গত দুই-বৎসরের বস্ত্রবাণিজ্য এবং লবণবাণিজ্য তাহার প্রমাণ। গত দুইবৎসরে বিদেশীবস্ত্র এবং বিদেশীলবণের আমদানি কমিয়া যাওয়াতে ভারতের কয়েককোটি টাকা ভারতেই রহিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে বঙ্গে ও বিহারে জোলা এবং তাঁতীর লক্ষ লক্ষ পরিবার টাকায় পাঁচসের করিয়া চাউল কিনিয়া খাইয়াও দুর্ভিক্ষ অনুভব করিতে পারে নাই। দুর্ভিক্ষের সময়ে রাজা যেরূপ সাহায্য করেন, তাহা জানা আছে। প্রজা যদি বিদেশীবর্জ্জনদ্বারা স্বদেশী-বস্ত্রব্যবসায়ীর অন্নসংস্থান না করিত, তাহা হইলে এই দীর্ঘকালব্যাপী অন্নদৈন্যে এই লক্ষ লক্ষ পরিবারের কি দশা হইত? প্রজাশক্তি আত্মনির্ভরের রসাস্বাদ সবেমাত্র এই প্রথম পাইল; ভবিষ্যতে তাহার ক্রিয়াশীলতা এবং সফলতার সীমানির্দ্দেশ করিতে কে সমর্থ?

ভারত এবং ইংলণ্ডের বিভিন্নমুখ স্বার্থই ভারতীয় রাজনীতির প্রধান সমস্যা; একমাত্র প্রজাশক্তি অর্থাৎ প্রজাসাধারণের দৃঢ়নিবদ্ধ একতাই এই সমস্যার সমাধানে সমর্থ। কিন্তু সাধারণ ইংরেজ নির্ব্বোধ নহে, নিশ্চেষ্ট নহে, ভারতবাসীর একতাকে ভাঙিবার জন্য, প্রজা-শক্তিকে ব্যর্থ করিবার জন্য তাহাদের ভেদ-নীতি নানা মূর্ত্তিতে দেখা দিতেছে। কোথাও টাকাপয়সায় সাহায্য করিয়া, কোথাও চাকুরী প্রভৃতি নানা অনুগ্রহের লোভ দেখাইয়া, আর কোথাও 'তুমি বড় বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্' বলিয়া পিঠ চাপড়াইয়া এই ভেদনীতি ভারতের প্রজাশক্তিকে ছত্রভঙ্গ এবং ছিন্নভিন্ন করি-বার চেষ্টা করিতেছে। যাহারা এ সবে ভুলি-তেছে না, এ সব টোটকায় যাহাদের রোগ-মুক্তির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না, তাহাদের জন্য ফুলারি-পেটেণ্ট লাঠ্যৌষধি এবং যথায় পীড়া আরও কঠিন, তথায় কারাগাররূপ হাঁসপাতালের ব্যবস্থা হইতেছে।

সর্ব্বত্রই শিক্ষার একটা আদর আছে, শিক্ষিতলোকের কথার একটা মূল্য আছে; কিন্তু ভারতবাসীর শিক্ষা এখন সাধারণ ইংরে-জের চক্ষের বালি, শিক্ষিত ভারতবাসী এখন সাধারণ ইংরেজের "শত্রু"। ভারতের জন্য এখন যে-কোন বিধিব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে আর শিক্ষিত ভারতবাসীর স্থান যাহাতে না হয়, সে চেষ্টাই হইতেছে। ভারতের শিক্ষিত-সমাজকে এখন এই রাজনৈতিক দাবাখেলার চাল ঠিক করিতে হইতেছে, এই ভেদনীতিকে ব্যর্থ করিবার উপায় দেখিতে হইতেছে। যদি এই ভেদনীতি অচিরে ব্যর্থ না হয়, তবে আর আশাভরসা নাই, ভারতবাসীর অব-

নতি ঘুচিবার আর কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। যাহারা এখন ভেদনীতিতে ভুলিবে, তাহাদের অশ্রুজলে একদিন গঙ্গাযমুনার স্রোত কূল ছাপাইয়া চলিবে, কিন্তু তখন অশ্রু ভিন্ন আর কোন সম্বল থাকিবে না। সে অশ্রুতে পাষাণে কর্দ্দম জন্মিবে না। সমস্যা এখন এই ভেদনীতির ব্যর্থীকরণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী।

গৌড়কাহিনী।

দেবকোটের পরিণাম।

বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়কাহিনী নানা বিষয়ে রহস্যপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তিনি সম্রাট্ কুতবুদ্দীনের প্রতিনিধিরূপে লক্ষ্মণাবতী-রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন কি না, তদ্বিষয়েও নানা বাদপ্রতিবাদ প্রচলিত হইয়াছে। বক্তিয়ার খিলিজির দিল্লীশ্বরের নিকট সেনাবল প্রাপ্ত হইবার প্রমাণাভাব। তিনি যে দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যজয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; তাহারও কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তখন মুসলমানের বিজয়-যুগ,—যিনি যে পথে যে দেশ অধিকার করিবার অবসর লাভ করিয়াছেন, তিনি স্বাধীনভাবে সেই পথেই অগ্রসর হইয়াছিলেন।

লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিবার পর বক্তিয়ার খিলিজির একবার দিল্লীশ্বরের নিকটে উপনীত হইয়া, তাঁহাকে বিবিধ উপঢৌকন প্রদান করিবার কথা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে অতিমাত্র প্রীতিলাভ করিয়া দিল্লীশ্বরের বক্তিয়ারকে লক্ষ্মণাবতীর অধিপতি বলিয়া খেলাত ও সনন্দ দান করিবার কথাও কোন কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তৎকালে বক্তিয়ার শিষ্টাচাররক্ষার্থ কুতবুদ্দীনকে উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। অবস্থানুসারে তাহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। *

খিলিজিসেনানায়কগণের মধ্যে অনেকেই এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বক্তিয়ারকেই সর্ব্বময় প্রভু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। বক্তিয়ার এই সকল খিলিজি-সেনানায়কগণকে বরেন্দ্রমণ্ডলে জায়গীর দান করিয়া, তাঁহাদের বাহুবলেই রাজ্যবিস্তারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন।

তিব্বৎবিজয়ের অসঙ্গত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বক্তিয়ারকে উত্যক্ত না করিলে, তাঁহার ও তাঁহার সেনাদলের সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইত না।

---

* This subordination was nominal as Bakhtiar conquered Bengal and Bihar on his own account though he outwardly acknowledged the suzerainty of Delhi.—Notes in Riaz-us-Salateen.

মুসলমান ইতিহাসলেখকগণ তিব্বৎবিজয়-বাসনাকে অসঙ্গত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

দেবকোটে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বক্তিয়ার খিলিজি রোগশয্যার আশ্রয়গ্রহণ করিবামাত্র আর একজন খিলিজিসেনানায়কের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। এই সময়ে বক্তিয়ার একে মর্ম্মপীড়িত, তাহাতে নিরতিশয় রুগ্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, তাহাদের আত্মীয়-অন্তরঙ্গের সকল ক্রোধ বক্তিয়ারের উপরেই নিপতিত হইয়াছিল। এই-সময় উপযুক্ত সময় মনে করিয়া আলীমর্দ্দন খিলিজি কৃতঘ্নতা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই ব্যক্তি বক্তিয়ার খিলিজির কৃপায় দেবকোটের কিল্লাদার হইয়া জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাহা বিস্মৃত হইয়া রাজ্যলাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

সে ইতিহাস কলঙ্কের ইতিহাস। তাহা পুরাতন লেখকগণের গ্রন্থে বিবৃত রহিয়াছে। আধুনিক লেখকগণ তাহার কথা বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে। বক্তিয়ারের প্রত্যাবর্ত্তনকাহিনীকেও এই সকল লেখক উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। রিয়াজরচয়িতা সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক লেখক। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—বক্তিয়ার একসহস্র অশ্বারোহী সহ দেবকোটে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করেন। অন্য কোন ইতিহাসে এরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বদোনী লিখিয়া গিয়াছেন—বক্তিয়ার তিনশত অশ্বারোহী লইয়া দেবকোটে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর রুগ্ণাবস্থায় নিহত হইয়াছিলেন। একজন প্রাচীন লেখক লিখিয়া গিয়াছেন—বক্তিয়ার একমাত্র অনুচর সহ করতোয়া সন্তরণ করিয়া দেবকোটে উপনীত হইবার পর কিল্লাদার আলীমর্দ্দন খিলিজি কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার উক্তিই সমধিক প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়। *

এই হত্যাকাণ্ড খিলিজিসেনানায়কগণের মধ্যে অন্তর্ব্বিবাদের সূচনা করিয়া দিয়াছিল। তখনও মুসলমানরাজ্য ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই,—তখনও সমগ্র বরেন্দ্রমণ্ডল মুসলমানের অধিকারভুক্ত হয় নাই,—তখনও বক্তিয়ারের অনুগত অন্তরঙ্গ মহম্মদ শেরান ও তাঁহার বীর ভ্রাতা আহম্মদ ইরান রাঢ়জয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। এরূপ সময়ে খিলিজিদিগের সাধারণ লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া সেনানায়কগণ অন্তর্বিপ্লবে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন।

বক্তিয়ারের হত্যাকাণ্ডের কথা মহম্মদ শেরানের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব ঘটিল না। তিনি সসৈন্যে দেবকোটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আলীমর্দ্দনও সৈন্য-সংগ্রহ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে মুসলমান-সেনানিবাস হইতে অল্পকাল পূর্ব্বে বক্তিয়ার বিজয়যাত্রা করিয়া-

---

* And when he became weak from illness, Ali 'Mardan, one of Mahammed Bakhtiar's principal officers, arrived at Devkot, and finding him bed-ridden, pulled down the sheet from his face, and despatched him with one blow of a dagger.—*Badaoni.*

ছিলেন, তাহা এইরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইল। মুসলমান মুসলমানের রক্তপানের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল,—পার্ব্বত্য খিলিজি-জাতির অশান্ত স্বভাবের নিকৃষ্ট পরিচয়ে ইতিহাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল!

মহম্মদ শেরান অনায়াসেই আলীমর্দ্দনকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন; এবং বক্তিয়ারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন করিবার জন্য বন্দীকে কোতোয়ালের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তখন মহম্মদ শেরানের বীরহৃদয় নানা আশঙ্কায় নিরতিশয় আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। চারিদিকে গৃহকলহ,—লক্ষ্মণাবতীর নবপরাভূত হিন্দুরাজ্য নামমাত্র পরাভূত,—তখনও দেবকোটের নিকটবর্ত্তী অত্যল্প ভূভাগমাত্র খিলিজিদিগের অধিকারভুক্ত—সকল স্থলেই অরাজকতা! এরূপ অবস্থায় মহম্মদ শেরান দেবকোটে বক্তিয়ার খিলিজির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন না। বিহারে বক্তিয়ারের বীরদেহ সমাধিনিহিত হইল! *

এরূপ অচিন্তিতপূর্ব্ব হত্যাকাণ্ডে বাহুবল প্রবল হইয়া লক্ষ্মণাবতীরাজ্যের শাসনকৌশল ব্যর্থ করিয়া ফেলিল। মুসলমানের নূতন রাজ্য নায়কহীন হইয়া উঠিল। স্বস্বপ্রধান খিলিজি-সেনানায়কগণ কলহকোলাহলে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। শেরান রাজ্যরক্ষার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিতে ত্রুটি করিলেন না। সকলে সম্মত না হইলেও, অধিকাংশ খিলিজিনায়কগণ সম্মত হইয়া মহম্মদ শেরানকেই শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত করিলেন। কিন্তু এই সকল গৃহকলহের সুযোগ লাভ করিয়া আলীমর্দ্দন কোতোয়ালের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া, একেবারে দিল্লীশ্বরের নিকট উপনীত হইলেন। তিনি দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া লক্ষ্মণাবতীর শাসনভার গ্রহণ করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিবামাত্র তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল হইল।

সনন্দলাভ করা সহজ হইলেও, দেবকোট অধিকার করা সহজ নহে। তাহার জন্য সেনাবল ভিক্ষা করিতে হইল। এই সময়ে রুমী-নামক এক মুসলমানসেনাপতি অযোধ্যা-প্রদেশের জায়গীরদার ছিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকেই আলীমর্দ্দনের সহায়তাসাধনের জন্য লক্ষ্মণাবতীপ্রদেশে প্রেরণ করিলেন। রুমী আসিতেছেন শুনিয়া, শেরান দেবকোট-রক্ষার জন্য সমরসজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাই দিল্লী এবং গৌড়ের প্রথম কলহ। দিল্লীশ্বরের অধীনতাস্বীকার করিতে সম্মত হইলে, এই কলহ সহজেই নিরস্ত হইতে পারিত। শেরান তাহাতে অসম্মত হইয়া, বাহুবলে আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অধিকাংশ খিলিজিসেনানায়কগণ শেরানের পক্ষাবলম্বন করিলেন। কেবল হাসামুদ্দীন নামক এক ব্যক্তি সম্মত হইলেন না। তিনি বক্তিয়ার খিলিজির কৃপায় দেবকোটের নিকটে একটি জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে কথা বিস্মৃত হইয়া, বক্তিয়ারের হত্যাকারীর

---

* মুসলমানলিখিত ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়,—বক্তিয়ার খিলিজি দ্বাদশবর্ষকাল এ দেশে রাজ্যভোগ করিয়া হিজরী ৬০৫ সালে পরলোকগমন করেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি কতদিন এ দেশে বাস করিয়াছিলেন, তাহা নানা সংশয়ে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাকে বিহারে সমাধিনিহিত করায় সে সংশয় প্রবল হইয়া রহিয়াছে। কিয়ৎকাল দেবকোটের সেনানিবাসে বাস করা ভিন্ন অন্য কোন স্থানে দীর্ঘকাল বাস করিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পক্ষাবলম্বন করিয়া হাসামুদ্দীন সসৈন্যে রূমীকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য কুশীনদীর তীরে উপনীত হইলেন।

মহম্মদ শেরানের আত্মরক্ষার চেষ্টা সফল হইল না। রূমীর সেনাদলই জয়লাভ করিয়া দেবকোট অধিকার করিয়া ফেলিল। পথ-প্রদর্শক বিশ্বাসঘাতক হাসামুদ্দীন দেবকোটের কিল্লাদার হইলেন। আটমাসের রাজ্যাধিকারের পর এইরূপে প্রভুভক্ত মহম্মদ শেরান রাজ্যচ্যুত হইয়া পুনরায় দেবকোট অধিকার করিবার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে পুনর্ভবাতীর হইতে আত্রেয়ীতীর পর্য্যন্ত বরেন্দ্রমণ্ডলের উত্তরাংশ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইল।

খিলিজিসেনানায়কগণ আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়া দেবকোট হস্তগত করিতে পারিলেন না। রূমী প্রত্যাবর্ত্তন করিবামাত্র তাঁহারা দেবকোট আক্রমণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সংবাদ পাইবামাত্র রূমী পুনরায় দেবকোটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে শক্তিপরীক্ষার ত্রুটি হইল না। অবশেষে আত্রেয়ীতীরে শেরান নির্দ্দয়রূপে নিহত হইলেন। মহীসন্তোষনামক স্থানে তাঁহার বীরদেহ সমাধিনিহিত হইল। আলীমর্দ্দনকে দেবকোটে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রূমী স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এইরূপে প্রভুহন্তা আলীমর্দ্দন দেবকোটের অধিকারলাভ করিয়া দুইবৎসর রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। বিশ্বাসঘাতকতাই তাঁহার অভ্যস্তবিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। তিনি বক্তিয়ারের নিকট জায়গীরলাভ করিয়া আশ্রয়দাতাকে নিহত করিয়াছিলেন। এক্ষণে দিল্লীশ্বরের কৃপায় সিংহাসনলাভ করিয়া তাঁহার অধীনতা অস্বীকার করিবার জন্য "সুলতান আলাউদ্দীন" নাম গ্রহণ করিয়া আপনাকে স্বাধীন নরপতিরূপে ঘোষিত করিয়া দিলেন।

আলাউদ্দীন খিলিজির দুইবৎসরের রাজ্যাভিনয় অত্যাচারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কেহ শান্তিলাভ করিল না,—কেহ নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না,—অব্যবস্থিতচিত্ত অশান্ত নরপতির দণ্ডপুরস্কার তুল্যরূপেই খিলিজিদিগকে উত্যক্ত করিয়া তুলিতে লাগিল।* বদৌনী লিখিয়া গিয়াছেন,—সুলতান আলাউদ্দীন নিজনামে মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন। "রিয়াজ-উস্-সলাতিনে"ও তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয়, বদৌনীর উক্তিই "রিয়াজ-উস্-সলাতিনে" উদ্ধৃত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সুলতান আলাউদ্দীনের নামাঙ্কিত কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই।

খিলিজিগণ পার্ব্বত্যজাতি। তাঁহারা বাহুবলে বরেন্দ্রমণ্ডলের সমতলক্ষেত্রে অধিকার-বিস্তার করিয়াও স্বাভাবিক অশান্তপ্রবৃত্তি নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। আলাউদ্দীনের রাজ্যলাভ তাঁহাকে দিনদিন উপহাসাস্পদ

---

* মিনহাজ লিখিয়া গিয়াছেন—He was cruel and ferocious, killed many khiliji nobles, and the native chieftains trembled under him. The subjects as well as the soldiers were in disgust with him.

করিয়া তুলিতে লাগিল। মিন্‌হাজ এই নরপতির যে সকল কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আলাউদ্দীনের প্রকৃত স্বভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। মিন্‌হাজ লিখিয়া গিয়াছেন,—আলাউদ্দীন এতদূর আত্মম্ভরী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তিনি মনে মনে ইরান ও তুরান (পারস্য ও তাতার) নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া আপন আত্মীয়-অন্তরঙ্গগণকে তথায় জায়গীর দানের আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। এই দুই প্রাচীন পরাক্রান্ত রাজ্য যে তাঁহার অধিকারভুক্ত নহে, কেহ সে কথা দন্তস্ফুট করিতে সাহস পাইত না। একদা ইস্পাহাননিবাসী কোন দরিদ্রব্যক্তি আলাউদ্দীনের দরবারে উপনীত হইয়া আপন দারিদ্র্যজ্ঞাপন করিবামাত্র আলাউদ্দীন উজীরকে বলিলেন, "ইহাকে ইস্পাহানে একটি জায়গীর দান কর।" এই সকল কারণে এই অন্তঃসারশূন্য অকর্ম্মণ্য নৃশংস নরপতি অল্পকালের মধ্যেই সর্ব্বসাধারণের বিরাগভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

দিল্লীশ্বরের দরবারে এই সকল কথা প্রচারিত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। দিল্লীর সেনাদল আবার দেবকোটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন খিলিজিগণ তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া সুলতান আলাউদ্দীনকে নিহত করিতে ইতস্তত করিলেন না। এই সূত্রে হাসামুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ঘিয়াসুদ্দীন খিলিজি নামে পরিচিত হইলেন।

দেবকোট যখন এই সকল অন্তর্বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইতেছিল, সেই সময়ে দিল্লীশ্বর কুতবুদ্দীন লাহোর পরিদর্শনে বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি ক্রীড়াক্ষেত্রে অশ্ব হইতে ভূপতিত হইয়া পঞ্চত্বলাভ করায় তাঁহার পুত্র আরামশাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অকর্ম্মণ্য বলিয়া শীঘ্রই জনরব প্রচারিত হইয়া পড়িল। সুতরাং ঘিয়াসউদ্দীন আপনাকে স্বাধীন সুলতানরূপে প্রচারিত করিতে ত্রুটি করিলেন না।

দেবকোট পুনঃপুন আক্রান্ত হইয়াই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। নিকটে খিলিজিগণের জায়গীর থাকায়, দেবকোট সর্ব্বদাই বিবিধ গুপ্তমন্ত্রণার স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। ঘিয়াসুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তরিত করেন। সেই হইতে দেবকোট পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখন তাহা একটি ক্ষুদ্র পল্লীরূপে বর্ত্তমান!

এ দেশের প্রথম মুসলমানরাজধানী এইরূপে পরিত্যক্ত হইবার পর, তাহার পুরাতন কীর্ত্তিচিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এক সময়ে যে দেবকোট একটি প্রসিদ্ধস্থান বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহার প্রমাণপরম্পরা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। দেবকোটের অনতিদূরে "তর্পণদীঘি"নামক সুবৃহৎ সরোবর। তাহার নিকটে পালরাজবংশের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। দেবকোটের অনতিদূরে ভট্টগুরবের "গরুড়স্তম্ভ" অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। দেবকোটের নিকটেই মুসলমানদিগের প্রথম জায়গীর। এই সকল কারণে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—পাল ও সেনরাজগণের সময় হইতেই দেবকোট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মুসলমানের শাসনসময়ে তাহা কিছুদিনের জন্য রাজধানীরূপে ব্যবহৃত হইয়া, এক্ষণে জনসমাজের নিকট অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে!

দিনাজপুরের ইতিবৃত্তের সহিত দেবকোটের ইতিবৃত্ত জড়িত হইয়া রহিয়াছে। বাঙালী তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, এখনও অনেক পুরাতন কাহিনীর উদ্ধার সাধিত হইতে পারে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

বালী।

মাল্যবাণ ও ঋষ্যশৃঙ্গ—এই দুই পর্ব্বতের মধ্যে ক্ষীণা কিন্তু বেগশালিনী পার্ব্বত্যনদী প্রবাহিত ছিল, পর্ব্বতের ক্রোড়ে গুহাধিষ্ঠিতা কিষ্কিন্ধ্যায় পর্ব্বতের গাত্র কাটিয়া বিচিত্র হর্ম্ম্যরাজি উত্থিত হইয়াছিল, কিষ্কিন্ধ্যাবাসিনীগণের সমতাল পাদক্ষরা গীতিবাদিত্র শব্দে—এই নিরাপৎ গুহা-লীন প্রদেশ সর্ব্বদা মুখরিত ছিল।

বালী এই রাজ্য শাসন করিতেন, তিনি ইন্দ্রের নিকটে বিশাল কাঞ্চনমাল্য উপহার পাইয়াছিলেন, বিক্রমে তাঁহার সঙ্গে কোন বীরই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না, একদা দুন্দভি নামক রাক্ষস বরপ্রাপ্ত হইয়া দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছিল, সে দিক্ দিগন্ত "যুদ্ধংদেহি" রবে বিকম্পিত করিয়া জগতের বীরশ্রেষ্ঠগণকে যুদ্ধের জন্ম আহ্বান করিয়া বেড়াইত। তাহার বদনমণ্ডল মহিষের মুখের বর্ণ ও ভঙ্গীতে বিকৃত করিয়া সে যখন যুদ্ধের জন্ম দাঁড়াইত, তখন তাহার বদ্ধমুষ্টি, রোষকষায়িত চক্ষু ও তাণ্ডব উল্লম্ফন লক্ষ্য করিয়া বহু যোদ্ধা পশ্চাৎপদ হইয়া নিষ্কৃতি ভিক্ষা করিত। এই দুন্দভি একদা সরিৎপতির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে হিমবাণের সঙ্গে বল পরীক্ষা করিতে পরামর্শ দেন, হিমবাণ যুদ্ধে সম্মত না হইয়া বলেন, কিষ্কিন্ধ্যার বালী রাজাই তোমার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দী হইবার যোগ্য, তুমি তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ কর।

দুন্দভি বালীকে মহিলাগণ পরিবৃত, মদ্যপান নিরত দেখিয়া প্রথমত তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছিল, "প্রমত্ত, কৃশ, রমণীতে আসক্ত ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ, তুমি স্ত্রীদিগের সহিত সুখে ক্রীড়া করিতে থাক, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করা বীরের ধর্ম্ম নহে।

বালী দাম্ভিক দুন্দভিকে মুষ্টি ও জানুর দ্বারা আঘাত করিয়া ভূতলে নিপাতিত ও নিহত করেন, শেষে বিজয়দৃপ্ত হইয়া পদ দ্বারা রাক্ষসের শবকে মাতঙ্গমুনির আশ্রমে উৎক্ষেপ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন; তপোনিরত ঋষি অকস্মাৎ রক্তবিন্দুপাতে চমৎকৃত হইয়া জানিতে পারিলেন, বালী তাঁহার তপোবনের অবমাননা করিয়াছে, তখন এই অভিশাপ দিলেন যে বালী সেই আশ্রমের চতুষ্পার্শে পদার্পণ করিলে তাঁহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইবে। মাতঙ্গাশ্রম তদবধি বালীর নিষিদ্ধ হইয়া রহিল।

ইহার পরে মায়াবী নামক এক রাক্ষসের

সঙ্গে বালীর স্ত্রীঘটিত (১) কলহ বাধে। মায়াবীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বালী তাহাকে অনুসরণ করিয়া পর্ব্বত গহ্বরে প্রবেশ করেন, সুগ্রীব তাহাকে অনুগমন করিতে চাহিলে ভ্রাতৃবৎসল বালী তাহাকে উৎকট শপথ দ্বারা প্রতিনিবৃত্ত করেন, শুধু এই অনুরোধ করেন যেন সুগ্রীব সেই গহ্বরের দ্বারে তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিয়া অবস্থিত থাকেন।

এক বৎসর কাল বালী মায়াবীর অনুসন্ধান করেন, বালী যেরূপ সরল, তেমনি অটল; প্রতিহিংসা, ঘৃণা, বা ভালবাসা সকল ব্যাপারেই তাঁহার চরিত্রের একটা দুর্জ্জয় দৃঢ়তা পরিদৃষ্ট হয়। এক বৎসর কাল পর্ব্বতগহ্বরের নিবিড়তম প্রদেশে বাস করিয়া তিনি মায়াবীর সন্ধান করেন, সুগ্রীবকেও তিনি তাহা বলিয়া গিয়াছিলেন—যে পর্য্যন্ত মায়াবীকে আমি বধ করিতে না পারি, তাবৎ আমার ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা নাই—তুমি বিলদ্বারে প্রতীক্ষা করিও।

সুগ্রীব এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া দেখিলেন, বালী ফিরিলেন না, তখন ভ্রাতৃজীবন সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হইল, একদা সেই গর্ত্তমুখে সফেন রক্তের প্রবাহ দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া গেল, তাঁহার ধারণা হইল বালী রাক্ষস কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। রাক্ষসেরা পাছে কিষ্কিন্ধ্যাপুরী আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় সুগ্রীব এক বিশাল প্রস্তরখণ্ড দ্বারা বিলমুখ বন্ধ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন, তখন সচীববৃন্দ তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া সম্মানিত করিল।

কিন্তু এই পদে তিনি অধিককাল প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন নাই, তাঁহার অভিষেকের অব্যবহিত পরেই বালী পদাঘাতে বিলমুখস্থিত প্রস্তরখণ্ডকে অপসৃত করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হন, এবং বহুশলাক হেমছত্র ছায়ায় অধিষ্ঠিত রাজবেশী কনিষ্ঠ সহোদরকে সমবেত সচীব মণ্ডলীর সম্মুখে ক্রূর ভাষায় লাঞ্ছিত করিয়া কিষ্কিন্ধ্যা হইতে নির্ব্বাসিত করেন, সুগ্রীব অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন, তাহা বালী একবারে শুনিতে চাহেন নাই, সুগ্রীবের সচীবদিগকে আবদ্ধ করিয়া এবং তাঁহাকে একখানি উত্তরীয় বাস লইবার অবকাশ না দিয়া নিষ্ঠুরভাবে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন, ও সুগ্রীব পত্নী রুমাকে স্বয়ং গ্রহণ করিয়া প্রতিহিংসার অভিনয় উৎকট ভাবে সমাপন করিলেন।

বালীর সম্বন্ধে এই বিবরণ সুগ্রীব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, তখন রামচন্দ্রের সীতাবিরহে নিদ্রা হইত না, ভার্য্যাপহারীর চিত্র তাঁহার কল্পনায় অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত রাখিয়াছিল, তিনি পম্পাতীরে পদ্ম-কেশর নিক্রান্ত বায়ুকে সীতার নিশ্বাস মনে করিয়া উন্মত্তের ন্যায় পথে পথে পর্য্যটন করিতেছিলেন এবং সুগ্রীব-প্রদর্শিত সীতার উত্তরীয় ও ভূষণ বক্ষে লইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতেছিলেন, কখন বা বিলস্থ ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ভার্য্যাপহারী দস্যুর কল্পিত চিত্রের প্রতি বিষাক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, সুগ্রীবের সৌহার্দ্দ্য এই বিপৎকালে তাঁহার নিকট দেবতার আশীষের ন্যায় মহার্ঘ বোধ হইয়াছিল, এখন যখন শুনিলেন, সুগ্রীবের

(১) কিষ্কিন্ধ্যা, ৯ম সর্গ ৪র্থ শ্লোক।

পত্নী রুমাকে বালী অপহরণ করিয়াছে, সুগ্রীব তাঁহারই মত হৃতভার্য্য, হৃতরাজ্য, ফলমূলাহারী এবং বনবাসী—তখন তিনি বালীবধের জন্য অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন—

"আত্মানুমানাৎ পশ্যামি মগ্নস্তুং শোকসাগরে।"

আমি নিজের বিষয় হইতেই বুঝিতে পারিতেছি তুমি শোকসাগরে মগ্ন। চরিত্রদূষক, তোমার স্ত্রীহারী ভ্রাতাকে আমি যে পর্য্যন্ত না দেখিব, তাবৎকাল পর্য্যন্তই তাঁহার জীবন।

বালীর যে বৃত্তান্ত উপরে উদ্ধৃত হইল, তাহাতে বালীকে অন্যায়কারী, ক্রোধান্ধ—পশুপ্রকৃতি বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক, রামচন্দ্রেরও তাহাই হইয়াছিল; কিন্তু সুগ্রীব রামের নিকট একটি কথা গোপন করিয়াছিলেন,—সেই একটি কথা না বলাতে বালীর চরিত্র অনেকটা দুর্জ্ঞেয় হইয়া পড়ে। বালী সুগ্রীবকে বিলমুখে প্রতীক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন,—কিন্তু সুগ্রীব তথায় প্রবাহিত রক্তধারা দর্শনে কাহার রক্ত তাহা অনুসন্ধান না করিয়া একেবারে রাজ্যাধিকার করিয়া বসিলেন। যে ভ্রাতা একাকী বিল মধ্যে বৈরদমন সংকল্পে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি নিহত হইলেও—তৎ প্রতিহিংসা লওয়া বীর ভ্রাতার অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা দূরে থাকুক, তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত সংবাদ না জানিয়া পথরোধ পূর্ব্বক—প্রত্যাবর্ত্তন করা একান্ত কাপুরুষের কার্য্য। ভীরুর প্রতি সাহসের উদ্বোধন নিষ্ফল, সুতরাং ভয়াভিভূত সুগ্রীব—প্রাণের আশঙ্কায় যাহা করিয়াছিলেন—তাহা কৃপার উদ্রেক করিতে পারে—এরূপ উৎকট ক্রোধের উদ্রেক কখনই করিতে পারে না, রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়াও তাঁহার ইচ্ছানুসারে হয় নাই, সুগ্রীব বারংবার একথা বলিয়াছেন,—এমন অবস্থায় তাঁহাকে অপমানিত করিয়া পুনশ্চ গ্রহণ করিলেই বালীর ন্যায় উদার ব্যক্তির পক্ষে শোভন হইত। তৎবিপরীতে এ কি ঘোর নির্য্যাতন! একবাস পরিহিত সুগ্রীবকে পুষ্পকাননা জন্মভূমির অঙ্ক হইতে চিরদিনের জন্য বিতাড়িত করিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিনীকে অঙ্কশোভিনী করা—এ কি জ্যেষ্ঠের না পিশাচের কার্য্য?

রাম যাহা শুনিয়াছিলেন—তাহাতে ক্রুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক—কিন্তু একটি বিষয় সুগ্রীব গোপন রাখিয়াছিলেন,—বালী-বধের পরে সুগ্রীব তাহা স্বয়ং রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,

রাজ্যঞ্চ সুমহৎ প্রাপ্য তারাঞ্চ রুময়া সহ।
মিত্রৈশ্চ, সহিতস্তস্য বসামি বিগতজ্বরঃ॥"

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ॥৬।৯

অর্থাৎ বিলদ্বার প্রস্তরখণ্ডে রুদ্ধ করিয়া সুমহৎরাজ্য, তারা এবং রুমাকে প্রাপ্ত হইয়া সুগ্রীব অমাত্যগণের সঙ্গে সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

দেখা যাইতেছে সুগ্রীব সুধু রাজ্যাধিকার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, জ্যেষ্ঠের মহিষীকে—তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে নিশ্চিত সংবাদ না জানিয়াই স্বীয় শয্যাসঙ্গিনী করিয়াছিলেন, রাজ্য অরাজক থাকিলে না হয় প্রজাদের নিতান্ত অকল্যাণের বিষয়, সুতরাং সচীবগণের বাধ্য-বাধকতায় তিনি সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষোক্ত বিষয়ের জন্য কোন উত্তর নাই; মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত সংবাদ না জানিলেও পুরাঙ্গনারা দ্বাদশবর্ষকাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, ইহা শুধু শাস্ত্রবিধি-অনুযায়ী

নহে ; স্বাভাবিক প্রত্যাশা আত্মীয়গণের মনে দীর্ঘকাল অধিকার করিয়া থাকে, সুগ্রীবের এই আচরণ এত গর্হিত হইয়াছিল, যে বালীর ন্যায় উদার হৃদয়ে তাহা অসহ্য হইয়াছিল,—তিনি এই অপরাধ কোনক্রমেই ক্ষমা করিতে পারেন নাই, প্রতিহিংসার উত্তেজনায় তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া রুমাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন—কিন্তু এই কার্য্য নিতান্ত অসঙ্গত হইলেও তিনি হীন-লালসার উত্তেজনায় এরূপ করিয়াছিলেন, বলিয়া বোধ হয় না, তারার প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল—তাহাতে সেরূপ লালসা তাঁহার চরিত্রে সঙ্গতি প্রাপ্ত হয় না—তৎসম্বন্ধে পরে লিখিব।

বালী এই কথা কাহাকেও বলেন নাই, ভ্রাতার এই কার্য্য তাঁহার হৃদয়ে গভীর ঘৃণা ও প্রতিহিংসা বৃত্তির উদ্রেক করিয়াছিল, কিন্তু তিনি লজ্জায় এ কথার উল্লেখ করিয়া স্বীয় কার্য্যের সমর্থন করিতে চেষ্টা পান নাই, রামচন্দ্র যখন তাঁহাকে কনিষ্ঠের বধূ-অপহারী বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি সুগ্রীবের অসৎকার্য্যের কোন উল্লেখ করেন নাই।

কিন্তু সুগ্রীব কৃত এই কর্ম্ম যে কিষ্কিন্ধ্যায় কিরূপ ঘৃণা ও ক্রোধের উদ্রেক করিয়াছিল, তাহা আমরা অঙ্গদের উক্তি হইতে জানিতে পাই ; সমুদ্রের বেলাভূমির অনতি দূরে এক সুগভীর নিবিড় গুহা-প্রদেশে সুরম্য নির্ঝর ও ফল ফুল পল্লববিতানে শোভিত অধিত্যকায় পরিশ্রান্ত ও নিরাশাগ্রস্ত বানরমণ্ডলীর মধ্যে যে গূঢ় তর্ক বিতর্ক হইতেছিল তাহা হইতে অঙ্গদের এই উত্তেজিত উক্তির অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

> ভ্রাতুর্জ্জ্যেষ্ঠস্য যো ভার্য্যাং জীবতো মহিষীং প্রিয়াং।
> ধর্ম্মেণ মাতরং যস্ত স্বীকরোতি জুগুপ্সিতঃ॥
> কথং স ধর্ম্মং জানীতে যেন ভ্রাতা দুরাত্মনা
> যুদ্ধায়াভিনিযুক্তেন বিলস্য পিহিতং মুখং॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী মাতৃতুল্য,—সুগ্রীব বিলদ্বার রোধ করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিল—এরূপ দুরাত্মাকে ধার্ম্মিক বলিয়া কে গণ্য করিবে ?

বালী এই ব্যাপারে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, যে ভ্রাতা এরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাকে স্বগৃহে স্থান দিবেন কিরূপে ? সুতরাং সুগ্রীব নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তিনি আশৈশব পিতৃস্নেহে লালনপালন করিয়াছিলেন, বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিতে যাইয়া আঘাত পাইলে যিনি শিশু সুগ্রীবকে কত যত্নে হাত বুলাইয়া দিতেন এবং "ভ্রাত এরূপ আর করিও না" বলিয়া সস্নেহে সতর্ক করিয়া দিতেন, * তাঁহাকে তিনি বধ করিয়া হস্তকলঙ্কিত করিলেন না। "ন ত্বাং জিঘাংস্যামি" তোমাকে বধ করিব না বলিয়া মুক্তি প্রদান পূর্ব্বক নির্ব্বাসন দণ্ড প্রদান করিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা একেবারে অস্বীকার করিয়া প্রতিহিংসার উত্তেজনায় রুমাকে স্বীয় অন্তঃপুরে আনয়ন করিলেন।

বালী তারাহরণ ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হইয়া এরূপ আচরণ করিয়াছিলেন। যে ভ্রাতা স্বীয় স্ত্রীকে একবার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে গৃহে স্থান কিরূপে দিবেন,—সুতরাং কোন ক্রমেই তিনি সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন না।

* কিষ্কিন্ধ্যা, ২৪ শ, ১১ শ্লোক।

এখন দেখা যাইতেছে, কনিষ্ঠের বধূকে স্বীয় অন্তঃপুরে স্থান দেওয়া যেরূপ অপরাধ, জ্যেষ্ঠের বধূ সম্বন্ধেও তদ্রূপ অবৈধ ব্যবহারও তুল্যরূপই অকার্য্য। সুতরাং রামচন্দ্র এক পক্ষের কথা শুনিয়া এই বালীবধ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া খুব সঙ্গত কার্য্য করেন নাই।

বালী, সুগ্রীবের আহ্বানে প্রথম দিন বহিপ্রাঙ্গনে আসিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া চলিয়া গেলেন। দ্বিতীয় দিন গজপুষ্পমাল্য বিভূষিত দর্পিত বক্ষে সুগ্রীব আবার আসিয়া বালীকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলেন,— তারা বলিলেন যে অব্যবহিত পূর্ব্বে যুদ্ধে হারিয়া গিয়াছে, সে পুনশ্চ এরূপ স্পর্দ্ধার সহিত আহ্বান করিতেছে কি সাহসে? রামচন্দ্র তাহাকে সাহায্য করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন,—অঙ্গদের নিযুক্ত চরগণ এই সংবাদ দিয়াছে—বালী এ কথা বিশ্বাস করিলেন না। রামচন্দ্রের সত্য-রক্ষার খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, ঈদৃশ ধর্ম্মজ্ঞ সাধু ব্যক্তি কেন তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবেন?" তারা সুগ্রীবের প্রশংসা করাতে বালী ক্ষুণ্ণমণে বলিলেন— তিনি তাঁহার প্রাণনাশ করিবেন না, দর্প নষ্ট করিবেন মাত্র। তারা সুগ্রীবকে বিপুলগ্রীব বিশেষণে বিশেষিত করাতে বালী ক্রোধের সহিত তাঁহাকে "হীনগ্রীব" বলিয়া উপেক্ষা করিলেন।

গিরিপরিবৃত দুর্লঙ্ঘ্য পুরীতে বিশ্বস্ত যোদ্ধা প্রতাপান্বিত সম্রাটকে রামচন্দ্র গুপ্ত ভাবে তীর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিলেন, রামচন্দ্র সুগ্রীবকে স্বীয় বলের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য পদাঙ্গুলী দ্বারা দুন্দভির অস্থিপঞ্জর বহু-দূরে উৎক্ষেপ করিয়া ফেলিয়াছিলেন—সপ্ত-তাল ভেদ করিয়াছিলেন, কিন্তু এ সকল বল পরীক্ষা একান্ত নিষ্প্রয়োজন ছিল, তিনি বালীকে যে ভাবে হত্যা করিয়াছিলেন, একটি শিশুও তদ্রূপ করিতে পারিত। যুদ্ধধূলি শরীর হইতে মার্জ্জনা করিতে করিতে যুদ্ধ-পরিশ্রান্ত বালী উঠিয়া অন্তঃপুরে যাইতেছিলেন, তখন সহসা অদ্ভুত আলো-সঞ্চারী বিদ্যুৎপ্রভ রামচন্দ্র-করনিঃসৃত শর, বালীর মর্ম্মভেদ করিয়া ফেলিল, সম্যক্‌উত্থিত, তেজোদৃপ্ত ইন্দ্রধ্বজ যেন অকস্মাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া গেল।

রামচন্দ্রকে বালী যে সকল তীব্র ভাষায় নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, তাহার একটিরও যথাযথ উত্তর রাম দিতে পারেন নাই।

আমি আপনার রাজ্যে বা নগরে যাইয়া কোন অন্যায় করি নাই।

আমার মাংস আপনি আহার করিবেন এরূপ সম্ভাবনা নাই।

এই গিরিসঙ্কুল দুর্গম গিরিগুহা বন্ধ্যা— এখানে স্বর্ণ রৌপ্য কিংবা কোন প্রকার উৎ-কৃষ্ট শস্য জন্মায় না, সুতরাং রাজারা যে কারণে কোন স্থান অধিকার করিতে ইচ্ছা করেন, এখানে তাহার কোনটিই বিদ্যমান নাই।

আপনি তস্করের ন্যায় আমাকে হত্যা করিলেন, আমি অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম, সুতরাং এই অবস্থায় লুকাইয়া বাণ নিক্ষেপ করা যুদ্ধরীতিসঙ্গত নহে।

আমি তারার মুখে আপনার অসদভিপ্রায়ের কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা বিশ্বাস করি নাই, আমার বিশ্বাস একান্ত অযোগ্য পাত্রে ন্যস্ত হইয়াছিল।

যাঁহারা আপনার প্রতি অন্যায় করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আপনি কোন প্রতিবিধান বা দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, যে ব্যক্তি আপনার কোনই অন্যায় করে নাই, অন্যায়পূর্ব্বক তাঁহাকে হত্যা করিলেন, ইহা সাহসী যোদ্ধার কার্য্য নহে।

সুপ্ত ব্যক্তিকে যেরূপ সর্পে দংশন করে, আপনি আমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, সম্মুখযুদ্ধে আপনার সঙ্গে দেখা হইলে আপনি নিশ্চয়ই নিহত হইতেন।

রাজহত্যার ফল অনন্ত নরক, আপনি তজ্জন্য প্রস্তুত হউন।

আপনি ক্ষত্রিয়ের বেশ ধারণ করিয়া তপস্বী সাজিয়াছেন, অথচ হিংসাবৃত্তিটি পূর্ণমাত্রায় আছে, আপনার জটাজুট ও চিরবাস একবারেই শোভন হয় নাই। আপনি ধর্ম্মধ্বজী কিন্তু অধার্ম্মিক,—কূপের মুখ তৃণাচ্ছাদিত থাকিলে যেরূপ নিরাপদ জ্ঞানে লোক তাহাতে নিপতিত হয়, আপনার ঋষির বেশও তদ্রূপ প্রতারক ও ভয়ানক। আপনি সত্যসন্ধ প্রবলপ্রতাপান্বিত দশরথ মহারাজের ঔরসজাত পুত্র বলিয়া আমার মনে হয় না। কাম প্রবণতা রাজবৃত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয় না,—আপনি কামপ্রধান, শুধু ইন্দ্রিয়তাড়িত হইয়া এবম্বিধ অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন।

আমি মৃত্যুকে ভয় করি না,—কালবশে দেহাত্যয় ঘটিল সুতরাং তজ্জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, কিন্তু আপনি আমাকে এইভাবে হত্যা করিয়া অক্ষয় অযশ অর্জ্জন করিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বালীর এই সকল অভিযোগের উত্তরে রামচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন—তাহা বিশেষ সারগর্ভ বলিয়া মনে হয় না, তিনি বলিলেন, নিরীহ মৎস্য জলে বিহার করে এবং মেষাদি পশু ক্ষেত্রে বিচরণ করে কাহারও অপকার করে না,—সুতরাং কোনরূপ অন্যায় না করিলেও লোকে পরহত্যায় বিরত হয় না, এই যুক্তি অতি হীনবল। তৎপর তাঁহার প্রধান যুক্তি, বালী, সুগ্রীবের স্ত্রী কন্যা স্থানীয়া রুমাকে গ্রহণ করিয়াছেন,—ইহার উত্তরে বালীর প্রবল যুক্তি ছিল, কিন্তু তাহা বালী বলেন নাই। যখন দেহ হইতে প্রাণবায়ু নির্গত হইতেছে—তখন ভূলুণ্ঠিত অঙ্গদের প্রতি বালীর দৃষ্টি পড়িল, আর সমস্ত চিন্তা তখন দূর হইল, অঙ্গদের কোনরূপ অনিষ্ট না হয় এই আশঙ্কায় তিনি বৈরীর সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন, দূরদর্শী কিষ্কিন্ধ্যাধিপ অঙ্গদের শুভকামনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। সেই স্থানে অসম্বৃত কেশপাশে আর্ত্তস্বরে তারা তাঁহার অঙ্গস্পর্শ লাভ করিয়া কাঁদিয়া উপস্থিত ব্যক্তিসমূহের হৃদয় কারুণ্যসিক্ত করিতেছিলেন, কিন্তু বালী স্বীয় রাজ্ঞীর জন্য বিশেষ চিন্তিত হন নাই, তিনি মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া অঙ্গদকে অনেক উপদেশ দিলেন, এবং "মম প্রাণৈঃ প্রিয়তর" প্রভৃতি সংজ্ঞাভিদিত অঙ্গদের জন্য রামচন্দ্রও সুগ্রীবকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, অঙ্গদ তাঁহার একমাত্র পুত্র,—শৈশব হইতে চিরসুখাভ্যস্ত, সেই রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী, কিন্তু এখন রামচন্দ্র সুগ্রীবকে নিশ্চয়ই রাজ্য প্রদান করিবেন জানিয়া বালী নিজ হস্তে ইন্দ্রদত্ত কাঞ্চনমালা কণ্ঠ হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক সুগ্রীবের গলদেশে লম্বমান করিয়া দিয়া তিনিই রাজা

হইলেন এরূপ নির্দ্দেশ করিলেন এবং অঙ্গদ যেন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয় এজন্য বারংবার অনুনয় করিতে লাগিলেন।

প্রাণপ্রিয় পুত্রের জন্য শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চিন্তান্বিত ও বিলাপমান কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বালীর দেহাবসান হইল, সমস্ত কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর কুসুমোদ্যানগুলি যেন এককালে কুসুমশূন্য হইল এবং দিগ্‌দিগন্ত হইতে কেবলমাত্র শুনা গেল যে বালী পঞ্চদশ বর্ষ রাত্র দিন যুদ্ধ করিয়া ভীষণ পরাক্রান্ত গোলভ নামক গন্ধর্ব্বকে নিহত করিয়াছিলেন সেই বিক্রান্ত পুরুষকে একটি মাত্র শরে রামচন্দ্র বধ করিয়াছেন—কিষ্কিন্ধ্যাবাসিগণ ইতস্ততঃ ভয়ে পলাইতে লাগিল।

তারা বহু বিলাপ করিয়া শেষে সুগ্রীবের অঙ্কশায়িনী হইলেন, কিন্তু অঙ্গদ পিতৃশোক ভুলিতে পারে নাই, পিতার মৃত্যুকালে অঙ্গদ কোন বিলাপ করে নাই, রুদ্ধকণ্ঠে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পিতার এই মৃত্যুকালের ছবি খানি তাহার হৃদয়ে রক্তের রেখায় অঙ্কিত হইয়াছিল। সমুদ্রের উপকূলে বানর মণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইয়া অঙ্গদ বালীর কথা ও সুগ্রীবের ব্যবহার সম্বন্ধে যখন আর্ত্ত স্বরে সমস্ত কথা বলিতেছিল, তখন বানর-বাহিনী সাশ্রুনেত্রে শোক-করুণ অস্ফুট স্বরে কাঁদিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেছিল, বালীর মৃত্যুর জীবন্ত স্মৃতি অঙ্গদের তরুণ ললাট কালিমাকুঞ্চিত ও বিষণ্ণতায় চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিল।

আশ্চর্য্য সাহস তেজ ও উদারতায় বালীর চরিত্র আমাদিগের হৃদয়ে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সত্য বটে বালীর প্রতিহিংসা অসভ্য বৃত্তি প্রণোদিত। কিন্তু দোষে গুণে বালী একটি অসাধারণ ব্যক্তি,—তাহা অস্বীকার করা যায় না। তিনি যেরূপ বিরুদ্ধ অবস্থায় নিপতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ব্যবহারে একদিকে অমার্জ্জিত প্রতিহিংসাবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, অন্য দিকে একটা প্রবল ধৈর্য্যও সূচিত হইতেছে, তিনি সুগ্রীবকে ও তারাকে লইয়া—ভ্রাতা ও স্ত্রীর সঙ্গে একত্র সুখের সংসার আর করিতে পারিতেন না,—সুতরাং হয় স্ত্রী না হয় ভ্রাতা বর্জ্জনীয় হইয়াছিল—পার্ব্বত্যপ্রদেশে স্ত্রীলোকের সতীত্বের আদর্শ অত্যন্ত সমুন্নত ছিল না—সুতরাং তিনি রাজোচিত মর্য্যাদার সহিত এক্ষেত্রে ভ্রাতা সুগ্রীবের দণ্ড বিধান করিয়া তারাকে গ্রহণ করিলেন – তাহার এক কারণ সুগ্রীব রাজা হইয়া যাহা করিয়াছিলেন রাজ্ঞীর তাহাতে বাধা দেওয়ার শক্তি ছিল না, রাজার ইচ্ছা তিনি পালন করিতে বাধ্য,—দ্বিতীয়তঃ তাহাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন —তারা তাঁহার মৃত্যুর পরে রামচন্দ্রের নিকট কাঁদিয়া বলিয়াছিল, বালী স্বর্গে যাইয়া স্বর্গসুখ লাভ করিলেও আমাকে ছাড়া সুখী হইতে পারিবে না *—যে স্বামী স্ত্রীর হৃদয়ে এতটা আস্থার সঞ্চার করিতে পারেন, তাঁহার প্রণয় অতি সুগভীর, বস্তুতঃ আমরা বালীকে তারার অবৈধ ব্যবহারের জন্য একটিবারও অনুযোগ দিতে দেখি নাই, তিনি উদার হৃদয়ে তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, কিন্তু তারার জন্য মৃত্যু-

* "স্বর্গেঽপি শোকং বিবর্ণতাং। ময়া বিনা প্রাপ্স্যতে বীর বালী।"

কিষ্কিন্ধ্যা। ২৪।৩৫।

কালে তাঁহার কোন উৎকণ্ঠা হয় নাই, তারা পরে কি করিবেন তিনি তাহা জানিতেন—নতুবা তারার এত বিলাপগীতি শুনিয়াও তিনি অঙ্গদ অঙ্গদ বলিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন, একবার মাত্র সুগ্রীবকে তারার প্রতি সদ্ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করিয়া মুমূর্ষু কালেও অঙ্গদের জন্য সমস্ত হৃদয়ের আর্ত্তি, উৎকণ্ঠা ও স্নেহের অশেষ নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া গেলেন। তিনি তাহারই কথা নানাপ্রকারে বলিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন, তারাঘটিত ভ্রাতৃ-ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি রামচন্দ্রকে কোন কথাই বলেন নাই, তিনি নিজে প্রবল বিক্রান্ত, তিনি নিজে যে অন্যায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—তাহার দণ্ড তিনি নিজ হস্তে দিবেন—অপরের নিকট স্বীয় পারিবারিক ঘটনা উপস্থিত করিয়া বিচারাধীন হইতে ইচ্ছা করেন নাই,—এই ব্যাপারে তাঁহার উদারতা ও সংযম রাজোচিত। যখন দেখিলেন মৃত্যু আসন্ন, তখন বিচক্ষণতার সহিত নিজের সুর ফিরাইয়া লইলেন, এবং রামচন্দ্রকে প্রশংসা করিয়া অঙ্গদের ভার গ্রহণ করিতে বিনয় করিলেন, তিনি জানিতেন অঙ্গদ কখনই সুগ্রীবকে ভালবাসিতে পারিবে না; সুতরাং তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, সুগ্রীবের সহিত তুমি অতি প্রণয় বা অপ্রণয় এই দুয়ের কোনটিই করিও না, স্থির ভাবে কর্ত্তব্য সাধন করিও।

রুমাকে গ্রহণ না করিলে বালীর চরিত্র উজ্জ্বল হইয়া থাকিত, এই কার্য্যটির জন্য তাঁহার চরিত্রে কতকটা কলঙ্কের ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমরা পুনরায় বলিতেছি সাহসী, পরাক্রান্ত, দূরদর্শী রাজনীতিপ্রাজ্ঞ বালীকে বাল্মীকি অতি অল্প রেখাপাতে যে ভাবে অঙ্কন করিয়াছেন,—তাহাতে উহা দোষে গুণে অসামান্য হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

হারামণির অন্বেষণ।

বন্দররহস্য।

॥ ১॥ ও-সব তর্ক-বিতর্ক এখন থা'ক্! সন্ধ্যার চন্দ্রমা দেখা দিতেই কুসুম-কাননে মলয়ানিল কেমন দেখ জাগিয়া উঠিল। তোমার সেদিনকার সেই বসন্তবাহারটি গাও—শুনিয়া প্রাণটা ঠাণ্ডা হো'ক্। বলিতেছ "গাই, গাই"—গাহিতেছ কই?

॥ ২ ॥ রোসো! গান'টাকে মনে আনি।

॥ ১ ॥ গান'টা তবে কি তোমার মনে নাই? মনে যদি নাই, তবে আছে তাহা কোথায়? যে স্থান হইতে গানটাকে তুমি উঠাইয়া আনিয়া তোমার মনের সম্মুখে দাঁড় করাইতে ইচ্ছা করিতেছ—না জানি সেটা কোন্ স্থান! বুঝিয়াছি! গানটি তোমার প্রাণের (অর্থাৎ অব্যক্ত চেতনের) আঁধার

ঘরে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়িয়া আছে। অবগুণ্ঠন সে আর কিছু না—তমোগুণ বা জড়তা, ইংরাজিশাস্ত্রে যাহাকে বলে inertia। তমোগুণে অবগুণ্ঠিত হইয়া দিনরাত্রি শুইয়া পড়িয়া থাকা একপ্রকার রোগ—আল্‌সেমি রোগ। ও রোগের একমাত্র ঔষধ. রজোগুণ কিনা কর্ম্মোদ্যম। অতএব, আর বিলম্ব ভাল না—গান'টাকে ঝট্‌পট্ট চেয়াইয়া তোলো।

॥ ২ ॥ তোমার মতো ব্যস্তবাগীশ ভূ-ভারতে নাই! তোমার জানা উচিত যে, গীতাঙ্গনাটি লজ্জাবতী লতা। ত্বাড়াহুড়া করিয়া আমি যদি তাহাকে "ওঠ্ তোর বিয়ে" বলিয়া চেয়াইতে যাই, তাহা হইলে বালিকাটি লজ্জায় জড়সড় হইয়া ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া পলাইয়া বসিয়া থাকিবে; সন্ধ্যার অবশিষ্ট সময়টুকুর মধ্যে সে আর আমার এদিক্‌মুখো হবে না।

॥ ১ ॥ অত করিয়া আমাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না—এক ইঙ্গিতেই আমি বুঝিয়াছি সমস্ত! আমি ঘড়ি'র মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম—দেখি তোমার গীতাঙ্গনাটির কতক্ষণে ঘুম ভাঙে।

॥ ২ ॥ এ এ-এ-এ···!

॥ ১ ॥ গীতটি বেরো'ব বেরো'ব করিতেছে—তা' তো দেখিতেছি; কিন্তু বেরো'চ্চে কই? দেখিতেছি বটে যে, রজোগুণের উত্তেজনায় গীতটি তোমার অব্যক্ত চেতনের আঁধার ঘর হইতে অর্দ্ধস্ফুট চেতনের ঝাপ্‌সা আলোকে বাহির হইয়াছে—সংস্কারাত্মক প্রাণের শয়নমন্দির হইতে বাসনাত্মক মনের সাজঘরে বাহির হইয়াছে; কিন্তু তবুও সে এখনো পর্য্যন্ত তোমার সুব্যক্ত চেতনের পরিষ্কার আলোকে বাহির হইতে পারিতেছে না—সত্ত্বগুণের দীপালোকিত ঈশনাত্মক জ্ঞানের সভামন্দিরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না।

গান।

॥ ২ ॥ বসন্ত আগত ভয়ী সখীরী—ইত্যাদি।

॥ ১ ॥ বলিহারি! সত্ত্বগুণ সাক্ষাৎ মা সরস্বতী! তাহার আবির্ভাবে গীতাঙ্গনাটির অবগুণ্ঠন অপসারিত হইয়া গিয়া যে-মাত্র তাহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মধুর মূর্ত্তি দেখা দিল, আর-অমি তৎক্ষণাৎ তোমার কণ্ঠের ফোয়ারা খুলিয়া গেল।

জ্ঞানের সুব্যক্ত চেতনের সঙ্গে সত্ত্বগুণের অর্থাৎ ঈশনাত্মক প্রকাশজ্যোতির—মনের অর্দ্ধস্ফুট চেতনের সঙ্গে রজোগুণের অর্থাৎ বাসনাত্মক ক্রিয়াচাপল্যের—প্রাণের অব্যক্ত চেতনের সঙ্গে তমোগুণের অর্থাৎ জড়তাগর্ত্ত অপ্রকাশের—দেখিলে কেমন মর্ম্মান্তিক মিল। জ্ঞান-প্রাণ-মন এই যে তিন বস্তু চেতনাচেতন-অর্দ্ধচেতন, আর, সত্ত্ব-তমো-রজো এই যে তিন গুণ প্রকাশাপ্রকাশ-অর্দ্ধপ্রকাশ – দোঁহার মধ্যে ভেদ আছে বলিয়া কি তোমার মনে হয়? আমার তো তাহা মনে হয় না! কিন্তু তোমার কণ্ঠের ফোয়ারা খুলিয়া গিয়াছে—এখন তাহার উচ্ছ্বাস থামানো ভার। তোমার ভিতরে আমি একটি যুগল মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি। আমি তোমার গানের শুধুই কেবল শ্রোতা; কিন্তু তুমি তোমার গানের শ্রোতা এবং প্রবর্ত্তন-কর্ত্তা দুইই এক সঙ্গে। যে অংশে তুমি তোমার আপনার কণ্ঠনিঃসৃত গানের আপনি

শ্রোতা এবং রসগ্রাহী, সেই অংশে তোমার প্রাণের চাওয়া বা বাসনা পরিতৃপ্ত হইতেছে; আবার যে অংশে তুমি তোমার আপনার গানের আপনি প্রবর্ত্তন কর্ত্তা, সেই অংশে তোমার জ্ঞানের পাওয়া বা ঈশনা কিনা কর্ত্তৃত্বশক্তি ফলবতী হইতেছে। তোমার মনের মধ্যে শ্রোতা এবং গায়কের, সমজ্‌দার এবং গুণীর, ভোক্তা এবং কর্ত্তা'র, বাসনা এবং ঈশনা'র, চাওয়া এবং পাওয়ার শুভ-সম্মিলনে দোঁহার দ্বন্দ মিটিয়া গিয়াছে; তোমার সঙ্গীতজ্ঞান এবং সঙ্গীতাসক্ত প্রাণ হরগৌরীর ন্যায় দুয়ে এক একে দুই হইয়াছে, তাই তোমার এত আনন্দ। তোমার গান শুনিয়া আমার কি আনন্দ হইতেছে না? আমার খুবই আনন্দ হইতেছে; কিন্তু আমার আনন্দ একগুণ—তোমার আনন্দ তিনগুণ। তার সাক্ষী—আমি কেবল গান শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতেছি; তুমি কিন্তু—কি আর বলিব—তোমার ভাগ্যকে বলিহারি—

(১) গান গাহিয়া আনন্দ লাভ করিতেছ;

(২) গান শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতেছ;

(৩) গান শুনাইয়া আনন্দ লাভ করিতেছ।

ওঁ বিষ্ণু! মানস সরোবরের মাঝখানে একটি উপদ্বীপ আছে—সে কথাটা তোমাকে বলিতে ভুলিয়াছি! তোমার আনন্দ দেখিয়া সেই উপদ্বীপটির কথা আমার মনে পড়িতেছে। সে উপদ্বীপটির নাম সমাধি-উপদ্বীপ। মনঃসমাধান বলিলে যাহা বুঝায় তাহারই সংক্ষিপ্ত নাম সমাধি। মানসসরোবরের দুইপার-ঘ্যাঁসা দুই কিনারা হ'চ্চে বাসনা এবং ঈশনা, আর, দুয়ের মধ্যিখানে যে একটি উপদ্বীপ আছে—সেইটির নাম সমাধি-উপদ্বীপ। সমাধি-উপদ্বীপের মাঝখানে একটা ফোয়ারা আছে, আর, সেই ফোয়ারার চারিধারে একটি পদ্মবন শোভিতা পুষ্করিণী আছে। ফোয়ারা এবং পুষ্করিণীর মধ্যে জলের আদানপ্রদান চলিতেছে ক্রমাগতই। পুষ্করিণী বারবার ফোয়ারাতে জলসঞ্চার করিয়া ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, এবং বারান্তরে বারান্তরে ফোয়ারার জলে ভরাট্ হইয়া উঠিতেছে। পুষ্করিণীটির নাম হৃৎপদ্মিনী এবং ফোয়ারাটির নাম আনন্দ-উৎস। ব্যাপারটা তবে তোমাকে খুলিয়া বলি;—

জ্ঞানের পাওয়া এবং প্রাণের চাওয়া মানসসরোবরের চখাচখী। বিচ্ছেদের সময় চখী এপার হইতে (প্রাণের কূল হইতে) ডাকাডাকি করে, চখা ওপার হইতে (জ্ঞানের কূল হইতে) সাড়া দ্যায়। মিলনের সময় চখী এপার হইতে প্রাণের সম্বল লইয়া এবং চখা ওপার হইতে জ্ঞানের সম্বল লইয়া সমাধি-উপদ্বীপে হৃৎপদ্মিনীর ধারে একত্রে মিলিত হয়; আর-অমি আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া যায়। চাওয়া এবং পাওয়া'র (অর্থাৎ বাসনা এবং ঈশনার) বিচ্ছেদমিলনের এই যে রহস্য, ইহারই নাম দ্বন্দ রহস্য।

ক্ষেত্র দেখ—

বিচ্ছেদ-কালে		মিলন কালে		
জ্ঞান } মন	ঈশনা (১)	জ্ঞান } মন	ঈশনা	} [illegible]
মন } প্রাণ	বাসনা (২)	মন } প্রাণ	বাসনা	

এতদ্ব্যতীত, দ্বৈতাদ্বৈত রহস্য বলিয়া যে একটি বিশ্বব্যাপী রহস্য আছে, তাহা এই দ্বন্দরহস্যেরই বিরাট্‌ মূর্ত্তি। তোমার এক্ষণকার এই গীতোচ্ছ্বাসে কতগুলা দ্বৈত অদ্বৈতে পরিণত হইয়াছে—শুনিবে? তোমাতে গায়ক এবং শ্রোতা দুই নহে কিন্তু এক; যে জন গান শুনিতেছে এবং যে জন গান শুনাইতেছে, সে দোঁহে দুই নহে কিন্তু এক; গান কার্য্যের কর্ত্তা এবং গান রসের ভোক্তা দুই নহে কিন্তু এক; গান গাহিবার ইচ্ছা এবং গান গাহিবার শক্তি দুই নহে কিন্তু এক; প্রাণের চাওয়া এবং জ্ঞানের পাওয়া দুই নহে কিন্তু এক; বাসনা এবং ঈশনা দুই নহে কিন্তু এক; প্রকৃতির প্রবৃত্তি এবং পুরুষকারের প্রবর্ত্তনা দুই নহে কিন্তু এক; গান শুনিবার আনন্দ এবং গান শুনাইবার আনন্দ দুই নহে এক।

এই দ্বন্দরহস্যের মধ্য হইতে অতীব একটি নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে এই যে, এক হাতে তালি বাজে না; ফাঁকা একত্ব বা ইংরাজিতে যাহাকে বলে ছিন্ন সত্তা (abstract entity) তাহা কোনো কার্য্যেরই নহে; তার সাক্ষী—তোমার এই যে গানকার্য্য এ কার্য্যের কারণ কে? গায়ক না শ্রোতা? কারণ যে কে—তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ফলেন পরিচীয়তে। তোমার কাণে যদি তালা লাগিয়া যায়, তাহা হইলে শ্রোতার অভাবে তোমার গানকার্য্য তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যাইবে; আবার, শ্লেষ্মার আক্রমণে তোমার যদি গলা বুজিয়া যায়, তাহা হইলে গায়কের অভাবে তোমার গানকার্য্যের বিপত্তি ঘটিবে তেমিই সাঙ্ঘাতিক। তবেই হইতেছে যে, তোমার গানকার্য্যের কারণ অ্যাকা কেবল গায়ক না—অ্যাকা কেবল শ্রোতা না—পরন্তু গায়ক এবং শ্রোতার হরিহরাত্মা ভাবই তোমার জ্ঞানকার্য্যের কারণ। জগৎকার্য্যের কারণ তেমি পুরুষনিরপেক্ষা উদাসিনী প্রকৃতিও না এবং প্রকৃতি নিরপেক্ষ উদাসীন পুরুষও না; পরন্তু প্রকৃতিপুরুষের একাত্মভাবের আনন্দই জগৎকার্য্যের কারণ, আর, সেই আনন্দই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূলাধার। বেদোপনিষদে স্পষ্টই লেখা আছে যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। আনন্দ হইতেই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে; উৎপন্ন হইয়া আনন্দেরই গুণে বাঁচিয়া থাকিতেছে, এবং জীবনাবসানে আনন্দেরই মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

॥ ২ ॥ আমার এইরূপ ধারণা যে, জগৎকার্য্যের গোড়া'র কথা বুদ্ধিমনের অগোচর।

॥ ১ ॥ তুমি যাহা বলিতেছ—উপনিষদের ঐ বচনটির পরেই তাহা লেখা আছে; তাহা এই যে, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" সে তত্ত্ব এরূপ মহানিগূঢ় এবং অনির্ব্বচনীয় যে, মনের সহিত বাক্য তাহার নাগাল না পাইয়া সেখান হইতে ফিরিয়া আসে। কিন্তু আবার, তাহার অব্যবহিত পরেই লেখা আছে "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন তিনি কোথা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হ'ন না।" তা শুধু না, উহার দুই এক পংক্তি পূর্ব্বে এ কথাও লেখা আছে যে, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের মূলাধার সেই যে আনন্দ

তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর তিনিই ব্রহ্ম। একটা ছোটো খাটো কথা ধরা যা'ক্। জগদ্বিখ্যাত কবিদিগের কাব্য-রচনার গোড়া'র কথা তোমার কিরূপ মনে হয়? তাহা বুদ্ধিমনের গোচর না অগোচর? একব্যক্তি বলিতে পারে যে, কবির প্রকৃতি হইতে কবিতা আপনা-আপনি উচ্ছ্বসিত হইতেছে; আর এক ব্যক্তি বলিতে পারে যে, কবির পুরুষকার হইতে কবিতা ফলাইয়া তোলা হইতেছে; দুই কথাই সত্য—তবে কিনা আধা সত্য। সব-চেয়ে বেশী সত্য তৃতীয় ব্যক্তির কথা; সে কথা এই যে, কবির প্রকৃতি এবং পুরুষকার, বাসনা এবং ঈশনা একসঙ্গে মিলিয়া এক হইয়া যাওয়া'র আনন্দ হইতে কবিতা উচ্ছ্বসিত হইতেছে। এ না যে, কবির প্রকৃতি হইতে কবিতা রচনা আপনা-আপনি হইয়া যাইতেছে, যেন—কবি নিজে শুধুই কেবল সাক্ষীগোপাল; এও না যে, কবিতারচনাতে কবির প্রকৃতির বা প্রাণের কোনো হস্ত নাই, সবই কবির ঈশনাত্মক 'জ্ঞানের বলে ঘটাইয়া তোলা হইতেছে। এ'ও না! ও'ও না! এ যে বড় বিষম সমস্যা! "অনির্ব্বচনীয়" তো আর গাছে ফলে না—ইহারই নাম অনির্ব্বচনীয়। অনির্ব্বচনীয়ই বটে! ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যাপকের জ্ঞান জ্ঞানই কেবল; ভোগাসক্ত বিলাসীর প্রাণ প্রাণই কেবল; এ দুটা তাই সুনির্ব্বচনীয়; পরন্তু প্রতিভাশালী মহাত্মাদিগের প্রাণই জ্ঞান, জ্ঞানই প্রাণ; শক্তিই ইচ্ছা, ইচ্ছাই শক্তি; বাসনাই ঈশনা, ঈশনাই বাসনা; চাওয়াই পাওয়া; পাওয়াই চাওয়া; কাজেই অনির্ব্বচনীয়। কবির কবিতা বাহির হয় কোথা হইতে কখন্ তাহা বলিব শুনিবে? মানসসরোবরের সমাধি-উপদ্বীপে হৃৎপদ্মিনীর ধারে যখন কবির বাসনা এবং ঈশনা, প্রকৃতি এবং পুরুষকার, প্রাণের চাওয়া এবং জ্ঞানের পাওয়া, একত্রে মিলিয়া দুয়ে এক একে দুই হয়, তখনই আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া যায়, আর, সেই আনন্দের ফোয়ারা হইতে কবিতা উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে। কবির চিদাকাশে এ যেমন দেখিতে পাওয়া গেল, সার্ব্বভৌমিক মহাকাশে তেমনি আনন্দের উৎস আছে। সে আনন্দ মহানন্দ—তাহা বুদ্ধিমনের অগোচর অনির্ব্বচনীয়; তাহা মহাপ্রকৃতি এবং মহান্ পুরুষের একাত্মভাবের অটল গম্ভীর এবং মহান্ আনন্দ। সেই মহানন্দের উৎস হইতে নিখিল বিশ্বভুবন উচ্ছ্বসিত হইতেছে। পলকে পলকে, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে, অহোরাত্রে, পক্ষে পক্ষে, অব্দে অব্দে, যুগে যুগে, সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় হইতেছে।

॥ ২ ॥ এ যেন বুঝিলাম যে, সৃষ্টিস্থিতি আনন্দেরই ব্যাপার। কিন্তু প্রলয় কিরূপ? প্রলয়ও কি তাই—প্রলয়ও কি আনন্দের ব্যাপার?

॥ ১ ॥ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় তিনে এক একে তিন। যাহাকে তুমি বলিতেছ শরীরের কান্তি পুষ্টি এবং স্থিতি, তাহার মধ্য হইতে সৃষ্টি এবং প্রলয়ের ব্যাপার দুটাকে (দৈহিক উপকরণ সামগ্রীর উপচয় এবং অপচয়ের ব্যাপার দুটা'কে) বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া কতক্ষণ তুমি স্থিতিটাকে স্বপদে দণ্ডায়মান রাখিতে পারো তাহা আমি দেখিতে চাই। তোমার মুখে যে রা নাই! তবেই হইতেছে যে, স্থিতির নামই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়। মোট কথাটা যাহা এখানে দ্রষ্টব্য তাহা এই;—

সুব্যক্ত জ্ঞানে বাস্তবিক সত্তা যাহা সর্ব্বত্র প্রকাশ পায়, যাহা তোমাতে প্রকাশ পায়, আমাতে প্রকাশ পায়, জীবজন্তুতে প্রকাশ পায়, তরুলতা উদ্ভিদে প্রকাশ পায়, কাষ্ঠলোষ্ট্রপাষাণে প্রকাশ পায়, স্বর্ণ রৌপ্য মণিমাণিক্যে প্রকাশ পায়, তাহা কিরূপ পদার্থ? তাহা মোহের নিদ্রা নহে, কল্পনার স্বপ্ন নহে; পরন্তু তাহা সাক্ষাৎ সত্য—তাহা জাগ্রত জীবন্ত সত্য। তবে এটা সত্য যে, যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি শুনিতেছি সমস্তই ঘড়ি ঘড়ি রূপান্তরিত হইতেছে। হউক্ না রূপান্তরিত; তুষার রূপান্তরিত হইয়া হউক্ না জল; জল রূপান্তরিত হইয়া হউক্ না বাষ্প; বাষ্প রূপান্তরিত হইয়া হউক্ না মেঘ; মেঘ রূপান্তরিত হইয়া আবার হউক না জল; জল রূপান্তরিত হইয়া আবার হউক্ না তুষার; যতই যাহা রূপান্তরিত হউক্ না কেন—সবই সত্য; সকলেরই সত্তা বাস্তবিক সত্তা; কাহারো সত্তা আমাদের মনগড়া কাল্পনিক সত্তা নহে; এমন কি, যাহা কিছু আমরা মনে করি আমাদের মনগড়া মাত্র, যেমন স্বপ্নের হাতি-ঘোড়া, তাহারও ভিতরে বাস্তবিক সত্তা জাগিতেছে; কেন না প্রতিধ্বনি যেমন রূপান্তরিত ধ্বনি, কাল্পনিক সত্তা তেমি রূপান্তরিত বাস্তবিক সত্তা। সৎশব্দের অর্থ স্বতঃসিদ্ধ নিত্যবস্তু;—সত্তামাত্রই সতেরই সত্তা—বস্তুরই সত্তা—বাস্তবিক সত্তা। সবই সত্য—জাগ্রত জীবন্ত সত্য—অদ্বিতীয় সত্য। সত্য এক, সত্যের প্রকাশ এবং অপ্রকাশ দুই। অপ্রকাশের প্রতিযোগে প্রকাশ আত্ম-সমর্থন করে, স্থলের অপ্রকাশ জলে, জলের অপ্রকাশ স্থলে; দুয়ের এই দুই অপ্রকাশের প্রতিযোগে দুয়ের প্রকাশ ঘটিয়া উঠে; জলের প্রতিযোগে স্থল পরিস্ফুট হয়, স্থলের প্রতিযোগে জল পরিস্ফুট হয়; রৌদ্রতাপের প্রতিযোগে বটচ্ছায়ার শৈত্য পরিস্ফুট হয়, বটচ্ছায়ার শৈত্যের প্রতিযোগে রৌদ্রতাপ পরিস্ফুট হয়; বিদ্যুতের প্রতিযোগে ঘনান্ধকার পরিস্ফুট হয়, ঘনান্ধকারের প্রতিযোগে বিদ্যুৎ পরিস্ফুট হয়। ভূর্ভুবঃ স্বঃ তিনের প্রতিযোগে তিন পরিস্ফুট হইয়াছে। এটা কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, যাঁহার প্রকাশ, তাঁহারই অপ্রকাশ; সত্যেরই প্রকাশ, সত্যেরই অপ্রকাশ; সত্যকে ছাড়িয়া প্রকাশও কিছুই নহে, অপ্রকাশও কিছুই নহে। নিখিল জগতের সমস্ত দ্বন্দ্ব-বৈচিত্র্য একই সত্যের নিশ্বাস প্রশ্বাস।

আর একটি কথা মনে রাখা চাই এই যে, ক্রমবিকাশের সোপান মাড়াইয়া অপ্রকাশের শয্যা হইতে প্রকাশ মাথা তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, তথৈব, ক্রমাবগুণ্ঠনের সোপান মাড়াইয়া প্রকাশ অপ্রকাশের সুখশয্যায় শুইয়া পড়ে। একদিকে প্রাতঃসন্ধ্যার মধ্য দিয়া উষার মুখাবরণ অপসারিত হয়, আর এক দিকে সায়ংসন্ধ্যার মধ্য দিয়া দিবা'র মুখে অবগুণ্ঠন পড়িয়া যায়। এক দিকে শরতের মধ্য দিয়া গ্রীষ্মঋতু শীতে পরিণত হয়, আর এক দিকে বসন্তের মধ্য দিয়া শীতঋতু গ্রীষ্মে পরিণত হয়। প্রাতঃসন্ধ্যা, সায়ংসন্ধ্যা, শরৎ, বসন্ত এই সব মাঝের মাঝের সন্ধিস্থান দ্বন্দের জোড়স্থান। মনের আনন্দ তেমনি একটি দ্বন্দের জোড়স্থান—জ্ঞানের পাওয়া এবং প্রাণের চাওয়ার শুভ সঙ্গম স্থান। আর একটি রহস্য দেখিতে পাওয়া যায় এই যে,

মিলনও আবার দুইরূপ; জ্ঞান যখন প্রাণকে প্রাধান্য দ্যায়, তখনকার মিলন একরূপ; আবার, প্রাণ যখন জ্ঞানকে প্রাধান্য দ্যায়, তখনকার মিলন আর একরূপ। দুইরূপ মিলনের আনন্দও দুইরূপ। জ্ঞানপ্রধান মিলনের আনন্দ প্রাতঃসন্ধ্যার আনন্দ; প্রাণপ্রধান মিলনের আনন্দ সায়ংসন্ধ্যার আনন্দ। প্রত্যূষে যখন তোমার ঘুম ভাঙিয়া যায়, তখন তোমার প্রাণের চাওয়া কোন্‌দিকে দৌড়ায় তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। তখন তুমি বিছানা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া প্রকাশক্ষেত্রে বাহির হইতে পারিলে বাঁচো; তখন তোমার প্রাণের চাওয়া যায় জ্ঞানোদয়ের প্রতি, কর্ম্মোদ্যমের প্রতি; আর সেইজন্য তখন তোমার আনন্দ হয় জ্ঞানের প্রকাশ জ্যোতিকে পাইয়া—কর্ম্মের উদ্যমস্ফূর্ত্তিকে পাইয়া। কিন্তু এখন রাত্রি আগত প্রায়; তোমার চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে এবং মুখে হাই উঠিতেছে। এখন তুমি জ্ঞানোদয়ের আনন্দও চাও না—কর্ম্মোদ্যমের আনন্দও চাও না; এখন তুমি বিছানায় পড়িতে পারিলে বাঁচো! তোমার এখনকার এ অবস্থার নিকটে অপ্রকাশের আনন্দই আনন্দ, বিশ্রামের আনন্দই আনন্দ, নির্ভাবনার আনন্দই আনন্দ, নিশ্চেষ্টতার আনন্দই আনন্দ। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে যেমন চাওয়া এবং পাওয়ার দুইরূপ মিলনের দুইরূপ আনন্দ হইতে জীবের নিদ্রাজাগরণ হয়, বৃহৎব্রহ্মাণ্ডে তেমনি প্রকৃতি-পুরুষের মিলনের আনন্দ হইতে দিনরাত্রি হয়, শুক্লপক কৃষ্ণপক্ষ হয়, উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ হয়, ইত্যাদি; এ সমস্তই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের আর এক নাম। আবার ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডে যেমন প্রাণ মন এবং জ্ঞান তিনে এক একে তিন, বৃহৎব্রহ্মাণ্ডে তেমনি অস্তি ভাতি এবং আনন্দ তিনে এক একে তিন; অর্থাৎ জীবাত্মা প্রাণবুদ্ধিমনস্বরূপ, পরমাত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ। অস্তি'র সঙ্গে প্রাণের, ভাতি'র সঙ্গে জ্ঞানের, এবং আনন্দের সঙ্গে মনের বা ইচ্ছা'র মিল যে কিরূপ তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। অতএব প্রণিধান কর:—

(১) যাহার গুণে যাহা বর্ত্তিয়া থাকে তাহাই তাহার জীবনীশক্তি বা প্রাণ। অস্তিত্ব রক্ষা করাই প্রাণের একমাত্র কার্য্য। বর্ত্তিয়া থাকার নামই বাঁচিয়া থাকা, বর্ত্তমানতাই—অস্তিই—প্রাণ। কাষ্ঠপাষাণের ভিতরেও তড়িৎ উত্তাপ এবং আলোক অনবরত তরঙ্গিত হইতেছে—বর্ত্তমান বস্তুমাত্রেরই বুকের ভিতরে প্রাণ ধুক্‌ধুক্ করিতেছে।

(২) যাহার গুণে সত্তা প্রকাশ লাভ করে তাহারই নাম জ্ঞান। প্রকাশের নামই জ্ঞান—ভাতিই জ্ঞান।

(৩) মনের বা ইচ্ছার মাঝের সমাধি স্থানটিই যে, আনন্দের স্থান তাহা একটু পূর্ব্বে বলিয়াছি; বলিয়াছি যে, মনের দুই অঙ্গ—(১) প্রাণঘ্যাঁসা বাসনা এবং (২) জ্ঞান-ঘ্যাঁসা ঈশনা। তাহার মধ্যে, প্রকাশাপ্রকাশ চাওয়া বাসনার কার্য্য, প্রকাশাপ্রকাশ ঘটাইয়া তোলা ঈশনার কার্য্য। মনের যে জায়গাটি এই দুই মানসাঙ্গের সমাধিস্থান অর্থাৎ যে স্থানটিতে বাসনা এবং ঈশনা দুয়ে এক একে দুই হয়, সেই স্থানটিতেই আনন্দের প্রস্রবণ উন্মুক্ত হয়। ফলে, মানসসরোবর একপ্রকার ত্রিবেণীসঙ্গম—বাসনা যমুনা, ঈশনা

গঙ্গা. এবং আনন্দ সরস্বতী এই তিনের ত্রিবেণীসঙ্গম।

ছন্দরহস্যের ভিতরে আর একটি যে রহস্য চাপা দেওয়া আছে—সেইটিই চরম রহস্য। সে রহস্য এই :—

আনন্দ শুধু যে কেবল তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানের ঈশনা এবং প্রাণের বাসনার মিলন-ক্ষেত্র বা সমাধিকেন্দ্র তাহা নহে। একদিকে যেমন তাহা তোমার আমার ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ জীবাত্মার জ্ঞানের ঈশনা এবং প্রাণের বাসনার সমাধিকেন্দ্র, আর একদিকে তেমি তাহা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড এবং বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সমাধিকেন্দ্র। যোগী মহাপুরুষদিগের তো কথাই নাই—উচ্চশ্রেণীর কবিদিগের মনে যখন ঈশনা এবং বাসনা এক হইয়া যায়, তখন দুই ব্রহ্মাণ্ডের সেই সন্ধিস্থানটিতেই আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া যায়। কাব্যের উচ্ছ্বাস-কালে কবির জ্ঞান এবং প্রাণ হয় যে, এক, তা তো জানাই আছে; কিন্তু এক যে হয়—কিসের গুণে হয়? কবির নিজের গুণে হয় না আর-কোনো কিছুর গুণে হয়? বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সহিত কবির ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড একীভূত হইলে—তবেই কবির জ্ঞান এবং প্রাণ একী-ভূত হইতে পারে—তা ভিন্ন অন্য কোনো প্রকারেই তাহা হইতে পারে না। কোনো কবিই বৃহৎব্রহ্মাণ্ড হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া আপনার নিজগুণে কবি হইতে পারেন না। কবির প্রাণ জ্ঞান এবং মন একরকমের সৎ-চিৎ এবং আনন্দ, আর, সেই জন্য কবি এক-রকমের স্বাধীন পুরুষ, এ কথা সত্য; কিন্তু কবি কি রকমের সচ্চিদানন্দ—কি রকমেরই বা স্বাধীন পুরুষ—সেইটিই জিজ্ঞাস্য। প্রজা-বর্গ যখন রাজপুত্রকে রাজা সম্বোধন করিয়া বলে যে, এ সমস্ত রাজ-ঐশ্বর্য্য তোমারই, তখন রাজপুত্র যে-রকমের রাজা হয়, কবি সেই রকমের সচ্চিদানন্দ স্বাধীন পুরুষ। পিতামাতার গুণ যে. পুত্রকন্যাতে বর্ত্তিবে তাহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, আর, মর্ত্ত্যবাসী কবির প্রাণ জ্ঞান এবং মন যে দেবারাধ্য সৎ চিৎ আনন্দ হইবে তাহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আশ্চর্য্য এই যে, প্রজাবর্গের কথার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া রাজপুত্র মনে করে যে, আমিই রাজাধিরাজ মহারাজ—পিতা কেহই নহে। রাজপুত্র যদি সৎপুত্র হয় তবে সে অবশ্য বলিতে পারে যে, পিতার রাজ্যই আমার রাজ্য, পিতার মহিমাই আমার মহিমা; কিন্তু তাহার অর্থ এ নহে যে, পিতা হইতে স্বতন্ত্ররূপে আমিই এ রাজ্যের রাজা। ফল কথা এই যে, প্রকৃতি পুরুষের অভেদ-স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা সমস্ত জীবাত্মা লইয়া একমাত্র অদ্বিতীয় অখণ্ড পরিপূর্ণ সত্য; তাঁহা হইতে স্বতন্ত্ররূপে কোনো কিছু সত্য হইতে পারা দূরে থাকুক—তাঁহা ছাড়া স্বতন্ত্র কোনো পদার্থ মূলেই নাই। সেই অখণ্ড পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ পুরুষের প্রকাশাপ্রকাশ-রূপিনী যে প্রকৃতি তাহাও তিনিই স্বয়ং। কবি-মহাকবি হইলেও তাঁহার জ্ঞানপ্রাণের সমাধি-স্থান হইতে আনন্দের উৎস উৎসারিত হইতে পারে না—যদি না বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের সচ্চিদানন্দ-প্রকৃতিপুরুষ মাতাপিতা কবির জ্ঞানপ্রাণকে আপনার সহিত এক করিয়া প্রকাশিত না করেন। যিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আনন্দের প্রস্রবণ—তিনিই মহাপুরুষদিগের মনের আনন্দ প্রস্রবণ। সত্যও দুই নহে, আনন্দের উৎসও

দুই নহে। প্রকৃতিপুরুষের অভেদরূপী অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাই একমাত্র আনন্দের উৎস। কিন্তু আনন্দ বলিতে অনেকে অনেক-রূপ বোঝেন, আর, তা ছাড়া, কবিদিগের আনন্দ সব সময়ে ঠিক্ জায়গায় পৌঁছে না। এক অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ অখণ্ড সত্য ভিন্ন আর কিছুতেই মনুষ্যের সমগ্র জ্ঞানমনপ্রাণ চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না। সেই এক অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ সত্যে সবই আছে—আনন্দ আছে, জ্ঞান আছে, প্রাণ আছে, শক্তি আছে—"নাই" শব্দই সেখানে নাই। তাঁহারই একতমা শক্তি যাহা আমাদের স্বশক্তি-রূপিনী, সেই অহমাত্মিকা অপরা শক্তির বশতাপন্ন হইয়া আমরা মণিহারা ফণীর ন্যায় মণি অন্বেষণ করিয়া সারা হইতেছি এবং আর-যে-শক্তি—সেই দিব্যাপরা শক্তি—আমাদের মন হইতে যাহা ভ্রমপ্রমাদ মোহের নিবিড় অন্ধকার সরাইয়া দিবে সে শক্তিও তাঁহারই শক্তি। সে শক্তি তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, সে শক্তি তিনিই স্বয়ং। সে শক্তি জগতের সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে; ভূগর্ভে অগ্নিরূপে কার্য্য করিতেছে, জীবের হৃদয়ে প্রাণরূপে কার্য্য করিতেছে, মস্তকে বুদ্ধিরূপে কার্য্য করিতেছে, আকাশে জ্যোতি-রূপে দীপ্তি পাইতেছে। আমাদের পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষেরা সেই শক্তিই ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান করিতেন; তাঁহাদের ধ্যানের মন্ত্র ছিল শুধু এই যে, সেই জগৎপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় তেজ যাহা ভূর্ভুবস্ব!—সমস্ত বিশ্বভুবনের সার সর্ব্বস্ব—সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি—তিনি আমাদিগকে জ্ঞানদান করুন। তাঁহার কৃপায় আমাদের জ্ঞানের সম্মুখ হইতে মোহের আড়াল সরিয়া গেলে—সে আড়াল আর কিছুই না কেবল আমাদের চিরাভ্যস্ত সংস্কারের ঘুমের ঘোর এবং বাসনার স্বপ্ন—তাহা সরিয়া গেলে—সাক্ষাৎ সত্যকে পাইয়া আমরা প্রাণ জ্ঞান আনন্দ শক্তি এবং আর যাহা কিছু আমাদের চাই সবই পাইব একাধারে—আমাদের কিছুরই আর অভাব থাকিবে না। তখন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিব যে, মাথার মণি মাথায় জল্ জল্ করিতেছে—তাহা হারাইবার জিনিসই নহে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাচীন সামাজিক চিত্র।

১

পুত্র।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে * দেখা যায়—রাজা হরিশ্চন্দ্রের একশত স্ত্রী ছিল, কিন্তু তিনি সেই সকল স্ত্রী হইতে পুত্র লাভ করিতে পারেন নাই। পর্ব্বত ও নারদ ঋষি তাঁহার গৃহেই

* ৭-৩-১। ভাগবতে যে হরিশ্চন্দ্র-উপাখ্যান দৃষ্ট হয়, তাহা ইহারই অনুবাদ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইহা অন্য প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, অনতিকালমধ্যে তাহা প্রকাশিত হইবে।

বাস করিতেছিলেন ; রাজা হরিশ্চন্দ্র একদিন নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যাহাদের বিবেক জ্ঞান আছে, ও যাহাদের বিবেক জ্ঞান নাই, সকলেই পুত্র ইচ্ছা করে, অতএব ভগবন্ নারদ, আপনি বলুন, লোকে পুত্রের দ্বারা কি লাভ করিয়া থাকে?" নারদ হরিশ্চন্দ্রের এই একটি গাথায় প্রশ্ন শুনিয়া দশ গাথায় তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি সেই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—পিতা পুত্রের উপর ঋণ স্থাপন করিতে পারেন, অমৃতত্ব লাভ করিতে পারেন, যদি তিনি উৎপন্ন জীবিত পুত্রের মুখ দর্শন করেন। * পৃথিবী প্রভৃতিতে যে ভোগ আছে, পুত্রে পিতার তদপেক্ষা অনেক অধিক ভোগ। পিতা পুত্রের দ্বারা বহুল অন্ধকার (দুঃখ) অতিক্রম করিতে পারেন। পুত্র জ্যোতিস্বরূপ। অপুত্রের লোক (অর্থাৎ সংসারসুখ) নাই †। পুত্রবদ্‌গণ শোকরহিত হইয়া যে পথ (পুত্র-সুখানুভব) প্রাপ্ত হন, শ্রেষ্ঠ লোকেরা তাঁহার প্রশংসা করেন…।" পুত্র পিতাকে বিশেষরূপে রক্ষা করে, ‡ 'পুৎ' বা 'পুৎ' নামক নরক হইতে রক্ষা করে §। অতএব এতাদৃশ পুত্রের কামনা না করিয়া কে থাকিতে পারে, কে বা ইহার জন্য ব্যাকুল না হইবে। ভারতে এরূপ এক সময় আসিয়াছিল, যখন পুত্রের এই উপাদেয়তার প্রভাবে সমাজ মধ্যে নানাবিধ কৃত্রিম-পুত্রের উৎপত্তি হয়। আজকাল ঔরস ও দত্তক এই দ্বিবিধ পুত্র আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু পুরাকালে, ব্রাহ্মণ সময়ে—মন্ত্র-সময়েও আমরা বহুবিধ পুত্রের প্রচলন দেখিতে পাই। প্রাচীন সাহিত্যে এই সকল পুত্রকে অবলম্বন করিয়া বহু বিধি-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ দেখা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়ই আলোচিত হইবে।

কৃত্রিম-অকৃত্রিম বা গৌণ-মুখ্য মোট দ্বাদশ-বিধ পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায় ; ‖ যথা—১ ঔরস, ২ ক্ষেত্রজ, ৩ পুত্রিকা-পুত্র, ৪ পৌনর্ভব, ৫ কানীন, ৬ গূঢ়োৎপন্ন, ৭ সহোঢ়, ৮ দত্তক, ৯ ক্রীত, ১০ স্বয়মুপাগত, ১১ অপবিদ্ধ, ও শূদ্রাপুত্র।

ঔরস পুত্র।

নিজের স্ত্রীতে নিজের দ্বারা উৎপাদিত পুত্র ঔরস ¶। কেহ কেহ বলেন ধর্ম্মপত্নী বা সজাতীয় স্ত্রীতেই স্বয়ং উৎপাদিত পুত্র ঔরস $।

---

* বিষ্ণু ও বশিষ্ঠস্মৃতিতে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। (বিষ্ণু ১৫-৪২ ; বশিষ্ঠ ১৭-১ ;)

† তুলনীয়—"অথ ত্রয়োবাব লোকাঃ। মনুষ্যলোকঃ, পিতৃলোকঃ, দেবলোক ইতি। সোহয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব জয্যো, নান্যেন কর্ম্মণা ; কর্ম্মণা পিতৃলোকো, বিদ্যয়া দেবলোকঃ।"

—শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪-৪-৩-২৫ ; বশিষ্ঠ স্মৃতি, ১৭-২-৫ ; বিষ্ণু ১৫-৪৬।

‡ "পুত্রঃ পুরুত্রায়তে, নিপরণাৎ বা, পুং নরকং ততস্ত্রায়ত ইতি বা।"

—যাস্কীয়নিরুক্ত, ২-৩-২।

§ মনু ৯-১৩৮ ; মহা-ভাঃ ১৪-২৭৫২ ; রামাঃ ২-১০৭-১২ ; মার্ক-পুঃ ৭৫-১৬।

‖ "দ্বাদশ ইত্যেব পুত্রাঃ পুরাণদৃষ্টাঃ।"—বশিষ্ঠস্মৃতিঃ ১-১২।

"অথ দ্বাদশ পুত্রা ভবন্তি।"—বিষ্ণুস্মৃতি, ১৫-১।

মনুঃ ৯-১৫৮ ; বিবাদরত্নাকর, পুত্রান্তর বিভাগতরঙ্গধৃত নারদবচন (৫৫১পৃঃ) ঔরসপুত্রলক্ষণ তরঙ্গ প্রভৃতি।

¶ বশিষ্ঠস্মৃতি ১৭-১৩ ; বিষ্ণু ১৫-২ ; মনু ৯-১৬৬।

$ যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ব্যবহারাধ্যায়, ২৩-১২৮ ; ঐ মিতাক্ষরা ; বৌধায়নধর্ম্ম ২-২-১৪।

তুলনীয়—আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র ২-৫-১৩-১।

অন্যান্য পুত্র অপেক্ষা এই ঔরস পুত্রই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইত। অপর পুত্রগণ ঔরসের অভাবে তাহার প্রতিনিধিস্বরূপে গৃহীত হইত।

ক্ষেত্রজ।

দ্বিতীয় পুত্র ক্ষেত্রজ। অন্যের ক্ষেত্রে অর্থাৎ স্ত্রীতে অন্যের দ্বারা উৎপাদিত পুত্রের নাম ক্ষেত্রজ পুত্র। ঔরস পুত্র না থাকিলে, বা স্বামী মৃত, ক্লীব, বা ব্যাধিগ্রস্ত থাকিলে স্ত্রী স্বামীর দ্বারা বা অপর গুরুজনের দ্বারা পরপুরুষকর্তৃক পুত্রোৎপাদনে নিযুক্তা হইতেন।* এইরূপ নিয়োগস্থলে স্বামীর সপিণ্ড, সগোত্র, সপ্রবর বা সবর্ণ পুরুষই পুত্র উৎপাদন করিতেন।† কিন্তু এ বিষয় দেবরের স্থান প্রথম ছিল।‡ বিধবা স্ত্রীর দেবরের সহিত সহবাসের কথা ঋগ্বেদে পাওয়া যায়।§ অথর্ব্ববেদের চতুর্দ্দশ কাণ্ড কেবল বিবাহবিষয়ক কথাতেই পরিপূর্ণ; এস্থানে একটী মন্ত্রে স্ত্রী ও দেবরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।‖ ইহাও প্রসিদ্ধ আছে যে স্ত্রীর দ্বিতীয় বর বলিয়াই দেবরের নাম "দেবর"।¶ প্রাচীন গ্রন্থে যে যে স্থানে ক্ষেত্রজ পুত্রের কথা উল্লিখিত দেখা যায়, তাহার বহুস্থলে প্রথমে দেবরেরই নাম দেখা যায়, এবং পরে সপিণ্ডাদি উক্ত হইয়াছে। কন্যা বাগ্‌দত্তা হইবার পর স্বামী মৃত হইলে, দেবর ঐ কন্যাকে বিবাহ করিত।

যাহাতে এতাদৃশ পুত্রোৎপাদন কামোপভোগরূপে পরিণত না হয়, সেজন্য বিশেষ

* বশিষ্ঠস্মৃতি ১৭-১৪; বিষ্ণু ১৫-৩; মনু ৯-১৬৭; বৌধায়ন ধর্ম্ম ২-২-১৭;
তুলনীয়—আপস্তম্ব শ্রৌত ১-৯-৭; নারদস্মৃতি ১৩-২৩।

† গৌতমধর্ম্মশাস্ত্র ১৮-৬ যাজ্ঞবল্ক্যের এ সম্বন্ধে বচনটি এই—"ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রজাতস্তু সগোত্রেণেতরেণ বা।" (ব্যবহারাধ্যায়, ২৩-১২৮) এ স্থানে "ইতর" শব্দের অর্থ 'অসগোত্র' নহে; মিতাক্ষরা বলিয়াছেন—"ইতরেণ—অসপিণ্ডেন দেবরেণ বা"; তুলনীয়—যাজ্ঞবল্ক্য ৩-৬৮-৬৯। চণ্ডেশ্বর লিখিয়াছেন—"ইতরেণ উৎকৃষ্টবর্ণেন",—বিবাদরত্নাকর ৫৫৬ পৃঃ।

‡ গৌতমধর্ম্মশাস্ত্র ১৮-৪; মনু ৯-৫৯। দেবর ভিন্ন অন্য কেহ উৎপাদন করিতে পারিবে না, এ নিয়মও প্রচলিত ছিল, গৌতমধর্ম্মশাস্ত্র ১৮-৭।

§ "কুহ স্বিদ্ দোষা কুহ বস্তোরশ্বিনা;
কুহাভিপিত্বং করতঃ কুহোষতুঃ।
কো বাং শয়ুত্রা বিধবেব দেবরং,
মর্য্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ।" ১০-৪০-২।

হে অশ্বি-দ্বয়, তোমরা রাত্রিতে কোথায় ছিলে? দিবসেই বা কোথায় ছিলে? কোথায় তোমাদের অভিপ্রাপ্তি (তত্তৎ প্রয়োজন সিদ্ধি) করিলে? কোথায় তোমরা বাস করিলে? বিধবা যেমন দেবরকে ও স্ত্রী যেমন মনুষ্যকে (স্বামীকে) সহস্থান অর্থাৎ এক স্থানে বর্তমান হইয়া (পরিচর্য্যা) করে, এইরূপ কে তোমার শয়নে ছিল? দ্রষ্টব্য—নিরুক্ত ও তাহার টীকা, ৩-৩-৩।

‖ "অদেবৃঘ্ন্যপতিঘ্নী হৈধি, শিবা পশুভ্যঃ সুযমা সুবর্চাঃ।
প্রজাবতী বীরসূর্দেবৃকামা স্যোনেমমগ্নিং গার্হপত্যং সপর্য্য।"
১৪-২-২-১৮

হে স্ত্রী, তুমি দেবর ও পতির অঘাতিনী হও; তুমি এখানে পশুদের জন্য কল্যাণকারিণী হও, সংযতা হও, সুরূপা হও, প্রজাবতী (পুত্রাদি সন্ততিযুক্তা) হও, বীরপ্রসবিনী হও। তুমি দেবরকামা ও সুখবিধায়িনী হইয়া এই গার্হপত্য অগ্নিকে সেবা কর।

¶ "দেবরঃ কস্মাদ্? দ্বিতীয় বর উচ্যতে।" ইতি যাস্ক, নিরুক্ত। ৩-৩-৩
সোসাইটী মুদ্রিত পুস্তকে দেখা যায় যে কোন কোন পুস্তকে এই কথাটি নাই। দেবর শব্দের যাস্কক্বত অপর ব্যুৎপত্তি—"দেবরো দীব্যতিকর্ম্মা।" ঐ মনু ৯-৬৯

সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল দেখা যায় *। পরক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদয়িতা বিহিত নিয়মে একটি বা দুইটি পুত্র উৎপাদন করিতে পারিতেন। তাহার পর গুরু ও স্নুষার ন্যায় উভয়কে ব্যবহার করিতে হইত। তাহা না হইলে উভয়কেই সমাজচ্যুত করা যাইত। †

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে স্ত্রী স্বামী বা গুরুজনের দ্বারা পুত্রোৎপাদনে নিযুক্তা হইত। কিন্তু যদি স্বামী বা গুরুজন না থাকিত, তবে স্ত্রী রাজার নিকট নিজের কুলক্ষয়-সংবাদ জানাইতেন, ও রাজা অনুশাসন করিলে পূর্ব্ব নিয়মে সন্তান উৎপাদিত হইত। ‡

স্বামী বাঁচিয়া থাকিলেও এবং ক্লীব বা ব্যাধিগ্রস্ত না হইলেও স্ত্রী সময়ে সময়ে পুরুষান্তর আশ্রয় করিত। ইহা ব্রাহ্মণেরও মধ্যে প্রচলিত ছিল। স্বামী যদি দেশান্তর গমন করিতেন, তবে প্রসূতা ব্রাহ্মণী আট বৎসর, অপ্রসূতা চারি বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া অন্য পতি আশ্রয় করিত। এইরূপ প্রসূতা ক্ষত্রিয়া ছয় বৎসর, অপ্রসূতা তিন বৎসর; প্রসূতা বৈশ্যা চারি বৎসর, অপ্রসূতা দুই বৎসর অপেক্ষা করিত। শূদ্রার কোন কাল নিয়ম ছিল না; তবে অপ্রসূতা এক বৎসর থাকিত। কখন কখন এই সময়ের কিছু পরিবর্ত্তন হইত। পত্নী এই সময় অপেক্ষা করিয়া সমানোদক, সপিণ্ড, সকুল্য, সগোত্র ও সমান-প্রবর ব্যক্তির মধ্যে অন্যতমকে আশ্রয় করিত। এই সকলের মধ্যে পর পর অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন প্রশস্ত বলিয়া গণ্য ছিল; এবং স্বকুলের পুরুষ পাওয়া গেলে অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিত না। §

পুত্র উৎপন্ন হইলে যদি কোন ধনপ্রাপ্তির

* "ঘৃতেনাভ্যজ্য গাত্রাণি তৈলেনাবিকৃতেন বা। মুখান্মুখং পরিহরন্ গাত্রৈর্গাত্রাণি চাস্পৃশন্।
কুলে তদবশেষে চ সন্তানার্থং ন কামত। নারদ
ঋতৌ স্নাতায়াং তস্যাং তু বাগ্যতস্তামসে নিশি।
স্ব-(?)শ্মশ্রুনখলোমানাং গন্ধস্পর্শাববেদয়ন্।
একবাসা ঘৃতাক্তাঙ্গো দুর্গন্ধঃ শোকদুর্ম্মনাঃ।
মুখান্মুখং পরিহরন্ গাত্রৈর্গাত্রাণি চাস্পৃশান্।
যত্তাস্যা গর্ভমাদধ্যাদ্ ধৃতে গর্ভে ত্বপত্রজেৎ। যম।

† গৌতমধর্ম্মশাস্ত্র ১৮-৮। মনু ৯-৬০-৬৩; যাজ্ঞবল্ক্য ৩-৬৮-৬৯

‡ "অবিদ্যমানে তু গুরৌ, রাজ্ঞে বাচ্যঃ কুলক্ষয়ঃ।
তত্তদ্বচনাদ্ গচ্ছেদনুশিষ্যাৎ স্ত্রিয়ঞ্চ সঃ।" নারদ।

§ "অষ্টৌ বর্ষাণ্যুদীক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিং।
অপ্রসূতা চ চত্বারি, পরতোঽন্যং সমাশ্রয়েৎ॥
*　*　*
ক্ষত্রিয়া ষট্ সমাস্তিষ্ঠেদ্ অপ্রসূতা সমাত্রয়ম্।
বৈশ্যা প্রসূতা চত্বারি দ্বে সমে ত্বপ্রসূতিকা।
ন শূদ্রায়াঃ স্মৃতঃ কালো ন চ ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ।
বিশেষতোঽপ্রসূতায়াঃ সংবৎসরপরা স্থিতিঃ।
অপ্রবৃত্তৌ স্মৃতঃ কাল এষ প্রোষিতযোষিতাম্। বিবাদরত্নাকরে দেবল।
"প্রোষিতো ধর্ম্মকার্য্যার্থং প্রতীক্ষ্যোঽষ্টৌ নরঃ সমাঃ।
বিদ্যার্থং ষড়্, যশোঽর্থং বা, কামার্থং ত্রীংস্তু বৎসরান্॥" মনু ৯-৭৬

সম্ভাবনা থাকে, আর স্ত্রী তাহাতে লোভ প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহাকে পুত্রোৎপাদনে নিযুক্ত করা হইত না; তবে কখন কখন প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়া অনুমোদন করা হইত, দেখা যায়। *

পুরাকালে অখিল পৃথিবীর উপভোগ-কারী রাজর্ষিপ্রবর বেণ কামোপহতচেতন " হইয়া স্বরাজ্যে বর্ণ শাঙ্কর্য্য উৎপাদন করেন। সেই সময় হইতে যিনি বিধবা স্ত্রীকে সন্তানোৎপাদনে নিয়োগ করিতেন, তাঁহাকে সাধুগণমধ্যে নিন্দিত হইতে হইত; এই নিয়োগ ধর্ম্মকে তাঁহারা পশুধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিতেন। মনুর সময়ের সমাজের অবস্থা এইরূপই ছিল;— নিয়োগ প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহা নিন্দিত হইত। এই জন্য তিনি স্বয়ং নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াও আবার তাহার নিন্দা করিয়াছেন।†

বৃহস্পতি এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"মনু নিয়োগের কথা বলিয়া আবার নিজেই নিষেধ করিয়াছেন; কেন না যুগহ্রাসহেতু মানবেরা যথাবিধি তাহা করিতে সমর্থ হইবে না।... পুরাতন ঋষিগণ বহুবিধ পুত্র করিয়াছিলেন, ইদানীন্তন শক্তিহীন মানবেরা এখন তাহা করিতে পারিবে না। ‡

ক্ষেত্রজ পুত্র যাহার ক্ষেত্রে অর্থাৎ স্ত্রীতে উৎপন্ন, সেই ক্ষেত্রীর অথবা যে তাহাকে উৎপন্ন করিয়াছে, সেই বীজীর হইবে, তদ্বিষয়ে পুরাকালে বিলক্ষণ বিবাদ ছিল। § এক দল বলিতেন ঐ পুত্র ক্ষেত্রীর এবং অপর দল বলিতেন ঐ পুত্র বীজীর হইবে। ‖ ফলে দেখা যায় কখন কখন তাদৃশ পুত্র ক্ষেত্রীর, কখন

"প্রোষিতপত্নী পঞ্চ বর্ষাণ্যুপাসীতোর্দ্ধং পঞ্চভ্যো বর্ষেভ্যো ভর্ত্তৃসকাশং গচ্ছেৎ।
যদি ধর্ম্মার্থাভ্যাং প্রত্যনুকামা ন স্যাদ্, যথা প্রেত এবং বর্ত্তিতব্যং স্যাৎ।
এবং ব্রাহ্মণী পঞ্চ প্রজাতাঽপ্রজাতা চত্বারি, রাজন্যা প্রজাতা পঞ্চাপ্রজাতা
ত্রীণি, বৈশ্যা প্রজাতা চত্বার্য্যপ্রজাতা দ্বে, শূদ্রা প্রজাতা ত্রীণ্যপ্রজাতৈকম্।
অত ঊর্দ্ধং সমানোদকপিণ্ডজন্মর্ষিগোত্রাণাং পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো গরীয়ান্।
ন তু কুলীনে বিদ্যমানে পরগামিনী স্যাৎ।" বশিষ্ঠ ১৭-৬৭-৭০
বঙ্গবাসীর বশিষ্ঠসংহিতা ভ্রমে পরিপূর্ণ। আমরা আনন্দাশ্রমসংস্করণের পাঠ গ্রহণ করিয়াছি।

* বশিষ্ঠ ১৭-৫৭-৫৮। মিতাক্ষরা ২-১৩৫-৬;
"নিয়োগাৎ পাবনং কুর্য্যাদ্ যথোক্তং তদ্ বিশুদ্ধয়ে।
দ্বিজস্য স্ত্রীষু ধর্ম্মোঽয়ং শূদ্রস্যৈকে তদাশ্রয়ঃ।" কাত্যায়ন।

† মনু ৯-৬৬-৬৮।
"নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিযোক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা ধর্ম্মং হন্যুঃ সনাতনম্।" মনু ৯-৬৪।
কুল্লুকভট্ট এই শ্লোকের "অন্যস্মিন্" শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"ভর্ত্তুরন্যস্মিন্ দেবরাদৌ।" কিন্তু "দেবরাদ্ বা সপিণ্ডাদ্ বা" ইত্যাদি (৯-৫৯) শ্লোকের সহিত ইহা আলোচনা করিলে চণ্ডেশ্বরের ব্যাখ্যাই সঙ্গত বোধ হয়। তিনি লিখিয়াছেন—"অন্যস্মিন্—দেবরসপিণ্ডাভ্যা-মন্যস্মিন্।"—বিবাদরত্নাকর (৪৪৯ পৃঃ)। তুলনীয়—"নাদেবরাদিত্যেকে"। গৌতম ধর্ম্মসূত্র ১৮-৭।

‡ "উক্তো নিয়োগো মনুনা নিষিদ্ধঃ স্বয়মেব তু।
যুগহ্রাসাদশক্যোঽয়ং কর্ত্তুং সর্ব্বৈর্বিধানতঃ।
* * *
অনেকধা কৃতাঃ পুত্রা ঋষিভির্যৈঃ পুরাতনৈঃ;
ন শক্যাঃ সাধুনা কর্ত্তুং শক্তিহীনৈরিদন্তনৈঃ।" বিবাদরত্নাকর (৪৫০ পৃঃ)

§ বশিষ্ঠ ১৭-৬; মনু ৯-৩২। ‖ বশিষ্ঠ ১৭-৭-৯।

কখন বীজীর, এবং কখন কখন ক্ষেত্রী বাজী—উভয়েরই হইত। আলোচনা করিলে বোধ হয় প্রথম অবস্থায় ক্ষেত্রজ পুত্র সাধারণত জনয়িতা বা বীজীরই হইত। *

যাঁহারা বলিতেন পুত্র জনয়িতার, তাঁহাদের তৎসম্বন্ধে যুক্তি এই—বীজ ও ক্ষেত্র, এই উভয়ের মধ্যে বীজ উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ প্রধান; কারণ সমস্ত ভূতই বীজলক্ষণাক্রান্ত হইয়া উৎপন্ন হয়। যথাকালে সংস্কৃত ক্ষেত্রে যাদৃশ বীজ বপন করা হয়, তাদৃশ বীজই স্বকীয় গুণ বিশিষ্ট হইয়া অঙ্কুরিত হয়। এই পৃথিবীকে ভূতগণের নিত্য কারণ বলা হয়, কিন্তু বীজ স্বকীয় অঙ্কুরাদিতে তাহার কোন গুণ (স্বাদ-বর্ণাদি) ধারণ করে না। এক ক্ষেত্রে কৃষকগণ কর্ত্তৃক যথাকালে উপ্ত বীজসমূহ স্বভাবানুসারে নানাবিধ হইয়া উৎপন্ন হয়। ব্রীহি, শালি, মুদ্গ, তিল, মাষ, যব প্রভৃতি শস্য নিজ নিজ বীজানুসারেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক বীজ বপন করা হইল, আর অন্য অঙ্কুর উৎপন্ন হইল—ইহা উপপন্ন হয় না; যে বীজ বপন করা যায়, তাহারই অঙ্কুর হয়। অতএব বীজ প্রধান; এবং তজ্জন্য যাহার বীজ, তাহারই পুত্র। †

যাঁহারা ক্ষেত্রীরই পুত্রাধিকার ইচ্ছা করিতেন, তাঁহারা ক্ষেত্রের প্রাধান্য প্রতিপাদন করিতে গিয়া নিম্নলিখিত যুক্তির অবতারণা করেন—প্রাজ্ঞ, বিনীত, জ্ঞানবিজ্ঞান বেদী, আয়ুষ্কাম ব্যক্তি কখনও পরস্ত্রীতে বীজবপন করিবে না। পুরাবিদ্‌গণ এ স্থানে বায়ুগীত গাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, পরস্ত্রীতে বীজ বপন করিবে না। যেমন পূর্ব্ববিদ্ধ মৃগকে আবার শরবিদ্ধ করিলে, ঐ বিদ্ধশর নিষ্ফল হয় (কেননা ঐ মৃগ পূর্ব্বে শরবেধকারীরই প্রাপ্য), সেইরূপ পরস্ত্রীতে বীজ বপন করিলে, তাহা নষ্ট হয়। যেমন পরকীয় গো, অশ্ব, উষ্ট্র, মহিষ প্রভৃতি জন্তুতে ও পরকীয় দাসীতে উৎপাদিত সন্তান উৎপাদকের না হইয়া, গো প্রভৃতির স্বামীরই হইয়া থাকে, পরকীয় স্ত্রীতে উৎপাদিত সন্তানও সেইরূপ ঐ স্ত্রীর স্বামীরই হয়। যাহার ক্ষেত্র নাই, কেবল বীজ আছে,—এইরূপ লোক যদি পরক্ষেত্রে বীজ বপন করে, তবে সে কখনও উৎপন্ন শস্য লাভ

* "উৎপাদয়িতুঃ পুত্র ইতি হি ব্রাহ্মণম্"। আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র, ২-৬-১৩-৬।
উৎপাদয়িতাই যে ঐ পুত্রের অধিকারী হইতেন, তৎসম্বন্ধে এস্থানে তিনটি পুরাতন গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে:—

"অথাপ্যুদাহরন্তি—
"ইদানীমেবাহং জনকঃ স্ত্রীণামীর্ষ্যামি নো পুরা।
যদা যমস্য সাদনে জনয়িতুঃ পুত্রমব্রুবন্॥ ১॥
রেতোধাঃ পুত্রং নয়তি পরেত্য যমসাদনে।
তস্মাদ্ ভার্য্যাং রক্ষন্তি বিভ্যতঃ পররেতসঃ॥ ২॥
অপ্রমত্তা রক্ষথ তন্তুমেতং মা বঃ ক্ষেত্রে পরবীজানি বাপ্সুঃ।
জনয়িতুঃ পুত্রো ভবতি সাম্পরায়ে
মোঘং বেত্তা কুরুতে তন্তুমেতামিতি॥" ৩। ঐ ২-৬-১৩-৬।

তৃতীয় শ্লোকটি বশিষ্ঠ স্মৃতিতেও ধৃত হইয়াছে (১৭-৯)।

মনুসংহিতায় ধৃত বায়ুগীত গাথা দ্রষ্টব্য (৯-৪২)। মনুসংহিতায় প্রথমে ক্ষেত্রীর পুত্রত্ব অনুকূলে, ও পরে বীজীর পুত্রত্ব অনুকূলে যুক্তিপ্রদর্শন ও উল্লিখিত মত সমর্থন করিতে পারে।

† মনু ৯-৩৩-৪০।

করিতে পারে না। যদি কোন বৃষভ অন্যকোন লোকের গাভীতে একশতও বৎস উৎপাদন করে, তথাপি ঐ সকল বৎস গাভীর স্বামীরই হইবে; সেই বৃষভের শুক্রনিষেক নিষ্ফল, কেননা এই বৃষভের স্বামী ঐ সকল বৎস পাইতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রহীন বীজী যদি পরক্ষেত্রে বীজ বপন করে, তাহাতে সে ক্ষেত্রীরই প্রয়োজন সাধন করে, নিজে কোন ফল লাভ করে না। ক্ষেত্রস্বামী ও বীজবপন-কারী,—ইহাদের ফল বিষয়ে যদি কোন নিয়ম না থাকে, তাহা হইলে প্রত্যক্ষরূপে ক্ষেত্র-স্বামীরই ফল লাভ হইয়া থাকে; কেন না বীজ হইতে ক্ষেত্রের গৌরব অধিকতর। জলপ্রবাহ বা বায়ু-দ্বারা আহৃত বীজ যাহার ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়, ঐ বীজ ক্ষেত্রস্বামীরই বলিয়া গণ্য হয়; বীজবপনকারী তাহার ফল লাভ করে না। দাসী ও পশু-পক্ষীর সন্ততি সম্বন্ধেও এই নিয়ম;—তাহাদের স্বামীই তাহা-দের সন্তানের অধিকারী, বীজপবনকারীর স্বামী নহে। *

আবার যাঁহারা বলিতেন ঐ পুত্রে ক্ষেত্রী ও বীজী উভয়েরই অধিকার, তাঁহারা বীজ ও ক্ষেত্রের ন্যূনাধিকত্বভাব কল্পনা না করিয়া উভয়ের সাম্য প্রতিপাদন করিতেন। তাঁহা-দের কথা এই—বীজ থাকিলেও, যদি ক্ষেত্র না থাকে, তবে শস্য হয় না; আবার ক্ষেত্র থাকিলেও যদি বীজ না থাকে, তবে শস্য হয় না; অতএব ধর্ম্মানুসারে দেখা যাইতেছে যে তাদৃশ পুত্র পিতা-মাতা উভয়েরই, অর্থাৎ ক্ষেত্রী ও বীজী উভয়েরই তাহাতে অধি-কার। †

কখন কখন ক্ষেত্রহীন বীজী ও বীজহীন ক্ষেত্রী পরস্পরে এইরূপ নিয়ম করিতেন যে, এই ক্ষেত্রে যে ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা আমাদের উভয়ের। এরূপ স্থলে ঐ পুত্রে উভয়েরই অধিকার থাকিত। এই পুত্র "দ্ব্যামুষ্যায়ন" (অর্থাৎ দুই জনেরই অপত্য) নামে কথিত হইত। অতএব এতাদৃশ পুত্রের দুই পিতা; উভয় পিতারই গোত্রে সে পরি-চিত হইত, এবং উভয় পিতারই পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদন করিত ও উভয় পিতারই ধনাংশ লাভ করিত। ‡

বীজবপনকারী যদি ক্ষেত্রস্বামীর সহিত নিয়ম না করিতেন যে ঐ পুত্রে তাঁহাদের উভয়ের অধিকার থাকিবে, তবে উৎপন্ন পুত্র সম্পূর্ণভাবে ক্ষেত্রস্বামীরই প্রাপ্য ছিল, বীজ-বপনকারী তাহাতে বঞ্চিত হইতেন। § আবার কখন কখন ঐরূপ নিয়ম না থাকিলে ক্ষেত্রস্বামীই বঞ্চিত হইতেন, উৎপাদয়িতারই ঐ পুত্রে অধিকার থাকিত। কিন্তু যদি ঐ ক্ষেত্রের অর্থাৎ স্ত্রীর স্বামী বাঁচিয়া থাকে, তবে সেই নিয়ম না থাকিলে ক্ষেত্রস্বামীই পুত্র পাইতেন। ইহাও দেখা যায় যে, সন্তান উৎপত্তির পর ক্ষেত্র ও বীজীর মধ্যে যে ব্যক্তি

* মনু ৯-৪১-৪৫; ৪৮-৫২; ৫৪-৫৫।

† "ন তাৎ ক্ষেত্রং বিনা শস্যং ন বীজঞ্চ বিনাস্তি তৎ।
অতোঽপত্যং দ্বয়োর্দৃষ্টং পিতুর্মাতুশ্চ ধর্ম্মতঃ॥" নারদ।

‡ মনু ৯-৫৩; বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র ২-২-৩-১৭—১৯; যাজ্ঞবল্ক্য ২-১২৭; নারদ ১৩-২৩; তুলনীয়—আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র ১-৯-৭। § মনু ৯-৫২।

ক্ষেত্রকে ভরণ-পালন করিতেন, তাহারই পুত্র হইত। *

ক্ষেত্রজ পুত্র সমাজে কিরূপ স্থান পাইত ইত্যাদি বিষয় অন্যান্য পুত্রের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিয়া উপসংহারে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

প্রবাসের পাঠশালা।

পণ্ডিত মহাশয় স্কুলে আসিয়াই প্রথমে লালমোহনকে ডাকিতেন, তাহাকে দু'চারটা পড়া জিজ্ঞাসা করিয়াই কাণ মলিয়া দিয়া, কয়েক ঘা বেত মারিয়া একটা গাধার টুপি মাথায় পড়াইয়া বই হাতে দিয়া বেঞ্চির উপর দাঁড় করাইয়া দিতেন। লালমোহনের বয়স বছর দশেক হইবে, তার ছোট ভাই প্যারী-মোহনের বছর ৮।৯—লালমোহনের পরে তাহার ডাক পড়িত। তাহাকেও দু'একটা পড়া জিজ্ঞাসা করিয়াই পণ্ডিত মহাশয় তাহার দুই কাণ ধরিয়া আচ্ছা করিয়া একবার ঝাঁকা-ইয়া দিতেন, পরে বেত মারিতে আরম্ভ করিতেন—বেতের বিরাম নাই, বেতের উপর বেত পটাপট্‌ পটাপট্‌! লালমোহন নিঃশব্দে বেত হজম করিত কিন্তু প্যারীমোহন প্রথম ঘা হইতেই 'আল্লা (আর না) পণ্ডিত মশাই আল্লা পণ্ডিত মশাই' বলিয়া করুণস্বরে কাঁদিয়া স্কুল ফাটাইয়া দিত। এক একদিন বেত মারিতে মারিতে পণ্ডিত মহাশয়ের এমন রাগ চড়িয়া যাইত ও তিনি এমন উত্তে-জিত হইয়া উঠিতেন যে স্কুলের ছাত্রীদের পাশের ঘরে পাঠাইয়া দিয়া প্যারীমোহনকে বিবস্ত্র করিয়া প্রহার করিতেন।

লালমোহন প্যারীমোহনকে শিক্ষাদান করা হইলে একে একে অন্য ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষাদান আরম্ভ হইত—বালকদের বেত্রাঘাত এবং বালিকাদের গালে ঠাস্‌ ঠাস্‌ করিয়া চড় মারা শেষ হইতে হইতে বেলা ১২॥০টা বাজিত; তখন পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রীদের কয়জনকে (জন ৬।৭) সঙ্গে করিয়া উপরের তলায়

---

* গৌতমধর্ম্মশাস্ত্র ১৮-৯-১৪ Prof. Adolf Triedrich Stenzler (London, Trubner & Co.) সম্পাদিত গৌতমধর্ম্মশাস্ত্রে এই স্থানের কয়েকটি সূত্রের পৌর্ব্বাপর্য্য এইরূপ লিখিত হইয়াছে—"জীবতশ্চ ক্ষেত্রে। ১১। পরস্মাৎ তস্য। ১২। দ্বয়োর্ব্বা। ১৩। রক্ষণাৎ তু ভর্ত্তুরেব। ১৪।" বঙ্গবাসী সংস্করণেও (উনবিংশতি সংহিতা ৪৫৪ পৃঃ) তাহাই আছে, কেবল ১৪শ সূত্রের "তু" অক্ষরটি নাই দেখা যায়। সূত্রের এইরূপ পৌর্ব্বাপর্য্যে অর্থগ্রহ ভালরূপে হয় না। বিবাদরত্নাকরে ঐ অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গবাসীর ন্যায় ইহাতেও সূত্র সংখ্যা প্রদত্ত হয় নাই। ইহার পাঠ এইরূপ—"······জীবতশ্চ ক্ষেত্রে পরস্মাত্তস্য রক্ষণাৎ ভর্ত্তুরেব দ্বয়োর্ব্বা।" ইহাই সঙ্গত বোধ হয়। "পরস্মাৎ তস্য রক্ষণাৎ ভর্ত্তুরেব' এই অংশকে দুইটি সূত্র গণ্য করিলে অর্থ বোধ দুষ্কর। বিবাদ-রত্নাকরের ব্যাখ্যার সহিত যদিও উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যায় আমি একমত হইতে পারি নি, তথাপি তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে এই অংশটিকে তিনিও একটি সূত্ররূপে ধরিয়াছেন, বোধ হয়। আমি ইহাই করিয়াছি।

জলযোগ করিতে যাইতেন, ছেলেরাও জলখাবারের ছুটি পাইত। লালমোহন প্যারীমোহন এক একদিন সে ছুটিও পাইত না, এক জনকে বেঞ্চির উপর আর একজনকে ইটের উপর পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে আদেশ দিয়া পণ্ডিত মহাশয় উপরে চলিয়া যাইতেন।

মায়ের কাছে শুনিয়াছি, যখন আমি প্রথম স্কুলে ভর্ত্তি হই তখন আমার বয়স চার বৎসর পূর্ণ হয় নাই—তখনকার এক একদিনের কথা আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। মনে পড়ে উপরে পণ্ডিত মহাশয়ের একখানি মাত্র ছোট ঘর ও তার সম্মুখে অল্প একটুখানি ছাদও ছিল; বড় স্কুল-ঘরটার ছাদ যে কোথায় ছিল তা মনে নাই। আমাদের ৬।৭ জনকে সেই ঘরের মধ্যে পূরিয়া পণ্ডিত মহাশয় এক ছিলিম তামাক সাজিয়া খাইয়া মুখ ধুইতে চলিয়া যাইতেন। একটি বালকের উপর আদেশ থাকিত, সে আমাদের জলখাবার সিঁড়ির কাছে পৌঁছিয়া দিত—কাহারও বাড়ী হইতে খাবার আসিত, কেহ বাড়ী হইতে পয়সা আনিয়া খাবারওয়ালার কাছে হইতে কিনিয়া খাইত। যদি রৌদ্র না থাকিত তবে ছাদে, নয় ত পণ্ডিত মহাশয়ের ক্ষুদ্র ঘরখানিতে আমরা খেলা করিতাম। খেলাটা হইত প্রায়ই যাত্রার নকল করা; আমি সর্ব্ব কনিষ্ঠ, আমার মাথায় একটা 'পেন্‌-কলম' বাঁধিয়া দিয়া হেমা আমাকে কৃষ্ণ সাজাইয়া একখানা টুলের উপর দাঁড় করাইয়া দিয়া নিজে বৃন্দা হইয়া নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে আমার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া গান করিত—দুঃখের বিষয় গানের এক ছত্রও আমার মনে নাই। অন্য মেয়েরা সখি হইয়া আমার দুদিকে দুজনে দাঁড়াইত—মধ্যে মধ্যে সখিরাও গান করিত আবার নাচিত। এত কথা মনে আছে অথচ গানের এক ছত্রও যে মনে নাই তাহার কারণ বোধ হয় যে হেমার গান আমি ভাল শুনিতেই পাইতাম না; পণ্ডিত মহাশয়ের ভয়ে হেমা বেঁ অতি মৃদুস্বরে গান করিত।

একদিন বাবা আমাকে একটা ময়ূরপুচ্ছ দিলেন, পরদিন বইয়ের মধ্যে সেই পুচ্ছটি দেখিয়া হেমা বড় খুসি হইল, বলিল "আজ আর 'পেন্‌-কলম' দিয়া চূড়া বাঁধিতে হইবে না, আসল ময়ূরপুচ্ছের চূড়া হইবে।" যথা সময়ে 'আসল ময়ূরপুচ্ছের চূড়া' মাথায় বাঁধিয়া আমি 'আসল কৃষ্ণ' হইয়াছি ভাবিয়া বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলাম, সেটা আমার খুব মনে আছে। পণ্ডিত মহাশয়ের আগমনে কৃষ্ণযাত্রা ক্ষণেকের জন্য স্থগিত হইত। মেঝেতে একখানা চেটাইয়ের উপর একটা লেপ ও চাদর পাতা থাকিত, একটা ময়লা বালিশও ছিল, তাহাতে পণ্ডিত মহাশয় হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া বসিতেন—রাত্রেও সেই শয্যায় তাঁহার শয়ন হইত। বিছানার পাশে একটা কুঁজা ও একটা গেলাস থাকিত; এক গেলাস জল গড়াইয়া লেপের তলা হইতে আফিমের কৌটাটি বাহির করিয়া একটা রিটার আঁটির মত এক ডেলা আফিম পাকাইয়া পাকাইয়া এক ঢোক্ জল গালে করিয়া ডেলাটি ছাড়িয়া দিয়া চক্ করিয়া গিলিয়া ফেলিতেন, তারপর মধু দিলে শিশু যেমন চুষিয়া চুষিয়া খায়, পণ্ডিত মহাশয় তেমনি তৃপ্তির সহিত নিজের আঙ্গুলের আফিমটুকু

চুষিয়া চুষিয়া খাইতেন। অবসর বুঝিয়া ক্ষেত্রমণি বলিত, "বড় মিষ্টি লাগছে, না পণ্ডিত মশায়?" পণ্ডিত মহাশয় প্রসন্নচিত্তে একটু মুচ্‌কে হেসে বলিতেন, "হুঁ হুঁ তোরা কি বুঝবি!" অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে একটুখানি বিদ্যুত যেমন, পণ্ডিত মহাশয়ের গম্ভীর মুখের হাসিটুকু ঠিক সেই রকম। আঙ্গুল দুটি চোবা হইলে হাতটি ধুইয়া পণ্ডিত মহাশয় আবার এক ছিলিম তামাক সাজিতেন ও বালিশে ঠেসান দিয়া ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করিয়া তামাক টানিতেন, ক্রমে ক্রমে চক্ষু দু'টি মুদিয়া আসিত; এক একদিন তাঁহার হাত হইতে হুঁকাটা পড়িয়া গিয়া বিছানায় জল ও আগুন পড়িয়া যাইত, মেয়েরা তাড়াতাড়ি গিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া দিত। পণ্ডিত মহাশয় চক্ষু বুজিলেই হেমা নিজের পকেট হইতে একটা আফিমের কৌটা বাহির করিত। হেমার বয়স ১০।১১ বৎসর; একটা ইজের, একটা জামা পরিয়া ও মাথায় একটা ছিটের রুমাল বাঁধিয়া সে স্কুলে আসিত। তার দুই কাণে চারিটা করিয়া আটটা সোণার মাকড়ি, নাকে নোলক ও পায়ে চার গাছা মল ছিল—সে মেয়েদের মধ্যে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মার খাইত। হেমার আফিমের কৌটা শুনিয়া সকলে বোধ হয় বিস্মিত হইয়াছেন, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। হেমা খয়ের ভিজাইয়া ছোট ছোট গুলি বানাইয়া রাখিত ও তাহাই কৌটা ভরিয়া লইয়া আসিত এবং পণ্ডিত মহাশয়ের আফিম খাওয়া হইলেই তাঁহার অজ্ঞাতসারে "এস ভাই আমরা আফিম খাই" বলিয়া আমাদের সকলকে এক একটি গুলি খাইতে দিত; কিন্তু আমরা সেই খয়েরের গুলি ঢক্ করিয়া গিলিয়া খাইতাম না—পণ্ডিত মহাশয়ের আঙ্গুলের আফিমের মত চুষিয়া চুষিয়া খাইতাম এবং শেষে জল খাইয়া জলের মিষ্ট স্বাদ পাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতাম। যতক্ষণ পণ্ডিত মহাশয় ঢুলিতেন, হেমাও ততক্ষণ হাত মুখ নাড়িয়া যাত্রার অভিনয় করিত—তখন তাহার গলা হইতে কিছুমাত্র স্বর বাহির হইত না, কেবল হাঁ করা দেখিয়া আমরা বুঝিতাম হেমা গান করিতেছে।

ময়ূরপুচ্ছ মাথায় বাঁধিয়া ঠিক আসল কৃষ্ণ সাজার সুখ আমার ভাগ্যে অধিক দিন ঘটে নাই। ময়ূরপুচ্ছ মাথায় বাঁধিবার লোভে একদিন ক্ষেত্রমণি বলিল "আমি কৃষ্ণ সাজিব।" হেমা বলিল, "দূর! অমন ধেড়ে কৃষ্ণ কি মানায়? সে হবে না।" ক্ষেত্রমণির বয়স ৯।১০—সে বলিল "তবে আমি রাধিকা সাজিব, রাধিকার মাথায় ত চূড়া থাকে।" হেমা বলিল, "একটা বই ময়ূরপুচ্ছ নয়, তা কেমন করে হবে?" ইহা লইয়া হেমাতে ও ক্ষেত্রমণিতে বিষম ঝগড়া হইয়া গেল—যাত্রার দল পৃথক হইল। সব মেয়ে তাহার দলে হওয়ায় ক্ষেত্রমণির দল ভারি হইয়া উঠিল কৃষ্ণকে (আমাকে) লইয়া বৃন্দাসখি (হেমা) এক দল বাঁধিল। ক্ষেত্রমণির দল ভারি হইবার একটা কারণ ছিল—পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত ক্ষেত্রমণি লাল মলাটের কি একখানা বই আনিত এবং পণ্ডিত মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সুর করিয়া তাহা পড়িত, সব মেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া শুনিত—কেবল হেমা যাইত না এবং আমার ময়ূরপুচ্ছের উপর লোভ করিয়াছিল বলিয়া আমিও যাইতাম

না। হেমা আমাকে কৃষ্ণ সাজাইয়া টুলের উপর উঠাইয়া দিয়া যাত্রা করিত, কিন্তু ভাল জমিত না—আমাদের মন থাকিত ক্ষেত্রমণির বইয়ের দিকে। একদিন হেমা আমাকে বলিল, "যাত সুকুমারী, ক্ষেত্রমণির পিছন থেকে চুপি চুপি দেখে আয় ত বইখানার নাম কি।" আমি ধীরে ধীরে যাইতে যাইতে শুনিলাম ক্ষেত্রমণি পড়িতেছে, 'দাদা আর কি আর কি, প্রাণপতি কোলে লয়ে জলে ভেসেছি'—আমি পিছনে গিয়াছি জানিয়া ক্ষেত্রমণি ফস্ করিয়া বইটা বন্ধ করিল—মলাটের উপরে দেখিলাম লেখা আছে 'ভগবদ্গীতা।' আমাদের বাড়ীতে একখানা ভগবদ্গীতা ছিল, পরদিন সংগ্রহ করিয়া, লইয়া স্কুলে গেলাম এবং অতিশয় গর্ব্বভরে হেমাকে দিলাম। আমাদের বইখানা নূতন চক্চকে, ওদের খানা ছেঁড়া—আজ হেমা সুর করিয়া 'দাদা আর কি আর কি' পড়িয়া সকলের তাক্ লাগাইয়া দিবে, এই আনন্দে পণ্ডিত মহাশয়ের জলযোগের সময় প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি;—অনেক কষ্টে সময় আসিল, কিন্তু পড়িতে গিয়া শুধু যে সমস্ত বইখানার মধ্যে 'দাদা আর কি, আর কি' পাওয়া গেল না তা নয়, এক বর্ণও আমরা পড়িতে বা বুঝিতে পারিলাম না। হেমা বলিল, "একি এনেছ, এযে সংস্কৃত! এখন বুঝিতে পারি, ক্ষেত্রমণি সুর করিয়া 'মনসার ভাসান' পড়িত—কিন্তু আমার বেশ মনে আছে সেই বইয়ের মলাটে ভগবদ্গীতা নাম আমি পড়িয়াছিলাম—বোধ হয় দুখানা বই একত্রে বাঁধান ছিল।

ঝিমুনি ভাঙিলে পণ্ডিত মহাশয় গলা খাঁকারি দিয়া উঠিয়া বসিতেন, তাঁর ড্যাবা ড্যাবা লাল চক্ষু আরও ২।৪ বার ঢুলিয়া পড়িত, কয়েক বার ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া জোরে নিশ্বাস বহিয়া যাইত, তারপর তিনি সজাগ হইয়া ঠোঙ্গাশুদ্ধ খাবার লইয়া খাইতেন; তারপর জল, পান ও আর এক ছিলিম তামাক খাইয়া আমাদের লইয়া নীচে নামিয়া আসিতেন। আমরা সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে শুনিতে পাইতাম ঝড়ের মত হুড় মুড় হুড় হুড় করিয়া ছাত্রেরা স্কুলঘরে প্রবেশ করিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থা ছিল, ছেলেরা ও পণ্ডিতমহাশয় জলযোগের জন্য আধঘণ্টা মাত্র ছুটি পাইবেন। পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রদের আধঘণ্টা সময় জলযোগের জন্য ছুটি দিয়া নিজে জলযোগ করিতে যাইতেন, কিন্তু দেড়ঘণ্টার কম কোনদিনই স্কুলঘরে আসিতে পারিতেন না। সেই দেড়ঘণ্টা ছাত্রেরা এমন কোলাহল করিত, এমন ছুটাছুটি করিত যে তাহাদের আনন্দধ্বনি উপর হইতে শুনিয়া আমার হিংসা হইত—আমিও কেন নীচে থাকিতে পাই না—প্রতিদিন একঘেয়ে যাত্রাখেলায় মন তৃপ্তি মানিত না।

নীচে আসিয়া পণ্ডিত মহাশয় লালমোহন প্যারীমোহনকে পাঁচ মিনিটের জন্য ছুটি দিতেন—এটা কিন্তু তাহাদের উপরি লাভ কারণ পূর্ণ বলিত, পণ্ডিত মহাশয় উপরে উঠিলেই অন্য ছেলেদের মত লালমোহন প্যারীমোহন লাফালাফি ছুটাছুটি করিত এবং খড়মের শব্দ পাইলেই আবার যে যাহার শান্তির স্থানে দাঁড়াইত। পাঁচমিনিট ছুটির পর ফিরিয়া আসিয়া তাহারা বসিতে পাইত। তখন

পণ্ডিত মহাশয় সকলকে একটু একটু পড়া বলিয়া দিতেন, বোর্ডে আঁক কসাইতেন ও ছুটির অব্যবহিত পূর্ব্বেই ঘরশুদ্ধ সকলকে নামতা পড়াইতেন।

আমাকে পণ্ডিত মহাশয় বড়ই তাচ্ছিল্য করিতেন—কোন দিন ২।১টা পড়া লইলেন, কোনদিন কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়াই "এইখান থেকে এই পর্য্যন্ত পড়া করে' আনিস্" বলিয়া বিদায় দিতেন। আমার দুই বৎসর বয়সের সময় হইতে বাবা একখানা বর্ণপরিচয় লইয়া আমাকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন; আমার চার বৎসর বয়সের সময় অল্পে অল্পে আমি বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ 'সায়' করিয়াছিলাম, 'বোধোদয়' ধরিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। বাস্তবিক 'বোধোদয়' পড়িবার মতন তখন আমার বোধোদয় হইয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু বাবা সকলের কাছে গল্প করিতেন যে 'সুকুমারীর অগাধ বুদ্ধি ও এর মধ্যে 'বোধোদয়' পড়ে।

স্কুলে ভর্ত্তি হইবার ২।৪ দিন পরেই কি একটা পড়া বলিতে না পারায়, পণ্ডিত মহাশয় আমার গালে একটা প্রকাণ্ড চড় মারিলেন—সে কি চড়! আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম! লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিলাম না! ইহার পূর্ব্বে আমি কখনও কাহারও কাছে মার খাই নাই। বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল কিন্তু কাঁদিলাম না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম; সমস্ত দিন আমার গাল জ্বালা করিতে লাগিল। ছুটির পর বাড়ী আসিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া একেবারে মায়ের কোলে আছড়াইয়া পড়িয়া বলিলাম, "পণ্ডিত মশায় আমাকে মেরেছে।" মা আমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আহা হা আহা হা! হতভাগা পণ্ডিত বাছাকে একেবারে মেরে ফেলেছে, এমন চড় মেরেছে যে পাঁচ আঙ্গুলের দাগ প'ড়েছে! মরে যাই, মরে যাই, বাছারে আমার!" বাবা তখন বাড়ী ছিলেন না, মা একেলাই ব'কতে লাগিলেন ও আমাকে শান্ত করিলেন। পরদিন কিছুতেই আর স্কুলে যাইতে দিবেন না, বাবা অনেক বলা কহায় স্কুলে পাঠাইলেন, কিন্তু বাবা পণ্ডিত মহাশয়কে একখানা 'কড়া' করিয়া চিঠি লিখিয়া দিলেন যে, "আমার মেয়ে পড়া বল'তে পারুক আর না পারুক খবরদার আমার মেয়েকে মারিবেন না।"

চিঠিখানা আমিই হাতে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম—পণ্ডিত মহাশয় পড়িয়া আমার দিকে এমন কট্‌মট্ করিয়া তাকাইলেন যে আমার গায়ের রক্ত যেন শুকাইয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "তোর পড়াশুনা কিছু হবে না, কাল পাঁচটা পয়সা আনিস্ একখানা বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ দিব, তাই তুই প'ড়বি। না মারলে কখনও লেখাপড়া হয়?" বলিয়া আমার কাণ ধরিয়া নীচু ক্লাশে বসাইয়া দিলেন এবং অধিকতর আগ্রহের সহিত পরে পরে লালমোহন ও প্যারীমোহনকে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। প্যারীমোহনের সে দিনের কান্নার সুর এখনো আমার কাণে যেন লাগিয়া রহিয়াছে!

লালমোহন ও প্যারীমোহন এত যে মার খাইত তবু কোন দিন স্কুল কামাই করিত না। একদিন তাহারা স্কুলে আসিল না—পণ্ডিত মহাশয় আস্ফালন করিতে লাগিলেন যে, 'আসুক তারা স্কুলে, হাড় এক ঠাঁই মাস

এক ঠাঁই করিব।" বাড়ী গিয়া শুনিলাম মা ও বাবা বিষন্ন ভাবে বসিয়া কাহার জন্য আক্ষেপ করিতেছেন। আমি বলিলাম "কি হয়েছে মা?" মা বলিলেন "আহা তোদের স্কুলের সেই যে লালমোহন ও প্যারীমোহন—তাদের বাপ মরে' গেছে, তারা কাল দেশে যাবে।"

আমি। কেন মা তারা দেশে যাবে?

মা। আর কি ক'রতে এখানে থাকবে, না খেতে পেয়ে মারা যাবে যে। বাপ চাকৃরি ক'রতো তবে তো খেতে পেতো।

আমি। দেশে গিয়ে কি খাবে মা?

মা। দেশে গিয়ে যা হয় খাবে।

মনে মনে সান্ত্বনালাভ করিলাম যে 'যা হয়' খাবে, না খেতে পেয়ে মরিবে না। তখন জানিতাম না যে আমাকেও একদিন 'যা হয়' খেতে হবে।

পরদিন বই শ্লেট্ না লইয়া শুধু হাতে, শুধু পায়ে, বিষন্নমুখে লালমোহন ও প্যারীমোহন স্কুলে আসিল—কেহই ভাল করিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না; সকলেই এই দুঃসংবাদ শুনিয়াছিল। যদিও তখনও পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসে আসেন নাই, তথাপি কেহ গোলমাল করিল না, লালমোহন প্যারীমোহনের মত চুপ করিয়া বেঞ্চিতে বসিয়া রহিল। পণ্ডিত মহাশয় আসিতেই লালমোহন ও প্যারীমোহন অসঙ্কোচে তাঁহার কাছে গিয়া চেয়ারের দুই পাশে দুই জনে দাঁড়াইল। পণ্ডিত মহাশয় একবার দুইজনের গায়ে,হাত বুলাইয়া দিতেই, দুইজনের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ক্ষণেক পরে লালমোহন বলিল, "পণ্ডিত মশায় আজ আমরা দেশে যাব।" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "যাও বাবা দেশে যাও, ভালয় ভালয় পৌছোও। বাবা, রাগ বড় চণ্ডাল—তোদের অনেক মেরেছি, সে সব কথা ভুলে যাস্; ভাল করে' পড়াশুনা করিস্"—আরও কত কি বলিলেন তাহা আমার মনে নাই—তবে বেশ মনে আছে সে দিন পণ্ডিত মহাশয় কাহাকেও একটা চড়ও মারেন নাই। লালমোহন প্যারীমোহন একে একে প্রত্যেকের কাছে আসিয়া "আমরা আজ দেশে যাব" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। আমার কাছে আসিতেই আমি 'ভ্যাঁ' করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। লালমোহন আমাকে কোলে করিয়া "কেঁদোনা সুকুমারী" বলিয়া আদর করিল।

দিনের পর দিন যায়—পূর্ণকে বিশেষরূপে শিক্ষিত করিতে পণ্ডিত মহাশয় মনোনিবেশ করিলেন। প্রহার খাইয়া খাইয়া একদিন পূর্ণ, ঘুমন্ত পণ্ডিত মহাশয়ের টিকি চেয়ারের সহিত বাঁধিয়া দিল—সেদিন পণ্ডিত মহাশয় পূর্ণকে একটা অন্ধকার ঘরে লইয়া গিয়া কি শাস্তি দিলেন জানি না, কিন্তু পূর্ণ সেদিন বাড়ী যাইবার সময় শাসাইয়া গেল—"দেখবো কেমন পণ্ডিত মশাই, তাকে দেশ-ছাড়া করে' তবে ছাড়বো।" পরদিন হইতে আর সে স্কুলে আসিল না।

একদিন হেমা আসিয়া বলিল "কাল আমরা দেশে যাব, আমার বে হবে।" পরদিন হইতে হেমারা দুই বোনে আর আসিল না।

তখন গ্রীষ্মকাল—ভোর ৬ টায় স্কুল বসে, বেলা ১০ টায় ছুটি হয়। পণ্ডিত মহাশয় আর

কাহাকেও জলযোগের ছুটি দিতেন না বা নিজেও ছুটি লইতেন না।

একদিন আমরা কলরব করিয়া যে যাহার পড়া মুখস্থ করিতেছি—একজন সাহেব আমাদের স্কুলে আসিলেন। পণ্ডিত মহাশয় শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতে সেলাম করিয়া বলিলেন, "হুজুর আইয়ে আইয়ে বৈঠিয়ে, হাম ইংরাজী জান্‌তা নেই।" সাহেব টুপি খুলিয়া দুই হাতে নমস্কার করিয়া, হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "মশায় আমি সাহেব নই আমি বাঙ্গালী, আপনার স্কুল দেখতে এসেছি" বলিয়া একখানা চেয়ার লইয়া স্কুলের মাঝখানে বসিলেন।

একটা বড় ঘরের তিন দিকে খান ছয়েক বেঞ্চি পাতা একদিকে একটা বড় ডেস্ক' একটা বোর্ড, পণ্ডিত মহাশয়ের একখানা চেয়ার আর দেয়ালে ম্যাপ—এই আমাদের স্কুল! পণ্ডিত মহাশয় একে একে তাঁহার সব ভাল ভাল ছাত্রদের সাহেবের নিকট লইয়া গেলেন; মেয়েদের মধ্যে ক্ষেমমণিকে লইয়া গিয়া 'খুব ভাল মেয়ে' বলিয়া পরিচয় দিলেন। ভাল ভাল ছেলে মেয়েদের দেখা হইলে সাহেব বেঞ্চির কাছে আসিয়া এক একটি ছেলের বই দেখিতে লাগিলেন—"দেখি তুমি কি পড়, দেখি তুমি কি পড়' বলিয়া কাহাকেও একটা বানান্ জিজ্ঞাসা করিলেন কাহাকেও বা একটু পড়িতে বলিলেন। ক্রমে আমার কাছে আসিয়া মিষ্টস্বরে বলিলেন, "দেখি তুমি কি পড়।" আমি আমার দ্বিতীয় ভাগ তাঁহার হাতে দিলাম—আমার থলির ভিতর কিন্তু 'বোধোদয়' আর 'কবিতাবলী' সর্ব্বদাই থাকিত।

সাহেব। ঈস্! এ যে দ্বিতীয় ভাগ! তুমি এত প'ড়েছ?

আমার পার্শ্ববর্ত্তী একটি মেয়ের বয়স ৮।৯ বৎসর, নাম কালীদাসী, সেও দ্বিতীয় ভাগ পড়িত, সে বলিল "ও বাড়ীতে 'বোধোদয়' আর 'কবিতাবলী' পড়ে, ওর বাবা ওকে পড়ান।" সাহেব আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গো মা, তুমি 'বোধোদয়'ও প'ড়তে পার আবার 'কবিতাবলী'ও পড়? তুমি যে মা সরস্বতী! তোমার নাম কি মা?" আমি বলিলাম "সুকুমারী।" সাহেব হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমার একটি ছেলে আছে তার নাম সুকুমার—তুমি তার সঙ্গে ভাব ক'রবে? তোমাকে দেখলে সে খুব খুসি হবে।" আমি ঘাড় নাড়িয়া "হ্যাঁ" বলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি আমাকে একটা কবিতা মুখস্থ বলিতে বলিলেন; আমি 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল' বলিলাম, তিনি করতালী দিয়া বাঃ বাঃ বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটির বয়স কত? পণ্ডিত মহাশয় একটু মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন "যে সেয়ানা মেয়ে, বয়স ৭।৮ বৎসর না হইয়া যায় না।" সাহেব আমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "না; অত হবে না।" কালীদাসী বলিল "ও এই অগ্রাণ মাসে [illegible] বছরে, প'ড়েছে—ও আমাদের [illegible] বয়সি, আমি জানি।"

সাহেব। তা'হলে সাড়ে চার বছর বয়স—তাই হবে। তোমার বাবার নাম কি সুকুমারী?"

আমি। শিবনাথ মিত্র।

সাহেব। তিনি কি করেন মা?

আমি। তিনি ডাক্তার।

স্কুলের ছুটির ঘণ্টা পড়িল—ছেলেরা ধীরে ধীরে যে যাহার বই গুছাইতে লাগিল।

সাহেব। মশায়, স্কুলটি চলে কি করে'?

পণ্ডিত মহাশয়। বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা চাঁদা করে' চালান।

পণ্ডিত মহাশয় আরও অনেক কথা বলিলেন, সে সব আমার মনে নাই, তবে বড় হইয়া মায়ের কাছে শুনিয়াছি যে, দিল্লি-প্রবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা ছেলে মেয়েদের বাঙ্গালা শিখাইবার জন্য চাঁদা করিয়া ঐ স্কুলটি করিয়াছিলেন—পণ্ডিত মহাশয়কে মাসিক ২০৲ টাকা ও স্কুলের একটা বেহারাকে ৫৲ টাকা মাহিনা দিতেন; স্কুল বাড়ীটা দিল্লির একজন ভদ্রলোক অমনি দিয়াছেন, তাহার ভাড়া দিতে হইত না। পণ্ডিত মহাশয় সেই বাড়ীতেই বাস করিতেন; স্কুলের বেহারাটা তাঁহার কাযও করিত—সেও স্কুল বাড়ীতে থাকিত!

স্কুলের ছুটি হইয়া গেলে, ছেলেরা হৈ হৈ করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল—সবশুদ্ধ ৩০।৪০ জন হইবে। আমি একে নিতান্ত ছোট তাতে মেয়ে মানুষ, আমি অত ছুটাছুটি করিতে পারিতাম না। ছেলেরা বাহির হইয়া গেলে সর্ব্বশেষে আমি বাহির হইয়া [illegible] হাতে শ্লেট ও বই দিয়া ছাতাটি হাতে করিয়া বাড়ী যাইতাম। আমাকে লইতে নিয়মিত চাকর আসিত। আজ চাকরের হাতে শ্লেট বই দেওয়া হইলে, সাহেব-বাবুটি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "সুকুমারী চল তোমাদের বাড়ী যাই।" এতক্ষণ আমি তাঁহার সহিত বড় বেশী কথা কহি নাই—বাড়ী যাইবার কথা শুনিয়া বড়ই আহ্লাদ হইল; দুই হাতে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলাম "বেশ ত চল না।"

সাহেব। কি খেতে দিবে?

আমি। যা রান্না হ'য়েছে।

সাহেব। কি রান্না হ'য়েছে?

আমি মাছের ঝোল আর ভাত আর আলুভাতে আর চচ্চড়ি আর ডাল—(এইখানে একটু ভাবিয়া লইয়া বলিলাম) আর অম্বল আর দুধ।

রান্নার কথা জিজ্ঞাসা করায় আমি ভারি মুস্কিলে পড়িয়াছিলাম, কারণ মা আমাকে দিনের মধ্যে ৪।৫ বার দুধ খাওয়াইয়া পেট ভরাইয়া রাখিতেন, অন্য খাদ্যের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না।

সাহেব। তুমি কি খেতে ভালবাস?

আমি। আঙ্গুর আর পেস্তা।

পথে যাইতে যাইতে অনেক কথা হইয়াছিল, তাহা কি আর সব মনে আছে! এই পর্য্যন্ত মনে আছে যে যখন বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন সাহেব বাবুর সঙ্গে আমার বেশ ভাব হইয়া গিয়াছে, কোন সঙ্কোচ নাই।

আমরা বাড়ীর দরজায় পৌঁছিতেই, বাবা রোগী দেখিয়া টম্ টম হাঁকাইয়া ফিরিলেন। আমাকে একজন সাহেবের হাত ধরিয়া থাকিতে দেখিয়া, অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। আমি সাহেবের হাত দুই হাতে ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম—বাবা কাছে আসিতেই হাত ছাড়িয়া বাবার হাত ধরিয়া বলিলাম, "বাবা ও বাঙ্গালীবাবু"—বাবা কথা

সম্পূর্ণ করিতে না দিয়া বলিলেন "ছিঃ 'ও' ব'লতে নেই, 'উনি'।" আমি কিছু লজ্জিত হইয়া সংশোধন করিয়া লইয়া বলিলাম "বাবা বাবা, উনি বাঙ্গালী বাবু, সাহেব নয়।" বাবা একটু হাসিয়া বলিলেন "নন্।"

আমি। নন্।

সাহেব আমাকে ধরিয়া কোলে তুলিয়া "নন্—'নয়' ব'লতে নেই, 'নন্'" বলিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। তারপর বাবা সাহেবকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গিয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন। আমি স্কুলের কাপড় ছাড়িতে উপরে উঠিয়া গিয়া মাকে বলিলাম, "মা মা, একজন সাহেব-বাবু এসেছে, সে ভাত খাবে।

মা। সাহেব-বাবু কিরে?

আমি। ঠিক সাহেবের মত পোষাক পরা কিন্তু সাহেব নন, বাঙ্গালী-বাবু। মা, সে ভাত খাবে, মাছের ঝোল হ'য়েছে?

মা। ছিঃ 'সে' ব'লতে আছে কি? 'তিনি' বলতে হয়। অত বড় মেয়ে, এখনও কথা কইতে শিখ্‌লে না! সারাদিন লক্ষীছাড়া স্কুলে গিয়ে বসে থাকবে ত সহবৎ শিখবে কি!

আমি তিরস্কার খাইয়া একটু চুপ করিয়া রহিলাম।

মা আমাকে স্নান করাইয়া দিতেছেন, এমন সময় বাবা আসিয়া বলিলেন "ওগো একটি ভদ্রলোক এসেছেন, মাছের ঝোল ভাত খেতে চান, আমাদের মাছ আছে কি?"

মা। এখনো বাজার আসে নাই, দেখি আজ মাছ পাওয়া যায় কি না; সব দিন ত মাছ পাওয়া যায় না।

আমি। মা মা, বাজারে যদি মাছ না পাওয়া যায়, তবে বাজারে সন্দেশ না পেলে তুমি যেমন ঘরে সন্দেশ কর, তেমনি করে মাছ কেন তৈরি কর না।

মা। এ কোথাকার বোকা মেয়ে! হ্যাগা তুমি না বল যে তোমার মেয়ের বড় বুদ্ধি?—মাছ কখনও ঘরে তৈরি করা যায়? মাছ নদীতে ধরে।

ছেলেবেলা যেদিন যেদিন নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জা পাইয়াছি, সেই সেই দিনের কথা আমার খুব মনে আছে।

স্নান করিয়া একটা খুব পরিষ্কার ইজের আর একটা কোর্ত্তা পরিয়া নীচে গেলাম—মা চুল আঁচড়াইয়া একটা টিপও পরাইয়া দিয়াছিলেন।

আমি গিয়া দেখি, সাহেব-বাবু বাবার একটা ধুতি পরিয়া বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন! আমি যাইলে, আমাকে কাছে বসাইলেন। আমি বলিলাম "তুমি বুঝি সাহেব বাবু?" তিনি খুব হাসিয়া আমাকে টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন "মশায় ডাক্তারবাবু, আপনি বড় ভাগ্যবান—দিব্যি মেয়েটি আপনার।"

বাবা। তবু মেয়েটির বুদ্ধির পরিচয় এখনও পান নাই। ঘরে সন্দেশ তৈরির মত, ঘরে মাছ গ'ড়ে দিতে তার মাকে পরামর্শ দিচ্ছিল।

সাহেব। অর্থাৎ যে কোন প্রকারে তার নবাগত বন্ধুকে মাছের ঝোল খাওয়া চাইই।

ভারি হাসাহাসি হইল, আমিও প্রচুর আদর লাভ করিলাম। আহারাদির পর সাহেব-বাবুকে ও আমাকে লইয়া বাবা

টম্‌টমে করিয়া সাহেব-বাবুর হোটেলে' গেলেন; সেখানে আমরা গাড়ীতে বসিয়া রহিলাম, সাহেব নামিয়া গেলেন। একটু পরে এক এক বাক্স আঙ্গুর ও অনেক বাদাম পেস্তা আপেল ও আরও কত কি ফল নিজে হাতে করিয়া আনিয়া আমার কোলে দিলেন।

বাবা। এ সব কি?

সাহেব। সুকুমারী ভালবাসে!

বাবা। কিন্তু ও যে চাপা পড়ে' গেল—এত কেন?

সাহেব-বাবু পুনরায় গাড়ীতে উঠিয়া বলিলেন, "চলুন ষ্টেশনে যাওয়া যাক; চাকরটাকে বলে' এসেছি আমার ব্যাগটা নিয়ে যেতে।

বাবার সহিত সেক্‌হাণ্ড করিয়া, আমার মুখে অনেক অনেক চুমো খাইয়া, রেলগাড়ী চড়িয়া যখন সাহেব রুমাল উড়াইতে উড়াইতে চলিয়া গেলেন, তখন আমার ভারি কান্না পাইয়াছিল। বাবাতে আমাতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও বাবুটি কে গা? সাহেবি টুপি পরেন কেন?"

বাবা। উনি গাজিয়াবাদের রেলের ইঞ্জিনিয়ার—বেশ বড় কায করেন। দিল্লিতে বেড়াতে এসেছিলেন, দুইদিন হোটেলেই ছিলেন, স্কুল দেখতে গিয়ে বেড়াতে বেড়াতে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। আমাদের গাজিয়াবাদে যেতে বার বার করে' বলে' গেছেন। তোমাকে নিয়ে একদিন যাব বলেছি।

আমি। বাবা আমি যাব।

বাবা। সবাই বাড়ী থেকে গেলে চলবে কেন? তোর মাতে আমাতে যাব, তুই বাড়ী থাক্‌বি।

আমি। (মায়ের কাছে গিয়া) মা, আমি শোব কার কাছে?

মা। শুনিস্ কেন ওঁর কথা, উনি ঠাট্টা করছেন! আমি গেলেই তুই যাবি—তুই কি একলা থাক্‌বি?

২

হেমাও আর স্কুলে আসে না, যাত্রা খেলাও হয় না—আমি ক্ষেত্রমণির সঙ্গে জুটিয়া গেলাম। একদিন ক্ষেত্রমণি বলিল, "সবাই যদি একটা করে পয়সা দাও, তবে আমি এক জোড়া তাস কিনে আমার কাছে রাখবো, রোজ স্কুলে আসবো, ছুটির সময় আমরা খেলবো।" আমরা ছয়জনে ছয়টা পয়সা দিলাম। পরদিনে ক্ষেত্রমণি ছোট্ট একজোড়া ময়লা তাস আনিয়া বলিল "এর দাম দু-আনা, আমি নিজে দু-পয়সা দিয়েছি।" কালীদাসী শুনিয়া বলিল "ওমা সে কিলো বলিস্ কি! তুই ঠকেছিস্—আমার যে এমনি একজোড়া তাস আছে তার দাম চার পয়সা। দেখি তোর তাস—মাগো! ময়লা পুরোনো—এ ভাই তুমি ফিরিয়ে দিয়ো।" ক্ষেত্রমণি গম্ভীর ভাবে বলিল আর কি ফিরিয়ে নেয়। আয়না গোলাম-চোর খেলি।"

হেমা যাওয়ার পর হইতে খেলা টেলা কিছু হইত না, অগত্যা সকলে তাস খেলিতে বসিলাম। চোর প্রায় আমিই হইতাম; অন্য সকলে মাঝে মাঝে চোর হইত কিন্তু ক্ষেত্রমণি কখনো চোর হইত না গোলাম

তার হাতে গেলেই সে আমার হাতে চালাইত।

একদিন ক্ষেত্রমণি আমাকে বলিল "সুকুমারী, পুতুলের কাপড় কিন্‌বি? সে জানিত আমি পুতুল খেলিতে ভারি ভালবাসি।

আমি। কোথায় বিক্রী হয়?

ক্ষেত্রমণি। আমায় পয়সা দিস্ এনে দিব।

সেই দিন হইতে বাবার পকেট হইতে হউক আর মার কাছ থেকেই হউক, যেখানে যা পয়সা পাইতাম, ক্ষেত্রমণিকে দিতাম, সে আমাকে এক টুক্‌রা করিয়া ছেঁড়া কাপড় দিত—কোনখানার দাম এক পয়সা, কারো দু পয়সা, কারো বা চার পয়সা। ক্ষেত্রমণি বলিয়া দিয়াছিল 'ইস্কুলের মেয়েদের দেখাস্‌নি, তাহলে তারাও চাইবে, ও বেশী পাওয়া যায় না। আর তোর মাকে দেখাস্‌নি, মা ব'কবে।" ভয়ে কাহাকেও কিছু বলি নাই।

একদিন মা আমার পুতুলের বাক্স দেখিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে, তুই এ সব টুক্‌রো টুক্‌রো ন্যাক্‌ড়া কোথা পেলি? একটু ঢাকাই কাপড় ছেঁড়া, একটু নীলাম্বরী ছেঁড়া—এ সব কে দিলে তোকে?"

আমি। (ভয়ে ভয়ে) ও সব আমি কিনেছি মা।

মা। কোথা থেকে কিন্‌লি?

আমি। আমাকে ক্ষেত্রমণি কিনে এনে দেয়।

মা। ক্ষেত্রমণি কিনে এনে দেয়! এর দাম কত? এখানার দাম কত?

আমি সমস্ত বলিলাম।

মা। রোস'—তোমার ক্ষেত্রমণির কাছে পুতুলের কাপড় কেনা বার করছি। একটা লক্ষ্মীছাড়া স্কুল, অনামুখো পণ্ডিত, মিথ্যাবাদী সব মেয়ে, সেইখানে দেওয়া হয়েছে মেয়েকে লেখাপড়া শিখতে!

মা গজ্ গজ্ করিয়া বকিতেছেন—বাবা আসিলেন; বলিলেন, "কি হয়েছে? এত গর্জ্জন কেন?"

মা। তোমার মেয়ে সওদা করেছে দেখ—পুতুলের কাপড় কিনেছে।

তার পরদিন হইতে আমার স্কুল যাওয়া বন্ধ হইল। ক্ষেত্রমণির সঙ্গে আর দেখা হইত না। বাবা কোথা হইতে এক মাষ্টার জুটাইয়া আনিলেন, তিনি নিজে স্কুলে পড়িতেন ও আমাকে পড়াইতেন, আমাদের বাড়ীতেই থাকিতেন। তিনি নিজের পড়া মুখস্থ করিতেন, আমি বই হাতে করিয়া তাঁহার কাছে গিয়া বসিতাম, তিনি বইয়ের একটা স্থান দেখাইয়া দিয়া বলিতেন, "পড়"—আমি পড়িতাম; কিছু জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "আমি প'ড়ছি, আমাকে বিরক্ত ক'রো না।" বাবার কাছে যাহা শিখিয়াছিলাম ক্রমে তাঁহা ভুলিতে লাগিলাম।—এইরূপে আমার বিদ্যালাভ হইতে লাগিল।

শুভবিবাই রচয়িত্রী।

কোজাগর পূর্ণিমা।

এত হাসি এত সুধা আনন্দ উৎসব,
এত আলো মেঘ-মুক্ত বঙ্গের আকাশে,
প্রকৃতির এ বিদ্রূপ বিকট বিভব,
আর নাহি লাগে ভাল কাঙ্গালের দেশে ;

চাহি শুধু অমা নিশা, অন্ধ তমোময়,
ঢাকিবারে অন্নক্লিষ্ট মলিন এ মুখ।
দরিদ্র বাঙ্গালী গৃহে প্রমোদ উচ্ছ্বাস,
শ্মশানে আনন্দ-গীতি, কেন এ কৌতুক ?

তুমি না হে শশধর ! যুগ যুগান্তের
আর্য্যের পূজিত সখা দেবতা শোভন ?
কোন্ প্রাণে কোন্ মুখে দরিদ্র দেশের
উন্মুক্ত করিতে এলে জীর্ণ গৃহ কোণ ?

আমরা বহিয়া ক্ষীণ জীবনের আলো,
অতিথি হইয়া আছি শ্মশানের দ্বারে।
অত হাসি আর হেথা নাহি লাগে ভাল,
পড়ে আছি, পড়ে রব, এ চির-আঁধারে।

কার পূজা আজি দীন বঙ্গের কুটীরে ?
দুর্ভিক্ষের হাহাকার প্রতি শব্দ আজি
লক্ষ্মীরে বিদ্রুপ করি প্রতি ঘরে ঘরে
সহস্র করুণ-কণ্ঠে উঠিতেছে বাজি।

তুমি লক্ষ্মী নহ আর বঙ্গের জননী,
ধন ধান্তে ভরা তব শ্যামল অঞ্চল
পাতিয়াছ বঙ্গ-গৃহে, চঞ্চলা রমণী !
লইযারে দেশান্তরে যা কিছু সম্বল !

তথাপি এ ভক্তদের হৃদয় শোণিত,
কাতর করুণ ভাবে চরণ তোমার
কোজাগরী পূর্ণিমায় করিবে রঞ্জিত।
—বর দেও হে বরদে ! করিছি চীৎকার।

কর্ণ নাহি শুনিবার ? নিষ্ঠুর পাষাণ !
কিছু নাহি দিতে হেথা ? শস্য নাহি ঘরে ?
আমরা কি সত্য তব সপত্নী সন্তান
পথ প্রান্তে পড়ে রব ঘৃণা অনাদরে !

ধরিত্রী আমার গৃহে শস্যের ভাণ্ডার ;
আমার মেদিনী গর্ভে কত রত্ন ধন ;
আমাদের মুষ্টিভিক্ষা ! কভু অনাহার !
অভুক্ত সন্তানদের কাতর ক্রন্দন !

অয়ি লক্ষ্মি ! জানি তোমা ভীম বাহুবলে
জগতের নানা জাতি নানা রূপে হরি,
বাঁধিয়া রেখেছে আজি সুবর্ণ শৃঙ্খলে
লৌহ কারাগার মাঝে অবরুদ্ধ করি।

বুঝেছি মা ! আজি এই দারুণ সংগ্রামে,
দেবতাও নহে তুষ্ট পূজা অর্ঘ্য দানে,
আপনার বাহুবল যে করে বিস্তার
তুমি লক্ষ্মী দাসী হও চরণে তাহার।

শ্রীঊর্ম্মিলা

বারাণসী-অভিমুখে।

১০

স্থৈর্য্যনাশ।

"মনস্‌ :—সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দের অর্থ—এমন একটি পদার্থ যাহা আমাদের চতুর্দ্দিকে বিকীরিত হইতেছে—ব্যাপ্ত হইতেছে—অথচ উহার এমন কোন পৃথক সত্তা নাই, যাহা চিরকাল অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। উহার কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে।..."

বিহঙ্গ-পরিসেবিত সেই ক্ষুদ্র গৃহের নীরবতার মধ্যে আমার দীক্ষাদাত্রী আমাকে এইরূপ বলিলেন। সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা সামান্য তক্তার উপর, মুখামুখী হইয়া আমরা দুজনে উপবিষ্ট।

তাঁর উপদেশে কেমন একটা একগুঁয়েমি ভাব আছে;—কিন্তু সেই উপদেশ একদিকে যেমন অনম্য কঠোর, তেমনি আবার কারুণ্য-রসসিক্ত; এই উপদেশের প্রভাবে আত্মার পৃথক সত্তার ধারণা আমার মন হইতে যেন ক্রমশঃ অপসারিত হইতে লাগিল; যাহাদের আমি ভালবাসি, আমার আত্মীয় স্বজন, অপর লোক, আমি স্বয়ং—সমস্তই ধ্বংস হইতে চলিল; কতকগুলি ক্ষুদ্র অংশ একই সমষ্টি হইতে ক্ষণকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; পরে, কাল-চক্র যখন আবার আবর্ত্তিত হইবে, তখন ঐ সকল অংশ, সেই অক্ষয় অক্ষুণ্ণ মহাসমষ্টির অতল গর্ভে আবার আসিয়া চিরতরে নিমজ্জিত হইবে! "একদিন ঈশ্বরের ক্রোড়ে গিয়া আবার তোমরা পুনর্ম্মিলিত হইবে"—বাইবেলের এই অস্পষ্ট ও মধুর আশ্বাস-বাণীর ইহাই সুস্পষ্ট ও বিষাদময় ব্যাখ্যা।

যাহারা আমাদের ভালবাসার জিনিস তাহাদের পৃথক্ সত্তা স্থায়ী হইবে—ইহা একটা মায়া বিভ্রম মাত্র; তাহাদের হাসি, তাহাদের দৃষ্টি, অন্য হইতে যাহা কিছু তাহাদের বিশেষত্ব, তাহাদের অমর আত্মার যে একটু ছায়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, আত্মারই মত যাহাকে আমরা নির্ব্বিকার ও অবিনশ্বর বলিতে ইচ্ছা করি—এ সমস্তই মায়া-বিভ্রম। মানব-জীবনসম্বন্ধে খৃষ্টানদের যে ধারণা, এতদিন সেই ধারণাকে আমি প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলাম—আমার মমতাময় মানব-হৃদয়ের নিকট যাহা অতীব বীভৎস-জনক বলিয়া মনে হইয়াছিল সেই মতবাদকে পরীক্ষা করিয়া দেখাও হেয়জ্ঞান করিয়াছিলাম; অবশেষে, মাদ্রাজে, ঐ মতবাদকে আমি একবারেই অগ্রাহ্য করি; অবশ্য মাদ্রাজে, ঐ মতবাদটি বৌদ্ধধর্ম্মের আরও নির্ম্মম নিষ্ঠুর আকারে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন দেখ, যে

মতবাদ কোন্ পুরাকালে আমাদের রহস্যময় পূর্ব্বপুরুষেরা পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন, আমার দীক্ষাগুরু সেই সমগ্র মতবাদটি একটু একটু করিয়া ক্রমশ আমার উপর চাপাইয়া দিয়াছেন; এবং অনেক অবর্ণনীয় ভয়-আশঙ্কার পর, এখন দেখিতেছি আমার দীক্ষা-গুরুর উপদেশের মধ্যে যে টুকু সান্ত্বনা পাওয়া যায় তাহাতেই অগত্যা আমাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

এই উপদেশের ফলে,—তত্ত্বজ্ঞানীদের ধ্যান-লব্ধ বিচ্ছেদ-তত্ত্বটি আমার অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে সকল প্রিয়জনকে আমি হারাইয়াছি তাঁহাদের স্মৃতির সহিত এখন আর যাতনাময় জিজ্ঞাসা সংযুক্ত নাই। অবশ্য তাঁহারা জীবিত আছেন, কিন্তু পীড়নকারী ও মায়াময় আমিত্ব হইতে তাঁহারা প্রায় বিযুক্ত। দূর ভবিষ্যতে তাঁহাদের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইব কিংবা আরও ঠিক করিয়া বলিতে গেলে—তাঁহাদের সহিত একেবারে মিশিয়া যাইব—এই কল্পনাটি এখন আমি মানিয়া লইয়াছি। এইরূপ যে মিশিয়া যাইব, তাহা মৃত্যুর পরক্ষণেই নহে, কিন্তু হয় ত যুগ-যুগান্তরের পর। তাছাড়া, এই যুগ-যুগান্তর কালও বিভ্রমাত্মক,—সুতরাং উহার সহিত বর্ত্তমান জন্মের ক্ষণিক জীবনের যতটুকু সম্বন্ধ সেইটুকু কালই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

আমি জানি, এই সন্ন্যাস বৈরাগ্যের ভাব চলিয়া যাইবে; এই তত্ত্বজ্ঞানীদের গূঢ় প্রভাব হইতে দূরে সরিয়া গেলেই, আবার আমি জীবন পাইব, কিন্তু পূর্ব্বেকার মত নহে; আমার আত্মার অন্তরের মধ্যে যে বীজ উপ্ত হইয়াছে, তাহা অঙ্কুরিত হইয়া আবার আমার জীবনকে আচ্ছন্ন করিবে,—সম্ভবত আবার আমাকে বারাণসীতে ফিরিয়া আনিবে। এতদিন পৃথিবীতে যে কাজ করিয়াছি, যে ভাবে জীবন কাটাইয়াছি, এখন তাহার দীনতা ও ব্যর্থতা উপলব্ধি করিতেছি; রূপ ও রঙে আমি উন্মত্ত ছিলাম, পার্থিব জীবনে যারপরনাই মুগ্ধ ছিলাম; যাহা কিছু ক্ষণভঙ্গুর তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে—যাহা কিছু অস্থায়ী তাহাকে ধরিয়া রাখিতে, আমার প্রাণ-পণ চেষ্টা ছিল।

আজ রাত্রে আমি তত্ত্বজ্ঞানীদের গৃহ হইতে চলিয়া যাইব; উহার বাহ্য আকর্ষণে আমি চিরমুগ্ধ—না জানি আবার কোন্ দিন উহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইব।

লক্ষ্যহীন হইয়া বারাণসী নগরে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে, এইবার দৈবক্রমে নর্ত্তকী ও বেশ্যাদিগের অঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছি। বাড়ীর নীচের তালায় অসংখ্য ছোট ছোট দোকান; সেখানে চুম্‌কি-বসানো মল্‌মল, জরির মল্‌মল, রংকরা মল্‌মল বিক্রীত হইতেছে; দোকানীরা এই মাত্র প্রদীপ জ্বালিয়াছে। রাস্তার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত বাড়ীর উপর তালাগুলি সোহাগ-লালিতা তিমিরাশ্রিতা ললনাদের বাস-স্থান; নৈশ বেশ্যাবৃত্তির জন্য উহারা অত্যুজ্জ্বল বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, গবাক্ষের সম্মুখে, ব্যরণ্ডার ধারে বাহার দিয়া বসিয়াছে; পশ্চাদ্ভাগে উহাদের দীপালোকিত ঘরগুলি দেখা যাইতেছে, শিশু-রুচি-সুলভ প্রাচুর্য্য সহকারে অসংখ্য ঝাড়লণ্ঠন কড়িকাঠ হইতে ঝুলিতেছে। ঘরের চুনকাম-করা শাদা দেয়ালে গণেশের চিত্র, হনুমানের চিত্র, কিংবা

রক্তাপ্লুতা কালীর চিত্র রহিয়াছে। বেশ্যা-দিগের নগ্ন বাহুতে, কর্ণযুগলে, নাসারন্ধ্রে,—বলয়াদি ও বিবিধ রত্নরাজি ঝিকমিক করিতেছে। তীব্রগন্ধী পুষ্পমালা বহু-স্তবকে বক্ষের উপর ঝুলিতেছে। প্রভাতে গঙ্গাতীরে যে সকল অনধিগম্যা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে দেখা যায় তাহাদেরই মত ইহাদের একই প্রকার মখমল-কোমল নেত্র, বোধ হয় তাহাদেরই মত একই প্রকার উজ্জ্বল শ্যামল গাত্র,...সহসা বিভ্রম জন্মিতে পারে...

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রেখাক্ষর বর্ণমালা।*

রেখাগণের মেলা-মেশা।

দাঁড়িতে কসি, কসিতে দাঁড়ি।
অসমে পিরিতি, সমানে আড়ি॥

দাঁড়িতে কসি　　　　কসিতে দাঁড়ি

খগ　বনগজ　　　　রজক　জলগজ

দা'এ সাজে দাঁড়ি, অসিতে কসি।
দিনে যথা রবি, রাত্রে শশী॥

অসিতে অসি, দাত্রে দাত্র।
সমান পাত্রে সমান পাত্র॥

অসিতে অসি　　　　দাত্রে দাত্র

সরল　　　　ভয়হর

দাত্রে দাঁড়ি　　　　অসিতে কসি

পলক　নলক　　　　রজত　রক্ষক

দাঁড়ি-সিপাহীর অসি পছন্দ।
কসিতে দাত্র সাজে না মন্দ॥
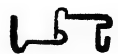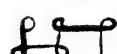
দন্ত-দাঁড়ি দু'ভাই সাবাস বীর।
ঢেউতরী-বাণে দাঁড়ায় স্থির॥

* বিশেষ মন্তব্য। স্ক্রু মোটা সব জায়গায় ঠিক হয় নাই।, দুই একস্থানে রেখারও একটু আধটু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। পাঠক ঠিক করিয়া লইবেন। পুস্তকাকারে বাহির করিবার সময় সমস্ত ঠিক করিয়া দেওয়া হইবে।

	দা		দাঁড়ি	
ঢেউ তরীতে	বল	কবল	বক	কতক
বাণে	নল	কমল	নখ	কনক

(১) দাঁড়িতে কসিতে মেলা-মেশা।

	শুদ্ধ	নোখো
অদ্ধ	গককগক	ঘথথঘথ
চোকো	জচচজচ	ঝছছঝছ

(২) দাঁড়িকসিতে বাণে মেলা-মেশা।

	শুদ্ধ				নোখো			
অদ্ধ	গতক	তকদ	কগত	তককন	ঘথথ	থথধ	থঘথ	থথঘন
চোকো	জপচ	পচব	চজপ	তচচব	ঝফছ	ফছভ	ছঝফ	ফছঝভ

(৩) দাঁড়িকসিতে তরিতরঙ্গে।

	শুদ্ধ		নোখো	
অদ্ধ	কনকমক	গগমককন	থণথঙক	ঘঘঙথথণ
চোকো	চটচঢ়চ	জজঢ়চচট	ছঠছঢ়ছ	ঝঝঢ়ছছট
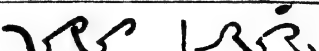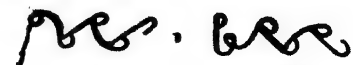
(৪) ঢেউতরীবাণে ঢেউতরীবাণে।

	শুদ্ধ		নোখো	
অদ্ধ	ততমনত	দমনতত	থথঙণথ	ঘঙণথথ
চোকো	পপডটপ	বড়টপপ	ফফঢঠব	ভঢঠফফ

(৫) দাঁড়িকসিতে অসিদাত্রে

	শুদ্ধ		নোখো	
অদ্ধ	গয়গয়কয়	যকরক	ঘলঘহথহ	হথলথ
চোকো	জসজশচস	শচসচ	ঝষঝক্ষছক্ষ	ক্ষছষছ

(৬). বাণে অসিদাত্রে।

	শুদ্ধ		নোখো	
অদ্ধ	যতবত	করদরত	হথহথ	খলথলথ
চোকো	শপশপ	চসবসপ	ক্ষকক্ষক	ছষভষক

(৭) তরিতরঙ্গে অগিদাত্রে।
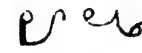
	শুদ্ধ		নোখো	
অন্ধ	য়নরম	করনয়ন	হণরঙ	খলণহণ
চোকো	চসটশট	শটসড়	ক্ষঠষঢ়	ছষঠক্ষঠ

(৮) অসিতে অসিতে দাত্রে দাত্রে।

	শুদ্ধ		নোখো	
অন্ধ	যরয়	কতযরর	হলল	কতহলল
চোকো	শসস	কতশসস	ক্ষহহ	কতক্ষহহ

অকারান্ত পদাবলী।

পবনচপল জল টলটলটল

ঠণঠণ কলস কমল টলমল

ঝরখত ঝমঝম গরজত ঘন

সরস হরষবশ ডগমগ মন

জলচর খংগদল বরণবরণ

কনকরজতছদ নয়নহরণ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মনীষা।

[মিশ্রকাব্য]

তৃতীয় সর্গ।

শুক্র তারা শিরে পরি' নামিল প্রভাত ধীরে ধীরে
সুবর্ণ হিল্লোলে বিশ্ব ফুটাইয়া নিবিড় তিমিরে।
আমরা ত্যজিয়া শয্যা যত্নে সাজাইয়া এ উহারে
নামিলাম সভাগৃহে—তখনও সুবর্ণ ফুৎকারে
সর্ব্ব কক্ষ ভরে নাই পূরব-সুন্দরী। রবি রেখা
ঊর্দ্ধস্থিত কলা-মূর্ত্তি-মুখ-রাজি 'পরে মাত্র দেখা
দিল রাঙা অনুরাগে।

দাঁড়াইয়া মোরা ফোয়ারার
পার্শ্বে যেন হেরিতেছিলাম শুভ্র রজত উৎসার,—
সহসা আসিল বেণা নিদ্রাশূন্য বিবর্ণ বদনে.-
পড়েছে কালিমা রেখা অশ্রুভরা নয়নের কোণে।
"পলাও পলাও তূর্ণ" কহে ভয়রুদ্ধ কণ্ঠস্বনে—
"দিদি জেনেছেন সব"—জিজ্ঞাসিনু "জানিলা কেমনে ?"
"বুঝি সে আমার দোষে"--তিতিল বালিকা আঁখি লোরে :
"পূর্ণ দোষী নহি তবু, ক্ষমা কর ক্ষমা কর মোরে।
শুন আনুপূর্ব্ব কহি। ধারা আছে দিদির কেমন
বিদ্রূপে বিদ্রূপে বিঁধি' চন্দ্রারে করিবে জ্বালাতন
নিশি নিশি। কেবলই বলিবে 'মনীষা হেথাকার
মাথা—দোহে মোরা দুই বাহু তাঁর'; ছিল আগেকার
এমনিই বোঝাপড়া—বিপরীত নেহারি এখন,—
চন্দ্রাই দক্ষিণ হস্ত সর্ব্বময়ী—আমি অযতন-
ত্যক্ত বাম হস্ত সম—লাগি মাত্র দু'চারিটা কাজে,—
চন্দ্রা সর্ব্ব স্নেহ জুড়ি' অধিকাংশ ছাত্রী-ল'য়ে আছে।'
তোমা সবে উদ্দেশিয়া গত রাত্রে নিন্দিল অপার,—
'রাণীর দেশের নারী—কিছু নাই কিন্তু প্রশংসার ;
এমন কর্কশ আমি দেখিনিত বাপার জনমে,—
নারীত্বের বিন্দু যদি থাকে! দেখিলে পুরুষ ভ্রমে

চিত্ত মোর উঠে শিহরিয়া।' অমনই তত্ত্বকথা
সর্পিনীর মত জাগে ফণা তুলি কহিতে বারতা
মোর মর্ম্ম হ'তে। বক্ষ যেন বিদীর্ণ হইতে চায়;—
হে মান্য অতিথি জন! গণ্ডে মোর রক্তিম আভায়
ফুটিল গোপন কথা বুঝি। তাহে দিদির নয়ন
আরো তীব্র দৃষ্টিপাতে দুর্ব্বল করিল মোর মন;
হাসিয়া কহিল দিদি—'এত লজ্জা কেন বেলা তোর?
'পুরুষের মত নারী'—এ কথায় তুই কেন ভোর
হয়ে গেলি লজ্জা আর ত্রাসে এমন করিয়া বল?
ঠিক পুরুষের মত,—পুরুষ ইহারা অবিকল;—
তবুও চন্দ্রার সনে গোপনে রহিল বহুক্ষণ।"
প্রকাশিল অবশেষে গুপ্ত-কথা এ মোর বদন
একে একে—'পুরুষ সত্যই এরা।' 'জানিস্ তা'হলে
তুই?'—'না না মোরে সুধায়োনা কিছু।' দিদি পুনঃ ছলে
কহিল 'জানিয়া কথা গোপন রাখিতেছিস্।' করি'
এমনই চতুরতা, দিদি সত্য কথাটি আহরি'
নিল মোর বক্ষ হ'তে,—অথচ কহিনি কোন কথা।
এই মাত্র শয্যা ত্যজি গিয়াছে রাজ্ঞীরে এ বারতা
দিতে। ঘুচিবে চন্দ্রার দর্প—কিন্তু এ বিপদ হ'তে
তোমাদের উদ্ধার সাধন হতে পারে কোন মতে।
এই অবসরে কর পলায়ন।—কিন্তু চিত্ত মম
অনুতাপ-বিদ্ধ জর-জর;—শান্ত কর সুধোপম
ক্ষমা বর্ষি।" "আবেগে রাঙিয়াছিল গণ্ড দুটি তোর
ক্ষমা চাস্ তাই মুগ্ধমুখী? হউক না কেন ভোর
মোদের জীবন নিশি দিব্য রক্তারুণ সু-প্রকাশে
ওই শুভ্র গণ্ডে তোর। ভিক্ষা মাগি শুভে! তোর পাশে—
এত শীঘ্র করিস্‌নে মোদেরে আনন্দ স্বর্গচ্যুত
ত্রিশঙ্কুর আত্মা যথা স্বর্গদ্বারে উঠিয়াই দ্রুত
নেমে গেল কক্ষচ্যুত তারা সম। পাষাণীর প্রাণ
গলায়ে কারুণ্যরসে অনুমতি ল'য়ে অবস্থান
করিব হেথায় আরো।" নিকুঞ্জ কহিয়া এ বচন
কোথায় চলিয়া গেল মুহূর্ত্তেকে চঞ্চল-চরণ।

ক্রমশঃ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

ভারত মহিলা

তৃতীয় বর্ষ।

শ্রীমতী সরযূবালা দত্ত-সম্পাদিত উৎকৃষ্ট স্ত্রীপাঠ্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা। বৈশাখে (১৩১৪) তৃতীয় বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিমাসে তিন চারিখানা সুন্দর স্বতন্ত্র মুদ্রিত হাফ্‌টোন্ ছবি যাইতেছে। ভারত-মহিলার লেখকলেখিকাগণ :—

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী, মানকুমারী, কামিনী রায় বি, এ, মিসেস্ আর, এস, হোসেন, লাবণ্যপ্রভা বসু, হেমলতা দেবী, রাজকুমারী দাস এম, এ, সরোজকুমারী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ, কুমুদিনী মিত্র, বি, এ, প্রভৃতি সুলেখিকাগণ; এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, হরিদেব শাস্ত্রী, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র (সঞ্জীবনী সম্পাদক) রজনীকান্ত গুহ এম্, এ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, প্রভৃতি বহু সুলেখক। ইহাদের সকলের লেখা ভারত-মহিলায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক সাহিত্য-সম্পাদক সাহিত্যে লিখিয়াছেন :—

ভারত মহিলার কল্যাণকল্পে ভারতমহিলার সৃষ্টি। সম্পাদিকা অল্পদিনের মধ্যে লক্ষ্যের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। প্রথম বৎসরেই "ভারতমহিলা" প্রবন্ধ সম্পদে যেরূপ গৌরবান্বিত হইয়াছেন, নূতন মাসিকের অদৃষ্টে সেরূপ সৌভাগ্য প্রায় ঘটে না। • • সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, সম্পাদিকার সাহিত্য-সাধনা সফল হউক। ভারতমহিলা বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বিরাজ করুক।

প্রবাসী বলেন :—এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রখানি বঙ্গনারীগণের জন্য গত (১৩১২) ভাদ্রমাস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বেশ ভাল লেখা থাকে। সম্পাদন কার্য্যও বেশ হইতেছে।

বসুমতী বলেন :—এই মাসিক পত্রিকাখানি বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। মহিলাপরিচালিত এই পত্রিকাখানি ক্রমেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

সুকবি মানকুমারী বসু—(সম্পাদিকার নিকট লিখিত পত্রে)—আপনার ভারত-মহিলা আমাদের গৌরবের সামগ্রী বটে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ দুই টাকা চারি আনা মাত্র। নমুনা চারি আনা। বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয় না।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত।

বঙ্গদর্শন।

অন্নকষ্ট।

মনুষ্যজীবনের পক্ষে দুইটী বিশেষরূপে প্রয়োজন—শিক্ষা ও অন্ন। অন্নের জন্য শিক্ষা চাহি। শিক্ষার জন্য অন্ন চাহি। এ দুইটীই আমাদের দেশে বিশেষ অভাব। এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ বর্ত্তমান অন্নকষ্টের বিষয় আলোচনা করিব। কিন্তু আলোচনা করার পথে অনেক কণ্টক। কোন বিষয় লিখিতে হইলে তৎসম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় সংবাদ অবগত হওয়া আবশ্যক। অন্নকষ্ট সম্বন্ধে আমাদের দেশে ঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা নিতান্ত কঠিন। দেশ আমাদিগের বটে, কিন্তু আমরা স্বদেশের বড় একটা সংবাদ রাখি না, যা কিছু সংবাদ রাখেন বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট। আমরা স্বদেশী কিন্তু স্বদেশের তথ্য জানিবার জন্য ততটা ব্যস্ত হইনা, যতটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গময়ী বক্তৃতা এবং সুললিতপদবিন্যাস-মধুর প্রবন্ধ লিখিবার জন্য ব্যাকুল। অধিকাংশ উগ্র "স্বদেশী"কে জিজ্ঞাসা করুন "যে গ্রামে তোমার জন্ম বা বাস সে গ্রামের জমির খাজনা কত করিয়া দিতে হয়, কোন রকম জমীতে বিঘা প্রতি কত শস্য হয়, তোমার গ্রামে কম বেশী আবাদী জমী কত বিঘা আছে, প্রতি বিঘাতে এক্ষণে কত ধান জন্মে,"—ইত্যাদি অতি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন, অনেক "স্বদেশী"ই তাহার উত্তর দিবার জন্য ঊর্দ্ধে গগনমার্গে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবেন; অথবা মস্তিষ্ক উত্তেজনা করিবার জন্য মস্তক কণ্ডূয়ণ করিবেন। একজন "স্বদেশী"র কথা কেন বলি—একজন উপাধিধারী শিক্ষিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন যে,—"শস্যের যে মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, ইহাতে কোন্ কোন্ শ্রেণীর ক্ষতি হইতেছে, অথবা অধিক ক্ষতি হইতেছে; তৎসম্বন্ধে কোনও প্রমাণ পাইয়াছেন কি?" দেখিবেন, তিনি কি গভীর "না-ভাবি-সাগরে" ডুবিয়া যাইবেন, অথবা কল্পনার ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া, শূন্যমার্গে উড্ডীন হইয়া, অচিরাৎ ভ্রান্তির অতল সাগরে পতিত হইবেন।

"অন্নরক্ষিণী সভা"র প্রথম অধিবেশনের পূর্ব্বদিন "বঙ্গবাসী"র কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাকে সেই অধিবেশনে উপস্থিত হইবার জন্য অনুগ্রহ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈবসংযোগ বশতঃ আমি সেই দিন কলিকাতায় থাকিতে না পারায়, উপস্থিত হইতে পারি নাই। এবং সেখানে দেশের যে সকল গণ্য-মান্য মহারথী মহাপণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মন্তব্য অবগত হইবার সমীচীন

সুবিধা পাই নাই। কিন্তু তাহার পূর্ব্বদিন যখন বঙ্গবাসী আপীসে ঐ বিষয় কথাবার্ত্তা হয়, তখন দুই একটী বন্ধুর সহিত যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছিল। তাহার একটু আভাস এখানে দিলে আমি উপরে যাহা বলিয়াছি তাহার একটা দৃষ্টান্ত মাত্র প্রদর্শিত হইবে।

একটী শিক্ষিত ভদ্রলোক অন্য একটী শিক্ষিত ভদ্রলোককে বলিলেন "মহাশয় আপনি এ বিষয় বোধ করি আলোচনা করিয়াছেন। আপনার মত কি?

২য় ভদ্রলোক। আমি বর্ত্তমান অন্নকষ্ট সম্বন্ধে মত দিতে সাহস করি না, কেন না আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করা নিতান্ত কঠিন।

১ম। কেন মহাশয়? সংবাদ ত চারি দিক হইতে পাওয়া যাইতেছে। চারি দিকেই দিন দিন চাউলের মূল্য অধিক হইতেছে। সেটা কি আমাদের দেশের লোকের বিশেষ কষ্টের কারণ নহে।

২য়। যদি মানিয়া লওয়া যায়, পূর্ব্বে যে পরিমাণে শস্য হইত, এক্ষণেও সেই পরিমাণে শস্য হইতেছে, আর শস্যোৎপাদকের সংখ্যা পূর্ব্বের অপেক্ষা বিশেষ বৃদ্ধি হয় নাই, তাহা হইলে ইহাও মানিয়া লইতে হইবে যে, শস্য মহার্ঘ হওয়াতে, শস্যোৎপাদক অর্থাৎ কৃষিজীবী লোকের ক্ষতি হইতেছে না, বরঞ্চ লাভ হইতেছে। আর যদি কৃষকদিগের পূর্ব্বাপেক্ষা লাভ হইতেছে এ কথা সিদ্ধান্ত হয় তাহা হইলে জমীদারগণেরও পূর্ব্বাপেক্ষা লাভ হইতেছে মানিতে হইবে। কারণ কৃষকেরা টাকা অধিক পাইলে জমিদারের খাজনা ভাল আদায় হয়, এমন কি হাল বকেয়া সমুদয় খাজনা আদায় হইয়া যায়। আমার একটী জমীদার বন্ধু আছেন। তাঁহার জমীদারীতে অনেক টাকা বাকী-বকেয়া পড়িয়াছিল। এই সনে তাঁহার জমীদারি হইতে হাল বকেয়া প্রায় সমুদয় টাকা আদায় হইয়াছে। তাঁহার প্রায় এক লক্ষ টাকা দেনা ছিল তাহা এইবার শোধ গিয়াছে। অন্যান্য অনেক জমিদারেরও ঐরূপ। শস্য-মূল্য-বৃদ্ধিতে লাভ হইবার সম্ভাবনা। শস্য-মূল্য-বৃদ্ধিতে কৃষক ও জমিদারগণের ক্ষতি বা কষ্ট হইতেছে না, লাভ বা সুবিধা হইতেছে। দেশের অধিকাংশ লোক কৃষক। সুতরাং শস্য-মূল্যবৃদ্ধিতে দেশের অধিকাংশ লোকের লাভ ও সুবিধা হইতেছে।

১ম। কিন্তু মহাশয় যে সকল ভদ্রলোক নির্দ্দিষ্ট বেতনে চাকরী করে, তাহাদেরত কষ্ট হইতেছে।

২য়। তাহাদের কষ্ট হইলে, এই বুঝিতে হইবে, ধনের নূতন বণ্টন হইতেছে। পূর্ব্বে ভদ্রলোকেরা অশন বসনের জন্য যে টাকা আবশ্যক তাহা ব্যয় করিয়া, যে টাকা উদ্বৃত্ত হইত, তাহা সৌখীন দ্রব্যে ব্যয় করিত। এখন শস্য-মূল্যবৃদ্ধি হেতু ঐ সকল ভদ্রলোক সৌখীন দ্রব্য ব্যবহার করিতে পায় না, স্ত্রীকে স্বর্ণালঙ্কার বাণারসী শাড়ী দিতে পারে না, পাচক ও ভৃত্য রাখিতে পারে না। কিন্তু যে সকল কৃষক আধপেটা খাইত, তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়াছে। যে শস্য বিনিময়ে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়া, রমণার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তারাহাররূপে বৃথা দুলিত ও ঝলকিত, কখন বা কোমল রমণীদেহে ফুটিত, ও অসচ্ছলতাহেতু রজনীতে পরিত্যক্ত হইয়া লজ্জায় উপাধাননিম্নে মুখ ঢাকিত, সেই শস্য বা অর্থ

স্বর্ণ, গর্ব্বিত নারীকণ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া, কুটীরে, যেখানে পূর্ব্বে ছিল, যারা তাহাদের জন্মদাতা তাহাদেরই তীব্র ক্ষুধানল নির্ব্বাপিত করিয়া, তাহাদিগের জীবন রক্ষা করিতেছে। ইহাতে স্বদেশপ্রেমিকের বা মানববৎসলজনের ক্রন্দন বা আক্ষেপের কারণ দেখি না।

১ম ভদ্রলোক। আচ্ছা মহাশয়, তাহা হইলেও যে সকল গরিব লোক প্রতিদিন খাটিয়া খায় অর্থাৎ ছুতার মিস্ত্রি রাজ তবলদার প্রভৃতি দরিদ্র লোকের ত শস্য-মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় বড় কষ্ট হইতেছে। এ কথাটা ত আপনি অস্বীকার করিতে পারেন না।

২য় ভদ্রলোক। সহসা স্বীকার করিতেও পারি না। তাহাত পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি, প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে না পারিলে তথ্য নির্ণয় করা যায় না।

১ম ভদ্রলোক। এ বিষয় আপনার কি মুস্কিল বাধিল বুঝিতে পারিলাম না। যে মজুরি তাহারা পূর্ব্বে পাইত, এখনও সেই মজুরি প্রতিদিন পাইতেছে, অথচ শস্য মহার্ঘ হইয়াছে, তাহাতে যে তাহাদের কষ্ট হইতেছে এত স্বতঃসিদ্ধ।

২য় ভদ্রলোক। বিসমোল্লায় যে গলৎ। কারিকর মজুর প্রভৃতি শ্রেণীর পূর্ব্বে যে মজুরী ছিল এখনও তাহাই আছে, তাহাই যে আমি স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহি।

১ম ভদ্রলোক। কেন?

২য় ভদ্রলোক। আমি কয়েক বৎসর পরে ভদ্রাসনে কিছুকাল বাস করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে থাকিবার সময় আমার ছুতর, রাজমিস্ত্রি তবলদার ইত্যাদি শ্রেণীর আবশ্যক হইয়াছিল। আমার বোধ হইল, পূর্ব্বাপেক্ষা তাহাদের অবস্থা ভাল।

১ম ভদ্রলোক। কেমন করিয়া বুঝিলেন?

২য় ভদ্রলোক। তাহারা গরিব লোক। বোধ করি আয় ব্যয়ের হিসাব রাখে না। যদ্যপি কেহ রাখে তাহা আমি দেখি নাই বটে। কিন্তু গৃহে গিয়া আমার জ্বালানি কাঠের আবশ্যক হইল। গৃহের চতুর্দ্দিকে যথেষ্ট বৃক্ষ আছে। আবশ্যক তবলদারের। সুতরাং ইন্ধনের জন্য বৃক্ষছেদক নিযুক্ত করা আবশ্যক হইল, তবলদার কার্য্য করার পর তাহার মজুরী বাকী থাকিল। আমি তাহাকে আবদ্ধ রাখিবার জন্য বলিলাম, তোমার মজুরী অল্প বাকী থাকিলে চলে না কি? তবলদার বলিল "আচ্ছা বাবু"। তাহার পর বলিলাম "কুঠারখানি কেন বহিয়া ঘরে লইয়া যাইবে, কল্য ত আসিতেছ?" তবলদার বলিল "যে আজ্ঞা, আমি আপনাদের পুরাতন লোক, কোন আপত্তি নাই" তবলদার মজুরী বাকী রাখিয়া তাহার কুঠারখানিও আমার নিকট রাখিয়া, প্রসন্ন চিত্তে স্বভবনে চলিয়া গেল। তাহার পর দিন সে আসিল না। আমি মনে করিলাম "বেচারার নিশ্চয়ই পীড়া হইয়াছে, নতুবা আসিত, কারণ তার কুঠার আমার নিকট রহিয়াছে।" তাহার পর দিন সে আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওহে, কাল তোমার অসুখ করিয়াছিল কি?" তবলদার বলিল—"আজ্ঞে না, কাল কেমন কুয়াসা করিয়াছিল, বাদলা মত বোধ হইল, তাই কা'ল আর কাজ করিতে বাহির হই নাই।" আমি বলিলাম "তোমার অবস্থা,

বোধ করি ভাল" তবলদার—"ভাল আর কই, তবে পূর্ব্বে বেলা ৭টা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত (অর্থাৎ আটঘণ্টা খাটিয়া) চারি গণ্ডা পয়সা পাইতাম এক্ষণ বেলা ৮টা বা ৯টা হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত খাটিয়া (অর্থাৎ পাঁচ বা চারি ঘণ্টা খাটিয়া) "সয়া-পাঁচগণ্ডা পয়সা পাই।" অর্থাৎ তবলদার পূর্ব্বে যে সময়ে চারি আনা উপার্জ্জন করিত এক্ষণ সেই সময় নয় আনা দশ আনা রোজগার করে। অথচ চাউলের দর সেই স্থানে পূর্ব্বে ৪৲ মণ ছিল এক্ষণে ৬৲ টাকা মণ, সুতরাং পূর্ব্বেকার আর এক্ষণকার মজুরি, ও চাউলের দর তুলনা করিলে তবলদারের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা এখন ভাল বোধ হয়। আর তাহাকে পূর্ব্বে কাজের জন্য প্রতিদিন যেমন লালায়িত দেখিতাম এবার তাহা দেখিলাম না।

১ম ভদ্রলোক। একজন তবলদারের একটা দৃষ্টান্ত দেখে আপনার একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত করা ঠিক কি ?

২য় ভদ্রলোক। তাই ত আমি আগেই বলিয়াছি, আমি সংবাদ অভাবে অন্নকষ্ট বিষয়ে কোন মত দিতে সাহস করি না। তবে কেবল তবলদারের সম্বন্ধে এই কথা জানিয়াছিলাম তাহা নহে। ছুতরের আবশ্যক হইয়াছিল। আমি দেখিলাম প্রথমত মজুরি অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে দৈনিক পাঁচ আনা ছয় আনায় ছুতার পাওয়া যাইত। এখন আট আনা দশ আনা লাগে। আর সেও পূর্ব্বে যে কয়ঘণ্টা খাটিত, এক্ষণ তাহার প্রায় অর্দ্ধেক সময় খাটে, আর ছুতার ডাকিয়া ডাকিয়াও সহজে পাওয়া যায় না। তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হওয়া সত্বে, ছুতারদিগের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল কি ?" সূত্রধর বলিল—"হাঁ মহাশয় আগেকার চেয়ে আমাদের অবস্থা মোটের উপর কিছু ভাল। একবেলায় অল্প খাটিয়া এখন অধিক মজুরি পাই। আবার বৈকালে ঘরে বসিয়া কাজ করি।" সুতরাং পূর্ব্বে, দিন ছয় আনা হিসাবে কিছু কম মাসিক ১২৲ টাকা পাইত। এখন দিন দশ আনা হিসাবে এক বেলায়—মাসিক কিছু কম ২০৲ টাকা পায়; আর ঘরে আর একবেলা কাজ করিয়া মাসিক আরও ১০৲ টাকা পায়। মাসে মোট প্রায় ৩০৲ টাকা পায়। পূর্ব্বে পাইত ১২৲ টাকা মাত্র। কারণ, ছুতর বলিল "৭টা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত খাটিয়া বাটী যাইতে ও স্নানাহার করিতে পূর্ব্বে বেলা ৪টা ৫টা হইয়া যাইত। তাহার পরে আর সে দিন আবার কাজ করিতে ইচ্ছা হইত না।" জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম রাজমিস্ত্রীদিগেরও অবস্থা ঐরূপ অর্থাৎ মজুরির মোট উপার্জ্জন ও চাউলের দর তুলনা করিলে, পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল বই মন্দ নহে।

১ম ভদ্রলোক। যাহা হউক অন্নের এতাদৃশ অধিক মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক।

২য় ভদ্রলোক। নিশ্চয়ই আলোচনা নিতান্ত আবশ্যক। তবে আলোচনা—এমারতটা সংবাদ-সংগ্রহ-ভিত্তির উপর তৈয়ার করিলে ভাল হয়।

কেহ মনে না করেন, উপরের ২য় ভদ্রলোকটি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া হঠাৎ বোধ হয়, আমিও সেই সিদ্ধান্ত করিয়াছি।

গবর্ণমেণ্ট অনেক সংবাদ নিজের ব্যব-

হারের অঙ্ক সংগ্রহ করেন। কিন্তু তাহা অনেক সময় সহজে পাওয়া যায় না। অথবা যদি বা পাওয়া যায় তাহা বিশুদ্ধভাবে না পাওয়া যাইতে পারে। কারণ, যে সকল ঘটনা বা সংবাদ প্রকাশ করিলে গবর্ণমেণ্টের উপর দোষ পড়ে, গবর্ণমেণ্ট তাহা না প্রকাশ করিতে পারেন, অথবা যদি প্রকাশ করেন, এমন অসম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন, যে যতটা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সত্য হইলেও, অপ্রকাশিত ঘটনা বাদ দিয়া কেবল প্রকাশিত ঘটনা হইতে কোনরূপ মীমাংসা করিলে একটা নিতান্ত গভীর ভ্রম গহ্বরে পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

আমাদের সমুদয় দেশে প্রতি গ্রামে জমিদারগণের গোমস্তা আছে। জমিদারগণ চেষ্টা করিলে, অতি সহজে বিনা ব্যয়ে অথবা নগণ্য ব্যয়ে, নিজ নিজ নায়েব ও তহশীলদারগণের দ্বারা, সমুদয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া জমিদার সভাতে অর্পণ করিতে পারেন। কিন্তু কোন জমিদার সভা, জমিদারগণের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য, এবং দেশের মঙ্গলকার্য্যে জমিদারশক্তির সম্ভাব্য প্রসার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। একটি সদাশয় জমীদার যুবক যিনি অর্দ্ধ ক্রোড় টাকার অধিক নগদ টাকার মালিক, আমাকে এক দিন বলিয়াছিলেন "(বর্ত্তমান) জমীদারি প্রণালীতে একটু বুদ্ধি লাগে, কিন্তু সে নিম্ন শ্রেণীর বুদ্ধি"। কথাটা ঠিক। এই নিম্নশ্রেণীর বুদ্ধি খাজানা বাড়ান ও উচ্ছেদে পর্য্যবসিত হয়। ইহার অতিরিক্ত বুদ্ধি, দুঃখের বিষয়, জমিদার সভাতে প্রায় দেখা যায় না। সে দুঃখের কথা এক্ষণে থাকুক।

বলিতেছিলাম, আমাদের দেশে কোন তথ্য নির্ণয় করিতে হইলে প্রথম বিঘ্ন—সংবাদের অভাব। এক্ষণে শস্য-মূল্য-বৃদ্ধি সম্বন্ধে যখন সংবাদের অভাব, তখন এ বিষয়ে কোন আলোচনা করা যাইতে পারে কি না? যাইতে পারে, এক রকমে।

একটি জিনিষ সম্বন্ধে কোন সংবাদ না পাইলে, সেটি আছে অথবা নাই, তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এবং যদি সেই জিনিষ থাকে তাহা হইলেই বা কিরূপ অবস্থা হওয়া সম্ভব, এবং যদি তাহা না থাকে তাহা হইলেই বা কিরূপ অবস্থা হওয়া সম্ভব, তাহা যুক্তি এবং জ্ঞাত সংবাদ দ্বারা কতকটা নির্ণয় করা যাইতে পারে।

কোন সংবাদ বা অবস্থা বা ব্যাখ্যা বা হেতুবাদ যদি সত্য বলিয়া কল্পনা করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহার ফল বা পরিণাম এক প্রকার হইবে। আবার যদি সেই সংবাদ বা অবস্থা বা ব্যাখ্যা মিথ্যা বলিয়া অনুমান করা যায়, তাহা হইলে যুক্তি দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে এইরূপ অনুমানের ফল বা মীমাংসা বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। যে ফলটী বা মীমাংসাটী জ্ঞাত অবস্থার সহিত মিলে না, তাহা যে অনুমানের উপর স্থাপিত তাহা মিথ্যা বুঝিতে পারা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উপরে ২য় ভদ্রলোকটীর অনুমিত সিদ্ধান্ত লওয়া যাউক—অর্থাৎ শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় কৃষককুলের অবস্থা ভাল হইয়াছে অনুমান করা যাউক। এখানে জ্ঞাত অবস্থা কি? প্রতি সনে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে বহুসংখ্যক কৃষকপ্রমুখ প্রজা অনশনে জর্জ্জরিত হয়, অথবা অকালে

মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হয়। জাত অবস্থা কি? গ্রামে গ্রামে অন্নের জন্য হাহাকার, গবর্ণমেণ্টের উদ্বেগ ও শস্য প্রেরণ, শস্য বিতরণ; ভারতে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের তাণ্ডব নৃত্য থামে না, অনাহার-হত-প্রজাপুঞ্জের বিক্ষিপ্ত কঙ্কাল-অস্থিতে ভারতের বিস্তৃত ক্ষেত্র ধবলীকৃত। যদি কৃষককুলের অবস্থা যথার্থই ভাল হইত, তাহা হইলে ভারতে বৎসর বৎসর তাহাদের মধ্যে অসংখ্য লোক কেন না খাইয়া মরিতেছে? কেন এক বৎসর আকাশের অনিশ্চিত বারি বর্ষণ না হইলেই, অথবা অপ্রচুর হইলেই, অমনি কৃষকরাজির বদনমণ্ডলে বিকট নৈরাশ্যের করাল ছায়া পতিত হয়? কেন সে নিজের কুটীরে ভীষণ যমদূতের অগ্রগামিনী ছায়া দেখিয়া কাঁপিয়া উঠে? ইহা কি ভাল অবস্থার চিহ্ন? ইহা কি প্রাচুর্য্যের চিহ্ন? ইহা কি উন্নতির চিহ্ন? না। কখন না। তবে যদিও অল্প সময়ের জন্য কোন এক স্থানে কৃষককুলের অবস্থা শস্যমূল্যের বৃদ্ধিতে উন্নত হইয়াছিল, তথাপি কয়েক বৎসর এক করিয়া ধরিলে, নানাস্থান বিস্তৃতভাবে দেখিলে, ঐ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক, বেশ বুঝা যায়। তাহা হইলেই বুঝা গেল ২য় ভদ্রলোক যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা প্রচুর নহে, তাহা আংশিক, কাল ও দেশ সম্বন্ধে তাহা সঙ্কীর্ণ। এবং বৃহৎ আয়তনে ও বিস্তৃতভাবে সংবাদ সংগ্রহ করা আবশ্যক।

একটী জ্ঞাত সংবাদ আলোচনা করা যাউক। ইহা সকলেই জানেন যে ভারতবর্ষ হইতে অনেক খাদ্য শস্যের রপ্তানি হয়। সেই শস্যের কতক অংশের পরিবর্ত্তে ভারত বিলাতী কাপড় ইত্যাদি দ্রব্য পায়। আর কতক অংশের পরিবর্ত্তে কোন দ্রব্য পায় না, তাহা এখানকার ও বিলাতের ভারতবর্ষ সংসৃষ্ট সাহেবদিগের বেতন পেনসন ইত্যাদি দিবার জন্য বিলাতে প্রেরিত হয়। যে শস্য রপ্তানি হইয়া বিলাতে যায় তাহা, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, বিলাতের শ্রমীগণ আহার করে—অর্থাৎ বিলাতী তাঁতী ও অন্যান্য কারীগরগণ তাহা হইতে বেতন পায় ও খাইতে পায়। যে টাকা বা শস্য বিলাতে বড় বড় সাহেব বেতন বলিয়া পান, তাহার কতকাংশ তাঁহারা নিজে খান ও কতক অংশ দিয়া বিলাতের তৈয়ারী দ্রব্য খরিদ করেন, অর্থাৎ ঐ দ্রব্য নির্ম্মাতা মজুরদিগের আহার যোগান। সুতরাং যে শস্য ভারত হইতে বিলাতে যায় তাহাতে ভারতের গরিব লোকের মুখের গ্রাস বিলাতের মজুর লোক পাইয়া থাকে—এইরূপ অনুমান হয় এবং তজ্জন্যই সন সন দুর্ভিক্ষ হয়, অর্থাৎ লোকসংখ্যার অনুপাতে খাদ্যদ্রব্যের অপ্রচুরতা বা আংশিক অভাব হয়। আমরা জানি, যেখানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অপ্রচুরতা, সেখানেই তাহার মূল্য বাড়ে।

যদি এমন হয় যে, লোক আছে ৩০ কোটী, কিন্তু যে শস্য আছে তাহাতে ২৯ কোটীর বেশী লোকের আহার হইতে পারে না। তাহা হইলে, ধনতত্ত্বের সূত্র অনুসারে এক শস্যের মূল্য এতটা বাড়িবে যে কোটী লোকের পক্ষে তাহা ক্রয় করা অর্থাভাবে অসম্ভব হইবে। এই অবস্থা হইলে, দুর্ভিক্ষ হয়। ফলে, শস্যের পরিমাণের সহিত খাদকের সংখ্যা সমান করিবার জন্য মূল্য বাড়াইয়া কতক খাদককে আহার হইতে বঞ্চিত করা হয়। কংগ্রেসের নেতাগণের মধ্যে কোন কোন মাননীয় পণ্ডিত

বলিয়া থাকেন যে দুর্ভিক্ষের সময় এ দেশে শস্যের অভাব হয় না, কেবল গরিব প্রজা অর্থাভাবে দেশে শস্য থাকিতেও ক্রয় করিতে পারে না। এই কথাটা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, বুঝিয়া দেখিলে, টাকা, দেশে যে সমগ্র শস্য আছে তাহার একটী অংশ পাইবার অধিকার সূচনা করে। ধরুন, দেশের সমুদয় শস্য যেন একটী বিরাট শস্যাগারে রহিয়াছে। তাহার মধ্যে কাহার কত পরিমাণ শস্য আছে তাহার হিসাবের কোন খাতা নাই। কিন্তু তাহার হিসাব ঐ টাকা৷ যাহার যে পরিমাণে টাকা আছে তাহার সেই পরিমাণে শস্য আছে। সেই শস্য নিজের ঘরে না থাকিয়া বাজারে সঞ্চিত আছে। ব্যাঙ্কে যেমন কাহারও টাকা যদি সঞ্চিত থাকে, তাহার যখন টাকার প্রয়োজন হয়, সে ব্যাঙ্কের উপর "চেক" কাটে, তেমনি বাজারে সমাজের শস্য সঞ্চিত আছে, যখন আহার আবশ্যক হয়, সে ঐ শস্যসমষ্টিস্বরূপ ব্যাঙ্কের উপর, টাকাস্বরূপ চেক পাঠাইয়া দেয়—। যদি টাকা না থাকে, তাহার অর্থ, দেশের শস্যসমষ্টিস্বরূপ ব্যাঙ্কে তাহার ভাগে কোন শস্য সঞ্চিত নাই। সুতরাং শস্য খরিদ করিবার টাকা নাই বলাও যাহা, প্রজার ভাগে শস্য নাই বলাও তাহা। তবে যখন দুর্ভিক্ষ হয়, তখন গবর্ণমেণ্ট প্রজাকে টাকা দিলে প্রজা ত শস্য কিনিতে পায়—। এ যুক্তিটা ভ্রমাত্মক। কারণ যে প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হয়, সেখানে গবর্ণমেণ্ট শস্য না পাঠাইলে, টাকা দিলেও সকলে শস্য পায় না। যখন সমুদয় প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হয় তখন গবর্ণমেণ্ট, ব্রহ্ম ইত্যাদি দেশ হইতে চাউল খরিদ করিয়া ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট গরিবলোকদিগের জন্য আমদানি করিতে বাধ্য হন।

আবার দুর্ভিক্ষসময়ে যখন ব্রহ্ম বা অন্য দেশ হইতে এদেশে চাউল আসে, তখন, বুঝিয়া দেখিলে, চাউল দিয়া চাউল খরিদ করা হয়। কারণ, যে টাকা দিয়া খরিদ করি, সেই টাকা পূর্ব্বে শস্যের বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ ভারত হইতে শস্য রপ্তানি করিয়া তাহার বিনিময়ে টাকার উপাদান, স্বর্ণ ও রৌপ্য, আনা হইয়াছিল। সুতরাং যখন টাকা দিয়া ব্রহ্মদেশের চাউল খরিদ করি, তখন পরোক্ষে ভূতপূর্ব্ব শস্য দিয়া বর্ত্তমান শস্য খরিদ করি। আমাদের দেশে রৌপ্য ও স্বর্ণের ধর্ত্তব্য খনি নাই। ভারতের শিল্পপ্রসূত দ্রব্য বিদেশে অতি অল্পই বিক্রয় হয়। সুতরাং ভারত অন্য দেশ হইতে যাহা ক্রয় করে, তাহা পরোক্ষে শস্য দিয়াই ক্রয় করে। তাই, যখন ব্রহ্মদেশ হইতে ভারত চাউল খরিদ করে, তখন শস্য দিয়া শস্য খরিদ করে। পূর্ব্বে যে শস্য রপ্তানি করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক গবর্ণমেণ্ট হাতছাড়া করিয়াছিলেন তাহাই আবার দেশে আনিতে হয়। আনিবার জন্য যে মূল্য দিতে হয়, তাহাও দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষকদিগের উৎপাদিত শস্যের মূল্যপরিণাম মাত্র—বিনিময়ের বিনিময় মাত্র। কোন জলাশয়ের জল, নালা কাটিয়া বাহির করিয়া, আবার নালা কাটিয়া সেই জলাশয়ে আনা যেরূপ; ঘরের শস্য বিদেশে পাঠাইয়া, আবার বিদেশ হইতে ঘরে আনা সেইরূপ। নালাতে অনেক জল শুষিয়া লয়, এবং জল আনিতে যে আবার নূতন করিয়া নালা কাটিতে হয়, তাহাতে যে বিলম্ব, সেই বিলম্বে জলাভাবে

লোক মরিয়া যাইতে পারে। এবং নানা কাটার খরচটা অপব্যয় হয়। ভারতের শস্য যখন বিদেশে যায় তখন ধীরে সুস্থে; তখন আদিতে সাঁদিতে, পল্লীতে, গ্রামে, নগরে, হাটে বাজারে, যেখানে সেখানে শস্য পাওয়া যায়, সেখানেই বিদেশীগণ শস্য খরিদ করিতে পায়; এবং নৌকায় রেলে তাহা সুবিধামত সময়ে চালান করে। কিন্তু যখন দুর্ভিক্ষ হয়, তখন তাড়াতাড়ি গ্রামে শস্য আমদানি করিতে হয়, তখন সুবিধামত সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিলে অনেক লোক মরিয়া যায়। অথচ সকল সময় শস্য গ্রামে চালান করার সুবিধা থাকে না। আবার যাহারা চালান করিবার জন্য নিযুক্ত হয়, তাহারা চুরি করিবার সুবিধা পায়। সব শস্য দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকে পায় না। যোগ্যপাত্রে না দিয়া অনেকস্থলে অযোগ্যপাত্রেও খাদ্য প্রদত্ত হয়। সুতরাং প্রথমে শস্যের রপ্তানি করিয়া দুর্ভিক্ষ সময় আমদানি করাতে (১) শস্য আনিতে আনিতে অনেক লোক মরিয়া যায়, (২) যখন দেশে শস্য আইসে তখনও দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট সকল লোক পায় না, (৩) শস্য আমদানি রপ্তানির খরচটা অনর্থক লাগে (৪) যখন রপ্তানি হয় তখন শস্য কম দরে দেশ হইতে চলিয়া যায়; যখন দুর্ভিক্ষের সময় তাহা আমদানি করিতে হয়, বিদেশী শস্য বিক্রেতাদিগের নিকট অধিক দরে কিনিতে হয় অর্থাৎ বেচিবার সময় কম দর লওয়ায় কিনিবার সময় অধিক দর দেওয়ায় ভারতবর্ষের ক্ষতি হয়, (৫) শস্য বণ্টন করিবার জন্য যে বেতন দিয়া লোক নিযুক্ত করিতে হয় সেটা দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজার অর্থাৎ অভিমে কৃষকের নিকট লওয়া হইয়া থাকে এবং (৬) বণ্টন করিবার সময় শস্য চুরি যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং শস্য রপ্তানি করিয়া, পরে দুর্ভিক্ষ হইলে, তাহা আমদানি করায় দেশের কোন মোটের উপর উপকার নাই—অপকার বিলক্ষণ আছে।

আরও গুরুতর কথা এই যে, যে পরিমাণ শস্য ভারত হইতে বিদেশে চলিয়া যায়, দুর্ভিক্ষের সময় সেই পরিমাণ শস্য ত আমদানি হয় না। রপ্তানি হয় নিয়ত ও অধিক; আমদানি হয় কম, ও কোন কোন বৎসর।

যদি প্রকৃত অবস্থা এই হয় যে, ভারতে যে পরিমাণ শস্য জন্মে তাহা সমুদয় ভারতবাসী জনের আহারের জন্য প্রয়োজন, অর্থাৎ ফাজিল শস্য হয় না, তাহা হইলে যে পরিমাণ শস্য রপ্তানি হইবে, সেই পরিমাণে দুর্ভিক্ষে লোক মরিবে। ভারতের খাদ্যের রপ্তানি যাহা দশ বৎসরে হয় তাহা তেরিজ কর; এবং দশ বৎসরে দুর্ভিক্ষে যত লোক মরে তাহারও তেরিজ কর। দেখ, যে পরিমাণে মোট শস্য দশ বৎসরে ভারত হইতে চলিয়া গিয়াছে, তাহা কত জনের খোরাক। এক জনের এক বৎসরের খোরাক ছয় মণ ধরিয়া হিসাব কর। এই অঙ্ক কসিয়া যে লোক সংখ্যা পাইবে, তাহা দুর্ভিক্ষ জনিত মৃত্যু সংখ্যার সহিত সমান হয় কিনা তাহা দেখ। যদি মোটামুটি সমান হয় তাহা হইলে, সম্ভাবনা অধিক যে রপ্তানির জন্যই, দুর্ভিক্ষে লোক মরিতেছে; স্বদেশীর অন্ন বিদেশী লইয়া যাইতেছে বলিয়াই স্বদেশী মরিতেছে এ কথাটা অতি সহজ কথা বলিয়াই ত বোধ হয়। তবে দুঃখ এই যে ইংরাজ শাসন কর্ত্তারা

তাহা মানিতে চাহেন না। আমাদিগের এই এই সকল যুক্তিকে crude economic fallacies বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। তজ্জন্যই এইগুলি লিখিতে হয়। যে চাষা সেও বলে যে "দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে না কেন? দেশের ধান গম জাহাজ পুরিয়া পুরিয়া যে বিলাতে চালান হইতেছে।" এ দেশের দুর্ভিক্ষের দায়িত্বটা ভগবানের উপর, আকাশের মেঘের উপর, গবর্ণমেণ্ট চাপাইতে থাকেন। বৃষ্টি হইল না, তাহা কি গবর্ণমেণ্টের দোষ? বিলাতের একজন "লিবারেল" রাজমন্ত্রী চটুল বাগ্মিতার সহিত ভগবানের বা আকাশের দোষটা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। "দেখুন, যে বৎসর ভাল বৃষ্টি হইল, ক্ষেত্র শস্যময় হইয়া হাসিতে লাগিল, কৃষকের কুটীর শস্যে পূর্ণ হইল, সেখানে তখন সুখ, হাসি খুসি, উৎসব, উৎসাহ। তখন ধরিত্রী হাস্যমুখী-সুখময়ী। তাহার পর বৎসর আকাশে মেঘ হইল না, ধরাতলে বারিবর্ষণ হইল না। ক্ষেত্রের ফসল জল না পাইয়া জন্মিল না। আকাশ শুষ্ক, ধরণী শুষ্ক। কৃষক চতুর্দ্দিক আঁধার দেখিল। দুর্ভিক্ষ হইল। লোক মরিতে লাগিল। এই দুই বৎসরের যে প্রভেদ বর্ণিত হইল, এক বর্ষে সুখ ও হাস্য— আর এক বর্ষে দুঃখ ও মৃত্যু—তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কি কোন অপরাধ আছে? দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর কারণ কি কেবলমাত্র, অনাবৃষ্টি নহে?" অবশ্য এই তর্কটাতে একটু চটক আছে। কিন্তু প্রথম বৎসর যে প্রচুর ধান হইয়াছিল তাহার উদ্বৃত্ত ধান যদি গ্রামে থাকিতে পাইত, বিলাতে না যাইত, তাহা হইলে কি কৃষকগণ অজন্মা বৎসরে দুর্ভিক্ষে মরিত? গত বৎসরের উদ্বৃত্ত শস্য খাইয়া কি জীবন ধারণ করিতে পারিত না? নিশ্চয়ই পারিত। কেবল গত এক বৎসরের উদ্বৃত্ত ধান নহে; যে যে বৎসর ধান অত্যধিক পরিমাণে হয়, সেই সেই বৎসরের উদ্বৃত্ত ধান কৃষক সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিত এবং অজন্মা বৎসরেও হাসিয়া খেলিয়া বাঁচিয়া থাকিত। রপ্তানি যত কম হইবে, গ্রামে তত ধান অধিক থাকিবে। গ্রামে যত ধান অধিক থাকিবে, তত অধিক লোক খাইতে পাইবে, এবং অনশনমৃত্যু তত কম হইবে, এবং চাউলের দরও সঙ্গে সঙ্গে তত কমিবে। কথাটা এত সহজ যে, গবর্ণমেণ্ট ইহা স্বীকার না করায় যেন আমাদের বিবেচনা শক্তির উপর এক রকম জবরদস্তি করা হয়। যাহা হউক মাননীয় কেয়ার হার্ডি সাহেব ইহা নির্ভীক চিত্তে স্বীকার করিয়াছেন। রপ্তানি হেতু দেশে শস্যের অপ্রচুরতাই দুর্ভিক্ষ ও শস্যের দর বৃদ্ধির কারণ। বঙ্গবাসীর "অন্নরক্ষিণী সভা"র প্রথম অধিবেশনের বিবরণীতে পড়িয়াছিলাম যে একজন দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, "দেশেতে শস্যের অপ্রচুরতা হয় নাই, দেশে টাকার পরিমাণ অধিক হইয়াছে, তাহাতেই জিনিষের দর বাড়িয়াছে।" বিনিময় (exchange) ব্যাপারটা অতি জটিল। এমন কি, মিলের প্রসিদ্ধ Principles of Political Economyতে তিনি বলিয়াছেন যে "ইহার তথ্য অতি কঠিন। পাঠক তাঁহার গ্রন্থে এই ভাগ বিশেষ অবহিত চিত্তে না পাঠ করিলে, তাঁহার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিবেন না।" টাকা বিষয়টা এই

জটিল বিনিময় বিষয়টার অন্তর্গত। সুতরাং তাহা আমি আলোচনা করিয়া যে সাধারণ পাঠকের নিমিত্ত বোধগম্য ভাবে লিখিতে পারিব আশা করি না। তবে মিলের মত অতি গভীর জলে ডুব না দিয়া, মোটামুটি দুই একটা কথা আলোচনা করা যাইতে পারে, যাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

আমাদের দেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি নাই বলিলেই হয়। এদেশের শিল্পদ্রব্যও বিদেশে অতি অল্পই বিক্রয় হয়। সুতরাং এদেশে অধিক টাকার আমদানি হইলে বুঝিতে হইবে যে, দেশে টাকা আনিবার জন্য, অধিক পরিমাণ শস্য দেশ হইতে (স্বর্ণ রৌপ্যের) মূল্য স্বরূপ বাহির হইয়া গিয়াছে। এ দেশে টাকা অধিক আসিতেছে বলিলেই বুঝিতে হইবে, তাহার বিনিময়ে অধিক শস্য বাহির হইয়া যাইতেছে। সুতরাং শস্যের অপ্রচুরতা হইতেছে—এবং কাজেই দর বাড়িতেছে।

কেবলমাত্র টাকা অধিক হইলে, দ্রব্যের দর বাড়ে না। তাহা নিম্নে দেখাইতেছি। দেশে শস্যের এবং অন্যান্য দ্রব্যের পরিমাণ যদি সমান থাকে, অর্থাৎ না বাড়ে ও না কমে, তথাপি টাকা অধিক হইলেও শস্যের দর নানা কারণে না বাড়িতে পারে। একই পরিমাণ শস্যের কেনাবেচা যদি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বার হয়, তাহা হইলে শস্যের পরিমাণ সমান থাকিলেও টাকার অধিক প্রয়োজন হইবে। মনে করুন, একটী গ্রামে ৩০০ লোক আছে। ১৮০০ 'আঠার শত মণ চাউল' সেই গ্রামে প্রতি বৎসর উৎপন্ন হয়। যদি তাহা গ্রামের লোকে ক্রয় করে এবং খায়, তাহা হইলে কৃষকগণ অন্যের নিকট যে চাউল বিক্রয় করিবে, কেবল সেই চাউলের মূল্যের জন্য টাকা আবশ্যক হইবে। ধরুণ, কৃষকগণ কেবল ৩০০ মণ চাউল বিক্রয় করিল, প্রতি মণ ৩৲ টাকা দরে। (বাকী ১৫০০ মণ নিজে খাইল) তাহা হইলে সেই ৩০০ মণ খরিদ করিতে ৯০০৲ মাত্র আবশ্যক হইবে। কিন্তু ধরুন সেই ৩০০ মণ চাউল গ্রামের হাটে একজন ব্যাপারী খরিদ করিল, সে ৯০০৲ দিল। তাহার পর দিন, ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী একটী নগরে কলিকাতার এক ব্যাপারী ৯৪৫৲ টাকা দিয়া গ্রামের ব্যাপারীর নিকট সেই ৩০০ মণ চাউল খরিদ করিল। সেই দিনই রেলে কলিকাতায় মাল আসিল এবং কলিকাতায় একজন দোকানী তাহা ১০০০৲ টাকায় খরিদ করিল, এবং সেই দিনই কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ৫টী গ্রামের ৫জন দোকানী তাহা ১১০০৲ দিয়া খরিদ করিল। সুতরাং ঐ ৩০০ মণ চাউল বারম্বার বেচা কেনাতে, অর্থাৎ হাত ফেরাফিরিতে ৯০০৲+৯৪৫৲+ ১০০০৲+১১০০৲ মোট ৩৯৪৫৲ টাকার প্রয়োজন হইল। কিন্তু গ্রামের সমুদয় চাউল গ্রামের লোকে যদি খাইত, অর্থাৎ চাউল যদি একবার মাত্র বিক্রয় হইত, ঐ চাউলের মূল্যের জন্য কেবল ৯০০৲ প্রয়োজন হইত। বারম্বার হাত ফেরাফিরি হওয়ায়, ৯০০৲ টাকার স্থলে ৩৯৪৫৲ টাকার দরকার হওয়া সত্বেও, চাউলের দর যে বিশেষ বৃদ্ধি হয় তাহা নহে। দূরে আনয়ন করিয়া বেচিবার জন্য ব্যাপারীর যে মূলধন খাটে তাহার সুদ, নিজের মেহনত আনা, ও ব্যাপারের লোকসানের সম্ভাবনার

জন্য একটা গড়ে ক্ষতিপূরণ, এই তিনটী ধরিয়া সে সামান্য দর বৃদ্ধি করিয়া বিক্রয় করিবে। ইহাতে দূরাগত শস্যের দর কিছু কিছু বৃদ্ধি হয়, কিন্তু দেশের চাউল দেশেই থাকাতে মোটের উপর দেশে অন্নের দর বৃদ্ধি হয় না, অর্থাৎ একস্থানে যেমন একটু দর বৃদ্ধি হয়, অন্যস্থানে তেমনি দর একটু কমে।

যাহা হউক উপরে যাহা বলিলাম, তাহাতে ইহাই বোধ হয় যে ভারতে টাকা অধিক হইয়া থাকিলে অধিক শস্য ভারত হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ অনেক শস্য কমিয়া গিয়াছে। এবং টাকা অধিক হইলেও, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অধিক বার কেনা বেচা হইলে দ্রব্যের দর বাড়িতে না পারে। আর দর বৃদ্ধি শস্যের অপ্রচুরতা হেতুই হইতেছে।

এত দূর যাহা লিখিলাম, তাহাতে শস্যের অপ্রচুরতা, দুর্ভিক্ষের কারণ ও শস্য মূল্য বৃদ্ধির হেতু এই বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহার ভিতর অনেক কথা আছে। তাহার আলোচনা না করিলে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কিন্তু এইরূপ জটিল বিষয় প্রবন্ধ দীর্ঘ হইলে পাঠক ধৈর্য্যচ্যুত হইবার সম্ভাবনা। তজ্জন্য পরে ইহার আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র লাল রায়।

গৌড়কাহিনী।

মুসলমান-রাজধানীর প্রথম প্রতিষ্ঠা।

বক্তিয়ার খিলিজি দক্ষিণ বিহার করতলগত করিবার পর, গৌড়মণ্ডলে রাজ্যবিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত রাজধানী বিহার নগরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানে এখনও তাঁহার মৃতদেহ সমাধিনিহিত আছে। এদেশে আসিয়া তাঁহাকে প্রয়োজনানুরোধে দেবকোটে একটি সেনানিবাস সংস্থাপিত করিতে হইয়াছিল। তাহাই এদেশের প্রথম মুসলমান রাজধানীরূপে ব্যবহৃত হইত। অথচ মুসলমান-লিখিত ইতিহাসমাত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়,—বক্তিয়ার খিলিজি লক্ষ্মণাবতীর ধ্বংসসাধন করিয়া, তথায় এক নূতন রাজধানী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন; সেখানে "খোৎবা" ও মুদ্রা প্রচারিত করিয়া, নিরুদ্বেগে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।* এই বর্ণনা নিতান্ত অতিরঞ্জিত বলিয়াই বোধ হয়।

*Muhammad Bakhtiyar, sweeping the town with the broom of devasatation, completely demolished it, and making anew the city of Lakhnawti, which from ancient times was the seat of Government of Bengal, his own metropolis, he ruled over Bengal peacefully, introduced the *Khutbah*, and minted coin in the name of Sultan Qutb-ud-din.—*Riaz-us-Salateen*, p. 63.

নিরুদ্বেগে রাজ্যশাসন কথা দূরে থাকুক; বক্তিয়ার একদিনের জন্যও উদ্বেগশূন্য হইতে পারেন নাই। অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন দেশে রাজ্যবিস্তারে ব্যাপৃত হইয়া, তাঁহাকে নিয়ত অনিশ্চিতে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে আপন অনুচর-হস্তে নিহত হইতে হইয়াছিল! রাজ্যবিস্তার চেষ্টায় কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু রাজ্যশাসন চেষ্টার নিদর্শন নিতান্ত অল্প। তাঁহার প্রচারিত একটি মুদ্রাও এ পর্য্যন্ত লোকসমাজে আবিষ্কৃত হয় নাই;—লক্ষণাবতীপ্রদেশে তাঁহার কোনও অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ অথবা তৎসংক্রান্ত কোনরূপ জনশ্রুতি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নাই!

এ দেশের অতি অল্পস্থানেই বক্তিয়ার খিলিজি অধিকারবিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বরেন্দ্রমণ্ডলের মহানন্দা এবং করতোয়া নদীর মধ্যবর্ত্তী দেবকোট প্রদেশের কয়েকটি পরগণামাত্র প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তথায় অধিকার রক্ষার আশায় বক্তিয়ার আপন অনুচরগণকে জায়গীরদার নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। * একমাত্র দেবকোট ভিন্ন অন্য কোনও স্থান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বক্তিয়ার খিলিজির শাসনাধীন ছিল না। তাহাও আবার একজন কিল্লাদারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। সেই কিল্লাদারের হস্তেই বক্তিয়ার খিলিজি নির্দ্দয়রূপে নিহত হইয়াছিলেন।

তাঁহার অচিন্তিতপূর্ব্ব হত্যাকাণ্ডে খিলিজি-শিবিরে গৃহকলহের সূত্রপাত হয়। তাহাতে কিছুদিনের জন্য দেবকোটের মুসলমান-সেনানিবাস সমরক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। হত্যাকারী আলিমর্দ্দন খিলিজি সিংহাসনে আরোহণ করিতে না করিতে, মহম্মদ শেরাণ আসিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই, আলিমর্দ্দন তাঁহাকে পরাভূত ও নিহত করিয়া, পুনরায় সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। আলিমর্দ্দনের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া, খিলিজিগণ অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাকে নিহত করিয়া, হাসামুদ্দীন খিলিজিকে সিংহাসন দান করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা দেবকোটেই সংঘটিত হইয়াছিল। তাহার পর হাসামুদ্দীন খিলিজি গৌড়নগরে রাজধানী নির্ম্মাণ করিতে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকেই এদেশের মুসলমান-রাজধানীর প্রথম ও প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

যে গৌড়নগর উত্তরকালে ভুবনবিখ্যাত রাজনগর বলিয়া সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রতিষ্ঠাতার জীবনকাহিনী লোকসমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়া পড়িতেছে। তিনি হোসেন নামক খিলিজিবংশীয় সম্ভ্রান্ত ওমরাহের পুত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বক্তিয়ার খিলিজির সৌভাগ্যবৃদ্ধির সংবাদে তাঁহার অনেক আত্মীয় অন্তরঙ্গ এদেশে

* অধ্যাপক ব্লকম্যান ইহার রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য লিখিয়া গিয়াছেন,—"The Rajas of Northern Bengal were powerful enough to preserve a semi-independence inspite of the numerous invasions from the time of Bakhtiyar Khilji."—ইহার সহিত অষ্টাদশ অশ্বারোহীর অলৌকিক দিগ্বিজয়-কাহিনীর সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। হাসামুদ্দীন খিলিজি তাঁহাদিগের দশজনের মধ্যে একজন। সকলেই বক্তিয়ার খিলিজির কৃপায় যথাযোগ্য জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হাসামুদ্দীনও একটি জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। এই জায়গীর কোন গ্রন্থে "গঙ্গোত্রী", কোন গ্রন্থে "কঙ্গোর" নামে উল্লিখিত। তাহা দেব কোটের নিকটেই অবস্থিত ছিল।

বক্তিয়ার খিলিজি শিষ্টাচাররক্ষার্থ দিল্লীশ্বর কুতবুদ্দীনকে "সুলতান" বলিয়া স্বীকার করিলেও, স্বাধীনভাবেই রাজ্যবিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। * তাঁহার হত্যাকারী আলি-মর্দ্দন খিলিজি দিল্লীশ্বরের নিকট সনন্দ ও সেনাবল লাভ করিয়া, রাজপ্রতিনিধিরূপেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহাকে নিহত করিয়া খিলিজিগণ হাসামুদ্দীনকে সিংহাসন দান করায়, তিনিও কিছুদিন দিল্লীশ্বরের নামের দোহাই দিয়া সিংহাসন রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। পরে শক্তিলাভ করিবামাত্র হাসামুদ্দীন খিলিজি প্রকাশ্যভাবে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর কুতবুদ্দীন লাহোর নগরে অশ্ব হইতে ভূপতিত হইয়া, সহসা পঞ্চত্বলাভ করায়, হাসামুদ্দীনের স্বাধীনতালাভের পথ সহজ হইয়া উঠিয়াছিল। সুলতান কুতবুদ্দীনের অযোগ্য পুত্র আরাম শাহ দিল্লীর ছত্রভঙ্গ বাদশাহী দরবার সুসংযত করিতে না পারিয়া, ক্রীড়া-পুত্তলে পরিণত হইয়াছিলেন। ইহাতে প্রশ্রয়-লাভ করিয়া হাসামুদ্দীন গৌড়নগরে রাজধানী নির্ম্মাণে ব্যাপৃত হইয়া, "সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন" নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নামে "খোৎবা" এবং মুদ্রাও প্রচারিত হইয়াছিল। হিজরী ৬১৪ হইতে ৬২০ সালের কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া, এই ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রদান করিয়াছে।

গৌড়নগরে সুলতান ঘিয়াসুদ্দীনের মৃৎ-প্রাচীর, রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার কথা ইতিহাসে লিখিত আছে। তাহার জনশ্রুতি বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ইতিহাস-লেখক মিন্‌হাজ-উদ্দীন গৌড়নগর পরিদর্শন করিয়া, সে কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মৃৎপ্রাচীরের কিয়দংশ এখনও বর্ত্তমান আছে। মিন্‌হাজ বলেন,—তাহা দশদিনের পথ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। তাহার এক সীমায় দেবকোট, অপর সীমায়

* A point of some importance in the fact prominently noticed by Major Raverty that the establishment of Muhammadan rule in Bihar and Bengal has nothing to do with the Muhammadan Kingdom established in Delhi. Muhammed Bakhtiyar is an independent conqueror, though he acknowledged the suzerainty of Ghazpin, of which he was a subject. The presents which he occasionally sent to Delhi, do not alter the case; a similar interchange took place between the Kings of the Dakhin and the later Kings of Delhi. Bihar and Bengal were conquered without help from Qutbuddin, and in all probability, without his instigation or knowledge. This view entirely agrees with the way which Minhaj-i-Siraj speaks of the Muizzi Sultans and their coordinate position.—H. Blochmann's History and Geography of Bengal, J. A. S. B. (1875).

রাঢ়ের রাজধানী লক্ষোর নগর অবস্থিত ছিল।* ঘিয়াসুদ্দীনের মৃৎপ্রাচীর বর্ত্তমান থাকিলেও, তাঁহার রাজধানী গৌড়ীয় ধ্বংসাবশেষের কোন্ অংশে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইবার উপায় নাই। খিলিজি-শাসন-সময়ে এদেশের মুসলমান-রাজধানী লক্ষৌতী (লক্ষ্মণাবতী) নামে কথিত হইত। তখনও গৌড়ের নাম প্রকাশ্যরূপে ঘোষিত হয় নাই,—এদেশের মুসলমান রাজ্যও "বাঙ্গালা রাজ্য" নামে কথিত হইতে আরম্ভ হয় নাই। কোন কোন ইতিহাসে এই সময়ের মুসলমান রাজ্য "লক্ষৌতি-দেবকোট" নামেও উল্লিখিত আছে। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, প্রথমযুগে মুসলমানগণ এদেশের অত্যল্পস্থানেই রাজ্যবিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই ইতিহাস-লেখকগণ তাহাকে "লক্ষৌতি" রাজ্য বলিয়াই বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। রাজ্যের ন্যায় এই সময়ের মুসলমান রাজধানীও লক্ষৌতি নামেই পরিচিত ছিল।

মুদ্রাতত্ত্ববিৎ টমাস্ সাহেব সুলতান ঘিয়াসুদ্দীনের প্রচারিত বিবিধ মুদ্রার সমালোচনা করিয়া নানা ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ঘিয়াসুদ্দীনের মুদ্রাগুলি দুইশ্রেণীতে বিভক্ত হইবার যোগ্য। একশ্রেণীর মুদ্রার বিপরীত দিকে এক অশ্বারোহীর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। তাহাই প্রথম মুদ্রা প্রস্তুতের নিদর্শন। মুসলমানগণ এদেশে আসিয়া প্রথম হইতেই রাজকার্য্যে হিন্দুদিগের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমানের প্রথম মুদ্রার অশ্বারোহীমূর্ত্তিতে এই ঐতিহাসিক তথ্য প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে। হিন্দু মুদ্রার বিপরীত দিকে এক অশ্বারোহী বীর পুরুষের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত। মুসলমান সুলতান তাহার অনুকরণে এক তুর্ক অশ্বারোহীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। তাহার হস্তে এক গদা,—ইহার সহিত আর একটি ঐতিহাসিক তথ্য জড়িত হইয়া রহিয়াছে। মহম্মদ গজ্‌নি গদাপাণি ছিলেন, বক্তিয়ার খিলিজিও গদাপাণি ছিলেন †

মুসলমানগণ মূর্ত্তিবিদ্বেষের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। তাঁহাদিগের মুদ্রা হইতে অশ্বারোহীমূর্ত্তি অল্পকালের মধ্যেই বিদূরিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম মুদ্রা প্রচলনকালে কোনরূপ মূর্ত্তিবিদ্বেষ প্রকাশিত হয় নাই! হিজরী ৬১৬ সাল পর্য্যন্ত তাহা নির্ব্বিবাদে মুদ্রাকলেবরে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সালের মুদ্রায় একটি দেবনাগরাক্ষর (সা) ব্যবহৃত হইয়াছিল। দেখিবামাত্র মনে হয়,—মুদ্রাকরগণ তখনও পারসিক বর্ণ-

* Minhaj-i-Sirhj, in describing Lakhnauti at a later date (641 A.H.) mentions that an embankment or causeway extended for a distance of ten days' journey through the capital from Devkot to Nagore in Birbhum.—Thomas' *Initial coinage of Bengal*, Part II. J. A. S. B. (1873)

† মহম্মদ গজ্‌নীর গদা তাঁহার সমাধিমন্দিরে সুরক্ষিত ছিল। ইংরাজ রাজ সেই গদা হস্তগত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের কাবুল অভিযানের সেনাপতিকে সেই গদা আনিবার জন্য লর্ড এলেনবরা বিশেষভাবে আদেশ প্রদান করেন, এরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। টমাস্ সাহেব ইহার প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—So much credence was attached to this ancient legend, that we find Lord Ellenborough in 1842 instructing his generals in sober earnestness to "bring away from the tomb of Muhammad of Gazni his club which hangs over it."—*Ibid.*

বিশ্বাসে অভ্যস্ত হইতে পারেন নাই। কেবল ইহাই নহে,—গৌড়ীয় মুদ্রার সহিত দিল্লীর মুদ্রার একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্মণাবতী প্রদেশেই রৌপ্যমুদ্রা প্রথমে প্রচারিত হইয়াছিল। * তখনও টঙ্কার মূল্য ৬৪ পয়সা নির্দ্ধারিত ছিল। মিন্‌হাজ লিখিয়া গিয়াছেন,—মুসলমানগণের পূর্ব্বে আমাদের দেশে কোনরূপ মুদ্রা প্রচলিত ছিল না! † বঙ্গদেশের বিপুল বাণিজ্য মুদ্রার অভাবে কিরূপে পরিচালিত হইত; দিল্লীর পূর্ব্বে লক্ষ্মণাবতী নগরেই বা কিরূপে রৌপ্যমুদ্রা সর্ব্বাগ্রে মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলে, মিন্‌হাজের উক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতে সাহস হয় না। মিন্‌হাজ মুদ্রাশব্দে রৌপ্যমুদ্রার প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকিলে, তাঁহার উক্তির সহিত তৎকাল প্রচলিত অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে। সুবর্ণমুদ্রা বহু পুরাকাল হইতে প্রচলিত ছিল, বাণিজ্যে তাহাই ব্যবহৃত হইত।

হিজরী ৬১৬ সাল, সুলতান ঘিয়াসুদ্দীনের শাসন সময়ের একটী স্মরণীয় সংবৎসর। এই বৎসরেও তিনি কিছু কাল দিল্লীশ্বর আলতমাসের নাম মুদ্রায় মুদ্রিত করিয়া, অবশেষে আপনাকে "সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন নাসির-আমির-উল্‌-মমিনিন্‌" নামে প্রচারিত করিয়াছিলেন। ইহার সহিত একটি ঐতিহাসিক তথ্য জড়িত হইয়া রহিয়াছে। সেকালের মুসলমান-সমাজে বোগদাদের খলিফার প্রাধান্য প্রবল ছিল,—তিনিই সমগ্র মুসলমান ধর্ম্মরাজ্যের একছত্র সম্রাট্‌ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ঘিয়াসুদ্দীন তাঁহার নিকট হইতে সনন্দ ও উপাধি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন ভূপতিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। হিজরী ৬২০ সালে ঘিয়াসুদ্দীন সত্য সত্যই তাহা লাভ করায়, পরবর্ত্তীকালে দিল্লীশ্বরকেও বোগ্‌দাদ হইতে এই উপাধি আনয়ন করিতে হইয়াছিল!

এইরূপে স্বাধীনতা অবলম্বন করায়, সুলতান ঘিয়াসুদ্দীনের সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইবার সূত্রপাত হয়। দিল্লীশ্বর আল্‌তমাস হিজরী ৬২২ সালে লক্ষ্মণাবতী অবরোধ করেন। ঘিয়াসুদ্দীন তখন রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি সংবাদ পাইয়া রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইয়াও রাজধানী রক্ষা করিতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সন্ধিসংস্থাপন করিয়া রাজধানী রক্ষা করিতে হইল। গৌড়ীয় মুসলমান রাজধানীর প্রথম প্রতিষ্ঠা এইরূপে যে সমরকলহে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, তাহাই উত্তরকালে গৌড়নগরীর অপরিহার্য্য সাধারণ দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। গৌড়ের ভাগ্যে দীর্ঘকালের শান্তিসুখ উপস্থিত হইতে পারে নাই;—নগরদ্বারে নিয়ত সমর-

* One of the most instructive facts disclosed by these few pices is, that the rich and comparatively undisturbed territory of Bengal felt the want of a supply of *silver* money long before a similar demand arose in the harassed provinces of the North-West.—Thomas' Initial Coinage of Bengal, Part II. J. A. S. B. (1878).

† On the first conquest of Bengal by the Muslims, they found no metallic or other circulating media of exchange except that supplied by *cowries*.—Ibid.

কোলাহল,—নগরের মধ্যে নিয়ত গৃহকলহ—গৌড়ের ইতিহাসকে রুধিররঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন সন্ধি করিয়া উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন, মুদ্রায় দিল্লীশ্বরের নাম মুদ্রিত করিয়া তাঁহার তুষ্টি সম্পাদনেও অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু আল্‌তমাস দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না করিতেই, আবার স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য আল্‌তমাস পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এবার শাহজাদা নাসীরুদ্দীন সসৈন্যে উপনীত হইয়া, ঘিয়াসুদ্দীনকে নিহত করিয়া হিজরী ৬২৪ সালে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এইরূপে গৌড়ীয় সিংহাসনে দিল্লীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠালাভ করায়, খিলিজি বংশের প্রাধান্য ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন খিলিজিবংশীয় শেষ বাদশাহ। খিলিজিগণ প্রথমে দক্ষিণবিহার জয় করিয়াছিলেন। তাহার পর লক্ষ্মণাবতী প্রদেশে তাঁহাদিগের বীরবাহু এক নূতন রাজ্যবিস্তারে ব্যাপৃত হইয়াছিল। তৎকালে উত্তরবিহারে ও মোবঙ্গ প্রদেশে মুসলমানশাসন প্রবর্ত্তিত হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া, মুসলমানাক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। ত্রিবেণী হইতে বিষ্ণুপুর ও তাহার দক্ষিণাংশে উৎকলরাজের অক্ষুণ্ণপ্রতাপ বর্ত্তমান ছিল। করতোয়ার পূর্ব্বতীরে রঙ্গপুর প্রদেশে কামরূপেশ্বরের শাসনক্ষমতা প্রচলিত ছিল। সুতরাং বরেন্দ্র এবং রাঢ়ভূমির কিয়দংশমাত্রই খিলিজিগণের বশীভূত হইয়াছিল। খিলিজি-শাসনকাল নিতান্ত সংক্ষিপ্ত,—তাহা গৃহকলহে পুনঃ পুনঃ বিপর্য্যস্ত,—সুতরাং খিলিজিগণ যথারীতি রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন ভিন্ন অন্য কোনও খিলিজি-সুলতান একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিতে পারেন নাই। এই সকল কারণে খিলিজি-শাসনকে প্রকৃতপ্রস্তাবে রাজ্যশাসন বলিয়া বর্ণনা করা যায় না;—তাহা রাজ্যাধিকার মাত্র।

এরূপ বিপ্লবযুগে সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন কিরূপে নগররচনায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে, বিস্মিত হইতে হয়। দিল্লীশ্বর সামসুদ্দীন আল্‌তমাসের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান নাসিরুদ্দীন দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার শাসন-সময়ে রাজধানীর বিশেষ উন্নতি সাধিত হইবারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। হিজরী ৬২৬ সালে গৌড়নগরেই নাসিরুদ্দীনের মৃত্যু হয়। তাঁহার অকালমৃত্যুতে দিল্লী শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল। আল্‌তমাস তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার আশায় রাজকার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভার্থ গৌড়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেখানে নাসিরুদ্দীন ভবিষ্যৎ ভারতসম্রাটের ন্যায় ছত্রদণ্ড ব্যবহার করিয়া লোকসমাজেও ভাবী দিল্লীশ্বর রূপে সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আল্‌তমাসের সকল আশাই অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়া গেল!

পুত্রশোকার্ত্ত বৃদ্ধ আল্‌তমাস বহুযত্নে নাসিরুদ্দীনের মৃতদেহ দিল্লীতে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে সুবিখ্যাত "কুতবমিনারের" অনতিদূরে,—একটি সমাধিমন্দিরে নাসিরুদ্দীনের মৃতদেহ সমাধি-নিহিত হইয়াছিল। তাহা এখনও "সুলতান গাজির" সমাধিমন্দির নামে

কথিত হইয়া আসিতেছে। * দিল্লীশ্বর যখন এই সকল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া শোক সংবরণের চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময়ে খিলিজি-স্বাধীনতাদীপের নির্ব্বাণোন্মুখ শেষ শিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। মালিক এক্তিয়ার উদ্দীন বাল্কা নামক এক খিলিজিবীর সুলতান দৌলত শাহ নাম গ্রহণ করিয়া নিজনামে স্বাধীনভাবে মুদ্রা প্রচারিত করিতে আরম্ভ করিলেন।† আল্‌তমাস স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। আবার গৌড়নগর বাদশাহী সেনাদলে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল; আবার নগরদ্বারে তুমুল সমর কোলাহল মুখরিত হইয়া উঠিল; আবার মুসলমানের অসি মুসলমানশোণিত পিপাসায় ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল! আল্‌তমাস নগর অধিকার করিয়া, বিহারের শাসনকর্ত্তা আলাউদ্দীনকে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। হিজরী ৬২৭ সালে এই শাসননীতি প্রবর্ত্তিত হইল। এই সময়ে দিল্লীশ্বর নগর প্রবেশ করিয়া, সুলতান ঘিয়াসুদ্দীনের কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, বিস্ময় প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে ঘিয়াসুদ্দীনের সমাধিমন্দিরে তাঁহার নাম "সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন" বলিয়া লিখিত হইল! ‡ সে সমাধিমন্দির কোথায়? সে গৌড়নগরই বা কোথায়? মালদহের লোকের নিকট ঘিয়াসুদ্দীনের নাম পর্য্যন্ত অপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে।

গৌড়ের নাম চিরপরিচিত পুরাতন নাম। তাহার উত্তরাংশে লক্ষ্মণসেনদেব যে রাজনগর নির্ম্মিত করিয়াছিলেন, তাহাই "লক্ষ্মণাবতী" নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। বক্তিয়ার খিলিজি এই রাজনগরের ধ্বংসসাধন করিয়াছিলেন। ঘিয়াসুদ্দীন যখন রাজধানী নির্ম্মাণে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তখন তিনি কোন্ স্থান মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহার তথ্যাবিষ্কারের আশা নাই। তাঁহার রাজধানী হিজরী ৬২৭ সালে দিল্লীশ্বরের অধিকারভুক্ত হইলে; হিজরী ৬৪১ সালে স্বনামখ্যাত ইতিহাসলেখক মিন্‌হাজ উদ্দীন তথায় উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে "লক্ষ্মণাবতী" নামেই উল্লিখিত করিয়া

* His body was brought to Delhi, and enshrined by the loving father in a beautiful mausoleum (known as the mausoleum of Sultan Gazi) about three miles west of the celebrated Qutb-Minar.—*Riaz-us-Salateen*, English translation, notes, p. 72. See also Thomas' Initial Coinage of Bengal Part, II.

† রিয়াজ-রচয়িতা গোলাম হোসেন এই বাদশাহের নাম "হাসামুদ্দীন" লিখিয়া গিয়াছিলেন কি না, তাহার রহস্য নির্ণয় করা অসম্ভব। রিয়াজ-উস্-সলাতিনের মুদ্রিত সংস্করণে "হাসামুদ্দীন" নামই দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা অনুবাদে সেই নামই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু দৌলত শাহের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইবার পর, রিয়াজের এই উক্তিতে আস্থা স্থাপন করা যায় না। হিজরী ৬২৭ সালের "দৌলতশাহী মুদ্রা" সমালোচনা করিয়া, আধুনিক ইতিহাস-লেখকগণ প্রকৃত তথ্যের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন। তদনুসারে রিয়াজের উক্তি সংশোধিত হওয়া কর্ত্তব্য।

‡ A tribute Altamsh had virtually anticipated, when he was at last permitted to behold the glories of his adversaries' capital in 627 A. H., and then conceded the tardy justice of decreeing that in virtue of his good works, Ghiyasuddin Iwaz should, in his grave, be endowed with that coveted title of *Sultan*, which had been denied to him while living.—Thomas' *Initial Coinage of Bengal* Part II.

গিয়াছেন। এদিকে ঘিয়াসুদ্দীনের মুদ্রিত হিজরী ৬১৬ সালের মুদ্রায়, তাহা "গৌড়নগরে মুদ্রিত" হইয়াছিল বলিয়া, উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানলিখিত পুরাতন ইতিহাসে প্রথমে গৌড়ের নাম উল্লিখিত হয় নাই;—অনেক দিন পর্য্যন্ত রাজ্য ও রাজধানী "লক্ষ্মণাবতী" নামেই উল্লিখিত হইয়াছিল। ইহার কারণপরম্পরার অভাব ছিল না। সমগ্র গৌড়ীয় হিন্দু-সাম্রাজ্য মুসলমানদিগের করতলগত হইবার পূর্ব্বে, তাঁহারা "লক্ষ্মণাবতী রাজ্যেই" প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং রাজকীয় কাগজপত্রে সেই নামই প্রচলিত ছিল। অনেকদিন পর্য্যন্ত এই সকল কারণে গৌড় নাম প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই। সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন। তিনি দেবকোটের সেনানিবাস ছাড়িয়া, পুরাতন গৌড় নগরে রাজধানী নির্ম্মাণ করিতে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন; এবং মুদ্রাতেও গৌড়ের নামই মুদ্রিত করিয়াছিলেন। দিল্লীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা রক্ষার আশায় তিনি বোগদাদের খলিফার নিকট হইতে সনন্দ আনয়ন করায় স্পষ্টই বোধ হয়, তিনি আপন রাজধানীকেও দিল্লীর সমকক্ষ করিয়া তুলিবার আশায় তাহাকে গৌড় নামে পরিচিত করিবার জন্য লালায়িত হইয়া ছিলেন। সেই জন্যই তাঁহার মুদ্রায় গৌড় শব্দটি বিশেষভাবে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। এখন ঘিয়াসুদ্দীনের একমাত্র কীর্ত্তিচিহ্ন—পুরাতন মৃৎপ্রাচীর। তাহাই কাল পরাজয় করিয়া, এখনও গৌড়নগরের সীমানির্দ্দেশ করিতেছে!

একদিনে রোমনগর নির্ম্মিত হয় নাই। গৌড়নগরও একদিনে নির্ম্মিত হইতে পারে নাই। সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন তাহার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। তাহার পর বহু বাদশাহের অক্লান্ত অধ্যবসায়ে গৌড়নগর ঐশ্বর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে ভুবনবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। গৌড়ীয় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহার পুরাকীর্ত্তির সঙ্গে স্বাধীনতার সংস্রব অত্যন্ত অধিক। তাহা সমগ্র রচনাকৌশলের ভিতর দিয়া সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত। গৌড় যেন নাগরিক সৌন্দর্য্যে দিল্লীকে পরাভূত করিবার জন্য প্রথম হইতেই লালায়িত ছিল। এই লালসা গৌড়ীয় স্বাধীন বাদশাহদিগের স্বাভাবিক লালসা। তাঁহারা ইষ্টক প্রস্তরের প্রত্যেক স্তরে তাহারই নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধিরূপে গৌড়ীয় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, এরূপ কোন উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন করিয়া যান নাই।

গৌড়ীয় রাজনগর নির্ম্মাণের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। গৌড়ের শাসনকাহিনীর ন্যায় তাহার গঠনকাহিনীও অতীতের বিস্মৃতিসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে! তথাপি দেখিতে পাওয়া যায়,—গৌড়ের ইতিহাসের দুইটি পৃথক্ যুগ দুইটি পৃথক্ অভ্যুদয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এক যুগ পরাধীনতার যুগ,—সে যুগের গৌড়েশ্বরগণ দিল্লীশ্বরের রাজপ্রতিনিধি মাত্র। তাঁহারা দিল্লীর সমকক্ষ করিয়া নগর গঠনের সাহস প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। আর এক যুগ স্বাধীনতার যুগ,——সে যুগের গৌড়েশ্বরগণ দিল্লীকে পরাভূত করিবার জন্যই প্রাণপণে নগরগঠন করিয়া গিয়াছেন।

যে সকল কীর্ত্তিচিহ্ন কালপরাজয় করিয়া,

এখনও পর্য্যটকগণের বিস্ময় উৎপাদিত করিয়া আসিতেছে, তাহা কাহার কীর্ত্তি, সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হয় না। তাহা সমস্তই গৌড়ীয় স্বাধীন বাদশাহগণের নামাঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। দিল্লীশ্বরের রাজপ্রতিনিধি-দিগের ইতিহাসে নগরগঠনের জন্য আগ্রহের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহাদের অধিকাংশের শাসন-কাহিনী প্রায় একরূপ,—তাহাতে বিচিত্রতার অভাব। অনেকেই দিল্লীশ্বরের ক্রীতদাস ছিলেন; বিশ্বাসপাত্র বলিয়াই উচ্চরাজপদে সমুন্নত হইয়া প্রথমে বিহারে পরে লক্ষ্মণাবতীরাজ্যে, রাজপ্রতিনিধি-রূপে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজ্যজয়, রাজ্যরক্ষা, রাজকোষের কষ্টসঞ্চিত ধনভাণ্ডার দিল্লীতে প্রেরণ করা,—ইহাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। তাঁহাদের শাসন, প্রবাসীর শাসন। তাহাতে গৌড়নগর রাজদর্পে সমুজ্জ্বল হইলেও, ঐশ্বর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইতে পারে নাই। প্রবাসীর শাসন কোনরূপে স্বকার্য্য সাধন করিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, স্বাধীন বাদশাহগণের শাসন তাহাতে পরিতৃপ্তি লাভ করে নাই। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা এবং অনুরাগ এখনও যেন প্রত্যেক ইষ্টক প্রস্তরে দৃঢ়মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে! *

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

মনীষা।

[মিশ্রকাব্য]

তৃতীয় সর্গ।

মস্তক নাড়িল বেলা। সন্দেহে চিকুর কুঞ্চ ছুটি
রক্তগণ্ডে দুলিয়া উঠিল; তবে মৌনভাব টুটি
মন্মথ কহিল "বেলা! কি লাগিয়া উপজিল কহ
চন্দ্রার এমন ভাব বাল্যসখী সুলোচনা সহ।"
কহিল সে "এ দোঁহার মাঝে হয়ে গেল বহুদিন
তুষের আগুণ সম পার্থক্য জ্বলিল সখ্যহীন

* রাজমহল, ঢাকা এবং মুর্শিদাবাদের মুসলমান-রাজধানীর কীর্ত্তিচিহ্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও, এই ঐতিহাসিক তথ্যই দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে। রাজমহল রাজপ্রতিনিধিগণের কর্ম্মভূমি,—ঢাকার রাজধানীও সেইরূপ। এই দুই নগরে রাজদর্প দেদীপ্যমান ছিল,—নাগরিক সৌন্দর্য্য বিকশিত হয় নাই। মুর্শিদাবাদের নবাবগণ প্রথম হইতে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করায়, এবং পরিণামে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা লাভ করায়, তাঁহাদের রাজধানী ঐশ্বর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে অতি অল্পকালের মধ্যেই ভুবনবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। পুরাতন অট্টালিকাকে পুরাতন ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দর্শন করিতে গিয়া, ইংরাজ-লেখকগণ নানা কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। গৌড়ীয় অট্টালিকার প্রধান গৌরব গৌড়ীয় স্বাধীনতা,—তাহাতেই এই সকল অট্টালিকায় অনন্য-সাধারণ গঠন প্রতিভা বিকশিত হইয়া রহিয়াছে।

গোপন ঈর্ষায়। দিদি বড় ঈর্ষাবতী,—হিয়া তার
গুহা-রুদ্ধ বায়ু সম উচ্চণ্ড আক্রোশে অনিবার
স্তম্ভিত হইয়া আছে। কত সহ্য করি' নিশিদিন
কাটাই যে আমি কাল জানেন তা বিধি। স্নেহহীন
বিপুল অকূলে ভাসিয়াছি মাতৃহারা—আশৈশব
রোষের তরঙ্গে দুলি'—জীবনের আনন্দ বৈভব
উবিয়া গিয়াছে ভয়ে। মহিষীর মৃত্যুকাল হ'তে
সুলোচনা হৈল তাঁর একমাত্র বন্ধু এ জগতে।
মনীষার সর্ব্বভার পড়িল তাহার পরে; কিন্তু
তব ভগ্নী এলে হেথা মনীষার চিত্ত আর বিন্দু
মাত্র রহিল না দিদির উপরে। তবু সম সুরে
বাঁধা দুইটি স্বতন্ত্র তন্ত্রী যথা কম্পিয়া মধুরে
বাজে রণন্ ঝনন্ একই স্বরের স্পর্শে; দোঁহে
তেমনই মিলি' হেথা মগ্ন ছিল কি প্রণয় মোহে!
দিদি কিন্তু বলিতেন নানা ভাবে ভরা তাঁর মন,
দ্রুষ্ট করি লয়ে চন্দ্রা বাড়াইল মহিমা আপন—
পরিয়া পরের পুচ্ছ ছাত্রীদের হরিল বিস্ময়
সবটুকু ঋণকরা—মূলবিদ্যা কিছু তার নয়!'
আরো কত আছে তত্ত্ব জানিনাকো বিশেষ বারতা"
কহি' ক্ষিপ্র গেল বালা, দমকা বসন্ত বায়ু যথা।

তার'পরে চাহি' চাহি' মন্মথ কহিল মৃদুভাবে
"পূতোন্মুক্ত চিত্ত ভরা—কি সারল্য কুমারী প্রকাশে।
ভাল যদি বাসি কভু—এই তবে যোগ্য পাত্রী তার,—
কি রঙ্গিম গণ্ডশোভা!—মধুকরা কিবা সুকুমার!
নহে এ মনীষা তব বসি' আছে গর্ব্ব-ভ্রান্ত-মনে,—
নহেক এ চন্দ্রা ডিঙ্গি,—কাছি-বাঁধা ছুটিবে পিছনে।"

আমি কহিলাম বন্ধু "শিব বুঝে গৌরীর মহিমা
কালাচাঁদ পারে বুঝি বর্ণিতে প্যারীর রূপসীমা।
সহস্র লোচনে ইন্দ্র ফিরে চায় শচীমুখপানে
হের যে যাহার যোগ্য সে তাহারে নিজ মনে জানে।

মনীষা মনীষা মোর ! মানি আছে প্রমাদ তাহার,
কিন্তু তা' প্রতিভাময়—মৌলিকতা তাহে যে অপার
শতেক মস্তিষ্ক হ'তে শতগুণে সে যে বিদ্যাবতী,
তাহার ভ্রমেও তাই ঠিকরিয়া উঠে চিন্তাজ্যোতিঃ ।
তার বিদ্যা তার চিন্তা স্বর্ণতাজ যেন মণিময়
সত্যেরে ঝলসি' মম মুগ্ধ কৈল নিখিল হৃদয় !
চন্দ্রা আর বেলা দোঁহে অভিনব কিশোর মূরতি
বহিতে অমৃত পাত্র আছে যেন ইন্দ্রের সংহতি ।
কিন্তু ভামিনীর ওই রবি-দীপ্ত নয়ন পলকে
বিশ্ববীণা বেজে উঠে রণঝনি' অপূর্ব্ব আলোকে ।"

অন্তঃপর সভা ত্যজি' উত্তরিনু ভ্রমণের তরে
উত্তরের উচ্চভূমে, বসিলাম—আনন্দ অন্তরে ।
নিয়ে ফুল্ল পুষ্পবন—স্বপ্নঘোর হানিয়া নয়নে
জুড়াইয়া দিল প্রাণ দিব্য-গন্ধ-মিশ্র সমীরণে ।
নিকুঞ্জ আসিল সেথা,—অবসন্ন নিকটে বসিয়া
"কি কঠিন কার্য্য ভাই" কহিল সে দীর্ঘ নিঃশ্বসিয়া ।
"ছায়া নয় ছায়া নয়—শত বাধা বিঘ্ন করি' ভেদ
পাইনু প্রবেশ পথ । করিয়া শাল্মলী-বনচ্ছেদ
বরঞ্চ সুগম পথ অন্বেষণ শ্রেয়ঃ, অনুনয়
বিন্দুমাত্র তবু পাষাণীর কাছে শ্রেয় কভু নয় ।
দুয়ারে নাড়িনু কড়া,—প্রবেশিনু অনুমতিক্রমে,—
হেরিলাম মুখে তার ঝটিকা নামিতে উপক্রমে
বিদ্যুত্-কটাক্ষ-পিঙ্গ । কিন্তু আমি বিনীত ভাষণে
ত্রৈলোক্য রচিনু ছন্দ—ভিক্ষা মাগি কহিনু "গোপনে
রাখ দেবি দয়া করি ।"—সুধাইল "কে তোমরা কহ,—
কি লাগি' আসিলে হেথা ?" আর মিথ্যা চাতুরীর সহ
কাহিনী রচিয়া কিবা হবে ?—আমিও তোমার মত
সকলি বলিনু তারে' । অমনি সে নারী বজ্রাহত
বিস্ময় চাহনি চেয়ে রয় । তথনু কহিতে তা'রে
বিবাহ সম্বন্ধ কথা তব,—ভ্রূভঙ্গিমা সহকারে

কহিল আমারে চেয়ে—"পাগলের প্রলাপ বচন!"
দুয়ারের তাম্রলিপি' পরে চিত্ত করি আকর্ষণ
কহিনু "করেছি সত্য গুরু অপরাধ, চক্ষু চাহি'
পা দিয়াছি ফাঁদে,—তা'র দণ্ড-গ্রহণ-ব্যতীত নাহি
নাহি অন্য পথ। কিন্তু কহ হেন মাত্রাতীত কাজে
পাইবে কি নারী স্থান ধরণীর আদর্শ সমাজে?"
"তোষামোদ-বিজড়িত বর্ত্তমান হ'তে বহুগুণে
শ্রেষ্ঠতা পাইবে তবু।" কহে নারী।—পরীক্ষিনু স্নেহাগুনে
তপ্ত করি চিত্ত তার—"ভাব শুভে কি হবে বেলার
জানিয়াও সব কথা বলেনি যখন।" কহে তা'র
উত্তরে সে "আমি তা বুঝিয়া লব,"—দেখাইনু ভয়,—
"তবে কহি ঘোর যুদ্ধ বাধিবে তুমুল মৃত্যুময়।"
কহিল,—"কর্ত্তব্য স্বধু,—কঠিন কর্ত্তব্য জাগে মনে,
শুভাশুভ নির্ব্বিচারে তাই মোরা পালিব যতনে।"
হতাশ্বাস হইনু তখন—কিন্তু পুনঃ চিন্তা এল মাথে—
পাষাণ ভেদিতে ঢেউ কত বর্ষ কত না আঘাতে
করে কলধ্বনি। আরম্ভ করিনু পুনঃ মিষ্টবাণী—
"একেবারে করিলে কি স্থির?—তোমারেই অনুমানি—
রাজ্ঞীর দ্বিতীয়া বলি (যদিও তৃতীয়া সবে বলে)
সর্ব্বোচ্চে স্থাপিব তোমা কহিলাম অব্যর্থ কৌশলে।—
তুমি হবে সর্ব্ব গরীয়সী। চক্ষু মুদি যদি রহ
এ পৌরুষত্রয়' পরে, রাজপুত্রে যদি রাজ্ঞী সহ
মিলাইতে পার সুহাসিনি! তবে পাবে পুরস্কার
মোদের নগরী মাঝে এমনিই অট্টালিকা—সাথে তার,
লভিবে অনেক ছাত্রী,—তব নাম এমনি করিয়া
অমর ব্যাপিবে চির কীর্ত্তিগন্ধে ধরণী ভরিয়া।"
এবার দ্বিধায় পড়ি কিঞ্চিৎ বিলম্বে নারী কহে
"মৌন থেকো—উত্তর ভাবিয়া দিব, কিন্তু আজি নহে।"

ক্রমশ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

মানবিকতা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যেখানে অর্জ্জুনকে আপনার বিশ্বরূপ দেখাইতেছেন,—নানা বিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনিচ,—নানাবিধ, দিব্য, নানা বর্ণাকৃতিবিশিষ্ট,—পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ—হে পার্থ, সেই আমার শত শত সহস্র সহস্র রূপ দেখ,—নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা, দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ—স্বচক্ষু দ্বারা তুমি আমাকে দেখিতে শক্য নও, তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি—সেইখানে একটি শ্লোক অর্জ্জুনের মুখে গীতাকার দিয়াছেন, যাহা বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। অর্জ্জুন অন্তরীক্ষস্পর্শী প্রদীপ্ত সেই ঘোর রূপ দর্শন করিয়া এমনি ভীত হইলেন যে বলিলেন—

> অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনোমে
> তদেব মে দর্শয় দেব ! রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস !
> কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব
> তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে।

হে দেব, অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া হৃষ্ট হইতেছি, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আমার মন প্রব্যথিত হইতেছে, অতএব আমাকে তোমার সেইরূপই দেখাও—হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসন্ন হও। আমি পূর্ব্ববৎ তোমাকে কিরীটী গদাধর ও চক্রপাণি দেখিতে ইচ্ছা করি; হে সহস্রবাহো, হে বিশ্বমূর্ত্তে, পূর্ব্ববৎ চতুর্ভুজ রূপে প্রকাশিত হও।

পরে শ্রীভগবান সেইরূপে যখন দর্শন দিলেন, তখন অর্জ্জুন বলিলেন,—

> দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
> ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিংগতঃ।

হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষরূপ দর্শন করিয়া আমি ইদানীং সচেতা, সংবৃত্ত ও প্রকৃতিগত হইলাম।

গীতায় যেখানে—ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈঃ—তিন প্রকার গুণময় ভাবদ্বারা—মোহিতং—মোহাচ্ছন্ন—নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্—আমাকে পরম অব্যয়রূপে কেহ জানিতে পারে না;—দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া—এই আমার গুণময়ী অলৌকিকী মায়া দুরতিক্রমণীয়া—মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে—আমাকে যিনি আশ্রয় করেন, মায়া তিনি অতিক্রম করেন—এই নির্গুণ ব্রহ্মবাদ বলা হইতেছে তাহারি এক অধ্যায়ে অর্জ্জুনের এই যে প্রার্থনা, এই যে বাক্য—ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিংগতঃ,—ইহা আমার কাছে পরম বিস্ময়কর বোধ হয়। কর্ম্ম কর, ফলস্পৃহা করিও না, সর্ব্বকর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হও, এইরূপে কর্ম্মেই কর্ম্মের বন্ধন ছেদন করিবে, সমত্ববুদ্ধি চিত্তে প্রকাশিত হইলে তবে ফলস্পৃহা ত্যাগ করা সম্ভব,—প্রভৃতি যে কথা গীতায় উল্লিখিত আছে—তাহা এমনি সমস্ত মানুষের অন্তরতম কথা যে তাহার দ্বিরুক্তি কাহারও কর্ত্তৃক সম্ভবে না। কিন্তু সেই কর্ম্মবাদের মধ্যে যখন জ্ঞানের কথা আসিয়া পড়িল, তখনই যে তত্ত্ব গীতাকার প্রচার করিতেছেন

তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। এক দিকে বলিতেছেন যে অনন্যচিত্ত হইয়া—তদ্‌গত হইয়া যে ভগবানকে চাহিবে তিনি তাহারই; অপর দিকে বলিতেছেন যে মায়ার মধ্যে যে নিজেকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, সে মায়াকেই পাইবে; গুণাতীত নির্ব্বিকার ভগবানকে লাভ করা তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু কর্ম্ম করিব, ফলস্পৃহা করিব না, চিত্তকে প্রশান্ত রাখিব, সমভাবে সর্ব্বচরাচরকে দর্শন করিব—এ সকল কথা বলিলেই দাঁড়াইতেছে এই যে যাঁহাকে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিব, সর্ব্বভূতে যাঁহাকে মাত্র দেখিব তিনি নিশ্চয় সগুণ, নচেৎ তাঁহাকে দেখা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। সগুণ বলিলেই তাঁহাকে মানুষ বলা হইল, অর্জ্জুন সেই মানুষং রূপংই দেখিতে চাহিয়াছিলেন।

আসল কথা, মানুষের হৃদয়ের দিক্‌টা কেহ বড় দেখে নাই। তাই মানুষের স্বরচিত ঈশ্বরতত্ত্বের একটা দুরূহতা হইয়াছে এই, যে ঈশ্বরের সহিত কোন্ খানটায় মানুষের যোগ তাহা বুঝিবার যো নাই। প্রকৃতি যদি মায়া হন্ এবং মায়ার সঙ্গে ঈশ্বরের সঙ্গে যদি কোন যোগ না থাকে, তবে ঈশ্বরকে লাভ করিব কোথায়? ভগবান যখন বলিতেছেন,—

> সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ
> ময্যর্পিত মনোবুদ্ধি র্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।
> যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ
> হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈ র্মুক্তোযঃ স চ মে প্রিয়ঃ।

সন্তুষ্ট যোগনিষ্ঠ সংযতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয় আমাতে অর্পিত মনোবুদ্ধি যাঁর সেই মদ্ভক্ত আমার প্রিয়। যাঁহা হইতে লোক উদ্বিগ্ন হয় না, এবং যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন্ না, যিনি হর্ষ ক্রোধ ভয় ও ক্ষোভ হইতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়—তখন বুঝি যে ভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে সন্তুষ্ট হইতে হইবে, সংযতাত্মা হইতে হইবে, কাহাকেও আঘাত না দেওয়া, কাহারো প্রতি ক্রোধ না করা, কিছুতে ক্ষুব্ধ না হওয়া প্রয়োজন। কারণ এ সকল তাঁহার গুণ নয়, তিনি সুন্দর, তিনি শান্ত, তিনি শিব, তিনি আনন্দ। কিন্তু তাঁহার কোন গুণ নাই যদি বলি, তবে তাঁহাকে পাইবার কোন প্রয়োজনও দেখি না।

তত্ত্বের দিক্ দিয়া বিচার করিতে বসা আমার পক্ষে ধৃষ্টতার একশেষ হইবে। তত্ত্বালোচনায় আমার কোন অধিকার নাই। কিন্তু তত্ত্ব ছাড়াও মানুষের হৃদয়ের একটি দিক্ আছে, সেখানকার বিচার তত্ত্বের সঙ্গে খাপ্ খাক্ আর নাই খাক্, মানুষ কোন দিন তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া ঠেলিয়া ফেলে নাই, ফেলিতেও পারিবে না। সেই বিচারের দিক্ দিয়া ধর্ম্মের অভিব্যক্তির ইতিহাসটা আমাদের দেশে কিরূপ একবার আলোচনা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। সম্পূর্ণ আলোচনা আমার দ্বারা সম্ভবে না, আমি কেবল চোখ বুলাইয়া যাইব মাত্র।

মনুষ্যসমাজ বলিয়া একটা বৃহৎ ব্যাপার যখন গড়িয়া উঠে নাই, মানুষ যখন তরু লতা পশু পক্ষীর মত প্রকৃতির মধ্যেই একান্তভাবে লিপ্ত বিজড়িত ছিল, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ভাবিবার অধিক অবকাশ যখন পায় নাই—সম্বৎসর ক্ষেত্রে চাষ লইয়াই ব্যস্ত ছিল এবং আকাশ অন্তরীক্ষ সূর্য্য চন্দ্র বর্ষা, নানা ঋতুর আগমন নির্গমনকে কেবল মাত্র জড়ভাবে নহে কিন্তু চেতন ভাবেই উপলব্ধি করিত, তাহাদের কল্যাণ-নিরত দেবতা বলিয়া পূজা

করিত—তখনকার ধর্ম্মগ্রন্থ ঋগ্বেদকে যদি টানিয়া আনি, তবে এই একটা ভারি বিস্ময়ে হৃদয় আপ্লুত হয় যে ঋগ্বেদের দেবতারা কি আশ্চর্য্যরূপে মানুষ! ইন্দ্রের কত কীর্ত্তিকলাপের স্তব ঋষি কবি করিতেছেন—যো দাসং বর্ণমধরং গুহাক! যিনি দাসবর্ণকে গূঢ়স্থানে অবস্থাপিত করিয়াছেন—শ্বঘ্নীব যো জিগীবাং লক্ষমাদদর্যঃ পুষ্টানি স জনাস ইংদ্রঃ। যিনি ব্যাধের ন্যায় লক্ষ্য জয় করিয়া শত্রুর সমস্ত ধন গ্রহণ করেন, তিনিই ইন্দ্র। তিনি 'বৃত্রহা' 'সোমপা' 'বজ্রবাহু'। তেমনি বরুণ অগ্নি রুদ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবতাই। আমাদের বোঝা দুষ্কর এই জড় প্রকৃতি কি করিয়া মানুষের চক্ষে মানুষ হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা তো অগ্নিকে বলিতে পারি না—সনঃ পিতেব সূনবেহগ্নে সূপায়নো ভব। সচস্বানঃ স্বস্তয়ে। পুত্রের নিকটে পিতা যেরূপ অনায়াসে অধিগম্য, হে অগ্নি, তুমি আমাদিগের নিকটে সেইরূপ হও, মঙ্গলার্থ আমাদিগের নিকটে বাস কর। আমাদের কাছে প্রকৃতির যতটুকু মানুষীরূপ,—তাহা তাহার সমস্তটা লইয়া, তাহার অবিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্যের প্রকাশ লইয়া—কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আকাশ অন্তরীক্ষ অগ্নি বায়ু সূর্য্যকে আমরা সেই সহজ সরল সুরে ডাকিতে পারি না। কিন্তু সে যাহাই হোক্, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মানুষ যখন কোন চিন্তা করে নাই, যখন তাহার প্রয়োজনটুকু মাত্র সে বুঝিত এবং সেই প্রয়োজন যিনি পূর্ণ করিতেন তাঁহাকেই ফলদাতা জ্ঞানে কৃতজ্ঞতায় পূজা দিত,—তাঁহাকে মানুষ কেন মানুষ করিয়া তুলিল? ইহা সে না জানিয়াই নিশ্চয় করিয়াছে, কিন্তু এই যে করাটুকু ইহার মধ্যে কি একটি গভীর সত্য প্রচ্ছন্ন! মানুষ, মানুষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে কৃতজ্ঞ হইতে পারে না—যেখানে সে হৃদয় দিবে, ভালবাসিবে সেখানে মানুষ থাকা চাই। তাই অগ্নিই হৌন্, বায়ুই হৌন্, ঋষিপিতামহের অন্তর্দৃষ্টিতে তাঁহারা পরম সুন্দর বলিষ্ঠ তরুণ যুদ্ধপ্রিয় সোমপায়ী মানুষই হইয়া উঠিয়াছিলেন,—তাঁহাদেরি ছাঁচের অনুরূপ মানুষ, কেবল তাঁহাদের অপেক্ষা বৃহত্তর ও মহত্তর।

তারপর মানুষ যখন তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হয় নাই কিন্তু তাহার আত্মজ্ঞান ফুটিয়াছে, বিশ্ব হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া সে দেখিতে শিখিয়াছে, তখন তাহার মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল—কোঽয়ম্ আত্মেতি বয়মুপাস্মহে, কতরঃ স আত্মা। কে এই আত্মা আমরা যাহার উপাসনা করি? যেন বা রূপং পশ্যতি, যেন বা শব্দং শৃণোতি, যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি, যেন বা বাচং ব্যাকরোতি যেন বা স্বাদুচাস্বাদু চ বিজানাতি? যাহা দ্বারা রূপ দেখি, শব্দশুনি, গন্ধ আঘ্রাণ করি, বাক্য বলি, স্বাদু ও অস্বাদু জানি—সেই বহিরিন্দ্রিয় সকলই কি আত্মা? যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ সজ্ঞানমজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামবশ ইতি। সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি। এই যে হৃদয়, এই মন, এই সংজ্ঞা, অজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা, দৃষ্টি, ধৃতি, মতি, মনীষা, জূতি, স্মৃতি, সঙ্কল্প, ক্রতু, অসু, কাম ও বশ প্রভৃতি—এই হৃদয়াদি অন্তঃকরণই কি আত্মা? সেই প্রশ্নের উত্তরে মানুষ যে আত্মতত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন তাহার মনে হইল যে এই সমস্তই কোন

এক অক্ষর পুরুষ কর্ত্তৃক বিধৃত হইয়া আছে—সর্ব্বত্রই এক তিনিই আছেন—মানুষের 'ধী'র তিনিই কারণ। তাই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনো যদ্বাচোহবাচং—তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য! যো বিশ্বম্ ভুবনম্ আবিবেশ—যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন—বিশ্বাত্মাকে সর্ব্বত্র ঋষিরা স্বীকার করিয়াছিলেন—অগ্নিতে জলেতে ওষধিতে বনস্পতিতে কোথাও তিনি নাই বলেন নাই।

তিনি—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন—এষহ্যেবানন্দয়াতি—ইনিই আনন্দ দিতেছেন।

সেইজন্য যদিও ঈশ্বরকে নিরাকার বলা হইল, অনন্ত বলা হইল, কিন্তু তাঁহাকে ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না এমন কোন কথাই হইল না। ঈশাবাস্যং ইদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। এ জগতে যাহা কিছু আছে সে সমস্তই ঈশ্বর কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত করিতে হইবে। তাঁহাতে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিতে হইবে।

অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ,
বায়ু প্রাণো হৃদয় বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।

অগ্নি তাঁহার মূর্দ্ধাস্বরূপ, চন্দ্রসূর্য্য তাঁহার চক্ষুদ্বয়স্বরূপ, দিক্ সমূহ তাঁহার শ্রোত্রস্বরূপ, বিবৃত বেদ সমূহই তাঁহার বাক্য স্বরূপ। বায়ু তাঁহার প্রাণ স্বরূপ, বিশ্ব তাঁহার হৃদয় স্বরূপ, তাঁহার পাদ হইতে এই পৃথিবী। তিনি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।

বেদে যেখানে ইন্দ্রাগ্নি দেবতাকে পৃথক্ করিয়া তাঁহাদের পূজা দিবার রীতি ছিল, উপনিষদ তাঁহাকে অপরা বিদ্যা বলিলেন,—অথ পরা যয়া তদক্ষরং অধিগম্যতে—তাহাই পরা বিদ্যা যাহাতে তাঁহাকে পাওয়া যায়। কিন্তু এই যে সর্ব্বত্র সেই এককে স্বীকার করা, তাহার মানে এমন হইল না যে ভগবানকে মানুষ পাইতে পারিবে না। বরং মানুষের মধ্যে যে নিত্য বস্তু আত্মা, তাহার যে মঙ্গলভাব, অমৃত ভাব, আনন্দ ভাব—সেই ভাব দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় এবং সেই জানা প্রকৃষ্টরূপে জানা, ঋষি কবি বারম্বার একথা বলিয়াছেন। অগ্নির্মূর্দ্ধা প্রভৃতি শ্লোকে সেই মানুষং রূপং ফুটিয়া উঠিতেছে!

কালক্রমে যখন এই ব্রহ্মজ্ঞান এবং এই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উলোট্-পালোট্ হইয়া গেল, তখনকার ইতিহাস আমাদিগের নিকটে সুস্পষ্ট নহে। আমরা সহসা বুদ্ধের আবির্ভাব দেখিলাম। তিনি যে তত্ত্বটি আবিষ্কার করিলেন, তাহা সত্য হোক্, মিথ্যা হউক্, তাঁহার জীবন এবং উপদেশ সমস্ত সমাজে কত বড় প্লাবন উপস্থিত করিল সকলেই জানেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশ কিছু নূতন নহে, যাহাতে তাঁহাকে আমরা অন্য চক্ষে দেখিতে পারি। উপনিষদ্ প্রভৃতিতেও বহুস্থানে সেই উপদেশ দেওয়া আছে।

বুদ্ধদেব যদিও বলিলেন যে ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দিলেই নির্ব্বাণ সহজ হইবে, মানুষের মন ব্যক্তিত্বকে বর্জ্জন করিতে পারিল না। মানুষ বুদ্ধেই সেই ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার পূজা জুড়িয়া দিল। নিজের হাতে নিজের কর্ম্মের ফলাফল সে লইল না।

হঠাৎ পৌরাণিক যুগের শত সহস্র দেবদেবীর মাঝখানে আমরা আসিয়া পড়ি। সে

সকল দেবদেবীর সঙ্গে ঋগ্বেদের দেবদেবীর সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। কোথা হইতে যে তাঁহারা আসিলেন, কেমন করিয়া ধীরে ধীরে সমস্ত দেশে স্বস্ব স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন, ইতিহাসের নিকটে তাহা সমস্যা। সে সমস্যা আজিও পরিষ্কার হয় নাই।

কিন্তু সেই সকল দেবদেবীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রাবল্য যে কত বড়—আমাদের দেশে শাক্তযুগে কালীপূজার কথা ভাবিলেই বুঝা যাইবে। কবিকঙ্কণ চণ্ডী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকটে এ বিষয়ে অধিক উল্লেখ নিষ্ফল। 'শক্তিপূজা' মানুষকে কি ভীষণতায় টানিয়া লইয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

বাঙ্গলাদেশে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব প্রথম কখন হইল তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলা শক্ত। শৈবধর্ম্মের পরেই অবশ্য। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এ শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক বড় কম। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রবিৎ মহাবীর; সমস্ত ক্ষত্রিয়-সমাজ তাঁহার ভয়ে কম্পান্বিত। সেখানে তিনি কেবল অর্জ্জুনকে সখা ভাবে ধরা দিয়াছিলেন মাত্র কিন্তু সেখানে তাঁহার প্রকাশ মাধুর্য্যে নহে, কর্ম্মে। তিনি বলিতেছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত এবং দুষ্কৃতের বিনাশার্থ তিনি যুগে যুগে আবির্ভূত হইবেন। কিন্তু এখানে তাঁহার রাজ্য কিছুই নয়, কংস বধ, জরাসন্ধ বধের কথা কেহ ভুলিয়াও উল্লেখ করে না। এখানে তিনি গোপাল, ননীচোর, ঘরের শিশু—বাৎসল্যরসে সমস্ত পুরাঙ্গনার হৃদয় অভিষিক্ত করিয়াছেন, তিনি মা যশোদার 'নয়ন-নন্দন'। তিনি রাখাল, রাখাল বালকদের সঙ্গে গোচারণ করিতেছেন, কাদাধূলা গায়ে মাখিতেছেন। তিনি প্রণয়ী, মানুষকে না হইলে তাঁহার চলে না। পূর্ব্বরাগ সম্ভোগ মিলন মান বিরহ—প্রেমের সমস্ত লীলায় তিনি লীলাময়! কোন রূপকে বৈষ্ণব কবি বাদ দেন নাই—অন্যান্য ধর্ম্মে যাহাকে পাপ বলিয়াছে—সেই স্ত্রীপুরুষের প্রেমের সম্বন্ধেই তিনি ভগবানকে দেখিয়াছেন—কোনো খানে বাধা মানেন নাই। ইহার চেয়ে মানুষং রূপং আর কি আছে বলিতে পারি না।

আশ্চর্য্য এই যে, এই কথাই সকলে বলিতে চাহিয়াছে। ঋষি যখন তাঁহাকে আনন্দং বলিয়াছিলেন তখন সহসা তাঁহার নিকটে বিশ্ব-জগতের আনন্দরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল বিশ্বাস করি। কিন্তু তখন পথে যে মানুষ চলিতেছে, ঘরে যে মানুষ আছে তাহাদের মধ্যে তিনি আনন্দং—এমন জীবন্তরূপে ঈশ্বর তাঁহাদের নিকটে ধরা দেন নাই।

সকলেই বলেন যে ইহার বিপদ্ বড় বেশী। যেখানে বিপদ্ বেশী সেখানে তাহা লঙ্ঘন করার আনন্দও বেশী। ইহা সহজ, খুবই সহজ, কারণ ইহা আমারি পাশে—আমারি ঘরে দৃষ্টির সম্মুখে। তাইতো এত শক্ত। পুত্রের মধ্যে তাঁহাকে উপলব্ধি করা, তাঁহার রূপ পাওয়া যদি শক্ত হয়, তবে অন্যান্য সম্বন্ধে যেখানে কত কলহ, কত বিবাদ, কত অশান্তি আছে, সেখানে তিনিত আরও ধরা দিবেন না। সংসার সংসার বলিয়াই সংসারীকে স্বর্গ করা এত শক্ত। বুদ্ধিতে বোঝা সহজ, হৃদয় দেওয়া শক্ত। কাহাকেও আমি আঘাত দিব না, আমার মাধুর্য্যে জড়কে পর্য্যন্ত প্লাবিত করিব; কোথাও তাহাকে ম্লান হইতে দিব না, একথা

বলা শক্ত—করা আরও শক্ত। এই জন্যই তো বৈষ্ণবেরা বৈষ্ণব ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন :—

সহজ সহজ সবাই কহয়ে
সহজ জানিবে কে ;
তিমির আঁধার যে হইয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে।
চাঁদের কাছে অবলা আছে
সেই সে পিরীতি পায়।
বিষে অমৃতেতে মিলন একত্রে
কে বুঝে মরম তায় !

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

বারাণসীর অভিমুখে।

১১

যে প্রস্তর-পীঠের উপর বুদ্ধদেব বসিয়াছিলেন।

যে প্রস্তর-পীঠের উপর বুদ্ধদেব বসিয়াছিলেন সেই পীঠটি দেখাইবার জন্য আমার বন্ধু আমাকে সহরের বাহিরে, পল্লীর মাঠময়দানের দিকে লইয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে, সেই মেঠো নিস্তব্ধতার মধ্যে আমরা অলৌকিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলাম।

বারাণসীর পল্লীভূমি অতীব নির্জ্জন, প্রশান্ত এবং গোপজীবন-সুলভ শান্তি-রসাশ্রিত। কতকগুলি যব ও ধান্যের ক্ষেত দেখা যাইতেছে ; এখন ফেব্রুয়ারী মাস—ইহার মধ্যেই শস্যাদি পাকিয়াছে; গাছপালা সবুজ হইয়া উঠিয়াছে ; এইরূপ না হইলে, কতকটা ফ্রান্সের ক্ষেত্রভূমি বলিয়া মনে হইত। রাখালেরা বেণু বাজাইতে বাজাইতে গো মহিষ ও ছাগল চরাইতেছে। বনভূমির কোণে, কতকগুলি পুরাতন পবিত্র শিলাখণ্ড রহিয়াছে,—সেইখান দিয়া যাইবার সময়, কোন্ ভক্ত কৃষক উহার উপর একটা হলদে ফুলের মালা ফেলিয়া গিয়াছে ; এই সকল শিলাখণ্ড গণেশ ও বিষ্ণুর মূর্ত্তি বলিয়া পূজিত ; গঠন-হীন হইলেও উহাতে গণেশ ও বিষ্ণুর কতকটা সাদৃশ্য এখনও লক্ষিত হয়। সুন্দর-সুন্দর রঙের পাখী,—কাহারও বা ফেরোজা মণির মত নীল-রং, কাহারও বা মরকত মণির মত সবুজ-রং—উহারা বিশ্বস্তভাবে আমাদের খুব কাছে আসিয়া বসিতেছে ;—উহারা মানুষকে ভয় করে না, কেননা এখানে কেহই উহাদিগকে হত্যা করে না। এই সমস্ত প্রদেশের উপর মূর্ত্তিমান শান্তিরস যেন স্তব্ধভাবে পক্ষ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

এখানে ওখানে অট্টালিকা ও সমাধি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ স্তূপাকারে অবস্থিত—তাহাতে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ও শিকড় জড়াইয়া রহিয়াছে, উহার উপর ক্ষুদ্র গ্রাম সকল স্থাপিত ;—দেবালয় ও সমাধি-স্থানের পুরাতন প্রাচীরে এখনকার কুটীর-সকল নির্ম্মিত হইয়াছে।

যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার লাভ করে, সেই সময়ে কতকগুলি বৌদ্ধমঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল; তাহার পর, দেশের উপর দিয়া যখন মুসলমান ধর্ম্মের প্রচণ্ড স্রোত বহিয়া যায়, তখন ঐ সকল মঠ মস্‌জিদে পরিণত হয়; আবার যখন প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আসিয়া দেশকে পুনরধিকার করে, তখন আবার ঐ সকল মস্‌জিদ্ পরিত্যক্ত হয়। এই সকল পরিত্যক্ত মস্‌জিদ; সন্ন্যাসী যোগী ও যোদ্ধাদিগের এই সকল সমাধি মন্দির;—সমস্তই, আম্রকানন ও কদলী বনের নীলিম ছায়ায় মিশিয়া গিয়াছে; ধর্ম্মোন্মত্ত প্রত্যেক আক্রমণকারীর ইচ্ছামত, বড়-বড় প্রস্তরখণ্ড কতবার ওলট্‌পালট্‌ হইয়া গিয়াছে—উহার একদিকে বুদ্ধের পদ্ম এবং অপরদিকে কোরাণের বয়েৎ অঙ্কিত রহিয়াছে। এই সকল প্রশান্ত ধ্বংসাবশেষের উপরে এখনকার কুটীরবাসী লোকেরা প্রাচীন পদ্ধতি-অনুসারে, শিল্পকর্ম্মে ব্যাপৃত; উহারা রেশমের কোমরবন্দ বুনিতেছে; উহার সূতাগুলা তৃণের উপর প্রসারিত হইয়া কখন কখন সমাধি ভূমির উপর দিয়াও চলিয়া গিয়াছে; উহারা মলমল-কাপড়ে রং করিতেছে; রং-করিয়া ফাট্‌-ধরা কোন পুরাতন মন্দির-চূড়ার উপর, রন্দ্‌রে শুকাইতেছে।

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত, আমাকে যে তীর্থস্থানে লইয়া যাইতেছেন, উহা আরও দূরে অবস্থিত।

পথের মাঝে একটা গরুর গাড়ীর পাশ দিয়া আমরা চলিয়া গেলাম—গরুর গাড়ীটা শিশুতে ভরা,—বৃদ্ধ যাদুকরের মত একজন লোক উহাদিগকে লইয়া যাইতেছে। উহা আমাদের দেশের জুজুর গাড়ী কিম্বা জুজুর বুড়ী মনে করাইয়া দেয়। ছেলে মেয়েতে প্রায় ২০টি শিশু গাদাগাদী করিয়া রহিয়াছে; ফুকর-বিশিষ্ট তক্তা-ঘেরের মধ্য হইতে—চাঁদোয়ার নীচে হইতে—গাড়ীর সর্ব্বাংশ হইতেই উহাদের মাথা দেখা যাইতেছে। উহারা কণ্ঠহার নলক প্রভৃতি অলঙ্কারে বিভূষিত, উৎসবোচিত পরিচ্ছদ ও চুম্‌কি-বসান উচ্চ মুকুটে সজ্জিত; উহাদের বড় বড় চোখ্—কজ্জল-রেখায় অঙ্কিত হওয়ায় আরও বড় দেখাইতেছে;—আমি শুনিলাম, শোভার জন্য নহে কিন্তু পাছে পথিমধ্যে কোন দুষ্ট ডাইনী ঐ নির্দ্দোষী শিশুদের উপর নজর দেয়—তাহাই নিবারণ করিবার জন্যই উহারা চোখে কাজল পরিয়াছে। দেখিতে জুজুর মত যে ভাল মানুষটি, গাড়ীটা আস্তে আস্তে হাঁকাইতেছে উহার দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রু নদীর মত প্রবাহিত, উহার নগ্ন গাত্র, উত্তর দেশীয় ভল্লুকের ন্যায় শাদা রোমে আচ্ছাদিত। লোকটা শিশুদের লইয়া কোথায় যাইতেছে? বোধহয় শিশুদের কোন একটা উৎসবে—সেই জন্যই উহারা এই আনন্দের সাজসজ্জায় সজ্জিত এবং পুতুলের ন্যায় অলঙ্কারে বিভূষিত।

এখন আমরা খোলা মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন গাড়ী হইতে নামিয়া, প্রখর রৌদ্রে, একটি অনুর্ব্বর ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ডের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে হইবে। এই আমাদের গন্তব্য স্থান;—ধ্বংসাবশেষ গুলারই ন্যায় ঘোর-ধূসরবর্ণ কতকগুলা গণ্ডশৈল—তাহারই মধ্যে একটা চক্রাকৃতি পাথুরে জায়গা; এইখানে একজন রাখাল বাঁশি বাজাইতেছে, আর সেই বংশীর ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ছাগেরা একপ্রকার সূক্ষ্ম তৃণ চর্ব্বণ করিতেছে। এইখানে কতকগুলা বড় বড় গাছ আছে, দূরে হইতে

আমাদের ওকগাছ বলিয়া মনে হয় —এই সব গাছের ছায়ার মধ্যে একটা বহু পুরাতন কালো পাথরের পীঠ আছে; আমি ও পণ্ডিত এই প্রস্তর-পীঠের উপর ভক্তিভাবে বসিলাম। দুই সহস্র বৎসরের অধিক হইল, বুদ্ধদেব ইহার উপর বসিয়া তাঁহার প্রথম উপদেশ বিবৃত করিয়াছিলেন। কিয়ৎ শতাব্দি হইতে, বৌদ্ধধর্ম্ম এই সমস্ত প্রদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া, সুদূর প্রাচ্য ভূখণ্ডে বিস্তারলাভ করিয়াছে। এখন এই পুরাকালের পুণ্যভূমিতে ভারতবাসীগণ আর আইসে না। কিন্তু ইহার পরিত্যক্ত অবস্থা সত্ত্বেও, এই প্রস্তর-পীঠটি এখনও বহুসহস্র মনুষ্যের কল্পনার সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে। সুদূর চীনে, জাপানের দ্বীপপুঞ্জে, শ্যামের অরণ্যে, দুর্ব্বোধ্য পীত মস্তিষ্কসকল এই ঔপন্যাসিক আসন-পীঠের ধ্যান করিতেছে। কখনও কখনও সেখান হইতে তীর্থযাত্রীরা পদব্রজে যোজন যোজন পথ অতিক্রম করিয়া, এইখানে আগমন করে এবং নতজানু হইয়া এই পীঠকে চুম্বন করে। এই গেপভূমি সুলভ শান্তির মধ্যে, এই রমণীয় নিস্তব্ধতার মধ্যে, আমি ও পণ্ডিত আমরা দুজনে ব্রাহ্মণ্যিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছি।

প্রাচীন ও হৃদয়হীন তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দীপক এই পীঠের অনতিদূরে, ক্ষুদ্র পর্ব্বতের ন্যায় গুরুপিণ্ডাকৃতি একটা প্রস্তর-স্তূপ উঠিয়াছে— এক সময়ে উহা বহুল কারুকার্য্যে ভূষিত ছিল; কিন্তু দুই সহস্র বৎসর পরে এখন উহার খোদাই কাজগুলি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে— এবং উহার আপাদ মস্তক, তৃণ ও কণ্টকগুল্মে আচ্ছন্ন হইয়াছে। পুরাতন বারাণসীতে যে বৌদ্ধ-মন্দির সর্ব্বপ্রথমে নির্ম্মিত হয়, ইহাই তাহার ধ্বংসাবশেষ। এই প্রকাণ্ড স্তূপের ভিতর-দেয়াল মনুষ্যপ্রমাণ উচ্চ; ইহার সমস্ত বহিঃপ্রসারিত অংশগুলি, ইহার সমস্ত ক্ষয়গ্রস্ত প্রস্তর, সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্রে মণ্ডিত; এবং উহা এই জরাজীর্ণ অবস্থাতেও অপূর্ব্ব ও অভাবনীয় উজ্জ্বলতা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। চীনবাসী, অ্যানামাবাসী, ব্রহ্মবাসী তীর্থযাত্রীগণ তাহাদের নিজ নিজ দূর-দেশ হইতে স্বর্ণপত্র আনিয়া উহার গায়ে লাগাইয়া দেয়; এবং চির-ধ্যানের বস্তুকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া এইরূপ ভাবে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা উহারা কর্ত্তব্য জ্ঞান করে। বড়লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে যেরূপ তাহাদের নিকট নিজের নাম লিখিয়া পাঠাইতে হয়— এই স্বর্ণপত্রগুলি এই অবজ্ঞাত উপেক্ষিত পুরাতন পুণ্যপীঠের হস্তে অর্পিত একপ্রকার "সাক্ষাৎকার-পত্র" বলিলেও চলে।

দিবাবসানে, আবার বারাণসীনগরে ফিরিয়া আসিয়া আমার ভ্রমণ-সহচর তাঁহার এক বন্ধুর বাগানবাটীতে গাড়ী থামাইলেন। ইনিও তাঁহারই ন্যায় জাতিতে ব্রাহ্মণ, দর্শনশাস্ত্রে ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। ফলাদি আহার ও জল পান করিবার জন্য আমাকে তিনি সেইখানে লইয়া গেলেন। (বলা বাহুল্য, একজন ম্লেচ্ছ সঙ্গে আছে বলিয়া, তিনি স্বয়ং খাদ্যপানীয় গ্রহণ পক্ষে বিশেষ সতর্ক ছিলেন।) বাড়ীটি পুরাতন কিন্তু অতীব রমণীয়। ইহার সংলগ্ন একটি উদ্যান আছে— উদ্যানের রাস্তাগুলি একেবারে সোজা, আমাদের অনুকরণে ধারে ধারে চির-হরিৎ তরুরাজি এবং ফ্রান্সের সেকেলে বাগানের মত, ফোয়ারা-বিশিষ্ট জলের চৌবাচ্চা রহিয়াছে; আমাদের দেশের

গোলাপাদি ফুলও রহিয়াছে; শীতের প্রভাবে কতকগুলা গাছ পত্রহীন হইলেও,—এই সকল ফুল, এই বায়ুর উত্তাপ, এই সকল হলুদে পাতা দেখিয়া মনে হয় যেন গ্রীষ্মঋতু শেষ হইয়া আসিতেছে, অথবা খর-রৌদ্র শরতের আবির্ভাব হইয়াছে; যেন বৃষ্টির অভাবে এই শরৎ অকালে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে—আলোকের আতিশয্যে বিষণ্ণভাব ধারণ করিয়াছে...

১২

খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে বারাণসীর তত্ত্বজ্ঞানীদের অভিপ্রায়।

বারাণসীর তত্ত্বজ্ঞানীরা বলিলেন:—"যদি তোমরা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হও,—তোমরা যাহা পাইয়াছ তাহাই সযত্নে রক্ষা কর। তাহার ওদিকে আর যাইও না। খৃষ্টধর্ম্ম একটি চমৎকার আদর্শ—বহুশতাব্দী হইতে ইহা পাশ্চাত্যদিগের ঠিক্ উপযোগী হইয়া রহিয়াছে, এবং ইহার মূলে সত্য অবস্থিত। তোমরা খৃষ্টকে পাইয়া একজন দেব-প্রতিম গুরুকে পাইয়াছ—এমন একটি গুরু যিনি চিরকালই জীবিত আছেন;—কেন না এ জগতে মৃত বলিয়া কিছুই নাই; তিনি তোমাদের "মুখ্য পথ ও জীবন"; এবং মৃতেরা তাঁহাতে যে আশা স্থাপন করে সে আশা হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে না।

কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মের যদি কোন বিশেষ মত, "যে অক্ষর প্রাণঘাতী",—ধর্ম্মগ্রন্থের সেইরূপ কোন আক্ষরিক অংশ যদি তোমাদের যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে তুমি আমাদের নিকটে আসিও। যদি তোমার নিকট ভক্তির পথ, প্রার্থনার পথ রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমরা তোমার সম্মুখে সুসূক্ষ্ম জ্ঞানের পথ উদ্‌ঘাটিত করিব; সে পথটি অধিকতর দুরূহ ও অধিকতর কঠোর, কিন্তু কল্পকাল পূর্ণ হইলেই, ঐ উভয় পথই আবার একত্র আসিয়া মিলিত হয় এবং একই গন্তব্যস্থানে লইয়া যায়।"

আরও তাঁহারা বলিলেন:—"প্রার্থনা বোধ হয় ছোট ছোট জাগতিক ঘটনার গতি ফিরাইতে পারে না। কিন্তু আত্মার ক্রমোন্নতি ও শান্তিলাভের পক্ষে প্রার্থনাই শ্রেষ্ঠ উপায়।

আমরা ইহা বিশ্বাস করি না যে, মহান্ ঈশ্বর,—(এই ঈশ্বরের কথা এখানে সকলেই বর্জ্জন করে) মানুষের প্রার্থনা শোনেন। কিন্তু আমরা যাহারা জীবিত আছি আমাদের চতুর্দ্দিকে, সেই মহান্ ঈশ্বরেরই অংশসমূহ, পৃথক সত্তায় পরিণত হইয়া, শুভঙ্কর আত্মারূপে সূক্ষ্মজগতে ছড়াইয়া রহিয়াছে!...আর তোমরা খৃষ্টান—তোমাদিগকে খৃষ্ট আহ্বান করিতেছেন; তিনি যে আছেন সে বিষয়ে সন্দেহ করিও না—অন্তত তাঁহার মধ্যে কেহ-না-কেহ অবস্থিতি করিতেছেন—তাঁহার কোন আত্মীয় অবস্থিতি করিতেছেন; তিনিই তোমার বাক্য শ্রবণ করেন।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাতীয় উদ্দীপনা ও জাতীয় শিক্ষা।

কিছুদিন হইতে বাঙালীর প্রাণে যে নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে তাহা সকলেই লক্ষ্য করিতেছেন কিন্তু কেন এ উদ্দীপনা?

যতদিন মানুষ দাসত্ব করিয়া, অর্থোপার্জ্জন করিয়া, পান ভোজন করিয়া, নিদ্রা ও দ্যূত ক্রীড়ায় বেশ আরাম ও সুখ অনুভব করে ততদিন তাহার মনে এইরূপ উদ্দীপনা জাগরিত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। যে দেশে সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ লোক, মৃগ পক্ষীর ন্যায় আহার নিদ্রায় তৃপ্ত হইয়া জীবনধারণ করে, কোন উচ্চাভিলাষের সংবাদও রাখে না, সে দেশে জাতীয় উদ্দীপনা সম্ভবপর নহে। কিন্তু এক অদ্ভুত মানব সহসা এইরূপ জনসমাজে আবির্ভূত হন। তাঁহার প্রাণ সেই সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তৃপ্ত হইতে পারে না। তিনি মনশ্চক্ষে স্বার্থময় ক্ষুদ্র জীবনের অতীত স্থানে, আহার পান আমোদতৃপ্ত জীবনের অতীতস্থানে আর একটী উন্নত, পবিত্র, সুন্দর জীবনের, উচ্চতর মনুষ্যত্বের ছবি দেখিতে পান। এই আদর্শ জীবনের ছবি তাঁহার নিকট এমনই সুন্দর, এমনই বাস্তব প্রতীয়মান হয় যে পার্থিব ক্ষুদ্র জীবন, স্বার্থময় সাংসারিক জীবন, তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ ও নগণ্য হইয়া পড়ে। তিনি বর্ত্তমান ক্ষুদ্র জীবনকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া অহরহঃ ভবিষ্যপটে নূতন, সুন্দর, মহত্তর জাতীয় জীবনের ছবি আঁকিতে আঁকিতে তন্ময় হইয়া পড়েন। এই আদর্শ জীবনের নিত্য সাধনা তাঁহার প্রাণে নূতন শক্তি, নূতন উদ্যম, নূতন সাহসের সঞ্চার করে; তাঁহার কণ্ঠে অলৌকিক বাগ্মিতার আবির্ভাব ও মনে দুর্জ্জয় বলের সঞ্চার হয়। তিনি দেবাদিষ্ট হইয়া, অপরাজিত সংকল্পে জাতীয় জীবনকে বর্ত্তমানের দুর্গতি হইতে ভবিষ্যতের উন্নত রাজ্যে টানিয়া লইয়া যান। ঈদৃশ অনুপ্রাণিত ব্যক্তি যখন সমগ্র বলের সহিত স্বরচিত আদর্শকে বহুসংখ্যক মানবের মধ্যে নিক্ষেপ করেন, তখন তাহা ঝটিকাসংকুল নদীবক্ষের ন্যায় জনসমাজকে আলোড়িত ও বিলোড়িত করিয়া দেয় এবং তখনই জাতীয় উদ্দীপনার জন্ম হয়। আজ বঙ্গবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে যে জাতীয় উদ্দীপনা নৃত্য করিতেছে, বর্ত্তমান জীবনে যে অতৃপ্তি জন্মিয়াছে ও ভবিষ্যৎ জীবনে যে আশা ও বিশ্বাস স্থাপিত হইয়াছে তাহার মূলে কি দেখিতে পাই? এই বর্ত্তমানে অতৃপ্তি ও ভবিষ্যতে আশা প্রথমতঃ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রাণে সঞ্চিত হইয়াছিল। তৎপরে অক্ষয় কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বঙ্গের প্রতিভাশালী মহাত্মাগণের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ক্রমে উহা সাহিত্য ও কাব্যের

মধ্য দিয়া, সংবাদপত্র ও বক্তৃতার মধ্য দিয়া, বিদ্যালয়, জনহিতৈষণা ও ধর্ম্মোপদেশের মধ্য দিয়া জনসাধারণের প্রাণে সংক্রামিত হইয়া দেশের চিন্তাভাব রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, রুচি আকাঙ্ক্ষার সম্যক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে এবং একটী শিল্প সাহিত্য, বাণিজ্য রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি সঞ্জীবিত কর্ম্মঠ জাতীয় জীবনের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করিয়া দেশবাসিগণের প্রাণে সামাজিক ঐক্য বন্ধনের আদর্শ জাগাইয়া তুলিয়াছে। ঈদৃশ আদর্শানুরূপ জীবনলাভের জন্য আজ বাঙালীর প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। সেই ব্যাকুলতার তীব্রোচ্ছ্বাস আজ বঙ্গভূমিতে জাতীয় উদ্দীপনার আকার ধারণ করিয়াছে।

আর এক কারণে জাতীয় উদ্দীপনা স্ফুরিত হইয়া থাকে। তাহা সাধারণের শিক্ষা। জ্ঞানকে যদি কতিপয় ব্যক্তিমাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তবে জনসমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি অজ্ঞানান্ধকারে পড়িয়া থাকে এবং সেজন্য তাহাদের মনে জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য জাগিতে পারে না। শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিলে মানবমনে যে সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, শিক্ষা ও জ্ঞানবর্জ্জিত ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। সুতরাং উচ্চ অধিকার লাভের চেষ্টাও তাহাদের জীবনে স্ফুরিত হয় না। বিগত শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার হওয়াতে জনসাধারণ, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে, শিক্ষালাভ করিয়াছে। ইংরাজের সাহিত্যের মধ্যে, ইতিহাসের মধ্যে, বিজ্ঞানের মধ্যে এমন একটী স্বাধীনতার শক্তি নিহিত, এমন একটী কর্ম্মশীলতার সজীব স্রোত প্রবাহিত, এমন একটী সাংসারিক জীবনের সফলতা ও সুখস্বচ্ছন্দতার ভাব বিদ্যমান, এমন একটী জাতীয়তার প্রবলভাব সঞ্চারিত, যাহা দ্বারা ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অল্পবিস্তর অনুপ্রাণিত হইয়া থাকেন। এদেশে ইংরাজি শিক্ষার কি অনিষ্ট হইয়াছে তাহার বিচার এখন করিতেছি না, কিন্তু দেশে ইংরাজীশিক্ষার প্রচার হওয়াতে জনসাধারণের মনে একটী সাম্য ও স্বাধীনতার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহা হইতে দেশবাসিগণের মনে ধীরে ধীরে বর্ত্তমানে অতৃপ্তি জন্মিয়াছে। তাঁহারা সামাজিক স্বাধীনতা ও সাম্যের জন্য আশা ও উৎসাহের সহিত ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। ইংরাজীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের যুগে, কলিকাতায় হিন্দুকলেজ স্থাপনের সময়ে, মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার, ডিরোজিও, কাপ্তেন রিচার্ডসন্ প্রভৃতি প্রতিভাশালী প্রেমিকহৃদয়, স্বার্থশূন্য ইয়ুরোপীয় শিক্ষকগণ তখনকার যুবকগণের মনে স্বাধীনতা ও সাম্যের ভাবটী বিশেষরূপে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। সে সময়ের ইংরাজীতে কৃতবিদ্য বঙ্গীয় যুবকগণের চিন্তা ভাব ও কার্য্য, বর্ত্তমান বা অতীতের মধ্যে কোন পরিতৃপ্তির সামগ্রী খুঁজিয়া না পাইয়া বর্ত্তমান ও অতীতের বন্ধন হইতে একেবারে মুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ডিরোজিও ও কাপ্তেন রিচার্ডসনের মনস্বী, কৃতবিদ্য শিষ্যগণ সকলেই সংস্কারক হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের একজনের জীবনও বিফলে যায় নাই। যাঁহারা এই যুবকগণের কর্ম্মশীলতা ও সংস্কারোদ্যমের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবল

প্রভাব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই সংস্কারকদল নানা প্রকারে জনসাধারণের মনে বর্ত্তমানে অতৃপ্তি জাগরিত এবং ভবিষ্য জীবনের আদর্শ মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। সে প্রবল চেষ্টা নিষ্ফল হইবার নহে। তাহারই ফলে আজ বঙ্গদেশে জাতীয় উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু একটী কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে এই শিক্ষার প্রসার ভারতে যতটুকু হইয়াছে, কোটী কোটী অধিবাসীর মধ্যে তাহার স্থান নিতান্ত অল্প। এখনও বহুসংখ্যক ভারতবাসী নূতন আকাঙ্ক্ষা, নূতন আশা, নবজীবনের আদর্শ লাভ করিতে পারে নাই। শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবই তাহার কারণ। কেবল যাঁহারা শিক্ষা ও শিক্ষাভাস লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেই বর্ত্তমান উদ্দীপনার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এই উদ্দীপনার দুই চারিটী তরঙ্গ বহুসংখ্যক অশিক্ষিত ভারতবাসীর প্রাণের উপর গিয়া আছাড়িয়া পড়িতেছে মাত্র। একথা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিলে অসঙ্গত হইবে না যে নবপ্রসূত জাতীয় ভাবকে স্থায়ী ও গভীর করিতে হইলে, ভারতের কোটী কোটী অশিক্ষিত অধিবাসীকে শিক্ষা দান করা প্রয়োজন।

আর এক কারণেও জাতীয় উদ্দীপনার জন্ম হইতে পারে। উহা বিদ্বেষ। যখন কোন জাতির স্বার্থ, সম্ভ্রম বা ধর্ম্মের সহিত অন্যজাতির সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তখন প্রথমোক্ত জাতির মধ্যে উদ্দীপনার আবির্ভাব হইয়া থাকে। সেই জাতি যদি হীন বীর্য্যও হয় তবে সেই সময়ে তাহার লুপ্ত বলবিক্রম ফিরিয়া আসে। আত্মকলহ দূর হইয়া তখন সেই জাতির মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগিয়া উঠে; অনৈক্য দূর হইয়া একতা সংঘটিত হয় এবং সমবেত ভাবে কার্য্য করিবার শক্তি স্ফুরিত হইয়া উঠে। তখন তাহারা বিষম বিদ্বেষ ও রোষের তাড়নায় দেহ, মন, প্রাণ ও অর্থ ঢালিয়া আপনাদের স্বার্থ, সম্ভ্রম বা ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারে সমবেত ভাবে কার্য্য করিতে থাকে। ইতিবৃত্তে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। অতএব দেখা যায় উচ্চতর জীবনের আদর্শের ন্যায় বিদ্বেষপ্রসূত উদ্দীপনার ফলেও হীনবীর্য্য জাতির মধ্যে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠগুণ সমূহ স্ফুরিত হইতে পারে। কিন্তু বিদ্বেষপ্রসূত উদ্দীপনা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। বিদ্বেষের কারণের অবসানে বিদ্বেষেরও অবসান হয়। কিন্তু বিদ্বেষ বিলুপ্ত হইলেও দেখা যায় যে তাহার ফল স্বরূপ জাতিটীর মধ্যে সুন্দর ঐক্য ও প্রেম সংঘটিত হইয়াছে; শক্তি স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছে; সংকল্প ও দৃঢ়তা, সাহস ও স্বাবলম্বন জাগিয়া উঠিয়াছে। ফলটী বাহির হইয়া পড়িলেই ফুলটীর দলগুলি ঝরিয়া পড়ে; ডিম্বের মধ্য হইতে পক্ষিশাবকটী বাহির হইয়া পড়িলেই আবরণটি খণ্ডে খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যায়; অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়া গেলে বাঁশের ভারা খুলিয়া ফেলে। তেমনি জাতিটার মধ্যে মনুষ্যত্বের উচ্চ গুণ সমূহ বিকশিত করিয়া দিয়া উদ্দীপনার মূল কারণ—বিদ্বেষও অন্তর্হিত হয়। তখন যদি সেই জাতিটীর সম্মুখে উচ্চতর জীবনের আকাঙ্ক্ষা, নূতন জীবনের আশা বিদ্যমান থাকে, তবেই তাহার পুনর্গঠন সুন্দরভাবে আরম্ভ হইয়া যায়।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে যে জাতীয় উদ্দী-

পনা সংঘটিত হইয়াছে, দেখা যাইতেছে যে তাহার মধ্যে অল্লাধিক পরিমাণে এই তিনটী উপাদানই বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথম, একটী উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা স্ফুরণ—বর্ত্তমানে অতৃপ্তি ও ভবিষ্যতে আশা; দ্বিতীয়, সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং তৃতীয়, অধুনা বঙ্গবিভাগে বাঙালী জাতির বিদ্বেষ না হউক প্রবল অসন্তোষ ও বিরক্তি। এই তিনটী কারণও একত্রিত হইয়া বঙ্গদেশে বর্ত্তমান জাতীয় উদ্দীপনাকে স্ফুরিত করিয়া দিয়াছে এবং তাহার ফলস্বরূপ এই নিশ্চেষ্ট জাতির মধ্যে অল্পদিনের মধ্যেই মনুষ্যত্বের গুণ সমূহ বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।

এখন প্রশ্ন এই, যে আমরা এই নব নিঃসৃত জাতীয় উদ্দীপনাকে কোন্ পথে পরিচালিত করিব? সমালোচনা, ঘৃণাপ্রকাশ ও অত্যাচারের আন্দোলন করিয়াই কি আমাদের উৎসাহ ও উদ্যম ব্যয় হইয়া যাইবে? অথবা আমরা দেশের পুনর্গঠনের জন্য স্থায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব? অনেকে বলেন কার্য্য ত হইতেছে। সে কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমার মনে হয় কোলাহলের তুলনায় দেশে কার্য্যের সংখ্যা ও সমষ্টি অতি অল্পই হইয়াছে। ভাঙার কার্য্য একপ্রকার, গড়ার কার্য্য অন্যপ্রকার। সমালোচনা, ঘৃণাপ্রকাশ, অত্যাচারের প্রতিবাদ এ সকল সমবেত কার্য্য হইলেও—কিয়ৎ পরিমাণে প্রয়োজনীয় কার্য্য হইলেও, আসল কার্য্যের তুলনায় নিতান্ত লঘু। ইহা দ্বারা উদ্দীপনা হয়, কিন্তু গঠন হয় না। আন্দোলন অনেক হইতেছে, এখন দেশের কল্যাণপ্রদ বিচিত্র কার্য্যাবলীর সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে নীরবে প্রবৃত্ত হওয়াই প্রয়োজন।

দেখা যাইতেছে বর্ত্তমানে এই জাতীয় উদ্দীপনার প্রধান লক্ষ্য দেশীয় বস্ত্রের উন্নতি ও বিস্তার। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের অনুষ্ঠান যে না হইতেছে এমন নহে। কিন্তু যাহাতে দেশের লোক দেশজাত উপাদানে ও দেশীয় পরিশ্রমে দেশের পরিধেয় দেশেই প্রস্তুত করিতে পারে, এই জাতীয় উদ্দীপনার স্রোত আপাততঃ এই একটী লক্ষ্যে—একটীমাত্র প্রণালী অবলম্বনে প্রধানতঃ প্রবাহিত হইতেছে। কোন জাতির মধ্যে যখন উদ্দীপনা আসে, তখন সেই জাতির যে অভাবটী সর্ব্বপ্রধান, প্রথমে উহা প্রবলবেগে তাহারই উপর গিয়া পড়ে। সম্প্রতি বঙ্গদেশে বয়ন শিল্পের পুনরুদ্ধার সর্ব্বপ্রধান প্রশ্ন। সুতরাং জাতীয় উদ্দীপনা প্রথমতঃ এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই প্রবল বেগে প্রবাহিত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু একটী জাতিকে সম্পূর্ণরূপে গঠিত করিয়া তুলিতে হইলে একটী অথবা দুই চারিটি মাত্র উপায় অবলম্বন করিলে বিশেষ ফল হইবে না। যাহাতে সেই জাতির সর্ব্ববিভাগে শক্তি সঞ্চার ও সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ হয়, সমবেত চেষ্টায় তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে বহুদর্শী মালী, সে একটী ডালে ফুল ফুটাইতে চেষ্টা করে না; কিন্তু এমন সকল নিয়মে, এমন কৌশলে গাছটীর পাট করে যে যথাসময়ে সকল ডাল গুলিতেই ফুল ফুটিয়া উঠে। আমাদিগকে বিশেষ প্রণিধান করিতে হইবে যে বস্ত্রশিল্প অথবা দুই চারিটী অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি প্রকৃতপক্ষে জাতীয় উন্নতি নহে,

উহার নিতান্ত আংশিক অনুষ্ঠান মাত্র। যাহাতে সমগ্র জাতিটীর মধ্যে শারীরিক ও নৈতিক বল এবং ধর্ম্মশক্তি জাগিয়া উঠে; সাহিত্য, দর্শন; বিজ্ঞান, ইতিহাস; শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি; গার্হস্থ্য ও সামাজিকতার উন্নততর বিকাশ লাভ হয়, এ সকলের উৎকৃষ্ট শিক্ষা ও সাধনা হয়; যাহাতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের প্রযুক্ত অনুশীলন হয়,—এক কথায় যাহাতে জাতিটীর সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্ব লাভ হয়, আমাদিগকে এখন এই প্রকার বহুমুখী প্রণালী মধ্যে জাতীয় উদ্দীপনাকে প্রেরণ করিতে হইবে। মনে করিয়া রাখিতে হইবে যে অন্ন বস্ত্র সংগ্রহ জাতীয় উন্নতির লক্ষ্য নহে। কেবল অন্ন বস্ত্রের উপর যে জাতীয় আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত তাহা অতিসঙ্কীর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী। সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বলাভই জাতীয় উদ্দীপনার লক্ষ্য, অন্নবস্ত্রের স্বচ্ছন্দতা তাহার অবশ্য ভাবী ফল। বর্ত্তমান জাতীয় উদ্দীপনাকে সর্ব্বাগ্রে সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের উন্নত শিখরে স্থাপিত করিতে হইবে। কিন্তু রীতিমত শিক্ষা ব্যতীত দেশে এরূপ পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব প্রস্তুত হইতে পারে না।

ভারতে ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত নিম্ন ও উচ্চ শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধে বহুদিন ধরিয়া এই অভিযোগ শুনা গিয়াছে যে তাহা আমাদিগের সন্তানগণকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে নাই। এই যে মানুষ করিয়া তুলা, এ সম্বন্ধে একটু বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। যে জাতির যেরূপ জীবনাদর্শ, সে জাতি তাহার সন্তানগণকে তদনুসারে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য শিক্ষা প্রদান করে। জার্ম্মাণী আপন আদর্শানুসারে তাহার সন্তানগণকে মানুষ করিয়া তুলিতেছে। ইংলণ্ড নিজের আদর্শানুসারে সন্তানগণকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য শিক্ষা দিতেছে। নব অভ্যুদিত জাপান নূতন আকাঙ্ক্ষায় শক্তিশালী হইয়া, তদনুসারে আপনার সন্তানগণকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য শিক্ষা দিতেছে। প্রাচীন গ্রীস ও রোম এবং প্রাচীন ভারত, সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বের যে সকল আদর্শ লাভ করিয়াছিল, তদনুসারে শিক্ষা দিয়া আপনাপন সন্তানবর্গকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা যাহা প্রয়োজন মনে করিয়াছে স্বাধীনভাবে শিক্ষালয় গড়িয়া সন্তানগণের প্রতি তাহারই শিক্ষা বিধান করিয়াছে ও করিতেছে। কিন্তু পরাধীন জাতির শিক্ষা অন্য প্রকার হইয়া থাকে। পরাধীনতা যে ভাল একথা কেহই বলিবেন না। আবার পরাধীনতা যে সব সময় মন্দ এ কথাও বলা যাইতে পারে না। এই ত আমাদের রাজগণের পূর্ব্বপুরুষ রোমের হাতেই মানুষ হইয়াছিলেন। তবে সকল বিষয়েরই একটা স্বাভাবিক সীমা আছে। ইংরাজ ভারতে রাজশাসনের সহায়তা করিবার জন্যই মুখ্যত এদেশীয়গণের শিক্ষা বিধান করিতেছেন। সুতরাং ইংরাজপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় হইতে বর্ষে বর্ষে যে সকল যুবক শিক্ষালাভ করিয়া বাহির হইতেছে তাহারা ঠিক্ রাজশাসনে সহায়তা করিবারই উপযুক্ত হইতেছে। তদতিরিক্ত আর কিছু হইতেছে না। তদতিরিক্ত আরকিছু হইতে গেলেই, অর্থাৎ আসল মানুষটী হইতে গেলেই একটু তফাতে দাঁড়াইয়া মনুষ্যত্বের সাধনা করা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। দুই একটী আসল মানুষ এই শিক্ষাযন্ত্রের মধ্য

হইতে সবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া তফাতে দাঁড়াইয়াছেন। যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়। বঙ্গদেশে এইরূপ আসল মানুষ কয়েকটী মাত্র জন্মিয়াছিলেন। তাঁহারা নিজের তেজে, নিজের চেষ্টায় মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগেরই পুণ্যবলে আজ বঙ্গদেশে জাতীয় উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে। সে যাহা হউক, অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় বুঝা গিয়াছে যে ইংরাজরাজ নিয়ম প্রবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন; সংস্কার, পুনঃসংস্কার করিয়া ভারতে যে প্রকারেই বিদ্যালয়ের গঠন করুন, তাঁহারা আমাদিগের পক্ষে যে প্রকার শিক্ষা প্রয়োজন মনে করিতেছেন তাহাই; দিবেন, আমরা অতঃপর আমাদিগের পক্ষে যে প্রকার শিক্ষা প্রয়োজন মনে করিতেছি তাহা আমাদিগকে কখনও দিবেন না, দেওয়া সম্ভবও নহে। সত্যবটে, অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে রাজশক্তি প্রজাশক্তিকে সর্ব্বাঙ্গীন বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে, পক্ষান্তরে উন্নত প্রজাশক্তিও উদাসীন রাজশক্তিকে চেতনা দিয়া—উত্তোলন করিয়াছে। কিন্তু যেখানে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি উভয়ে সমজাতীয় ও সমসামাজিক স্বার্থজড়িত, সেই খানেই পরস্পরের প্রতি এইরূপ প্রভাব বিস্তার ও পরস্পরের উচ্চ মনুষ্যত্ব লাভে সহায়তা করা সম্ভব। যেখানে রাজা ও প্রজা পরস্পরের নিকট বৈদেশিক এবং যেখানে তাঁহাদের সামাজিক আদর্শ ও জাতীয় স্বার্থ মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান, তথায় এ প্রকার প্রভাব ও সহায়তা অসম্ভব। এস্থলে বৈদেশিক রাজা মনুষ্যত্ব বলিয়া, শিক্ষা বলিয়া যেটুকু প্রজার হাতে তুলিয়া দিবেন, সে টুকুতে যদি তাহার আকাজ্ক্ষার তৃপ্তি না হয়, তবে প্রজা তাঁহার বিরুদ্ধে লাঠি ধরিয়া দাঁড়াইবে অথবা তাঁহাকে কেবল গালাগালি দিতে থাকিবে—ইহা আমি বাতুলতা মনে করি। কিন্তু সে ক্ষেত্রে প্রজাকে যে স্বচেষ্টা ও স্বাবলম্বনে নিজের পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের উপায় নিজেই করিয়া লইতে হইবে একথা নিশ্চয়।

কিন্তু এ সকল যুক্তিতে একটী কঠিন সত্য অপ্রমাণ হইয়া যায় না। তাহা এই যে বিগত শতাব্দীর ইংরাজি শিক্ষা যদিও আমাদিগকে আসল মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে নাই, কিন্তু আসল মনুষ্যত্বের আদর্শ আমাদিগের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে জাগাইয়া তুলিয়াছে। ইংরেজের আমাদিগকে শিক্ষা দিবার মুখ্য উদ্দেশ্য, আমাদিগকে তাঁহার রাজশাসনে সহায়তা করিবার উপযোগী করিয়া লওয়া। কিন্তু তাহার গৌণফল এই হইয়াছে যে একটী আধুনিক সজীব জাতির এবং জগতের সমস্ত সভ্য জাতির শিল্পবাণিজ্য ও সামাজিক কার্য্যশীলতার প্রবল স্রোত সেই শিক্ষার মধ্য দিয়া আমাদের কল্পনাপ্রবণ, ভাবুক, নিশ্চেষ্ট জাতিটার উপর সবেগে পতিত হইয়া, ইহাকে আলোড়িত করিয়া দিয়াছে, চেতনা দিয়াছে ও বর্ত্তমান জীবনের প্রতি ঘোর বিরক্তি জন্মাইয়া, একটী অভিনব জীবনের ছবি ইহার চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছে। প্রাচীনে ও নবীনে দেশমধ্যে ঘোর বিপ্লব ঘটাইয়াছে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সংঘর্ষে এই জাতীয় উদ্দীপনা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে ইংরাজী শিক্ষার এমন এক শক্তি আছে যদ্দ্বারা এদেশে নূতন আকাজ্ক্ষা জন্মিতে পারে, কিন্তু তাহার এমন শক্তি নাই যদ্দ্বারা সেই আকাজ্ক্ষার তৃপ্তি হইতে পারে।

কেন পারে না? তাহার একটী নিগূঢ় কারণ আছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের সংঘর্ষে আমরা যে আদর্শ লাভ করিয়াছি, তাহা জগতে সম্পূর্ণ নূতন। আধ্যাত্মিকতা প্রাচীন ভারতসভ্যতার প্রাণস্বরূপ ছিল; আর ঐহিক সুখস্বচ্ছন্দতার উৎকর্ষ সাধনই আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিমূল। ইংরাজী শিক্ষা শেষোক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এতদ্বারা ভারতীয় জীবনের একটী অবিকাশিত অংশ বিকাশ লাভ করে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার প্রকৃতিগত আধ্যাত্মিকতার তৃপ্তি হয় না। তদ্ব্যতীত ইংরাজী শিক্ষায় আমরা যে সকল তত্ত্ব লাভ করিয়াছি, আমাদের ব্যক্তিগত, গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনে তাহার স্ফূর্ত্তির কোন পন্থা নাই। ভারতে ইংরাজশাসনপ্রণালী এবং এদেশের সামাজিক স্থিতিশীলতা তজ্জন্য তুল্যরূপে দায়ী। আমাদের সম্মুখে আজ যে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের আদর্শ দণ্ডায়মান, তাহা ঐহিকতা ও আধ্যাত্মিকতা উভয়ের সম্মিলন; এ দুইটীর কোনটীই বিচ্ছিন্নভাবে সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করিতে পারে না। আমরা নূতন আদর্শ লইয়া বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়াছি। নবীন আদর্শের সফলতার জন্য ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রসংহিতাদি একদিকে যেমন আমাদের নিকট যথেষ্ট বোধ হইতেছে না, অন্যদিকে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার একদেশদর্শী সাংসারিক লক্ষ্য এবং তদুপযোগী কর্ম্ম সকলও, যথেষ্ট বোধ হইতেছে না। আমরা কর্ম্মকে ছাড়িয়া আর ধর্ম্মে তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না; ধর্ম্মকে ছাড়িয়া কর্ম্ম লইয়াও আমাদের জীবন বাঁচে না। কেন না এ দুইয়ের সম্মিলনই আমাদের লক্ষ্য। যখন প্রাচীন ও নবীন জগৎ কেহই আমাদিগের এই লক্ষ্য সাধনে সহায়তা করিতে পারিতেছেন না, তখন এই গুরুতর সমস্যার সমাধানের ভার আমাদের নিজেদের স্কন্ধেই আসিয়া পড়িতেছে।

এই আদর্শানুসারে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইলে আমাদিগকে এমন একটি সার্ব্বভৌমিক, স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে যদ্দ্বারা জগতের প্রত্যেক জাতিই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করত আপন স্বাতন্ত্র্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। বিশ্বরাজ্যে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায় যে একটী নিগূঢ় প্রণালীতে ইহার যাবতীয় পদার্থ স্বতন্ত্র ও সংশ্লিষ্টভাবে পরিণতি লাভ করিতেছে। উহা গ্রহণ এবং বর্জ্জনের প্রণালী। জড়চেতনপূর্ণ বিচিত্র বিশ্ব এই অটল নিয়মাবলম্বনে এতন্মধ্যস্থ প্রতি পদার্থের, প্রতি জীবের, প্রতি সম্প্রদায়ের, প্রতি জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করত, আনন্দ সংগীত তুলিয়া, মৃদুমন্দগতিতে ভবিষ্য সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ব্যক্তিগত মানবজীবন ও চরিত্র বিকাশ যেমন এই নিয়মের অধীন, সামাজিক ও জাতীয় জীবন গঠনও এই গ্রহণ বর্জ্জনের নিয়মের তেমনি অধীন। ইহার ব্যতিক্রমে বিকৃতি ও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। জগতে যে কোন সুসভ্য, স্বাধীন ও সজীব জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করা যাউক, দেখিতে পাওয়া যাইবে, যে সে স্বকীয় অধম বিষয় গুলিকে বর্জ্জন করিয়াছে এবং উত্তম বিষয়গুলিকে অক্ষুন্ন রাখিয়া, বহল পরিমাণে পরকীয় উত্তম বিষয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সহিত মিলিত করিয়া পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান রাজা

ইংরাজ জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে গ্রীক শিল্প ও দর্শন; রোমান ধর্ম্ম ও রাজনীতি এবং স্বকীয় স্বাভাবিক কর্ম্ম-শীলতা, সাধারণতঃ এই তিন উপাদানের সংযোগে ইঁহাদের যে সভ্যতার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহাই ক্রমবিকশিত হইয়া এক্ষণে প্রবল এবং সুন্দর আকার ধারণ করিয়াছে। আমেরিকান ইংরাজ ইয়ুরোপীয় ইংরাজ অপেক্ষা সমধিক উদার প্রকৃতি। এজন্য গ্রহণ বর্জ্জনে প্রশস্তহৃদয় আমেরিকান ইংরাজ তাঁহাদের ইংলণ্ডীয় ভ্রাতৃবৃন্দ অপেক্ষা বহু পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন। জাপানের কথা আলোচনা করিলেও এ কথার স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। কয়েকবর্ষ পূর্ব্বে যাহার সভ্যতাচেষ্টা, স্ফুরণের উপক্রম মাত্র করিতেছিল, আজ আমরা সেই জাতির নবীন, সতেজ, স্পর্দ্ধিত সভ্যতার প্রতি বিস্ময় বিমুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া আছি। তাহার কারণ এই যে জাপানের শিক্ষা ও সাধনার মধ্যে এই স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ গ্রহণ বর্জ্জনের প্রণালী বিদ্যমান রহিয়াছে। জাপান যদি শম্ভ ও শম্বুকের ন্যায় আপন আবরণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, নীরবে তথায় আবদ্ধ থাকিত, তবে আজ তাহার এই নবীন সভ্যতার স্ফুরণ একেবারেই সম্ভব হইত না। সে তাহা করে নাই। কিন্তু স্বকীয় অধম বিষয়গুলি পরি-বর্জ্জন করিয়া ইয়ুরোপ ও আমেরিকার উত্তম বিষয়গুলিকে আপনার মধ্যে পোষণ পূর্ব্বক এমনই একটি এসিয়াটীক সভ্যতার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, যাহা হীনপ্রভ এসিয়াটিক জাতি সমূহের সম্মুখে উজ্জ্বল আদর্শরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছে; কেবল তাহাই নহে, কিন্তু অনেক ইয়ুরোপীয় রক্ষণশীল জাতির পক্ষেও শিক্ষার স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলকথা, সংকীর্ণতাই বিকৃতি এবং বিনাশের মূল; সম্প্রসারণই ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবন বিকাশের নিগূঢ় কারণ। যে জাতি এই অজেয় নিয়মের বৈরাচরণ করে তাহার উপর প্রকৃতির নিষ্ঠুর প্রতিশোধ অনিবার্য্য। সুতরাং গ্রহণ এবং বর্জ্জনের নিয়মালম্বনে আমাদের এক্ষণে এমন একটী জাতীয় শিক্ষার প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে যাহা একাধারে ধর্ম্মের ও কর্ম্মের প্রস্ফুরক। সে সকল আলোচনা বারান্তরে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু।

রাইবনীদুর্গ।

[ঐতিহাসিক উপন্যাস।]

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজপুত্রের মুখে সহধর্ম্মিণীর সেরূপ অভাবনীয় সঙ্কটাবস্থার কথা শুনিয়াও শিবাপ্রসন্নদাস কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। পরন্তু যে প্রাণের মায়া না করিয়া তাহার প্রতি-বিধান জন্য ততটা বিপদ আলিঙ্গন করিয়াছে ইহাতেই তিনি কেমন বিবশ বিহ্বল হইলেন। সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর বৎসের প্রতি যেরূপ

অসংযত অনুরাগ, কতকটা সেইভাবে তিনি পদ্মাক্ষনারায়ণকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। অভয়ানন্দ গিরি একটু আগে যে মহানুভবের অনন্তসাধারণ, মানসিক দৃঢ়তায় বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাঁহারই সুকুমার হৃদয়ের এইরূপ কুসুম-কোমলতায় আশ্চর্য্য হইলেন। কিন্তু কল্যাণপণ্ডার সেই বিষম পরীক্ষার সময় ইহা আদৌ ভাল লাগিতেছিল না। তিনি অলক্ষ্যে উঠিয়া গিয়া অবিলম্বে শত অশ্বারোহী সৈন্যের অগ্রে অন্তর্হিত হইলেন।

এ দিকে কুমার পদ্মাক্ষনারায়ণও অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। প্রতি মুহূর্ত্ত তাহার কাছে এক একটা যুগ বলিয়া মনে হইতেছিল। দাদা মহাশয়ের ততটা মোহ তিনি পছন্দ করিতেছিলেন না। বলিলেন—"ও কি দাদামশায়, এই বুঝি তোমার আমাকে ছেলে বেলার মত আদর করার সময়? ছাড়, ছাড়! তেওয়ারির কাছে আমি প্রতিশ্রুত হয়ে এসেছি—তিন চারি দণ্ডের ভিতর ফিরিব।" কল্যাণপণ্ডাকে উদ্দেশ করিয়া রাজপুত্র কহিলেন "পণ্ডামশায়, আমায় একটা ঘোড়া আনাইয়া দিন,—আর সঙ্গে একদল সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার দিন!"

পণ্ডাজীর শূন্য আসনের প্রতি তখন সকলের দৃষ্টি পড়িল। দাসমহাশয় বুঝিলেন, সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ-সদাজাগ্রত রাজপুরুষ পরামর্শে কালক্ষয় সে অবস্থায় মারাত্মক স্থির করিয়া স্বয়ং সসৈন্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। হাসিয়া পদ্মকে বলিলেন—"কল্যাণ ও তোরই মত পাগল। ইহারই ভিতর সে অর্দ্ধেক পথ পার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এত ত্বরার কোন দরকার ছিল না। তুই কি তোর ঠানদিদিকে চিনিস্‌নে ভাই? বাঘিনীকে পিঁজরায় পোরা কি এতই সহজ?"

পদ্ম। তোমার আমার কাছে বাঘিনী বলে কি দুর্বৃত্ত পাঠান সেনার সামনেও তাই? না দাদামশাই! পরের কাজ তুমি যেমন বোঝ, নিজের বেলায় তার কিছুই বোঝ না! আমায় আর ধরে রেখো না! আমি না গেলে দুই জনের কাছে মিথ্যাবাদী হব।—তেওয়ারির কাছে, আর—

নাতিকে বাধা দিয়া দাদামহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কার কাছেরে ভাই? জলে ঝাঁপ দেবার আগে তুই ত তোর ঠান্‌দিদির সঙ্গে দেখা করিস্‌নি? তা হলে কি আর এমন পাগ্‌লামি করতে পারতিস্?"

কিছু অপ্রস্তুতভাবে রাজকুমার বলিলেন—"কেন, আর আমার ঘোড়া চন্দ্রচূড়ের কাছে! তাকে বলে এসেছি, যতক্ষণ আমি না আসি, সে যেন নদীতীর থেকে না নড়ে।"

এমন বাল-সুলভ সারল্য ও বিশ্বস্তভাবে কথাকয়টি উচ্চারিত হইল যে দাসমহাশয় এবং অভয়ানন্দ গিরি তাহাতে একযোগে উচ্চহাস্য না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। শিবাপ্রসন্ন তাঁহার স্নেহ-ভুজবন্ধন আরও নিবিড় করিয়া তুলিলেন।—নহিলে পদ্ম পলাইবে নিশ্চয়!

পদ্মাক্ষনারায়ণের ইহাতে রাগ অভিমান দুইই হইল। রাগের চেয়ে অভিমানটার মাত্রাই বেশী। একটু একটু আর্দ্রস্বরে বলিলেন—"রাগ করোনা দাদা মশাই, কিন্তু আমার বেলায় তোমার কাজে কথায় ঠিক থাকে না। কতবার তুমি শিখিয়েচ যে মিছা কথা অভ্যাস হতে দিতে নেই। এই যে

আজ আমি আস্‌বো বলে গেলাম না, এটা মিছা কথা হ'ল কিনা ?"

দাদা মহাশয় এ অভিমানের যুক্তিটা হাসিয়া উড়াইতে পারিলেন না। বলিলেন,—"তা বেশ, তোর এই মিছা কথায় যে পাপ হবে, আমি তা গ্রহণ করলাম ! এখন হলো ?"

তখন জয়লাভ করিয়া পদ্ম অনুভব করিল যে দাদা মশায়কে ঝগড়ার সময় উচ্চ কথা বলা হইয়াছে—সেটা ভারি অন্যায় হয়েছে ! হাসিয়া কহিল—"আচ্ছা দাদা মশাই,—তুমি যে বল বাসুদেব ঘোষ শ্রীগৌরাঙ্গকে বলেছিলেন—

জীবের দুঃখ দেখে মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীব পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে।

সেটা কি সম্ভব ?"

শিবাপ্রসন্ন অনেকক্ষণ তন্ময় চিত্তে ভগবান স্মরণ করেন নাই। এই কথায় তাঁর রোমাঞ্চ হইল। বাহু-বন্ধ শিথিল করিয়া মনে মনে কহিলেন—"হে প্রভো, এ মোহ মার্জ্জনা করিও।" প্রকাশ্যে বলিলেন—"অসম্ভব কিসে ভাই ? তাঁর পক্ষে অসম্ভব কি ?"

ত্রয়শ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রাধাচরণ এই দৃশ্যে মুগ্ধ হইলেন। পদ্ম দাদামহাশয়ের স্নেহ-পাশ মুক্ত হইয়া মন্ত্রণাগারের বাহিরে উন্মুক্ত বায়ু ও আকাশতলে একটু হাঁফ ছাড়িবার আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিল, কিন্তু গিরি মহাশয় তাহাকে ধরিয়া বসিলেন। "এস বাবা, আমার কোলে একবার বস !"—পদাঙ্ক নারায়ণ তখন পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্মিলিত হয় নাই, কাজেই সে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না, নিতান্ত ভালমানুষটির মত মাতুল মহাশয়ের পদপ্রান্তে গিয়া বসিল। অভয়ানন্দ তাহাকে উৎসঙ্গে বসাইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

পদ্ম দেখিল, এ আর এক বিপদ। খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া দাসমহাশয়কে বলিল—"দাদা মশাই,—আচ্ছা আমায় যেতে নাই দাও, চন্দ্রচূড়কে আনিবার জন্য একটা ঘোড়সওয়ার ত পাঠাতে পার ? সে যেন বন-কুঞ্জে তাকে পৌঁছে দায়। আর এক কথা। দিদিমাকে যেন বলে আসে, তুমি আজ আমায় আটকে রেখে দিয়েচো!" কুমারের কণ্ঠস্বরে বিষাদ সূচিত করিতেছিল।

বুঝিয়া শিবাপ্রসন্ন মনে মনে হাসিলেন। বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "তা বেশ, চল্ আমিও তোর সঙ্গে বনকুঞ্জ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়ে বাঘিনীর অভ্যর্থনা করে আসি! নইলে তোদের ভাইবোনের বাক্যযন্ত্রণায় মাসখানেক আমার অতিষ্ঠ হতে হবে!"

অভয়ানন্দ গিরি তখনও ধ্যান-মগ্ন। কুমার সেটা লক্ষ্য না করিয়া কহিলেন, "মামা, আপনাকেও আমাদের সঙ্গে বনকুঞ্জে যেতে হবে। দিদিমার আদেশ!"

গিরি মহাশয় তদবস্থাতেই পদ্মর মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিলেন। দাস মহাশয় তখন পর্য্যন্ত তাঁহার সম্যক্ পরিচয় পান নাই—বিস্মিত হইয়া পদাঙ্কনারায়ণের মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বুঝিয়া পদ্ম বলিল—"দাদামশাই, তুমি বুঝি আজও জাননা ইনি মামা, দিদিমার সেই হারানো ছেলে ?"

শিবাপ্রসন্ন দাসের মনে যেন কেহ আলোক আনিয়া দিল। তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

কুমারের নদীস্রোতে আত্মবিসর্জ্জনের সঙ্গে

সঙ্গে প্রবর্দ্ধিত বায়ুবেগের ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ কল্পনা করিয়া বিধুণ-তেওয়ারি শোকাকুল হইল। কি করিয়া এ সর্ব্বনেশে-খবর মাঠাকুরাণীকে দেওয়া যায়? কিন্তু খবর না দিলেও নহে। তখন সেই বিষম সঙ্কটকালের যথাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে করিতে তেওয়ারি পাল্‌কীর কাছে ফিরিয়া গেল। কিন্তু শিবিকা ত সেখানে নাই!

ওদিকে সৌদামিনী দেবী পদ্মনারায়ণের প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া শিবিকা হইতে বাহির হইলেন। কুমারের অজ্ঞাতসারে তিনি তীক্ষ্ণ-ধার তরবারি সঙ্গে লইয়া ছিলেন। —কোষমুক্ত করিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে তাহা দক্ষিণ করে ধারণ করিলেন। মশালের আলোকে অসিফলক প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিল। আর সেই বনপথে মাতৃকল্পা প্রভুপত্নীকে সে অভাবনীয় অবস্থায় দেখিয়া লাঠিয়ালের দল প্রাণবিসর্জ্জনে কৃতসংকল্প হইল। তাহারা একবাক্যে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "কালী-মায়ী কি জয়!" তাহাতে কাননতল এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই বেশে দেবী সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইলেন। দেখিয়া মশাল বাহকদের কেহ কেহ অগ্রে দৌড়িল, কয়জন পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিল। মাতার অভিপ্রায় বুঝিয়া পুরাতন সন্তানতুল্য লাঠিয়ালের দল তাঁহাকে মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া ক্ষুদ্র ব্যূহ রচনা করিল। ইহাতে আপনা আপনি যন্ত্রের মত যে অভিযান প্রস্তুত হইল, বীরদর্পী স্বল্পসংখ্যক পাঠান সেনা তাহাতে প্রমাদ গণিল।

বিধুণ-তেওয়ারি দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া অশ্ববেগ সংযত করিল এবং সসম্ভ্রমে যথাসম্ভব ব্যবধান রাখিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। সেই স্থানে এবং কালে কুমারের সংবাদ কর্ত্রীঠাকুরাণীর গোচর করা অবৈধ বলিয়াই বিশেষভাবে আত্মগোপন করিয়া চলিল। কিন্তু বনপথ শেষ হইতে না হইতে অকস্মাৎ একটা গোলমাল হইয়া উঠিল। তখন তেওয়ারি বেগে অশ্বচালনা করিয়া একেবারে অগ্রবর্ত্তী মশালচীদের সমীপবর্ত্তী হইল।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

হিন্দুজাতির বৈজ্ঞানিক উন্নতি

১। বিমান ও লৌহবর্ম্ম।

কি রামায়ণ, কি মহাভারত, অথবা কি পুরাণ-নিবহ, সর্ব্বত্রই আমরা বিমান বা পুষ্পক রথ শব্দের অবতারণা দেখিতে পাইয়া থাকি, ইহার কারণ কি? বস্তুতই কি আমাদিগের দেশে এই নামের কোন "পুষ্পযান" ছিল? না ইহা আকাশকুসুম শব্দের ন্যায় অভাব

পদার্থ ও নিরঙ্কুশ কবিগণের কল্পনা-সাগরের ফেনবুদ্বুদবিশেষ? যে দেশে বিজ্ঞান-চর্চার পরাকাষ্ঠা নারদের ঢেঁকী ও বাঁশের তীর ধনু, সে দেশেও কি বহু বৈজ্ঞানিক কৌশলসম্পন্ন ব্যোমযান ও লৌহযন্ত্রের উদ্ভাবন হইতে পারে? যে জাতি সমুদায় আর্য্যভাষার আদি জননী ও জনয়িত্রী গীর্ব্বাণবাণীর উদ্ভাবয়িতা, যে জাতি সমুদায় সভ্যজগতের পূর্ব্ব পিতামহ ও শিক্ষাদীক্ষার আদিগুরু, যে জাতির সমুভাবিত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, গণিত ও জ্যোতিষ, আরব, মিশর ও গ্রীশ-প্রভৃতি সমুদায় সভ্যজগতে যাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া নানা নূতন শাখা প্রশাখা ও নূতন ফলপুষ্পে বিশোভিত হইয়াছে; যে জাতি এই মহাপতনের মসীকৃষ্ণ তামসযুগেও অধ্যাত্মজগতের বেলোর্দ্ধ সীমায় সমাসীন থাকিয়া সমুদায় জগতের দীক্ষা বিধানে পূর্ণ সমর্থ; যে জাতি কখনও কোন বিষয়ে উত্তমর্ণ ভিন্ন অধমর্ণের ব্রত গ্রহণ করে নাই; সেই জগদ্বরেণ্য হিন্দুজাতির মধ্যে বিজ্ঞানের বিকাশ বা স্ফুরণ হইয়া ছিল না, বৈজ্ঞানিক জগতে তাঁহারা একবারেই বর্ব্বর বা অর্ব্বাচীন ছিলেন,' ইহা হইতেই পারে না। অমর ও মেদিনী-প্রভৃতি কোষকারগণও বলিতেছেন—

"ব্যোমযানং বিমানোঽস্ত্রী"

"বিমানং ব্যোমযানে চ"

সুতরাং বিমান শব্দের ভূরি প্রয়োগ দৃষ্টে বোধ হয়, ইহা কেবল কথায় ছিল না, পরন্তু কার্য্যেও ছিল। অবশ্য আমরা লৌকিক কোষকারক ভিন্ন অন্যত্র কুত্রাপি "ব্যোমযান" শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাইয়া থাকি না (১), কিন্তু কোন শিষ্ট কোন গ্রন্থে উহার প্রয়োগ না করিলে অর্ব্বাচীন পুরাণ ও অমরাদি কখনই উহার পরিগ্রহ করিতেন না। যে যুগে পৌরাণিক ভ্রান্তিবশতঃ মানুষ শূন্যকে নভঃ, অন্তরিক্ষ, আকাশ ও ব্যোম শব্দে সংসূচিত করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়েই বিমানের নামান্তর "ব্যোমযান" হইয়াছিল।

বিঃ পক্ষী এব মানম্
উপমা যস্য তৎ বিমানম্

যাহা পক্ষীর ন্যায় শূন্যে গমনাগমন করিত তাহারই নাম বিমান। এবং উহা শূন্যে গমন করিত বলিয়াই কালে ব্যোমযান নামের বিষয়ীভূত হয়। যক্ষরাজ কুবেরের বিমানের নাম পুষ্পকরথ। রামচন্দ্র তদারোহণে সুদূর লঙ্কা হইতে অযোধ্যাতে আগমন করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও রঘুবংশে তাহা সবিস্তার বিবৃত রহিয়াছে। বিভীষণ বলিতেছেন—

পুষ্পকং নাম ভদ্রং তে বিমানং সূর্য্যসন্নিভং।
মম ভ্রাতুঃ কুবেরস্য রাবণেন বলীয়সা॥৯
হৃতং নির্জ্জিত্য সংগ্রামে কামগং দিব্যমুত্তমং।
ত্বদর্থং পালিতং চেদং তিষ্ঠত্যতুলবিক্রম॥১০

১২১ সর্গ যুদ্ধকাণ্ড।

হে অতুলবিক্রম রামচন্দ্র! এই যে সম্মুখে সূর্য্যসন্নিভ সুগঠিত, অত্যুত্তম দিব্য বিমান দর্শন করিতেছেন, ইহার নাম পুষ্পক। ইহা কামগম, চালকের ইচ্ছানুসারে চালিত হইয়া থাকে। মহাবল ভ্রাতা রাবণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইহা ভ্রাতা কুবেরের নিকট হইতে হরণ করেন। ইহা আপনার জন্য আনীত ও

(১) বেদাঙ্গাদসমূহের অপ্রাপ্তি বা বিরলসন্নিবন্ধন আমরা বৈদিক গ্রন্থ হইতে বিমানাদি শব্দের সত্তা প্রদর্শন করিতে অসমর্থ।

রক্ষিত হইয়াছে। কালিদাস রঘুবংশে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—

কচিৎ পথা সঞ্চরতে সুরাণাং
কচিৎ ঘনানাং পততাং কচিচ্চ।
যথাবিধোমে মনসোঽভিলাষঃ,
প্রবর্ত্ততে পশ্য তথা বিমানম্ ॥১৯-১৩ সর্গ।

হে সীতে! দেখ—আমাদিগের বিমান, কখন অত্যুচ্চ আকাশপথে সঞ্চরণ করিতেছে, আবার কখন মেঘ-সঞ্চার-পথ, কখনও বা পক্ষীদিগের সঞ্চার-মার্গে নামিয়া আসিতেছে। আমি ইহাকে যে ভাবে চালাইতে ইচ্ছা করিতেছি, ইহা সেই ভাবেই চালিত হইতেছে। কুমারসম্ভবে বিবৃত রহিয়াছে—

ভুবনালোকনপ্রীতিঃ স্বর্গিভির্নানুভূয়তে।
খিলীভূতে বিমানানাং তদাপাতভয়াৎ পথি ॥৪৫-২ সর্গ

কোন্ দিক্ দিয়া তারকাসুর আসিয়া আপতিত হয়, এই বুঝি এই দিক্ দিয়া তারকাসুর আসিতেছে, এই ভয়ে দেবতারা তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য স্ব স্ব বিমানে আরোহণপূর্ব্বক আকাশপথে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আকাশ বিমানে বিমানে সমাকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং স্বর্গস্থিত দেবতারা যে অধঃস্থিত ভূলোক দর্শন করিয়া প্রীতি অনুভব করিবেন তাহা আর হইল না। বিমানসমূহে দৃষ্টিপথ সংরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বায়ুপুরাণে বিবৃত রহিয়াছে—

বিমানযানৈরাকাশং
পতত্রিভি'রিবাবৃতম্। ৩৪-১১ অঃ। উত্তরখণ্ড।

শরবণে দেব-সেনানী কার্ত্তিকেয়ের সমুদ্ভব হইলে দেবগণ তদ্দর্শনার্থ স্ব স্ব বিমানে আরোহণপূর্ব্বক আকাশমার্গে সমবেত হইয়াছিলেন। তাহাতে বোধ হইতেছিল যেন পক্ষিশ্রেণী দ্বারা আকাশ সমাবৃত হইয়াছে। মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ও দেবীযুদ্ধের বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়া গিয়াছেন—

হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তি ব্র'হ্মণী সাভিধীয়তে ॥১৪
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা ॥১৫
কৌমারী শক্তিহস্তাচ ময়ূরবরবাহনা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যান্ অম্বিকা গুহরূপিণী ॥১৬
৮৮অ

অক্ষমালা ও কমণ্ডলুধারিণী মহাদেবী ব্রহ্মাণী হংসমূর্ত্তিসমলঙ্কৃত বিমানে, মহাহিবলয়া চন্দ্রলেখা-বিভূষণা মহাত্রিশূলধারিণী মহাদেবী মাহেশ্বরী বৃষভমূর্ত্তিবিলসিত বিমানে * এবং শক্তিহস্তা গুহরূপিণী গুহগেহিনী ময়ূরমূর্ত্তি-সমলঙ্কৃত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে রণাঙ্গনে সমবেত হইলেন।

বেশ জানা গেল তৎকালে আমাদিগের মধ্যে বিমানের বহুল প্রচার ছিল এবং মহিলাগণও ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া যত্র তত্র যাইতে সমর্থ ছিলেন। বিতর্ক হইবে কার্ত্তিকের পত্নী ও মাহেশ্বরী ত ময়ূর ও বৃষভারূঢ়া ছিলেন? না একথা প্রকৃত নহে। পূর্ব্বকালে মনুষ্যগণ হংস, পক্ষী, বানর, ঋক্ষ, ময়ূর, মূষিক, গো বা বৃষভ ও মহিষ-প্রভৃতি আখ্যায় সমলঙ্কৃত ছিলেন, তজ্জন্য উক্ত মনুষ্যশ্রেণীর নেতা ব্রহ্মার নাম "হংসবাহন," বিষ্ণুর বিশেষণ "গরুড়ধ্বজ", কার্ত্তিকের "ময়ূরবাহন," গণপতি "মূষিকবাহন;" যম "মহিষবাহন" ও কৈলাসনাথ শিব "বৃষবাহন" বলিয়া সমাহূত হইতেন। ভ্রান্ত পৌরাণিকগণ শিবাদিকে একটা বুড়া

* অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসের সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশিত "বাহনতত্ত্ব" দেখ।

বলদ্ ও মূষিকাদিতে চড়াইয়া আমাদিগকে কুপথগামী করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ কার্ত্তিকেয়ের বিমান ময়ূর ও শিবের বিমান গো-মূর্ত্তিদ্বারা সমলঙ্কৃত ছিল, কৌমারী ও ভগবতী সেই সেই বিমানে আরোহণ করিয়াই রণাজিরে আগমন করিয়াছিলেন। রামায়ণের এই বিবৃতিও আমাদিগের উক্তির সমর্থন করিয়া থাকে।

ততো বৃষভ মাস্থায় পার্বত্যা সহিতঃ শিবঃ।
বায়ুমার্গেণ গচ্ছন্ বৈ শুশ্রাব রুদিতস্বনম্। ২৭-৪ সর্গ
উত্তর কাণ্ড।

অনন্তর শিব পার্বতীর সহিত বৃষভ আরোহণপূর্ব্বক বায়ুমার্গে যাইতে যাইতে রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

কৈলাস-নাথ শিব, মানুষ ছিলেন, মানুষেরা যে বলদ ব্যবহার করিয়া থাকেন, উহা স্থলচর ভিন্ন খেচর বা উভচর নহে। সুতরাং বুঝিতে হইবে শিবের এ বৃষভ, এরূপ কোন মহাযান, যাহা শূন্য পথে বিচরণে সমর্থ ছিল। ফলতঃ একালে যেমন সকলেরই এক একখানি বাইশিকল আছে, সেইরূপ পূর্ব্বকালে সকল দেবতারই এক একখানি বিমান ছিল ও থাকিত। দেবর্ষি নারদ যে বিহায়স পথে দিনের মধ্যে দুইবার ভারতে আসিয়া দৈনিক সংবাদপত্রের কাজ করিয়া যাইতেন, এ বিষয়েও বিমানই তাঁহার প্রধান সাধন ছিল। আমরা নিম্নে মহাভারত ও বায়ুপুরাণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, তৎপাঠেই সামাজিকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন যে তৎকালে ব্যোমযানের কিরূপ বহুল ব্যবহার হইত।

দৃষ্টবন্তো গিরৌ রম্যে দুর্গান্ দেশান্ বহূন্ বহূন্।
বিমানশতসংবাধাং গীতস্বরনিনাদিতাম্। ১০

আক্রীড়ভূমিং দেবানাং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং তথা।
উদ্যানানি কুবেরস্য সমানি বিষমাণি চ। ১১-১২০ অ
আদি পর্ব্ব।

গন্ধমাদন পর্ব্বতের (বেলুর টাগ?) পাদদেশ হইতে ঋষিরা স্বর্গ বা মঙ্গলিয়া পার হইয়া ব্রহ্মলোক বা উত্তর কুরু (সাইবিরিয়াতে) ব্রহ্মার সভায় যাইতে ছিলেন, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, তাঁহাদিগের গমনপথের বর্ণনাচ্ছলে বলিতেছেন গন্ধর্ব্ব, অপ্সর ও দেবগণের ক্রীড়াভূমি সকল শত শত বিমান দ্বারা সমাকীর্ণ ছিল। বায়ুপুরাণ বলিতেছেন—

বিমানযানৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ শতসঙ্খ্যৈর্দিবৌকসাং।
প্রভাদীপিতপর্য্যন্তং মেরুঃ পর্ব্বণি পর্ব্বণি। ৬৮
তত্রেশানস্য দেবস্য সহস্রাদিত্যবর্চসং।
মহাবিমানং সংস্থাপ্য মহিম্না বর্ত্ততে সদা। ৭৩-৩৪ অ

মেরু পর্ব্বতের স্তরে স্তরে দেবগণের চাকচিক্যশালী অসংখ্য বিমান যান, চারি দিক্ সমুদ্ভাসিত করিয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার বিমান অতীব বৃহত্তর ও মহাগুণসম্পন্ন।

সম্প্রতি পাশ্চাত্যগণ বেলুনে আরোহণ পূর্ব্বক উপর হইতে শত্রুগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ ও প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া কত জয়ধ্বনি পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার প্রায় ৫০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে পুলস্ত্যকুলকেতু ইন্দ্রজিৎ কি এই বিমানযোগেই মেঘের অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন? ইউরোপে ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট না হইলে, আজি আমরা মনে করিতাম ইহা কবিকল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যথা—

নাস্য বেগগতিং কশ্চিৎ নচ রূপং ধনুঃ শরান্।
ন চাস্য বিদিতং কিঞ্চিৎ সূর্য্যস্যেবাভ্রসংপ্লবে। ৩৫
সতু বৈহায়সন্নধ্যে যুধি তৌ রামলক্ষ্মণৌ।
অচ ঘুবিবহে তিষ্ঠন্ বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ। ২২
৮০ সর্গ যুদ্ধকাণ্ড।

পাশ্চাত্যগণের উদ্ভাসিত বিমান, ইতিপূর্ব্বে ইচ্ছানুসারে চালিত হইতে পারিত না, আরোহিগণ পাহাড় পর্ব্বত সমুদ্র ও নালে খালে পড়িয়া প্রাণ হারাইতেন! কিন্তু আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা সেই মান্ধাতারও বৃদ্ধ প্রপিতামহের আমলে এরূপ সুকৌশলসম্পন্ন বিমান নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, তৎসমুদয় মনের ন্যায় তীব্রগামী ছিল ও চালকের ইচ্ছানুসারে চালিত হইত, উহাদিগের গবাক্ষ সকলও স্বর্ণখচিত হইয়া লোকের মনস্তুষ্টির সংসাধন করিত। যদাহ বায়ুপুরাণম্—

> তত্র তৎ পুষ্পকং নাম নানারত্নবিভূষিতং।
> মহাবিমানং রুচিরং সর্ব্বকামগুণৈর্যুতম্। ৬
> কামগমং মনোজবং হেমজালবিমণ্ডিতং।
> বাহনং যক্ষরাজস্য কুবেরস্য মহাত্মনঃ। ৭-৪১ অ

কোন কোন বিমান স্ফটিক দ্বারাও নির্ম্মিত হইত, সুতরাং এ বিষয়ে হিন্দুরা প্রভূত পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন ইহা প্রতীত হইতেছে। যথা

> দৈবোপযোগ্যাঃ দিব্যং বা মাকাশে স্ফাটিকং মহৎ।
> আকাশগং ত্বাং মদর্থং বিমান মুপপৎস্যতে। ১৩
> ৬৩অ আদিপর্ব্ব।

বলিবে হাঁ দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের মধ্যে বিমানের ব্যবহার ছিল, তাহা ঠিক। কিন্তু উহা লইয়া মর্ত্তালোকবাসী মানুষ আমাদিগের শ্লাঘা করিবার কি আছে? এবং উহাও যে এ কালের বিদেশাগত বাইসিকল ও মটরকারের ন্যায় অন্যের সম্পত্তি নহে, তাহারই বা প্রমাণ কি? আমরা "দেবতা ও মানুষ এক" এই প্রবন্ধে দেখাইব, আমরা ভূতপূর্ব্ব স্বর্গবাসী ও দেবতা এবং আমরা স্বর্গ হইতে ভারতে আসিয়া মানুষে পরিণত হইয়াছি, এখনও ভারত, সপ্তদেবলোকের অন্যতম দেবলোক বলিয়া পরিচিত এবং বিমানসকলও আমাদিগেরই পূর্ব্বপুরুষ দেবগণ দ্বারা বিনির্ম্মিত। আমাদিগের প্রায় সমুদায় পুরাণেই বিমান নির্ম্মাণের কাহিনী বিবৃত আছে। আমরা মহাভারত হইতে নিম্নে কতিপয় পংক্তির অধ্যাহার করিয়া পরিপন্থিগণের এ কুতর্ক ও সন্দেহের নিরসন করিব। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন আদিপর্ব্বের একত্র বলিয়া গিয়াছেন—

> বৃহস্পতেস্তু ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মবাদিনী।
> যোগসক্তা জগৎ কৃৎস্ন মসক্তা বিচচার হ। ২৬
> প্রভাসস্য চ ভার্য্যা সা বসূনামষ্টমস্য হ।
> বিশ্বকর্ম্মা মহাভাগো জজ্ঞে শিল্পপ্রজাপতিঃ। ২৭
> কর্ত্তা শিল্পসহস্রাণাং ত্রিদশানাঞ্চ বর্দ্ধকিঃ।
> ভূষণানাঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্ত্তা শিল্পবতাং বরঃ। ২৮
> যো দিব্যানি বিমানানি ত্রিদশানাং চকার হ।
> মনুষ্যাশ্চোপজীবন্তি তস্য শিল্পং মহাত্মনঃ।২৯-৬৬ অ,

দেবগুরু বৃহস্পতির ভগিনীর নাম যোগসক্তা, তিনি অতীব ব্রহ্মবাদিনী ও প্রধান মহিলা ছিলেন। তিনি একাকিনী সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। তিব্বতুদেশবাসী ধবাদি অষ্টবসুর অন্যতম প্রভাসের ঔরসে উক্ত মহাদেবী যোগসক্তার গর্ভে শিল্পিকুলকেতু বিশ্বকর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই দেবগণের সূত্রধর, স্বর্ণকার ও সহস্র সহস্র শিল্প এবং বিমানসমূহের নির্ম্মাণকর্ত্তা ছিলেন। ভারতবাসী মনুষ্যগণ তাঁহারই শিল্পকলা উপজীব্য করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন।

আমরা যাহা যাহা বলিলাম, প্রবীণগণ নিশ্চয়ই তৎপাঠে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন যে পূর্ব্বকালে আমাদিগের বিমান ছিল ও উহার নির্ম্মাতা আমরাই ছিলাম, পরন্তু অপর

কোন বৈদেশিক জাতি নহে। অতঃপর আমরা অস্মদ্দেশীয় লৌহবর্ম্মের কথা বলিব—অথর্ব্ববেদ বলিতেছেন—

হিরণ্যয়ী নৌরচরৎ হিরণ্যবন্ধনা দিবি।
তত্রামৃতস্য পুষ্পং দেবাঃ কুষ্ঠমবন্বত ॥৮

দিবি স্বর্গে মঙ্গলিয়াদিজনপদে হিরণ্যবন্ধনা হিরণ্যয়ী লৌহময়ী নৌঃ নীয়তে অনয়া স্থলযানবিশেষঃ অচরৎ চালিতা অভূৎ। দেবাশ্চ দেবাখ্যনরাশ্চ তত্র তস্যাং নাবি অমৃতস্য অমৃতলোকস্য স্বাস্থ্যকরস্বর্গভূমেঃ পুষ্পং ওষধিবিশেষং কুষ্ঠং অবন্বত সংস্থাপিতবন্তঃ বন্ধ যাচনে ইতি চান্দ্র ব্যাকরণং। ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ অত্র বনধাতোঃ স্থাপনার্থ এব গৃহীতঃ।

ভৌমস্বর্গ মঙ্গলিয়া-প্রভৃতি স্থানে লৌহনির্ম্মিত একপ্রকার নৌকাকৃতি স্থলযান ব্যবহৃত হইত। দেবাখ্যনরগণ উহাতে অমৃত ভূমি স্বর্ণপ্রভব কুষ্ঠনামক ওষধি স্থাপন করিতেন।

হিরণ্যয়াঃ পন্থান আসন্ অরিত্রাণি হিরণ্যয়া।
নাবো হিরণ্যয়ীরাসন্ যাভিঃ কুষ্ঠং নিরাবহন্ ॥৫

দিবীতি পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ স্বর্গে পন্থানঃ মার্গা হিরণ্যয়া হিরণ্ময়া লৌহময়া আসন্ অরিত্রাণি চক্রাণি হিরণ্যয়া লৌহময়ানি আসন্ নাবশ্চ হিরণ্যয়ী হিরণ্ময়াঃ লৌহনির্ম্মিতা আসন্ অভবন্ দেবা যাভিঃ নৌভিঃ করণৈঃ কুষ্ঠং কুষ্ঠাখ্য মোষধি বিশেষং নিরাবহন্ বাহিতবন্তঃ স্বর্গাৎ স্থানান্তরং নীতবন্তঃ

স্বর্গের পথ সকল লৌহময়, নৌকা (ওয়াগনাকৃতি স্থলযান বিশেষ) সকল লৌহময় ও উহাদের চাকা সকল লৌহময় ছিল। দেবতারা উক্ত লৌহময় নৌকায় করিয়া লৌহময় পথের উপর দিয়া কুষ্ঠনামক ওষধিসকল দেশ দেশান্তরে লইয়া যাইতেন। কোথায় কোথায় লইয়া যাওয়া হইত? তাহা বলিতে যাইয়া অথর্ব্ববেদ বলিতেছেন—

উদঙ্ জাতো হিমবতঃ স প্রাচ্যাং নীয়সে জনং।
তত্র কুষ্ঠস্য নামানি উত্তমানি বিভেজিরে ॥৮-

প্রথম খণ্ড—১০৭ পৃষ্ঠা।

হে কুষ্ঠ! স ত্বং হিমবতঃ হিমালয়স্য উদঙ্ উদীচ্যাং দিশি জাতঃ উৎপন্নঃ সন্ পশ্চাদিতি শেষঃ প্রাচ্যাং হিমালয়স্য পূর্বস্যাং দিশি জনং জনলোকং অতএব বর্ত্তমানচীনদেশং নীয়সে নীতোভবসি। দেবা ত্বাং লৌহবর্ত্মনা লৌহযানযোগেন স্বর্লোকাৎ জনলোকং নয়ন্তি। তত্র তস্মিন্ জনলোকে কুষ্ঠস্য তব নামানি সংজ্ঞাঃ উত্তমানি উত্তমতাং নানানামোৎকর্ষং বিভেজিরে ভেজুঃ

হে কুষ্ঠ! তুমি হিমালয়ের উত্তর দিকে দেবলোকে জন্মগ্রহণ কর ও দেবতারা তোমাকে লৌহবর্ত্মযোগে হিমালয়ের পূর্ব্বদিকস্থ জন লোকে লইয়া যাইয়া থাকেন। তথায় তুমি নানা উত্তম উত্তম নাম ভজনা কর।

মহামতি সায়ণ এই মন্ত্রগুলির কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। কাজেই আমরা এই গুলির ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলাম। প্রায় সহস্র সহস্র বেদমন্ত্র ব্যাখ্যাহীন রহিয়াছে, সুতরাং এগুলি যে কৃত্রিম তাহাও কেহ মনে করিবেন না। মহামতি শঙ্করও ছান্দোগ্যের বহু মন্ত্রের বহু অংশ বিনা ব্যাখ্যায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং এ বিষয়ে ব্যাখ্যাকর্ত্তা ভিন্ন মন্ত্রকর্ত্তারা কিংবা বেদ অপরাধী নহেন।

এখানে বিতর্ক হইতে পারে যে আমরা কেন হিরণ্য শব্দের প্রসিদ্ধার্থ "অকুপ্য" অর্থাৎ স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিহার করিলাম। কিন্তু

লৌকিক কোষসমূহে হিরণ্য শব্দ উক্ত অর্থদ্বয়ে গৃহীত হইলেও বৈদিক কোষ নিঘণ্টু হিরণ্য শব্দের ঐরূপ লৌকিকার্থের অভিব্যক্তি করেন নাই। নিঘণ্টু বলিতেছেন—

হেম, চন্দ্রম্, রুক্মম, অয়ঃ, হিরণ্যং পেশঃ
কৃশনং, লোহং, কনকং, কাঞ্চনং, ভর্ম্ম,
অমৃতং, মরুৎ, দত্রম্, জাতরূপম্
ইতি পঞ্চদশ হিরণ্য নামানি।

সুতরাং বুঝা গেল বৈদিক যুগের কোন এক সময়ে স্বর্ণ ও লৌহই হিরণ্য শব্দে সংসূচিত হইত; রৌপ্যের নাম অবরজ যুগে গৃহীত হইয়া লৌহের নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদের বহুস্থলে হিরণ্যশব্দ লৌহার্থে প্রযুক্ত রহিয়াছে, আমরা যথাসময়ে তাহার অবতারণা করিব। যাহা হউক যখন নিঘণ্টু স্বয়ং হিরণ্য অর্থ অয়ঃ ও লৌহ, উভয়ই বলিতেছেন এবং পথ ও যান সকল যখন স্বর্ণরৌপ্য নির্ম্মিত না হইয়া লৌহ-নির্ম্মিত হওয়াই সম্ভবনীয়, তখন আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলাম পূর্ব্বে আমাদিগের লৌহময় রেলপথ ও ওয়াগন ছিল। তবে তাহা ট্রলির মতন হস্তে চালিত হইত, কি বাষ্পবেগে চালিত হইত, তাহা দুরধিগম্য। কিন্তু যাঁহারা ব্যোমযানের বেলা বাষ্পের শক্তির পরিচয় পাইয়া ছিলেন, তাঁহারা যে ভৌম লৌহবর্ত্মে উহার বিনিয়োগ করিয়া ছিলেন না, ইহা হইতেই পারে না। পাণ্ডবগণ যে নৌকায় আরোহণ করিয়া গঙ্গা পার হইয়াছিলেন। উহা যন্ত্রযুক্ত ছিল! সুতরাং উহাও যে ষ্টীমার বিশেষ ছিল না, তাহা কে জানে?

ততঃ প্রবাসিতো বিদ্বান্ বিদুরেণ নরস্তদা।
পার্থানাং দর্শয়ামাস মনোমারুতগামিনীম্ ॥৪
সর্ব্ববাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীং।
শিবে ভাগীরথী তীরে নরৈ র্বিস্রংসিভিঃ কৃতাম্ ॥৫
১৪৯ অ—আদিপর্ব্ব।

এখানে আরও একটি তর্ক হইবে যে, আমরা "অরিত্র" অর্থ চাকা করিলাম কেন? অমর বলিতেছেন—

নৌকাদণ্ডং ক্ষেপণিঃ স্যাৎ
অরিত্রং কেনিপাতকঃ।

নৌকা দণ্ডের নাম ক্ষেপণী বা দাঁড় ও অরিত্র এবং কেনিপাতক শব্দের অর্থ হাইল। কেন না উহা জলে (কে) পড়িয়া থাকে। কিন্তু লৌকিক কোষে বৈদিক শব্দের প্রাচীন অর্থ বহুত্র গৃহীত হয় নাই। বেদে শর্ম্ম শব্দ সুখ ও গৃহ উভয় অর্থেই প্রযুক্ত রহিয়াছে, অথচ অমরাদি উহার সুখার্থমাত্রের পরিগ্রহ করিয়াছেন। ফলতঃ

ঋচ্ছতি গচ্ছতি অনেন
ইতি ঋ ধাতোরিত্র প্রত্যয়েন
অরিত্র মিতি পদং সিদ্ধং স্যাৎ।

সুতরাং অরিত্র অর্থ চাকা হইতে পারেই না এরূপ নহে। অর্ণবযানের চাকা সকল জলে পড়িয়া থাকে, সুতরাং সে গুলিকে অক্লেশে "কেনিপাতক" বলা যাইতে পারে। যাহা হউক আমরা যাহা যাহা বর্ণনা করিলাম, ভরসা করি বিবেকশীল অধীয়ান পাঠকগণ তাহাতেই তৃপ্ত হইয়া আমাদিগের বিমান ও লৌহবর্ত্মের অস্তিত্বে আস্থাবান্ হইবেন। আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে কামান ও বন্দুকের কথা বলিব।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন।

দশ-পদী-কবিতা।

[অপ্রকাশিত]

(নারী)

ঐ যে পূর্ণ দেহখানি তরঙ্গবর্ণপরিধান;
চারিধারে ঘেরে আছে শতলুব্ধ ভ্রমর আঁধার
ঐ যে আনন, রয়েছে যাহা মিশ্র হয়ে অগ্নি ও তুষার;
চক্ষু দুটি, যাহার মধ্যে ঘুমায় এসে সুদূর নীলিমা;
কোথায় রবে? — আসবে যখন চর্ম্মপরে জরা,
গর্ত্তভাবে ডুবে পড়বে দেহবল্লী; স্বচ্ছ ললাটে এ
বৃদ্ধ কাকের বাসা; চক্ষু দুটির উপর — ধীরে আসবে ছেয়ে
অনিবার্য অস্থির আঁধার; — কোথা রবে তোমার গর্ব্ব, হে অঙ্গনা?
অবহেলেও তোমার পানে, কোন পথিক চাবেনা সে দিন;
সৌন্দর্য্যের সমাধির উপর বসে' রবে আপনি শ্রীহীন।

২

তোমার রূপের হোমাগ্নিতে দেহখানি করেছো ইন্ধন;
ধীরে ধীরে পুড়ে যাচ্ছে; তুমি দেখছো দাঁড়ায়ে অদূরে;
সাধ্য নাইক রুদ্ধ কর সেই দাহ; দেখো অনুক্ষণ
তিলে তিলে মিশে যাচ্ছে একাকারে ভীষণে মধুরে।
তবু ক্ষুব্ধ হোয়োনাক — হে সুন্দরী! এ দুঃখ সম্বরে।
জেনো তুমি, তোমার অমর হৃদয় রাজ্যে যে সৌন্দর্য্য আছে
অনাদৃত পতিতভাবে, আবাদ কর যদি, তাহার কাছে
এ সৌন্দর্য্য কোথায় লাগে! — হীরাকে ছেড়ে কাচের আদর কর,
এরই জন্য স্বর্গরাজ্য তোমার, করে' রাখো মরুভূমি।
হা মরণি! যাও! — তুমিই জানোনা যে কি সুন্দরী তুমি!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

রাজতপস্বিনী।

[জীবনীপ্রসঙ্গ]

২০

"পৃথিবীর মত সর্ব্বসহা হও," "গঙ্গার মত শীতল হও," বঙ্গীয় প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা গৃহিণীরা অন্তরের শুভাকাঙ্ক্ষার সহিত এই বলিয়া আজিও কুলকন্যা এবং বধূদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। এই সর্ব্বসহ ভাব এবং এই শীতলতা মহারাণীমাতার চরিত্রকে বড় মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল। এই গুণ বিশেষ ভাবে তিনি স্বীয় মাতৃদেবী হইতে লাভ করিয়াছিলেন। শেষোক্তার ভাস্কর্য্যবৎ স্থির ধীর মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয় মাধুর্য্য অবিকল প্রতিবিম্বিত করিত। কথা খুব অল্প কহিতেন, কিন্তু তাহা কারুণ্যে এবং স্নেহশীলতায় শ্রোতার হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করিত। সহিষ্ণুতা এতদূর যে মাল বৈদ্যের দ্বারা চক্ষের ছানি তুলিবার সময়ও যন্ত্রণাসূচক মুখবিকৃতি কি কোনরূপ শব্দ করেন নাই। সচরাচর যেরূপ বসিয়া থাকিতেন, ঠিক্ সেই ভাবেই ছিলেন।

মহারাণীমাতার সহগুণের কথা বলিতেছিলাম; যে শিরঃপীড়ায় সাধারণত অন্যে পাগল হইয়া উঠে, তাহা লইয়া তিনি সহজের মত লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেন, যেন কিছুই হয় নাই। এক দিনের কথা বলি। অপরাহ্নে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়াছি। বুঝিলাম কন্যাকার মাথার বেদনা তেমনি আছে। একাদশীর ক্লেশে মুখ শুকাইয়াছে। পূর্ব্বদিন হবিষ্যান্ন গ্রহণের পর বমন হইয়াছিল, পেটে কিছু ছিল না, সুতরাং উপবাস দুইটী। তথাপি প্রফুল্লতার এবং দয়ার জ্যোতি মুখে দীপ্তি পাইতেছিল। কিন্তু আশৈশব আমি তাঁহার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছিলাম, আমায় বড় কিছু লুকাইতে পারিতেন না। একটুতেই বুঝিলাম যন্ত্রণা বড় কষ্টকর। বলিলাম মাথার বেদনার ঔষধ আনাইয়া দিই? মা হাসিলেন—"না, আজ কাজ নাই।" আমি জেদ করিয়া বলিলাম, "কেন মা, শারীরিক, মানসিক সকল কষ্টই কি ইচ্ছা করিয়া পাইতে হইবে?" মাতা তাহাতে কেবল হাসিয়া আমার সঙ্গে একটা গুরুতর বৈষয়িক কথায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কুমার মহাশয় যখন মহারাণীকে শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া যাইবার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেই সময়ের এক দিনের কথা। তখন শ্রাবণ মাস। মা পিত্রালয়ে গিয়াছেন শুনিয়া বৈকালে দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার অসুখের কথা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। আমি অন্দরে প্রবেশ করিয়া বরাবর উপরে গেলাম। পূজনীয়া শ্রীসুন্দরী দেবীও তাঁহার জ্যাঠাই মা সেখানে ছিলেন—গৃহমধ্যে মাতা শয়ানাবস্থায় তাঁহার জ্বর ও চক্ষুরোগ জনিত মাথার বেদনা হইয়াছে। দেখিয়া আমি হটিয়া গেলাম। আমার নাম শুনিয়া মা উঠিয়া বসিলেন। সুতরাং আমায় আবার যাইতে হইল। বলিলেন বমন করিয়াছেন, শরীর ভাল নাই। কিন্তু তখনই যেন কিছু হয় নাই, এই ভাবে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার কথা তুলিলেন।

তাঁহার শরীর ক্রমশ খারাপ হইতেছিল। একদিন ভাদ্রমাসে মাতাকে প্রণাম করিতে গেলাম। কি কথায় বর্দ্ধমানের জাল-রাজা প্রতাপ চাঁদের কথা উঠিল। এমন সময় সম্বাদ আসিল, যে কবিরাজ মহাশয় আসিয়াছেন! শুনিয়া মহারাণী ত্রৈলোক্যকে বলিলেন, তোমারই এ কাজ! এবং হাসিলেন। কবিরাজ হাত দেখিয়া কহিলেন যে জ্বর আজ আরও প্রবল। তিনি স্নান করিতে বারণ করিলেন। মহারাণী বলাইলেন—গরম জলে আজ স্নান করিবেন কাল আর করিবেন না। মাতার মূর্ত্তি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম, শরীর বড় অসুস্থ, স্নান করিবার জেদ্ দেখিয়া আমি বলিলাম—কাল জ্বর প্রবল আপনিই হইবে, স্নান আর করিতে হইবে না। পরদিন প্রাতে গিয়া দেখি, তিনি বড় অসুস্থ। অনাবৃত মেঝের উপর একটী বালিশ মাথায় দিয়া শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার পিতার প্রাচীন বিশ্বাসী ভৃত্য বাতাস করিতেছে, অন্নদাসী মাথা টিপিয়া দিতেছে। নিতান্ত পীড়িত না হইলে মাতা কখন শয্যা গ্রহণ করিতেন না, কাহারও সেবা লইতেন না। আমি বিছানায় শয়ন না করার কারণ সুধাইলে বলিলেন যে মেঝে খুব ঠাণ্ডা। এই সময়ে তাঁহার খুল্লতাত মন্মোহন সান্ন্যাল আসিলেন। আমরা উভয়ে মহারাণী মাতাকে বলিলাম, নিজের অযত্নে অসুখ এত বাড়িয়া গেল। এই অসুখের জন্য আপনার ধর্ম্মচর্চ্চারও ত ব্যাঘাত হইতেছে, আজ ত আর আহ্নিক করিতে পাইবেন না? তিনি কেবল হাসিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

আর একদিন তাঁহার শরীর অসুস্থ হইলে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, শীত পড়িয়াছে, তথাপি জানালা বন্ধ না করিয়াই শয়ন করেন। এজন্য আমি মাতাকে একটু অনুযোগ করিলাম। তাঁহার সমক্ষে ত্রৈলোক্যকে বলিয়া দিলাম যে দুইটা নীল কাপড়ের পর্দ্দা যেন মাথার ও পায়ের দিকের জানালার জন্য প্রস্তুত করা হয়। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে হাত পা জ্বলিতেছে। বলিলাম কাগজীলেবুর রস দিয়া মালিস করিলে তখুনি শীতল হইবে। ত্রৈলোক্য লেবু আনিতে চলিল, কিন্তু মা মানা করিলেন।

আমার ধারণা হইয়াছিল, যে রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাসে তাঁহার অসুখ সারিতেছে না। মার তাচ্ছিল্য দেখিয়া ত্রৈলোক্য পর্দ্দা প্রস্তুতের প্রতি আদৌ মনোযোগ করে নাই, অথচ রোজ আমি তাগাদা করি। পরদিন মহারাণী-মাতার শয়ন-সঙ্গিনী-ব্রাহ্মণ-কন্যাদের তাঁহার সম্মুখেই জিজ্ঞাসা করিলাম জানালা খোলা ছিল কি বন্ধ ছিল? মা হাসিয়া আপনিই বলিলেন, তিনি ঘুমাইলে কে একবার বন্ধ করিয়াছিল, পরে তিনি খোলাইয়া দিয়াছিলেন। আমি পর্দ্দার ব্যবস্থায় ব্যস্ত হইয়া উঠায় পরদিন মহারাণীর বৃদ্ধা পিসি ঠাকুরাণী বলিলেন—"পর্দ্দা হইলেই কি দিতে দিবে? সেবার বেশী ব্যারাম হইলেও দিতে দেয় নাই!" কথাটা তাঁহার গোচরেই হইতেছিল। আমি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া সুধাইলাম—"সত্যই মা, পর্দ্দা তৈয়ারি হলেও কি আপনি দিতে দিবেন না?" মহারাণী হাসিলেন, আমায় খুসী করার জন্য বলিলেন—"কতক সময় দিতে দিব।"

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

প্রার্থনা।

ভৈরবী—একতালা।

অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তরতরহে !
নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর, সুন্দর করহে।
জাগ্রত কর, উদ্যত কর, নির্ভয় করহে,
মঙ্গল কর, নিরলস নিঃসংশয় করহে।
যুক্ত করহে সবার সঙ্গে, মুক্ত করহে বন্ধ !
সঞ্চার কর সকল কর্ম্মে শান্ত তোমার ছন্দ !
চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করহে,
নন্দিত কর, নন্দিত কর, নন্দিত করহে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহাত্মা কেম্পিসের প্রতি।

কভু আমি হে যোগেন্দ্র ! দূরে হেরি আলেয়ার বাতি,
ছুটিয়াছি জ্ঞানারণ্যে, শতবার হারাইয়া পথ ;—
হায়রে অবোধ আমি ! শতবার ভগ্নমনোরথ,
ভাবিয়াছি, ওই বুঝি, ওই বুঝি জ্ঞানারুণ—ভাতি !
কভু আমি, ভক্তি-রাজপথ ছাড়ি, হঠগর্ব্বে মাতি,
বিপথে, ঘর্ঘর শব্দে, চালায়েছি সাধনার রথ ;
অকস্মাৎ ভাঙি গেল রথচক্র ! হায়রে বিপদ !
যোগ কোথা ? বিয়োগের ঘোর বনে পোহাইনু রাতি !
তার পরে, হে বৈষ্ণব ! তোমার ও সাধন কাননে
একদিন পশিলাম, মম চির সৌভাগ্যের ফলে ;
কি আনন্দ ! ভক্তিফল মুখে দিলে, বৈরাগ্য-বাকলে
সাজালে এ তনু মম, বসাইয়া প্রেমের আসনে !
আঁকা সে দেউল, মঠ, ইষ্টদেব খ্রীষ্টের মূরতি ;
কি সুন্দর ! শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ; হয় অপূর্ব্ব আরতি !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

বঙ্গদর্শন।

শক্তি।

একদিন যে সময়ে য়ুরোপের জ্ঞানের ঐশ্বর্য্য হঠাৎ আমাদের চোখের সমুখে খুলিয়া গিয়া আমাদের দেশের নূতন ইংরেজি শিক্ষিত লোকদিগকে একেবারে অভিভূত করিয়া দিয়াছিল সেই সময়ে রামমোহন রায় আমাদের স্বজাতির পৈতৃক জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তখনকার নিতান্ত শিশু ও দুর্ব্বল বাংলা গদ্যেও তিনি উপনিষৎ, বেদান্ত প্রভৃতি অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনিই সেই ঘোরতর ইংরেজি বিদ্যাভিমানের দিনে জ্ঞান ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের দেশের দারিদ্র্যের লজ্জা দূর করিয়া দিবার জন্য প্রথম দাঁড়াইয়াছিলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের মন হইতে সেই অগৌরব অল্পমাত্রও দূর না হইয়াছিল ততক্ষণ আমরা নিতান্ত নিঃসম্বল ভিক্ষুকের অবস্থায় আমাদের ইংরেজি মাষ্টারের মুখের দিকে চাহিয়া অঞ্জলি পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম।

কিন্তু কোনো বড় জিনিষকে কখনই ভিক্ষা করিয়া পাওয়া যায় না। নিজের ঘরের মূলধনটি আমরা যতটা পরিমাণে খাটাইব, বাহির হইতেও ততটা পরিমাণে লাভ করিবার অধিকারী হইব। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী এবং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ কথাটার অর্থই তাই। দুই কারণে ভিক্ষুকের দৈন্য ঘোচে না, এক ত পরের নিকট হইতে তাহার উদ্বৃত্তের অংশ পাওয়া যায়-কখনই তাহার ঐশ্বর্য্য আশা করা যায় না, দ্বিতীয়ত ভিক্ষুক যতই ভিক্ষা করে ততই তাহার নিজের চেষ্টার প্রতি বিশ্বাস পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। এই জন্য ইংরেজের দেশে সমাজের হিতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভিক্ষাবৃত্তিকে দণ্ডনীয় করা হইয়াছে।

রামমোহন রায়, ইহুদি খৃষ্টান ও মুসলমানের ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া স্বদেশীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন কিন্তু এই সমস্তকে গ্রহণ ও ধারণ করিবার জন্য লজ্জার সহিত ভিক্ষার পাত্র বাড়াইয়া ধরেন নাই; আমাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সোনার থাল বাহির করিয়াছিলেন;—আমাদের অধিকার যে কোন্‌খানে ছিল তাহাই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

এই আমাদের স্বদেশীয় অধিকারের পথেই যাত্রা করিয়া আজ বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনস্বী এবং সেই সঙ্গে আমাদের সমস্ত দেশ, ইস্কুলের ছাত্রভাবকে কাটাইয়া পৃথিবীর জ্ঞানিসভায় নিজের গৌরবে প্রবেশ করিতেছে। এমনি করিয়া নিজের সম্পদে মাথা তুলিতে পারিলেই আমরা বিশ্বমানবের জ্ঞানশালায়

নিঃসঙ্কোচে আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারি—নহিলে মুষ্টিভিক্ষা এবং উঞ্ছবৃত্তি করিয়াই দিন কাটাইতে হয়। সম্পদকে নিজের মধ্যে অনুভব করিলে কেবল যে গৌরব বৃদ্ধি হয় তাহা নহে, শক্তি বৃদ্ধি হয়।

রামমোহন রায় এই যেমন আমাদের জ্ঞানের অধিকার আমাদের চিত্তের মধ্যে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন অন্ধকার দিনে তেমনি আমাদের আর এক রামমোহনের প্রয়োজন যিনি আমাদের শক্তির অধিকারকে সেইরূপ আত্মগৌরবে উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। জ্ঞানের যুগের পরে কর্ম্মের যুগ। প্রথম আশ্রমে বিদ্যা এবং দ্বিতীয় আশ্রমে শক্তির প্রয়োজন।

এই শক্তির মূর্ত্তির দিকে যখন চাই তখন য়ুরোপ তাহার কামান বন্দুক মেলিয়া তাহার জাহাজের মাস্তুলের শিং উঁচাইয়া আমাদিগকে একেবারে অভিভূত ও বিহ্বল করিয়া দেয়। এই প্রকার মুগ্ধ অবস্থাতেই আমাদের ভ্রম হয় যে এই শক্তি বুঝি ভিক্ষা করিয়া, দরবার করিয়া, দরখাস্ত করিয়া পাওয়া যায়। এই জন্যই আমরা ঘরের কোণে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় বলাবলি করি ইংরেজ অনুগ্রহ না করিলে আমাদের উপায় মাত্র নাই, আমরা সম্পূর্ণ অশক্ত।

এই সময়ে আমাদের দেশে এমন একজন মহাপুরুষের আবশ্যক যিনি আমাদিগকে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিবেন যে, ঐ বন্দুক কামান জাহাজ রেলগাড়ি উপরকার ফেনা এবং বুদ্বুদ মাত্র—উহার নীচে কি আছে? মানুষের চিত্তসমুদ্র। সেইখানেই শক্তি, সেইখানেই ভক্তি, সেইখানেই ত্যাগ, সেইখানেই ধর্ম্ম। সেই মহাপুরুষ আমাদের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ়রূপে সঞ্চার করিয়া দিবেন যে আমাদের জাতির অন্তঃকরণের মধ্যেও আমাদের নিজের শক্তি নিহিত আছে। তাহা ত্যাগ করিবার শক্তি, তাহা প্রাণ দিবার শক্তি, তাহা বিশ্বাস, তাহা নিষ্ঠা। তাহা গুলি নহে, গোলা নহে, পাল নহে, মাস্তুল নহে। আমাদের সেই অন্তরতর শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিলে তবেই আমরা অন্য প্রবল জাতির শক্তির দৃষ্টান্তকে যথার্থ অকুণ্ঠিতভাবে পৌরুষের সহিত গ্রহণ করিতে পারিব। নহিলে কেহ দয়া করিয়া দিলেও লইতে পারিব না। নিজের চোখের জ্যোতি না থাকিলে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের জ্যোতির্বর্ষণে কোনো কাজ হইবে না।

বহু চেষ্টা ও বাক্যব্যয়ে রাজকীয় মন্ত্রণা-সভায় আমাদের দেশের লোক দুই জনের জায়গায় চারজন বসিতে পারে কিন্তু সে ত শক্তি নহে, তাহা নিষ্ফলতা। এমন কি, তাহাতে শক্তির হানি হয়। আমরা নিজের জোরে প্রবল হইয়া উঠিলে যেদিন মন্ত্রণাসভায় আমাদের নিজের স্থান দখল করিয়া বসিব, যখন অপর পক্ষে দায়ে পড়িয়া বসাইবে—এবং আমরা দায়িত্ব লইয়া বসিব তখন তাহা নিষ্ফল হইবে না—তাহা যাত্রার সং-সাজা মাত্র হইবে না—তখন সেখানে আমাদের কণ্ঠ হইতে ঠিক সুরটি আপনি বাহির হইবে এবং ঠিক জায়গায় অনায়াসে গিয়া লাগিবে। আজ আমাকে ইংরেজ যদি সমস্ত ভারতবর্ষের রাজাসনেও বসাইয়া দেয় তবে আমার সেই রাজত্বের মত এমন প্রকাণ্ড বিড়ম্বনা জগতে আর কিছুই হইতে পারে না—তাহা আবুহোসেনের প্রহসনকে অনেক দূরে ছাড়াইয়া গিয়া মিরজাফরের শোকাবহ অভিনয়ে গিয়া

ঠেকিবে। অতএব রাজা হইলেই বা কি, রাজমন্ত্রী হইলেই বা কি—যতক্ষণ তাহার সঙ্গে আমাদের শক্তি না থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত যতবড় দান তাহা ততবড়ই লজ্জারূপে প্রকাশ পাইবে। নিজের শক্তিকে না জাগাইয়া অন্যের শক্তির কাছে হাত পাতিতে গেলেই শক্তিকে শুধু যে পাওয়া যায় না তাহা নহে, শক্তির অপমান হয়, শক্তির বিনাশ ঘটে।

অতএব যেখানেই আমাদের মনুষ্যত্ব, আমাদের নিজের শক্তি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, শিক্ষার দ্বারা দীক্ষার দ্বারা ধর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের দ্বারা সেইখানেই খনি খনন করিয়া দ্বার মোচন করিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। নহিলে অন্যদেশের ইতিহাস আমাদের পক্ষে কেবল-মাত্র ইস্কুলের বই এবং অন্য দেশের শক্তি আমাদের পক্ষে কেবল শক্তিশেল হইয়া থাকিবে। এ পথে বিলম্ব হইবে বলিয়া যদি শঙ্কা কর তবে একথা মনে রাখিয়ো, অন্য সকল পথেই ব্যর্থ হইতে হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইতালীর অভ্যুদয়ে সাহিত্যিকগণের প্রভাব।

ফরাসী ইতিহাস পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ভল্‌টেয়ার ও রুসো মহোদয়দ্বয়ের লেখনী হইতেই ঐ দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ রাষ্ট্রবিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে ফরাসী বিপ্লবের একশত বৎসর কালস্রোতে ভাসিয়া গেল, কিন্তু ইহার ইতিহাস অদ্যাপি নিঃশেষিত হয় নাই। এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আজও রুসো মহোদয়ের সামাজিক নিয়ম বা চুক্তি (Social contract) কিম্বা মনুষ্যের স্বত্বনিচয় (Rights of man) সম্বন্ধীয় নিবন্ধগুলি আলোচনা করিলে দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশেরও মৃত দেহে জীবন সঞ্চার করে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে রুসো দেহত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার জীবনীশক্তি আজও ক্ষয় হয় নাই। ডিডেরো প্রভৃতি দুই একটি সাহিত্যসেবক ব্যতীত ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব তাঁহার নিকট যে পরিমাণে ঋণী, বোধ হয়, আর কাহারও নিকট সেরূপ নহে। ফরাসী দেশীয় কোন এক মহাপুরুষ বলিয়াছেন, যে মনুষ্যের মস্তিষ্কই বিচিত্র ঘটনার লীলাস্থল এবং লেখনী ও বাক্য তাহার বাহিক অভিব্যক্তি মাত্র। ঐ সমস্ত মহাত্মা-গণের মস্তিষ্কে তীব্র বিদ্রোহানল জ্বলিয়াছিল বলিয়াই উহা সাময়িকভাবে পর্য্যবসিত না হইয়া সর্ব্বব্যাপী হইয়া পড়িয়াছিল।

ইতালীর অভ্যুদয়েও কয়েকটি ইতালীয় সাহিত্যিকের সেইরূপ একটা প্রাণগত চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকটির বিশেষতঃ গিয়োবার্টি, গিজার-ব্যাবো এবং ম্যাসিমো, ডাজেগলিওর (Gioberti, Cegser, Balbo and Massimo D'Azoglio) রচিত সাহিত্যের পরিচয় দান করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আধুনিক গবেষণায় ইতিহাসের অনেক অমীমাংসিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে;

এবং যে সমস্ত জটিল: তমসাচ্ছন্ন ব্যাপারের আবরণ এখনও উন্মোচিত হয় নাই তাহা হইতে যে আমাদের সন্দেহ অনেকাংশে দূরীভূত হইয়াছে—সে কথা একরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু এখনও ইউরোপীয় ইতিহাসে এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া থাকে যে গিয়োবার্টির লেখনীপ্রসূত পুস্তকগুলি পাঠ করিয়াই কি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইতালীয়গণ রাজদ্রোহে উত্তেজিত হইয়াছিল? এখনও ইতালীর বাণীপুত্রগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, যে পুস্তকের গাম্ভীর্য্যে ও লিপিচাতুর্য্যে সমগ্র ইতালীয় জাতি উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তাহা সেই স্বদেশবৎসল গিয়োবার্টির "প্রথম নৈতিক ও রাজনৈতিক নিয়ম" (Primato morale e civile Italiani)। ইহারই কাল্পনিক নিয়মগুলি ইতালীয় জাতির চক্ষু ফুটাইয়া দেয় এবং তাহাতেই তাহারা সজীব হইয়া উঠে। বস্তুতঃ সাহিত্যের কি অপ্রতিহত গতি এবং উহার প্রতিপত্তি বিস্তারের নিমিত্ত জনসাধারণের কি অক্লান্ত চেষ্টা তাহা গিয়োবার্টির "নৈতিক ও রাজনৈতিক নিয়ম" পাঠে সম্যক্ বুঝা যায়। ইতালীয়গণের মধ্যে তখন যে মহা শক্তি নিহিত ছিল, তাহাদের জাতীয় উন্নতি যে ঐ শক্তির সুব্যবহার সাপেক্ষ এবং পরাধীনতার লৌহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে কেবল যে সেই মহাবলেরই জয়যুক্ত হওয়ার কথা—তাহা তাহারা পুস্তকপাঠে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিল। সে সময়ের ইতালীবাসীগণের মধ্যে মিংযেটি একজন প্রথিত নামা ব্যক্তি; যখ্য ইতালী যখন ক্ষীণ আশায় উদ্বেলিত হইতেছিল, তখন ইনিই উহার পরিপুষ্টিসাধনে বদ্ধপরিকর হন। যত দিন ইতালী স্বাধীন বলিয়া জগতে ঘোষিত হইবে ততদিন তাঁহারও কার্য্যকলাপ অক্ষয় রহিবে। মিংযেটি একজন সুবিবেচক ও ধীর পুরুষ বলিয়া প্রখ্যাত। তিনি গিয়োবার্টির এই পুস্তক সম্বন্ধে বলেন যে "কোন কোন লোকে এই পুস্তকখানিকে অতিরঞ্জিত বলিয়া গ্রহণ করিত এবং অপরসাধারণে উহাতে বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ আছে বলিয়া উহার আদর করিত। বস্তুত পক্ষে উহার কতকগুলি কল্পনা গিয়োবার্টির নিজস্ব ছিল; এবং সমগ্র ইতালীয় দেশে উহার সামঞ্জস্য কাহারও সহিত হইত না"। ইহার মূলে একটু সত্যও নিহিত আছে। গিয়োবার্টির চরিত্রে কিছু বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই নিমিত্তই তাঁহার আশা ভরসা সমস্তই চরিত্রানুযায়ী হইয়াছিল। অস্বাভাবিক কল্পনা বলিয়া তাঁহার দেশীয়গণ উহা উপেক্ষা করেন নাই, পরন্তু অত্যন্ত আগ্রহের সহিত উহারই অনুকরণ করিয়া সাধ্যমত ঐ নিয়মে আপন আপন চরিত্র গঠন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ঠিক্ এই সময়েই জাতীয়তার ভাব সমগ্র দেশকে এক মন্ত্রবলে অধিকার করিয়া বসিল এবং যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যেও স্বাধীনতাস্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে জাতীয়তা ও স্বাধীনতার ভাবস্ফূর্ত্তির জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল তাহা অচিরেই অজাতশ্মশ্রু যুবকসম্প্রদায়ের নিকট অপ্রীতিকর হইয়া উঠিল। এ স্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে এই সমস্ত যুবকই বিংশতি বৎসর পরে ইতালীকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে জন্মের মত মুক্ত করে। ষড়যন্ত্রে যে আর কোন ফল ফলিবে না তাহা তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। ক্ষীণ ও দুর্ব্বল গুপ্ত

সমিতিগুলি ও নিত্য নব রাজদ্রোহ যে তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধির অন্তরায় তাহাও তাঁহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না। ষড়যন্ত্রে বা গুপ্ত সমিতি সমূহে দেশের কোন স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হয় না। প্রথমতই ত শাসনকর্ত্তাদের তীব্র বিরাগ ও সেই সঙ্গে আইনের কঠোরতা উপলব্ধি হয়; তাহার পর সামাজিক উন্নতির পথ কণ্টকিত হইয়া ঐশ্বর্য্যলাভের আশা একেবারে সুদূরপরাহত হইয়া উঠে। শেষে যে সকল কুলধুরন্ধর এই সমস্ত কার্য্যে ব্রতী হয়েন তাঁহাদের পরিবারবর্গের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। আবার ইতালীয়গণ যে সমগ্র সভ্য জগতের সহানুভূতি ও সাহায্য ব্যতীত উন্নতি সোপানে উঠিতে অক্ষম, তাঁহারাও যে কোন কালে এরূপ কার্য্যের অনুমোদন করিবেন না, ইহা নিশ্চয়।

প্রায় প্রতিবৎসর বসন্তের প্রারম্ভে, ইউরোপে একটা ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত – এই-রূপ ভাবের জনরব উঠিত। ম্যাটসিনি কিন্তু সে সময়ে দূরবস্থিত লণ্ডনের কোন এক নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া এবং তদানীন্তন আইন কানুনের সুরক্ষিত গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া, ঈশ্বরের ও স্বজাতিয়গণের নামে বহু রহস্যপূর্ণ বাগাড়ম্বর করিতে এবং গুরুগম্ভীরস্বরে তাহাদিগকে হত্যা ও রাজদ্রোহে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ইতালীর ইতিহাসের এ পৃষ্ঠা যিনিই উন্মুক্ত করিবেন তিনি কখনই ম্যাটসিনির সাধুবাদ করিবেন না। এখন গভীর প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক কার্য্যকরী শক্তির অভাব হইয়া পড়িয়াছিল। অসার, অনিত্য বিষয়ের চিন্তা যতই মন হইতে অপসৃত হয়, ততই এই শক্তি বিকাশ লাভ করিতে থাকে। গিয়োবার্টি পুরাতন জিয়োভাইন্ ইতালীয়ান্ সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন এবং সেই কারণেই পিড্‌মণ্টে নির্ব্বাসন দণ্ডভোগ করেন। ইহারই অল্পকালপরে ঐ সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গিয়োবার্টি কিছু সন্দিহান্ হইয়া পড়িলেন। যে সম্প্রদায় কেবলই কথা কহে কিন্তু কার্যের বেলা সর্ব্বদাই পশ্চাৎপদ, তাহার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা দুরূহ নহে। জিয়োভানি ইতালীয়ারও তাহাই হইয়াছিল। সভ্যমহোদয়েরা কেবলই স্ব স্ব বক্তৃতা সাধারণ্যে কিরূপ আদৃত হইল তাহারই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং তাঁহাদিগের আনন্দ বা বিষাদ সকলই উহার উপর নির্ভর করিত। সে সময়ে ইতালীতে সংবাদ পত্রের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইলেও কোন সংবাদ পত্রই ঐ সমস্ত অসার, বাগাড়ম্বর পূর্ণ, বক্তৃতা প্রকাশ করিতে ভরসা করিত না, কারণ, সকলকেই তখন স্ব স্ব পত্রিকার অস্তিত্ব সংরক্ষণ কথা লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হইত এবং যদি কোনক্রমে উহা রক্ষা পাইত তাহাদের আনন্দের আর সীমা থাকিত না। আর যদি সুললিত বক্তৃতা প্রদান করাই তাঁহারা দেশোদ্ধারের ও লোক-শিক্ষার চরম উপায় স্থির করিয়াছিলেন, কই তাহাতেও তাঁহারা ত তেমন সচেষ্ট ছিলেন না। সকলকালে, সকলদেশেই, সকলজাতির মধ্যেই অধস্তন সম্প্রদায়ই দেশের বাহুবল এবং দশের আশাভরসাস্থল; কাযেই বক্তৃতা দ্বারা দেশকে উন্নত করিতে হইলে, এই নিম্নশ্রেণীরই শিক্ষা সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক হইয়া পড়ে; কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে জিয়োভানি দলের দৃষ্টি ইহাদের উপর পড়ে নাই। গিয়োবার্টি ক্রমশ বুঝিতে পারিলেন যে এই সুমতি ইতালীয় জাতির হৃদয়ে অতর্কিতভাবে উদয় হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের

আত্মজ্ঞানের সহিত উহারও ক্রমোন্নতি হইতেছে। এইরূপে সাধারণের কল্পনার সহিত গিয়োবার্টি ঐক্যমত হওয়ায় তাঁহার "প্রাইমেটো মরাল" (Primato morale) ইতালীয় সাহিত্য সমাজে বিশেষ আদৃত হইল। ঐতিহাসিক মিঃ প্রোবিনের কথায় বলিতে গেলে শুদ্ধ যে পুস্তকের ভাষা সুমার্জ্জিত নহে, এ কথা বলিলে যথেষ্ট হইবে না; কিন্তু, উহা কোন বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন জন্য রচিত হয় নাই, তাহাও বলিতে হয়। ইতালীর রাজনৈতিক অবস্থা যে নিতান্ত শোচনীয় তাহা গিয়োবার্টি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। নৈতিক ও রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের জন্য যে সমস্ত উপকরণের আবশ্যক সে সময়ে ইতালীতে তাহার সমুদয়ই বর্ত্তমান ছিল—কেবল উপায়, দৃঢ়ব্রত ও সৎসাহসের অভাবই বিশিষ্টরূপে অনুভূত হইত। সে অভ্যুদয় আনিতে হইলে বিদ্রোহ বা আক্রমণের কোন আবশ্যক নাই। অধিকন্তু যাঁহারা উহার জন্য বিদেশীয়দের কার্য্যকলাপ বা হাবভাব অনুসরণ করাকেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায় মনে করেন তাঁহারা যে কেবল সমাজে নিন্দনীয় হয়েন তাহা নহে, কিন্তু ইহপরকালে সর্ব্বত্রই সকলের বিরাগভাজন হইয়া স্ব স্ব ঘৃণিত জীবন বহন করেন। স্বাতন্ত্র্য হারাইলে মানুষের গত্যন্তর নাই। এখন পরাধীনকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে হইলে ঐক্যতা স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা (unity, independence and liberty) আবশ্যক। ইতালীয় জাতিবৃন্দকে একতাসূত্রে বন্ধন করিতে হইলে ধর্ম্মগুরু পোপের অধীনে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতালীয় রাজ্যকে সখ্যতাসূত্রে প্রথম বাঁধিতে হইবে; এবং ঐ সমস্ত রাজ্যগুলিতে স্বাতন্ত্র্যভাব রক্ষা করিয়া তাহাদিগের রাজাকর্ত্তৃক রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা করাইতে হইবে। ইহাতে ক্রমশ স্বাধীনতার ভাবও অঙ্কুরিত হইবে। কিন্তু রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয় সকল সংস্কার করিতে হইলে রাজন্যবর্গের স্ব স্ব ক্ষমতা খর্ব্ব হইবার আশঙ্কা আছে। গিয়োবার্টির মতে সে ক্ষমতা হ্রাসের সময় এখনও আসে নাই এবং আপাততঃ তাহার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি হয় নাই। যে শক্তিপুঞ্জ নীরবে ইতালীয় জাতির অধোগতি সম্পাদন করিতেছিল, তাহার আলোচনা আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। শুদ্ধ ইতালী কেন, সেই শক্তির বিকাশ যে জাতির মধ্যেই হউক না কেন, তাহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। জাতীয় উন্নতি বিধান করিতে হইলে বিচ্ছিন্ন শক্তি সমূহের সম্মিলন আবশ্যক, ইহাই গিয়োবার্টি বুঝিলেন। তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে তাঁহার মত লোকের এ বোধ নিতান্ত ভ্রমাত্মক বলিতে হয়। যাহা হউক, তাঁহারই কল্পনাপ্রসূত Primato morale পুস্তকখানি চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রের নিকটই বিশেষ আদৃত হইল এবং সকলেই ঐ মতের পোষকতা করিতে লাগিল। তাঁহার প্রাইমেটো পুস্তক ১৮৪২ সালে ব্রসেলস্ নগরে প্রথম মুদ্রিত হয়। এক পিড্‌মন্ট (Piedmont) ব্যতীত ইতালীয় আর কোন রাজ্যে উহা গৃহীত হইল না। তথাপি পিড্‌মণ্টের এই সামান্য অনুগ্রহেই গিয়োবার্টির পৃষ্ঠপোষকেরা একেবারে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন; ভাবিলেন, যে কালে উহা ইতালীর সর্ব্বত্র পঠিত হইবে। তাঁহারাও পুস্তকখানি যাহাতে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এত করিয়াও তাঁহারা বিফলমনোরথ হইলেন। তবে সুখের বিষয় এই যে গ্র্যাণ্ড-ডিউক বোরবোঁ এবং মহামতি পোপ কর্ত্তৃক উহা আদৌ আদৃত হইল না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ইতালীয়গণ ঐ পুস্তকে তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতা খর্ব্ব করিবার যে একটা উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিত। পুস্তকখানি অপাঠ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হওয়াতেই উহা লোকচক্ষু অধিকার করিয়া বসিল। তাহা না হইলে উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংবাদ রাখিতে কাহারও অবসর থাকিত না।

তদানীন্তন ইতালীয় সমাজে Primato পুস্তকের প্রতিপত্তি ও প্রসার কতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহা ইতিহাস পাঠে যথাযথ জানা যায়। লেখক যে কেবলমাত্র ইতালীয় জাতির রাজনৈতিক অধঃপতন পূর্ব্বাহ্নেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন এমন নহে, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের দোষে শাসন ও সমাজসংক্রান্ত অনেকপ্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে ইহাও তিনি সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করেন। সময় থাকিতে বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন বলিয়াই স্বরচিত পুস্তকের অনেকস্থলে এই সমস্ত বিষয়ের উপর একটা তীব্র কটূক্তি করিয়াছেন। এ বিষয়ে যদি বলা যায় যে তিনি Savonarola অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন না, তাহা হইলেও অত্যুক্তি হয় না। একস্থলে জাতিগত পাপের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি স্পষ্টই বলিলেন "যে যদি তাহারা সমূলে বিনষ্ট না হয় তাহা হইলে স্বয়ং ভগবান আসিয়া আমাদের আইন কানুন আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেও আমরা পূর্ব্ববৎ পতিতই থাকিব ও লোকসমাজে ঘৃণার্হ হইব।" জাতীয় গুণরাজি রক্ষা করিতে গিয়োবার্টি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারই চেষ্টায় জাতীয় গুণগাথা তদানীং ইতালীতে প্রায় সর্ব্বত্র গীত হইত। ইতালী যে এক সময়ে সুসভ্য ইউরোপীয় জগতের মুকুটমণি ছিল, গিয়োবার্টির যত্নেই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। গিয়োবার্টি সিজারের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে জাতীয় জয়, সাম্রাজ্য ও অন্যান্য গৌরবের কথা স্মরণ করা-ইয়া দিলেন। ইতালী সাহিত্য ও শিল্পে চির উন্নত; সেই সাহিত্য ও শিল্প গৌরবের কথা মৃতকল্প ইতালীয় জাতির স্মরণপটে আনিয়া দিলেন। কোনজাতি বিশেষের প্রাণে নূতন জীবন সঞ্চার করিতে হইলে প্রথমেই লুপ্ত জাতীয় গৌরবের কথা তাহাদের চিত্তপটে অঙ্কিত করিতে হয়। গিয়োবার্টি ও সেই পন্থা অবলম্বন করিলেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় ঐ কথায় একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কার্য্যকরী শক্তিও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু সূক্ষ্মবুদ্ধি লোকমাত্রেই বুঝিতে পারিলেন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নবাবদের ক্ষমতা হ্রাসের প্রয়াস কালে ব্যর্থ হইবে। এবং পোপ মহোদয়ও যে তাঁহার উদারতার প্রকৃষ্ট পরিচায়কস্বরূপ তাঁহাদিগকে স্বীয় ক্ষমতা হইতে কিছু বণ্টন করিয়া দিবেন সে আশাও যুক্তিসঙ্গত নহে। পোপের উপর গিয়োবার্টির যে বিশ্বাস তাহা একটি বিষয় হইতেই প্রমা-ণিত হয়। ধার্ম্মিকের প্রগাঢ় ভক্তি ও রাজ-নৈতিকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি—এ দুইই স্বতন্ত্র জিনিস। এ দুইয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া তিনি ভ্রমে পড়িলেন। যে পোপ মহোদয় চির-কাল দৈবশক্তির ও দৈবজ্ঞানের ভান করিয়া

আসিতেছিলেন, তিনিই আবার ব্যবস্থাসঙ্গত আইনের বশীভূত হইলেন! ইহাপেক্ষা ভ্রমাত্মক বুদ্ধি আর কি হইতে পারে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গিয়োবার্টি কল্পনার দাস ছিলেন এবং সেই কল্পনাবলেই দেখিলেন, যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মরাজ্যের নিয়ন্তৃ আজ সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের প্রধান উদ্যোগী হইয়া সুবিচার ও স্বাধীনতার পক্ষতাচরণ করিতেছেন। কিন্তু যাঁহাদিগের কার্য্যকরী শক্তি আছে, তাঁহারা এই কল্পনাকে মূঢ়তারই অঙ্গ বলিয়া উপেক্ষা করিলেন এবং এ কল্পনা সিদ্ধ হইলে বিধর্ম্মীদিগের পথে এখন যে সমস্ত প্রতিবন্ধক আছে তাহা কিছুই যে থাকিবে না তাহাও তাঁহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রতিবন্ধকগুলি অপসরণ করা গোঁড়া ধার্ম্মিকের চক্ষে বড়ই ভয়াবহ বলিয়া প্রতিভাত হইল। কিন্তু কল্পনারাজ্যে যাঁহারা বাস করেন সাংসারিক বিষয়ে তাঁহাদিগের আস্থা কিছু কম দেখা যায়। গিয়োবার্টিরও সেই দশা। কাযেই তিনি এ সমস্ত ব্যাপারে বিচলিত হইলেন না।

ভাগ্যক্রমে এই সময়ে নবম পায়স (Pious IX) পোপত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং তাঁহারই প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গিয়োবার্টির সৌভাগ্যসূর্য্য উদিত হইল। গিয়োবার্টি যে উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, পায়সও তাহাতেই উদ্বোধিত হন—তিনিও গিয়োবার্টির স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং মনে মনে তাঁহারই কল্পনায় তন্ময় হইয়াছিলেন। পায়স দেখিলেন তাঁহার অধীনে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ইতালীয় সমাজ ও রাজনীতি পরিশুদ্ধ করিল এবং সমগ্র খৃষ্টীয় জগতের শাসনভার পুনর্ব্বার যাজক সম্প্রদায়ের হস্তে সমর্পিত হইল। সারাংশে ইহাদের মতদ্বৈধ ছিল না, তথাপি সকল বিষয়ে দুইজনে একমত হইতে পারেন নাই। গিয়োবার্টি ভাবিলেন প্রজাগণকে তাহাদের স্বত্ব কিছু কিছু দিতে হইবে এবং তাহা ক্ষমতাশালী স্বেচ্ছাচারীর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। পায়স দেখিলেন যে যাজকগণকে ঐহিক সমাজের নিকটতর সম্বন্ধে না আনিলে ঐ সম্প্রদায়ের ক্ষমতা বলবতী হইবে না এবং উঁহাদের প্রতি জাতীয় ভক্তিও বৃদ্ধি হইবে না। ইতালীর এই সময়ের ইতিহাস পাঠে আমরা অবগত হই যে উঁহারা দুইজনেই ঘোর ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, কেন না ইহাদের কার্য্যপ্রণালীর ফল বিচিত্র রকমের হইয়াছিল। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে ইতালীয় জাতিও ভ্রমে পড়িলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে এক সংস্কারলিপ্সু ধর্ম্মরাজ এবং সাধারণ স্বাধীনতার এত বড় এক সমর্থনকারীর একত্রে আবির্ভাব বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। তাঁহারা মনে করিলেন যে এই দুই জনের মধ্যে মতের পার্থক্য কিছুই নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে এই ভ্রম কিন্তু ইতালীয় জাতির স্বাধীনতার পথ অনেকাংশে পরিষ্কার করিয়া দেয়। পায়স যদিও পরে পিছু হটিয়াছিলেন কিন্তু জাতির মধ্যে যে সকল আশা প্রদীপ্ত হইয়াছিল তাহা আর নিভিল না—আশা বলবতী হইল এবং উদার নৈতিক দলের কার্য্যও অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সকল কারণগুলিই গিয়োবার্টির মতকে বিকশিত করিয়া তুলে। তাঁহার প্রধানতম অভিপ্রায় তিনি ইতালীয় জাতিকে ভাল করিয়া বুঝাইলেন। তিনি বলিলেন যে ভূগোলের দিক্ দিয়া বিচার করিলে ইতালীতে বিপদের

আশঙ্কা কম; আর তাঁহারা সকল জাতি অপেক্ষা পুরাতন বংশোদ্ভব এবং সেইজন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সকল কারণে ইতালীয় জাতি সমস্ত ইয়োরোপীয় জগতের কর্ত্তা ছিল এবং আধুনিক ইয়োরোপীয়দের মধ্যে পুনরায় সে পদ তাহারা লাভ করিবেই করিবে, ইহাই গিয়োবার্টির প্রাণের প্রিয়তম আশা ছিল এবং তিনি যে এই আশার গান গাহিয়াছিলেন তাহা শুধু ইতালীয়দিগের জাতীয় অহঙ্কার বৃদ্ধি করাইবার জন্য নহে।

গিয়োবার্টি বলেন যে "ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবার জন্য যে সকল গুণের আবশ্যক তাহা কেবল ইতালীয়তেই আছে। আজ যদিও ইতালী ইউরোপ মধ্যে সে স্থান অধিকার করিতেছে না এবং তাহার উপর স্বত্ব হারাইয়াছে, তথাপি সে সেই পদ ও সে ক্ষমতা পুনরধিকার করিতে সক্ষম। তিনি তাহারই অতি প্রয়োজনীয় নিয়মটি বলিলেন। শৈশবে সভ্যতা দুই নদের মধ্যে মিসোপটেমিয়াতে বসতি করিত এবং মিসোপটেমিয়া হইতে সেই সভ্যতা আসিয়া, আফ্রিকা এবং পশ্চিমে বিস্তারিত হইয়া ছিল। প্রৌঢ়াবস্থায় সভ্যতা দুই মহাসমুদ্রের মধ্যস্থানে অবস্থিতি করিতেছে। টাইরিণ ও আড্রিয়াটিক মহাসমুদ্রের অন্তস্থিত সেই ইতালী খণ্ডে অবস্থিত এবং সেই কারণেই ইতালী ইউরোপে পুনরায় আদৃত হইবেই হইবে। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম আশ্চর্য্য জিনিষ। ইহা গ্রীসীয় সভ্যতা এবং বর্ব্বর জাতির অসভ্যতা এক চক্ষে দেখে—কোন প্রভেদ করে না। ধর্ম্মসমক্ষে সকল জাতিই এক। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের এক মুখ্য পুরোহিত আছেন। এবং তাঁহাকেই ভগবান সর্ব্বোচ্চস্থানে অভিষিক্ত করিয়াছেন, যে স্থান হইতে তিনি আমাদের অপেক্ষা তাঁহার সন্নিকট এবং সেই কারণে অন্যের তুলনায় তাঁহার স্বর ভগবানের নিকট শীঘ্র এবং স্পষ্টতর হইয়া পৌছিবে।

(ক্রমশ)

শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ।

বুদ্ধ ও আনন্দ।

(মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্ত)

রাজগৃহে গৃধ্রকূটে, ধ্যানমগ্ন নেত্রপুটে
　সৌম্যমূর্ত্তি তথাগত পবিত্র আসনে;
যেন দীপ্ত তপোরাশি শৈলশির পরকাশি'
　পূর্ণ নিজমহিমায় সংযম শাসনে।
তখনো হয়নি সন্ধ্যা, বকুল রজনী গন্ধা
　মুক্তদল হৃদয়ের ছাড়েনি সৌরভ;
তখনো আকাশতটে অলকার চিত্রপটে
　রক্তাম্বরা সুরবালা আসেনিক সব;
সারস বলাকাগণ, তরঙ্গিত মাল্যসম
　তখনো অম্বর তলে পড়েনি ছাপিয়া,
তখনো পুণ্যকালে দূর উপস্থান শালে
　চৈত্যে, স্তূপে, দীপাবলী উঠেনি জ্বলিয়া।

আনন্দ বুদ্ধের পাশে নবীন গৈরিক বাসে ;
ধ্যাননিরত গুরুদেবে করিছে বীজন ;—
শাশ্বত সাম্রাজ্য দীপ্তি, ললাটে জাগিয়া যেন
অন্তর্জ্যোতি মহিমায় ভাস্বর আনন !

তখন দাঁড়াল ধীরে বিজন মন্দির দ্বারে
বৃদ্ধ মন্ত্রী বর্ষকার অজাত শত্রুর ;—
চকিতে হৃদয়ে তার গন্ধে ভরা মৃত্তিকার,
লাগিল পাবন স্পর্শ বৈকুণ্ঠ বায়ুর !
আত্ম বিস্মৃতের মত মৌন, স্তব্ধ, চিত্রগত
সেই পুণ্য দেবশৈলে দাঁড়ায়ে ব্রাহ্মণ,
কহিল "হে ভগবন, সম্রাট অজাতশত্রু
সসম্ভ্রমে আজি তব বন্দিয়া চরণ,
আদেশ মাগেন তব বৃজিগণে নাশিবারে ;—
তা'রা অতি পরাক্রান্ত শত্রু আমাদের "—
এত কহি বর্ষকার নমে পুনঃ পদে তাঁর ;
জাগিল ছন্দের কম্প হৃদয়ে বুদ্ধের !

সুগত উঠিলা হাসি,— স্বরগের পুষ্প রাশি
উদার নয়ন হতে ছাইল হৃদয়ে ;—
কিবা দীপ্তি শিবতরা চন্দ্রমার স্পর্শভরা ;
সে বিজন শৈলশির পূরিল বিস্ময়ে।

রহিলেন কিছুক্ষণ মৌনী, সমাহিত মন ;
চরাচর ভরা কত স্তব্ধ নীরবতা ;
সুপ্রসন্না সন্ধ্যারাণী, মুখে তাঁর স্তব্ধ বাণী,
নক্ষত্র সভায় হ'ল স্তব্ধ মধুকথা !

চাহি আনন্দের পানে কহিলেন ভগবান
"হে আনন্দ, কহ মোরে সববৃজিগণ
সভায় সঙ্গত হয়ে একবাক্যে একপ্রাণে
করেনা কি নিজেদের পথ নির্দ্ধারণ ?"
আনন্দ আনতশিরে কহে অতি ধীরে ধীরে
"সত্য প্রভো ; তা'ই তা'রা করে চিরদিন।"
বুদ্ধ কন্ "তবে তা'রা অজেয় স্বাধীন।"
আবার পুছিলা প্রভু— "হে আনন্দ, কহ কভু
বৃজিগণ করেনাত রমণী জীবন
অবরোধে অবরুদ্ধ, শৃঙ্খলিত প্রতি পদে,
জ্ঞানময় উপবীত করিয়া ছেদন ?"
আনন্দ আনত শিরে কহে ধীরে অতি ধীরে
নহে প্রভো, তা'রা ইহা মনে করে হেয়।"
বুদ্ধ কন্—"বৃজিগণ তবে ত অজেয়।"
প্রভু জিজ্ঞাসিলা পুনঃ "হে সুন্দর-সৌম্য, শুন
বৃজিগণ বরেণাত নব প্রতিষ্ঠান,
অতীতের সনাতন ধ্রুব ভূমি পরিহরি' ?
তারা কি উন্মত্ত শুধু লয়ে বর্ত্তমান ?"
আনন্দ আনত শিরে ধীরে কহে, অতি ধীরে
"তা'রা ত করেনি প্রভো, ইহা কোন দিন।"
বুদ্ধ কন্—"তবে তারা রহিবে স্বাধীন।"
শুনি ইহা বর্ষকার প্রণমিয়া বার বার
চলে গেল ধীর পদে আপনার পুরে।
স্তূপে ফুটে দীপরাজি— আরতি উঠিল বাজি
পল্লীর বিজন বক্ষে দূরে অতি দূরে !

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত।

উর্ব্বরতা।

কোনও জমি উর্ব্বর, এ কথা বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে সেই জমিতে গাছের জীবন ধারণ ও বৃদ্ধির জন্য যে সকল খাদ্যের প্রয়োজন, তাহার সমস্তই যথেষ্ট পরিমাণে আছে। রসায়ন শাস্ত্রে ইহারা কারবন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, পোটাসিয়ম্, ফস্ফোরাস্ ম্যাগনেসিয়ম্, ক্যাল্সিয়ম্, লৌহ এবং গন্ধক নামে পরিচিত।

এই কয়টি মূল পদার্থের সকলগুলিই গাছের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। গাছের জীবনে ইহাদের প্রত্যেকটিরই একটি বাঁধা নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে। লৌহের কাজ পোটাসিয়মে হয় না, ফস্ফোরাসের অভাব নাইট্রোজেন্ পূরণ করিতে পারে না।—সুতরাং কোনও জমিতে এই সকল মূল পদার্থের একটি মাত্রেরও অভাব ঘটিলে গাছের পক্ষে তাহা মারাত্মক। বাকী অন্যান্য সমস্ত খাদ্য প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও গাছের তাহা কোনই কাজে আসে না।

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ্-খাদ্যের সকলগুলিই বিভিন্ন পরিমাণে প্রায় সমস্ত জমিতেই ছড়াইয়া আছে। যে জমিতে শুধু ঘাস, বুনো কুল, কি করমচার গাছ জন্মিতে থাকে তাহাকে আমরা সাধারণত অনুর্ব্বর বলিয়া থাকি। কিন্তু সে জমিতে কোনও জাতীর উদ্ভিদই যে জন্মিয়াছে, ইহাতেই প্রমাণ হয় তাহা উর্ব্বর—গাছের জীবন ধারণের জন্য যে দশটী মৌলিক পদার্থের প্রয়োজন, তাহার সকল গুলিই সেখানে আছে। এ জমিতে যে ধান্য অথবা ইক্ষু জন্মে না তাহার কারণ অন্য। হয়ত এ স্থলে মাটী সহজেই এত জমাট বাঁধিয়া যায় যে ধানের শিকড় সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। এখানকার মাটির স্তর হয়ত এমন ভাবে আপাতত দানা বাঁধিয়া আছে, যে সেখানে "রস" সংগৃহীত হইবার উপায় নাই। তাহা ব্যতীত এমনও হইতে পারে যে সেখানে দশটা খাদ্যের দু'একটি অত্যন্ত অল্প পরিমাণে আছে। বিভিন্ন গাছের জন্য বিভিন্ন পরিমাণে খাদ্যের প্রয়োজন হয়। একমণ ধানের হয়ত একসের নাইট্রোজেন্ নহিলে চলে না, বুনো কুলের হয়ত একছটাক নাইট্রোজেনেই চলিয়া যায়। ধান যেখানে উপবাসে মরে, ঘাস ও আগাছা সেখানে এই জন্যই অনায়াসে দিব্য হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া উঠিতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মৃত্তিকার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া কোন সুবিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ (Professor F. W. Clarke of the United States Geological Survey) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, গড়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রথমস্তরের সাতইঞ্চি মাটিতে যে পরিমাণ লৌহ আছে তাহাতে প্রতিবৎসর বিঘা প্রতি ২৩ মণ করিয়া ভুট্টা উৎপন্ন করিলে ২,৪০,০০০ বৎসরে লৌহ ফুরাইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। এবং যে পরিমাণ ক্যাল্সিয়ম্ আছে তাহাতে ৬১,০০০ বৎসর, যে

পরিমাণ ম্যাগ্‌নেসিয়ম্ আছে তাহাতে ৭৬০০০; যে পরিমাণ সল্‌ফর্ আছে তাহাতে ২,১০০ বৎসর এবং যে পরিমাণ পোটাসিয়ম্ আছে তাহাতে ২,৪০০ বৎসর চলিতে পারে। কিন্তু যে পরিমাণ ফস্‌ফোরাস্ আছে তাহাতে সুধু ১২০ বৎসর মাত্র চলিবে। কর্ষিত মাটিতে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন্ আছে, এইভাবে কোনো রূপ সারপ্রয়োগ না করিয়া প্রতিবৎসর বিঘা-প্রতি ২৩ মণ করিয়া ভুট্টা উৎপাদন করিয়া গেলে, পঞ্চাশ বৎসরেই তাহার সমস্ত নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

ইহা হইতে আর কিছু না হোক, স্পষ্টই দেখা যায়, অন্যান্য উদ্ভিদখাদ্যের তুলনায়, মাটিতে নাইট্রোজেন্, ফস্‌ফরাস্, পোটাসিয়মের পরিমাণ কতই অল্প!—বস্তুত এই তিনটিকে লইয়াই যত গোলোযোগ। অধিকাংশ "নিস্তেজ"বা অনুর্ব্বর জমি, এই তিনটির দুটি কি একটির অভাবেই অনুর্ব্বর হইয়া আছে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, এই দশটি উদ্ভিদ-খাদ্যের মধ্যে জমিতে যেটির পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা কম, তাহারই প্রভাব উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কোন জমিতে দুইলক্ষ মণ গোধুম উৎপাদন করিবার মত নয়টি খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে আছে, কিন্তু বাকী একটি যে পরিমাণ আছে তাহা সুধু দুই শত মণ গোধুমের পক্ষে প্রচুর। এ ক্ষেত্রে সুধু দুইশত মণ শস্য পাওয়া যাইবে, দুইলক্ষ মণ নহে।

তাহার পর সুধু দশ প্রকার খাদ্যের সকলগুলিরই প্রচুর পরিমাণে মাটিতে থাকাই যথেষ্ট নহে—এগুলি এমন অবস্থায় থাকা আবশ্যক, যাহাতে গাছ ইহাদের গ্রহণ করিতে পারে। এঁটেল মাটিতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন্ আছে এবং গাছের জন্য যে সকল খাদ্যের প্রয়োজন তাহার সমস্তই পাথরে পাওয়া যায়। তথাপি পাথর ও এঁটেল মাটি মিশাইলে যে পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাহাতে গাছ বাঁচে না—সে মাটি "উর্ব্বর" নহে। কারণ খাদ্য এখানে যে ভাবে আছে তাহা জলে দ্রব হয় না, এবং তরল আকারে শিকড়ের আশে পাশে না থাকিলে গাছ মাটি হইতে কোনও আহার্য্যই গ্রহণ করিতে পারে না। জলের সহিত গাছের জীবনের সম্পর্ক এই জন্যই এত ঘনিষ্ঠ।

মাটির যে অংশটুকু জলের সংস্পর্শে আসে, তাহাতে যতটুকু দ্রবণীয় আহার্য্য আছে তাহারই তরল আকার ধারণের সুযোগ ঘটে। সুতরাং জমাট চাপ বাঁধা জমিকে গুঁড়া করিয়া যত অসংখ্য কণায় পরিণত করা যায়, জল ততই ঘনিষ্ঠ ভাবে খাদ্যের সহিত যুক্ত হইবার অবকাশ পায় এবং গাছও সেই পরিমাণে অধিক আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে। লাঙ্গল দেওয়া প্রভৃতিতে ইহাই সিদ্ধ হয়।

আজকাল ভূমির উর্ব্বরতা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জগতে নানাবিধ পরীক্ষা চলিতেছে। এইরূপ পরীক্ষা সাধারণত "রাসায়নিক বিশ্লেষণ" ও "কল্‌চার এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্ (culture experiment) এই দুই উপায়ে হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত উপায়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়া মতে মাটিতে কোন্ কোন্ আহার্য্য কি পরিমাণে আছে তাহা স্থির করা হয়। তাহার পর সাধারণত যে সকল মাটি উর্ব্বর বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাতে যে পরিমাণ এই সকল পদার্থ আছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে কোন্ বিষয়ের অসম্পূর্ণতার জন্য মাটি অনুর্ব্বর

হইয়া আছে অথবা উর্ব্বর হইতেছে না, সহজেই তাহা জানা যায়। দ্বিতীয় উপায়ে জমিতে এমন একটি অংশ বাছিয়া লওয়া হয়, যাহার সহিত সেখানকার আশে পাশের জমির বিশেষ কোনও প্রভেদ নাই। তাহার পর সেই জমিকে লম্বালম্বি ২০।২৫টি সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক একটিতে পর্য্যায়ক্রমে ফস্‌ফোরাস্, পোটাসিয়ম্, নাইট্রোজেন্ প্রভৃতি প্রয়োগ করা হয় এবং দুই তিনটি প্লটে (ভুমিখণ্ডে) কোনো প্রকার সার প্রয়োগ করা হয় না। একই প্রকার বীজ, একই সময়ে, একই ভাবে এই সকল বিভিন্ন অংশে বপন করিবার পর, উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ও গুণানুসারে জমিতে কোন্ কোন্ খাদ্যের প্রয়োজন তাহা স্থির করা যায়। খোলা মাঠে এরূপ পরীক্ষায় কখন কখনও অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, তুষারপাত প্রভৃতি আকস্মিক দৈবদুর্য্যোগ বশত অসুবিধায় পড়িতে হয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আকারের টবে পরীক্ষা করিবারও রীতি আছে। নিম্নে এইরূপ পরীক্ষার একটি ছবি দেওয়া গেল। এই ছয়টি টবের মাটিই একস্থানের, এগুলিতে একই প্রকারের বীজ বপন করা হইয়াছিল। এক ও দুই নম্বর টবে নাইট্রোজেন্ ও ফস্‌ফোরাস্, তিন ও চারি নম্বর টবে নাইট্রোজেন্ ও পটাসিয়ম্, পাঁচ নম্বর টবে ফস্‌ফোরাস্ ও পটাসিয়ম্ ও ছয় নম্বর টবে নাইট্রোজেন্ ফস্‌ফরাস্ ও পটাসিয়ম্ সার দেওয়া হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে ৫ নম্বর টবে গাছ মোটেই বাড়িতে পারে নাই, কিন্তু অন্যান্য টবে অল্প বিস্তর সব গাছগুলিই বেশ তেজাল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, নাইট্রোজেনের অভাবেই পাঁচ নম্বর টবে গাছগুলি বাড়িতে পারে নাই—অন্যান্য টবে নাইট্রোজেন্ ছিল বলিয়া গাছগুলি বাড়িয়া উঠিয়াছে। অতএব যে জমি হইতে এই মাটি লওয়া হইয়াছে, বুঝিতে হইবে সেখানে নাইট্রোজেনের অভাব আছে। ১, ২ ও ৬নং টবে নাইট্রোজেনের সহিত ফস্‌ফোরাস্ ব্যবহার করিয়া তিন ও চারি নম্বর টব অপেক্ষা অনেক ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে, অতএব বুঝিতে হইবে জমিতে ফস্‌ফোরাস্‌ও যথেষ্ট পরিমাণে নাই।
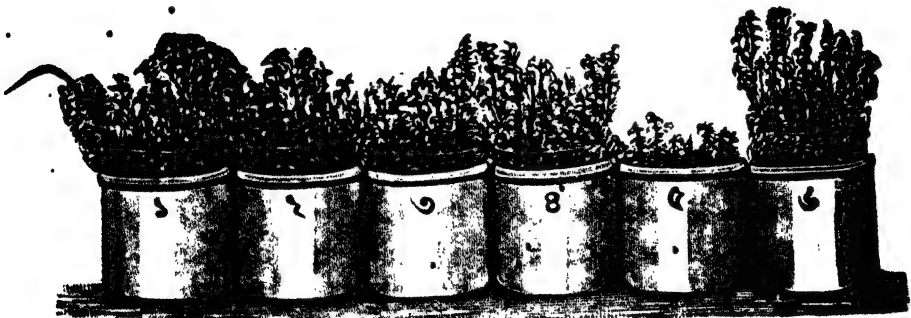
কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই ধরণের পরীক্ষা বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল,—এ সকল তত্ত্ব সাধারণ কৃষকের কোনও কাজে আসিবে এ কথা কেহ ভাবিতেও পারিত না। কিন্তু গত দশ বৎসরের মধ্যে সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্শের বিভিন্ন ষ্টেট্গুলিতে ৬০টি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাদের শাখা প্রশাখায় আজ সমস্ত উত্তর আমেরিকা ছাইয়া ফেলিয়াছে। ঘাস জন্মান, কীট নিবারণ, পশুপক্ষীর রোগ-চিকিৎসা, পয়ঃপ্রণালী খনন, গৃহনির্ম্মাণ, জমির উর্ব্বরতা রক্ষা ও বৃদ্ধি প্রভৃতি কৃষিসম্বন্ধে সহস্র সহস্র বিষয় এই সকল স্থানে চলিতেছে। এই সকল পরীক্ষার ফলাফল সর্ব্বসাধারণের গোচর করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা চলিতেছে। ইহার জন্য কতপ্রকার উদ্যোগ আয়োজন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সম্প্রতি প্রত্যেক ষ্টেটের বিভিন্ন জমিতে কি কি উদ্ভিদখাদ্যের অভাব আছে, পটকাল্চার ও রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা তাহা স্থির করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেটের ম্যাপ্ প্রস্তুত হইতেছে—এই ম্যাপের সাহায্যে ঘরে বসিয়া যে কোনও কৃষক তাহার জমিতে কিসের অভাব আছে, তাহা অনায়াসে স্থির করিতে পারিবে।

এই সকল চেষ্টার ফল ইতিমধ্যেই ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। ৫০।৬০ বৎসর ক্রমান্বয়ে এক শস্য উৎপন্ন করিবার পর, এখানকার (ইলিনয় ষ্টেটের) অনেক জমি নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল—যেখানে পূর্ব্বে বিঘাপ্রতি অনায়াসে পাঁচ ছয় মণ গোধূম পাওয়া যাইত, সম্প্রতি সেখানে একমণ শস্যও পাওয়া যাইতেছিল না। সাধারণ ভাবে সার দিয়া বিশেষ কিছু উন্নতি অবনতি বোঝা যায় নাই। গত ব[illegible]পূর্ব্ব বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়া[illegible] এ[illegible]বণীয় ধরণের অধিকাংশ জমিতে শুধ পট[illegible]আকার অভাব ঘটিয়াছে, অন্যান্য সমস্ত খাদ্য এখনও প্রচুর পরিমাণে আছে। পটাসিয়মের অভাব পূরণ করিবার পর এই দুই বৎসর সেই সকল জমিতেই আবার পূর্ব্বের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতেছে।

শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার।

বেদান্ত দর্শন।*

বেদান্ত বেদের অন্ত। বেদ দুই ভাগে বিভক্ত; মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব্ব এই চারি বেদের প্রত্যেকেরই কতক অংশ মন্ত্রাত্মক, কতক অংশ ব্রাহ্মণাত্মক। ঋক্-সংহিতায় যে ১০১৭টী সূক্ত আছে, তাহারা সকলেই মন্ত্র। ঋক্বেদের একটী ব্রাহ্মণ ছাপা হইয়াছে। উহার নাম ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শেষ ভাগ ঐতরেয় আরণ্যক। ঐতরেয় আরণ্যকের শেষ ভাগ ঐতরেয়োপনিষৎ। প্রথম মন্ত্র, পরে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের শেষভাগকে আরণ্যক বলে, কেন না উহারা অরণ্যে অধীত হইত। অরণ্যেঽনুচ্যমানত্বাদারণ্যকমুদাহৃতম্। আবার আরণ্যকের শেষে উপনিষদ্ বা বেদান্ত থাকে। এইরূপে শুক্লযজুর্ব্বেদে প্রথম সংহিতা (বাজসনেয়-সংহিতা), পরে ব্রাহ্মণ (শতপথ ব্রাহ্মণ)।

* কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ওরিয়েন্টাল ক্লবে, ১৯০৮ সালের ৬ই জানুয়ারী, এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ অংশ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্। কাজেই বেদান্ত (উপনিষৎ) যথার্থই বেদের অন্ত বা শেষ অংশ। এতদ্ভিন্ন আরও এক কারণে উপনিষদকে বেদান্ত বলে। বেদান্তে বেদ-প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জন্যই ঈশোপনিষৎ শুক্লযজুর্ব্বেদের সংহিতার শেষ অংশ হইলেও উহাকে বেদান্ত বলে। উহার অপর নাম বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ। বস্তুতঃ আমরা যে সকল উপনিষৎ দেখিতে পাই, তাহার কতগুলি মন্ত্রোপনিষৎ আর কতগুলি ব্রাহ্মণোপনিষৎ। কথিত আছে যে প্রত্যেক শাখারই এক একখানি স্বতন্ত্র উপনিষদ্ আছে। ঐকৈকস্যাস্ত শাখায়া ঐকৈকোপনিষন্মতা। এইরূপে মুক্তিকোপনিষদে ১১৮০ খানি উপনিষদের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে ১০৮ খানি সমধিক প্রসিদ্ধ। এই ১০৮ খানির মধ্যেও আবার

> ঈশ কেন কঠ-প্রশ্নমুণ্ডমাণ্ডূক্যতিত্তিরিঃ।
> ঐতরেয়ঞ্চ ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকস্তথা।

শ্বেতাশ্বতর, কৌষিতকী, ব্রাহ্মণোপনিষৎ, মৈত্রেয়াণী উপনিষৎ প্রভৃতি অতীব প্রসিদ্ধ।

এই সকল উপনিষদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কিনা জগতের মূল কারণ। সুপ্রসিদ্ধ গৌড়াচার্য্য প্রকৃতি শব্দের পর্য্যায়-নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ব্রহ্ম শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্ম হইল জগতের মূল কারণ বা প্রকৃতি। এই ব্রহ্ম কি? জড় না চেতন? উপনিষদের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি নির্ণয় করিয়াছেন যে যাহা হইতে জগত উৎপন্ন হইয়াছে, যাহাতে জগত অবস্থিতি করিতেছে এবং যাহাতে লীন হইবে, সেই ব্রহ্ম ও জীবাত্মা অভিন্ন পদার্থ। উপনিষদের মতে

ব্রহ্ম = আমি।

শঙ্করের মতে, এবং বিদেশীয় পণ্ডিত দয়সেনের (Deussen) মতে ইহাই উপনিষদের উপদেশ।

উপনিষদের প্রধান প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, এবং উপনিষদের অধিকাংশই অদ্বৈতবাদের অনুকূলে। কিন্তু তাই বলিয়া উপনিষদে যে অন্য কোনও মতের সমাবেশ নাই একথা বলা যায় না। বস্তুত উপনিষদ্ এক ব্যক্তির বা এক সময়ের লিখিত গ্রন্থ নহে। কাজেই উপনিষদের উপদেশগুলির পরস্পরের সহিত নিখুঁৎ মিল নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে লিখিত আছে।

> অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং
> বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
> অজো হ্যেকো জুষমানোঽনুশেতে
> জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ। ৪।৫

এই মন্ত্রটী পড়িলে স্বতই মনে হয় যে সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষই এই শ্রুতির প্রতিপাদ্য এবং কপিলের সাংখ্যদর্শনই উপনিষদের অনুমোদিত। আবার, ঐ শ্বেতাশ্বতরেই ৫ম অধ্যায়ে

> ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি
> জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ। ৫।২

এই বলিয়া শ্রুতি আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্টভাবায় কপিলের দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, ছান্দোগ্যে

> তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো

এই বাক্যটীর পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, অদ্বৈতই তত্ত্ব এবং জীব এবং ব্রহ্ম বস্তুতই

অভিন্ন। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি জীব-বহুত্ববোধক, ছান্দোগ্যশ্রুতি জীবাত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব ও অভেদ বোধক। কোন্‌টী সত্য? আবার,

বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্,

এই ছান্দোগ্যশ্রুতি পড়িয়া মনে হয় জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম, বিবর্ত্ত নহে। শ্রুতিতে এইরূপ নানা বিরোধ বা বিরোধাভাসের উপলব্ধি হয়। এই সকল বিরোধ মীমাংসা করিবার জন্য ভগবান্ বাদরায়ণ উত্তর মীমাংসা, ব্রহ্মমীমাংসা বা শারীরক মীমাংসা নামক সূত্রসমূহ প্রণয়ন করিয়াছেন। মালাকার যেরূপ নানা ফুল লইয়া সূত্রের সাহায্যে মাল্য রচনা করে, ভগবান্ বাদরায়ণ মুনিও ঠিক্ সেইরূপ শ্রুতিবাক্যরূপ কুসুমগুলিকে তদীয় সূত্রমালায় গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই সূত্রগুলি এবং ইহাদের ভাষ্যাদিই বেদান্ত শব্দের দ্বিতীয় অর্থ। আজকাল বেদান্ত দর্শন বলিলে, এই সূত্র, ভাষ্য, ভাষ্যের টীকা প্রভৃতি এবং এতদবলম্বনে লিখিত পঞ্চদশী, বেদান্তসার, বেদান্তপরিভাষা, অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি বুঝায়।

যেরূপ মহামুনি জৈমিনি বেদের কর্ম্ম-কাণ্ডের মীমাংসা করিয়াছেন, ঠিক্ সেইরূপে মহর্ষি ব্যাস, বেদের জ্ঞানকাণ্ডের মীমাংসা করিবার জন্য "বেদান্ত সূত্র, ব্রহ্মসূত্র বা শারীরক মীমাংসার" প্রণয়ন করিয়াছেন। বন্দ্যঘটীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণের মীমাংসা করিয়া যেরূপ "অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব" রচনা করিয়াছেন, ঠিক্ সেইরূপে, জ্ঞানকাণ্ডের বা উপনিষদের মীমাংসা করিয়া বাদরায়ণ "ব্রহ্ম-সূত্র" লিখিয়াছেন। বাদরায়ণ ভারতের জ্ঞানপ্রধান শ্রৌতযুগের রঘুনন্দন। বাদ-রায়ণের প্রণীত "ব্রহ্মসূত্র" ও তাহার ভাষ্য প্রভৃ-তিকে একহিসাবে, কথ্যভাষায় স্মৃতির গ্রন্থ (exegetical works) বলিয়া ধরা যাইতে পারে। বস্তুত, সূত্র ও ভাষ্যের অধিকাংশ কেবল কোন্ শ্রুতির কিরূপ অর্থ তাহা লইয়াই ব্যস্ত। ঈক্ষতে র্নাশব্দম্ (১।১।৫) এই অধিকরণে বুঝান হইয়াছে যে সদেব সোম্য ইদমেক এবাগ্র আসীৎ প্রভৃতি স্থলে সৎ অর্থ ব্রহ্ম। প্রাণ-স্তথানুগমাৎ (১।১) এই অধিকরণে ব্রহ্মের প্রাণশব্দবাচ্যত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। এই গুলিকে কিরূপে জ্ঞানশাস্ত্র দর্শনের মধ্যে অন্তর্ভূত করিয়া লইব? রঘুনন্দনের গ্রন্থ পড়িয়া লোক স্মার্ত্ত হয়, ব্রহ্মসূত্র পড়িয়া লোক দার্শনিক হয় কেন? উভয়েই ত শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য নিরূপণ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। বৈদান্তিককে জোর "শ্রৌত" বা "ঔপনিষদ্" বলিতে পারি, তিনি দার্শনিক হইলেন কিরূপে?

এই প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে, স্মৃতি-শাস্ত্রের এবং উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করিতে হয়। স্মৃতিশাস্ত্রের তাৎ-পর্য্য বিধিতে। স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়া দেয়, "ইহা কর্ত্তব্য"; "ইহা অকর্ত্তব্য", "ইহা করিলে স্বর্গ হয়," "ইহা করিলে নরক হয়।" কোন কায স্বর্গপ্রাপক, কোন কায নরকপ্রাপক, তাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা জানা যাইতে পারে না। স্বর্গাদি লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য পদার্থ। স্বর্গের স্বরূপ এবং কিরূপে উহা লাভ করা যায় ইত্যাদির প্রতিপাদন স্মৃতিশাস্ত্রের মুখ্য প্রয়ো-

জন। কাজেই স্মৃতিশাস্ত্রে বা তাহার মীমাংসার তর্কের বিশেষ অবকাশ নাই। নবমীতে লাউ খাইলে পাপ হয়। এ বিষয় নিয়া কোন বিচার চলে না। শাস্ত্রে আছে পাপ হয়, অতএব পাপ হয় বলিতেই হইবে। প্রত্যক্ষ বা অনুমান নবমীতে লাউ খাওয়ার শারীরিক মানসিক উপকারাপকার বুঝাইতে পারে পারুক, তাহাতে স্মার্ত্তের কোন ইষ্টানিষ্ট নাই। একাদশীতে উপবাস করিলে রস টানে টানুক, কিন্তু শাস্ত্রে সেই জন্যই যে একাদশীতে উপবাস করার ব্যবস্থা, এ কথা স্মার্ত্ত স্বীকার করিতে পারেন না। যদি রস টানাই উদ্দেশ্য হয়, তবে দ্বাদশীতে উপবাস করি না কেন? যদি খাদ্যের বৈচিত্র সম্পাদন মানসেই প্রতিপদাদিতে দ্রব্যবিশেষের নিষেধ হইয়া থাকে, তবে দ্বিতীয়ায় কুষ্মাণ্ড এবং চতুর্থীতে নারিকেল নিয়মপূর্ব্বক ত্যাগ করি না কেন? শাস্ত্রের বিষয়ে যুক্তি তর্ক চলে না!

পূর্ব্বাত্যামপরিচ্ছিন্নে শাস্ত্রমর্থে প্রবর্ত্ততে।
প্রত্যক্ষানুমানানধিগত বস্তুতত্ত্বাখ্যানং শাস্ত্রধর্ম্মঃ।
অপ্রাপ্তপ্রাপকো বিধিঃ।

প্রভৃতি শত শত বচনের উপন্যাস করিয়া দেখান যাইতে পারে যে বিধিতে তর্কের প্রসার নাই। ইহা না বুঝিয়া অনেকে স্মৃতি শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহারের "আধ্যাত্মিক" ব্যাখ্যা করেন। প্রথমে কেন একাদশীতে উপবাসের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক জানিবার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু এ ঐতিহাস এবং দার্শনিক স্মার্ত্ত নহেন। বর্ত্তমান সময়ে লোকে যাহাকে "হিন্দু" বলে, সে শ্রেণীতে প্রবেশের অধিকার তাহার আছে কি?

উপনিষদে বস্তুর স্বরূপ জ্ঞাপিত হইয়াছে। বস্তুস্বভাবনিরূপণকারিণী শ্রুতি যদি বলেন যে চক্ষুদ্বারা শব্দের উপলব্ধি হয় বা মানবগণ স্বভাবত দুঃখের অন্বেষণ করে, তবে সেখানে উপনিষদের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

নহ্যাগমানাং শতমপি ঘটং পটয়িতুমীশতে।

বস্তুর স্বভাব যেরূপ আছে, শ্রুতি তাহা বদলাইয়া দিতে পারে না। যদি কোনও মত তর্কদ্বারা নিরাকৃত হয়, তবে সেমত শ্রৌতমত হইতে পারে না। এই জন্যই ভগবান্ ভাষ্যকার যুক্তিদ্বারা সাংখ্য ন্যায় প্রভৃতি দর্শন নিরাকৃত করিয়াছেন। এই স্থানেই বেদান্তের দর্শনত্ব। বেদান্তদর্শন বস্তুতত্ত্ব নিরূপণের ভার কেবল মাত্র শ্রুতির উপর দেন না। দিতে পারেন না। শ্রুতি আমাদিগকে সব বলিয়া দিবে, আর আমরা স্বকীয় বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিব না, এই মত জাগতিক বস্তুস্থিতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। কই, শীতকালে ত আমাদের শরীরস্থ রোমাবলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কম্বলের কাজ করে না? আমরা বুদ্ধি দ্বারা যতদুর যাইতে পারি, যাইব। পরে যখন আর অগ্রসর হইতে পারিব না, তখন জননীস্থানীয়া শ্রুতি বলিয়া দিবেন, "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"। এই সোঽহং-তত্ত্ব মানবের বুদ্ধির অগম্য—যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। মাত্র এইখানেই শ্রুতির সাহায্য চাই। পরে আবার এই মতের দৃঢ়ীকরণের জন্য যুক্তির শরণ লইব। শ্রুতিমধ্যে —দুইদিকেই যুক্তি। এই দুই দিকের Negative ও Positive, প্রতিষেধাত্মক এবং স্থাপনাত্মক যুক্তিই বেদান্তকে দর্শনপদবীতে

উন্নীত করিয়াছে। এইখানেই বেদান্তের দর্শনত্ব।

ইতিহাস।

বেদান্তশাস্ত্র কবে কিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা ঠিক্ করিয়া ধরিয়া দেওয়া যায় না। তবে বেদান্ত যে অতি প্রাচীন দর্শন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের নাসদীয় সূক্ত, দেবী সূক্ত, এবং পুরুষসূক্ত প্রভৃতিতে বেদান্ত-দর্শনের মত দেখিতে পাই। বেদান্তের ষট্-প্রমাণের দিকে লক্ষ্য করিলেও বেদান্তকে অবশ্য প্রমাণত্রয়বাদী সাংখ্যাদি হইতে প্রাচীন বলিতে হইবে। কিন্তু এই ষট্প্রমাণবাদ বেদান্তের অবশ্য রক্ষণীয় অবয়ব না হইলেও হইতে পারে। উপনিষদ্রূপ মূল বেদান্ত বৈদিকযুগের শেষ-ভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। উপনিষদ্ আজ কালকার প্রচলিত কথায় ঠিক্ দর্শন বা philosophy নহে। উহাতে মোটের উপর কোনও system বা প্রতিপাদনরীতি নাই। (প্রত্যেক অংশের প্রতিপাদনরীতি অতি সুন্দর—উহা পরে বর্ণিত হইবে।) স্বাধীনচিত্ত ঋষিদের মনে যখন যে তত্ত্বের উদয় হইত, তাঁহারা তাহাই উপনিষদে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ, জগতের সকল তত্ত্বের সামঞ্জস্যপূর্ব্বক মীমাংসা করিয়া দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন, ভারতীয় পরবর্ত্তী দার্শনিকগণের (সূত্রকার, ভাষ্যকার প্রভৃতির) এবং নব্য ইয়ুরোপের জার্ম্মাণগণের একচেটিয়া বলিলেও হয়।

উপরে যে বেদান্তের কথা বলা হইল, তাহা আধুনিক ব্রহ্মসূত্র নহে। পাণিনি যেরূপ বৈয়াকরণগণের মধ্যে অতি কনিষ্ঠ, বর্ত্তমান বেদান্তসূত্রের প্রণেতা সেইরূপ বেদান্ত-সূত্রকারদিগের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ। তিনি জৈমিনি, আশ্মরথ্য, বাদরি, বাদরায়ণ, ঔড়ুলোমি, কাশকৃৎস্ন, কার্ষ্ণাজিনি এবং আত্রেয় এই আটজন ঋষির মত স্বকীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সকল ঋষিরা উপনিষদের মীমাংসা করিয়া যে উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্ম-মীমাংসা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ কি? এই ব্রহ্মমীমাংসার প্রথম উন্মেষ, বোধ হয়, পূর্ব্বমীমাংসার পরেই হইয়াছিল। পূর্ব্বমীমাংসা practical—পূর্ব্বমীমাংসা যাগযজ্ঞের সহায়তা করে। যখন যাগযজ্ঞ প্রতিপাদক বেদবচনগুলি বিরুদ্ধার্থক বলিয়া বোধ হইল, তখনই পূর্ব্বমীমাংসার প্রথম অঙ্কুর জন্মিল এবং কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসা হইতে না হইতেই লোকের মনে জ্ঞানকাণ্ডের মীমাংসার আকাঙ্ক্ষা সহজে উদিত হইল। উত্তরমীমাংসা এই আকাঙ্ক্ষার ফল। তার পরে ন্যায়, পরে সাংখ্য—পরে বৈশেষিক ও বৌদ্ধ—পরে অদ্বৈত বেদান্ত ও চার্ব্বাক। এই গেল ভারতীয় দর্শনের আবির্ভাব পদ্ধতি। ভারতীয় দর্শন উন্নতির দিকে গিয়া বেদান্তে এবং অবনতির দিকে গিয়া চার্ব্বাকে পরিণত হইল। বস্তুত, হয় বেদান্ত (অদ্বৈত-বাদ) নয় চার্ব্বাক, ইহা ভিন্ন অন্য কোনও মত ঠিক্ যুক্তির উপর দাঁড়াইতে পারে না। বেদান্তের সিঁড়ি সাংখ্য, চার্ব্বাকের সিঁড়ি বৈশেষিক। যাঁহারা বৈশেষিকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ (analysis) এবং মহত্তর সমীকরণের (large generalization) দিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা কিছুতেই ইহাকে খুব প্রাচীন দর্শন বলিতে পারিবেন না। চার্ব্বাক দর্শন এবং অদ্বৈত দর্শনের আবিষ্কারের পর

ভারতবর্ষে আর কোনও নূতন দর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই। মিথিলার নব্যন্যায়কে ভুলিয়া গিয়া একথা বলিতেছি না। নব্যন্যায়ে কোনও নূতন দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা নাই। পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত রক্ষণই উহার প্রধান উদ্দেশ্য। বস্তুত নব্যন্যায় দর্শনই (philosophy) নহে, উহা তর্কশাস্ত্র (Dialectics, science of disputation) শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে বেদান্তদর্শনের একটী ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। উহার সংকলন বহুশ্রমসাধ্য। উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর মধ্যে কেহ ঐ কার্য্যে অগ্রসর হইবেন কি?

আধুনিক বেদান্তদর্শনের মূলগ্রন্থগুলি তিন ভাগে বিভক্ত। (১) উপনিষৎ বা শ্রুতি (২) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সনৎসুজাতীয়, অনুগীতা, বিষ্ণুপুরাণপ্রভৃতি স্মৃতি (৩) ব্রহ্মসূত্র বা ন্যায়। এই শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়, বেদান্তের তিন প্রস্থান। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এই প্রস্থানত্রয়েরই ভাষ্য বা বৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন। তদীয় শ্রুতির টীকার মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং গৌড়াচার্য্য প্রণীত মাণ্ডূক্যকারিকার ভাষ্য সমধিক প্রসিদ্ধ। গৌড়াচার্য্য বা গৌড়পাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের গুরুস্থানীয়। প্রবাদ আছে যে উভয়ে দেখা শুনা হইয়াছিল, এবং গৌড়াচার্য্যের নিকট পরীক্ষাস্বরূপে শঙ্কর শ্রীবিষ্ণু সহস্রনামভাষ্য প্রণয়ন করেন। এই গৌড়াচার্য্যের গ্রন্থ শ্রুতি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শাঙ্করভাষ্য আনন্দাশ্রমে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ ভাষ্য শঙ্করের লেখনী হইতে নিঃসৃত হয় নাই। পণ্ডিত মোক্ষমূলর কিন্তু শ্বেতাশ্বতরভাষ্যকেও শঙ্করাচার্য্যের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য প্রণীত স্মৃতির টীকার মধ্যে উপরিউক্ত সহস্রনামভাষ্য ব্যতীত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং সনৎসুজাতীয়ের টীকা আমাদের পরিচিত। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য বা শারীরক মীমাংসা বেদান্তের ন্যায় প্রস্থানের ব্যাখ্যা।

এতদ্ভিন্ন অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যের বলিয়া প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে উপদেশ-সাহস্রী, দশশ্লোকী, শতশ্লোকী, বিবেকচূড়ামণি, দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্র, অপরোক্ষানুভূতি, হরিস্তুতি, আত্মবোধ প্রভৃতি বেদান্তগ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ। শ্রীমদাচার্য্যের নামে পরিচিত অসংখ্য স্তোত্র (গঙ্গাস্তব, অন্নপূর্ণাস্তব, আনন্দলহরী প্রভৃতি) এবং মোহমুদ্গর, মণিরত্নমালা প্রভৃতি গ্রন্থ আবালবনিতা—পরিচিত। এগুলি সকলই যে ভাষ্যকারের এ কথা আমরা বলিতে পারি না। তবে কোন্‌খানি ভাষ্যকারের, কোন্‌খানি বা অপরের, এ বিষয় এখন পর্য্যন্ত মীমাংসিত হওয়া দূরে থাকুক, আলোচিতও হয় নাই! কথিত আছে যে শ্রীমদাচার্য্য তাঁহার মাতাকে সহজে বেদান্ত বুঝাইবার জন্য উপদেশ সাহস্রীর রচনা করেন। উপদেশ সাহস্রী যে শঙ্করের লিখা, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। কেননা, সুরেশ্বরের নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিতে এবং পঞ্চদশীতে উপদেশসাহস্রীর শ্লোক ভগবান্ ভাষ্যকারের বলিয়া ধৃত হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্যের পর, বার্ত্তিককার শ্রীমৎ সুরেশ্বরাচার্য্য। প্রসিদ্ধ মীমাংসক কর্ম্মী মণ্ডন কিরূপে সুরেশ্বর হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই

জানেন। সুরেশ্বরের বৃহদারণ্যক বার্ত্তিক; তৈত্তিরীয় বার্ত্তিক, দক্ষিণামূর্ত্তি স্তোত্র বার্ত্তিক, পঞ্চীকরণ বার্ত্তিক প্রভৃতি বেদান্তশাস্ত্রের অতি উপাদেয় গ্রন্থ। দুঃখের বিষয়, অধুনা উহাদের পঠনপাঠন একরূপ রহিত হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন তদীয় নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

সুরেশ্বরের পর শ্রীমদাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য পদ্মপাদাচার্য্যের নাম করিতে হয়। ইনি পঞ্চপাদিকার রচয়িতা। পঞ্চপাদিকা ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের প্রথম পাঁচপাদের টীকা। কিন্তু ইহার চতুঃসূত্রী ভিন্ন পাওয়া যায় না। পদ্মপাদ প্রণীত ভাষ্যের বাকি একাদশ পাদের টীকা "বৃত্তি" বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহাও অনেক-দিন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি সংক্ষেপ শারীরকের রচয়িতা। ইনি আপনাকে দেবেশ্বরের (সুরেশ্বর?) শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইনি বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক। ৬৭৯ খৃঃ অঃ প্রথম বিক্রমাদিত্যের (চালুক্য) এবং ৭৪৭ খৃঃ অঃ ২য় বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের শেষ হয়। অতএব সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার গুরু সুরেশ্বর। সুরেশ্বরের গুরু শঙ্কর। কাজেই শঙ্করাচার্য্য ৭৮৮ খৃঃ অঃ জন্মিয়াছিলেন, এ কথা ঠিক্ বলিয়া বোধ হয় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অনেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগকে শঙ্করাচার্য্যের সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন্।

ইহার পর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বাচস্পতির ভামতী। ভামতী, শঙ্করপ্রণীতশারীরক ভাষ্যের টীকা। বাচস্পতিমিশ্র ৮৪২ খৃঃ অঃ জীবিত ছিলেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। গার্বে (Garbe) তদীয় সাংখ্যযোগবিষয়ক জর্ম্মাণগ্রন্থে বাচস্পতিকে, অনুমানে, ১২শ শতাব্দীর প্রথমভাগে স্থান দিয়াছেন। বাচস্পতিমিশ্রের অদ্ভুত পাণ্ডিত্যে মোহিত হইয়া লোকে তাঁহাকে বার্ত্তিককার সুরেশ্বরের অবতার বলিয়া ঠিক্ করিয়াছিল। বাচস্পতি ভামতী ভিন্ন আরও অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, যথা—তত্ত্ববিন্দু, তত্ত্বসমীক্ষা, ন্যায়-কণিকা, ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য টীকা, যোগ-ভাষ্যটীকা, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী।

ভামতীর টীকা বেদান্তকল্পতরু। অমলানন্দ যাদববংশীয় জৈত্রদেবের (জৈত্রপাল) পুত্র কৃষ্ণরাজার সময়ে "কল্পতরু"র রচনা করেন। কৃষ্ণ ১২৪৭—১২৬০ খৃঃ অঃ বিদ্যমান ছিলেন। কল্পতরুর টীকা "বেদান্ত-কল্পতরু পরিমল।" পরিমলের প্রণেতা অপ্পয়দীক্ষিত ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি বহু উপাদেয় গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ, কুবলয়ানন্দ, বিধিরসায়ন, শিবার্কমণি দীপিকা (শ্রীকণ্ঠ ভাষ্য ব্যাখ্যা) প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ। কল্পতরু পরিমলের আভোগ নামে একটী টীকা আছে। এই ভাষ্যের এক লাইন্।

আর এক লাইনে ভাষ্য—পঞ্চপাদিকা—পঞ্চপাদিকা বিবরণ—তত্ত্বদীপন—ভাবপ্রকাশিকা—বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ প্রভৃতি। বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ বিদ্যারণ্য মুনি প্রণীত। বুক্করাজাদের মন্ত্রী মাধবাচার্য্য সন্ন্যাসী হইবার সময় বিদ্যারণ্য এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাধবাচার্য্য ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত

ছিলেন। বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে বিবরণ প্রতিপাদিত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে। উহা বিবরণের সংগ্রহ পুস্তক—সাধারণ টীকা নহে। প্রকাশাত্মযতি কবে বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। অখণ্ডানন্দমুনি কৃত "তত্ত্বদীপন" বিবরণের সাধারণ টীকা। নৃসিংহাশ্রম 'ভাবপ্রকাশিকা' নামে বিবরণের এক টীকা লিখিয়াছেন। উহাতে তত্ত্বদীপনের মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন শারীরক মীমাংসাভাষ্যের আরও অনেক টীকা আছে। তন্মধ্যে আনন্দজ্ঞানকৃত ন্যায়নির্ণয়, গোবিন্দানন্দকৃত রত্নপ্রভা এবং অদ্বৈতানন্দকৃত ব্রহ্মবিদ্যাভরণ নামে তিনটী টীকা ছাপা হইয়াছে। অনেকে শঙ্করের শিষ্য ও জীবনীলেখক অনন্তানন্দগিরি আর ভাষ্যটীকাকার আনন্দজ্ঞান উভয়কে অভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহা ঠিক্ নহে; কেন না, আনন্দজ্ঞান বা আনন্দগিরি স্বপ্রণীত টীকা সমূহে আপনাকে স্পষ্ট ভাষায় শুদ্ধানন্দের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষত মাণ্ডূক্যকারিকার ভাষ্যের টীকায় আনন্দ বলিয়াছেন যে পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতেরা ভাষ্যের অনেক টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। আনন্দগিরি বা আনন্দজ্ঞান দশোপনিষদ্ভাষ্যের, গীতাভাষ্যের এবং ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের টীকা করিয়াছেন। রত্নপ্রভার প্রণেতা গোবিন্দানন্দ। এক গোবিন্দানন্দের শিষ্য নারায়ণ সরস্বতী ১৫৯২ খৃঃ অঃ শারীরক ভাষ্যবার্ত্তিক লিখিয়াছেন।

ইহার পর অসংখ্য প্রকরণ গ্রন্থের উল্লেখ করিতে হয়। অধুনা পঞ্চদশী, বেদান্তসার, বেদান্তপরিভাষা, অদ্বৈতসিদ্ধি, বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী, অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি, বেদান্তসিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থের অধ্যাপনা হইয়া থাকে। ইহাদের পৌর্য্যাপর্য্য এবং কালনির্ণয়াদি এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। এখানে এই মাত্র বলা উচিত যে পঞ্চদশী গ্রন্থখানি দুই হাতের লেখা। ভারতীতীর্থ এবং বিদ্যারণ্য একত্রে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থখানি বেদান্তদর্শনের অতি উপাদেয় পুস্তক। দুঃখের বিষয় এই যে, এই গ্রন্থখানি ছাত্রেরা অতি অল্প বয়সে এবং বেদান্তশাস্ত্রের ভূমিকারূপে সর্ব্বপ্রথমেই পড়িয়া থাকেন। কিন্তু এখানিকে বেদান্তের শেষ গ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার দার্শনিক তত্ত্বগুলি ভালরূপে বুঝিলে, বেদান্তের কোনও তত্ত্বই অজ্ঞাত থাকে না। পঞ্চদশী মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম পাঁচ প্রকরণ বিবেক, দ্বিতীয় পাঁচ প্রকরণ দীপ, এবং তৃতীয় পাঁচ প্রকরণ আনন্দ নামে পরিচিত। ইহার কোন কোন অধ্যায় বিদ্যারণ্য প্রণীত, কোন কোন অধ্যায় ভারতীতীর্থ প্রণীত, আবার কোন কোন অধ্যায় দুইজনে মিলিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন। যেমন তত্ত্ববিবেক, অদ্বৈতানন্দ প্রভৃতি বিদ্যারণ্যের, তৃপ্তিদীপ ভারতীতীর্থের, এবং দ্বৈতবিবেক, যোগানন্দপ্রকরণ প্রভৃতি উভয়ের। এই পঞ্চদশী সর্ব্ববাদিসম্মতে মাধবাচার্য্যের সমসাময়িক। বেদান্তসারে পঞ্চদশী প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে। বেদান্তসারের সুবোধিনী টীকা খৃষ্টীয় ১৫৮৮ অব্দে লিখিত হইয়াছিল। বেদান্তসিদ্ধান্ত মুক্তাবলীপ্রণেতা শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক।

বেদান্তগ্রন্থের উল্লেখ করিতে গিয়া খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, স্বারাজ্যসিদ্ধি, শঙ্কর দিগ্বিজয়, জীবন্মুক্তি বিবেক প্রভৃতির উল্লেখ না করিলে

দোষ হয়। কিন্তু কত বলিব? বেদান্তের গ্রন্থ অসংখ্য—

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
সত্যং ব্রহ্ম জগন্ মিথ্যা জীবোব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

বস্তুতই বেদান্তের গ্রন্থরাশির ইয়ত্তা করা যায় না। এত গ্রন্থ থাকিতে বেদান্তের ইতিহাস কেন লিখিত হইবে না? সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ! তোমরা এ বিষয়ে মনোযোগী হইবে কি?

বেদান্তের ইতিহাসের উপকরণের ফর্দ্দ দিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু শ্রীমদাচার্য্য ভগবৎপাদ যে কোথা হইতে স্বকীয় দর্শনের উপকরণ পাইয়াছিলেন, তাহা বলি নাই। দার্শনিক ভাবে দেখিতে গেলে, বলিতে হয়, যে অদ্বৈতবাদ বিজ্ঞানবাদের উপসংহার। যেরূপ ইয়ুরোপে বিজ্ঞানবাদ হইতে অদ্বৈতবাদের সূচনা—সেইরূপ ভারতেও বিজ্ঞানবাদ হইতে অদ্বৈতবাদের জন্ম। সাঙ্খ্য মোটামুটি বিজ্ঞানবাদের দিকে হেলান। সাঙ্খ্যের শিষ্য বৌদ্ধ। বৌদ্ধের শিষ্য বেদান্ত। এ বিষয়ে দুইটী মাত্র প্রমাণের উল্লেখ করিব। বিজ্ঞানভিক্ষু প্রণীত "বিজ্ঞানামৃত" নামক ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এবং সাঙ্খ্যপ্রবচনভাষ্যে পদ্মপুরাণ হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ।
ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা।

ইহা হইতে প্রতীত হইবে, যে মায়াবাদ-বিজ্ঞানবাদের সন্তান। এই শ্লোকের ঈশ্বরাবতার ব্রাহ্মণ কে? ইনি কি শঙ্করাচার্য্য নহেন? তাহা হইলেই বুঝিলাম যে অস্মদ্দেশীয় কোন কোনও আচার্য্যও শাঙ্করদর্শনকে বৌদ্ধদর্শনের সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিতেন। আবার মাধবীয় সংক্ষেপশঙ্করজয়ে লিখিত আছে যে শ্রীমদাচার্য্য দিগ্বিজয় ব্যপদেশে কাশ্মীর দেশে "শারদা" পীঠে গিয়াছিলেন। তখন যে বিচার হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একটী বেশ ভাবিবার বিষয় আছে।

বিজ্ঞানবাদী ক্ষণিকত্বমেষা মঙ্গীচকারাপি বহুত্বমেষঃ।
বেদান্তবাদী স্থিরসংবিদেকেত্যঙ্গীচকারেতি মহান্ বিশেষঃ। (১৬।৭৬)

এই শ্লোকটী পড়িলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে শাঙ্করদর্শন এবং মাধ্যমিক দর্শনের মধ্যে প্রভেদ খুব কম। বস্তুত, যদি আচার্য্যগণ এই প্রভেদ অতি সূক্ষ্ম এবং স্বল্প বলিয়া মনে না করিতেন, তাহা হইলে কখনই শঙ্করাচার্য্যকে ঐরূপ প্রশ্ন করা হইত না। এইরূপে, আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে এইরূপ সন্দেহ জন্মিতে পারে যে শাঙ্কর দর্শন বৌদ্ধদর্শনের শিষ্য। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে দার্শনিক ভাবে দেখিতে গেলেও তাহাই সম্ভব। এইরূপে কিন্তু এ সন্দেহের মীমাংসা হইল না। মীমাংসার জন্য বৌদ্ধদর্শনে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহাদের নিকট যাইতে হইবে। বৌদ্ধদর্শনবেত্তা মদীয় অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলেন যে শান্তিদেব প্রণীত বোধিচর্য্যাবতার প্রভৃতি গ্রন্থে এরূপ অনেক দার্শনিক মত আছে, যাহা হইতে শাঙ্কর দর্শনে আসিতে এক পাদবিক্ষেপের অধিক দরকার হয় না। অতএব এই তিন রকম প্রমাণের সমবায়ে আমরা বলিতে পারি যে শাঙ্করদর্শন বৌদ্ধদর্শনের সন্তান। আমাদের সকল দর্শনেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৌদ্ধদিগের উল্লেখ

আছে। দর্শনের বর্ত্তমান সূত্রগুলি প্রায়ই বুদ্ধের পরকালীয়। অনেক হিন্দু একথায় কষ্ট পাইবেন। কারণ, তাঁহারা মনে করেন যে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদের নহে। বুদ্ধ, আমাদের, শঙ্করও আমাদের। বস্তুত বৌদ্ধেরা, নেপালী বৌদ্ধদের ভাষায়, বোধ্-মার্গী হিন্দুভিন্ন কিছুই নহে। সংস্কৃত এবং পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ পড়িলেও এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায়। একথা ভুলিয়া গিয়া আমরা অনেক গোলে পড়ি।

শ্রীবনমালী বেদান্ততীর্থ।

মনীষা।

[মিশ্রকাব্য]

তৃতীয় সর্গ।

থামিল নিকুঞ্জ,— এল বার্ত্তাবহা নারী মনীষার—
"আজি অপরাহ্ণে রাজ্ঞী গিরি মূর্ত্তি-তত্ত্ব-পরীক্ষার,
তরে—অশ্ব পৃষ্ঠে যাবেন উত্তরে। আমাদের মনে
যথেষ্ট কৌতুক যদি থাকে—যাইব কি তাঁর সনে,
জানিতে আসিল দূতী। শিক্ষার যথেষ্ট আছে তথা,
নদী ওই গিরি-মূলে নিবেদিছে কত না বারতা
যথা কল বোলে।" কহি' দেখাইল হেলায়ে অঙ্গুলী-
কি কহিছে মহীধর যথা উর্দ্ধ-কূট-বাহু তুলি'
অনন্ত গগনে চাহি' চাহি'।

মোরা হইনু সম্মত ;—
নানা আয়োজনে তারি তূর্ণ দিবা হইলে বিগত,
রাজ্ঞীর আহ্বান-ক্রমে উত্তরিনু স্বর্ণ সিংহদ্বার,
আপন সঙ্গিনী মাঝে জাগাইয়া শির আপনার
মনীষা দাঁড়ায়ে যথা। মণিময় স্তম্ভে করি ভর
পোষা বাঘিনীর পৃষ্ঠে চরণ স্থাপিয়া বামেতর,—
গৃহ মার্জ্জারীর মত পদমূলে বসি যেই স্থির
মাঝে মাঝে চাহিছে নীরবে। অগ্রসরি কাছে ধীর-

প্রতি নয়ন মেলিনু—সহসা সে বংশাগত ঝোঁক
অধিকার কৈল চিত্ত ;—মনে হ'ল মিছে নারী-লোক,—
কুমারী মনীষা যেন চিত্রগত মায়া তুলিকায় ;—
জীবন্ত সে ব্যাঘ্রী যেন মুহূর্ত্তেকে মিলাল মিথ্যায়।
ইন্দ্রজাল মনে হল সেই সৌধ, সেই নারীচয়,
তার মাঝে আমি যেন ভ্রমিতেছি ঘুরি ছায়াময় !
সব আছে—কিছু নাই—এই এক অদ্ভুত খেয়াল
ধরিল আচ্ছন্ন করি, ভুলিলাম যেন দেশকাল।
তবুও বিপুল বেগে হৃদিমাঝে বাজিল ধমনী
কি অব্যক্ত ব্যথা ভরে। মনীষার হেরিয়া চাহনি
চক্ষু ভরি এল নেশা—বক্ষ ভেদি' বাহিরিল শ্বাস,
সহসা আমার জানু নত হ'তে চাহিল সত্রাস।
অবশেষে চড়ি ঘোড়া বাহিরিনু নদীপথ ধরি,
অগ্রে চলিলাম মোরা—নারীদল এল অনুসরি।

মনীষার পার্শ্বে আমি,—কহিলেন আমারে তখন
"সখি ! তব সঙ্গিনীরে বলিনু কি পরুষ বচন
কালি প্রাতে ? অনিচ্ছায় কহেছি সে কথা।" কহিলাম
না না, তা'রে হয়নি পরুষ ;—তবে যাঁর মনস্কাম
জানাইনু ও চরণে তাঁর পক্ষে কিছু রুক্ষ বটে !"
চকিতে বিস্ময়মিশ্র করুণা শোভিল আঁখিপটে,—
"আবার সে কথা ?" চিৎকারি উঠিলা রাজ্ঞী। "ভাল শেষ
করহ বক্তব্য তব—অনুমতি দিনু ; দূর দেশ
হইতে এসেছ ;—কিন্তু কভু আর তুলোনা এ কথা।"

ভগ্ন ভাবে কহিলাম—"জানি জানি তাহার বারতা-
সাধ হয় মনে মোর—ইচ্ছা ছিল নৃপতির মনে—
আপন পুত্রের দেন পরিণয় মনীষার সনে।
কিন্তু কই পূরিল সে আশ ? সারা বিশ্বটি খুঁজিয়া
সে রাজপুত্রের মত মিলিবে না প্রেমময় হিয়া।
তাহারি হৃদয়খানি অভিব্যক্ত আজি আপনার
ও আঁখিদর্পণ মাঝে হইতেছে যেন বার বার।

জ্যোতির্ম্ময়ি! শুন আর এ দক্ষিণাপথে নেহারিয়া
ওই বহ্নি-শিখা—সে পতঙ্গ বুঝি আসিত উড়িয়া—
তব পাছে উন্মত্ত ছুটিতে। রাজ্ঞী যদি রাখেন এ পণ
দারুণ নৈরাশ্যে তবে কুমারের টুটিবে জীবন।"

"আ—রে অভাগ্য যুবা!"—কহিল মনীষা—"দেশে তা'র
গ্রন্থ নাই? ব্যায়াম কি খেলা ধূলা—এ সব ব্যাপার
সে দেশের জানে না কি কেহ? ছি ছি লাজে মরি
তুচ্ছ এক ধারণারে মূঢ়-সম হৃদয়ে আঁকড়ি'
রেখেছে পুরুষ হ'য়ে? একি নারী-প্রকৃতি তাহার?
মোদের বালিকা চিত্তে অমনিই দুর্ব্বলতা-ভার
ছিল এক দিন—কত ছবি অমনিই স্বপ্নময়
আঁকিতাম ভবিষ্যৎ পটে,—বুঝি তাহারো হৃদয়
তেমনি শিশুতা-ভরা খেলিছে কল্পনা-ছবি ল'য়ে।
সে এক অতীত জন্ম গিয়াছে আমার কবে ব'য়ে।—
সে শিশুত্ব-অবসানে লভিয়াছি আদর্শ জীবন,
নর-সম-মহিমায় নারীচিত্ত করিব গঠন
দেবীত্ব উজ্জীবি' তাহে পুনঃ।"

ক্ষণেক নীরবে রহি'
উচ্চ রোলে হাস্য তুলি নবগর্ব্বে উঠিলেন কহি'
"বাক্য-দত্তা? কারো বাক্যে কোনো কালে ফিরি না আমরা।
উশতী! উশতী! তুমি উঠ চিত্তে জাগি' গর্ব্বভরা
মূর্ত্তিমতী যেমতি বসিলে সতি! অটল অন্তরে
সুসেন-ঈশ্বরে উপেক্ষিয়া, যবে মত্স্যসভা'পরে
তাল-কুঞ্জ-গৃহে তোমা লইতে প্রেরে সে শত দূত।"
কহিলাম তবাশ্রিতা "প্রেমলতা ঝটিকা-বিচ্যুত
করি কেন ফেলিছেন রাজ্ঞী? রাজপুত্রে আমি ভাল জানি,—
জানি প্রেম-প্রবণ সে হিয়া। কেনই বা মহারাণী
এ বিপুল আয়োজনে চির-বৃদ্ধ পুরুষ-মহিমা
করিবারে বজ্র-দগ্ধ রোষদৃপ্ত ও হৈম প্রতিমা?
অনুমতি দিয়েছেন নাকি—তাই কহি,—অসম্ভব-
সম মানি সে বিরাট উদ্দেশ্য সাধন। প্রাণ তব

হয় ত অর্দ্ধেক পথে চির নিদ্রামুগ্ধ হয়ে রবে ;
দুর্ব্বল রমণী-হাতে এ আদর্শ নষ্টজ্যোতি হবে,
তার পরে সর্ব্ব পণ্ড,—এত চেষ্টা লুটাবে ধূলায়
ভবিষ্যের বালুচরে চিহ্ন মাত্র রবে নাকো হায় !
সুধাই হে রাজ্ঞী তোমা'—যশে করি' পতিত্বে বরণ,
বহুল সুকার্য্য সম করিলেও সন্তান-অর্জ্জন
নারী জন্ম হবে কি সার্থক ? পাবেন কি রাজ্ঞী তাহে
প্রেম শান্তি, সন্তান সন্ততি—সর্ব্ব নারী যাহা চাহে ?"

ক্রমশ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ।

কাব্যের উপভোগ।

কাব্যের মূলতঃ দুই রকম উপভোগ আছে। এক, জড়িত উপভোগ আর এক প্রবুদ্ধ উপভোগ। জড়িত উপভোগ আমি তাকেই বল্‌ছি, যে উপভোগ কাব্যের ভাবটা ধরবার জন্য উৎসুক নয়, একটা আনন্দ পেলেই হোল। সে আনন্দের উৎপত্তি কোথায়—বা সে কি প্রকারের আনন্দ তাও সে জানে না। সে একরকম নিশ্চেষ্ট, তন্দ্রাবিজড়িত উপভোগ ;—ইংরাজিতে যাকে passive enjoyment বলে। প্রবুদ্ধ উপভোগ হচ্ছে কাব্যের অর্থ বুঝে উপভোগ। সেই কাব্যের ভাব বুঝে, সেটাকে অনুমোদন করে', সেই কাব্যের মধ্যে আপনাকে অনুভব করে'; তার মধ্যে আনন্দের উৎস কোথা তা আবিষ্কার করে', যে উপভোগ,—(যাকে ইংরাজিতে active enjoyment বলা যেতে পারে) তাকেই আমি প্রবুদ্ধ উপভোগ বল্‌ছি। এই দ্বিতীয় রকম উপভোগে সমালোচনার সৃষ্টি।

Shakespeareএর নাটকাবলি যখন প্রথম ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল, শ্রোতৃবর্গ একরকম মোটাধরণের আনন্দ পেয়েছিল। কিন্তু জর্ম্মাণ সমালোচকেরা যখন বুঝিয়ে দিলেন যে Shakespeareএর নাটকাবলী কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত, তখন ইংলণ্ডে একটা প্রবুদ্ধ উপভোগ (intelligent appreciation.) এলো।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ পড়্‌তে অনেকের বেশ ভালো লাগে। পাঠক "ললিতলবঙ্গলতা", কি "বদসি যদি কিঞ্চিদপি" ইত্যাদি পড়েই তার ছন্দোমাধুর্য্যে এত অভিভূত হন, যে তার অর্থ পরিগ্রহ সম্বন্ধে একরকম উদাসীন হয়েন। এই উপভোগ প্রথমোক্ত শ্রেণীর উপভোগ। দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর পাঠক, অর্থাৎ প্রবুদ্ধ পাঠক, তার অর্থ খুঁজ্‌বেন ও তাতে উচ্চ বা মধুর অর্থের অভাব অনুভব করে' হতাশার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌বেন।

গীতগোবিন্দের ত অর্থ সুন্দর না হোক,—অর্থ আছে। যে কবিতার অর্থ নাই সেরূপ কবিতা প্রথমোক্ত শ্রেণীর পাঠককে উপভোগ কর্ত্তে দেখা যায়—কেন না, তাঁরা ত অর্থ খোঁজেন না, কারণ তাতে শ্রম ও শিক্ষা উভয়েরই প্রয়োজন। তাঁরা ধরে'ই নেন, যে কবিতাটির একটা অর্থ আছে—যদি কবিতাটির ছন্দ মধুর হয়। এরূপ পাঠক ইংলণ্ডে আছে কি না জানি না, আমাদের দেশে ত আছে জানি।

আবার ঠিক্ উল্টাও দেখা যায়। সাধারণ পাঠক Shelleyর Epipsychidion যে পরিমাণে উপভোগ করেন, প্রবুদ্ধ পাঠক তাহার শতগুণ উপভোগ করেন। সাধারণ পাঠক Wordsworth এর Ode on Immortality of the Soul হয়ত বুঝ্‌বেনই না। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠক তার ভাবমাধুর্য্যে অভিভূত হয়ে যাবেন। কেউ যেন মনে না করেন, যে আমি মিষ্ট ছন্দোবন্ধের বিরোধী। কবিতার ভাবের উপযোগী ভাষা ও ছন্দও চাই। তবে সেটি কবিতাব রূপ। ভাবই কবিতার প্রাণ।

কবিতার প্রাণ ভাব। সেই ভাব থেকে যে অনুভূতির উদ্রেক হয় তাতেই কবিত্বের পরিচয়। সঙ্গীতের সঙ্গে কবিতার তফাৎ এই, যে সঙ্গীত একেবারে সোজা গিয়ে অনুভূতিকে জাগায়। শ্রোতা অর্থ বোঝে না, কেবল অনুভব করে। স্বরমাধুর্য্যে তার মন গলে যায় বটে, কিন্তু তার অর্থ কি তা কিছু বোঝে না, বুঝ্‌তে চায়ও না, বুঝ্‌তে চাইলেও পারে না। কিন্তু কাব্যের অনুভূতির প্রথম ধাপ ভাব গ্রহণ বা অর্থ গ্রহণ, তার পরে অনুভূতি।

কবিতা কি রকম করে' অনুভূতির উদ্রেক করে তার একটা উদাহরণ লওয়া যাক্।—রবীন্দ্রবাবুর "যেতে নাহি দিব" কবিতাটিই উদাহরণ স্বরূপ নিয়ে আমার ব্যক্তব্যটি বোঝাবার চেষ্টা করব।

এই কবিতাটির মূল অংশ তিন। (১) যাত্রার আয়োজন, (২) বিদায়, (৩) বিদায়ান্তে কবির মনের ভাব।

প্রথম, বিদায়ের আয়োজনটি কি স্বাভাবিক। ভৃত্যগণ বিছানা পত্র বাঁধছে; সজল-নয়না গৃহিণী আবশ্যক অনাবশ্যক অনেক জিনিষ মনে করে', করে' সেই বিছানাপত্রের সঙ্গে যোগ করে দিচ্ছেন; এদিকে "দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি"; দ্বিপ্রহর দিবার নিস্তব্ধ 'রৌদ্রময়ী রাতি'।—বেশ একটি জীবন্ত প্রাকৃতিক ছবি পাওয়া গেল।

কবি এ ছবিটি এমন স্বাভাবিক ভাবে এঁকেছেন, যে বোধ হয় যেন তাঁর বর্ণিত ব্যাপার চক্ষের সম্মুখে দেখ্‌ছি।

তার পরে বিদায়। গৃহিণীর কাছে বিদায়; পরে কন্যার কাছে বিদায়। গৃহিণী সংসারাভিজ্ঞ—জানেন যে তাঁর স্বামীর যেতেই হবে। কি করেন; অঞ্চলে নীরবে অশান্ত অশ্রুজলকে গোপন করে' স্বামীকে বিদায় দিলেন। চারি বৎসরের কন্যাটির ব্যবহার কিন্তু ঠিক বিপরীত। সে সংসারের রীতি নীতি কিছুই বোঝে না; সরলমতি শিশু ধারণাও কর্ত্তে পারে না যে বিশ্ব-নিয়ম এত নিষ্ঠুর হতে পারে। সে বল্লে "যেতে নাহি দিব"।—কি স্বাভাবিক! কি মর্ম্মস্পর্শী!

বঙ্গবধূর এই পতিবিচ্ছেদ আমাদের হিন্দু-পরিবারে একটি অতি করুণ, প্রাত্যহিক

ব্যাপার। প্রাত্যহিক বলে'ই এত করুণ। কিছুকাল পূর্ব্বে পত্নীকে বড় কেহ কর্ম্মস্থানে নিয়ে যেতেন না। পূজার ছুটি পতিপত্নীর সাক্ষাতের একটি প্রধান সময় ছিল। সে সাক্ষাৎই বা কয়দিনের জন্য? সেই দশদিনব্যাপী সাক্ষাতের পর আবার সেই আসন্ন দীর্ঘ বিরহ। প্রাণসমা পত্নী, প্রাণাধিক কন্যাকে আবার একবৎসরের জন্য ছেড়ে যাওয়ার করুণ গভীর ছবি, কবি কি গাঢ় অসহ্য করুণভাবে চিত্রিত করেছেন। পড়্‌তে পড়্‌তে অশ্রু সম্বরণ করা দুঃসাধ্য।

তার পরে বিদায় গ্রহণের পরে গাড়িতে যেতে যেতে কবির চিন্তা। কবি দুইদিকে শস্যক্ষেত্র দেখ্‌ছেন, তরুশ্রেণী দেখ্‌ছেন, শরতের ভরা গঙ্গা দেখ্‌ছেন, আকাশে শুভ্রমেঘ-খণ্ড দেখ্‌ছেন। সে সব চক্ষের সাম্‌নে ভাস্‌ছে মাত্র; তাঁর মস্তিষ্কে, অনুভাবনায় স্থান পাচ্ছেনা। তাঁর কাণে, প্রাণে, মর্ম্মে মর্ম্মে, সেই এক কথা বাজ্‌ছে—"যেতে নাহি দিব।" এখানে কবি প্রকৃতির একখানি পৃষ্ঠা খুলে দেখাচ্ছেন, জীবনের যা একটা tragedy—যে সংসারের নিয়ম মানুষের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, শক্তি,—সব চরণে দলিত করে' চলে যায়, ভ্রূক্ষেপও করে না। বিশ্বময় প্রেমের উপর বিজয়ী মৃত্যুর একটা জাজ্বল্যমান ছবি পাই। কবি নিঙ্‌ড়ে নিঙ্‌ড়ে যেন এই তিক্তরসটা পাঠককে সেবন করিয়ে দিচ্ছেন।

রবীন্দ্রবাবু যদি আর কোন কবিতা না লিখ্‌তেন—কেবল এইটি,—এই "যেতে নাহি দিব" লিখ্‌তেন, তা হলে'ও তাঁর কবি-প্রতিভা বঙ্গভাষায় চিরদিন জাজ্বল্যমান থাক্‌তো। এরূপ তাঁর অনেক কবিতা আছে। তাই দুঃখ হয়, যে তাঁর চেলাগণ এই সব রত্ন ছেড়ে আবর্জ্জনা ঘেঁটে বেড়াচ্ছেন।

মনুষ্য জীবনে অনেক tragedy আছে। যেমন বাপ কি মা ছেলের জন্য এত করে, ছেলে তার দশমাংশও প্রতিদান করে না। পিতা মাতার এই স্নেহদৌর্ব্বল্য একটা tragedy. মা ছেলের জন্য এত চিন্তিত, কিন্তু মৃত্যুর পর একবার ফিরে এসে চেয়েও দেখে না। এ একটা tragedy. আজীবন সেবার প্রতিদানে নির্ব্বাসন বা নির্য্যাতন একটা tragedy. উদ্দেশ্য মহৎ, প্রতাপসিংহের মত প্রাণপণ উদ্যম, তথাপি ঘটনার আবর্ত্তে পড়ে' সে প্রাণপণ উদ্যমও তৃণখণ্ডের মত ডুবে যায়।—এ আর এক tragedy. সভ্যতার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সারল্যের তিরোভাব আর এক tragedy. মানুষের প্রতি মানুষের কৃতঘ্নতা, বিশ্বাসঘাতকতা, নির্দ্দয়তা এ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র tragedy. মানুষের জীবন tragedyতে পূর্ণ। তিনিই কবি যিনি এই eternal tragedy গুলি মধুরভাবে ব্যক্ত কর্ত্তে পারেন।

আমি বলেছি যে অনেক tragedy বিশ্বে আছে। আবার অনেক tragedy আমরা কল্পনা কর্ত্তে পারি। যেমন ধরুন Rossettiর "Blessed Damosel" নামক কবিতাটি। তার tragedy হচ্ছে এই যে মানুষের ইহ জীবনে যে সব মৃত্যু ঘটিত বিচ্ছেদ ঘটে তাতে সে এই বলে' নিজেকে সান্ত্বনা করে, যে পর জীবনে তার সঙ্গে দেখা হবে। উক্ত কবিতাটি সেই আশার বারিপাত্র ভূতলে সজোরে নিক্ষেপ করে' ভেঙ্গে ফেলে দেয়।

তবে জীবনে কি সবই tragedy?—না। এ বিশ্বে comedy আছে, farce আছে। তা

না থাক্‌লে জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠ্‌তো। এত সুখ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে' রয়েছে, যে তার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রতি tragedyর মধ্যেই একটা অসহ্য সুখ আছে। বাপ মা ছেলের প্রতি স্নেহের প্রতিদান পায় না বটে। কিন্তু তথাপি বাপ মায়ের সেই অকুণ্ঠিত ভালোবাসা কি পবিত্র কি আশাপ্রদ! উপকারীর কৃতোপকারের নির্য্যাতন ঘাড় পেতে নেওয়া কি মহিমান্বিত! বালিকার স্নেহ কোমলতা, কৃতজ্ঞের কৃতজ্ঞতা, নিগৃহীতের ক্ষমা martyrএর martyrdom এও ত সব এ পৃথিবীতে আছে। রবীন্দ্রবাবু স্বয়ং এইরূপ একটা সৌন্দর্য্য "পুরাতন ভৃত্য" নামক কবিতায় দেখিয়েছেন। Wordsworthএর Wood-cutter নামক কবিতাটিও এই ধরণের। বিশ্বসৌন্দর্য্য কেবল গোলাপ ফুলে, সন্ধ্যার মেঘে, নারীর বিম্বাধরে নাই। মানুষের হৃদয়ে যে সৌন্দর্য্য আছে, বাহিরে তার সিকির সিকিও নাই। এই সব সৌন্দর্য্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করে' দেখানোই কবির মহত্তর কাজ। এমন কি আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে যিনি tragedyই দেখান, তাঁর চেয়ে যিনি মানুষকে আনন্দ, সান্ত্বনা, আশা দেন, তিনি মহত্তর কবি। Tragedian destructive কবি। কিন্তু শেষোক্ত কবি constructive কবি। প্রথমোক্ত কবি সেই ক্ষতগুলো খুঁচিয়ে দেখান। শেষোক্ত কবি সে ক্ষতগুলো আরাম করেন। একজন pessimist আর একজন optimist. সেই জন্য বোধ হয় সমালোচকেরা বাইরণের চেয়ে Shelleyকে এবং Shelleyর চেয়েও Wordsworthকে উচ্চতর আসন দেন। আর Browningএর spirit যদি আমি ঠিক বুঝে থাকি, ত সে এই, যে তিনি কেবল আতুরকে সান্ত্বনা দিয়েই ক্ষান্ত নন, তিনি নির্য্যাতিতকে ছেড়ে নির্য্যাতনকারীর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যেমন একজনকে কবি ভালোবাসেন তিনি কিন্তু ভালোবাসা পান নাই, এ সময়ে অন্য কবি হয় ত আপনাকে সান্ত্বনা দিবেন যে আমায় ভালোবাসে না, না বাসুক, আমি তাকে ভালোবেসেই সুখী। কিন্তু Browning বল্লেন I have found thee, you have lost me. মৃত্যুর সঙ্গে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামেন; বলেন—"আয় না তোকে একবার মুখোমুখী দেখি।"

Browningএর পাঠক মাত্রই জানেন যে Browning দুর্ব্বোধ্য। তাঁর রসাস্বাদন কর্ব্বার আগে প্রথমত তাতে দাঁত বসানোই শক্ত। এর জন্য তাঁকে ব্যাখ্যা কর্ব্বার জন্য বিলাতে এক সমিতি স্থাপিত হয়েছে; তার নাম Browning Society. তাঁরা Browningকে সিদ্ধ করে একটু নরম করে' দিচ্ছেন। কিন্তু এই আগ্রহেই প্রমাণ হয় যে তাঁর মধ্যে রস আছে। একবার দাঁত বসাতে পার্লে হয়! আমি স্বয়ং ব্রাউনিংবিৎ একটি বন্ধুর কাছে তাঁর কবিতা পড়ে' নিয়ে তাতে যথেষ্ট রস পেয়েছি। কিন্তু Browningএর ভাষা এত কর্কশ, এত বন্ধুর, এত শুষ্ক,—যে দাঁত বসাতেই ইচ্ছা হয় না। তিনি ভাষা-সম্বন্ধে প্রায় উদাসীন। (আজকালকার পাঠকেরা যেন স্মরণ রাখেন, যে দাঁত বসাতে পালে, "বৃহৎ ভাবের" জন্য কোন কবির কোন কবিতার অর্থ গ্রহণ কর্ত্তে অণুমাত্র কষ্ট হয় না!) এইটে বলাই আস্পর্দ্ধা, যে পৃথিবীতে কোন কবির কোন কবিতার ভাব এত বৃহৎ, যে মানুষের ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না, বা

সাধারণে তা বুঝতে পারে না। ভাব সবই প্রায় পুরাতন— পাহাড়ের মত পুরাতন।

আমার "কাব্যের অভিব্যক্তি" নামক প্রবন্ধ পাঠে অনেক ব্যক্তি অনেক রকম অদ্ভুত ওকালতি করেছিলেন। কবি স্বয়ং যে সব কবিতার ভাবগ্রহণ কর্ত্তে অসমর্থ, সে সব কবিতা, দেখ্‌লাম, যে কবির চেলাগণ বেশ বোঝেন। আমি সেই চেলাদিগকে এইখানে বলে' রাখি যে রবীন্দ্রবাবুর কাব্য আমি যেরূপ উপভোগ করি, সেই চেলাগণ তাহার দশমাংশও করেন কিনা সন্দেহ। তবে রবীন্দ্রবাবু যা'ই লেখেন তা'তেই "তাধিন তাকি ধিন তাকি, ধিন তাকি, ধিন তাকি, ম্যাও এঁও এঁও" বলে' কোরাস দিতে পারি না—রবীন্দ্রবাবুর বন্ধুত্বের খাতিরেও নয়।

রবীন্দ্রবাবু তাঁর আত্মজীবনীতে Inspiration দাবী করে' যখন নিজের কবিতাবলি সমালোচনা কর্ত্তে বসেছিলেন, তখন তাঁর দম্ভ ও অহমিকায় আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম। তাঁরই উক্তি বঙ্গদর্শনে প্রায় তাঁরই ভাষায় পুনরুক্ত দেখে বঙ্গসাহিত্যের মঙ্গলহিসাবে তার প্রতিবাদ কর্ত্তে বসেছিলাম; এবং উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রবাবুরই কবিতা নিয়েছিলাম। কারণ আমি দেখেছি, যে রবীন্দ্রবাবুর জনকতক নগণ্য চেলা তাঁর উত্তম কবিতাগুলি অনুকরণে অসমর্থ হয়ে তাঁর অর্থহীন কবিতাগুলির অন্ধ অনুকরণে ভাবহীন ঝঙ্কার কর্চ্ছেন। তাই আমার উক্ত প্রবন্ধটি লেখার প্রয়োজন হয়েছিল। আমি দেখে সুখী হলাম যে সে বিষয়ে সকলেই আমার সঙ্গে একমত। কাব্য যে স্পষ্ট হওয়া উচিত সে বিষয়ে ত তাঁরা আমার সঙ্গে একমতই। আর আমার উল্লিখিত কবিতাটিরও যে কোনরূপ অর্থ হয় না, সে বিষয়েও তাঁরা আমার সঙ্গে একমত। কারণ, যখন পাঁচজন শিক্ষিত ব্যক্তি সেই নগণ্য কবিতাটির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বাহির করে' নিজেদের মধ্যে বিবাদ কর্চ্ছেন—তখন এ সিদ্ধান্ত অমূলক নয় যে কবিতাটির সত্যই কোন অর্থ নাই। তবে তাঁরা পণ্ডিত লোক, নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করেছেন। আমি "কাব্যের অভিব্যক্তি" প্রবন্ধেই সে কথার উল্লেখ করেছি,—যে পণ্ডিতেরা কালিদাসের প্রসারিত অঙ্গুলিদ্বয় হতে দ্বৈতবাদের শাস্ত্র এবং মুষ্টি হতে পঞ্চভূতের সমষ্টির তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। "একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল" আমি "সাহানা"য় গাইতে শুনেছি।

এই দশজন চেলার ব্যাখ্যা পড়ে' রবিবাবু অনায়াসে বল্‌তে পারেন—"O save me from my friends!"

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে প্রবুদ্ধ উপভোগ থেকে সমালোচনার সৃষ্টি। আমাদের দেশে সমালোচনা জিনিষটা বড় একটা নাই। তাই আমার বোধ হয় আমাদের দেশে কাব্যের প্রবুদ্ধ উপভোগও বড় বেশী নাই। শিক্ষিত সমাজে শতাংশের একাংশও কবিতা পড়েন কিনা সন্দেহ। আবার সেই ভগ্নাংশের শতাংশের একাংশ ব্যক্তি কবিতা বুঝে পড়েন কিনা সন্দেহ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য।

বঙ্গদর্শনসম্পাদক মহাশয় দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আমার কি বলিবার আছে জানিবার জন্য তাহা প্রকাশ করিবার আগেই আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

আমার কোনো বিশেষ কবিতা ভাল কি মন্দ, তাহা সুবোধ কি দুর্ব্বোধ, সে সম্বন্ধে যদি বা আমার বলিবার কিছু থাকে তাহা না বলিলেও চলে। ভাল কবিতা না লিখিতে পারাকে ঠিক অপরাধ বলিয়া ধরা যায় না। শক্তির অভাব প্রকাশ হইয়া পড়িলে মানুষের লজ্জা বোধ হয় বটে কিন্তু সেই অভাবকে কেহ কলঙ্ক বলিতে পারেন না। তা ছাড়া শক্তির অভাবে যে ত্রুটি ঘটে তাহার সকলের চেয়ে বড় শাস্তি নিষ্ফলতা—কোনো সাহিত্য বিচারকের কড়া কলমে তাহার চেয়ে বেশি দণ্ড কোনো লেখককে দিতে পারে না। কালের সেই চূড়ান্ত রায় একদিন বাহির হইবেই—ইতিমধ্যে যে ত্রুটি ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে যাহাতে কেবলমাত্র অক্ষমতা প্রকাশ পায় তাহার জন্য কৈফিয়তের চেষ্টা করা অনাবশ্যক।

তবে দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের শেষভাগে তিনি আমার প্রতি যে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন তাহা সামান্য নহে। কারণ সেটা কবিত্ব লইয়া নয়, চরিত্র লইয়া।

আমার "আত্মজীবনী" প্রবন্ধে আমি অলৌকিক শক্তির প্রেরণা দাবী করিয়া দম্ভ প্রকাশ করিয়াছি দ্বিজেন্দ্রবাবুর এইরূপ ধারণা হইয়াছে। এবং সেই কারণে তিনি আমার দর্প হরণ করা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছেন।

আমি যাহা বলিতে চেষ্টা করি, সকল ক্ষেত্রে তাহা যে স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না দ্বিজেন্দ্রবাবু তাহা আমার কাব্য সমালোচনা উপলক্ষ্যে পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। আমার সেই বুদ্ধি ও বাণীর জড়িমা আমার গদ্য প্রবন্ধেও নিশ্চয় প্রকাশ পাইয়া থাকে নহিলে দ্বিজেন্দ্রবাবু আমার আত্মজীবনী পড়িয়া এমন ভুল বুঝিলেন কেন? কারণ আমি মনে জানি, অহঙ্কার প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না।

বহুদিন হইল জর্ম্মন কবিশ্রেষ্ঠ গ্যয়টের কোনো রচনার ইংরেজি তর্জ্জমাতে একটা কথা পড়িয়াছিলাম; যতদূর মনে পড়ে, তাহার ভাবখানা এই যে, বাগানের মধ্যে যে শক্তি গোলাপ হইয়া ফোটে সেই একই শক্তি মানুষের মনে ও বাক্যে কাব্য হইয়া প্রকাশ পায়।

এই বিশ্বশক্তিকে নিজের জীবনের মধ্যে ও রচনার মধ্যে অনুভব করা অহঙ্কার নহে। বরঞ্চ অহঙ্কারের ঠিক উল্টা। কেন না, এই বিশ্বশক্তি কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ সম্পত্তি নহে—তাহা সকলের মধ্যেই কাজ করিতেছে।

তাই যদি হয় তবে এত বড় একটা অত্যন্ত সাধারণ কথাকে বিশেষভাবে বলিতে বসা কেন?

ইহার উত্তর এই যে, অত্যন্ত সাধারণ কথারও যখন জীবনের বিশেষ অবস্থায় বিশেষ উপলব্ধি হয় তখন তাহা আমাদিগকে হঠাৎ একটা আলোকের মত চমৎকৃত করিয়া দেয়। যাহা সাধারণ তাহাকেই বিশেষ করিয়া যখন জানিতে পাই তখন তাহার বিস্ময় বড় বেশি করিয়া আঘাত করে। মৃত্যুর মত অত্যন্ত বিশ্বব্যাপী, নিশ্চিত ও পুরাতন পদার্থেরও বিশেষ পরিচয় আমাদিগকে একটা সদ্যো নূতন আবির্ভাবের মত চমক লাগাইয়া দেয়। এইজন্য বিশেষ অবস্থায় সাধারণ কথাকেও বিশেষ করিয়া বলিবার আকাঙ্ক্ষা মনে উদয় হইয়া থাকে। বস্তুত সাহিত্যের বারো আনা কথাই নিতান্ত জানা কথাকেই নিজের মধ্যে নূতন করিয়া জানিয়া নিজের মত নূতন করিয়া বলা।

সম্প্রতি অধ্যাপক কেয়ার্ডের একটি গ্রন্থে পড়িতেছিলাম :—

"Though man is essentially self-conscious, he always *is* more than he *thinks* or *knows*; and his thinking and knowing are ruled by ideas of which he is at first unaware, but which, nevertheless, affect everything he says or does. Of these ideas we may, therefore, expect to find some indication even in the earliest stage of his development; but we cannot expect that in that stage they will appear in their proper form or be known for what they really are."

যে আইডিয়া সম্বন্ধে আমরা প্রথমে অচেতন ছিলাম তাহাই যে আমাদিগকে বলাইয়াছে ও করাইয়াছে এবং আমাদের অপরিণত অবস্থারও কথা ও কাজকে আমাদের অজ্ঞাতসারে সেই আইডিয়ারই শক্তি প্রবর্ত্তিত করিয়াছে— আমার ক্ষুদ্র আত্মজীবনীতে এই কথাটার উপলব্ধিকে আমি কোনো একরকম করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। কথাটা সত্য কি মিথ্যা সে কথা স্বতন্ত্র কিন্তু ইহা অহঙ্কার নহে, কারণ, ইহা কাহারো একলার সামগ্রী নহে। তবে কিনা যখন নানা কারণে নিজের জীবন বিকাশের মধ্যে এই আইডিয়াকে স্পষ্ট করিয়া প্রত্যক্ষ করা যায় তখন তাহাকে নিতান্ত সাধারণ কথা ও জানা কথা বলিয়া আর উপেক্ষা করিতে পারি না।

কিন্তু অহঙ্কার করিব বলিয়া কোমর বাঁধিয়া বসি নাই তবু অহঙ্কার আপনি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে ইহা কিছুই অসম্ভব নহে। মাতাল নিজেকে অপ্রমত্ত মনে করিলেও তাহার মাৎলামি ধরা পড়িয়া যায়। অহঙ্কার আমার মনেও নাই এত বড় অহঙ্কার ত স্বীকার করিতে পারি না। সেই সকল অহঙ্কার সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়া গেলেই আমার মঙ্গল ইহা নিশ্চয়। সেই দুর্ব্বল প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অহঙ্কার যদি অসঙ্গত ও অন্যায় আকারে অজ্ঞাতসারেও প্রকাশ হইয়া পড়ে তবে দর্পহারীর কাছে মার্জ্জনা দাবী করা যায় না। বিশেষত অজ্ঞানকৃত অহঙ্কারেই মানুষকে যেমন হাস্যভাজন করিয়া তোলে এমন স্বেচ্ছাকৃত স্পর্দ্ধাতে নহে। আমার সেইরূপ বিকৃতি যদি লক্ষিত হইয়া থাকে তবে দ্বিজেন্দ্রবাবু তাহার শাস্তি দিতে কিছুমাত্র আলস্য করেন নাই ইহা নিশ্চিত। তিনি প্রবন্ধে ও

গানে, সভাস্থলে ও মাসিকপত্রে, এবং যে ব্যঙ্গ ইতিপূর্ব্বে কদাচ কোনো ব্যক্তিবিশেষের মর্ম্মভেদ করিবার জন্য নিক্ষিপ্ত হয় নাই সেই ব্যঙ্গে ও ভর্ৎসনায় অশ্রান্তভাবে আমার লাঞ্ছনা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। শাস্তির উদ্দেশ্য সংশোধন করা এবং সংশোধনের উপায় বেদনা দেওয়া। দ্বিজেন্দ্রবাবুর দণ্ড বিধানে সেই বেদনা আমি ভোগ করি নাই এ কথা জোর করিয়া বলিতে গেলে একপক্ষে মিথ্যা গর্ব্ব করা হয় অপর পক্ষে দ্বিজেন্দ্রবাবুকে ক্ষুদ্র ব্যক্তি বলিয়া উপেক্ষা করিবার ভান করা হয়। কিন্তু বেদনার প্রয়োজন আছে। নিন্দা ও অবমাননার উপস্থিত উপলক্ষটা যদি বা অযথাও হয় তবু মানুষের প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারও ত আছে, সেইখানে কুঠার পড়ুক।

এই ত আমার কথা গেল। এখন এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে দুই একটি প্রশ্ন আছে। দ্বিজেন্দ্রবাবু এই রচনায় আমার কোনো একটি কবিতাকে ভাল বলিয়াছেন। কিন্তু সেইখানেই থামেন নাই। পূর্ব্বে তিনি আমার আর একটি কবিতার নিন্দা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কেহ কেহ আমার দ্বেষক মনে করিয়াছেন, প্রবন্ধ শেষে কৈফিয়ৎসহ দ্বিজেন্দ্রবাবু তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এ প্রতিবাদের কি কোনো প্রয়োজন ছিল? সেশন জজ্ আসামীকে ফাঁসি দিয়া তাহার পরে নিজে যে নরহত্যাকারী নহেন তাহারই কি প্রমাণ দিতে চেষ্টা করেন? আমার কোনো একটি লেখা তাঁহার ভাল লাগে নাই এবং আমার অন্য একটা রচনা তাঁহার অন্যায় মনে হইয়াছে সে কথা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া কি তাঁহার কোনো জবাবদিহি থাকিতে পারে?

আমি মাসিকপত্রে দ্বিজেন্দ্রবাবুর অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছি। তাঁহার লেখার সেই সকল "অপ্রবুদ্ধ" উপভোগের বিবরণ পড়িয়া অনেক বিচারক আমাকে দ্বিজেন্দ্রবাবুর অযথা স্তাবক বলিয়া অপবাদ দিয়াছেন। আমি তাহাতে কান দিই নাই। যেমন, যেখানে পীড়ার কারণ সেখানে নিন্দা স্বাভাবিক এবং কর্ত্তব্য তেমনি যেখানে উপভোগ সেখানে স্তব যে আপনি আসে। যেখান হইতে আন্তরিক আনন্দ ভোগ করিয়াছি সেখানে সেই আনন্দটাকেই প্রথমে রাখিয়া এবং তাহাকেই সকলের বড় করিয়া দেখাইতে ইচ্ছা হয়—ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতাকে তাহার পশ্চাতে ফেলিয়া রাখি। তাহার উল্লেখ করা যায় বটে কিন্তু তাহার উপরেই তীব্র আলোক সংহত করিলে বা তাহাকে বিদ্রূপের দ্বারা বিকৃত করিলে নিজের আনন্দ সম্ভোগের প্রতি অবিচার করা হয়—বস্তুত সেরূপ প্রবৃত্তি মানুষের স্বাভাবিক নহে। দ্বিজেন্দ্রবাবু বঙ্গসাহিত্যে যে একটি অপূর্ব্ব রূপ এবং বঙ্গভাষায় যে একটি নূতন প্রাণ আনিয়া দিয়াছেন—তাঁহার কাব্যের মধ্যে যে পৌরুষ এবং তাঁহার হাস্যের অভ্যন্তরে যে তেজ প্রকাশ পাইয়াছে—বিদ্রূপের চাপল্যের মধ্যেও সুগভীর সত্যকে রক্ষা করিয়া তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন তাহার আনন্দ আমি প্রথম হইতেই, যখন তিনি সাহিত্য সমাজে অপরিচিত ছিলেন তখন হইতেই, অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি—তাঁহার কাব্যের কোনো নিন্দাকেই অতিশয়রূপে উৎকট করিয়া তুলিতে ইচ্ছাই হয় নাই—কারণ, তাহাতে সত্যের ব্যভিচার ঘটে। ইহাকে যদি স্তব বলে তবে তাহার জন্য লজ্জিত হইবার কারণ নাই।

কিন্তু স্তাবকতা কাহাকে বলে? যেখানে স্তবটা দোকানদারি। যেখানে স্তবের বিনিময়ে হয় স্তব নয় অন্য কোনো উপকার কেহ প্রত্যাশা করে সেইখানেই সেটা স্তাবকতা—কিন্তু ভাললাগার আনন্দের স্বাভাবিক প্রকাশকে স্তাবকতা বলেনা—এমন কি, আনন্দের আবেগে অত্যুক্তি ঘটিলেও তাহা স্তাবকতা হয় না।

এই আনন্দের অত্যুক্তি ত কোনো চারিত্র-নৈতিক অপরাধ নহে। অপর পক্ষে কোনো কবির গদ্যে বা পদ্যে পীড়াজনক ও অনিষ্টজনক কোনো বিকার যখন আমাদিগকে অতিমাত্র আঘাত করে তখন যতই তীব্রভাব সহিত তাহার প্রতিঘাত করি না কেন তাহাতে ত কেহ দোষ দিতে পারে না। প্রকৃতির চাঞ্চল্যবশত এই নিন্দা প্রকাশেও সকল সময় পরিমাণ রক্ষা হয় না—বিশেষত অন্যমতাবলম্বীর বিরুদ্ধে বলিতে গেলে কথার মধ্যে অনাবশ্যক উত্তেজনাও আসিয়া পড়ে—এমন হইয়াই থাকে। ভাল না লাগিলে ভাল লাগিল না অথবা না বুঝিলে বুঝিলাম না এ কথাটুকু বলিবার জন্য তাঁহাকে যদি কেহ দোষী করে তবে ভাললাগার যোগ্য একটা কোনো কবিতা বাছিয়া লইয়া তাহার প্রশংসার পশ্চাতে কৈফিয়ৎ জুড়িয়া দেওয়া কি দ্বিজেন্দ্রবাবুর মত লোকের পক্ষে শোভন হইয়াছে? এরূপ সাফাই চেষ্টার কি প্রয়োজন ছিল?

বিশেষত এই অংশে তিনি বিচলিত চিত্তের পরিচয় দিয়াছেন। তাহার প্রমাণ, আমার কাব্য সমালোচনা সম্বন্ধে যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার মতের অনৈক্য হইয়াছে তাঁহাদিগকে তিনি আমার "চেলা" বলিয়াছেন। তিনি যে কাব্যকে ভালবাসেন না অন্যে যদি সেই কাব্য হইতে রস পাইয়া থাকেন তবে দ্বিজেন্দ্রবাবু তাহাকে অপ্রবুদ্ধ উপভোগ বলিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন কিন্তু অন্য পক্ষকে যদি স্তাবক বা চেলা বলিতে তিনি কোনো সঙ্কোচ বোধ না করেন তবে তাঁহাকে বিদ্বেষক বলিলে তিনি বিরক্ত হন কেন?

যাঁহাদিগকে তিনি আমার চেলা বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছেন তাঁহারা হয়ত দ্বিজেন্দ্রবাবুর মনের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া এই সকল উত্তেজনা বাক্যে কান না দিতেও পারেন কিন্তু আমার পক্ষে ইহা সহ্য করা কঠিন কারণ দ্বিজেন্দ্রবাবুকে আমি উপেক্ষা করিতে পারিনা। একহাতে তালি বাজে না তেমনি চেলা একপক্ষ হইতেও হয় না। চেলার সঙ্গে গুরুর যোগ আছে। যাহারা গুরুর অনুগত হইয়া পশ্চাতে পশ্চাতে তাঁহার তল্পি লইয়া ফেরে তাহারাই ত চেলা—দূর হইতে যাহারা গুরুকে অল্প বা অত্যন্ত ভক্তিও করে তাহাদিগকে ত চেলা বলা যায় না। দ্বিজেন্দ্রবাবু কেন অকারণে কল্পনা করিতেছেন যে আমি একদল চেলা আমার চারিপাশে তৈরি করিয়া তুলিয়াছি।' যদিচ তাঁহারও অনুরক্ত বন্ধুবর্গের অভাব নাই তথাপি আমি রাগ করিয়াও এরূপ অপবাদ তাঁহাকে পাল্টা ফিরাইয়া দিতে পারি না। আমার যে কবিতা দ্বিজেন্দ্রবাবুর কোনোমতেই ভাল লাগে নাই তাহা যে আর কাহারো ভাল লাগিতে পারে আমার এই অপরাধ তিনি কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছেন না।

রসগ্রাহিতায় সকলে দ্বিজেন্দ্রবাবুর সমকক্ষ নহেন। আনন্দরসভোগের স্বাভাবিক কৃতজ্ঞ-

তায় অনেকে অনেক কবির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠেন, জগতের সর্ব্বত্রই ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মেলে, আমিও নিজেকে এই দলের মধ্যেই গণ্য করিয়া থাকি, ইহাদের সকলের বুদ্ধি ও ক্ষমতার যথেষ্ট ন্যূনতাও থাকিতে পারে কিন্তু ইহারা কাহারো চেলা-নহেন। মতের সহিত না মিলিলেই যদি দ্বিজেন্দ্রবাবু অনুরাগকে অন্ধ অনুরাগ বা চেলা-বৃত্তি বলেন তবে অপর পক্ষে তাঁহার বিরাগকেই বা অন্ধবিরাগ বা নিন্দুকতা না বলিবে কেন? এরূপ সংজ্ঞাপ্রয়োগ কি সুপ্রবুদ্ধতা? কাব্য-রচনার ক্ষমতাতেও ত সকলে দ্বিজেন্দ্রবাবুর সমান নহে—বস্তুত ইহাই ত তাঁহার কবিত্বের গৌরব—সেজন্য কি তিনি অক্ষমদিগকে ক্ষমা করিতে পারেন না? রসবোধের ক্ষমতাতেও দৈবের কৃপণতায় যাঁহারা তাঁহা অপেক্ষা ন্যূন তাঁহাদিগকে গালি দেওয়া কি বিচারকের যোগ্য? আমার বিবেচনায় এরূপ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়ার চেয়ে বঙ্গসাহিত্যে তিনি যদি সুপ্রবুদ্ধ সমালোচনার দৃষ্টান্ত প্রচারে নিযুক্ত হন তবে তিনি যেমন কবি ও রসিকরূপে বঙ্গসাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন তেমনি রসবিচারকরূপেও হয়ত, বাংলা সাহিত্যের যে অভাব লইয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা পূরণ করিয়া যশস্বী হইতে পারিবেন এবং "ভগ্নাংশের শতাংশের একাংশ"কে সম্পূর্ণতা দান করিয়া রসজ্ঞদের দলবৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধি করিয়া তুলিবেন; তখন, যাহারা নগণ্য তাহাদিগকে নগণ্য প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার মত গণ্য ব্যক্তির বজ্রাস্ত্রের অপব্যয় করিতে হইবে না। নগণ্যের দ্বারাই গণ্যের গণ্যতারক্ষা হইয়া থাকে; এবং গণ্যেরা নগণ্যের অবমাননা করেন না। শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা।

দ্বিজেন্দ্রবাবুর কোনো লেখা বা আচরণ সম্বন্ধে এমন কোনো মন্তব্য প্রকাশ যাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধবাদ আছে আমার পক্ষে অপ্রিয়;—আমি এ কাজটাকে যতখানি আমার কর্ত্তব্য বলিয়া নিজেকে ভুলাইতেছি ইহা ঠিক ততটা বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য নিশ্চয়ই নহে;—নিশ্চয়ই আমার ব্যক্তিগত ক্ষোভের অধৈর্য্যও ইহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আছে;—নিজের দুর্ব্বলতায় আঘাত লাগিলে আমাদের যে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি হঠাৎ অত্যন্ত তীব্র ও সজাগ হইয়া উঠে তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু দ্বিজেন্দ্র বাবু এ কথা মনে রাখিবেন এই ক্ষোভের দ্বারাতেও আমি তাঁহার বা তাঁহার বন্ধুদের সম্মানহানি করিতে চাহি নাই—কোনো কারণেই তাঁহার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অস্বীকার করিতে পারিব না। ব্যক্তিগত ক্ষোভ চিরদিন থাকে না—কিন্তু আনন্দ তাহা অপেক্ষা প্রবল ও নিত্য; সেই আনন্দেরই জয় হউক্!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেবোপহারের ক্রমোৎকর্ষ। *

দেবতার উদ্দেশে উপহার প্রদান করিবার রীতি, দেববিশ্বাসী সমস্ত জাতির মধ্যেই, বহু প্রাচীন কাল হইতে, কোন না কোন প্রকারে চলিয়া আসিতেছে। এই উপহার প্রদানের ভাব মানব-হৃদয়ে কখন কিরূপে প্রথমে উদিত ছিল, ও কিরূপে পরিবর্ত্তন ঘটিল,—ইহাই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য; এবং তজ্জন্যই বন্ধুগণ, এই প্রবন্ধ হস্তে আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

আলোচ্য বিষয়ে জগতে সমস্ত জাতির মতামত প্রকাশ করা সামান্য প্রবন্ধের মধ্যে সম্ভব নয়; বিশেষতঃ আপনারা আমাকে যে সংক্ষিপ্ত সময় দিয়াছেন, তাহার মধ্যে আমার মত লোকের নিকট আপনারা সে আশা করিতে পারেন না। আমি যথাবুদ্ধি ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই আলোচনা করিব; তবে, যতটুকু পারি, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের স্থানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেশান্তরেরও আচার-ব্যবহারের উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিব।

দেবোপহারের ভাব ভারতবর্ষে প্রথম কখন, ও কিরূপে আবির্ভূত হইয়াছে?—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন-ইতিবৃত্তের আকরস্বরূপ বেদের নিকট উপস্থিত হইতে হয়। দেখিতে হইবে—আমরা বেদ হইতে তদ্বিষয়ে কি জানিতে পারি।

সেখানে আমরা দেখিতে পাই,—তদানীন্তন লোকেরা প্রথমে প্রকৃতির অলৌকিক শক্তি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, সেই শক্তির নিকটে নিজের শক্তিকে নিতান্ত হীন বিবেচনা করিয়া অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন বহুবিধ দেবতার কল্পনা করিয়াছিলেন। আজ কাল বৈজ্ঞানিক সময়ে আমরা, ভূলোক, মধ্যলোক (মেঘমণ্ডল ও বায়ুর বিচরণস্থান) ও দ্যুলোকে নিত্য-বিহরণশীল অগ্নি-বায়ু, মেঘ-সূর্য্য প্রভৃতির ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সাধারণত কোন অনৈসর্গিকতা দেখিতে পাই না। কিন্তু যখন বিজ্ঞানের এতাদৃশ উন্নতি হয় নাই, সেই সময়ে ঐ সমস্ত বিষয়ে যাঁহারা প্রথম চিন্তা আরম্ভ করিয়াছিলেন, যাঁহারা প্রকৃতির নিত্য নিত্য নূতন নূতন বৈচিত্র্যময় কার্য্যকলাপ দেখিতেছিলেন, তাঁহাদের মনে ঐ সময়ে কি ভাবের উদয় হইতে পারে, সকলেই একবার ভাবিয়া দেখিতে পারেন। এস্থানে তৎসম্বন্ধে অধিক কিছু না বলিয়া ভাবুক লেখক মোক্ষমূলরের কথায় বলিতে পারা যায়:—

"When we see our fire burning, and hear it crackling in the great, nothing seems to us more homely, more natural, Every child feels attracted by the fire, enjoys its genial warmth, and wonders what

* বোলপুর শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যাপকসমিতিতে পঠিত।

kind of thing it is. But try to think, once more, what the first appearance of the fire must have been when it came down from the sky as lightning, killing a man, and setting his hut ablaze,—surely there was a miracle, if there was a miracle......There was nothing to compare it to in the whole experience of man, and if it was called a wild beast *, or a bird of prey, or a poisonous serpent, these were all but poor similies, which could hardly satisfy an observing and enquiring mind"—Physical Religion. p. 304.

এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা না বলিয়া থাকা যায় না—

"And when certain families had found out how to elicit fire from flints, or how to produce it by friction the mystery remained as great as ever.......Thus there remained in the fire from the first, even after it had been named, something unknown, something different, from all the ordinary and finite perceptions, something not natural, something unnatural, or, as it was also called, supernatural.

If we once see this clearly and understand how the supernatural element was there from the beginning,...we shall be better able to understand how the same supernatural element was never completely lost sight of the poets of the Veda, and how in the end Agni, fire, after being stripped of all that was purely phenomenal, natural, and physical, stands before us. endowed with all those qualities which we reserve for the Supreme Being."... Ibid, pp 304-5.

ইন্দ্র বেদের মধ্যে অন্যতম প্রধান দেবতা। (নৈরুক্তগণের মতে ইন্দ্র ও বায়ু দেবতা একই।) দেখা যায়, তদানীন্তন লোকেরা ইন্দ্রের বজ্রনিক্ষেপরূপ ভীষণ কর্ম্ম দেখিয়াই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা করিয়াছিলেন,—ইন্দ্র নামে কোন দেব আছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। উক্ত হইয়াছে—

"ইন্দ্র যখন হননসাধন বজ্র আঘাত করেন, তখন সকলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা করে।" ঋগ্বেদ ১-৫৫-৫।

আর এক স্থানে দেখা যায়—একজন ইন্দ্রের অস্তিত্বই স্বীকার করিতেছেন না—

"সংগ্রাম (জয়) ইচ্ছা করিয়া তোমরা ইন্দ্রের স্তুতি কর,—সত্য স্তুতি কর, যদি ইন্দ্র সত্য থাকে। কেহ (অথবা ভার্গব নেমর্ষি) বলেন—ইন্দ্র নামে কেহ নাই, কে তাহাকে

* Herodotus, iii. 16, says that the Egyptians took fire to be a live beast, devouring every thing, and dying with what it had eaten. See also *Satap. Brahman* II. 3, 3, 1.

দেখিয়াছে, কাহাকে আমরা স্তব করিব।" ৮-১০০-৩।

এই ইন্দ্রেরই প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করিবার জন্য অন্য ব্যক্তি ইন্দ্রের বীর্য্যের কথাই তুলিয়াছেন—

"লোকেরা যে ভীষণকে এই বলিয়া জিজ্ঞাসা করে—'সেই ইন্দ্র কোথায়?, ইন্দ্র নাই!' সেই ইন্দ্র উদ্বেগকারী হইয়া শত্রুগণের পুষ্টিপ্রদ ধনসমূহ অপহরণ করে। অতএব ইন্দ্রের প্রতি বিশ্বাস কর।" ২-১২-৫।

"ইন্দ্রের এই অদ্ভুত বীর্য্য অবলোকন কর, এবং তাঁহার-বীর্য্যে শ্রদ্ধা কর।" ১-১০৩-৫।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে মানবহৃদয়ে অলৌকিক অমিতশক্তিসম্পন্ন দেববুদ্ধি দৃঢ়ীভূত হইতে আরম্ভ করিলে, এবং ঐ দেবসমীপে স্ব স্ব শক্তির নিতান্ত অকিঞ্চিৎকরত্ব অনুভূত হইতে থাকিলে, তাঁহাদের মধ্যে এরূপ বুদ্ধিও উদিত হইয়া থাকিবে যে, ঐ দেবগণের প্রতিই তাঁহাদের জীবন-মরণ, সুখ-দুঃখ সমস্ত নির্ভর করিতেছে। মেঘ-জল, বায়ু-বৃষ্টি, অগ্নি-সূর্য্য—এই সকলের দ্বারাই জীবনযাত্রা রক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব যাহাতে প্রয়োজনানুসারে ঐ সকলের উপকার পাওয়া যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে ঐ সকল পদার্থে দেবত্ববুদ্ধিসম্পন্ন লোকগণের উপায়ান্বেষণ অত্যন্ত নৈসর্গিক।

কল্পনা দৃষ্টানুসারিণী; যাহা সচরাচর দেখা যায়, তদনুসারেই কল্পনা হইয়া থাকে; অন্যথা তাহাকে উন্মত্ত-প্রলাপ ভিন্ন কিছু বলা যায় না। কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই অগ্নিকে জল বলিয়া কল্পনা করিতে পারেন না।

নিকৃষ্ট মনুষ্যগণ যখন উৎকৃষ্ট দেবগণের নিকটে উপকারপ্রার্থী হইলেন, তাঁহাদের সন্তোষ উৎপাদনের জন্য সচেষ্ট হইলেন, তখন তাঁহারা তজ্জন্য লোকদৃষ্ট উপায়ই অবলম্বন করেন। উৎকৃষ্টের করুণা ভিক্ষা করিতে হইলে, তাহার সন্তোষ উৎপাদন করিতে হইলে নিকৃষ্টকে স্তুতি করিতে হয়, ও যথাশক্তি প্রীতিপ্রদ বস্তু সমর্পণ করিতে হয়। ইহা আসৃষ্টিকালের প্রথা। বিরুদ্ধাচরণের দ্বারা অনুগ্রহলাভেচ্ছা বাতুলের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে।

যেমন আজকালিও কোন রাজা বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অনুকূল দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য স্তুতি, বা উপহার প্রদান করা হইয়া থাকে, সেইরূপ ঋগ্বেদের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তদানীন্তন লোকসমূহের এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, দেবগণের স্তুতি না করিলে, বা কোন উপহার প্রদান না করিলে, তাঁহাদের আনুকূল্য লাভ করিতে পারা যায় না। ঋগ্বেদের বহু মন্ত্র দেবগণের স্তুতি, ও সোমাদি-উপহারদানের কথায় পরিপূর্ণ। নিদর্শনস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত হইতেছে :—

"সেই অগ্নি পরিচর্য্যাকারী তোমাকে অন্নধন প্রদান করিবেন, ও তোমার শরীর রক্ষা করিবেন।" ১০-৪৬-১।

"হে বহুধনাধিপতি ইন্দ্র, আমরা ধনকাম হইয়া তোমার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিতেছি। হে শূর, আমরা জানি, তুমি বহুধনের অধিপতি। আমাদিগকে আমাদের অভীষ্ট বর্ষণ কর, বিবিধ ধন প্রদান কর।" ১০-৪৭-১।

"আমার যে সকল স্তোত্র হৃদয়স্পর্শী, যাহাদিগকে আমি মনের সহিত উচ্চারণ করিয়া থাকি, আমার সেই সকল স্তোত্র দূতের ন্যায় আমার প্রতি ইন্দ্রের অনুকূল বুদ্ধি প্রার্থনা

করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেছে।” ১০-৪৭-৭।

ইন্দ্র স্বয়ং বলিতেছেন—

“আমি ধনের অসাধারণ স্বামী, আমি চিরকাল (শত্রুর) ধন জয় করিয়া লই। প্রাণিগণ পিতার ন্যায় আমাকে আহ্বান করে। আমি দাতাকে (অর্থাৎ সোমদাতা যজমানকে) ভোগ প্রদান করি।” ১০-৪৮-১।

“যখন যজমানেরা সোম ও স্তোত্র দ্বারা আমাকে তৃপ্ত করে, তখন আমি যজমানের জন্য (শত্রুগণের) প্রচুর গো-অশ্ব-যুক্ত, সুবর্ণালঙ্কৃত ক্ষীরশালী পশুসংঘকে জয় করি, ও সহস্র সহস্র শস্যকে সংস্কৃত করি।” ঐ ৪।

“আমি ইন্দ্র, আমার ধন কখন পরাভূত হয় না, মৃত্যুর নিকটে আমি অবনত হই না। হে পুরুগণ, তোমরা সোমাভিষব করিয়া আমার নিকট ধন প্রার্থনা কর। আমার সহিত যে সখ্য আছে, তাহা বিনাশ করিও না।” ঐ ৬।

“দুইজনের মধ্যে একজনের নিকট সোম দেখা গেল। রক্ষক ইন্দ্র বজ্রধারণ করিয়া তাহাকে প্রকাশিত (অর্থাৎ প্রসিদ্ধ) করিলেন। আর তাহার সেই দ্রোহকারী তীক্ষ্ণায়ুধ বাণবর্ষণকারী তাহার সহিত যুদ্ধেচ্ছু হইয়া অন্ধকার মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিল!” ঐ ১০।

“যে আমার স্তুতি করে, আমি তাহাকে মুখ্য ধন প্রদান করি। স্তুতির নিমিত্ত ধন প্রদান করিয়া আমি নিজেকেই বর্দ্ধিত করি। যে আমার উদ্দেশে যাগ করে, আমি তাহার প্রতি ধন প্রেরণ করি; আর যে যাগ করে না, তাহাকে সমস্ত সংগ্রামে অভিভব করি।” ১০-৪৯-১।

“হে স্তুতিকারিন্, বিশ্বনায়ক ইন্দ্র তোমার প্রভূত অন্ন (সোম) দেখিয়া আনন্দিত হইতেছেন। সেই ভূতভাবন ইন্দ্রের স্তুতি কর…।” ১০-৫০-১।

“হে মেধাবিন্ ইন্দ্র, প্রভূত ধন ও নিবাসস্থানরূপ ধন-প্রদানের জন্য যে-স্তোতৃগণ সমবেত হইয়া ও সোমাভিষব করিয়া তোমার পরিচর্য্যা করে, এবং যখন অভিষুত সোমরূপ অন্নজনিত কোলাহল উপস্থিত হয়, তখন যেন তাহারা তোমার স্তোত্ররূপ পথের দ্বারা সুখ লাভে সমর্থ হয়।” ১০-৫০-৭।

এই উদাহৃত মন্ত্রগুলি আলোচনা করিলে স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে যে, বৈদিককালে দেবতার অনুগ্রহলাভের জন্য স্তুতি, ও সোমাদি উপহার দান—এই উভয়ই প্রচলিত ছিল। দেবতাকে স্তুতি না করিলে, বা উপহার প্রদান না করিলে কেবল যে তাঁহার অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হওয়া যায়, তাহা নহে, তজ্জন্য কষ্টও পাইতে হইত।—এ ধারণাও বৈদিক সময়ে ছিল, এবং ঐ মন্ত্র সমূহের মধ্যেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের ন্যায় অন্যান্য দেশেও অতি প্রাচীনকালে দেবতাকে উপহার প্রদান করিবার রীতি প্রচলিত ছিল; উপহার প্রদান না করিলে কেবল স্তুতি দ্বারা দেবারাধনা সম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইত না। গ্রীসীয়, রোমীয়, মিশরীয় ও আরবীয় প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীন জাতিরাই কোন না কোন প্রকারে উপহার প্রদান করিতেন। লাটিন ভাষায় Sacrificium শব্দ (যাহা হইতে ইংরাজী Sacrifice হইয়াছে)। রোমীয়গণের দেবোপহার-দান-প্রথার সূচনা করিয়া দিতেছে। Sacrificium

শব্দের অর্থ দেবোদ্দেশে কোন বস্তু প্রদান করা। হিব্রু বা য়িহুদীগণের ইহা একটি মৌলিক নিয়ম ছিল দেখিতে পাওয়া যায় যে, শূন্য হস্তে কেহই "জেহোবা"র (Jehovah) নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে না। * খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-মন্দির সমূহে আজকাল কোন উপহার-সম্বন্ধ দেখা না গেলেও অতি পূর্ব্ব অবস্থায় ঐ রীতি বিশেষরূপেই ছিল।

যাঁহাদের হৃদয়ে দেবতাবুদ্ধির উদ্রেক হইয়াছিল, তাঁহারা দেবতাকে মনুষ্যাকারেই ভাবিয়াছিলেন। অতএব নিজেদের যেমন অভাবপ্রয়োজন বোধ হইত, দেবতার উপরেও সেই সমস্ত ধর্ম্ম আরোপ করিয়াছিলেন। যাহা তাঁহাদিগকে ভাল, বা মন্দ লাগিত, ভাবিতেন, দেবতার পক্ষেও তাহা ঐরূপ ভাল, বা মন্দ হইবে। তাঁহারা যেরূপ ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভব করিতেন, যেরূপ আহার গ্রহণ করিতেন, দেবতার সম্বন্ধেও তাঁহারা সেইরূপ ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুমান করিয়া ঐরূপ আহারই প্রদান করিতেন। এই জন্য ভারতবর্ষের ন্যায় অন্যান্য দেশেও উপহারসামগ্রীর মধ্যে ফল-শস্য, দধি-দুগ্ধ, ঘৃত-মধু ও মদ্য-মাংস দেখা যায়।

আমিষ ও নিরামিষ এই দ্বিবিধ উপহারের মধ্যে প্রথমে কোন্‌টি প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা বলা শক্ত। উভয়বিধ উপহারই যুগপৎ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিবে বলিয়া মনে হয়। বৈদিক গ্রন্থে ব্রীহি-যবাদির ন্যায় জীব-উপহারেরও ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যান্য দেশেও ফলাদি উপহারের সহিত জীববলিদানের কথা শুনা যায়।

আজকাল শুনিয়া রোমহর্ষ উপস্থিত হইবে, জীব-বলির মধ্যে অন্যান্য পশুর ন্যায় পুরাকালে অধিকাংশ জাতির মধ্যেই মনুষ্য বধ করা হইত। ফিনিশিয়ান্‌গণ (Phœnicians) তাহাদের রক্তপিপাসু দেবতা Ba'al ও M'olachএর রক্তপিপাসা নিবারণ করিবার জন্য নিয়তই নরবলি প্রদান করিত। কার্থেজিনিয়ানেরাও (Carthaginians) ঐ দেবতার উদ্দেশে ঐ আচারে অভ্যস্ত ছিল। Druidগণ Great Britain ও Scandinaviaয় একসঙ্গে বহু মনুষ্যকে কঞ্চি-নির্ম্মিত বাক্সে দগ্ধ করিয়া তাহাদের দেবতার তৃপ্তিসাধন করিত। Scythian-গণ যুগপৎ শত শত মনুষ্য বধ করিয়া তাহাদের ভক্তির পরীক্ষা করিয়াছিল। Athenianগণের মধ্যে এইরূপ আচার ছিল যে, প্রতি বৎসরে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোককে সমগ্র জাতির পাপক্ষয়-উদ্দেশে বলি প্রদান করা হইত। প্রবন্ধের কলেবর-বৃদ্ধি ভয়ে এতাদৃশ ঘটনাবলীর এখানে উল্লেখ আর করিতে পারিতেছি না। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের On Human Sacrifice in Ancient India নামক প্রবন্ধে (Indo-Aryans, Vol ii pp 49-133) এইরূপ ঘটনা অনেক সংগৃহীত আছে। অনুসন্ধিৎসুগণ তাহা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।

ভারতবর্ষেও ঐ রীতির ব্যভিচার দেখা যায় না। বৈদিককাল হইতে তাহার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।৩) হরিশ্চন্দ্র-আখ্যায়িকায় শুনঃশেপ যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া মরণভয়ে ব্যাকুলহৃদয়ে মুক্তিলাভের জন্য দেবগণের নিকটে কয়েকটী মন্ত্রে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাহার মধ্যে অত্যন্ত

* "...and none shall appear before me empty"—Exodus. xxiii, 15.

চিত্তাকর্ষক বলিয়া দুইটি মন্ত্রের অনুবাদ এখানে প্রদান করিতেছি :—

"অমৃতগণের (দেবগণের) মধ্যে কোন্ জাতীয় কোন্ দেবতার মনোরম নাম উচ্চারণ করিব। কে আমাকে পৃথিবীতে রাখিবেন? * যাহাতে আমি পিতামাতাকে দেখিতে পাই!"

"দেবগণের মধ্যে প্রথম যে অগ্নি, তাঁহার মনোরম নাম আমি উচ্চারণ করি। তিনি আমাকে পৃথিবীতে রাখিবেন, যাহাতে আমি পিতা-মাতাকে দেখিতে পাইব!"

এই সকল মন্ত্র ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে (২৪ সূঃ) আছে। শুনঃশেপকে বধ করিবার জন্য যে যূপকাষ্ঠে তিন স্থানে তাঁহাকে বন্ধন করা হইয়াছিল, ঋগ্বেদের তত্রত্য অন্যতম মন্ত্র তাহাও স্পষ্টরূপে বলিয়া দিতেছে—

"শুনঃশেপো হ্যহ্বদ্গৃভীত
স্ত্রিষ্বাদিত্যং দ্রুপদেষু বদ্ধঃ।
অবৈনং রাজা বরুণঃ সসৃজ্যাদ্
বিদ্বাঁ অদব্ধো বিমুমোক্তু পাশান্।" ১-২৪ ১৩।

বধের জন্য গৃহীত শুনঃশেপ যূপে স্থানত্রয়ে (উপরে নীচে ও মধ্যে) বদ্ধ হইয়া আদিত্য বরুণকে আহ্বান করিয়াছে অতএব রাজা বরুণ,—যাঁহাকে কেহ হিংসা করে নাই, তিনি ইহাকে বন্ধনপাশ হইতে অবসৃষ্ট করুন, মুক্ত করুন।

এই সূক্তটি পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার সর্ব্বাংশে সামঞ্জস্য বোধ হইবে। এবং ইহার জন্যই বলিতে হয় ঋগ্বেদের সময় পুরুষ-পশু বধ ছিল। Rosen ও Wilson প্রভৃতি ঋগ্বেদের এই শুনঃশেপ বৃত্তান্তকে একবারে Metaphorical ধরিয়া ঋগ্বেদের সময়ে পুরুষ বলি প্রচলিত ছিল না বলিতে চান। তাঁহাদের এই উক্তি সত্য সত্যই সেইরূপ হইলে আমাদের অত্যন্ত গৌরবের বিষয় হইত। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে, ইচ্ছা না থাকিলেও, আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত মতই গ্রহণ করিতে হয়। এ সম্বন্ধে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কথাগুলি যুক্তিযুক্ত। † বাহুল্যভয়ে এ আলোচনা হইতে এখন আমাদিগকে নিবৃত্ত হইতে হইতেছে।

যজুর্ব্বেদসংহিতায় পুরুষ-পশু বধের অতিদীর্ঘ বিধান দৃষ্ট হয়। শুক্ল যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ি-সংহিতায় ত্রিংশ (৩০) অধ্যায়টি সমগ্রভাবে কেবল পুরুষমেধসম্বন্ধীয় কথায় পরিপূর্ণ। ১৮৪ জন দেবতার উদ্দেশে ১৮৪ প্রকার নর-পশুর এস্থানে উল্লেখ দেখিয়া স্তব্ধ হইতে হয়। এই পুরুষপশুর মধ্যে কোন জাতীয় লোকই বাদ পড়েন নি। "ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণং, ক্ষত্রায় রাজন্যং, মরুদ্ভ্যো বৈশ্যং, তপসে শূদ্রম্…" এই প্রকার আরম্ভ করিয়া সূত, মাগধ, নট, রথকার, সূত্রধার, কর্ম্মার (লোহকার), মণিকার, ইষুকার, ধনুষ্কার, জ্যাকার, রজ্জুকার, মৃগয়ু (ব্যাধ), কক্কুর নেতা, পৌঞ্জিষ্ঠ (পুক্কস), নিষাদ পুত্র, কুলালপুত্র, হস্তিপাল, গোপাল, মেষপাল, অজপাল, অশ্বপাল, সুরাকার, গৃহপ (গেহপালক), কাষ্ঠাহার ইত্যাদি।

* 'কে আমাকে পৃথিবীকে দিবে'—অর্থরাথ।
† See Indo-Aryan. Vol. II. p. 72.

স্ত্রীলোকেরাও নিস্তার পাইত না; পুরুষের ন্যায় তাহাদিগকেও বধ করা হইত। সেখানে এই সকল স্ত্রীলোকের নাম করা হইয়াছে—বস্ত্রপ্রক্ষালনকারিণী,রজয়িত্রী, (বস্ত্রের রঙ্গকারিণী), অঞ্জনকারিণী, কোষকারিণী (যে খড়্গাদির আবরণ করে), বন্ধ্যা, যমজপ্রসবিনী, নিরপত্যা, অপ্রসূতা, কুলটা, জর্জ্জরদেহা, পলিতকেশা, কামোদ্দীপিকা('স্মরকারী'), বংশপাত্রকারিণী ('বিদলকারিণী'),—ইত্যাদি।

আবার এই সকল লোককেও যজ্ঞে বধ্যরূপে সেখানে বলা হইয়াছে—ভয়ঙ্কর, চীৎকারকারী ("রেভ'), বাচাট, দুর্ম্মদ, ব্রাত্য (সাবিত্রীপতিত), উন্মত্ত, বিকল ('অপ্রতিপদ'), দ্যূতকার, জার, উপপতি, কুব্জ, বামন, জলক্লিন্ন নেত্র ('স্রাম'), অন্ধ, বধির, খল ইত্যাদি।

সদোষের ন্যায় সগুণকেও বধ করা হইত, তবে ইহা খুব অল্প দেখা যায়। ঐ স্থানেই লিখিত হইয়াছে :—"প্রিয়ায় প্রিয়বাদিনম্।"*

বাজসনেয়ি-সংহিতায় ঐ সকল বধ্য উল্লেখ করিয়া লিখিত হইয়াছে—

"অথৈতানষ্টৌ বিরূপানালভতে—অতিদীর্ঘঞ্চাতিহ্রস্বঞ্চ, অতিস্থূলঞ্চাতিকৃশঞ্চ, অতিশুক্লঞ্চাতিকৃষ্ণঞ্চ, অতিকুল্বঞ্চাতিলোমশঞ্চ।" ৩০-২২-১।

এই সকল বিরূপ লোককে বধ করা হয়—অতিদীর্ঘ—অতিহ্রস্ব, অতি স্থূল—অতিকৃশ, অতিশুক্ল—অতিকৃষ্ণ, অতিলোমহীন ও অতিলোমশ।

ইহা আলোচনা করিলে মনে হয় সাধারণত বিরূপ লোকই বধ্যমধ্যে গণিত হইত।

বাজসনেয়ি-সংহিতায় যেরূপ অতিদীর্ঘ বধ্য তালিকা পাওয়া যায়, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও ঠিক ঐরূপ তালিকা আছে।† তৈত্তিরীয় সংহিতার মধ্যেও এই পুরুষবধের ভূরি প্রমাণ আছে। ইহার কিছু কিছু কিঞ্চিৎ পরেই প্রকাশিত হইবে। ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে পুরুষপশু সম্বন্ধে বিস্তর কথা আছে। ঐতরেয়ের হরিশ্চন্দ্র-শুনঃশেপ আখ্যায়িকা পুরুষবধের সুস্পষ্ট পরিচায়ক; শতপথ ব্রাহ্মণে "পুরুষমেধ" যজ্ঞের বিধানই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।‡ শ্রৌতসূত্রসমূহে এই পুরুষমেধের ক্রম-পরিপাটী আরও বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে।§ তাহার পর পরবর্ত্তি-সাহিত্যে কালিকাপুরাণে (৫৬শ অধ্যায়) পর্য্যন্ত নরবধের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এমন কি আজকালও ভারতে সময়ে সময়ে বর্ব্বরগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত পুরুষ-বলির সংবাদ আমাদের নিকট আসিয়া পৌছে।

এখন কথা হইতেছে—দেবতাকে পুরুষবলি দিবার ভাব মানবহৃদয়ে কিরূপে সমুদিত হইল এবং কিরূপেই বা তাহা তিরোহিত হইল!

ক্রমশ

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

* বাজসনেয়ি-সংহিতা সময়ের অনেক সামাজিক সংবাদ এই স্থানের শব্দসমূহে নিহিত আছে। এখানে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক।

† স্থানে স্থানে দেবতা ও বধ্যের নামে কিঞ্চিৎ ভেদ থাকিলেও তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে।

‡ পুরুষো হ নারায়ণোঽকাময়ত......স এতং পুরুষমেধং পঞ্চরাত্রং যজ্ঞক্রতুমপশ্যৎ......ইত্যাদি (১৩-৬) দ্রষ্টব্য।

§ "প্রজাপতিরশ্বমেধেনেষ্ট্বা পুরুষমেধমপশ্যৎ ॥১। তস্য অশ্বমেধবদেবোপাসীৎ. তৎসর্ব্বং পুরুষমেধে-নাপ্নোৎ ॥২৫...ইত্যাদি শাখায়ন শ্রৌতসূত্র। ১৬-১০-১২; কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ২১ অধ্যায়।

রাজতপস্বিনী।

[জীবনী-প্রসঙ্গ]

২১

এই জীবনীপ্রসঙ্গ মধ্যে মাঝে মাঝে এ ক্ষুদ্র লেখককে তাহার নিজের কথা বলিতে হইতেছে। কিন্তু নিতান্ত যাহা না বলিলে মহারাণী মাতার চরিত্র-চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহারই উল্লেখ করিয়া যাইতেছি। পুটিয়ার রাজধানীর সঙ্গে আমার প্রাথমিক জীবন অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংশ্লিষ্ট—সে অকিঞ্চিৎকর জীবনের যেটুকু গৌরবকাল তাহা সেই প্রাতঃস্মরণীয়া মাতৃদেবীর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার মহান্ আলেখ্য অঙ্কনের অবসরেই আত্ম কথা অনিবার্য্য হইয়াছে, ইহা সহৃদয় পাঠকপাঠিকাকে মনে রাখিতে হইবে।

তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গের মুখ্য কারণ যে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য এবং অনিয়ম তাহাতে কোন সংশয় নাই। কিন্তু মানসিক ক্লেশ ইদানীন্তন তাহাতে সংযুক্ত হওয়ায় পীড়ার আক্রমণ ও গতি উত্তরোত্তর দ্রুততর হইয়া উঠিতেছিল। নিজের একটা প্রধান কর্ত্তব্যকাজ ভাবিয়া আমি অন্ততঃ মোটামুটি অনিয়মগুলার প্রতিবিধান চেষ্টা করিতাম। কিন্তু অনেক সময় সেটা অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করার প্রয়াস তুল্য বিফল হইত। যাহা হউক পুটিয়ায় যতদিন ছিলাম, আমার সামান্য শক্তিতে সেই কর্ত্তব্যপালনে কোন ত্রুটি হইত না। তাঁহার এই অযোগ্য সন্তানের ক্ষুদ্র জীবনে সেইটুকু মাত্র সান্ত্বনা।

ইদানীন্তন মহারাণী-মাতা অনেক সময় পিত্রালয়ে থাকিতেন। এক দিন তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখি মা নীচে রান্না-বাড়ীতে আছেন, আমায় দূর হইতে দেখিয়া ভগ্নীসহ উঠিয়া আসিলেন এবং দ্বিতলে গেলেন। সেখানে তাঁহার মাতৃ দেবী ছিলেন। সকলকে প্রণাম করিয়া আমি তাঁহাকে সুধাইলাম—"ঠাকুর মা, আপনার শরীর কেমন?" পরে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তিনি রীতিমত ঔষধ সেবন করেন কিনা? ঠাকুরমাতা বলিলেন সে সম্বন্ধে তিনি কোন অনিয়ম করেন না। যো পাইয়া আমি তখন মহারাণীকে বলিলাম, "তবে মা আপনি ঔষধ না খাওয়া কার্ কাছে শিখিলেন?" মাতা হাসিয়া উঠিলেন। তার পর কুমারের পশ্চিমোত্তর প্রদেশে যাওয়ার প্রস্তাব সম্বন্ধে নানা কথা হইল। রাজবাটীর শুদ্ধান্তপুরটা অনেকাংশে সে কালের ধরণের, রৌদ্র, এবং বায়ু চলাচলের যথেষ্ট ব্যবস্থাবিহীন, বাবুর বাটীর (মহারাণী-মাতার পিত্রালয়ের) ভিতর এবং বাহিরের সংস্থান বেশ স্বাস্থ্যকর। সে জন্ত চিকিৎসকদের পরামর্শে কিছু দিন তাঁহার সেখানে থাকার কথা হইতেছিল। আমি বাড়ীটিতে মুক্ত বায়ু চলাচলের সুব্যবহার

প্রশংসা করিয়া সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়ার একান্ত প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত সকলের হৃদয়ঙ্গম করাইলাম।

আমার জেদে পর্দ্দা ত প্রস্তুত হইল, কিন্তু তাহা জানালায় দিবার ব্যবস্থা আর হইয়া উঠে না। মার সমক্ষে ত্রৈলোক্যকে বলিলাম, দেখিও পর্দ্দা যেন আজ আঁটিয়া দেওয়া হয়। মহারাণী হাসিলেন, বলিলেন,—আর দরকার কি? শীতকাল আসিল, এখন দুয়ার বন্ধ করিতে হবে।" ২।৪ দিনেই এ উপেক্ষার ফল বুঝা গেল। আমার প্রশ্নোত্তরে মাতা স্বীকার করিলেন যে তাঁহার দক্ষিণ কর্ণের শ্রবণ-শক্তি যেন কিছু কমিয়াছে। এবং তিনি বুঝিতে পারিতেছেন কাণ পাকিয়াছে। আমি আশঙ্কা প্রকাশ করিলাম যে অবিলম্বে চিকিৎসা না হইলে কর্ণের স্থায়ী কোন পীড়া হইতে পারে। স্থির হইল ডাক্তার চন্দ্রবাবুকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া যথাবিহিত করা যাইবে।

আমার সঙ্গে ডাক্তারবাবুর কথাবার্ত্তার পর দিন তিনি আসিলেন। ডাক্তার অন্দরে প্রবেশ করিয়া বড় হলের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র গৃহদ্বারের এক পাঠ বন্ধ হইল, উন্মুক্ত দ্বারে অন্নদাসী বসিল। তখন চন্দ্রবাবু মহারাণী-মাতার কাণের অসুখ সম্বন্ধে একে একে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমায় সুধাইলেন—মা গরম জল ও সাবানের পিচকারী কর্ণে প্রয়োগ করিতে দিবেন কি না? আর নারিকেল তৈলে আতর মিশ্রিত করিয়া কাণে দিতে আপত্তি আছে কিনা? আমি তাঁহাকে সম্মত করাইলাম। কিন্তু পিচকারী প্রয়োগ ত ডাক্তারের দ্বারা হইবে না। দাসীরাও তাহাতে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত। শেষে সে ভার আমার উপর পড়িল।

ঔষধ আনিবার জন্য আমি ডাক্তার বাবুর সঙ্গে বহির্ব্বাটীতে গেলাম। পুটিয়াতে রাজা পরেশ নারায়ণের দাতব্য ঔষধালয় ছিল, এখনও আছে; মহারাণী মাতার প্রতিষ্ঠিত ঔষধালয় সকল মফঃস্বলে—ভাল ঔষধের দোকান সেখানে আমরা দেখিয়া আসি নাই। ইদানীং সেজন্য একটী ঔষধালয় রাজবাটীতেই খোলা হইয়াছিল। রাজপরিবারবর্গ ও ভৃত্যদের নিমিত্ত আদৌ তাহা স্থাপিত হইলেও বাহিরের অনেক লোক সেখানে ঔষধ লইতে আসিত, বিশেষ তখন অসুখের সময়, আর পুটিয়ার স্বাস্থ্য কোনকালে ভাল নয়। স্বর্গীয় রাজার আমলে ত্রিতলের যে গৃহ সচরাচর তাঁহার বৈঠকরূপে ব্যবহৃত হইত, দেখিলাম ঔষধ সেইখানে রক্ষিত হইয়াছে। ঐ ঘরগুলি ইহার আগে বন্ধই থাকিত, আমি আর কখন তাহাতে প্রবেশ করি নাই। দেখিলাম তাহাদের জীর্ণাবস্থা; সেখানকার আসবাবগুলিও পুরাতন এবং অযত্নরক্ষিত। ঔষধ লইয়া আমি পুনরায় অন্তঃপুরে মার কাছে গেলে তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—কাল সন্ধ্যার পর বাহিরে তুমি চন্দ্রাবলীকে জানালার পর্দ্দার কথা আর আমার কাণের অসুখের কথা সুধাইয়াছিলে। সে আসিয়া বলিল, "শ্রীশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন যে কাণে পর্দ্দা দেওয়া হইয়াছে কিনা?" উপস্থিত সকলেই হাসিয়া উঠিল। আমি অতি সাবধানে মাতার কর্ণে পিচকারী প্রয়োগ করিয়া ঔষধ দেওয়াইলাম। ২।৩ দিন ঐরূপ করায় কিছু উপকার হইল। কিন্তু মাঝে মাঝে ইহাতে ব্যাঘাত

ঘটিতে লাগিল। কোন কোন দিন দাসীদের ভুলে সময়মত গরম জল প্রভৃতি প্রস্তুত থাকে না, মাতাও তাহাতে কাহাকেও কিছু বলেন না। এরূপ যে দিন ঘটিত, আমি বারম্বার তাঁহাকে কাণে শুক সেঁক দিতে অনুরোধ করিয়া বাসায় ফিরিতাম। কুমারের পশ্চিম যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গোপনে উইল করার গোলমালেও কয়দিন উপর্য্যুপরি কর্ণের চিকিৎসা বন্ধ রহিল। যাহা হউক অসুখটা ক্রমে সারিয়া গেল।

তাঁহার মানসিক ক্লেশের কথা বলিতে ছিলাম। ইতিপূর্ব্বে সে পরিচয় কিছু কিছু দিয়াছি। সকল বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া কুমার অযোধ্যাগমন স্থির নিশ্চয় করিলেন। যাওয়ার আগে মহারাণীর অজ্ঞাতসারে অতি গোপনে এক উইল করিয়া দস্তর মত লোহার সিন্ধুকে রক্ষা করিবার জন্য কলেক্টর সাহেবকে উহা অর্পণ করিতে বোয়ালিয়ায় গেলেন। এখানে বলা উচিত যে তাঁহার দেহত্যাগের পর দেখা গিয়াছিল সে উইল খানিতে মাতার অনিষ্টকর কিছু ছিল না। কিন্তু তখন মন্ত্র-গুপ্তির কাজটা মাত্রা ছাড়াইয়া সম্পন্ন হওয়ায় ভারি দুঃখের বিষয় হইয়া উঠিল। কুমার মাতৃদেবীকে খসড়াটা দেখাইয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিলে জল্পনা কল্পনার কোন কারণ ঘটিত না—কোনরূপ মনোমালিন্যের অবসর উপস্থিত হইতে পারিত না। মাতার বেশী কষ্টের কথা এই হইল যে কুমার তাঁহাকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া অন্যান্যের পরামর্শ-মত চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা হউক সে কার্য্য শেষ করিয়া কুমার একদিন রাত্রি ১টার সময় জেলার সদর হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং দুই ঘণ্টার ভিতর মহারাণীর কাছে বিদায় লইতে গেলেন। মা কেবল অশ্রুত্যাগ করিতেছিলেন। কুমার বলিলেন, "এখন ত চলিলাম, ভাল করিয়া বিদায় দিন্।" মা উত্তর করিলেন, "ভাল করিয়া আর কি বলিব? যাহা তোমার ইচ্ছা হইতেছে, তাহাইত করি-তেছ! তাহাই কর।"

তারপর রাত্রি ১টার আমলে কুমার পশ্চিম চলিয়া গেলেন। ইহাতে মহারাণী মাতার কয়টাদিন বড় মনঃকষ্টে কাটিল। এই সময়ে রাজসংসারের পেন্‌সেন প্রাপ্ত আত্মীয় জগৎ-প্রচণ্ড মহাশয় কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া-ছিলেন। তিনি তখন এমন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন যে ভাল করিয়া দেখিতে শুনিতে পান না। মানসিক ক্লেশে মার শরীর আবার খারাপ হইল। সকল শুনিয়া তিনি তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন এবং হাত দেখিলেন। অন্যান্য কথা আরম্ভ হইলে চক্ষের জলে মাতার গণ্ড-প্লাবিত হইল, প্রচণ্ড মহাশয়কে বলাইলেন তিনি কদাপি আর এখানে (পুটিয়ায়) থাকিবেন না।' বৃদ্ধ মর্ম্মপীড়িত হইয়া বলিলেন,— "থাক, আর অবৈধ। মা সতীলক্ষ্মী, যাহারা তাঁহাকে কাঁদায়, তাহাদের কি ভাল হইবে?"

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

বারাণসীর অভিমুখে।

অন্য প্রভাত

বারাণসীর প্রভাত, সুশীতল ও শিশির-সিক্ত; এখানে শীতের প্রভাত, কিন্তু আমাদের দক্ষিণ ফ্রান্সে, অক্টোবর মাসে ঋতুকালের যেরূপ মৃদুমধুর ভাব হয়, এখানে কতকটা সেইরূপ।

নগরের যে দূর উপকণ্ঠে আমি বাস করি, সেইখান হইতে প্রতিদিন প্রাতে, নদীর ধারে যখন বেড়াইতে যাই, তখন দেখিতে পাই, পল্লী-গ্রামের ছোট ছোট ব্যবসাদারেরা,—খুব যেন শীত লাগিতেছে এই ভাবে চাদর কিংবা শালে চোখ্ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া শহরের দিকে ছুটিতেছে; লাঠির আগায় ঝুলাইয়া, ক্ষীরের হাঁড়ী, চাউল-পিঠার চুব্ড়ি, ময়দার ঝুড়ী,—গঙ্গায় যাহা নিঃক্ষিপ্ত হইবে সেই সব জুঁইফুলের মালা, গাঁদাফুলের মালা, কাঁধে করিয়া চলিয়াছে।

নদীতে নামিবার পূর্ব্বেই, ঘাটের উপরে, একজন সন্ন্যাসীর সম্মুখে আমি দাঁড়াইলাম। সন্ন্যাসীর বয়স ত্রিশবৎসর; ইনি একটি পুরাতন চতুষ্কমণ্ডপে আড্ডা গাড়িয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ সন্ন্যাসীরা ভূমির উপর যে অগ্নি এতদিন জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই অগ্নি তিনিও এখন দিবারাত্রি রক্ষা করিতেছেন। দুই সহস্র বৎসর হইতে এই অগ্নি এই একইস্থানে জ্বলিতেছে। ইনি বৃদ্ধ, মাংসহীন; ইঁহার দীর্ঘ কেশ মস্তকের চূড়াদেশে, স্ত্রীলোকের খোঁপার মত বাঁধা; নগ্ন দেহ ভস্মলিপ্ত; ইনি আমার গলায়, এক ছড়া জুঁইফুলের মালা নিঃক্ষেপ করিলেন, ধ্যান-বিহ্বল অতীব মধুর দৃষ্টিতে মুহূর্ত্তকাল আমার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর বাহুর দ্বারা একটা ইঙ্গিত করিয়া, আবার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। "যদি ইচ্ছা হয়, এইখানে বসে ধ্যান কর।" তাঁহার চির-অবারিত গৃহের সেকেলে ধরণের থামের মধ্য হইতে, নিম্নস্থ গঙ্গার-উপর দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে—পরপারের বিশাল সমভূমি দেখা-যাইতেছে—সেই মরুভূমি, যাহা এখনও নৈশ বাষ্পজালে আচ্ছন্ন; এবং তাহারই পশ্চাৎ হইতে যাদুকর সূর্য্য ধীরে ধীরে উদিত হইতে-ছেন। পার্শ্ববর্ত্তী আর একটি চতুষ্কমণ্ডপ,—যাহা এই চতুষ্কের উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে, এবং যেখান হইতে এই চতুষ্কটা দেখা যায় সেইখানে গঙ্গাদেবীর উদ্দেশে,বারাণসীর সমস্ত দেবদেবীর উদ্দেশে প্রভাত-সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে; স্তম্ভশ্রেণীর মধ্য হইতে, উদয়াচলের দিকে মুখ করিয়া কতকগুলা দীর্ঘ তূরী বন্যপশুর ন্যায় বিকট গর্জ্জন করিতেছে; এবং এই কর্ণবধির ভীষণ কোলাহলে যোগ দিয়া ঢাক-ঢোল ভিতর হইতে বাজিতেছে।

আমি,প্রতিদিন প্রাতে যাহা করিয়া থাকি, আজও সেইরূপ, বারাণসীর প্রথার অনুসারে

নদীতে নামিলাম। এই সময়ে আমার নৌকা আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে।

প্রথমে, শ্মশান-ভূমির সম্মুখ দিয়া আমাকে যাইতে হইবে। যদিও কিছু দিন হইতে, এই পবিত্র নগরে মারীভয় দেখা দিয়াছে, তবু একটা বই শব নাই; এই মৃতদেহটি তীরের উপর শয়ান থাকিয়া আ-কটি গঙ্গার জলে নিমজ্জিত রহিয়াছে। কিন্তু আরও কতকগুলা মৃতদেহ আজ রাত্রে নিশ্চয়ই পোড়ান হইয়াছে; কেননা, মাটির উপর কতকগুলা ধূমায়মান চেলা-কাঠ, সম্মুখে খানিকটা জল,—মানব-অঙ্গারে সমস্ত কালো হইয়া গিয়াছে, বিষ্ঠা ও গলিত আবর্জ্জনার সহিত ম্লানশুষ্ক পুষ্পমালা সেই জলে ভাসিতেছে। সন্ন্যাসীর সেই মৃতদেহটা বরাবর একইভাবে এইখানে খাড়া হইয়া রহিয়াছে; বাহুদ্বয় আড়াআড়িভাবে স্থাপিত, মস্তক অবনত, অঙ্গুলীর মধ্যে পুতী রক্ষিত, ধূসর চূর্ণে দেহ আচ্ছন্ন থাকায় মনে হইতেছে যেন গ্রীশ দেশের কোন পিত্তল-প্রতিমূর্ত্তি পৃথিবীতে বেড়াইতে আসিয়াছে; কিন্তু দীর্ঘকেশকলাপ লালরঙ্গে রঞ্জিত এবং মস্তক জুঁইফুলের মুকুটে বিভূষিত।

এই সব ফুলের মধ্যে, এই সব হলদে ফুলের মালার মধ্যে, স্ফীত শবদেহ—জলমগ্ন গরু, মৃত কুকুরসকলও ভাসিতেছে এবং গঙ্গার পুরাতন পূতিগন্ধে এই চমৎকার স্বচ্ছ বায়ু পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; এই পূতিগন্ধ,—গোলাপী প্রভাতের মায়ারাজ্যের মধ্যে, মৃত্যুর ভাবকে আনিয়া বসাইয়াছে ও সযত্নে রক্ষা করিতেছে।

মনে হইতেছে যেন বসন্ত আগতপ্রায়; প্রথমে যখন এখানে আসি, তখন শীতের লক্ষণ সকল দেখা দিয়াছিল, এখন সে সব লক্ষণ আর দেখিতে পাই না। এখন প্রভাতে, এক প্রকার নূতনতর অবসাদ অনুভব করা যায়; মনে হয়, নদীর জলও যেন একটু গরম হইয়াছে; ভারতের সূক্ষ্ম মলমল্-শাড়ী-পরিহিতা, দীর্ঘকুন্তলা স্নান-রতা রমণীগণ গঙ্গার জলে আজকাল একটু বেশীক্ষণ থাকিতেছে। স্নানার্থী ছোট ছোট পাখীর ঝাঁকে নদী আচ্ছন্ন; পায়রা, চড়াই, সকল রঙেরই পাখী দলে দলে থাকিয়া পূজা-রত ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে; তাহাদের চক্‌চকে তাম্র-ঘটির উপর, তাহাদের ফুলের মালার উপর আসিয়া বসিতেছে; নৌকার সমস্ত কাছির উপর পায়ের নখ্ বাধাইয়া রহিয়াছে এবং পূর্ণকণ্ঠে গান করিতেছে। পবিত্র গাভীগুলা এখন আরও অলস হইয়া পড়িয়াছে, ঘাটের সিঁড়ির নীচে রদ্দুরে আরামে শুইয়া আছে; এইখানে বালকেরা আসিয়া উহাদিগকে আদর করিতেছে, তাজা ঘাস দিতেছে, সবুজ খাকড়া দিতেছে।

প্রতিদিনের ন্যায় আজও সমস্ত বারাণসী এইখানে উপস্থিত; সমস্ত নগ্ন-গাত্র লোক, উচ্চবর্ণের সমস্ত পিত্তল-মূর্ত্তি,—তটস্থ বিশাল সোপান-ধাপের উপর, অপূর্ব্ব আতপত্রের ছায়াতলে, যেখানে ষড়্‌ভুজ দেবতারা বাস করে সেই প্রস্তরের চতুষ্কমণ্ডপের মধ্যে, অথবা ভরপূর রদ্দুরে, ভাসন্ত তক্তার উপর ও জলের মধ্যে সমবেত হইয়াছে।

শুধু আমিই গঙ্গার উপর, এই সময়ে আরাধনা করিতেছি না, কিংবা আমিই শুধু স্নান, প্রণতি, জুঁই ও গেঁদা ফুলের নৈবেদ্যদান, প্রভৃতি পূজার কোন অনুষ্ঠানই করিতেছি না।

প্রত্যেক ডিঙ্গিনৌকার উপর, প্রত্যেক সোপান-ধাপের উপর, প্রতিদিন প্রভাতে এই আনন্দ-উৎসব আরম্ভ হয়; এই ভক্তবৃন্দের মধ্যে আমার কোন স্থান নাই; তাহাদের এরূপ তাচ্ছিল্যভাব, যে, আমার দিকে উহারা একবার চাহিয়াও দেখে না; এখন ভ্রমণের সুবিধা হইয়াছে, ভারতের দ্বার সকলের নিকটেই উন্মুক্ত, পর্য্যটকের বন্যায় বারাণসী এখন পরিপ্লাবিত, কিন্তু এই পর্য্যটকদিগের মধ্যে আমি নগণ্যভাবে চলিয়াছি···আমি প্রথম যখন এখানে আসি, তখন আমি যেরূপ ছিলাম, এখন আর আমি সে আমি নাই; তত্ত্বজ্ঞানীদের গৃহে থাকিয়া, এমন একটি ভাব আমার মনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, যাহা কখনই বিলুপ্ত হইবার নহে। আমি "দ্বারদেশের বিভীষিকাগুলা" পার হইয়াছি এবং এক্ষণে শান্তভাবে, আত্মসমর্পণ করিয়া, অভিনব তত্ত্বগুলির ঈষৎ আভাস পাইতেছি। অনেকদিন পর্য্যন্ত অনন্তকালকে আমি উপলব্ধি করিতে পারি নাই, কিন্তু যখন হইতে এই অনন্তকালের মূর্ত্তি, আর এক আকারে, আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইল, তখন হইতেই সমস্ত জিনিষেরই ভাব বদলাইয়া গেল,—জীবনের ভাব বদলাইয়া গেল, মৃত্যুরও ভাব বদলাইয়া গেল।

কিন্তু তবু (তত্ত্বজ্ঞানীদের ভাষা অনুসারে) "জাগতিক মায়ায়" এখনও আমি আচ্ছন্ন! সমস্ত পার্থিব ও ক্ষণস্থায়ী বিষয় সম্বন্ধে ঔদাস্য ও বৈরাগ্যের অঙ্কুর তাঁহারাই আমার অন্তরে নিহিত করিয়াছিলেন। বারাণসী যেমন একদিকে ধর্ম্মবিষয়ে গুহ্যতন্ত্রী, তেমনি আবার পার্থিব বিষয়ে ইন্দ্রিয়োন্মাদক। বারাণসীর সমস্ত লোক কেবল পূজাঅর্চনা ও মৃত্যুরই চিন্তা করে; ইহা সত্ত্বেও, বারাণসীর সমস্ত পদার্থই যেন নেত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। আমি জানি না, এরূপ স্থান আর দ্বিতীয় আছে কিনা। বারাণসী যেমন মানুষকে একদিকে ত্যাগের দিকে,—তেমনি আবার তাহা হইতে দূরে—ভোগের দিকেও সত্বর লইয়া যাইতে সমর্থ। আলোক, বর্ণচ্ছটা, আর্দ্র শাড়ী- পরিহিতা, অর্দ্ধনগ্না মদালসনয়না নবযুবতী—এই সমস্তই ইন্দ্রিয়ের ফাঁদ। পুরাতনী গঙ্গানদীর বরাবর ধারে-ধারে ভারতের অতুলনীয় নারী-রূপের হাট বসিয়াছে···

আমার আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই আমার মাঝিমাল্লারা প্রতিদিনের ন্যায় আজও নৌকাকে আবার উজান বাহিয়া লইয়া গেল। আমরা সেই পুরাতন প্রাসাদ-অঞ্চলের সম্মুখে উপনীত হইলাম। স্থানটি অতীব নির্জ্জন ও ধ্যানচিন্তার অনুকূল···আজ অপরাহ্নে তত্ত্ব-জ্ঞানীদের সেই ক্ষুদ্র গৃহে আবার প্রত্যাগমন করিব; ভয়-মিশ্রিত একটা মনের টানে আমি সেইখানে যাইতেছি। তাঁহাদের যে উপদেশ প্রথমে আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই, আমার নিকট বীভৎসজনক বলিয়া মনে হইয়াছিল, এখন তাহাই ক্রমশ আমার মনকে অধিকার করিতেছে; ইহারই মধ্যে তাঁহারা আমার পূর্ব্ব-জীবনের কেন্দ্রটিকে টলাইয়া দিয়াছেন; মনে হয় যেন সেই মহা বিশ্বাত্মার সহিত বিলীন জন্য, তাঁহাদেরই ন্যায়, আমার অন্তরস্থ ক্ষুদ্র আত্মাটিকে তাঁহারা ছেদন করিয়াছেন···

তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন:—"যাহা তোমা হইতে ভিন্ন, যাহা তোমার আত্মার বাহিরে অবস্থিত,

তাহাই তোমার কামনার বিষয় হইতে পারে; কিন্তু যদি তুমি জানিতে পার যে, তোমার চৈতন্যের অন্তর্গত সমস্ত বিষয় তোমাতেই রহিয়াছে, এবং সমস্ত বিশ্বের সার বস্তুটি তোমার মধ্যেই অবস্থিত, তখন তোমার সমস্ত কামনা তিরোহিত হয় এবং সমস্ত শৃঙ্খল বিলীন হইয়া যায়।"

"স্বরূপত তুমি ঈশ্বর। এই সত্যটি যদি তোমার হৃদয়ে মুদ্রিত করিতে পার, দেখিবে,—যাহা হইতে সমস্ত দুঃখ যাতনা সমুদ্ভূত হয়, সেই মায়াময় সসীমভাব সমূহ—সেই পৃথক্ সত্তার বাসনা-সকল স্খলিত হইয়া পড়িবে।..."

সেই রহস্যময় পুরাতন প্রাসাদের ধার দিয়া আমরা চলিয়া গেলাম। যাহারা জলের উপর চুল আছড়াইয়া পরে সেই চুল কাঁধের উপর ফেলিয়া দেয়—আর চুল হইতে জল ঝরিয়া পড়ে—সেই সব রমণীদের আর দেখিতে পাইলাম না; ঘাটের সিড়িতে—অন্ধকারের উচ্চ দেয়ালের পাদদেশে, কেহই নাই। কিন্তু হঠাৎ একটা দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল—রাজ-প্রাসাদের নিম্নতলস্থ-গহ্বরের গুরুভার বৃহৎ দ্বার;—এক মৌসমের জন্য, এই গহ্বর প্রতি-বৎসর নদীর জলে নিমজ্জিত থাকে। সৌর-করে উদ্ভাসিত হইয়া, একটি রমণী দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল;—এই সব বিষণ্ণ প্রকাণ্ড প্রস্তর-রাশির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র বিদ্যুন্ময়ী স্বপ্নমূর্ত্তি। পরিধানে রূপালি জরির পাড়-ওয়ালা বেগুনি রঙের একখানি শাড়ী—এবং নারাঙ্গী-জর্দ্দা রঙের একটি ওড়্‌না। ওড়নাখানি রোমক-মহিলাদের ন্যায় মস্তকের কেশের উপর ন্যস্ত;—সম্মুখস্থ জনশূন্য সমভূমির দিকে তাকাইয়া না জানি কি দেখিতেছে, এবং চোখ্ ঢাকিবার জন্য নগ্নবাহু উঠাইয়া রহিয়াছে—সেই ভারত-সুলভ বড় বড় চোখ্—যাহার মধ্যে কি একটা অনির্ব্বচনীয় মোহিনী-শক্তি আছে। এই সব বেগ্‌নি ও জর্দ্দারঙের বস্ত্র,—উহার সুন্দর বক্ষদেশ, উহার সুনম্র নিতম্বের রেখা-নিচয় ফুটাইয়া তুলিয়াছে; উহার তরুণ দেহের সহিত সমস্তই বেশ মিশ্ খাইয়াছে...

তত্ত্বজ্ঞানীরা আমাকে বলিয়াছিলেন—"তিনিই আমি, আমিই তিনি, এবং আমরা ঈশ্বর"...বোধ করি, যেন তাঁহাদের সেই অবিচলিত প্রশান্ত ভাব, আমাকেও আচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

অনেকক্ষণ ধরিয়া আমি উহাকে নিরীক্ষণ করিলাম, আমার মন বিচলিত হইল না, আমার মনে কোন প্রকার আক্ষেপ কিংবা বিষাদের ছায়া পড়িল না; নবযৌবনা ভগিনীর রূপলাবণ্যে যেরূপ গর্ব্ব অনুভব করা যায়, সেইরূপ গর্ব্বভরে আমি তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; একটা ঘনিষ্ঠতর ভ্রাতৃ-বন্ধনে আমরা পরস্পরের সহিত আবদ্ধ হইলাম; এবং আজিকার প্রভাত, জগতের উপর যে অমের উজ্জ্বল মহিমাচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়াছে, আমরা উভয়ে মিলিয়া যেন তাহা সম্ভোগ করিতেছি; আমরাই আলোক, আমরাই বহুমুখী প্রকৃতি, আমরাই বিশ্ব-আত্মা। আজিকার এই বিরল মুহূর্ত্তে, আমার সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে;—"যে সব মায়াময় সসীমভাব হইতে পৃথক সত্তার বাসনাদি উৎপন্ন হয়"—সেই সসীমভাবগুলা স্খলিত হইয়াছে...

১৪

অজ্ঞাত বন্ধুদের উদ্দেশে।

আমাকে শপথ করিতে বলায়, আমি সহজ ভাবের একটি শপথ আবৃত্তি করিলাম; তাহার পর, সেই নিস্তব্ধ ক্ষুদ্র গৃহের তত্ত্বজ্ঞানীরা আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন।

তাঁহারা আমাকে যে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা পুনরাবৃত্তি করিতে আমি চেষ্টা করিব না।

প্রথমতঃ, সূক্ষ্ম জগৎ আমার ভ্রমণ পথের বাহিরে বলিয়া অন্য লোকের মনে হইতে পারে; অতএব আমার সহিত সূক্ষ্মজগতে বিচরণ করিতে কেহ সম্মত হইবে,—এ বিষয়ে কি আমি ভরসা পাইতে পারি? আমি জানি, লোকে কেবল আমার ভ্রমণপথের মায়া-দৃশ্য—যে অসংখ্য পদার্থের উপর আমি চোখ্ বুলাইয়া গিয়াছি, কেবল সেই সব পদার্থের ছায়া-চিত্রই আমার নিকট হইতে প্রত্যাশা করে।

বিশেষতঃ, আমার এই অল্পদিনের শিক্ষা-দীক্ষার পর, আমি অন্যকে শিক্ষা দিতে পারিব এ কথা আমি কি করিয়া বিশ্বাস করিব? আমি এখন যাহা বলিতে পারিব তাহাতে শুধু অন্যের চিত্তস্থৈর্য্য নাশ হইবে—হয়ত তাহা কাহাকে "দ্বারদেশের বিভীষিকা" পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে—তাহার ওদিকে আর নহে।

তাছাড়া, আমি এখনও ভারতকে আবিষ্কার করিতে পারি নাই, যেহেতু বেদকে এখনও আবিষ্কার করিতে পারি নাই; একথা সত্য, কয়েক বৎসর হইতে, আমাদের মধ্যে,—অসম্পূর্ণ হইলেও—ঐ অলৌকিক গ্রন্থের অনুবাদ প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বর্ত্তমান শতাব্দিতে যাঁহাদের সংখ্যা অসংখ্য, আমার সেই সব অজ্ঞাত বন্ধুদের প্রতি আমি শুধু এই কথা বলিতে চাহি;—এই বৈদিক মতের মধ্যে কতটা সান্ত্বনা আছে, তা প্রথম দৃষ্টিতে সহসা উপলব্ধি হয় না।

এবং উহাতে যে সান্ত্বনা পাওয়া যায়, তাহা ঈশ্বর-প্রকাশিত ধর্ম্মাদির সান্ত্বনার ন্যায়, যুক্তির দ্বারা বিনষ্ট হইবার নহে।

এই বেদগ্রন্থ একজনের প্রণীত নহে—ইহা একটি সমস্ত জাতির সঙ্কলিত গ্রন্থ; সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও পরমাশ্চর্য্য বিষয়সমূহের পাশাপাশি, ইহার মধ্যে, অনেক অস্পষ্টতা, অসঙ্গতি ও 'ছেলেম' কথাও আছে; এই গ্রন্থগুলি অরণ্যের ন্যায় নিবীড় ও রসাতলের ন্যায় অতলস্পর্শ। যাঁহারা নির্জ্জনে বসিয়া অবিচলিতচিত্তে এই গ্রন্থগুলির অনুশীলন করেন, সেই বারাণসীর তত্ত্বজ্ঞানীরাই বোধ হয় উহার মধ্যে আমাদিগকে একটু প্রবেশ করাইতে পারেন। তাঁহাদের পূর্ব্বে, এই অতলস্পর্শের দ্বার আর কেহ উদ্‌ঘাটিত করে নাই; এই সব কথা আমি আর কোথাও শুনি নাই; জীবন ও মৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে, বারাণসীর তত্ত্বজ্ঞানীরা যে উত্তর প্রদান করেন, তাহাতে মানব-জ্ঞানের আকুল জিজ্ঞাসা-কেও পরিতৃপ্ত করিতে পারে; এবং পার্থিব অংশ ধ্বংস হইবার পরেও, তোমার নিজ সত্তা প্রায় চিরস্থায়ী হইবে, এই বিষয় সম্বন্ধে এরূপ প্রমাণ সকল তোমার সম্মুখে তাঁহারা স্থাপন করেন যে, সে বিষয়ে তোমার আর কোন সন্দেহ থাকে না।

যাই হোক্, গোলাপ-উদ্যানে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র ধবল গৃহটি, অবারিত-দ্বার ও আতিথেয় হইলেও, লঘুহৃদয়ে উহার মধ্যে প্রবেশ করা যায় না; কারণ উহা, প্রধানতঃ সন্ন্যাস ও মৃত্যুর

আশ্রয়; সেখানকার শান্তির হাওয়া একবার যদি কাহার গায়ে লাগে—যতই অল্প হোক্ না কেন—সে আর সে লোক থাকে না। সেই পূর্ণব্রহ্ম যিনি 'গুহাহিতং' 'গহ্বরেষ্ঠং'; সেই ঈশ্বর,—এই অভিব্যক্ত বিশ্বের সহিত যাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই; সেই ব্রহ্ম যিনি স্বরূপতঃ অনির্ব্বচনীয়, যিনি চিন্তার অতীত, যাঁহার সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, এবং যাঁহাকে নিস্তব্ধতাই শুধু প্রকাশ করিতে পারে, তাঁহার একটু দর্শন লাভ করা—একটা ভীষণ পরীক্ষা।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কপালের লেখা।

১

আমরা তিন বন্ধু এক বাসায় থাকিয়া কৃষ্ণনগর কলেজে আইন অধ্যয়ন করিতাম। তিনজনেই প্রায় সমবয়স্ক—তবে শ্রীশচন্দ্রের ২।৩ বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছিল, সুতরাং সে সংসারী লোক বলিয়া কিছু গম্ভীর প্রকৃতি। আমি ও বিজয় চাপল্যের জন্য তাহার নিকট দিনের মধ্যে অনেকবার করিয়া উপদেশ ও অনুযোগ শুনিতাম। তথাপি আমাদের চরিত্রোন্নতির কোনও প্রকার ভরসা দেখা যাইত না।

ফাল্গুন মাস, দোলের সময়। সন্ধ্যাবেলা বাসায় খোলা ছাদের উপর বসিয়া স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিতেছিলাম। সুকণ্ঠ বিজয় কার্ণিশের কাছে বসিয়া হিন্দোলায় গান গাহিতেছিল

"বেরি ভজন গরি আয়ত না য়াই।
ফিরত দেশ দেশ সবকবৃহাই।"

গাহিতে গাহিতে বিজয়ের মনে কি ভাবের উদ্রেক হইল জানি না। সে সহসা গীত বন্ধ করিয়া বলিল "ওহে, কাল হোরির দিন, ছুটি রহিয়াছে। চল একটু দেশভ্রমণ করে আসা যা'ক।"

শ্রীশ অলস ভাবে উত্তর করিল "দুই দিনের ছুটিতে আবার দেশভ্রমণ কি? তাহার চেয়ে ঘরে বসিয়া অকাতরে নিদ্রা দিলে বরং অধিকতর উপকার আছে।"

বিজয় কহিল "আমি কি আর রাজপুত্তুর, মন্ত্রীপুত্তুর আর কোটালপুত্তুরের মত পক্ষীরাজ ঘোড়া চড়িয়া দেশভ্রমণের কথা বলছি? একটু পল্লীগ্রামের দিকে হাঁটিয়া যাওয়া যা'ক। বসন্তে ভ্রমণং পথ্যং, একটু শারীরিক স্ফূর্ত্তিও হবে, আবার হয় ত একটা কিছু এডভেঞ্চরও হ'তে পারে।"

প্রস্তাবটা আমারও লাগিল ভাল। সুতরাং ভোট অধিক হওয়ায় এই মন্তব্যই গৃহীত হইল। পরদিন প্রত্যুষেই তিন মূর্ত্তিতে রওয়ানা হওয়া গেল। সঙ্গে রসদের মধ্যে তিনখানা পাউরুটি, ৮টা ডিম আর গোটাটেক সন্দেশ।

তখনও ঠিক সূর্য্যোদয় হয় নাই। দুই ধারে অনিল সঞ্চালিত হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্রের

মধ্যদিয়া আইল বাহিয়া চলিলাম। খোলা মাঠের মাঝে ভোরের হাওয়া লাগিলে অতি নীরস প্রাণেও স্ফূর্ত্তি আসে। আমরা মহানন্দে ধাবমান রবারের বলের ন্যায় লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া চলিতে লাগিলাম। এমন কি শ্রীশচন্দ্রও আজ তাহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিয়া আমাদের চাপল্য ও বাচালতার যোগ দিতে লাগিল।

এইরূপে সহরের প্রান্তভাগ ছাড়িয়া প্রায় ৪।৫ মাইল পথ অতিক্রান্ত হইল।

বিজয় কহিল "ভাই, এতটা পথ আসা গেল, কই কোনও এডভেঞ্চারের লক্ষণ ত দেখা গেল না।"

আমি বলিলাম "এড্‌ভেঞ্চারের অভাব কি? মনে কর যদি ওই ধান্তবাহী মুসলমানটার মস্তকে পশ্চাৎভাগ হইতে একটা প্রবল চপেটাঘাত করা যায়, তাহা হইলেই ত এখনি একটা বেশ এডভেঞ্চারের সূত্রপাত হইতে পারে।"

বিজয় উত্তর করিল "দূর মূর্খ! এডভেঞ্চারের মধ্যে যদি নায়িকা না থাকে তবে রোমান্স আসিবে কোথা হইতে?"

ভাবিলাম তাও ত ঠিক। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম—একটি অন্যূন সপ্ততি বর্ষীয়া ঘুঁটেওয়ালী ব্যতীত আর কোনও নায়িকার চিহ্নমাত্র দেখা গেল না।

তখন একটু একটু রৌদ্র উঠিয়াছে। একটা গাছতলায় বসিয়া জলযোগ ও কয়েক মুহূর্ত্ত বিশ্রামান্তর আবার চলিতে আরম্ভ করা গেল। ক্রমে একখানা বর্দ্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রামের প্রান্তভাগে আসিয়া পড়িলাম।

রৌদ্রের তেজ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভ্রমণের স্পৃহাটাও কমিয়া আসিতেছিল। আমি ফিরিবার প্রস্তাব করিয়া কহিলাম বাস্তবিক ইহার চেয়ে শ্রীশের কথামত ঘরে বসিয়া ঘুমাইলে কাজ দেখিত।"

বিজয় রাগিয়া কহিল "ভগবান তোমাদের হস্তপদাদি কেন দিয়াছিলেন তাহা তিনিই জানেন। তোমাদের কি উচিত জান—"

"আমাদের কি উচিত তাহা আর শোনা হইল না। সহসা আমাদের বাক্যস্রোত রুদ্ধ হইয়া মুখের কথা মুখেই মিলাইয়া গেল। বিপরীত দিক হইতে একটি ছোট বিলাতী কুকুর আমাদের দিকে দৌড়িয়া আসিতেছিল—তাহার পশ্চাৎধাবমানা একটি কুসুমকিশলয়সমা বালিকা। আমরা রুদ্ধনিশ্বাসে দেখিতে লাগিলাম—কি [illegible]র! শুক্লাত্রয়োদশীর স্নিগ্ধসমোজ্জ্বল কৌমুদীরাশির ন্যায় কি মনোহারিণী মূর্ত্তি! আগমনোন্মুখ যৌবনের ঈষচ্ছায়ে বালিকার সুচঞ্চল দেহে যেন একটা তাড়িততরঙ্গের বিকাশ অনুভূত হইতেছে। কালিদাসের "সঞ্চারিণী দীপশিখার" কথা মনে পড়িতে লাগিল।

বালিকা অন্যমনস্কে কুকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছিল। তাবে বোধ হইল আমাদের লক্ষ্যও করে নাই। কেবল আমাদের পাশ দিয়া যাইবার সময় একবার নিমেষের জন্ত আমাদের দিকে চাহিয়াই চক্ষু পূর্ব্ববৎ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সেই চকিতচাহনির কি তীক্ষ্ণতা! আমি স্পষ্ট বুঝিলাম বালিকা সেই এক নিমেষের মধ্যেই দেখিয়া লইয়াছে যে শ্রীশের গালের কাছে একটা ব্রণ আছে, বিজয়ের বামকর্ণের শিরতাপটা কাটা ও আমার [illegible]মার এক

হাতের স্লিভ (বোতাম হারাইয়াছে বলিয়া) সূতা দিয়া বাঁধা।

বালিকা খানিক দূরে চলিয়া গেলে বিজয় কহিল "কি সুন্দর মুখখানি! বাস্তবিক ইহা একবার করিয়া দেখিবার জন্ত প্রত্যহ পাঁচ-ক্রোশ পথ স্বচ্ছন্দে হাঁটা যায়। যেন মূর্ত্তিমতী সরলতা।"

শ্রীশ বলিল "সখে, আর যাই বল, ঐ ভ্রমটুকু করিও না। অভিধানে অবলা, সরলা ইত্যাদি নানা নাম থাকিলেও, নারীজাতীয় জীব কখনও সরল হয় না, ইহা ধ্রুবসত্য জানিও। দেখিলে না, ঐ ক্ষুদ্র বালিকার চাহনির ধারটা কিরূপ?"

বিজয় কহিল তুমি অতি পাষণ্ড। তোমার কথা শুনিলেও পাপ আছে। কেম যে এক অভাগিনী তোমার গলায় বরমাল্য দিয়াছিল তাহা নিষ্ঠুর বিধাতাই জানেন।"

এই বলিয়া বিজয় অনুমোদনের প্রত্যাশায় আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি কোনও কথা কহিলাম না। কি জানি কেন, আমার মুখ দিয়া ভাল করিয়া কথা বাহির হইতেছিল না।

বিজয় গান ধরিল

"শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুঁহু লোচন নেল।" ইত্যাদি।

গান শেষ হইতে না হইতে, পশ্চাৎদিক হইতে একটা বিকট আওয়াজ শোনা গেল। ফিরিয়া দেখিলাম কতকগুলা ভীষণদর্শন কৃষ্ণকায় লোক লাঠিহস্তে চীৎকার করিতে করিতে আমাদের দিকে দ্রুতবেগে আসিতেছে।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপার কি?" শ্রীশ সভয়ে বলিল "ব্যাপার তোমার মাথা আর মুণ্ডু। ভদ্রলোকের মেয়ের দিকে চাহিয়া গান করিবে, আর লোকে কি তোমায় সন্দেশ খাওয়াবে? আজ যদি 'ভালয়' 'ভালয়' মাথাটা বাঁচে, তবে কোন্ আহম্মক আর তোমাদের সঙ্গে কোথাও যাবে।"

আমি মৃদুস্বরে কহিলাম "ওই মাথাটার সম্বন্ধেই ত বর্ত্তমানে একটা "যদি' দাঁড়াচ্ছে।"

বিজয় মহা আস্ফালন করিয়া কহিল "কুচ পরোয়া নেহি। এস, এই পাশের বাগানটার ভিতর পলান যা'ক।"

বিজয়ের এই রৌদ্র ও শান্তিরসের সংমিশ্রণ দেখিয়া আমাদের এই অতি বিপদেও হাসি আসিল। যাহা হউক তাহার পরামর্শটা যুক্তিযুক্ত বটে। অতএব অনতিবিলম্বেই তৎ-প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করা গেল আর কি। লোকগুলা একটু দূরে থাকিতে থাকিতেই আমরা কোনও গতিকে প্রাচীর বাহিয়া বাগানের ভিতর পড়িলাম।

দেখিলাম বাগানটি বেশ সুন্দরভাবে সাজানো। দেশী বিলাতী নানাবিধ ফুলগাছের কেয়ারি— মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম কুঞ্জবন। আমরা একটা অপরাজিতা-বিতানের মধ্যে লুক্কায়িত হইলাম। এমন সময় বাহিরে আবার গোলমাল শ্রুত হইল।

একজন মোটা গলায় কহিতেছিল "আর কোথায় পালাবে? নিশ্চয় এই বাগানের মধ্যেই আছে।"

আর একজন বলিল "আর এই বাগানটা ঘেরাও করা যা'ক। দেখতে পেলে লাঠির চোটেই সাবাড় করা যাবে।"

কম্পিত কলেবরে শ্রীশ চুপি চুপি বলিল "ঐরে, এখানেও তাড়া করেছে। এইবারেই বুঝি অপঘাত হয়।"

আমি বলিলাম "একবার ধরিতে পারিলেই এড্‌ভেঞ্চরের চূড়ান্ত করিয়া দিবে।"

বাহিরে একজন চীৎকার করিয়া কহিল "ঐ দিকে, ঐ দিকে, উঃ কি বড় বড় দাঁত।"

এ আবার কি? আমাদের দন্তপংক্তি দেখিবার ত ইহাদের কোন অবকাশ. বা প্রয়োজন হয় নাই!

আর একজন বলিল "উঃ কি প্রকাণ্ড বনবরা'! যেন একটা ষাঁড়।"

ও হরি! আমরা তবে উহাদের আক্রমণের লক্ষ্যীভূত নহি। ঘাম দিয়া জর ছাড়িল।

বিজয় কহিল "আমি তাই তখনই ভাবছিলুম যে একটা নির্দ্দোষ গান গা'হাতে ইহারা শুধু শুধু আমাদের মারিতে আসিবে কেন?

শ্রীশ বলিল "থাক, আর বুদ্ধি প্রকাশের প্রয়োজন নাই। এখন আস্তে আস্তে পলান যা'ক চল। পাঁচপয়সার হরিরলুট মানত করেছিলাম, বাটী গিয়াই দিতে হবে।"

লতান্তরাল হইতে বাহির হইয়া সম্মুখেই দেখা গেল বাগানের এক উড়ে মালী দণ্ডায়মান। সে আমাদের শুষ্ক মুখ, ছিন্ন ভিন্ন কেশ ও লুকোচুরি ভাব দেখিয়া নিশ্চিত আমাদিগকে চোর সাব্যস্ত করিয়াছিল। তবে কতকটা ভদ্রলোকের ন্যায় আকার প্রকার দর্শনে একেবারে গোলমাল করিল না। নিতান্ত সন্দিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কে বাপু আপনারা? কি চান এখানে?"

এ আবার এক নূতন বিপদ—কি বলা যায়? আমাদের দলের মধ্যে বিজয় উপস্থিতবুদ্ধির জন্য বিখ্যাত ছিল। তাহাকে টিপিয়া টিপিয়া আস্তে আস্তে বলিলাম "একটা কিছু গুছিয়ে উত্তর দাও না?"

বিজয় খুব সপ্রতিভের ন্যায় মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল "হাঁ বাপু মালী! বল্‌তে পার হরি বাবুর বাড়ী কি এইখানে?"

মালী প্রকাণ্ড একটা নমস্কার করিয়া বলিল "আজ্ঞা হাঁ, বাবু বাহিরে গিয়াছেন। আপনারা ততক্ষণ বৈঠকখানায় মেজবাবুর কাছে বসুন।"

আ সর্ব্বনাশ! এরূপ উত্তরটা ত প্রত্যাশা করা যায় নাই! আর কিছু বলিবার নাই। অগত্যা নিরুপায় হইয়া মালীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর দিকে চলিলাম। দেখিলাম বিজয়ের মুখের সে সপ্রতিভ ভাবটা ক্রমে যেন অন্তর্হিত হইতেছে।

আমাদের বৈঠকখানায় বসাইয়া মালী খবর দিতে গেল। আমরা পলাইব কি থাকিব ভাবিতেছি, এমন সময় একটি সৌম্য-মূর্ত্তি ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করিলেন। বেশ গৌরবর্ণ, সুপুরুষ—অনুভবে বুঝিলাম ইনিই মেজ বাবু।

আমাদিগকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া ভদ্রলোক অমায়িক স্বরে কহিলেন "আপনারা অনুগ্রহ করে একটু বসুন, দাদা এখনি আসিবেন। মহাশয়েরা কোথা হইতে আসিতেছেন?"

আমি। "আজ্ঞা কৃষ্ণনগর হইতে।"

মেজবাবু। "ওঃ, তবে ত আপনাদের বিশেষ শ্রান্তি হইয়াছে। তা' দাদার আসিতে যদি একটু বিলম্বই হয়, আপনারা ততক্ষণ স্নানাদি করুন।" এই বলিয়া আমাদের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই, চাকরদের তৈল, গামছাদি আনিতে বলিলেন। আমরাও

সকালবেলা হইতে নানা ঘটনার একরূপ "মরিয়া" হইয়া গিয়াছিলাম। সুতরাং অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে ভাবিয়া স্নানাদিতে মন দিলাম।

স্নানান্তে শরীর স্নিগ্ধ হইলে, তিন বন্ধু মিলিয়া গৃহস্বামী আসিলে কি বলা যাইবে তৎসম্বন্ধে পরামর্শ আঁটিতে লাগিলাম।

বিজয় মতলব করিল, চুপি চুপি চাকরদের কাছ থেকে সন্ধান লওয়া যাক বাবুর কোথায় আত্মীয় কুটুম্ব আছে। বলা যাইবে আমরা তাহাদের লোক—তারপর খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে, আস্তে আস্তে অদৃশ্যভাবে পলাইলেই চলিবে।

শ্রীশ এ সকলে সম্মত নহে। সে বলে "না না, বেশী বুদ্ধি করতে গিয়ে কি শেষে পুলিশে যেতে হবে?"

আমি কহিলাম ঠিক কথা, "সোজা রাস্তাই ভাল। গৃহস্বামী আসিলে আমি তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিব! আর তাঁহার নিকট মার্জ্জনা চাহিব, তাহা হইলেই সব গোল চুকিয়া যাইবে।"

এই পন্থাই সাব্যস্ত হইল।

২

কিয়ৎক্ষণ পরেই গৃহস্বামী হরিবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেজবাবুর মতই প্রায় চেহারা, কেবল কেশগুলি সমুদয় শুভ্র, ও চক্ষুদুটি একটু মিটমিটে।

আমি পূর্ব্বপরামর্শমত হরিবাবুর দিকে অগ্রসর হইয়া হাতযোড় করিয়া যথাসম্ভব সুমিষ্টস্বরে কহিলাম "মহাশয়——"

আমি কথা বলিতে না বলিতে বৃদ্ধ আমার মুখের পানে একবার মিটি মিটি চাহিয়া অকস্মাৎ আহ্লাদে বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন "আরে এ কি! শ্যাম বাবু যে! তুমি এত দিনের পর কোথা হইতে? (আমার যুক্তকর ধরিয়া) থাক থাক আর নমস্কার করতে হবে না। শরীর বেশ মোটা সোটা হইয়াছে দেখিতেছি যে। ভাল আছ ত?

এস্থলে বলা উচিত যে আমার নাম শ্রীনগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা—উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের ভিতর কাহারও নাম শ্যাম ছিল না এবং পৃথিবীর (কৃষ্ণনগরের শ্যামা নাপিত ছাড়া) শ্যাম নামে কোনও ব্যক্তিকে আমি চিনি না।

বুড়ার কথা শুনিয়া আমি ও আমার বন্ধুদ্বয় ত একেবারে আড়ষ্ট।

আমি কি উত্তর করিব ভাবিয়া না পাইয়া "আজ্ঞে, আজ্ঞে" করিয়া আমতা আমতা করিতেছি, বৃদ্ধ কিন্তু আমাকে আর কথা কহিবার সাবকাশ না দিয়াই হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। বকুনি আর থামে না—"একখানা চিঠি লিখিবার পর্য্যন্ত অবসর পাও না। যা হোক, জামালপুর জায়গাটা কেমন? স্বাস্থ্য ত বেশ আছে দেখিতেছি! দিব্য মোটা হইয়াছ, তাহার উপর একটু একটু দাড়ি হইয়াছে। আমি ত প্রথমটা চিনিতেই পারি নাই। (এ কথার সত্যতা আমরা তিন জনেই মনে মনে স্বীকার করিলাম) তা যা'হোক বড় সাহেবের সঙ্গে বনিবনাও আজকাল কেমন?"

একটা সুবিধা দেখিলাম যে বুড়া প্রশ্ন করিয়া উত্তরের অপেক্ষা রাখে না; আপন মনে বকিয়াই যায়—নতুবা বিভ্রাট ঘটিত।

ক্রমে হরিবাবু আমাদিগকে টানিয়া

অন্দরের দিকে লইয়া চলিলেন। আমি একটু সঙ্কুচিত ভাবে শ্রীশের দিকে চাহিলাম। শ্রীশ করতলদ্বয় উল্টাইয়া ও ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিয়া ইঙ্গিত করিল যা থাকে কপালে!

অন্দরের মধ্যে একটা সুপ্রশস্ত ও সুসজ্জিত ঘরে আমাদিগকে কোমল আসনে বসাইয়া বৃদ্ধ আমাদিগের জন্য শীঘ্র জলখাবার আনিতে বলিলেন, এবং ইত্যবসরে আমাকে ছাড়িয়া আমার বন্ধুদের লইয়া পড়িলেন। শ্রীশ ও বিজয় নিজেদের যথাযথ নাম ঠিকানা প্রদান করিল বটে, কিন্তু পাছে বেশী কথায় কিছু গোলমাল হইয়া পড়ে তাই বিজয় কৌশলক্রমে প্রসঙ্গান্তর উত্থাপন করিয়া এই গ্রামের সম্বন্ধে নানা জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিল।

এমন সময় কপাটের কাছে একটু খুট খুট শব্দ হইল। বৃদ্ধ সে দিকে চাহিয়া কহিলেন "এস না মা বিজলি, এখানে পর কেহই নাই। শ্যাম বাবু আমাদের ঘরের ছেলে, আর ইঁহারা তাঁর আত্মীয়। তুমি স্বচ্ছন্দে ভিতরে এস।"

জলখাবার হাতে লইয়া একটি নতমুখী বালিকা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে দিকে চাহিবামাত্র যেন ছাঁৎ করিয়া আমার বক্ষোস্পন্দন রহিত হইয়া গেল। গত ২।৩ ঘণ্টার নানা গোলমালের মধ্যেও সে মুখখানা এক নিমিষের জন্যও আমার অন্তর হইতে অপসৃত হয় নাই। সহসা আবার সম্মুখে সেই মুখখানি দেখিয়া আমার কবি বলরাম-দাসের কথা মনে হইল; —

"তোমার হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঁই বলরামের পঁহু চিত নহে থির।"

বেপ্যমান হৃদয়ে জলযোগ সমাপ্ত করা গেল। অন্যমনস্কতাবশত, চিরাগত ভদ্রপ্রথানুযায়ী ভোজনপাত্রে জলখাবারের ভগ্নাংশ অবশিষ্ট রাখিতে পর্য্যন্ত মনে রহিল না।

জলযোগ সমাপনান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর চর্ব্যচোষ্য লেহ্যপেয় নানাবিধ উপাদেয় ব্যঞ্জনাদিসহ অন্নের আবির্ভাব হইল। সকালের পরিশ্রমের পর সম্মুখে রসনাতৃপ্তিকর নানাপ্রকার উপকরণ প্রাপ্তিটা যথেষ্টই ইন্দ্রিয়সুখদায়ক বটে। কিন্তু চোষ্যমান মৎস্যের মুড়ায় যে আমাদের কোনও প্রকার ন্যায় ও আইনসঙ্গত অধিকার নাই, ইহা ভাবিয়া বিবেক দংশনে অন্তঃকরণটা ব্যথিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং এই আপাত সুখের পরিণামটা কতদূর বিষবৎ হইবে, তাহা কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠিল। তবে দুশ্চিন্তায় আহার কার্য্যের তাদৃশ বিঘ্ন ঘটিল না। সেই ধবলগিরি সদৃশ শুভ্র অন্নের স্তূপ ও বিবিধ পাত্র পরিপূরিত ব্যঞ্জনাদি তিন বন্ধুর সমবেত চেষ্টায় অনতিবিলম্বেই অদৃশ্য হইল।

আহারান্তে আঁচাইতে আঁচাইতে বিজয় চুপি চুপি কাণের কাছে বলিল "আর কেন এইবার পলাইবার যোগাড় দেখ।" প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্যের উদ্দেশে বৃদ্ধকে কহিলাম "আপনার বাগানটি বেশ; একটু ঘুরিয়া দেখিয়া আসি; বৃদ্ধের উত্তর শুনিয়া কিন্তু হৃৎকম্প হইল। বলে কিনা "বাগান আর দেখবে কি? তোমারই হাতের ত অর্দ্ধেক তৈয়ারি। এখন একটু ঘুমোও, বিকালে একসঙ্গে বেড়ান যাবে।"

অন্দর মহলের আর একটা ঘরে বেশ প্রশস্ত বিছানা পাতা। বৃদ্ধ ত আমাদিগকে

তথায় রসাইয়া চলিয়া গেলেন। গৃহস্বামীকে না বলিয়া চুপি চুপি পলাইতে গেলে অনেক বিপদের সম্ভাবনা ইত্যাশঙ্কায় আমরা বৈকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেই কৃতসংকল্প হইলাম।

৩

বৈকালে ৪টা বাজিতে না বাজিতেই হরিবাবু রাত্রে একটু পরিপাটি রকম আহারের আয়োজন করিতে আদেশ দিয়া আমাদিগকে বেড়াইতে যাইবার জন্য ডাকিলেন। আমরাও অনির্ব্বেদে মুক্তির সম্ভাবনা নিকটবর্ত্তিনী দেখিয়া অদৃষ্ট দেবীকে ধন্যবাদ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে একটি গাছ দেখাইয়া হরিবাবু আমাকে বলিলেন "এই ম্যাগ্নোলিয়া লইয়া কি হাঙ্গাম, মনে আছে ত?"

আমি কোনও কথা না কহিয়া অতি সতর্কভাবে শুধু মৃদু হাস্য করিলাম।

চতুর বিজয় তাড়াতাড়ি কহিল "দেখুন দেখুন, কি সুন্দর একটা প্রজাপতি।"

কিন্তু হায়, চাতুর্য্যের দ্বারা যে প্রবঞ্চনাকে চিরকাল খাড়া করিয়া রাখা যায় না, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে সৃষ্টিকাল হইতে অনেকবারই দেখা গিয়াছে।

কবি কাশীরাম দাস গাহিয়াছেন—

"কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে।
কতক্ষণ বুড়ি চাপা থাকয়ে বাদর।
কতক্ষণ মিথ্যা করে সত্যকে অন্তর।"

আমাদের অদৃষ্টতরণী নানা ঝঞ্ঝাবাত অতিক্রম করিয়া শেষে তীরের কাছে আসিয়া বানচাল হইল। পলাইবার বেশ সুযোগ হইয়া আসিতেছে, এমন সময় হরিবাবু সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা শ্যামবাবু, মৃণালের আজকাল ক'টি ছেলে?"

আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিলাম, "জানি না।"

সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া হরিবাবু সন্দিগ্ধস্বরে বলিলেন "সে কি? তোমার ভগ্নীর ক'টি ছেলে তুমি জান না?" সকলেরই গলদ্‌ঘর্ম্মাবস্থা। বৃদ্ধ আবার কহিলেন "শ্যামবাবু, তোমার কিছু মাথার গোলমাল ঘটেছে নাকি?"

আমি আর থাকিতে পারিলাম না, কহিলাম "মশায়, আমি ত আপনার শ্যামবাবু নই শ্যামবাবু কে তাও জানিনা; শরতের নির্ম্মল আকাশ সহসা জলদজালে আচ্ছন্ন হইল, বৃদ্ধের সে সহাস্য বদনমণ্ডল সহসা ঘোর গম্ভীর হইয়া উঠিল, ললাটতলের মাংসপেশী সমূহ নানা ভাবে কুঞ্চিত হইয়া যে ভাব ধারণ করিল, তাহা চিত্রিত করিতে একজন সুনিপুণ চিত্রকরের প্রয়োজন। বিস্ময়ে, ক্রোধে, ক্ষোভে, দুই তিন মিনিট তাঁহার কোনও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, তাহার পর সহসা অতি বিশুদ্ধ সুসংস্কৃত ভাষায় একটা বিরাট চীৎকার হইল "কে তবে তোরা দুর্বৃত্ত প্রতারক, আমার অন্তঃপুরের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে আসিয়াছিস্।"

তাঁর পর যাহা হইল, তাহা আর সবিস্তর বর্ণনকরা যদিও বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না তবু সংক্ষেপে বলি। দরওয়ান আসিল, সরকার আসিল, ঝি আসিল ও মালী আসিয়া "অবধান" করিল যে আমরা যে চোর তাহা সে প্রথম হইতেই অবগত আছে। মৌখিক লাঞ্ছনা আমাদের জন্য আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট রহিল না। বাকী রহিল কেবল "ধনঞ্জয়ের পালা। তাহার

উদ্যোগ পর্ব্বও বেশ জমিয়া উঠিতেছিল। দারোয়ান বাবাজী, শিকারী বিড়ালের মত, যত্নরক্ষিত, গোপ জোড়াটির দুই প্রান্ত বেশ করিয়া চাড়া দিয়া--"শীকারের উপর পড়ি পড়ি ভাবে" থাবাটা গুছাইয়া লইয়া মুনিবের ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছিল। আর আমরা তিনটি কৃষ্ণের জীব সেই ভাবী কোমলস্পর্শ সুখের—কল্পনায় অষ্টমী পূজার বলির মত প্রতি মুহূর্ত্তে শিহরিয়া উঠিতেছিলাম আর ভাবিতেছিলাম, হায় কপালের লেখা! এমন সময়—কে ডাকিল—"বা-বা! সে কণ্ঠে কি ব্যাকুলতা, সে স্বরে কি আর্দ্রতা, চাহিয়া দেখি, সম্মুখে উচ্চ বাতায়নে যেন লক্ষ্মীস্বরূপিনী বরাভয় দায়িনী, সাক্ষাৎ স্নেহ-প্রতিমাখানির মত দাঁড়াইয়া,বিজলি! বিজলি করুণ-নয়নে,বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ গৃহস্বামীর পানে চাহিয়া ডাকিতেছে-- বা-বা! সে সম্বোধনে কি ছিল কে জানে,কিন্তু কে যেন সহসা আগুনে জল ঢালিয়া দিল—বৃদ্ধের তখনকার সেই ভীমমূর্ত্তি—সহসা কান্তরূপ ধারণ করিল—কে, মা,বিজলি,—বলিয়া বৃদ্ধ বিজলির দিকে চাহিলেন—চোখে চোখে কি কথা হইল জানি না—বৃদ্ধ তখন কড়ি কোমল কণ্ঠে "জানে-দেও" বলিয়া আমাদের দিকে কুটিলনেত্রে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেলেন। তখন সংস্কৃত, ইংরাজি, বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী, উড়িয়া ইত্যাদি তৃণগুল্ম নানা ভাষার অভিধানভুক্ত ও অভিধান বহির্ভূত নানাবিধ গালি খাইতে খাইতে, গোধুলি লগ্নে আমরা তিনবন্ধু বৃষ্টিধারাসিক্ত কুকুরের ন্যায় বিনম্রবদনে "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" ভাবে বাগানের কণ্টক দিয়া বিনিষ্ক্রান্ত হইলাম।

তথা হইতে কৃষ্ণনগরের বাটি প্রায় সাত মাইল, কিন্তু এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম কালীন, দুই একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা ব্যতিরেকে আমরা আর কোনওরূপ বাক্যালাপ করি নাই। তবে নির্লজ্জ বিজয় নাকি কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার পাত্র নহে, তাই সে আপন-মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল।

"অমিয় সাগরে, সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।"

৪

এই ঘটনার প্রায় ১ মাস পরে কলিকাতা হইতে বাবার একখানি পত্র পাইলাম। গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হইবার কয়েকদিন দেরি থাকিলেও কোনও জরুরি কার্য্যোপলক্ষে শীঘ্র কলিকাতায় আসিবার জন্ত বাবা লিখিয়াছেন।

কলিকাতায় যাইয়া শুনিলাম সপ্তাহান্তে ২রা বৈশাখ আমার শুভবিবাহ। কন্যাপক্ষ কলিকাতাতেই বাসা ভাড়া করিয়া আছেন, সুতরাং বিবাহ কলিকাতাতেই হইবে।

আমাদের আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল না। সুতরাং একমাত্র পুত্রের বিবাহে বাবা যথেষ্টই আয়োজনাদি করিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সন্ধ্যায় মহাসমারোহে চৌতুড়ী চড়িয়া যোড়াসাঁকোর কন্যার বাটিতে বিবাহ করিতে চলিলাম।

দ্বারের নিকট গাড়ী আসিবামাত্র আমার মাথাটা কেমন ঘুরিয়া গেল। সম্মুখেই সেই বাগানের উড়ে মালী গোলাপী রঙ্গে ছোপান পোষাক পরিয়া আমার দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দণ্ডায়মান (বোধহয় ভাবিতেছে এ আবার কি চুরী করিতে এল), আর তৎপশ্চাতে হরিবাবু অতি ব্যস্তভাবে অন্দর মহলের দিকে ছুটিতেছেন। তবে—অ্যাঁ! তাই কি! ভগবতি ভবিতব্যতে! সত্যই তাই কি!

স্পন্দিত বক্ষে বরসভায় প্রবেশ করিলাম। নানাবিধ বয়সের নানাবিধ ব্যক্তি নানাবিধ কথা কহিতেছিল, আমার কিন্তু কোনও দিকেই দৃষ্টি ছিল না। একই কথা সমস্ত অন্তঃকরণটাকে বিক্ষোভিত করিতেছিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে হরিবাবু সভায় প্রবেশ করিয়া কহিলেন "তাহা হইলে মহাশয়দের অনুমতি হয় ত আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে পাত্রস্থ করি।"

এ আবার কি হইল? "ভ্রাতুষ্পুত্রী" আবার কে? তবে কি নিষ্ঠুরা অদৃষ্টদেবী আমায় লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন? আপন মুণ্ডটা শত খণ্ড করিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল।

স্ত্রী আচারের সময় আমার সব ধোঁয়া ধোঁয়া বোধ হইতেছিল। দৃষ্টিটা কি একটা অজ্ঞাত প্রত্যাশায় একবার চারিদিক ঘুরিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। এমন সময় কে বলিল "চোখ চাও, শুভদৃষ্টি কর।" যন্ত্র পরিচালিতবৎ সম্মুখে দৃষ্টি তুলিবামাত্র শরীরে যেন একটা তাড়িত তরঙ্গের হিল্লোল বহিয়া গেল। —এ চোখদুটা ত ভুলিবার নহে! অদৃষ্টদেবীর রঙ্গ তবে কি এখনও ফুরায় নাই!

বাসর ঘরে কথা প্রসঙ্গে জানিলাম যে বিজলীর পিতা হরিবাবুর খুড়তুতা ভাই ছিলেন। কিন্তু বিজলী অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায়, বিপত্নীক ও নিঃসন্তান হরিবাবু তাহাকে কন্যাস্থানীয়া করিয়া পালন করিয়াছেন। আরও একটা সংবাদ পাইলাম। আমাদের সেই বাগানের মধ্যে বিড়ম্বনার দিন, হরিবাবু, আমরা কে এবং কি উদ্দেশ্যে গিয়াছিলাম, তাহা অনুসন্ধানার্থ আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ লোক পাঠাইয়াছিলেন। বাকি ব্যাপারটা আমার আত্মীয় স্বজন প্রশংসিত মেধার সাহায্যে একরূপ আন্দাজ করিয়া লইলাম।

৫

পরদিন প্রত্যূষে অন্দর হইতে বহির্বাটিতে আসিয়া দেখিলাম বৈঠকখানার এক পার্শ্বে শ্রীশ ও বিজয়ে তুমুল তর্ক বাধিয়া গিয়াছে। শ্রীশচন্দ্র ইচ্ছাশক্তি, জন্মান্তর রহস্য, প্রাক্তন-সংস্কার, ছায়া পূর্ব্বগামিনী ইত্যাদি নানা কথার অবতারণা করিয়া আমার এই বিবাহ ও পূর্ব্ব সাক্ষাৎ বিষয়ে একটা বৈজ্ঞানিক সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করিতেছে। বিজয় কিন্তু ওসকল কিছুই মানিতে চাহে না। তাহার মতে এ সমুদয় কেবল আমার "নির্জ্জলা বজ্জাতি।" সে বলে "আরে রেখে দাও তোমার থিওসফি! আসল কথাটা এই যে বাবু কোনও রকমে সম্বন্ধের কথাটা টের পেয়েছিলেন। তাই আগে একবার কনে দেখবার জন্যে আমাদের শুদ্ধ ছল করে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। উঃ, কি প্রচণ্ড গালাগালটাই খাইয়েছিল। সাত দিন মশায়, গায়ের ব্যথা মরে নি।"

মূর্খের সহিত তর্ক করিয়া ত কোনও ফল নাই, কাজেই চুপ করিয়া রহিলাম। তবে আমি যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ তাহা আশা করি আপনারা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু আমি হাসিয়া উড়াইলে কি হয়, বন্ধু আমার সুযোগ পাইলেই আমায় "ভিজা বিড়াল" "জিলেপির প্যাঁচ" প্রভৃতি শ্লেষবাক্য ও সঙ্গে সঙ্গে "অপচয়ে ঠ্যাঙ," "লাভে ব্যাঙ," "এক যাত্রায় পৃথক ফল" প্রভৃতি বিদ্রূপবাণে জরজর করিয়া দিতেন—কিন্তু কি করি বলুন

পেটে খেলে পিঠে সয়—বিশেষত "সবই বিফল পরিশ্রমে-শ্রান্ত পৌটিকমহাশয়ও অবশ্য কপালের লেখা",—একথাটা এই গল্প পাঠের মনে মনে স্বীকার করিবেন।

শ্রীমনোজমোহন বসু।

ফতেগড়ের মা কালী

শুনিলাম জাগ্রতা এ কালী! কিন্তু মাতা দয়াময়ী
নাহি চান পশুবলি—মার হিয়া হয় কি পাষাণ?
পত্র, পুষ্প, নারিকেল, ভক্তিভাবে যা কর প্রদান,
তাহাতেই হন আহা আনন্দিতা এ আনন্দময়ী!
অয়ি চণ্ডি! রণরঙ্গিণীর সাজে তুমি চিরজয়ী,
তবে কেন বিফলে মা করে শোভে শাণিত কৃপাণ?
লক্ লক্ লোল জিহ্বা মিছামিছি কেন লেলিহান?
পশুরক্তে জুড়াও পিপাসা আজি, চির তৃষ্ণাময়ি!
হের এই পুষ্ট কাম-ছাগে! জয়কালি! জয়কালি!
দুষ্ট ক্রোধ-মহিষেরে বাঁধিয়াছি যূপকাষ্ঠে আজি;
খড়্গ দিয়া কাটি পাড়ি, দিতেছি মা ও চরণে ডালি!
রক্ত বহে—পান কর, পান কর, রণচণ্ডী সাজি!
লোভাসুর নৃত্য করে, মাগো হের এ হৃদয়-মাঝে;
কাট তারে—রক্তপান-পরিহার তোমার কি সাজে?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

হরিণী।

ফাঁদে পড়ি মৃগ কয়, ব্যাধে নাহি করি ভয়,
যদি সে শুনায় বাঁশি বধিবারো কালে।
শুধু ব্যথা বাজে প্রাণে, কেন সে সঙ্গীত খানে?
যার মোহে পশিলাম হেন মায়াজালে।

শ্রীপ্রেমানন্দ গুপ্ত।

ভারত মহিলা

তৃতীয় বর্ষ।

শ্রীমতী সরযূবালা দত্ত-সম্পাদিত উৎকৃষ্ট স্ত্রীপাঠ্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা। বৈশাখে (১৩১৪) তৃতীয় বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিমাসে তিন চারিখানা সুন্দর স্বতন্ত্র মুদ্রিত হাফ্‌টোন্ ছবি যাইতেছে। ভারত-মহিলার লেখকলেখিকাগণ :—

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী, মানকুমারী, কামিনী রায় বি, এ, মিসেস্ আর, এস, হোসেন, লাবণ্যপ্রভা বসু, হেমলতা দেবী, রাজকুমারী দাস এম, এ, সরোজকুমারী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ, কুমুদিনী মিত্র, বি, এ, প্রভৃতি সুলেখিকাগণ; এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, হরিদেব শাস্ত্রী, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র (সঞ্জীবনী সম্পাদক) রজনীকান্ত গুহ এম্. এ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, প্রভৃতি বহু সুলেখক। ইঁহাদের সকলের লেখা ভারত-মহিলায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক সাহিত্য-সম্পাদক সাহিত্যে লিখিয়াছেন :—

ভারত মহিলার কল্যাণকরে ভারতমহিলার সৃষ্টি। সম্পাদিকা অল্পদিনের মধ্যে লক্ষ্যের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। প্রথম বৎসরেই "ভারতমহিলা" প্রবন্ধ-সম্পদে যেরূপ গৌরবান্বিত হইয়াছেন, নূতন মাসিকের অদৃষ্টে সেরূপ সৌভাগ্য প্রায় ঘটে না। • • সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, সম্পাদিকার সাহিত্য-সাধনা সফল হউক। ভারতমহিলা বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বিরাজ করুক।

প্রবাসী বলেন :—এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রখানি বঙ্গনারীগণের জন্য গত (১৩১২) ভাদ্রমাস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বেশ ভাল লেখা থাকে। সম্পাদন কার্য্যও বেশ হইতেছে।

বসুমতী বলেন :—এই মাসিক পত্রিকাখানি বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হই-তেছে। মহিলাপরিচালিত এই পত্রিকাখানি ক্রমেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

সুকবি মানকুমারী বসু—(সম্পাদিকার নিকট লিখিত পত্রে)—আপনার ভারত-মহিলা আমাদের গৌরবের সামগ্রী বটে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ দুই টাকা চারি আনা মাত্র। নমুনা চারি আনা। বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয় না।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত।

কার্য্যালয়, ২১০।৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেবীযুদ্ধ (মহাকাব্য)

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, প্রণীত।

আকার ডিমাই ৮ পেজী ২৬৭ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০ মাত্র।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এ,—"আপনার শক্তি আছে এবং আপনি সেই শক্তি যথাপথে সঞ্চালিত করিয়াছেন। * * আপনার দেবীযুদ্ধ পড়িতে আমরা যেন মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত হই। এমন প্রগাঢ় অথচ প্রাঞ্জল ভাব—আজি কালি আর ত দেখিতে পাই না।"

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বীরেশ্বর পাড়ে—"দেবীযুদ্ধ পাঠ করিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি, কোন পদ্যগ্রন্থই আমি এরূপ আগ্রহের সহিত পাঠ করি নাই। মনোযোগ সহ পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। * * ইহার মধ্যে এমন সকল বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে যে তাহা পড়িলে মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়।"

বসুমতী, ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩০৮—"পুস্তকখানি পাঠ না করিলে কেবল সমালোচনায় ইহার মাধুর্য্য বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। * * লেখকের আন্তরিকতা পুস্তক খানির আদ্যোপান্ত সর্ব্বত্র মন্ত্র-শক্তিবৎ প্রসারিত রহিয়াছে; পাঠ করিতেই হইবে, আর পাঠ করিতে করিতে গ্রন্থকারের ক্ষমতা, কল্পনাশক্তি ও দূরদর্শনের প্রভূত পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দান না করিয়া থাকা যায় না। এক কথায় দেবীযুদ্ধ অধঃপতিতের জাতীয় জীবনের ইতিহাস; এক সুমহৎ নৈতিক সত্য সমগ্র গ্রন্থের মেরুদণ্ড স্বরূপ অবস্থান করিতেছে। ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পতনের কাহিনী উজ্জ্বল ভাষায় দৃষ্টান্ত সহকারে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে কি এ অপূর্ব্ব গ্রন্থের আদর হইবে? তবে একথা নিশ্চয়, যাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিবেন, তাঁহারাই পরিতৃপ্ত হইবেন।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন পণ্ডিতরাজ—* * সংস্কৃত রত্নাবলী নাটিকার মত এই দেবীযুদ্ধই অনন্তকালের জন্য এই মরজগতে ইহাঁর অমর যশঃ বিঘোষিত করিবে। * * দেবীযুদ্ধের সরস্বতীর বীণা ক্রমে ক্রমে উঠিতে উঠিতে শেষে একেবারে সপ্তমে উঠিয়া ধীরে ধীরে জগৎকে ব্রহ্মজ্ঞানের শিক্ষা দিতেছে। এই জন্যই দেবীযুদ্ধের প্রশংসা, * * দেবীযুদ্ধের প্রতিপাদ্য বুঝাইতে শরচ্চন্দ্রের কবিতা সমর্থ হইয়াছে। শরচ্চন্দ্রের কণ্ঠে আধুনিক কবিদিগের মত জড়তা নাই। * * আহ্লাদের বিষয়, যদৃচ্ছাবশতঃ আমি এই কাব্যের যখন যে অংশ পড়িয়াছি, তাহাতে চেষ্টা করিয়াও ছন্দোদোষ দেখি নাই, * * এই এই কারণে আমি দেবীযুদ্ধের পক্ষপাতী, এই এই কারণে আমি বলিতেছি, দেবীযুদ্ধের ন্যায়,—বর্ত্তমান যুগের বঙ্গভাষায় দেবীযুদ্ধের ন্যায় অদ্যাপি কোন কাব্য লিখিত হয় নাই। আমার মতে আধুনিক কবিদিগের মধ্যে বেদবেদান্ত বিশ্বাসী, দেবদেবীতে বিশ্বাসী, মাতৃপিতৃপূজক শরচ্চন্দ্র উচ্চাসন অধিরোহণে অধিকারী। * *" (হিন্দুরঞ্জিকা, ৯ই ভাদ্র, ১৩১০)

বিবিধ পুস্তক।

শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ ঘোষ—পরিণয় কাহিনী ১৲, বাঁধাই ১।০, সয়মায় সুখ ১৲, বাঁধাই ১।০।

,, মহেশচন্দ্র পাল প্রকাশিত—সচিত্র দশমহাবিদ্যা সুলভ মূল্য ২॥০, হরিবংশ উৎকৃষ্ট সংস্করণ সুলভ মূল্য ২৲

,, সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারণ্য—কবিতাকুসুমাঞ্জলি ।৶০

,, শশীভূষণ সিদ্ধান্ত প্রণীত—অধ্যাত্ম চণ্ডী ॥০

,, ব্রজগোপাল সিংহ প্রণীত—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৲, ঐ বাঁধাই (উপহার) ব্রহ্মতেজ ১

,, ষোড়শীমোহন আচার্য্য—ভুবানল উপন্যাস ।৶০

Musnud of Murshidabad ৩॥৶০

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—ঝঙ্কার (কাব্য) ৸৶০, লহরী (উপাখ্যান) ॥০
তাপসকুমার ৸০

,, যদুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত—রাজা সীতারাম রায়ের জীবনী ১।০, নির্ম্মলা (সামাজিক উপন্যাস) ১৲, সুশীলা ও সরলা ॥০, কর্ম্মবীর ॥০, কালাপাহাড় (উপন্যাস) ১॥০।

,, সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রকাশিত—বাধা (স্বদেশ কবিতা)

শ্রীমতী সুশীলা দেবী প্রণীত—সাধনা (ঐ) ৸০

প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—দেবসঙ্গীত ।৶০

,, প্রতাপচন্দ্র মিত্র প্রণীত—লেখা (স্বদেশী কবিতা) ১৲, ঐ বাঁধাই ১।০

পরমহংস শ্রীশিবনারায়ণ স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত ১।০, সায়নিত্য ক্রিয়া ।৶০

শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র প্রণীত—শিশুর বলিদান ৶০, মেরী কার্পেণ্টার ।০

শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত প্রণীত মহারাজ রাজবল্লভ সেন ও তৎসমকালবর্ত্তী বাঙ্গালার ইতিহাসের স্থূল স্থূল বিবরণ ১৲, নবীন জাপান ॥০

পণ্ডিত শ্রীলালমাধব বিদ্যানিধি প্রণীত—কার্য্য নির্ণয় ১।০, ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা ১।০, মেঘদূত সংস্কৃত ১৲, ঐ ইংলিষ ট্র্যান্সলেসন ঐ ॥০

শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দাস— জ্যোতি উপন্যাস বাঁধাই ১।০

,, ভূপেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রণীত—ভবনামালা বাঁধাই ১৸৶০

,, সুবোধচন্দ্র রায় প্রণীত—দুর্গালীলা তরঙ্গিণী ১৲
নূতন শিশুপাঠ্য কবিতা (উৎকৃষ্ট বাঁধাই—) মূল্য ৸০

,, হেমচন্দ্র সরকার, এম, এ প্রণীত—মাতাপুত্র ।০

,, সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত—দেশের কথা নূতন সংস্করণ ৸০, ঐ রাজসংস্করণ ১॥৶, ঝাঁন্সির রাজকুমার—॥০, বাজীরাও নূতন সংস্করণ—।০, ঐ—বাঁধাই ৸০, আনন্দীবাই ॥০, কৃষকের সর্ব্বনাশ ৶০।

মজুমদার লাইব্রেরি, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নূতন সামাজিক উপন্যাস

"উড়িষ্যার চিত্র" প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ, বি, এ, প্রণীত

ধ্রুবতারা।

বান্ধব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর বলেন :—

"আপনার ধ্রুবতারা বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি অত্যুজ্জল তারারূপে ধ্রুবস্থান পাইবে।"

ভক্ত কবি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন বলেন :—

"তোমার পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ পর্য্যন্ত না পড়িয়া থাকা যায় না। বর্ণনীয় বিষয়গুলি এরূপ সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত, যেন—"উন্মীলিতং তুলিকয়েব চিত্রম্"......তোমার গ্রন্থ কয়খানি পুণ্য ক্ষেত্রের সুন্দর পথপ্রদর্শক, যাত্রীকে সরল ও সুশোভন পথ দিয়া গন্তব্য স্থানে, উপনীত করে। তোমার হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা ও রচনার গুণে ঘটনাগুলি ঠিক যেন সম্মুখে প্রতিভাত হয়।"

The Amrit Bazar Patrika says :—" * * The fact is, the author is a powerful writer, and he can make even his common place dialogues interesting and instructive. This is because, he has thought, imagination and powers of observation. Add to this his descriptions which are always natural and are sometimes sublime. Thus the death scene of Bonalata is one of the finest we have seen in any language......In the end let us observe that the author deserves a foremost plalce in the ranks of our novelists. Bankim Chandra's language is possibly better but our author is more natural. Bankim Chandra wrote to create effect but our author seems not aware what effect his writing would produce. We are unlucky in our novel writers. Bankim Chandra showed the way of copying European masters and most of those who have succeeded him, have followed the same path. But our author's conception is original and what we like most in the book is its religious tone."

কবিবর শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র, এম,এ, সি,এস, ডিষ্ট্রিক্ট জজ—লিখিয়াছেন :—

"Allow me to heartily congratulate you on your ধ্রুবতারা in which you have succeeded in producing a book which is at once eminently readable suggestively instructive and artistically meritorious. Every page has its interest apart from the scheme of the work which carries one along with the easy and restful glide of a barge on calm waters...you need not be surprised to hear that I practically finished reading the whole book at one sitting. Only a few pages remained over. The book is a series of pictures each accurately and dramatically fitted in showing powers of observation and expression—observation imaginatively sympathetic and expression full of simple pathos and earnestness—there is pathos even where fun is the outward garb......"

JARRAH WOOD.

New consignment just arrived 2.500 tons scantlings good assortment. Sizes and lengths for building purposes. Price list and Sample on application. As good as teak but cheaper. Jarrah and Karri wood (1902) Ces.

AGENT—

GILLANDARS ARBUTHNOT & CO.

CLIVE STREET, CALCUTTA.

ফাল্গুন। একাদশ সংখ্যা।

বঙ্গদর্শন।

[নব পর্য্যায়]

সপ্তম বর্ষ।

এস্, মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

২০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ দিনময়ী প্রেসে,

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৪

বঙ্গদর্শন—৭ম বর্ষ, ১৩১৪।

পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে সভাপতি রবীন্দ্রবাবুর বক্তৃতা শীঘ্র পাঠ করিবার জন্য পাঠক মহাশয়গণ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায়, অদ্য ২৮শে মাঘ সভাধিবেশনের দিনেই ফাল্গুনের বঙ্গদর্শন বাহির করিতে বাধ্য হইলাম। যাঁহারা বঙ্গদর্শনের গ্রাহক নন, এমন অনেকেই এ সংখ্যা বঙ্গদর্শন কম মূল্যে দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের সে অনুরোধ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলাম বটে, তথাপি তাঁহাদের যাহাতে পড়িবার অসুবিধা না হয়, এজন্য আমরা সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে অধিকাংশ সংবাদ পত্রাদিতে এ প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিবার জন্য অদ্যই সকল স্থানে বঙ্গদর্শন পাঠাইলাম।

বঙ্গদর্শনের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০ ভিঃ পিতে ৩৷৶০ লাগে গত ছয় বৎসরের বঙ্গদর্শন সম্পূর্ণ পাওয়া যায়, প্রতিখণ্ড বাঁধাই ৪৲।

ম্যানেজার, বঙ্গদর্শন।

বঙ্গদর্শন।

দুঃখ।

জগৎসংসারের বিধান সম্বন্ধে যখনি আমরা ভাবিয়া দেখিতে যাই তখনি, এ বিশ্বরাজ্যে দুঃখ কেন আছে, এই প্রশ্নই সকলের চেয়ে আমাদিগকে সংশয়ে আন্দোলিত করিয়া তোলে। আমরা কেহবা তাহাকে মানবপিতামহের আদিম পাপের শাস্তি বলিয়া থাকি—কেহবা তাহাকে জন্মান্তরের কর্ম্মফল বলিয়া জানি—কিন্তু তাহাতে দুঃখ ত দুঃখই থাকিয়া যায়।

না থাকিয়া যে জো নাই। দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব যে একেবারে একসঙ্গে বাঁধা। কারণ, অপূর্ণতাই ত দুঃখ এবং সৃষ্টিই যে অপূর্ণ।

সেই অপূর্ণতাই বা কেন? এটা একবারে গোড়ার কথা। সৃষ্টি অপূর্ণ হইবে না, দেশে কালে বিভক্ত হইবে না, কার্য্যকারণে আবদ্ধ হইবে না, এমন সৃষ্টিছাড়া আশা আমরা মনেও আনিতে পারি না।

অপূর্ণের মধ্য দিয়া নহিলে পূর্ণের প্রকাশ হইবে কেমন করিয়া?

উপনিষৎ বলিয়াছেন যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহারই অমৃত আনন্দরূপ। তাঁহার মৃত্যুহীন ইচ্ছাই এই সমস্ত রূপে ব্যক্ত হইতেছে।

ঈশ্বরের এই যে প্রকাশ, উপনিষৎ ইহাকে তিন ভাগ করিয়া দেখিয়াছেন। একটি প্রকাশ জগতে, আর একটি প্রকাশ মানবসমাজে, আর একটি প্রকাশ মানবাত্মায়। একটি শান্তং, একটি শিবং, একটি অদ্বৈতং।

শান্তম্ আপনাতেই আপনি স্তব্ধ থাকিলে ত প্রকাশ পাইতেই পারেন না;—এই যে চঞ্চল বিশ্বজগৎ কেবলি ঘুরিতেছে, ইহার প্রচণ্ড গতির মধ্যেই তিনি অচঞ্চল নিয়মস্বরূপে আপন শান্তরূপকে ব্যক্ত করিতেছেন। শান্ত এই সমস্ত চাঞ্চল্যকে বিধৃত করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি শান্ত, নহিলে তাঁহার প্রকাশ কোথায়!

শিবম্ কেবল আপনাতেই আপনি স্থির থাকিলে তাঁহাকে শিবই বলিতে পারি না। সংসারে চেষ্টা ও দুঃখের সীমা নাই, সেই কর্ম্মক্লেশের মধ্যেই অমোঘ মঙ্গলের দ্বারা তিনি আপনার শিবস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। মঙ্গল, সংসারের সমস্ত দুঃখ তাপকে অতিক্রম করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি মঙ্গল, তিনি ধর্ম্ম, নহিলে তাঁহার প্রকাশ কোথায়?

অদ্বৈত যদি আপনাতে আপনি এক হইয়া থাকিতেন তবে সেই ঐক্যের প্রকাশ হইত কি করিয়া? আমাদের চিত্ত সংসারে আপন পরের

ভেদবৈচিত্র্যের দ্বারা কেবলি আহত প্রতিহত হইতেছে; সেই ভেদের মধ্যেই প্রেমের দ্বারা তিনি আপনার অদ্বৈতস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। প্রেম যদি সমস্ত ভেদের মধ্যেই সম্বন্ধ স্থাপন না করিত তবে অদ্বৈত কাহাকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেন?

জগৎ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা চঞ্চল, মানবসমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট, এবং আমাদের আত্মবোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমরা আত্মাকে এবং অন্য সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই জানি। কিন্তু সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেই শান্তি, দুঃখচেষ্টার মধ্যেই সফলতা এবং বিভেদের মধ্যেই প্রেম।

অতএব এ কথা মনে রাখিতে হইবে পূর্ণতার বিপরীত শূন্যতা; কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে, তাহা পূর্ণতারই বিকাশ। গান যখন চলিতেছে যখন তাহা সমে আসিয়া শেষ হয় নাই তখন তাহা সম্পূর্ণ গান নহে বটে কিন্তু তাহা গানের বিপরীতও নহে, তাহার অংশে অংশে সেই সম্পূর্ণ গানেরই আনন্দ তরঙ্গিত হইতেছে।

এ নহিলে রস কেমন করিয়া হয়? রসো বৈ সঃ। তিনিই যে রসস্বরূপ। অপূর্ণকে প্রতি নিমেষেই তিনি পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন বলিয়াই ত তিনি রস। তাঁহাতে করিয়া সমস্ত ভরিয়া উঠিতেছে, ইহাই রসের আকৃতি, ইহাই রসের প্রকৃতি। সেই জন্যই জগতের প্রকাশ আনন্দরূপমমৃতং—ইহাই আনন্দের রূপ, ইহা আনন্দের অমৃত রূপ।

সেই জন্যই এই অপূর্ণ জগৎ শূন্য নহে, মিথ্যা নহে। সেই জন্যই এ জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, ঘ্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন্ অনির্ব্বচনীয়তায় নিমগ্ন করিয়া দিতেছে। সেই জন্য আকাশ কেবল মাত্র আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া নাই তাহা আমাদের হৃদয়কে বিস্ফারিত করিয়া দিতেছে; আলোক কেবল আমাদের দৃষ্টিকে সার্থক করিতেছে না তাহা আমাদের অন্তঃকরণকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং যাহা কিছু আছে তাহা কেবল আছে মাত্র নহে, তাহাতে আমাদের চিত্তকে চেতনায়, আমাদের আত্মাকে সত্যে সম্পূর্ণ করিতেছে।

যখন দেখি শীতকালের পদ্মার নিস্তরঙ্গ নীলকান্ত জলস্রোত পীতাভ বালুতটের নিঃশব্দ নির্জ্জনতার মধ্যদিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতেছে—তখন কি বলিব, এ কি হইতেছে! নদীর জল বহিতেছে এই বলিলেই ত সব বলা হইল না—এমন কি, কিছুই বলা হইল না। তাহার আশ্চর্য্য শক্তি ও আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের কি বলা হইল! সেই বচনের অতীত পরম পদার্থকে সেই অপরূপ রূপকে, সেই ধ্বনিহীন সঙ্গীতকে, এই জলের ধারা কেমন করিয়া এত গভীরভাবে ব্যক্ত করিতেছে। এ ত কেবলমাত্র জল ও মাটি—"মৃৎপিণ্ডো জলরেখয়া বলয়িতঃ;"—কিন্তু যাহা প্রকাশ হইয়া উঠিতেছে তাহা কি! তাহাই আনন্দরূপমমৃতম্ তাহাই আনন্দের অমৃতরূপ।

আবার কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়েও এই নদীকে দেখিয়াছি। বালি উড়িয়া সূর্য্যাস্তের রক্তচ্ছটাকে পাণ্ডুবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে—কশাহত কালোঘোড়ার মসৃণ চর্ম্মের মত নদীর জল রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে—পরপারের স্তব্ধ তরুশ্রেণীর উপরকার আকাশে একটা নিঃস্পন্দ আতঙ্কের বিবর্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তারপরে সেই জলস্থল আকাশের

জালের মাঝখানে নিজের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মেঘ মধ্যে জড়িত আবর্ত্তিত হইয়া উন্মত্ত ঝড় একেবারে দিশাহারা হইয়া আসিয়া পড়িল সেই আবির্ভাব দেখিয়াছি। তাহা কি কেবল মেঘ এবং বাতাস, ধূলা এবং বালি, জল এবং ডাঙা? এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকরের মধ্যে এযে অপরূপের দর্শন। এই ত রস। ইহাত সুধু বীণার কাঠ ও তার নহে—ইহাই বীণার সঙ্গীত। এই সঙ্গীতেই আনন্দের পরিচয়—সেই আনন্দরূপমমৃতম্।

আবার মানুষের মধ্যে যাহা দেখিয়াছি তাহা মানুষকে কতদূরেই ছাড়াইয়া গেছে! রহস্যের অন্ত পাই নাই। শক্তি এবং প্রীতি কত লোকের এবং কত জাতির ইতিহাসে কত আশ্চর্য্য আকার ধরিয়া কত অচিন্ত্য ঘটনা ও কত অসাধ্যসাধনের মধ্যে সীমার বন্ধনকে বিদীর্ণ করিয়া ভূমাকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিয়াছে। মানুষের মধ্যে ইহাই আনন্দরূপমমৃতম্।

কে যেন বিশ্বমহোৎসবে এই নীলাকাশের মহাপ্রাঙ্গণে অপূর্ণতার পাত পাড়িয়া গিয়াছেন—সেইখানে আমরা পূর্ণতার ভোজে বসিয়া গিয়াছি। সেই পূর্ণতা কত বিচিত্ররূপে এবং কত বিচিত্র স্বাদে ক্ষণে ক্ষণে আমাদিগকে অভাবনীয় ও অনির্ব্বচনীয় চেতনার বিস্ময়ে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে।

এমন নহিলে রসস্বরূপ রস দিবেন কেমন করিয়া? এই রস অপূর্ণতার সুকঠিন দুঃখকে কানায় কানায় ভরিয়া তুলিয়া উছলিয়া পড়িয়া যাইতেছে। এই দুঃখের সোনার পাত্রটি কঠিন বলিয়াই কি ইহাকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া এতবড় রসের ভোজকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; না, পরিবেষণের লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিব হোক্ হোক্ কঠিন হোক্ কিন্তু ইহাকে ভরপূর করিয়া দাও, আনন্দ ইহাকে ছাপাইয়া উঠুক্?

জগতের এই অপূর্ণতা যেমন পূর্ণতার বিপরীত নহে কিন্তু তাহা যেমন পূর্ণতারই একটি প্রকাশ তেমনি এই অপূর্ণতার নিত্য সহচর দুঃখও আনন্দের বিপরীত নহে তাহা আনন্দেরই অঙ্গ। অর্থাৎ দুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দুঃখই নহে তাহা আনন্দ। দুঃখও আনন্দরূপমমৃতম্।

এ কথা কেমন করিয়া বলি? ইহাকে সম্পূর্ণ প্রমাণ করিবই বা কি করিয়া?

কিন্তু অমাবস্যার অন্ধকারে অনন্ত জ্যোতিষ্কলোককে যেমন প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি দুঃখের নিবিড়তম তমসার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আত্মা কি কোনোদিনই আনন্দলোকের ধ্রুবদীপ্তি দেখিতে পায় নাই—হঠাৎ কি কখনই বলিয়া উঠে নাই—বুঝিয়াছি, দুঃখের রহস্য বুঝিয়াছি,—আর কখনো সংশয় করিব না? পরম দুঃখের শেষ প্রান্ত যেখানে গিয়া মিলিয়া গেছে সেখানে কি আমাদের হৃদয় কোনো শুভমুহূর্ত্তে চাহিয়া দেখে নাই? অমৃত ও মৃত্যু, আনন্দ ও দুঃখ সেখানে কি এক হইয়া যায় নাই? সেইদিকেই কি তাকাইয়া ঋষি বলেন নাই "যস্যচ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম," অমৃত যাঁহার ছায়া এবং মৃত্যুও যাঁহার ছায়া তিনি ছাড়া আর কোন্ দেবতাকে পূজা করিব! ইহা কি তর্কের বিষয়, ইহা কি আমাদের উপলব্ধির বিষয় নহে? সমস্ত মানুষের অন্তরের মধ্যে এই উপলব্ধি গভীরভাবে আছে বলিয়াই মানুষ দুঃখকেই পূজা করিয়া

আসিয়াছে—আরামকে নহে। জগতের ইতিহাসে মানুষের পরমপূজ্যগণ দুঃখেরই অবতার, আরামে লালিত লক্ষ্মীর ক্রীতদাস নহে।

অতএব দুঃখকে আমরা দুর্ব্বলতাবশত খর্ব্ব করিব না, অস্বীকার করিব না, দুঃখের দ্বারাই আনন্দকে আমরা বড় করিয়া এবং মঙ্গলকে আমরা সত্য করিয়া জানিব।

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে অপূর্ণতার গৌরবই দুঃখ; দুঃখই এই অপূর্ণতার সম্পৎ, দুঃখই তাহার একমাত্র মূলধন। মানুষ সত্যপদার্থ যাহা কিছু পায় তাহা দুঃখের দ্বারাই পায় বলিয়াই তাহার মনুষ্যত্ব। তাহার ক্ষমতা অল্প বটে কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে ভিক্ষুক করেন নাই। সে শুধু চাহিয়াই কিছু পায় না, দুঃখ করিয়া পায়। আর যত কিছু ধন সে ত তাহার নহে—সে সমস্তই বিশ্বেশ্বরের—কিন্তু দুঃখ যে তাহার নিতান্তই আপনার। সেই দুঃখের ঐশ্বর্য্যেই অপূর্ণজীব পূর্ণস্বরূপের সহিত আপনার গর্ব্বের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছে, তাহাকে লজ্জা পাইতে হয় নাই। সাধনার দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে পাই, তপস্যার দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে লাভ করি—তাহার অর্থই এই, ঈশ্বরের মধ্যে যেমন পূর্ণতা আছে আমাদের মধ্যে তেমনি পূর্ণতার মূল্য আছে—তাহাই দুঃখ। সেই দুঃখই সাধনা, সেই দুঃখই তপস্যা, সেই দুঃখেরই পরিণাম আনন্দ; মুক্তি, ঈশ্বর।

আমাদের পক্ষ হইতে ঈশ্বরকে যদি কিছু দিতে হয় তবে কি দিব, কি দিতে পারি? তাঁহারই ধন তাঁহাকে দিয়া ত তৃপ্তি নাই—আমাদের একটিমাত্র যে আপনার ধন দুঃখধন আছে তাহাই তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হয়। এই দুঃখকেই তিনি আনন্দ দিয়া, তিনি আপনাকে দিয়া পূর্ণ করিয়া দেন—নহিলে তিনি আনন্দ ঢালিবেন কোন্‌খানে? আমাদের এই আপন ঘরের পাত্রটি না থাকিলে তাঁহার সুধা তিনি দান করিতেন কি করিয়া? এই কথাই আমরা গৌরব করিয়া বলিতে পারি। দানেই ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতা। হে ভগবান্‌, আনন্দকে দান করিবার, বর্ষণ করিবার, প্রবাহিত করিবার এই যে তোমার শক্তি ইহা তোমার পূর্ণতারই অঙ্গ। আনন্দ আপনাতে বদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ হয় না, আনন্দ আপনাকে ত্যাগ করিয়াই সার্থক—তোমার সেই আপনাকে দান করিবার পরিপূর্ণতা আমরাই বহন করিতেছি, আমাদের দুঃখের দ্বারা বহন করিতেছি, এই আমাদের বড় অভিমান; এইখানেই তোমাতে আমাতে মিলিয়াছি, এইখানেই তোমার ঐশ্বর্য্যে আমার ঐশ্বর্য্যে যোগ—এইখানে তুমি আমাদের অতীত নহ, এইখানেই তুমি আমাদের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছ; তুমি তোমার অগণ্য গ্রহসূর্য্যনক্ষত্রখচিত মহা সিংহাসন হইতে আমাদের এই দুঃখের জীবনে তোমার লীলা সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছ। হে রাজা, তুমি আমাদের দুঃখের রাজা; হঠাৎ যখন অর্দ্ধরাত্রে তোমার রথচক্রের বজ্রগর্জ্জনে মেদিনী বলির পশুর হৃৎপিণ্ডের মত কাঁপিয়া উঠে—তখন জীবনে তোমার সেই প্রচণ্ড আবির্ভাবের মহাক্ষণে যেন তোমার জয়ধ্বনি করিতে পারি,—হে দুঃখের ধন, তোমাকে চাহি না এমন কথা সেদিন যেন ভয়ে না বলি;—সেদিন যেন দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়—যেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়া তোমার উদ্দীপ্ত ললাটের দিকে দুই চক্ষু

তুলিয়া বলিতে পারি, হে দারুণ, তুমিই আমার প্রিয়।

আমরা দুঃখের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া অনেকবার বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি যে আমরা সুখদুঃখকে সমান করিয়া বোধ করিব। কোনো উপায়ে চিত্তকে অসাড় করিয়া ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে সেরূপ উদাসীন হওয়া হয়ত অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু সুখ দুঃখ ত কেবলি নিজের নহে, তাহা যে জগতের সমস্ত জীবের সঙ্গে জড়িত। আমার দুঃখবোধ চলিয়া গেলেই ত সংসার হইতে দুঃখ দূর হয় না।

অতএব, কেবলমাত্র নিজের মধ্যে নহে, দুঃখকে তাহার সেই বিরাট রঙ্গভূমির মাঝখানে দেখিতে হইবে যেখানে সে আপনার বহ্নির তাপে বজ্রের আঘাতে কত জাতি, কত রাজ্য, কত সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে; যেখানে সে মানুষের জিজ্ঞাসাকে দুর্গম পথে ধাবিত করিতেছে, মানুষের ইচ্ছাকে দুর্ভেদ্য বাধার ভিতর দিয়া উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতেছে এবং মানুষের চেষ্টাকে কোনো ক্ষুদ্র সফলতার মধ্যে নিঃশেষিত হইতে দিতেছে না; যেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ দুর্ভিক্ষমারী অন্যায় অত্যাচার তাহার সহায়; যেখানে রক্ত সরোবরের মাঝখান হইতে শুভ্র শান্তিকে সে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে, দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর তাপের দ্বারা শোষণ করিয়া বর্ষণের মেঘকে রচনা করিতেছে এবং যেখানে হলধরমূর্ত্তিতে সুতীক্ষ্ণ লাঙল দিয়া সে মানব হৃদয়কে বারম্বার শত শত রেখায় দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়াই তাহাকে ফলবান্ করিয়া তুলিতেছে। সেখানে সেই দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণকে পরিত্রাণ বলে না—সেই পরিত্রাণই মৃত্যু—সেখানে স্বেচ্ছায় অঞ্জলি রচনা করিয়া যে তাহাকে প্রথম অর্ঘ্য না দিয়াছে সে নিজেই বিড়ম্বিত হইয়াছে।

মানুষের এই যে দুঃখ ইহা কেবল কোমল অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন নহে ইহা রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত। বিশ্বজগতে তেজঃপদার্থ যেমন, মানুষের চিত্তে দুঃখ সেইরূপ; তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ; তাহাই চক্রপথে ঘুরিতে ঘুরিতে মানব সমাজে নূতন নূতন কর্ম্ম-লোক ও সৌন্দর্য্যলোক সৃষ্টি করিতেছে—এই দুঃখের তাপ কোথাও বা প্রকাশ পাইয়া কোথাও বা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মানব সংসারের সমস্ত বায়ু প্রবাহগুলিকে বহমান করিয়া রাখিয়াছে।

মানুষের এই দুঃখকে আমরা ক্ষুদ্র করিয়া বা দুর্ব্বল ভাবে দেখিব না। আমরা বক্ষ বিস্ফারিত ও মস্তক উন্নত করিয়াই ইহাকে স্বীকার করিব। এই দুঃখের শক্তির দ্বারা নিজেকে ভস্ম করিব না নিজেকে কঠিন করিয়া গড়িয়া তুলিব। দুঃখের দ্বারা নিজেকে উপরে না তুলিয়া নিজেকে অভিভূত করিয়া অতলে তলাইয়া দেওয়াই দুঃখের অবমাননা—যাহাকে যথার্থভাবে বহন করিতে পারিলেই জীবন সার্থক হয় তাহার দ্বারা আত্মহত্যা সাধন করিতে বসিলে দুঃখদেবতার কাছে অপরাধী হইতে হয়। দুঃখের দ্বারা আত্মাকে অবজ্ঞা না করি, দুঃখের দ্বারাই যেন আত্মার সম্মান উপলব্ধি করিতে পারি। দুঃখ ছাড়া সে সম্মান বুঝিবার আর কোনো পন্থা নাই।

কারণ, পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি দুঃখই জগতে একমাত্র সকল পদার্থের মূল্য। মানুষ যাহা কিছু নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহা দুঃখ দিয়াই

করিয়াছে। দুঃখ দিয়া যাহা না করিয়াছে তাহা তাহার সম্পূর্ণ আপন হয় না।

সেইজন্য ত্যাগের দ্বারা দানের দ্বারা তপস্যার দ্বারা দুঃখের দ্বারাই আমরা আপন আত্মাকে গভীররূপে লাভ করি—সুখের দ্বারা আরামের দ্বারা নহে। দুঃখ ছাড়া আর কোনো উপায়েই আপন শক্তিকে আমরা জানিতে পারি না। এবং আপন শক্তিকে যতই কম করিয়া জানি আত্মার গৌরবও তত কম করিয়া বুঝি যথার্থ আনন্দও তত অগভীর হইয়া থাকে।

রামায়ণে কবি রামকে সীতাকে লক্ষ্মণকে ভরতকে দুঃখের দ্বারাই মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। রামায়ণের কাব্যরসে মানুষ যে আনন্দের মঙ্গলময় মূর্ত্তি দেখিয়াছে দুঃখই তাহাকে ধারণ করিয়া আছে। মহাভারতেও সেইরূপ। মানুষের ইতিহাসে যত বীরত্ব যত মহত্ত্ব সমস্তই দুঃখের আসনে প্রতিষ্ঠিত। মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য দুঃখে, বীর্য্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে।

এই মূল্যটুকু ঈশ্বর যদি মানুষের নিকট হইতে হরণ করিয়া লইয়া যান, যদি তাহাকে অবিমিশ্র সুখ ও আরামের মধ্যে লালিত করিয়া রাখেন—তবেই আমাদের অপূর্ণতা যথার্থ লজ্জাকর হয়, তাঁহার মর্য্যাদা একেবারে চলিয়া যায়। তাহা হইলে কিছুকেই আর আপনার অর্জ্জিত বলিতে পারি না—সমস্তই দানের সামগ্রী হইয়া উঠে। আজ ঈশ্বরের শস্যকে কর্ষণের দুঃখের দ্বারা আমরা আমার করিতেছি, ঈশ্বরের পানীয় জলকে বহনের দুঃখের দ্বারা আমার করিতেছি, ঈশ্বরের অগ্নিকে ঘর্ষণের দুঃখের দ্বারা আমার করিতেছি। ঈশ্বর আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনের সামগ্রীকেও সহজে দিয়া আমাদের অসম্মান করেন নাই;—ঈশ্বরের দানকেও বিশেষরূপে আমাদের করিয়া লইলে তবেই তাহাকে পাই নহিলে তাহাকে পাই না। সেই দুঃখ তুলিয়া লইলে জগৎ সংসারে আমাদের সমস্ত দাবী চলিয়া যায়, আমাদের নিজের কোনো দলিল থাকে না;—আমরা কেবল দাতার ঘরে বাস করি, নিজের ঘরে নহে। কিন্তু তাহাই যথার্থ অভাব—মানুষের পক্ষে দুঃখের অভাবের মত এত বড় অভাব আর কিছু হইতেই পারে না।

উপনিষৎ বলিয়াছেন—স তপো হতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ। তিনি তপ করিলেন, তিনি তপ করিয়া এই যাহা কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। সেই তাঁহার তপই দুঃখরূপে জগতে বিরাজ করিতেছে। আমরা অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু সৃষ্টি করিতে যাই সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয়—আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া, সমস্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অমৃতত্বই মৃত্যুর সোপান অতিক্রম করিয়া। ঈশ্বরের সৃষ্টির তপস্যাকে আমরা এমনি করিয়াই বহন করিতেছি। তাঁহারই তপের তাপ নবনবরূপে মানুষের অন্তরে নব নব প্রকাশকে উন্মেষিত করিতেছে।

সেই তপস্যাই আনন্দের অঙ্গ। সেইজন্য আর একদিক দিয়া বলা হইয়াছে আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—আনন্দ হইতেই এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে। আনন্দ ব্যতীত সৃষ্টির এতবড় দুঃখকে বহন করিবে কে! কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। কৃষক চাষ করিয়া যে ফসল

ফলাইতেছে সেই ফসলে তাহার তপস্যা যত-বড়, তাহার আনন্দও ততখানি। সম্রাটের সাম্রাজ্যরচনা বৃহৎ দুঃখ এবং বৃহৎ আনন্দ, দেশভক্তের দেশকে প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা পরম দুঃখ এবং পরম আনন্দ—জ্ঞানীর জ্ঞান লাভ, এবং প্রেমিকের প্রিয় সাধনাও তাই।

খৃষ্টান শাস্ত্রে বলে ঈশ্বর মানবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদনার ভার বহন ও দুঃখের কণ্টক কিরীট মাথায় পরিয়াছিলেন। মানুষের সকল প্রকার পরিত্রাণের একমাত্র মূল্যই সেই দুঃখ। মানুষের নিতান্ত আপন সামগ্রী যে দুঃখ, প্রেমের দ্বারা তাহাকে ঈশ্বরও আপন করিয়া এই দুঃখসঙ্গমে মানুষের সঙ্গে মিলিয়াছেন—দুঃখকে অপরিসীম মুক্তিতে ও আনন্দে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন—ইহাই খৃষ্টানধর্ম্মের মর্ম্মকথা।

আমাদের দেশেও কোনো সম্প্রদায়ের সাধকেরা ঈশ্বরকে দুঃখদারুণ ভীষণ মূর্ত্তির মধ্যেই মা বলিয়া ডাকিয়াছেন। সে মূর্ত্তিকে বাহ্যতঃ কোথাও তাঁহারা মধুর ও কোমল, শোভন ও সুখকর করিবার লেশমাত্র চেষ্টা করেন নাই। সংহার রূপকেই তাঁহারা জননী বলিয়া অনুভব করিতেছেন। এই সংহারের বিভীষিকার মধ্যেই তাঁহারা শক্তি ও শিবের সম্মিলন প্রত্যক্ষ করিবার সাধনা করেন।

শক্তিতে ও ভক্তিতে যাহারা দুর্ব্বল, তাহারাই কেবল সুখস্বাচ্ছন্দ্য শোভাসম্পদের মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতে চায়। তাহারা বলে ধনমানই ঈশ্বরের প্রসাদ, সৌন্দর্য্যই ঈশ্বরের মূর্ত্তি, সংসারসুখের সফলতাই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ এবং তাহাই পুণ্যের পুরস্কার। ঈশ্বরের দয়াকে তাহারা বড়ই সকরুণ, বড়ই কোমলকান্ত রূপে দেখে। সেই জন্যই এই সকল দুর্ব্বলচিত্ত সুখের পূজারিগণ ঈশ্বরের দয়াকে নিজের লোভের, মোহের ও ভীরুতার সহায় বলিয়া ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত করিয়া জানে।

কিন্তু হে ভীষণ, তোমার দয়াকে তোমার আনন্দকে কোথায় সীমাবদ্ধ করিব? কেবল সুখে, কেবল সম্পদে, কেবল জীবনে, কেবল নিরাপদ নিরাতঙ্কতায়? দুঃখ, বিপদ, মৃত্যু ও ভয়কে তোমা হইতে পৃথক করিয়া তোমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া জানিতে হইবে? তাহা নহে। হে পিতা তুমিই দুঃখ, তুমিই বিপদ, হে মাতা, তুমিই মৃত্যু তুমিই ভয়। তুমিই ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং। তুমিই

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণোঃ।

সমগ্র লোককে তোমার জ্বলৎবদনের দ্বারা গ্রাস করিতে করিতে লেহন করিতেছ—সমস্ত জগৎকে তেজের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া হে বিষ্ণু তোমার উগ্রজ্যোতি প্রতপ্ত হইতেছে।

হে রুদ্র, তোমারই দুঃখরূপ, তোমারই মৃত্যুরূপ দেখিলে আমরা দুঃখ ও মৃত্যুর মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমাকেই লাভ করি। নতুবা ভয়ে ভয়ে তোমার বিশ্বজগতে কাপুরুষের মত সঙ্কুচিত হইয়া বেড়াইতে হয়—সত্যের নিকট নিঃসংশয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারি না। তখন দয়াময় বলিয়া ভয়ে তোমার নিকটে দয়া চাহি—তোমার কাছে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনি—তোমার হাত হইতে

আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য তোমার কাছে ক্রন্দন করি।

কিন্তু হে প্রচণ্ড, আমি তোমার কাছে সেই শক্তি প্রার্থনা করি যাহাতে তোমার দয়াকে দুর্ব্বলভাবে নিজের আরামের, নিজের ক্ষুদ্রতার উপযোগী করিয়া না কল্পনা করি—তোমাকে অসম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া নিজেকে না প্রবঞ্চিত করি। কম্পিত হৃৎপিণ্ড লইয়া অশ্রুসিক্ত নেত্রে তোমাকে দয়াময় বলিয়া নিজেকে ভুলাইব না;—তুমি যে মানুষকে যুগে যুগে অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে উদ্ধার করিতেছ—সেই যে উদ্ধারের পথ সে ত আরামের পথ নহে সে যে পরম দুঃখেরই পথ। মানুষের অন্তরাত্মা প্রার্থনা করিতেছে আবিরাবীর্ম্ম এধি, হে আবিঃ, তুমি আমার নিকট আবির্ভূত হও—হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও—এ প্রকাশ ত সহজ নহে! এ যে প্রাণান্তিক প্রকাশ! অসত্য যে আপনাকে দগ্ধ করিয়া তবেই সত্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, অন্ধকার যে আপনাকে বিসর্জ্জন করিয়া তবেই জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং মৃত্যু যে আপনাকে বিদীর্ণ করিয়া তবেই অমৃতে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। হে আবিঃ, মানুষের জ্ঞানে, মানুষের কর্ম্মে, মানুষের সমাজে তোমার আবির্ভাব এইরূপেই। এই কারণে ঋষি তোমাকে করুণাময় বলিয়া ব্যর্থ সম্বোধন করেন নাই। তোমাকে বলিয়াছেন, রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্—হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। হে রুদ্র, তোমার যে সেই রক্ষা, তাহা ভয় হইতে রক্ষা নহে, বিপদ হইতে রক্ষা নহে, মৃত্যু হইতে রক্ষা নহে,—তাহা জড়তা হইতে রক্ষা, ব্যর্থতা হইতে রক্ষা, তোমার অপ্রকাশ হইতে রক্ষা। হে রুদ্র, তোমার প্রসন্নমুখ কখন্ দেখি, যখন আমরা ধনের বিলাসে লালিত, মানের মদে মত্ত, খ্যাতির অহঙ্কারে আত্মবিস্মৃত, যখন আমরা নিরাপদ অকর্ম্মণ্যতার মধ্যে সুখসুপ্ত তখন? নহে, নহে, কদাচ নহে।—যখন আমরা অজ্ঞানের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াই, যখন আমরা ভয়ে ভাবনায় সত্যকে লেশমাত্র অস্বীকার না করি, যখন আমরা দুরূহ ও অপ্রিয় কর্ম্মকেও গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত না হই, যখন আমরা কোনো সুবিধা কোনো শাসনকেই তোমার চেয়ে বড় বলিয়া মান্য না করি—তখনই বধে বন্ধনে আঘাতে অপমানে দারিদ্র্যে দুর্য্যোগে হে রুদ্র তোমার প্রসন্ন মুখের জ্যোতি জীবনকে মহিমান্বিত করিয়া তুলে। তখন দুঃখ এবং মৃত্যু বিঘ্ন এবং বিপদ প্রবল সংঘাতের দ্বারা তোমার প্রচণ্ড আনন্দভেরী ধ্বনিত করিয়া আমাদের সমস্ত চিত্তকে জাগরিত করিয়া দেয়। নতুবা সুখে আমাদের সুখ নাই, ধনে আমাদের মঙ্গল নাই, আলস্যে আমাদের বিশ্রাম নাই। হে ভয়ঙ্কর, হে প্রলয়ঙ্কর, হে শঙ্কর, হে ময়স্কর, হে পিতা, হে বন্ধু, অন্তঃকরণের সমস্ত জাগ্রত শক্তির দ্বারা উদ্যত চেষ্টার দ্বারা অপরাজিত চিত্তের দ্বারা তোমাকে ভয়ে দুঃখে মৃত্যুতে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিব—কিছুতেই কুণ্ঠিত অভিভূত হইব না এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিতে থাকুক এই আশীর্ব্বাদ কর! জাগাও হে জাগাও—যে ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও ধন সম্পদকেই জগতের

সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয় বলিয়া অন্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে প্রলয়ের মধ্যে যখন একমুহূর্ত্তে জাগাইয়া তুলিবে তখনি হে রুদ্র সেই উদ্ধত ঐশ্বর্য্যের বিদীর্ণ প্রাচীর ভেদ করিয়া তোমার যে জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে তাহাকে আমরা যেন সৌভাগ্য বলিয়া জানিতে পারি—এবং যে ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও সম্পদকে একেবারেই অবিশ্বাস করিয়া জড়তা, দৈন্য ও অপমানের মধ্যে নির্জ্জীব অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে তাহাকে যখন দুর্ভিক্ষ ও মারী ও প্রবলের অবিচার আঘাতের পর আঘাতে অস্থিমজ্জায় কম্পান্বিত করিয়া তুলিবে তখন তোমার সেই দুঃসহ দুর্দ্দিনকে আমরা যেন সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়া সম্মান করি—এবং তোমার সেই ভীষণ আবির্ভাবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন বলিতে পারি—

আবিরাবীর্ম্ম এধি—রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেনমাং পাহি নিত্যম্!

দারিদ্র্য ভিক্ষুক না করিয়া যেন আমাদিগকে দুর্গম পথের পথিক করে, এবং দুর্ভিক্ষ ও মারী আমাদিগকে মৃত্যুর মধ্যে নিমজ্জিত না করিয়া সচেষ্টতর জীবনের দিকে আকর্ষণ করে। দুঃখ আমাদের শক্তির কারণ হোক্, শোক আমাদের মুক্তির কারণ হোক্, এবং লোক-ভয় রাজভয় ও মৃত্যুভয় আমাদের জয়ের কারণ হোক্। বিপদের কঠোর পরীক্ষায় আমাদের মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করিলে তবেই, হে রুদ্র, তোমার দক্ষিণমুখ আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে; নতুবা অশক্তের প্রতি অনুগ্রহ, অলসের প্রতি প্রশ্রয়, ভীরুর প্রতি দয়া কদাচই তাহা করিবে না—কারণ সেই দয়াই দুর্গতি, সেই দয়াই অবমাননা; এবং হে মহারাজ, সে দয়া তোমার দয়া নহে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন।

পৌণ্ড্রদেশের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরী কোথায় অবস্থিত ছিল, সে সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হয়। অধুনা কাহারো কাহারো মতে বগুড়া জেলার মহাস্থান নামক স্থান এবং কাহারো কাহারো মতে মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া নামক স্থানই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরী।

এখন দেখিতে হইবে কোন্ মতটী সমীচিন। প্রমাণহীন কোন মতই গ্রহণীয় নহে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বি, এল, মহাশয়কে বর্ত্তমানে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে দেখিতেছি। কিন্তু তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অবস্থান সম্বন্ধে কোন প্রমাণ না দিয়া সংস্কার বা জেদ বশত মালদহ জেলার পাণ্ডুয়াকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নির্দ্দেশ করিয়া, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রাপ্য দাবী পাণ্ডুয়াতে আরোপিত করিতেছেন।

তিনি নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনের সপ্তম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যার ১৯৮ পৃষ্ঠায় গৌড়কাহিনী প্রস্তাবে লিখিয়াছেন, "রাজধানী কোথায় ছিল? এখন তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইতে পারে না।

কতস্থানে কত স্মৃতিচিহ্ন পড়িয়া রহিয়াছে,—পরিখা, প্রাচীর, দুর্গ, দুর্গদ্বারের ধ্বংসাবশেষ,—পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়।° তথাপি মালদহের অন্তর্গত "পাণ্ডুয়া" নামক স্থানই পুরাতন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রধান রাজধানী বলিয়া বোধ হয়।"*

তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে সন্তুষ্ট হওয়া যায় কি? যদি "নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইতে পারে না।" তবে তাঁহার আর অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া নীরবে থাকাই উচিত ছিল। কিম্বা পাণ্ডুয়াকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অনুমান মাত্রই করিয়া যদি ক্ষান্ত হইতেন, তবুও তেমন কিছু বলিবার থাকিত না; কিন্তু তিনি পাণ্ডুয়ার ইতিহাস বলিতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নামে কেন উহা ব্যক্ত করিতেছেন বুঝিতে পারিলাম না। † ‡

পাণ্ডুয়া 'পৌণ্ড্রদেশের' অন্তর্গত বটে, কিন্তু—'পৌণ্ড্রবর্দ্ধন' নহে।

সে যাহা হউক,—পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অবস্থান সম্বন্ধে আমরা এ পর্য্যন্ত যে কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

করতোয়া মাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে,

"করতোয়ে সদানীরে সরিৎশ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে।"

ইহা হইতে বুঝা যায় পৌণ্ড্রক্ষেত্র করতোয়া তটে অবস্থিত। § আবার :—

"বারাণস্যাং কুরুক্ষেত্রে যৎপুণ্যং রাহুদর্শনে।
শিলাদ্বীপং সমাসাদ্য তচ্চকোটি গুণং ভবেৎ ॥৩৫॥
পৌষে বা মাঘ মাসে বা যদি সোমযুতা কুহূঃ।
ব্যতিপাতেন যোগেন কোটি কোটি গুণং ভবেৎ ॥৩৬॥
চাপার্কে মূল সংযুক্তে যদি সোমযুতা কুহূঃ।
নারায়ণীতি বিখ্যাতা ত্রিকোটি কুলমুদ্ধরেৎ॥

১। এই শীলাদ্বীপ যেখানে ও পৌষনারায়ণী স্নান যেখানে হইয়া থাকে, সেই স্থানকেই হিন্দুগণ পৌণ্ড্রক্ষেত্র বলিয়া মানিয়া আসিতেছেন। বলা বাহুল্য—বগুড়া জেলার মহাস্থান নামক স্থানেই বিখ্যাত পৌষনারায়ণীস্নান হইয়া আসিতেছে এবং ইহা সর্ব্বজন বিদিত।

২। এই শীলাদ্বীপটী স্কন্দ ও গোবিন্দের মধ্যবর্ত্তী; উহাকেই মুক্তিক্ষেত্র এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলা হইয়াছে। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

"স্কন্দ গোবিন্দয়োর্মধ্যে ভূমিঃ সংস্কৃত বেদিকা। ‖

* * * *

বেদী মধ্যেঽর্পিতো যুপঃ সংশ্লেষাৎ বর্দ্ধতে নৃণাম্।
গোবিন্দ মণ্ডপাৎ পূর্ব্বং কুণ্ডং বিষ্ণুবিনির্ম্মিতং॥
স্কন্দ মণ্ডপ বায়ব্যে সভা রামস্য চাদ্ভুতা।

* পৌণ্ড্রবর্দ্ধন একটি অতি প্রাচীন রাজ্য বলিয়া তাহার রাজধানী ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সংস্থাপিত হইয়া থাকিতে পারে, এবং একই সময়ে একাধিক রাজনগর থাকাও বিচিত্র নহে। এতকাল পরে সংশয় দূর করিবার উপায় নাই। মৈত্রেয় মহাশয় সেইজন্য সংশয়ের উল্লেখ করিয়া, তাঁহার ব্যক্তিগত মত প্রকাশিত করিয়াছেন। এরূপ ব্যক্তিগত মত প্রকাশিত করিলে, তজ্জন্য কাহাকেও ভৎর্সনা করা যায় না। বং সং।

† প্রবাসী ১৩১৬। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

‡ পাণ্ডুয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত সুতরাং পাণ্ডুয়ার ইতিহাসকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ইতিহাস বলিলে ক্ষতি কি? বং সং।

§ পৌণ্ড্রগণ কেবল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে বাস করিত, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্য কোনস্থানে বাস করিত না, এরূপ প্রমাণ না পাইলে, "পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়সে" হইতে করতোয়াতটমাত্রই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন—অন্য স্থান নহে—এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। বং সং।

‖ স্কন্দ ও গোবিন্দ মন্দিরের স্থান দুইটী অশ্বত্থবৃক্ষ দ্বারা চিহ্নিত হইয়া অদ্যাপিও মহাস্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

* * * *

আদ্যং ভূযো ভবনং লক্ষ্য সংপাদ বিপ্রেঃ স্কন্দাদিদেবতা।
বিষ্ণু বলভদ্র শিবাদি দেবৈরধ্যাসিতং করজলাম্বু বিষ্ণু
পাপং শ্রীপৌণ্ড বর্দ্ধন পুরং শিরসা নমামি।"

৩। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের 'মহাস্থান' নাম কেন হইল, করতোয়া মাহাত্ম্যের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

"স্কন্দ গোবিন্দয়োর্মধ্যে গুপ্তা বারাণসী পুরী।
তত্রারোহণ মাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ॥
পঞ্চক্রোশমিদং ক্ষেত্রং সমস্তাৎ পরিকীর্ত্তিতং।
তদন্তর্গত মেতত্ত্ব ক্রোশ মাত্রং মহেশ্বরী।
অতি গুহ্যতমং ক্ষেত্রং যত্রাস্তে ভার্গবো মুনিঃ।
পশোর্জ্জুনং কথয়তি গৃহস্তদ গৃহে তাম্রচূড়ো—
দৈবী হৈমী শটিত স্থরভির্যষ্টিবৃদ্ধি শিলাস্থিঃ।
খেযুচ্ছত্র ন ফণতিফর্ণী দ্বিষরো জীব লোকঃ।
কূপোদ্বীপঃ কনক পতনং পৌণ্ড্র ক্ষেত্রেঽদ্ভুতানি।
প্রোচ্চা ভূমির্ভবতি তরণঃ স্নানতঃ কাম্যকুণ্ডে
ভোগো যজ্ঞো ভ্রমণ নটনং তত্রবাক্য হি বেদঃ
ইত্থং রামো রচয়তি পদং লক্ষণান্যূনবিংশ স্তস্মাৎ
সকল জগতাং শ্রীমহাস্থানমেতৎ॥

পরশুরাম এই উনবিংশ লক্ষণ রচনা করিয়াছেন, সেই জন্যই জগৎ মধ্যে ঐ স্থান মহাস্থান নামে খ্যাত ও শ্রেষ্ঠ।

ফল কথা করতোয়া মাহাত্ম্যপাঠে স্পষ্ট বুঝা যায় যে বগুড়াজেলার করতোয়া তীরবর্ত্তী বর্ত্তমান মহাস্থানই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবু উক্ত সপ্তম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা বঙ্গদর্শনের ১৯৬ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন,—"কিন্তু "করতোয়া মাহাত্ম্য" নামক পুরাতন সংস্কৃত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়,—পৌণ্ড্রগণের "নিত্যপ্লাবনকারিণী" বলিয়া করতোয়া মাহাত্ম্যশালিনী।"

করতোয়া মাহাত্ম্যের এই অংশটুকু ব্যতীত কি আর কোন অংশ তিনি দেখিবার অবসর পান নাই? না—তাঁহার মতের অনুকূল নহে বলিয়া উহা গ্রহণ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু এরূপ করা তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির উচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যুক্তি প্রমাণ দ্বারা বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করাই শ্রেয়। *

৪। যদি কেহ বলেন যে, করতোয়া মাহাত্ম্যোক্ত পৌণ্ড্রতীর্থ মহাস্থান হইতে পারে, কিন্তু রাজধানী পাণ্ডুয়ায় ছিল।

ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইহা কষ্টকল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ পাণ্ডুয়ায় যে পৌণ্ড্রের রাজধানী ছিল, তাহার কোন প্রমাণ কেহ দিতে পারেন কি? অনুমান ভিন্ন কতকগুলি মস্‌জিদ কিংবা পুকুর দ্বারা তাহা প্রমাণ করিবার উপায় নাই।

৫। শাস্ত্র ব্যতীত আমাদের অন্য কি প্রমাণ আছে দেখা যাউক।

প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিয়েন্থসিয়াঙ্গ ৬৫০ খৃষ্টাব্দে ভারত ভ্রমণে আগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণ বিবরণ হইতে জানা যায় যে, রাজমহলের নিকটস্থ গঙ্গা হইতে ৬০০লী বা ১০০ মাইল পূর্ব্বদিকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অবস্থিত। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ক্যানিংহাম বলেন যে, "এই বিবরণ রাজমহল হইতে মহাস্থানের দূরত্বের সহিত ঠিক্ মিলিয়া যায়। কারণ মহাস্থান রাজমহল হইতে ১০০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।"

* বল্লাল বিরচিত "দানসাগর" গ্রন্থ পাঠ করিলে, "করতোয়া-মাহাত্ম্যের" সকল কথা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। বং সং।

কিন্তু পাণ্ডুয়া রাজমহল হইতে অনেক নিকটবর্ত্তী।

৬। হুয়েন্থসিয়াঙ্গের বিবরণ হইতে আরও জানা যায় যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ২॥০ ক্রোশ পশ্চিমে "গগনস্পর্শী চূড়া বিলম্বিত 'পো শি পো' (ভাসুবিহার) সঙ্ঘারামের নিকট অশোক-রাজনির্ম্মিত স্তুপ ও সুবৃহৎ বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি-সমন্বিত একটী বৌদ্ধবিহার দর্শন করিয়াছিলেন।" মহাস্থানের ২॥০ ক্রোশ পশ্চিমে "বিহার" গ্রামে যে ধ্বংসস্তুপ আজপর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই যে হুয়েন্থসিয়াঙ্গ কথিত ভাসুবিহারের ধ্বংসাবশেষ মাত্র, তাহা সন্দেহ করিবার কারণ নাই। গ্রামটীর 'বিহার' নামই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 'বিহার' এবং 'ভাসুবিহার' এই নামে দুইটী গ্রামই এখন পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে।

আবার বিহারে ৭০০ ফিট দীর্ঘ ও ৬০০ ফিট প্রশস্ত যে ইষ্টকময় উচ্চ স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, তদুপরিই ঐ প্রকাণ্ড মঠ নির্ম্মিত ছিল এরূপ অনুমিত হয়। বিহারে অবলোকিতেশ্বরের মন্দির ও মূর্ত্তি আছে। ইষ্টক স্তুপের উত্তরদিকেই এই ভগ্ন মন্দির। এই স্থানেই গিয়াসুদ্দিনের নির্ম্মিত "বসন্ত কোট" নামক দুর্গ থাকা সম্বন্ধে ক্যানিংহাম সাহেব অনুমান করেন। উপরের বর্ণিত মাঠের কিয়দ্দূরেই মহারাজ অশোকের নির্ম্মিতস্তুপ বর্ত্তমান আছে। ইহার পার্শ্বেই বুদ্ধ দেবগণের নিকট শাস্ত্রের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। বুদ্ধের চারিজন শেষ অবতার এই স্থানেই বুদ্ধের ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া চিরবিশ্রাম লাভ করেন। ইহাদিগের পদচিহ্ন এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া পৌণ্ড্রখণ্ডে বৌদ্ধের প্রাধান্য বিঘোষণ করিতেছে।

হুয়েন্থসিয়াঙ্গ কথিত রাজমহল হইতে দূরত্ব হিসাবে ও বিহারের অবস্থিতির সহিত তুলনায় মহাস্থান যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন তাহা বেশ প্রমাণ হইতেছে। ক্যানিংহাম সাহেবের Archeological Survey of India নামক গ্রন্থে করতোয়া মাহাত্ম্যের নাম পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়না। ইহাতে অনুমান হয়, তিনি ঐ গ্রন্থ দেখিতে পান নাই। অথচ করতোয়া মাহাত্ম্যোক্ত বচনের সহিত উক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদের অনুমান বেশ মিলিয়া গিয়াছে। তিনি কেবল হুয়েন্থসিয়াঙ্গের বর্ণনার সহিত স্থান মিলাইতে গিয়া মহাস্থানকেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া ধারণা করিয়াছেন।

হিয়েন্থসিয়াঙ্গ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে একটী বিশাল নদী অতিক্রম করিয়া কামরূপে গমন করেন সে নদীটি যে করতোয়া সে বিষয়ে সন্দেহ নাই * †

৭। আবার খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কাশ্মীরাধিপতি জয়াপীড় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন করেন। তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনস্থ কার্ত্তিকের মন্দিরে দেবনর্ত্তকী কমলার নৃত্যকলা দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

* রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, প্রথম ভাগ প্রথম সংখ্যা মল্লিখিত "করতোয়া" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† করতোয়ার অপর তীরে কামরূপ রাজ্য। মহাস্থান ও কামরূপ রাজ্যের মধ্যে করতোয়া মাত্র ব্যবধান। হিয়েন্থ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ছাড়িয়া কতদূর গিয়া কামরূপ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ভাল হইত। বং সং।

এই কার্ত্তিকের মন্দিরই যে করতোয়া মাহাত্ম্যোক্ত স্কন্দদেবের মন্দির তাহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে ?

"স্কন্দ গোবিন্দয়োর্ম্মধ্যে গুপ্তা বারাণসীপুরী।
তত্রারোহণ মাত্রেণ নরোনারায়ণো ভবেৎ।"

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে স্কন্দ ও গোবিন্দের স্থান দুইটি অশ্বত্থ বৃক্ষ দ্বারা অদ্যাপিও চিহ্নিত হইয়া আছে।

লঘুভারতে লিখিত আছে যে, মানসিংহ কামরূপ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় স্কন্দ ও গোবিন্দ তীর্থ দর্শন করিয়া যান। কথিত আছে তিনি মহাস্থানোক্ত অনেক লুপ্ত তীর্থ আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

"সাহ সুলতানের সমকালীয় মুসলমানগণ দ্বারা যাবতীয় দেবদেবীগণ বিনষ্ট হওয়ায়—এইক্ষণ পৌষনারায়ণী যোগে ঐ সকল দেবদেবীর আসন অতি ক্লেশে যাত্রীগণ নির্ণয় করিয়া লইয়া পূজাদি করিয়া থাকে।"

৮। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে, —জয়াদিত্য গঙ্গাতীরে সৈন্যগণকে বিদায় দিয়া ছদ্মবেশে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে উপস্থিত হন। এই জয়াদিত্যের পৌণ্ড্রবর্দ্ধন আগমন বার্ত্তা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর কেহই জানিতে পারে নাই। পরিশেষে জয়াদিত্যের নামাঙ্কিত পতিত-কেয়ূর দৃষ্টে সকলেই কাশ্মিরাধিপের আগমন বার্ত্তা জানিতে পারিয়াছিলেন।

গঙ্গানদী যদি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকটবর্ত্তী হইত, তাহা হইলে অপর একজন রাজার সৈন্য সামন্ত রাজধানীর এত নিকটে আসিল ও বিদায় হইয়া গেল, অথচ নগরবাসী কেহই জানিল না, ইহাও কি সম্ভব ? ইহাতে বরং ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর গঙ্গাতীর হইতে দূরে ছিল; সুতরাং দূরত্ব নিবন্ধন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী কাহারো জয়াদিত্যের আগমন জানিবার সুবিধা হয় নাই।

গঙ্গা নাকি পূর্ব্বে মালদহ পাণ্ডুয়ার অতি নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত। সুতরাং ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন গঙ্গার অতি নিকটস্থ পাণ্ডুয়ায় না হইয়া, কিছু দূরে স্থিত মহাস্থানই হওয়া সুসঙ্গত।

৯। তারপর মহাস্থান যে পরগণার অন্তর্গত সে পরগণাটীর নাম "শীলবর্ষ", চলিত কথায় 'শেলবর্ষ' বলে। করতোয়া মাহাত্ম্যের 'শীলাদ্বীপ'ই বর্ত্তমানে শীলবর্ষ নামে অভিহিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শীলাবর্ষ নামটীতে "পৌণ্ড্রে কোটি শিলাদ্বীপে" ইত্যাদি করতোয়া মাহাত্ম্যোক্ত শ্লোকটী মনে করিয়া দেয়।

১০। কোন অপরিজ্ঞাত বা সমভূমি প্রান্তরে আমরা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের স্থান নির্দ্দেশ করিতেছি না; পূর্ব্বোক্ত প্রমাণগুলি ব্যতীত মহাস্থানে যে সকল ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহা দেখিলেই বিশ্বাস হইবে যে, মহাস্থান কি প্রাচীতত্ত্বে, কি বিশালতায়, কি সমৃদ্ধিতে কিরূপ অলঙ্কৃত ছিল।

মহাস্থানের সেই পাহাড় সদৃশ উচ্চ বিশাল গড়, ৫।৬ মাইল ব্যাপী অসংখ্য অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ, গড়বেষ্টিত পরিখা এবং নগর বেষ্টনীবৎ উচ্চ ৮ মাইল দীর্ঘ জাঙ্গাল (সচরাচর লোকে ইহাকে ভীমের জাঙ্গাল বলে) এই সকল দেখিয়া স্বতঃই মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়, হায়! ইহা কতকালের কোন্ বিশাল রমণীয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ; না জানি ইহা কতই সৌন্দর্য্যের আগার ছিল।

করতোয়া মাহাত্ম্য, ক্যানিংহাম ব্যতীত, সেতিহাস বগুড়া বৃত্তান্ত, লঘুভারত, এবং গ্রাম্য প্রাচীন কবিতা প্রভৃতি স্থানীয় ইতিহাস গুলিতেও 'মহাস্থানকেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি আমরা বাল্যকাল হইতেই মহাস্থান যে পৌণ্ড্রক্ষেত্রে, তাহা বৃদ্ধগণের মুখে শুনিয়া আসিতেছি।

সুতরাং মহাস্থান যে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর সে বিষয় আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

সর্ব্বশেষে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, গৌড় কাহিনীর ন্যায় একখানি উপাদেয় গ্রন্থ ভ্রমসঙ্কুল হইলে,—ইতিহাস কলুষিত হইবে আশঙ্কায়, গ্রন্থ প্রকাশের পুর্ব্বেই আমরা প্রতিবাদটী উপস্থিত করিলাম।

শ্রীহরগোপাল দাসকুণ্ডু।

মনীষা।

[মিশ্রকাব্য]

তৃতীয় সর্গ।

মনীষা সমুচ্চে কহে—"শান্তি! শান্তি। থাম বন্যবালা!
বকিয়ো না পাগলের মত,—রাজপুত্র প্রেম-ঢালা
পারিজাত দিলেও আমারে—ত্যজ্য তাহা হবে মম;
জাননা কি—আমরা দিয়াছি প্রেমপুষ্প বলি সম
দেবতার পদে? সাহস দুর্জ্জয় তব হৃদিমাঝে
আছে বুঝিলাম। অদ্যাবধি হেন ভাষা মোর কাছে
কহিতে পারেনি কেহ। সন্তান দুর্ল্লভ নহে হেথা—
ফুটে তা'রা অযতনে উপেক্ষায় সর্ব্ব যেথা সেথা।
পুত্রকন্যা ভালবাসি—কিন্তু তারা ঝরিয়া শুকায়,—
মনে রেখো ভ্রান্ত নারী—শ্রেষ্ঠ কার্য্য মরে না ধরায়।
রবি-শশি সম তা'রা নবতর বিতরি আলোক
মানবে মহান্ করি জীয়ে রয় ভরিয়া ভূলোক।
নারী-চিত্ত-বন হ'তে তুলে নর পুত্র কন্যা ফুল,—
জর্জ্জর জীবন তাহে আমাদের হিয়া চিন্তাকুল।
মা হ'য়ে যে নারী হেরে নিজ পুত্র পাপ পথে ধায়
রাখিতে বেদনাভার ঠাঁই তার রহে না ধরায়।

কীর্ত্তি হেতু করিনি এ কাজ। হয় ত' দেখানু পথ
ভবিষ্যৎ নারীবৃন্দে—হ'তে পারে পূর্ণ মনোরথ
তা'রা যদি এ আদর্শ লক্ষ্য করি চলে। নাহি ভয়—
আশা ধরি এ জীবন তুলিব করিয়া কর্ম্মময়—
সর্ব্বনারী কখনই হইবে না দুর্ব্বলহৃদয়—
এই চিন্তা'পরে করি ভর। অসংখ্য-জীবনময়
কোলাহল বিনিময়ে যদি লক্ষ বর্ষ আয়ু সহ
দৈত্য জন্ম লভিতাম দুই চারি জনে, হ'ত অহো!
কি সার্থক আনন্দ সঞ্চার। হেরি' কর্ম্মবীজ মোর
পরিণত শাখা-কাণ্ডে ফুলে-ফলে সুষমায় ভোর,
ধন্য হ'ত ধরায় জীবন!"

রহিলাম মৌন নত;—
অন্তরে ভাবিনু শুধু কি উপায়ে হ'ব পূর্ণব্রত;—
এ কবি-নৃপসুতারে বাঁধিব কেমনে প্রেম-ডোর
দিয়া; অদ্ভুত কল্পনা মাঝে আত্মহারা সে যে ভোর
হয়ে আছে।

হেনকালে ব্যক্ত করি অন্তর আমার
মনীষা কহিল—"বুঝি ভাবিতেছ দৈত্য কোথাকার
এরা সব নারী-বেশা? ওতে নহি অনভ্যস্ত মোরা;
কেননা এ সব দেশে অন্ধকার-কোণে-ফেরা-ঘোরা-
অসূর্য্যম্পশ্যরূপাদিগের খর্ব্ব-সর্ব্ব-চিত্ত-ভাব,—
উচ্চ আশা কিছু নাই—নাহি মাত্র বিন্দু দুঃখ তাপ
দাসীত্ব স্বীকারে—জানে না তাদেরি মুক্তি আমাদের
সমগ্র সাধনা? এমন হইত—দীর্ঘ ঘোর ফের
ছাড়া আত্মনাশে আশু ফল হবে,—যেমনি করিয়া
হোক—দধিচির মত মহামৃত্যু এখনি মরিয়া—
বাঁচাতাম নারীকুল,—জন্ম ধন্য হইত মহীতে।"
বালা এত বলি নত কৈল শির—যেন নিবারিতে
অশ্রু বেগ। উত্তরিনু অবশেষে যথা হ'তে নদী
কৃষ্ণ প্রস্তরের স্তূপে আস্ফালি আস্ফালি নিরবধি
বজ্রোদ্‌গারি মোহানায় যাচিছে প্রবেশ। কম্পে ঘন
ইন্দ্রধনু শতোচ্ছ্বাসে ঊর্দ্ধভাগে তার—অগণন

বর্ণ মর্ম্মরিয়া। দেখো যায়-দূর নিম্নতম স্তরে
সুবিশাল অস্থিরাশি,—নরজন্ম-পূর্ব্ব-ধরা-পরে-
চিহ্ন কে রাখিয়া গেছে অতীতের প্রস্থিত অতিথি।
হেরি হেরি কহে বালা অনুকূল হ'ন যদি বিধি
এই সব অস্থি হ'তে যত গুণে মোরা শ্রেষ্ঠ আজ,—
মোদের হইতে তত গুণে শ্রেষ্ঠ করিবে বিরাজ
নারী লোক ধরাতলে এই চেষ্টাবলে একদিন।"
"রাজ্ঞী কি বলিতে চান—সৃষ্ট হস্ত হইবে প্রবীণ
এ শিক্ষানবিশি হতে ক্রমশঃ মার্জ্জিত চেষ্টা ফলে ?'
"দেখিতেছি দর্শনে তোমার অনুরাগ"—কৌতূহলে
কহিলেন রাজ্ঞী,—"কর বিস্তৃত-বহুল অধ্যয়ন,—
নিগূঢ় অনন্ত তত্ত্বে ভারতের ষড়্দরশন ;—
জ্ঞান-রত্ন কোথা হেন আর ? কৃতকার্য্য হতে পার,
রতন খচিত বহুমূল্য স্বর্ণফুল উপহার
পাবে তুমি,—উৎকীর্ণ তাহাতে চিত্র "কমল-আসীনা
বীণাপাণি,—পদতলে আদি কবি শুনিছেন বীণা
মুগ্ধ বসি'।" আদর্শ মোদের এই জড়িত জীবনে
আছে হেথা। রমণী হইতে জ্ঞান জাগিল ভুবনে,
যে জন গুরুর গুরু সেও ছাত্র পদতলে তাঁর,
তাই ও আদর্শ হেথা—তাঁরি করে সর্ব্ববিদ্যাভার।"—
কহিলাম "অস্থিবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা কিন্তু নাই"
কহিলেন "ভেবেছি তা'—কিন্তু ছি ছি বড় ঘৃণা পাই—
শিরীষ-কিশোরীকুল রাক্ষসের ম'ত রবে বসি
জীবন্ত পশুরে ধরি' ছেদি ছেদি লভিবে উল্লসি'—
তত্ত্ববিদ্যা,—তার চেয়ে বীভৎস কি আছে ধরা-মাঝে ?
কিম্বা এই নর-দেহ,—যেই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজে
গুপ্ততত্ত্ব পবিত্র কত না—সেখানে উদ্ধত অস্ত্র হানি
হা হা করি হাস্য করি স্থূল তত্ত্ব তাহার বাখানি'
অবমানে ;—আত্মারে তাহার ; তবু তাহা শিক্ষণীয়
ভাবিনি অন্তরে আজো কিরূপে তাহারে অস্মদীয়
বিদ্যালয়ে প্রচলিত করি। তবু প্রয়োজন গণি'
ঔষধি-প্রয়োগ-বিদ্যা শিখেছিনু আপনা আপনি

গ্রন্থপাঠে (পুরুষ-প্রবেশ জানি' দিবনা হেথায়।)
কাহারো ঘটিলে গ্লানি আমরাই শুশ্রূষিব তায়।—
এখন স্রষ্টার কার্য্য সম্বন্ধে যে জিজ্ঞাসিলে কথা,
উত্তর দিতেছি শুন—বিশ্ব-সৃষ্টি-পূর্ব্বের-বারতা —
সন্ততি-সিসৃক্ষু বিধি আদিভূত সৃজিলেন জল,
এক ইচ্ছা-রেখাপাতে ফুটালেন সর্ব্ব ভূমণ্ডল—
সর্ব্বকাল বর্ত্তমানময়। অতীত ভবিষ্য আর
ক্ষণজীবী মানবের ছাঁপাইল জন্ম-মৃত্যু-পার
ক্ষুদ্র খণ্ডে বাঁধিয়া তাহারে। কটাক্ষে বিশ্বের সৃষ্টি,—
নাহি কিন্তু মানবের অব্যাহত সমুজ্জ্বল দৃষ্টি,
কালের তরঙ্গে উঠি মুহূর্ত্তে বিলয় ঘটে তার—
কতটুকু জেগে থাকে ? মুহূর্ত্তে ফুলায়ে গর্ব্বভার
বুদ্বুদ মিলায় ফাটি'। অবিদ্যার অন্ধকার আসি'
জ্ঞাননেত্র রুদ্ধ করি খণ্ড কাল সম্মুখে প্রকাশি'
মাত্র ধরে। তবু এই রুদ্ধ বর্ত্তমানে আহরিয়া
সর্ব্বশক্তি তুলিব নারীত্ব পূর্ণ মহত্বে ভরিয়া।"

দীপ্ত দৃষ্টি মহিমায় স্ফুরিল কামিনী ; দুই জন
বহুদূর চলিয়া গেলাম—কত গিরি পুষ্পবন
অতিক্রমি আনন্দ অন্তরে। তখন কহিনু আমি
ছদ্মবেশ ভুলি' যেন,—"মধুময় হ'ত দিন যামি'—
সাথে যদি থাকিত প্রণয়ী ফুল্ল কাননে এমন"।
কহিলেন "সত্য বটে, কিম্বা নানা আলোড়ি দর্শন
সার্থকতা লভিতাম কল্পনারে ধন্য করি মম।
কি মাধুরী হের হেথা নন্দন-কানন মনোরম!
ইন্দ্র-ধনু-বর্ণ ঝরে গগনে গগনে ; জ্যোতিস্নাত
হাসিছে ধরণী,—এমনি আনন্দ-লোকে সন্ধ্যাপ্রাতঃ
বুঝি ভ্রমিতেন অদিতিরূপসী উদ্ভাসি' দিগন্ত—
সর্ব্ব-দেবকুলপ্রসবের আগে।" পরে কণ্ঠ-ছন্দ
তুলিয়া মধুর সহচরী জনে কহিলা সম্ভাষি'—
"হেরিতেছ নীলকান্ত-মনোরম শ্যাম জলরাশি

হোথায় অদূর সরে। ওই ছায়াতটে বিরচন
করিয়া আসন—সাজাও আহার্য্য।" অমনি তখন
মায়াপুরী সম সেথা জাগি উঠে শাটিন শিবির,—
অঙ্কিত তাহাতে চিত্র—রণোন্মত্ত শুম্ভঘাতিনীর
সভ্রুভঙ্গছদ্মপ্রেক্ষ নয়নে ঝরিছে মহিমা ধারা,
সুরাসুর যক্ষরক্ষ বীভৎস-হুঙ্কার-ভয়ে সারা,—
যোড়হস্তে কাঁপে থর থর। সর্ব্ব শক্তি নারী মাঝে
তাঁরি প্রতিকৃতি আজি তাই সেথা অঙ্কিত বিরাজে—
পদতলে শুম্ভ পরাভূত।

তবে সবে গিরি' পরে
উঠিতে মানস করি' দোঁহে দোঁহে মিলিয়া মন্থরে
ধাইনু সেথায়—নিকুঞ্জ চন্দ্রার সাথে, বেলা সনে
মন্মথ চলিল—মোর প্রিয়াসহ আমি। মধুক্ষণে
রবির রক্তিম আলো পড়িয়াছে গিরি ফুলে ফলে,
রঞ্জিত প্রস্তরে আভা কোথাও বা ঝিকিমিকি জ্বলে।
কোথাও আনন্দজ্যোতি নামিয়াছে আঁধার গহ্বরে
কি রত্ন সন্ধান লাগি'। ঝোপে ঝোপে শিখরে শিখরে
ঘুরিলাম উঠিলাম অর্থহীন বকিতে বকিতে
বিচিত্র-উপলে-লোষ্ট্রে কটমট নাম দিতে দিতে;—
তখন প্রদীপ্ত সূর্য্য শ্রমারক্ত-স্ফীত কলেবরে
পশিল বিশ্রাম লাগি দূর-অস্ত-অচল-শিখরে।

গান।

ঐ দেখা যায় দুর্গ প্রাচীর
স্বর্ণ-আলোকে ভরা
ঐ দেখা যায় তুষার মালায়
গিরি-শোভা মনোহরা।
ঐ রবি রেখা কাঁপি' আনন্দে
নদী হ্রদে দুর্গে উজল ছন্দে
নির্ঝর করে গৌরব ভরে
শিঙা ফুকারিয়া বাজ,
দশদিশি ভরি প্রতিধ্বনির
হৃদয় কাঁপুক আজ।

ঐ মধু স্বরে ব্যাপি' দূরে দূরে
মধুতর মধুতম
কোন্ অলকার পুরী হ'তে বাজে
শিঙা এত মনোরম!
গিরি শির হ'তে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
সঘন পুলকে ধরণী ব্যাপিয়া
গৌরব ভরে সঙ্গীত স্বরে
শিঙা ফুকারিয়া বাজ্‌,
ফুলবন হ'তে প্রতিধ্বনির
হৃদয় কাঁপুক্ আজ।

গিরি নদী বনে সে ধ্বনি মিলায়
গগনে হারায় কভু
আমাদের গান চির বহমান
হৃদয়ে হৃদয়ে তবু
নাহি তার ক্ষয় নাহি তার শেষ
এত দুঃখে তার নাহি দুঃখ লেশ
বহে চিরদিন সরস নবীন
শিঙা ফুকারিয়া বাজ্‌,
অনন্ত সে গানে প্রতিধ্বনির
হৃদয় কাঁপুক্ আজ।

ক্রমশ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বেদান্ত দর্শন।*

বেদান্তের আদর্শ (Ethics)। বেদান্ত বলেন "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুক্তিক)—যিনি ব্রহ্ম জানেন, তিনি ব্রহ্ম হন্। ব্রহ্ম হওয়াই আমাদের আদর্শ। আমরা যদি ব্রহ্ম হইতে পারি, তবে আমাদের আর অপর কিছু অধিগন্তব্য থাকিবে না। আমরা কৃতকৃত্য হইব।

ব্রহ্ম হওয়া কি? দর্শনের কড়াকড়ি ছাড়িয়া দিয়া বলিতে পারি, আমরা সকলেই ব্রহ্ম হইবার জন্য অহরহ চেষ্টা করিতেছি।

* মাঘমাসের বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধের পূর্ব্বভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটী কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ওরিয়েণ্টাল ক্লবে ১৯০৫ সালের ৬ই জানুয়ারি পঠিত হইয়াছিল।

আমরা চাই কি? আমরা চাই অর্থ, সম্মান, সুখ, সৌন্দর্য্য; আমরা চাই জ্ঞান; আমরা চাই স্বাস্থ্য, বল এবং দীর্ঘজীবন। আমাদের প্রার্থিত বস্তুগুলিকে প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম সত্তা, দ্বিতীয় আনন্দ, তৃতীয় জ্ঞান। এই সত্তা আনন্দ ও জ্ঞানের সম্মিলিত মূর্ত্তিই ব্রহ্ম। কেহই মরিতে চায় না। সকলেই চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবার জন্য উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত। আমরা টাকাকড়ি রোজগার করি কেন? অর্থার্জ্জনের অন্য উদ্দেশ্য আছে সত্য, কিন্তু ইহার একটি উদ্দেশ্য যে দীর্ঘজীবন লাভ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যদি 'চাকর' না হই, তবে পেট চলে না, কাজেই আমরা সাধ করিয়া 'চাকরি' লই। আর, যাহার উদরান্নের সংস্থান আছে, তিনিও যে, অনেক সময়, চাকর হইয়া কৃতকৃত্য হন, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ তিনি নূতন সুখ চান। সুখ ও সত্তা—ইহারাই আমাদের মুখ্য অধিগন্তব্য।

কথাটা আর একটু বিস্তার করিয়া বুঝাইতেছি। সকলেই বাঁচিয়া থাকিতে চায়, কেহই মরিতে চায় না। অমর হওয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কি আছে? বিভীষণ বর চাহিলেন—

পরমাপদ্গতস্যাপি ধর্ম্মে মম মতির্ভবেৎ।
(উঃ ১০।৩৩)

অর্থাৎ বিষম বিপদে পড়িলেও যেন ধর্ম্মে আমার মতি থাকে। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন

যস্মাদ্রাক্ষসযোনৌ তে জাতস্যামিত্রনাশন।
নাধর্ম্মে জায়তে বুদ্ধিরমরত্বং দদামি তে। ১০।৩৪-৩৫

হে শত্রুনাশক, যেহেতু রাক্ষসযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও তোমার বুদ্ধি অধর্ম্মে যায় না, অতএব আমি তোমাকে অমরত্ব দিলাম। ব্রহ্মা জানিতেন অমর হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ। উপনিষদেও দেখিতে পাই—

সাহোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা
পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনাঽমৃতা স্যামিতি।

এইরূপ উক্ত হইয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন, "ভগবন্ যদি এই রত্নপ্রসূ সমগ্র পৃথিবী আমার হয়, তাহা হইলে কি অমর হইব?" মৈত্রেয়ী অমর হইতে চাহিয়াছিলেন। লোকে কীর্ত্তির জন্য অনেক কাজ করিয়া থাকে। যে কীর্ত্তি জীবদ্দশায় কোনও সুখ আবহন না করে, লোকে তাহার জন্য লালায়িত হয় কেন? ইহার কারণ এই যে, মনুষ্য মরণের পরও ইহ লোকে বাঁচিয়া থাকিতে চায়। তাহার শরীর না থাকুক, তাহার নাম ত রহিল! প্রাপ্তজননশক্তি সকল জীবই অপত্য লাভের জন্য লালায়িত হয়। ইহারও মূল কারণ আয়ুঃকালের বৃদ্ধি করা। আমরা মরিলাম—কিন্তু আমাদের স্নেহের সন্তানগণ রহিল। শ্রুতি বলিতেছেন—প্রজামনু প্রজায়সে তদু তে মর্ত্ত্যামৃতম্ (আপস্তম্ব ২।২৪।১ দেখ) অর্থাৎ হে মরণধর্ম্মা মানব, তুমি সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ কর, ইহাই তোমার পক্ষে অমৃতত্ব। আমরা নিজ নিজ শরীরের বা জীবনের রক্ষা ভিন্ন, সমাজের রক্ষার জন্যও, অনেক কাজ করিয়া থাকি। সমাজ বা দেশ রক্ষা করাও আমাদের অন্যতম আদর্শ। সমাজ রক্ষা করিতে চেষ্টা করাও ব্রহ্ম হওয়ার আকাঙ্ক্ষা মাত্র। ব্রহ্মের সত্তাংশ লইয়া এই আদর্শ গঠিত হইয়াছে। স্বাস্থ্য বল প্রভৃতিও এই সত্তারূপ আদর্শের অন্তর্গত।

ধন মান প্রভৃতি সুখের উপায়। সুখ এবং সুখের উপায় যে আমাদের প্রার্থিত তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা ব্রহ্মের আনন্দাংশ।

জ্ঞান পাইবার জন্য মানুষ স্বতঃই উৎসুক হয়। বালক নূতন জিনিস্ দেখিলেই তাহার পরিচয় করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। জ্ঞান-পিপাসা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইহার প্রেরণায় বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক, জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, এমন কি অনেক সময় জীবনকে বিপন্ন করিয়া, নূতন সত্যের পশ্চাতে ধাবিত হন্। এই জিজ্ঞাসা ব্রহ্মের বিজ্ঞানাংশ লাভের চেষ্টা।

প্রত্যেক মানুষের হৃদয়েই এই তিন সনাতন আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদের অঙ্গাঙ্গিভাবের জন্যই আমাদের আদর্শের এবং আমাদের আদর্শপরিচালিত জীবনের মধ্যে এত পার্থক্য হইয়া পড়ে। যেরূপ সত্ত্ব রজ ও তম এই তিনটী বস্তুর সম্মিলনে এই বহুভেদ-পূর্ণ বিচিত্র জগত সৃষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ নানা-রূপ আদর্শ এবং নানাবিধ জীবন এই তিনটী মহাদর্শের মিলনেই গঠিত হইয়াছে।

এই তিন আদর্শের ভেদেই জাতীয় জীবনেরও ভেদ হইয়া থাকে। যাহাদের দর্শন কেবল "সত্তাকে" জীবনের আদর্শ বলিয়া ধরিয়াছে, তাহাদের বাহ্যজীবনে—জনসাধারণের জীবনে যে, যে কোনও রূপে দেহরক্ষাই পরম পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে? নৈয়ায়িক-পরিচালিত বাঙ্গালী চারিটী উদরান্ন পাইলেই যথেষ্ট মনে করে। দেহ ত রহিল। প্রাণ ত গেল না। এখন ইংলণ্ডের বিষয় দেখা যাক্। ইংরাজ দার্শনিকেরা, হবস্ (Hobbes) এবং বেকন্ (Bacon) হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক মিল্ (Mill) এবং স্পেন্সার্ (Spencer) পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই সুখ বা আনন্দ চান। ইংরাজ utilitarian; যাঁহারা utilitarian নহে, তাহাদের মোক্ষেও আনন্দ আছে। ইংরাজ তাই দেহের জন্য ভাবে না। যদি সুখ না হইল, তবে বাঁচিয়া লাভ কি? সত্তা ত জীবনের লক্ষ্য নহে। সত্তা ত থাকিবেই,—তাহার জন্য চেষ্টার দরকার কি? তাই ইংরাজ বাহ্যসুখসম্পদে পৃথিবীতে অতুলনীয়। সুধু জ্ঞানের জন্য কোথাও জাতীয় জীবন পরিচালিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তবে প্রাচীন ঋষিপরিচালিত ভারতে সে ভাব যে কতক ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই তিনই ভুল। এই তিনটী আদর্শের সম্মিলনে যে নূতন জাতি গঠিত হইবে, সেই জাতিই ধন্য। জাতি থাকিবে, জাতি জ্ঞানের জন্য জ্ঞান খুঁজিবে, জাতি আনন্দের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিবে; এমন জাতি কি গঠিত হইবে? বর্ত্তমান ইয়ুরোপ, জাপান ও আমেরিকা যে ধীরে ধীরে এই দিকেই অগ্রসর হইতেছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইল যে সকলেই সত্ত্ব জ্ঞান ও আনন্দ চায়। সকলেরই বাস্তব আদর্শ ইহাই। কিন্তু এই আদর্শ লাভ করা যায় কিনা? আদর্শ থাকিলেই যে তাহা লাভ করা যায়, এরূপ নহে। মনে কর, আমি আজ হইতে একাধারে ভাস্করাচার্য্যের মত জ্যোতিষী, শঙ্করের মত দার্শনিক, কালিদাসের মত কবি, গঙ্গেশের মত তার্কিক, পাণিনির মত বৈয়াকরণ হইতে চাহিলাম। এইরূপ আদর্শ ইহজীবনে লাভ করার সম্ভাবনা আছে কি? লৌকিক দৃষ্টিতে বলিব, নাই। পতঙ্গ জলন্ত অগ্নিশিখায় শরীর শীতল করিবার চেষ্টা করিয়া

যেরূপ কৃতকৃত্য হয়, আমাদের আদর্শ অধিগন্তব্য না হইলে—অতিমানুষিক হইলে—আমাদেরও সেই দশা হইবে। অতএব দেখা যাউক যে আমাদের বাস্তব আদর্শ—যাহা বেদান্তের আদর্শও বটে—তাহা বস্তুত অধিগন্তব্য কি না? এ বিষয়ে দার্শনিকদের মতভেদ আছে। বৌদ্ধ বলেন এ আদর্শ একেবারেই অনধিগম্য। শূন্য হইয়া যাওয়াই সম্ভবপর এবং শূন্যই আদর্শ। নৈয়ায়িক বলেন যে, সত্তা, আনন্দ এবং জ্ঞান এই তিনের মধ্যে একমাত্র সত্তাই অধিগম্য; আনন্দ ও জ্ঞান অধিগম্য নহে। মোক্ষে আত্মার সত্তা থাকিবে কিন্তু জ্ঞান এবং আনন্দ থাকিবে না। সাঙ্খ্য বলেন যে, সত্তা এবং জ্ঞান, এই দুইই অধিগম্য—আনন্দ অধিগম্য নহে। কারণ আনন্দ দুঃখসাপেক্ষ। দুঃখ বিনা সুখ হইতে পারে না। অতএব মুক্তিতে সচ্চিদানন্দ হওয়ার আশা দুরাশা। মুক্ত পুরুষ চিদ্রূপ এবং সত্তাবিশিষ্ট। বেদান্তী বলেন যে, জীবের এই বাস্তব (actual) আদর্শের তিনটী অবয়বই অধিগম্য। মোক্ষে সচ্চিদানন্দরূপে আত্মা বিরাজ করে। বেদান্তের মত এবং লৌকিক মত একই। এ বিষয়ে বেদান্ত খুব সৌম্য দর্শন। নৈয়ায়িকের ভাষায় "ভীমঃ খলু অপবর্গঃ" বলিয়া বৈদান্তিককে অনুযোগ দেওয়া যায় না।

এই গেল বেদান্তের আদর্শ। এখন এ আদর্শ লাভের উপায় কি? এ প্রশ্নের উত্তর বেদান্তের অধিকারিনির্ণয়প্রস্তাবে এবং বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, এবং মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মার্দ্ধ প্রভৃতিতে এই উপায় অতি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, অস্মদাদির দৈনিক কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করা ভিন্ন, অন্য কোনও উপায়েই মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। সত্য বটে যাবতীয় ভারতীয় দর্শনই জ্ঞানবাদী (gnostics) অর্থাৎ জ্ঞানকেই মোক্ষের উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু এই জ্ঞানলাভের উপায় সাধুজীবন, ঈশ্বরে ভক্তি ও যোগ। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে

> নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
> নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥
>
> কঠ ২।২৪।

অর্থাৎ দুরাচারনিরত, অশান্ত, অসমাহিত, অশান্তচিত্ত ব্যক্তি কেবলমাত্র জ্ঞানদ্বারা আত্মলাভ করিতে পারে না। সর্ব্বদা অর্থার্জ্জনে নিরত থাকিয়া, সামাজিক প্রতিপত্তিকে জীবনের লক্ষ্য করিয়া, কেহই জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। কি অস্মদ্দেশীয় জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য্য কি বা বৈদেশিক জ্ঞান-ঋষি নিউটন্ বা কান্ট্ কেহই শারীরিক সুখ বা লৌকিক যশ বা অর্থলিপ্সা প্রণোদিত হইয়া জ্ঞানী হইতে পারেন নাই। জ্ঞানকে জীবনের লক্ষ্য না করিলে, জ্ঞান আসে না। সরস্বতী যে কেবল লক্ষ্মীর সপত্নী তাহা নহে। সরস্বতী সমস্ত দেবতার সপত্নী: "সরস্বতী"র সাক্ষাৎ করিতে হইলে, অন্য সকল উপাসনাকে গুণীভূত করিয়া, বিদ্যাদেবীর চরণপ্রান্তে অনন্যশরণ হইয়া লুটাইয়া পড়িতে হয়। এই অনন্যশরণতা, একাগ্রতা এবং ভক্তির অভাব হইলে, দেশে আইন করিয়া জ্ঞানপিপাসু জন্মানের চেষ্টা করিতে হয়। কঠোর কর্ত্তব্যব্রত পালন করা যদিও জ্ঞানলাভের উপায়ের মধ্যে অন্যতম, যদিও

কর্ত্তব্যচ্যুত ব্যক্তি কখনও জ্ঞানলাভ করিতে পারে না, তথাপি কেবলমাত্র সত্য আচরণ, ইন্দ্রিয়সংযম, প্রভৃতি কর্ত্তব্যপালনকে জ্ঞান-লাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। উহারা জ্ঞানমন্দিরের প্রথম সিড়ি। বিশেষত সত্য আচরণ এবং ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি কার্য্যে পরিণত করা অতি দুষ্কর। উহাদের জন্য অন্য উপায় চাই। যোগবল না থাকিলে, শারীরিক বল না থাকিলে, কেহই ইন্দ্রিয়সংযমে সক্ষম হয় না। শ্রুতি বলিতেছেন—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

বলহীন ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। চিত্তবৃত্তিগুলিকে অন্তর্ম্মুখীন করা এবং সংসারে বিরক্ত হওয়া—এই দুইটাই ভারতীয় ঋষিদের আবিষ্কৃত জ্ঞানলাভের অসাধারণ উপায়। এ উপায় আজ কাল্ বড় আদরণীয় হয় না। কিন্তু এই উপায়ই আমাদের যাবতীয় শাস্ত্রের বিশেষত্ব। যোগ এবং বৈরাগ্য খাঁটি ভারতীয় জিনিস্। বেদান্ত বলেন ইহা ভিন্ন জ্ঞান হয় না—জ্ঞান ভিন্ন মোক্ষ হয় না। এখানে এই-টুকু বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বেদান্তের আদর্শে Hedonism, Rigorism এবং Social Preservation এই তিন আদর্শই সম্পূর্ণ স্থান পাইয়াছে।

মনোবিজ্ঞান (psychology)। বেদান্তের আদর্শবাদ বা Ethics হইতে বিদায় লইয়া, চলুন আমরা বেদান্তের মনোবিজ্ঞান বা psychologyতে প্রবেশ করি। প্রত্যক্ষ খণ্ড (Doctrine of Perception)। প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচীন বেদান্তের সিদ্ধান্ত তত পরিস্ফুট নহে। বেদান্ত অদ্বৈতপ্রতিপাদনে যত্ন করিয়াছেন। অন্যান্য তত্ত্ব অঙ্গভাবে বিবেচিত হইয়াছে মাত্র। তাই, প্রাচীন বেদান্তে যে কিরূপ সিদ্ধান্ত ছিল তাহা বুঝা যায় না। এখানে যাহা বলা যাইবে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

এ বিষয়ে বেদান্ত এবং সাংখ্যের সিদ্ধান্ত অনেকটা একই রকম ; চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চক্ষু-রিন্দ্রিয় বিষয় দেশে যায় ; পরে অন্তঃকরণ নামক অতি সূক্ষ্ম স্বচ্ছ পদার্থ ঐ ইন্দ্রিয়পথে যাইয়া বিষয়কে ছাইয়া ফেলে। ইহার নাম বুদ্ধিবৃত্তি। এই বৃত্তিতে চৈতন্য প্রতিফলিত হইলে বিষয়জ্ঞান উদিত হয়। বিষয়টা কি দাঁড়াইল, তাহা সুধীগণ বুঝিয়া লইবেন। এত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বুঝা কঠিন। নৈয়ায়িকের মোটা কথাই আমাদের কাছে ভাল লাগে। নৈয়ায়িক বলেন, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে। কেন জন্মে, কিরূপে জন্মে প্রভৃতি সূক্ষ্ম বিষয়ের ধার নৈয়ায়িক ধারেন না। জড় কিরূপে চৈতন্যের উপর কার্য্য করিবে, চৈতন্য কিরূপে জড়কে বুঝিবে, এ প্রশ্ন লইয়া বিতণ্ডা না করিয়া নৈয়ায়িক ইয়ুরোপের স্কটীয় নৈসর্গিকজ্ঞানবাদি দর্শনের (common sense philosophy) ন্যায় বলিয়া দিলেন যে জড় বিষয় চৈতন্যের গোচর হয় ; ইহা বস্তুর স্বভাব। জার্ম্মান্ দার্শনিক-দিগের মতন আমাদের সাংখ্য বেদান্তী নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তকে মোটা বলিয়া—প্রাকৃত জ্ঞান বলিয়া—উপেক্ষা করেন করুন্, কিন্তু ন্যায়ের প্রত্যক্ষ-সিদ্ধান্ত যে বেদান্তের প্রত্যক্ষ-সিদ্ধান্তের ন্যায় দুর্ব্বোধ নহে, তাহা স্থির। এই অবসরে ইহাও বলিয়া লই যে, নৈয়ায়িকসম্মত জ্ঞান-লক্ষণা প্রত্যাসত্তি এবং সামান্য-লক্ষণা প্রত্যাসত্তি না স্বীকার করিয়া বেদান্তী নিজের

সূক্ষ্ম দৃষ্টিরই পরিচয় দিয়াছেন। নৈয়ায়িক বলেন যে, একটী ঘট দেখিলেই নিখিল ঘটের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। নৈয়ায়িক কেন এই লোক-যুক্তি-বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন, বলিতেছি। অনুমানের প্রামাণ্য মানিতে হইলে, ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞানের প্রামাণ্য জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ব্যাপ্তিজ্ঞান, অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে বহ্নি এই জ্ঞান, কিরূপে উৎপন্ন হইল? "শতশঃ সহচরিতয়োরপি ব্যভিচার-দর্শনাৎ"—শত শত হাজার হাজার স্থলে ধূম ও বহ্নির সামানাধিকরণ্য দেখিলেও, তদ্দ্বারা ধূম বহ্নিব্যাপ্য এই জ্ঞান জন্মিতে পারে না। হাজার স্থলে ধূম ও বহ্নি একত্র, এক-স্থানে আছে বটে, কিন্তু হাজার এক স্থলেও যে থাকিবে তাহার প্রমাণ কি? বিশেষত, ধূম বহ্নিব্যাপ্য এই জ্ঞানটী, এই ধূমটী বহ্নিব্যাপ্য, এই ধূমটী বহ্নিবাপ্য এইরূপ বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিলে, ইহাও একরূপ অনুমানই হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু অনুমানের প্রামাণ্য এখন নিরূপিত হয় নাই। এ বিষয়ে বিস্তার করা নিষ্প্রয়োজন। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের চার্ব্বাকদর্শন এবং তত্ত্বচিন্তামণির ব্যাপ্তিগ্রহের পূর্ব্বপক্ষে এ সকল কথা অতি সুন্দররূপে বলা হইয়াছে। কাজেই অগত্যা স্বীকার করিতে হয় যে, ব্যাপ্তিগ্রহ প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা হইয়া থাকে। তাহা হইলেই নিখিল ধূমের প্রত্যক্ষের দরকার। এই নিখিল ধূমের প্রত্যক্ষ সামান্য বা জাতি দ্বারাই হইয়া থাকে। এইরূপে অনুমানের প্রামাণ্যরক্ষার জন্যই বোধ হয়, সামান্যলক্ষণা প্রত্যাসত্তি মানা হইয়া থাকে। সংশয়ানুৎপত্তি প্রভৃতি দোষ সহজে সমাহিত হইতে পারে। বস্তুতঃ দার্শনিক "শিরোমণি" সামান্যলক্ষণা স্বীকার করেন নাই।

আমাদের মনোবিজ্ঞান বা psychology জড়বিজ্ঞানের পন্থা অনুসরণ করিয়া কেবল লৌকিকপ্রত্যক্ষ ও অনুমানগম্য বস্তুতত্ত্ব লইয়াই বিব্রত থাকে নাই। ইহারা লিঙ্গদেহ প্রভৃতি স্বীকার করিয়াছেন। চিৎ জড়ের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে, এইরূপ ধারণা করাও অসাধ্য। এই জন্যই এই ভৌতিক দেহাপগমে, সূক্ষ্ম দেহ অবশ্য স্বীকার্য্য। বিশেষতঃ যোগাদি-দ্বারা এই লিঙ্গদেহের প্রত্যক্ষ অসম্ভব নহে। বর্ত্তমান থিওসফি এবং সাইকিকাল্ রিসার্চ্ সমিতি যে সকল বিষয়ে আলোচনা করেন, তাহা সমস্তই এতদ্দেশীয় দর্শনে বর্ত্তমান ছিল। আমাদের মনোবিজ্ঞানে metapsychicsই প্রধানত আলোচিত হইত।

চিচ্ছক্তি বা জ্ঞান কেবল মনুষ্যে সীমাবদ্ধ, এরূপ নহে। পশুপক্ষী কীট পতঙ্গে ত জ্ঞান আছেই। উদ্ভিদও জ্ঞানবিহীন নহে। বস্তুত জড় প্রস্তরখণ্ডেও সুষুপ্ত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা বৈদান্তিকের অসম্ভব নহে। এইরূপে দেখিতে গেলে সমস্ত জগৎ চিন্ময় হইয়া যায়। প্রত্যেক পরমাণুতেও চিচ্ছক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

উদ্বোধন সংক্রান্ত নিয়মগুলিও (laws of suggestion) স্থূলত আমাদের দর্শনে দেখিতে পাই। তবে কয়টী মৌলিক নিয়ম মানিলেই চলে প্রভৃতির বিশেষ আলোচনা দেখি না। কারণ যে কার্য্যের স্মারক ইহা নিশ্চয়ই আচার্য্যদিগের বিদিত ছিল।

বেদান্তের 'মনোবিজ্ঞান' বুঝাইতে গিয়া,

আর একটী কথা বলিয়া শেষ করিব। আত্মার স্বরূপ কি? আত্মার স্বরূপ জ্ঞান না অজ্ঞান? আত্মা স্বভাবত চেতন না অচেতন? বেদান্তী বলেন, আত্মার স্বরূপ জ্ঞান। জ্ঞান ভিন্ন আত্মা থাকিতে পারে না। যেমন দেশব্যাপিত্ব জড়ের (matter) অব্যভিচারী ধর্ম্ম, সেইরূপ জ্ঞান আত্মার অব্যভিচারী ধর্ম্ম। ইহা আত্মার primary attribute. যদি ইহাই স্বীকার করিলাম, তবে আরও স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মা সুষুপ্তিতেও জ্ঞানবান্ থাকে। কারণ সুষুপ্তির সময় যে আমাদের আত্মার ধ্বংশ হয় না, এ কথা সকলেই মানেন। যদি আত্মা থাকে, তবে তাহার অব্যভিচারী ধর্ম্ম জ্ঞানও থাকিবেই। এইখানেই গোলমাল। সুষুপ্তি স্বপ্নহীন নিদ্রা। এ অবস্থায়ও আমাদের জ্ঞান থাকে, এরূপ মনে করার আপাতত কোনও কারণই দেখা যায় না। নৈয়ায়িক ইহা দেখিয়াই বলিলেন, জ্ঞান আত্মার অব্যভিচারী ধর্ম্ম নহে, আত্মা সুষুপ্তিতে জ্ঞানহীনরূপেই অবস্থান করে; অতএব মোক্ষেও আত্মার জ্ঞান থাকিবে না। কোনটী সত্য? কে বলিবে কোনটী সত্য? আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে এ বিবাদ যে কেবল ভারতীয় দর্শনেই সীমাবদ্ধ, তাঁহা নহে। ইয়ুরোপে দেকাত (Discartes) বলেন, হামিল্টন্ (Hamilton) বলেন যে সুষুপ্তিতেও জ্ঞান থাকে। এই জ্ঞানের নাম unconscious mental modification. লক্ (Locke.) বলেন, সালি (Sully) বলেন, জেমস্ (James) বলেন, সুষুপ্তিতে জ্ঞান থাকে না।

প্রমাণ শাস্ত্র (Logic)?

ভারতীয় প্রত্যেক দর্শনেরই একটী স্বতন্ত্র প্রমাণ বা তর্ক প্রকরণ আছে। উহারা তত্ত্বদর্শনের ভূমিকাস্বরূপ। বেদান্তীয় তর্কশাস্ত্রকে অক্ষপাদীয় তর্কশাস্ত্রের নিকট হার মানিতে হইবে। আবার ন্যায়ের তর্কশাস্ত্রও সাঙ্খ্যতর্কশাস্ত্রের নিকট পরাস্ত।

বেদান্তে ছয়টী মূল প্রমাণ মানা হইয়াছে। শ্রীমৎ সুরেশ্বরাচার্য্যের কারিকা ইহার প্রমাণ। নৈয়ায়িক চারটী প্রমাণ মানেন। আমরা কিন্তু দেখিতে পাই যে বস্তুত সাংখ্য কথিত তিনটী প্রমাণ দ্বারাই বেদান্তের সমস্ত কাজ চলিতে পারে। বস্তুত, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান, কেবল মাত্র এই দুইটী প্রমাণ দ্বারা যেরূপ ইয়ুরোপের দর্শনশাস্ত্র চলিতেছে, আমাদের দর্শনও সেইরূপ চলিবে না কেন? বৌদ্ধেরা এবং বৈশেষিকেরা এই দুটী প্রমাণই মানিতেন।

নৈয়ায়িকেরা "ন্যায়বাক্যে" পাঁচটী অবয়ব মানেন। বেদান্তীরা মানেন তিনটী। এ বিষয়ে বেদান্তীই যুক্তিযুক্ত পথ অবলম্বন করিয়াছেন। পরের নিকট কোনও সিদ্ধান্ত বুঝাইতেও প্রতিজ্ঞা হেতু উদাহরণ বা উদাহরণ উপনয় নিগম এই তিনটীই যথেষ্ট। ইয়ুরোপীয় দর্শন দেখুন।

বেদান্তদর্শন (সূত্র, ভাষ্য, প্রকরণ গ্রন্থাদি) উপনিষদের টীকা। অবশ্য খুব উপাদেয় টীকা। এই টীকায় যে উপনিষদকে "প্রমাণ" বলিয়া ধরিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? কাজেই তিনটী প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—বেদান্তকে মানিতেই হইবে। অপর প্রমাণগুলি কেন মানা হইয়াছে, ভাবিবার বিষয়। বোধ হয়, বেদান্ত দর্শনের বা উপনিষন্মীমাংসার যখন প্রথম উন্মেষ হইয়াছিল, তখন প্রমাণত্রয়বাদী সাংখ্য বা প্রমাণচতুষ্টয়বাদী নৈয়ায়িকের আবির্ভাব হয় নাই। পরে আমাদের সনাতন

নিয়মানুসারে, ন্যায় ও সাঙ্খ্যের আবির্ভাবের পরেও, বেদান্ত পুরাতন অনাবশ্যক প্রমাণগুলি ছাড়িতে পারেন নাই। আমরা পুরাণ ছাড়িতে অক্ষম।

বেদান্তের মতে উপনিষদ্ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। যাঁহারা আগমের (revelation) প্রামাণ্য মানেন, তাহারা সকলেই একবাক্যে আগমকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য। কিন্তু এ বিষয়েও একটু রহস্য ঘটিয়াছে। আগমের প্রকৃত মত কি তাহা কিরূপে ঠিক্ করিব? তুমি 'আগম' পড়িয়া একরূপ অর্থ করিলে, আমি আর একরূপ অর্থ করিলাম, ইহার কোনটী আগমের যথার্থ প্রতিপাদ্য? নৈয়ায়িক, সাঙ্খ্য, বৈদান্তিক, এবং বৈদান্তিকের মধ্যেও শ্রীমৎ শঙ্কর, শ্রীমৎ রামানুজ, শ্রীমৎ আনন্দতীর্থ, শ্রীমৎ বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি সকলেই আগমের প্রামাণ্য মানেন। কিন্তু প্রত্যেকেই বলেন যে, তাঁহার নিজকল্পিত অর্থই ঠিক্। অন্যান্য অর্থ ঠিক্ নহে। কাজেই মুখে যিনি যাহাই বলুন না কেন, বস্তুত যুক্তিই প্রধান প্রমাণরূপে দাঁড়াইয়াছে। প্রথমে উপনিষৎ পড়িয়া যুক্তিদ্বারা তাহার অর্থ ঠিক করিবে, পরে সেই অর্থই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে।

ঈশ্বরতত্ত্ব ও ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব (Theology and Cosmology)।

বেদান্তী অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈতবাদে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই সত্তাই পরম সত্তা। যদি এক ভিন্ন দুই নাই থাকে, তবে ঈশ্বরই বা কি আর সমস্ত জীবই বা কি? এই সহজ কথার জন্য, কি দেশীয় কি বিলাতী সমস্ত অদ্বৈতবাদীই নিরীশ্বর-বাদী বলিয়া অভিহিত হন। তাহাদের কথাটা এই :—

খৃষ্টানের মতে, ঈশ্বর পরমাণু সৃষ্টি করিয়াছেন, এমন কি দেশও (space) সৃষ্টি করিয়াছেন। নৈয়ায়িকের মতে, কিন্তু ঈশ্বর কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। তিনি একজন বড় ছুতোর বা মিস্ত্রি। যেমন ছুতোর লৌহ এবং কাঠ লইয়া তাহারই বিভিন্নরূপ বিন্যাস-দ্বারা টেবল্, চেয়ার্, নৌকা, ষ্টীমার প্রভৃতি তৈয়ার করে, তদ্রূপ নৈয়ায়িকের ঈশ্বরও চারি প্রকার পরমাণু এবং দেশ ও কাল লইয়া এই ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার, খৃষ্টানের আত্মাও সৃষ্ট পদার্থ। পুংশক্তি এবং স্ত্রীশক্তির সম্মিলনকালে ঈশ্বর এক একটী নূতন আত্মা সৃষ্টি করেন। নৈয়ায়িকের আত্মা কিন্তু নিত্য পদার্থ, ঈশ্বর তাহাকে সৃষ্ট করেন নাই। ঈশ্বরও যতদিন আছেন, জীবাত্মাও ততদিন আছেন। খৃষ্টানের মতে, ঈশ্বরের ক্ষমতা খুব বেশী—নৈয়ায়িক এবং ভারতীয় অন্যান্য প্রায় সকল দর্শনের মতেই ঈশ্বরের ক্ষমতা একটু কম। এইজন্য নৈয়ায়িক খৃষ্টানের নিকট নিরীশ্বরবাদী বলিয়া গণ্য। বেদান্তের ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং ন্যায়ের ঈশ্বরের ক্ষমতা প্রায় একরূপ। এইজন্য আমরা নিরীশ্বর বলিয়া অভিযুক্ত। কিন্তু এ অভিযোগ তর্কসহ নহে। ঈশ্বর কি? আমরা বলি, যাঁহাকে উপাসনা করা যায়, যিনি উপাসনার ফল দিতে পারেন, যিনি সংসারের নিয়ন্তা তিনিই ঈশ্বর। এই লক্ষণক্রান্ত ঈশ্বর বেদান্তী মানেন। কিন্তু ঈশ্বরের সর্ব্বতোমুখী সর্ব্বশক্তিমত্তা মানেন না। উহা কেহই মানেনা। খৃষ্টানের ঈশ্বরও এক এবং এক মিলাইয়া পাঁচ করিতে পারেন না। ইহাতে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি না হইলে, জীবাদির

স্রষ্টা না হইলেই যে তাঁহার সর্ব্বশক্তিতে আঘাত লাগে একথা আমরা স্বীকার করি না। আর আধুনিক পরমাণুর এবং শক্তির নিত্যতাবাদ (doctrines of the persistence of matter and force) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তও আমাদেরই পক্ষে।

অতএব বেদান্তী ঈশ্বর মানেন। ঈশ্বর কর্ম্মফলদাতা। তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি। তিনি করুণাময়। তিনি করুণাময় হইলেও সংসারে জরা, ব্যাধি, মৃত্যুরূপ দুঃখ থাকিতে পারে। কারণ, ঈশ্বর প্রাণি-কর্ম্ম-সাপেক্ষ হইয়া সৃষ্টি করেন। আমি এ জন্মে যেরূপ কাজ করিলাম, যেরূপ জ্ঞান অর্জ্জন করিলাম, পরজন্মেও "যথা প্রজ্ঞং যথা কর্ম্ম" তদনুরূপ শরীর-সম্বন্ধ লাভ করিব। ইহাতেই সিদ্ধ হইতেছে যে জীব অনাদি। ঈশ্বর জীবের স্রষ্টা নহেন, নিয়ন্তামাত্র।

বেদান্তের ব্রহ্মাণ্ড-সংস্থান পৌরাণিক। উহাতে কোনও বিশেষত্ব নাই। তবে এইটুকু বক্তব্য যে, নক্ষত্র মণ্ডলে এবং মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহেও যে জীবসঞ্চার আছে,একথা বেদান্তী মানেন। একমাত্র পৃথিবীই যে জীবের লীলাভূমি, তাহা নহে।

বেদান্তের সৃষ্টিরহস্যে কোনও বিশেষত্ব নাই। ঈশ্বর পঞ্চ ভূতসূক্ষ্ম সৃষ্টি পূর্ব্বক, তাহার পঞ্চীকরণে পঞ্চমহাভূত সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা স্থূল প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়াছেন। এটী আমাদের মোটা জড় বিজ্ঞানের ফল। পঞ্চীকরণ সকল আচার্য্যের সম্মত নহে। শ্রীমৎ বাচস্পতি ভামতীতে উহার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সুরেশ্বরের পঞ্চীকরণ বার্ত্তিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। প্রশ্ন হইতেছে যে, বাচস্পতি সুরেশ্বরের অবতার হইলে, এইরূপ বিরোধ হইল কেন?

প্রাক্ কর্ম্মপরিপাকবশাৎ পুনস্ত্বম্
বাচস্পতিত্বমধিগম্য বহুজ্ঞরারাম্।
ভব্যাং বিধাস্যসিতমাং মম ভাষ্যটীকাম্
আভুতসংপ্লব মধিক্ষিতি সা চ জীয়াৎ॥

(সংক্ষেপ শঙ্করজয়)

অতএব মাধবের মতে, ভামতীতে এবং সুরেশ্বরের গ্রন্থে ভেদ থাকা সম্ভব নহে।

শিক্ষাতত্ত্ব (Art of Teaching)। বেদান্ত গুরুমুখে শুনিয়া বুঝিতে হয়। উপনিষদ্ না পড়িলে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিতে পারে না। গুরু-মুখে শুনিয়া, পরে মনন নিদিধ্যাসনাদি করিলে ব্রহ্মজ্ঞান হইবে। "আ সুপ্তে রামৃতেঃ কালং নয়েদ্ বেদান্তচিন্তয়া। উপনিষদ্ না পড়িয়া শুধু যুক্তিবলে অদ্বৈতে পহুছান অসম্ভব। বিষয়ী এবং বিষয়—জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়—এতদুভয় যে জ্ঞানেরই ভেদমাত্র, এ তথ্য সুধু যুক্তিদ্বারা স্থাপিত হইবার নহে।

উপনিষদের শিক্ষাতত্ত্ব বড় সুন্দর। আজকালকার কিণ্ডারগার্টেন্ ঋষিদের অবিদিত ছিল না। ছান্দোগ্যে শ্বেতকেতুকে তদীয় পিতা কিরূপে উপদেশ দিয়াছেন, একবার মনে করিয়া দেখিলেই, একথা সহজে বুঝা যাইবে। ঋষি বলিলেন এক গ্লাস জলে একটু লবণ (অর্থাৎ এক চাকা সৈন্দব) মিশাও। পুত্র মিশাইল। ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন ঐ লবণ দেখিতেছ কি?" পুত্র বলিলেন "না"। "মুখে দাও"। পুত্র মুখে দিল। ঋষি বলিলেন, "কি বুঝিতেছ?" "বুঝিতেছি যে সমস্ত জল লবণময়"। এইরূপে ঋষি ব্রহ্মের সর্ব্বত্র সত্তার কথা বুঝাইলেন। চর্ম্মচক্ষুতে তাহাকে দেখিতে পাই না সত্য, কিন্তু অন্য উপায়ে, আধ্যাত্মিক আস্বাদনে তাহাকে জানা যাইতে পারে। ঋষি

লবণমিশ্রিত জলের কথা না বলিয়া, জলে লবণ মিশাইয়া দেখাইলেন। আবার একবার শ্বেতকেতুকে ১৫ দিন উপাস করিয়া বুঝিতে হইয়াছিল যে, অন্ন না খাইলে বুদ্ধিবৃত্তি থাকে না। এইরূপ প্রত্যক্ষাত্মক উপদেশ প্রণালীর অভাবে আমরা কেবল "পড়া" পণ্ডিত হইতেছি। চক্ষু ও শ্রোত্রে কত প্রভেদ তাহা ঋষিরা জানিতেন। ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদে যেরূপ ইন্দ্রকে ব্রহ্মচর্য্য করিয়া, দর্পণ দেখিয়া, দাড়ি গোঁপ কামাইয়া, অলঙ্কার পরিয়া উপদেশ নিতে হইয়াছিল, সেরূপ উপদেশ লাভ ভিন্ন কি বস্তুতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়? কিছুতেই না।

ব্রহ্মবিদ্যা (Metaphysics)।

বেদান্তের ভিত্তি ব্রহ্মবিদ্যা। বেদান্তের প্রতিপাদ্য আত্মার একত্ব। এ পর্য্যন্ত আমরা অবান্তর বিষয় লইয়া বিব্রত ছিলাম। এখন বেদান্তর মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়ে আসিয়া পঁহুছিলাম। বেদান্ত বলেন—

সত্যং ব্রহ্ম জগন্ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।

এই তথ্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য উপনিষৎহইতে সংগৃহীত করিয়াছেন। কিন্তু মাধ্যমিক শূন্যবাদের সাহায্যব্যতীত এরূপ একত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে না। যেমন ইয়ুরোপে হিউম্ (Hume) হইতে কান্ট্ (Kant) ও হেগেল (Hegel) এবং শেলিঙ্ (Shelling), ঠিক সেইরূপ শূন্যবাদীহইতে শঙ্কর। মাধ্যমিক সিদ্ধান্ত না বুঝিয়া বেদান্ত বুঝা যায় না। আবার সৌত্রান্তিক বৈভাষিক না বুঝিয়া মাধ্যমিকও বুঝা যায় না। অদ্বৈতে পঁহুছিতে হইলে প্রথমে বাহ্যার্থপ্রত্যক্ষত্ব, পরে বাহ্যার্থানুমেয়ত্ব, পরে বাহ্যার্থাভাব, পরে সর্ব্বাভাব এই দার্শনিক মতচতুষ্টয়ের স্বরূপ অগ্রে বুঝিতে হইবে। এই হিসাবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে প্রথমে ন্যায় ভূমিকা, পরে সাঙ্খ্যভূমিকা পরে বেদান্ত ভূমিকা। এইরূপ করিয়া বেদান্তের তত্ত্ব বুঝাইবার অবকাশ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে হইবে না বলিয়া উহার প্রমাণোপন্যাসে ক্ষান্ত রহিলাম। বস্তুত প্রমাণোপন্যাস অদ্বৈতে সম্ভব নহে। কিরূপে মানুষ ভাবিতে ভাবিতে হয় ক্রমে অদ্বৈতে নয় চার্বাকে পঁহুছিতে বাধ্য হয়, তাহা দেখানই দার্শনিকের উদ্দেশ্য। এখানে এইমাত্র বলিয়া বিরত হইব যে ব্রহ্মশব্দটীতে জগতের প্রকৃতি বা উপাদান কারণ বুঝায়। ব্রহ্ম কথাটীর অর্থ "জগতের মূল জিনিস্।" এই ব্রহ্ম কি? সাঙ্খ্য বলেন সত্ত্ব রজ ও তম—এই ত্রিগুণাত্মক জড় প্রধান বা প্রকৃতিই ব্রহ্ম। বেদান্তী বলেন স্থির সংবিদ্ বা জ্ঞানই ব্রহ্ম। এই জ্ঞানই জগতের একমাত্র পারমার্থিক সত্য। আর যা কিছু সব মিথ্যা। পরিদৃশ্যমান জগৎ শশবিষাণবৎ একান্ত অসৎ নহে। উহা মিথ্যা অর্থাৎ ব্যবহারিক ভাবে সৎ, কিন্তু পারমার্থিক ভাবে অসৎ। সংসার একটা দীর্ঘ স্বপ্ন। স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুগুলিকে সৎ বলিয়া বোধ হয়, কেবল স্বপ্নাবসানেই উহাদের অসত্যতা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, প্রপঞ্চসম্বন্ধেও ঠিক্ তাই। যতক্ষণ অজ্ঞান-স্বপ্ন, ততক্ষণ ভেদজ্ঞান। জ্ঞান হইলেই অদ্বৈত। তাই মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন "দীর্ঘস্বপ্ন ইদং জগৎ।"

বেদান্তবিষয়ে বলিতে গিয়া কেবল শাঙ্করদর্শনেরই বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বেদান্ত মাত্র শাঙ্করদর্শন নহে। মূল বেদান্ত বা উপনিষদ্ হইতে গৃহীত রামানুজদর্শন, মাধ্বদর্শন, শৈবদর্শন প্রভৃতিও বেদান্ত। উহারা শাঙ্করদর্শনহইতে কোন কোন বিষয়ে ভিন্ন

ইত্যাদি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এখানে উপেক্ষিত হইয়াছে। শঙ্করের পূর্ব্বেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ছিল এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। শাঙ্করদর্শন পূর্ণমাত্রায় অদ্বৈত। রামানুজ একটু দ্বৈত মানিয়াছেন। আনন্দতীর্থ "প্রপঞ্চো ভেদপঞ্চকঃ" বলিয়া বেদান্তের অদ্বৈতবাদের অবনতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

শ্রীবনমালি বেদান্ততীর্থ।

রাইবনীদুর্গ।

[ঐতিহাসিক উপন্যাস]

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বনমধ্যে সেই পাঠান সৈনিক কয়জন চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঘটনাবলীর খবর লইতেছিল। যে ব্যক্তি নদীতীরে কুমার এবং বিষুণ তেওয়ারির অনুসরণ করিয়াছিল, সে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা কিছু বুঝিতে পারিল না। কিন্তু দেখিল পদাঙ্কনারায়ণ ঘোড়া হইতে অবতরণ করিয়া নদীগর্ভে অন্তর্হিত হইলেন। হিন্দু বালকটা পাঠান সেনার কবলমুক্ত হওয়ার জন্যই যে তেমন দুঃসাহসের কাজ করিয়া ফেলিল, ইহাতে খাঁ সাহেবের সন্দেহমাত্র রহিল না। বিষুণ তেওয়ারি ফিরিয়া গেলে সে কুমারের অশ্বটী হস্তগত করিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিল এবং দলের লোকের কাছে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

সেই পঞ্চদশ পাঠান সৈন্যের ভিতর ঘোড়সওয়ার কেহ ছিল না—সকলেই পদাতিক। ঘোড়াটি পাইয়া তাহারা ভাবিল শিবাপ্রসন্নদাসের পরিবারবর্গ মধ্যে কাহাকেও গ্রেফ্‌তারির কোন হুকুম কেহ তাহাদিগকে দেয় নাই, তাহা করিলে বিষম একটা জবাবদিহি তাহাদের ঘাড়ে পড়িবে। অথচ দাসজীর জেনানাকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দেওয়াটাও ভারি বেয়াকুবির কাজ। তার চেয়ে এই ঘোড়াটার সওয়ার হইয়া কেহ কেন মনসবদার খাঁর সঙ্গে মোলাকাৎ করিয়া আসুক না? লহমায় যাবে লহমায় আসিবে। এই পরামর্শ প্রথমে যাহার মুখে শোনা গিয়াছিল, সকলে তাহার আক্কেলের তারিফ করিয়া তাহাকেই রাজ-ঘাটে রওনা করিল।

এই অশ্বারোহী অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিতে না করিতে কল্যাণপণ্ডা শত ঘোড়সওয়ার শীর্ষে আসিয়া পড়িলেন। দূর হইতে আলোক ও পদ-শব্দ অনুভব করিয়া পাঠান সৈনিক বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইল বটে, কিন্তু কুমারের প্রিয় ঘোটকটী তাহাতে বাদ সাধিল। সে বারম্বার আহ্লাদ-সূচক উচ্চ হ্রেষারবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল—অনেক চেষ্টা করিয়াও খাঁ সাহেব জানোয়ারটাকে থামাইতে পারিলেন না। বন্যাগর্জ্জনের ধ্বনিতে আর বড় কিছু সুস্পষ্ট শোনা যাইতেছিল না। কিন্তু কল্যাণপণ্ডার চারিদিকে সজাগ সতর্ক দৃষ্টি এবং শ্রবণশক্তিও তুল্যরূপে সুতীক্ষ্ণ। তিনি সেই হ্রেষারবে অদূরে শত্রুসেনা সমাবেশের আশঙ্কা করিয়া বিপদের জন্য প্রস্তুত হইতে সৈন্যগণকে সঙ্কেত

করিলেন। তাঁহার তূর্য্যনিনাদে আদিষ্ট হইয়া পশ্চাতের দশজন সৈন্য ঘোড়া ছুটাইয়া অগ্রসর হইল। ততক্ষণ খাঁ-জি উচ্ছৃঙ্খল বাহনটাকে ছায়া-সঙ্কুল বৃহৎ বৃক্ষমূলে বাঁধিয়া নিজে তাহাতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু পারিলেন না। অগ্রবর্ত্তী সেনা কয়জন তাঁহাকে ঘিরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল এবং কুমার সাহেবের ঘোড়া চিনিয়া চোর মনে করিয়া বেচারিকে সকলেই যথেচ্ছ কশাঘাত করিল। দেখিতে দেখিতে পণ্ডাজীও সসৈন্যে পৌঁছিলেন।

তিনি সেই প্রহারে জর্জ্জরিত পাঠান পদাতিককে দুই চারিটা প্রশ্ন করিয়াই তাহার সঙ্গীদের অবস্থা বুঝিয়া লইলেন। তারপর পদাঙ্ক নারায়ণের অশ্বসহ দুইজন ঘোড়সওয়ারের জিম্মায় তাহাকে রাজঘাটে রওনা করিয়া অবিলম্বে বনপথের অদূরে উপস্থিত হইলেন।

তখন ভারি একটা গোলমাল উপস্থিত হইল। লুক্কায়িত পাঠানসেনা কয়জন অলক্ষ্যে সৌদামিনী দেবীর অনুসরণ করিতেছিল,—অকস্মাৎ কল্যাণপণ্ডার নেতৃত্বাধীনে তত সৈন্য আসিয়া পড়ায় তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়নপর হইল। ইহাতে কাননতলের শুষ্ক পত্ররাশি তাহাদের পদশব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। সুযোগ বুঝিয়া দাসমহাশয়ের লাঠিয়ালের ভিতর কয়জন হল্লা করিয়া তাহাদের পশ্চাৎবর্ত্তী হইল। তাহার উপর বিপদ আশঙ্কা করিয়া বিষুণ তেওয়ারি ঘোড়া ছুটাইয়া আসাতে বনপথ আরো ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

এইখানে নদীর বাঁক রাজঘাট অভিমুখী হওয়ায় বন্যাগর্জ্জন ভীষণতর শুনাইতেছিল। কিন্তু তাহাতে সেই ক্ষুদ্র বনান্তবর্ত্তী কলরব এবং পশ্চাদ্ধাবনের সুস্পষ্ট শব্দরাজি একেবারে নিমজ্জিত হয় নাই। শুনিয়া কল্যাণপণ্ডা তূর্য্যধ্বনি করিলেন। বৃহৎ অজগরবৎ সেই শত সেনা দেখিতে দেখিতে তাঁহার নেতৃত্বাধীনে মশাল আলোকে উদ্ভাসিত কৃপাণধারিণী মাতৃমূর্ত্তির সমীপবর্ত্তী হইল।

দেখিয়া অগ্রবর্ত্তী বিষুণ তেওয়ারি কুমারকে নিরাপদ জানিয়া জয়োল্লাসধ্বনি করিল। ইঙ্গিতে কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে সাবধান করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে বাহকদের বলিল, "মাকে জানাও, সসৈন্যে স্বয়ং পণ্ডাজী উপস্থিত। কুমার সময় সংক্ষেপ জন্য বন্যাস্রোতে ভাসিয়া গিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, আর কোন ভয় নাই!" পদু তাঁহার জন্য ততটা বিপদ আলিঙ্গন করিয়াছে শুনিয়া স্নেহে অভিমানে গৌরবে সৌদামিনীর বুক পূরিয়া উঠিল।

তিনি তরবারি অবনত করিলেন বটে, কিন্তু লজ্জায় অধোবদন হইলেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি "ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ"—এই যে এদেশীয় যাবনিক আদর্শ মুসলমান রাজত্বের সময় হইতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, সৌদামিনী দেবীর শিক্ষাদীক্ষা ঘটনাধীনে ঠিক্ সে পথে পরিচালিত হয় নাই। স্বামী ছাড়া সকল পুরুষকেই তিনি সন্তানবৎ জ্ঞান করিতে শিখিয়াছিলেন এবং পরিচিত সকলেই তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিত। দাসমহাশয়ের নিতান্ত অন্তরঙ্গ সমবয়স্ক বন্ধুরাও তাঁহার মাতৃভাবে মুগ্ধ হইয়া সে সম্মান ও বাৎসল্যের অর্ঘ্য তাঁহাকে অর্পণ করিতেন। তিনিও অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা হইয়া তাঁহাদের সকলেরই সম্মুখীন হইতেন এবং আবশ্যকমত কথাবার্ত্তা বলিতে সঙ্কোচবোধ করিতেন না।

স্বয়ং কল্যাণপণ্ডা দাসমহাশয়ের এই সুহৃদ্‌শ্রেণীর অন্তর্গত। তিনি শেষোক্তের চেয়ে বয়সে কিছু বড়, এজন্য অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া সৌদামিনীর নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম লাভ করিলেন। গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন "মা, তোমায় কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব? আজ তোমার দুর্গতিহারিণী মূর্ত্তি দেখিয়া আমি জগন্মাতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। তুমি আমার কল্যাণীয়া হইয়াও আজ পূজনীয়া। তুমি সুধু শ্বশ্রু এবং পিতৃকুল পবিত্র কর নাই—সমস্ত পুরুষোত্তম ক্ষেত্র তোমার কার্য্যে আজ ধন্য হয়েছে! জগন্নাথ তোমায় সর্ব্বসুখভাগিনী করুন!" কাননতল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া জয়োল্লাস নিনাদিত হইল—"জয় মা ভবানীর জয়"!

কল্যাণপণ্ডা তারপর বলিলেন—"মা এখন পালকীতে উঠ! তোমার স্বামী নিরাপদে রাজঘাটে আছেন, রাজকুমারও নিরাপদে সেখানে পৌঁছিয়াছেন! চল তোমায় সসৈন্যে-আমি উমাপুরে পৌঁছাইয়া আসি!"

বিষুণ তেওয়ারিকে ডাকাইয়া তখন কর্ত্রী পণ্ডামহাশয়কে বলাইলেন যে তিনি এখন বাড়ী না ফিরিয়া একবার বনকুঞ্জে যাইবেন! পদ্মকে সেখানে আনিবার জন্য এখনই ঘোঁড়-সওয়ার রওনা করা হউক! কল্যাণপণ্ডা চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—"বুঝেছি মা, রাণী কৃষ্ণপ্রিয়ার সর্ব্বস্বধনকে একবার তাঁহার কোলে না দেখিয়া তুমি গৃহে ফিরিতে পারিতেছ না!" অশ্বারোহী দুইজন তৎক্ষণাৎ রাজঘাটের দিকে ধাবিত হইল।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

দেবোপহারের ক্রমোৎকর্ষ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মানবের যে সকল বস্তু প্রিয় বা অপ্রিয়, তাঁহারা কল্পনা করিয়া লইয়াছেন, দেবতার পক্ষেও তাহা প্রিয়, বা অপ্রিয় হইবে। এই অনুসারে, যে সকল জাতির মধ্যে নরমাংস ভক্ষণ প্রচলিত ছিল, বা যাহারা তাহাকে অতি উপাদেয় খাদ্যের মধ্যে গণ্য করিত, তাহাদের সম্বন্ধে দেবতাকে নরবলি প্রদান অতি স্বাভাবিক।

প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন দ্বীপের অধিবাসিগণের মধ্যে নরমাংস ভক্ষণ প্রচলিত ছিল। আফ্রিকার নিরক্ষদেশবর্ত্তী কোন কোন জাতি মনুষ্যের কাঁচা মাংস, কোন কোন জাতি বা ঐ দগ্ধ মাংস ভক্ষণ করিতে ভালবাসিত। মঙ্গলীয়গণ (mongols) ভিনিগারে নিমগ্ন মনুষ্য-কর্ণকে অতি সুস্বাদু খাদ্য মনে করিত। মধ্যযুগের জাপান, ও চীনের পূর্ব্ব দক্ষিণ অধিবাসী কোন কোন জাতি যুদ্ধপ্রাপ্ত বন্দিগণের রক্ত পান করিত, ও মাংস ভক্ষণ করিত। এইরূপ তাতার, তুর্ক, তিব্বত, জাবা, সুমাত্রা ও আন্দামান প্রভৃতির অধিবাসীরাও নরমাংসে পরিচিত ছিল।

ভারতবর্ষে নরমাংস ভক্ষণ একেবারেই ছিল না, তাহা বলিতে পারা যায় না। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে সংস্কৃত সাহিত্যে, নরমাংস ভক্ষণের উল্লেখ আছে। দণ্ডীর পূর্ব্ববর্ত্তী গুণাঢ্যকৃত পিশাচভাষাময় বৃহৎ-কথার সংস্কৃত অনুবাদ ‘কথাসরিৎ সাগরে’ ডাকিনী মন্ত্রসিদ্ধির জন্য নরমাংস ভক্ষণ বর্ণিত আছে।* দণ্ডিকৃত দশকুমার-চরিতে দুর্ভিক্ষবশতঃ মনুষ্যমাংস ভোজন লিখিত দেখা যায়।† কিন্তু অতি প্রাচীন সময়ে নরমাংস ভক্ষণ প্রচলিত ছিল, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ দেখা যায় না। বৈদিক আর্য্যগ্রন্থে ইহার অনুকূলে এ পর্য্যন্ত কিছুই দেখি নাই। আদিম-জাতিগণের মধ্যে ছিল কিনা, তাহাও বলিবার উপায় নাই। আমরা ভারতীয় আর্য্যগণের কথাই বলিতেছি, অতএব আদিম জাতির মধ্যে তাহার সদ্ভাব-অসদ্ভাব বিচার করিয়া এখানে কোন লাভ নাই। যে আর্য্যেরা ঐরূপ পুরুষমেধের সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা প্রথমে কিরূপে ঐ ভাব গ্রহণ করিলেন, ইহাই বিচার্য্য।

পরবর্ত্তী সময়ে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে, বা দুর্ভিক্ষ সময়ে যে নরমাংস ভোজনের কথা জানিতে পারা যায়, তাহা দ্বারা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের নরবলির মূল নির্দ্দেশ করা ঠিক হয় না। যদি সেই বৈদিক সময় হইতে বরাবর নরমাংস ভোজনের প্রমাণ পাওয়া যাইত, তবে আমরা তাহা অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার্য্য করিতে বাধ্য হইতাম। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা বলিতেছে না। অতএব আমাদিগকে তজ্জন্য অপর কোন কোন কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। এ কথা যেমন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, সেইরূপ অন্যান্য স্থানেও, যেখানে নরমাংস-ভোজন প্রচলিত ছিল না।

আমরা দেখিতে পাই, বৈদিক সময়ে বৈদিক কবিগণের দেবতার প্রতি দৃঢ়তর বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাঁহারা সেই দেবতার অনুগ্রহ লাভ-প্রত্যাশায় নিরন্তর স্তুতি করিতেছেন, ও বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত আছেন। ইহা অত্যন্ত নৈসর্গিক যে, আশ্রয়প্রদ মহান্ ব্যক্তির সম্পূর্ণ অধীন না হইলে, তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিলে, তাঁহাকে নিজের মনঃপ্রাণ-শরীরে সেবা না করিলে, এক কথায় তাঁহার নিকটে নিজকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ না করিলে, ঐ আশ্রয়দাতার যথার্থ প্রচুর অনুগ্রহ লাভ করা যায় না। দেব উপাসনার ইহাই নিয়ম যে, তাঁহার নিকটে নিজের মনঃপ্রাণ-শরীর সমস্তই উৎসর্গ করা। বোধ

* "ইমা নৃমাংসাশনজা ডাকিনীমন্ত্রসিদ্ধয়ঃ।"
"অভিবিচ্য চ সা মহ্যং তাংস্তান্ মন্ত্রান্ নিজান্ দদৌ।
ভক্ষণায় নৃমাংসঞ্চ দেবার্চনবলীকৃতম্।"
"আত্তমন্ত্রগণা ভুক্ত্বা মহামাংসং চ তৎক্ষণম্।"
"ভক্ষিতাস্তত্র চাস্মাভিঃ সমেত্য বহবো নরাঃ।"
লাবাণকলম্বকঃ, ৬ তরঙ্গঃ (আঃ ২০), ১০৩, ১১১, ১১৪ শ্লোক।
দ্রষ্টব্য—২৫, ১৮২—১৮৩; ২৬, ১৩১-২।

† "ত এত গৃহপতয়ঃ সর্ব্বধান্যানিচয়মুপযুজ্যাজাবিকং, গবলগণং, গবাং যূথং, দাসীদাসজনম্, অপত্যানি, জ্যেষ্ঠমধ্যমভার্য্যে চ ক্রমেণ ভক্ষয়িত্বা কনিষ্ঠভার্য্যা ধূমিনী শ্বো ভক্ষণীয়েতি সমকল্পয়ন্।" ৬ষ্ঠ উঃ, ১৮৪ পৃঃ, (নিঃসাঃ)

হয়, এই মহান্ ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা দেবতার উদ্দেশে আত্মাকে উৎসর্গ করিতেন, নিজের শরীরকে সমর্পণ করিতেন; দেবতার নিকটে নিজেই নিজকে বলি প্রদান করিতেন। এইভাব ভারতের পরবর্ত্তী সাহিত্যসমূহের মধ্যেও চলিয়া আসিয়াছে। সুরথ রাজা নদীপুলিনে ভগবতীর মহীয়সী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া নিজের শরীররক্ত দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। দশানন নিজের সমস্ত আননই ছেদন করিয়া মহেশ্বরের পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন। এ সব কথা সুপ্রসিদ্ধ; এবং এতাদৃশ অন্যান্য কথারও অসদ্ভাব নাই। তাহার পর, প্রায়োপবেশন, ভৃগুপতন, মহাপ্রস্থান, সমুদ্রপ্রবেশ প্রভৃতি ঘটনাও ঐ কথারই সমর্থন করিতেছে। তপস্যা ও কৃচ্ছ্র সান্তপনাদি ব্রতদ্বারা শরীর শোষণ ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদির উপকার করে, কিন্তু যে যে কঠোর কঠোর তপস্যার কথা আমাদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থে শুনিতে পাই, তাহার দ্বারা ইন্দ্রিয় কর্ম্মোচিতভাবে নিগৃহীত না হইয়া, চিরকালের জন্য নিগৃহীত হইয়া যায়। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি
ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতি স্বপ্নশীলস্য
জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥"

ভগবানের আনুকূল্য লাভের জন্য শরীরপাত করাই ঐ সব কঠোর-তপস্যার উদ্দেশ্য।* বুদ্ধদেব তাহার নিষ্ফলতা উপলব্ধি করিয়াই তাঁহার ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনে "মধ্যমা প্রতিপদা" বা মধ্যপথের আবিষ্কার করেন।

পরবর্ত্তী কালের এই ভাব দেখিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী কালেও এইরূপ হইয়া থাকিবে বলিয়া আমরা কেবল অনুমান করিয়া লইতেছি না; বৈদিক সাহিত্যের বহুস্থানে ইহার সমর্থনোচিত বাক্যাবলী দেখিতে পাওয়া যায়।

তৈত্তিরীয় সংহিতার একটি আখ্যায়িকায়† আছে—সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল প্রজাপতি ছিলেন। তিনি প্রজা ও পশুসৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় নিজের বপাকে‡ উদ্ধৃত করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন ও তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। তাহা হইতে "তূপর" (শৃঙ্গরহিত) অজ উৎপন্ন হয়।

শতপথ ব্রাহ্মণের এক আখ্যায়িকায় § আছে—স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তপস্যা করিতেছিলেন, তিনি দেখিলেন—তপস্যায় অনন্তত্ব লাভ

* দ্রষ্টব্য—অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কার সংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ।
কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রাম মচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুর নিশ্চয়ান্।"

† ২.১.১.৪.

‡ বপা উদরস্থ পদার্থবিশেষ। চরকসংহিতায় (শারীর স্থান, তৃতীয় অধ্যায়ে) ত্বক্, লোহিত, মাংস ইত্যাদি ধাতুর সহিত ইহাকে পাঠ করা হইয়াছে। সায়ণ বলেন ইহার আকার বস্ত্রের ন্যায়। তৈ.স. ২.১.১.৪.; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ২.২.২.

§ ১৩.৭.১.১.

হয় না, অতএব আমি ভূত সমূহের নিকট নিজকেই, এবং নিজের নিকটে ভূতসমূহকে হোম করিব। তিনি এইরূপে কার্য্য করিয়া সমস্ত ভূতের শ্রেষ্ঠতা, স্বারাজ্য ও আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। ‡

এ সকল কথা যে অত্যন্ত অদ্ভুত, এবং সর্ব্বপ্রকারে অবিশ্বাস্য, তাহা আজকাল আমরা যেমন বলিব, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও তেমনি বলিয়া গিয়াছেন। স্বকীয় প্রতিপাদ্য বিষয়ে এই সকল কথার যে কোন প্রামাণ্য নাই, তাহা মীমাংসা দর্শনকার স্পষ্টতঃ ও যুক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক বলিয়া গিয়াছেন। জিজ্ঞাসু পাঠকেরা মীমাংসাদর্শনের অর্থবাদাধিকরণ শাবরভাষ্যাদির¶ সহিত আলোচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

এই সকল আখ্যায়িকার কোন প্রামাণ্য না থাকিলেও, তাহাদের মধ্যে যে তদানীন্তন মানব সমাজের হৃদয়ভাব নিগূঢ় রহিয়াছে, তাহা আমরা অবাধে গ্রহণ করিতে পারি। যজ্ঞে তাঁহারা আত্মোৎসর্গ করার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেন, ইহা ঐ আখ্যায়িকা হইতে পাওয়া যাইতে পারে। আমরা ইহার পরেই যাহা আলোচনা করিতে যাইতেছি, তাহা দ্বারাও আমাদের এই কথা সমর্থিত হইতে পারিবে।

কার্য্যে প্রতিনিধিনিয়োগ সনাতন ব্যবহার। নিজে কোন কার্য্য করিতে না পারিলে, আর একজনকে নিজের পদে স্থাপন করিয়া ঐ কার্য্য সম্পাদন করা হইয়া থাকে। এই প্রথাকে অনুসরণ করিয়া হৃদয়ে এই ভাব পোষণ করিয়া প্রাচীনগণ যখন দেবসমীপে ভক্তি-হ্রাস-হেতু বা অপর কোন কারণে নিজকে উৎসর্গ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন অপর লোককে সংগ্রহ করিয়া সেই অধস্তকে বলিপ্রদান করিতে লাগিলেন। এই হতভাগাদের সংগ্রহ হইত তাহাদের অভিভাবককে অর্থ প্রদানপূর্ব্বক ক্রয় করিয়া। * এইরূপ আমরা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই—নিরপত্য হরিশ্চন্দ্র অপত্যকামনায় বরুণের নিকট ভাবী পুত্রের দ্বারা তাঁহার যাগ করিবার মানসিক করিয়া যখন উৎপন্ন রোহিত নামক পুত্রের দ্বারা বরুণের যাগ করিতে পারিলেন না, তখন রোহিত নিজের পরিবর্ত্তে কুলিশ কঠোর হৃদয়ে অপত্যস্নেহবিরহিত অজীগর্ত্তের নিকট হইতে শত গোমূল্যে শুনঃশেপকে ক্রয় করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক পিতাকে অর্পণ করে। পিতাও তাঁহার দ্বারা বরুণের যাগ আরম্ভ করিলেন। বরুণ ইহাতে আনন্দিত হইয়া বলিলেন—"ভূয়ান্ বৈ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়াৎ।" অর্থাৎ

* "তদৈক্ষত ন বৈ তপস্যানন্তমস্তি, হন্তাহং ভূতেষ্বাত্মানং জুহবানি, ভূতানি চাত্মনীতি। তৎসর্ব্বেষু ভূতেষ্বাত্মানং হুত্বা ভূতানি চাত্মনি সর্ব্বেষাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্য্যৈৎ...।"

তুলনীয়ঃ—"তেভ্যঃ প্রজাপতিরাত্মানং প্রদদৌ, যজ্ঞো হৈষামাস...।. স দেবেভ্য আত্মানং প্রদায়, অথৈতামাত্মনঃ প্রতিমামসৃজত যদ্যজ্ঞং...।"

শতপথব্রাহ্মণ ১১.১.৮.৩.

† ১ম অধ্যায়, ২য় পাদ।

‡ "ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বা সহস্রেণ শতাবেনাবক্রীয় সংবৎসরায়োৎসৃজন্তি।"—শাখায়ন শ্রৌতসূত্র. ১৬,১১.১০.

§ ৩-৭.

তোমার শুভ্র ক্ষত্রিয় রোহিত অপেক্ষা এই ব্রাহ্মণ শুনঃশেপ অধিকতর--আমার প্রিয়তর!

এইরূপে ভারতবর্ষে প্রতিনিধিনিয়োগ করিয়া যেমন নরবলি চলিতে লাগিল, দেশান্তরেও সেইরূপ হইয়াছিল। দেবতার নিকটে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন যখন কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইত, তখন প্রতিনিধিদ্বারাই চলিয়া যাইত। এজন্য স্নেহসর্ব্বস্ব পুত্রকেও দ্বিখণ্ডিত দেখিতে কেহ কুণ্ঠিত হইত না। ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে পেরুপ্রদেশে একদল শাসক (Incas) ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যখন কোন শ্রেষ্ঠব্যক্তি দুঃসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইতেন, তখন দেবতার নিকটে আরোগ্য প্রার্থনা করিয়া নিজ পুত্রকে বলিদান করিতেন। নরওয়ে দেশের পৌরাণিক গল্পে দেখা যায় রাজা Ocn নিজের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিয়া প্রধান দেবতা Odin-এর নিকটে উপর্য্যুপরি নয় পুত্রকে বলিপ্রদান করেন!

এইপ্রকারে মানুষের প্রতিনিধি মানুষ সংগ্রহ করিয়া মনুষ্যবধ সমাজে চলিতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে ঐ প্রতিনিধিত্ব মনুষ্যস্কন্ধ হইতে উত্থাপিত হইয়া পশুস্কন্ধে স্থাপিত হইল। যে সময়ে দেবতার নিকটে নিজকে অর্পণ করিতে হইত, তখন দুর্লভ মনুষ্য সংগ্রহের দায় হইতে তাঁহারা নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অনায়াসেই সেই স্থানে পশু দিয়াই কাজ চালাইতে লাগিলেন। মনুষ্যবধের কঠোরতা ও পৈশাচিকতা এক দিকে, ও তাহার দুর্লভত্ব অপর দিকে মনুষ্যবধের ক্রমশঃ বিলয়প্রাপ্তির কারণ হইয়াছিল। প্রবন্ধের উপসংহারে আমরা শ্রুতিবচন উদ্ধৃত করিয়া এই কথার বিশেষরূপে সমর্থন করিব।

পুরাকালে অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও বৈদিক আর্য্যগণের মধ্যেও মাংস অতি উপাদেয় ও পুষ্টিপ্রদ খাদ্য বলিয়া গণ্য হইত। * পশুমাংস তাঁহাদের প্রীতিকর ছিল বলিয়াই প্রথমে তাঁহারা দেবোপহারে তাহার বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। পরে যখন মনুষ্যের ন্যায় পশুও নিজের প্রতিনিধিরূপে বিবেচিত হইল, তখন পশুবধ ভীষণভাবে চলিতে লাগিল। সাধারণ দৃষ্টিতে মনুষ্য অপেক্ষা পশুজীবন অতি লঘু। তাহার জীবন-মরণে ভ্রূক্ষেপই আসে না। সেই জন্য আজও আমরা দেবোপহার দূরের কথা, নিজের উদর-পূর্ত্তির জন্য অবলীলায় পশুবধ করিয়া থাকি!

---

* যাস্ক লিখিয়াছেন—"মাংসং মাননং বা, মানসং বা, মনোঽস্মিন্ সীদতীতি বা।"—নিরুক্ত ৪.১.৩.; ইহার অর্থ—ইহাদ্বারা লোকের মাননা বা পূজা করা হয় বলিয়া ইহার নাম মাংস;" অথবা সুমনাঃ লোকগণ কর্ত্তৃক ইহা গৃহীত হয় বলিয়া ইহার নাম "মাংস"; অথবা মন ইহাতে প্রসন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম "মাংস", যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতায় (২১.৪৩) ভাষ্যকার মহীধর এক শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"এতদ্বৈ পরমমন্নাদ্যং যন্মাংসমিতি," ঐ সংহিতায় ঐ মন্ত্রেই আছে—"ঘবসপ্রথমানাম্"; ইহার অর্থ—"ঘবসানাম্ অন্নানাং মধ্যে প্রথমানাং মুখ্যানাম্"—মহীধরঃ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৪.৪.৫) "উষ" ও "পোষ"-শব্দে পশুকে বুঝায় লিখিত হইয়াছে; "উষ" অর্থে কমনীয়, এবং "পোষ" অর্থে পুষ্টিকর। এই জন্যই রাজা বা তাঁহার ন্যায় সম্মানার্হ ব্যক্তি অতিথি হইলে মহাবৃষ বা মহা-ছাগল বধ করিবার রীতি ছিল—"তদ্যথৈবাদো মনুষ্যরাজ আগতে অন্যস্মিন্ বাইত্যুক্ষাণং বা বেহতং বা ক্ষদন্তে—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১.৩.৪; "যথারাজ্ঞে ব্রাহ্মণায় বা মহোক্ষং বা মহাজং বা পচেৎ"—শতপথ ব্রাহ্মণ, ৩.৪.১.২; "মহোক্ষং বা মহাজং বা শ্রোত্রিয়ায়োপকল্পয়েৎ"—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১.১.৯; গোভিলগৃহ্যসূত্র, ৪.১০.১; এবং এই জন্যই পাণিনি বলিয়াছেন—"দাশগোঘ্নৌ সম্প্রদানে", ৩.৪.৭৩; "গোঘ্নোঽতিথিঃ।"

আমি বলিয়াছি পশু নিজের প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহার প্রমাণ জন্য আমরা তৈত্তিরীয় সংহিতার এই কথাটি বলিতে পারি—

"যদগ্নীষোমীয়ং পশুমালভত আত্মনিষ্ক্রয়ণ এবাস্য সঃ।" তৈ-স-৬-১-১১-৬। *

যজমান যে অগ্নীষোমীয় পশু বধ করে, তাহা সে অগ্নি ও সোমকে পশুরূপ মূল্য প্রদান করিয়া, তাহাদের নিকট হইতে নিজকে ক্রয় করিয়া লয়।

এই জাতীয় প্রমাণ আরও অনেক পাওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে তাহা আর এখানে উদ্ধৃত হইতেছে না।

ভারতের ন্যায় অন্যদেশেও নরবলির স্থানে পশুবলির ব্যবস্থা দেখা যায়। আব্রাহাম তাহার পুত্রের পরিবর্ত্তে ঈশ্বরের নিকটে মেষ বলি প্রদান করিয়াছিলেন—ইহা বাইবেলের প্রসিদ্ধ কথা। †

ভারতবর্ষে কত প্রকার জীব দেব-বলিতে ব্যবহৃত হইত, তাহা তৈত্তিরীয় সংহিতায় বিস্তৃতরূপে জানিতে পারা যায়। ইহার ৫ম কাণ্ডের ৫ম প্রপাঠকের ১১শ অনুবাক হইতে ২২ অনুবাক পর্য্যন্ত একএকটি দেবতার উল্লেখ করিয়া তাহার পরে পরে একএকটি জীবের নাম লিখিত হইয়াছে। এই সকল জীবের মধ্যে জলচর স্থলচর ও উর্দ্ধচর এই ত্রিবিধ জীবেরই নাম দেখা যায়। যেমন, নক্র-মকর, শূকর-মর্কট, শুক-শারি, ক্রৌঞ্চ-চক্রবাক ইত্যাদি। ‡ বাহুল্যভয়ে সমস্ত নামগুলি এখানে লিখিত হইল না।

পশুবধের সময়ে বৈদিক আচার্য্যগণ পশুদের মরণযন্ত্রণাকে যে মোটেই লক্ষ্য করিতেন না, তাহা বলা যায় না। কিছুদিন এরূপভাবে গিয়াছিল যে, তাঁহারা তাহা অনুভব করিয়াও যে-কোন কারণে হউক পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা পশুর সেই যন্ত্রণা নিবারণ করিবার জন্য ব্যর্থপ্রয়াস করিতেন। এই জন্যই আমরা যজুর্ব্বেদে দেখিতে পাই, তাঁহারা পশুবধে উদ্যত হইয়া বলিতেছেন—

"হে পশু, তোমার প্রাণে যে শোক উপস্থিত হইয়াছে, চক্ষু ও শ্রোত্রে যে শোক উপস্থিত হইয়াছে, এবং আমরা তোমার প্রতি যে ক্রূর আচরণ করিয়াছি, ও করিতে যাইতেছি, তৎসমুদয় শান্ত হউক!" §

আর এক স্থানে বলা হইয়াছে—"পশুকে যখন বধ করা হয়, তখন তাহার প্রাণে শোক প্রবেশ করে, এই জন্য 'বাগিন্দ্রিয় তোমার বর্দ্ধিত হউক, প্রাণ তোমার বর্দ্ধিত হউক'—এই বলিয়া প্রাণ হইতেই তাহার শোককে শান্ত করে।" ‖

এই সমস্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে, পশুহিংসা কিছুদিন প্রচলিত হইবার

---

* অত্র যজমানস্য পশ্বালম্ভঃ আত্মনিষ্ক্রয়ণং। পশুং মূল্যত্বেনাগ্নীষোমাভ্যাং দত্ত্বা তেন তয়োঃ সকাশাদাত্মানং নিষ্ক্রীণাতীতি"—সায়ণভাষ্য, (১.২.৯)

† Genesis XXII. 13.

‡ যজুর্ব্বেদের সময়ে কত রকম জীবজন্তু ছিল, তাহা জানিতে হইলে এ স্থান আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক। ইহার মধ্যে, বিশেষতঃ দেবতাগুলির নামের মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

§ "যাত্তে প্রাণান্ শুগ্জগাম, যা চক্ষুঃ শ্রোত্রং, যৎ তে ক্রূরং, যদাস্থিতং, তৎ ত আপ্যায়তাম্।"
তৈ. স. ১.৩.৯.১.

‖ তৈঃ সঃ ৬.৩.১.৯.

পর বৈদিকগণ তাহার ভীষণতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তবে, যে ব্যবহার তাঁহাদের পূর্ব্বসময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে, সর্ব্বথা তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন নাই। কালিদাসের কথায় বলিতে হইলে, এখানে বলা যায়, সেই সময়েই কিছুদিন পরে

"পশুমারণ কম্মদালুণে
অনুকম্পামিদুএ বি সোত্তিএ।" *

অভিজ্ঞান শকুন্তল, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'অনুকম্পামৃদুক' হইলেও পূর্ব্বব্যবহারে দৃঢ়তর শ্রদ্ধাহেতু 'পশুমারণকর্ম্মদারুণ' হইতেন। শাস্ত্র ঠিকই বলিয়াছেন—এতাদৃশ পশুহিংসাস্থলে বেদবচন বলিয়া অহিংসাই বুঝিয়া লইতে হইবে :—

"আম্নায়বচনাদহিংসা প্রতীয়েত।" নিরুক্ত ১-৫-৩।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে নরবধের পরিবর্ত্তে পশুবধ স্থান পাইয়াছিল। আমরা ইহার পরে দেখিতে পাইব যে পশুর প্রতিনিধিরূপে শস্যবলি প্রচলিত হইয়াছিল। যজ্ঞীয় পুরোডাশের কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। এই পুরোডাশ ব্রীহিজাত একপ্রকার পিষ্টক। আমরা বৈদিক গ্রন্থে দেখিতে পাই, এই পুরোডাশ পশুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে—

এই যে পুরোডাশ নির্ম্মিত হয়, তাহা পশুকে আলম্ভন অর্থাৎ বধ করা (বুঝিতে হইবে)। ব্রীহির কিংশারু-(শুঁয়া) সমূহই তাহার লোম, তুষ সমূহই তাহার ত্বক্, 'ফলীকরণ' সমূহ (অর্থাৎ চাউলকে পরিষ্কার করিতে হইলে অবঘাত দ্বারা উপরিস্থিত যে অংশকে পরিত্যাগ করা হয়, তৎসমুদয়) তাহার রক্ত পিষ্ট (অর্থাৎ চাউল পিষিলে যাহা হয়, পিঠুলি) ও পিষ্ট অবয়ব তাহার মাংস, এবং যাহা কিছু (ব্রীহির) সার, তাহাই তাহার অস্থি।

যে ব্যক্তি পুরোডাশের দ্বারা যাগ করে, তাহার সমস্ত পশুর সার-অংশের দ্বারা যাগ করা হয়। সেইজন্য (যাজ্ঞিকগণ) পুরোডাশসত্রকে লোকহিতকর 'লোক্য' বলিয়াছেন।"†

যখন সমাজে নরবলি প্রচলিত ছিল, তখন যে পশুবলি বা শস্য বলি ছিল না, তাহা নহে। এক সময়েই ঐ ত্রিবিধ বলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রচুর প্রমাণ রহিয়াছে। যে কোন সংহিতা, ব্রাহ্মণ বা সূত্রগ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। তবে, ঐ সকল সাহিত্যই আলোচনা করিলে পাঠকেরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন, যে, নরবলি পশুবলি ও শস্য-বলি এই তিনটির মধ্যে পরপরটি পূর্ব্ব-পূর্ব্বটি অপেক্ষা ক্রমশঃ সমাজে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণে ‡ একটি অতি মনোরম আখ্যায়িকা আছে। এখানে তাহা অনুবাদ না করিয়া থাকা যায় না। যথা—

* পশুমারণকর্ম্মদারুণঃ
অনুকম্পামৃদুকোঽপি শ্রোত্রিয়ঃ।

† "স বা এষ পশুরেবালভ্যতে যৎ পুরোডাশঃ। তস্য যানি কিংশারূণি তানি রোমাণি, যে তুষাঃ সা ত্বক্, যে ফলীকরণাস্তদসৃক্, যৎপিষ্টং কিক্নসাস্তন্মাংসং, যৎ কিঞ্চিৎকং সারং তদস্থি।
সর্ব্বেষাং বা এষ পশূনাং মেধেন যজতে, যঃ পুরোডাশেন যজতে। তস্মাদাহুঃ পুরোডাশসত্রং লোক্যম্"

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ২.১.৯.

‡ "পুরুষং হ বৈ দেবাঃ। অগ্রে পশুমালেভিরে। তস্যালব্ধস্য মেধোঽপচক্রাম, সোঽশ্বং প্রবিবেশ, তেঽশ্বমালভন্ত......১.২.৩.৬-৭.

"পূর্ব্বে দেবগণ পুরুষ পশুকেই আলম্ভন অর্থাৎ বধ করিতেন। তাহাকে বধ করা হইলে, তাহাতে স্থিত (যজ্ঞিয়) সারভাগ চলিয়া গেল। তাহা অশ্বে প্রবেশ করিল। তাঁহারা অশ্বকে আলম্ভন করিলেন। তাহাকে আলম্ভন করা হইলে (ঐ) সার চলিয়া গেল। তাহা গরুতে প্রবেশ করিল। তাঁহারা গরুকে আলম্ভন করিলেন। তাহাকে আলম্ভন করা হইলে (ঐ) সার চলিয়া গেল। তাহা মেষে প্রবেশ করিল। তাঁহারা মেষকে আলম্ভন করিলেন। তাহাকে আলম্ভন করা হইলে (ঐ) সার চলিয়া গেল। তাহা ছাগে প্রবেশ করে। তাঁহারা ছাগকে আলম্ভন করিলেন। তাহাকে আলম্ভন করিলে সার চলিয়া গেল। তাহা পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। তাঁহারা খনন করিয়া তাহাকে অন্বেষণ করিলেন, ও এই ব্রীহি ও যব লাভ করিলেন।......"

"পুরুষাদি সমস্ত পশু আলম্ভন করিলে ইহার হবি যেমন বীর্য্যযুক্ত হয়, যে ব্যক্তি ব্রীহিযবকে সর্ব্বপশুর সারভূত জানে, ইহার পুরোডাশরূপ হবিও সেইরূপ বীর্য্যযুক্ত হবি হয়।" *

ঐ আখ্যায়িকার শেষে বলা হইয়াছে—"দেবগণ যে পুরুষকে বধ করিয়াছিলেন, তাহা কিম্পুরুষ † হইয়া ছিল। যে অশ্ব ও গোকে বধ করিয়াছিলেন, তাহারা যথাক্রমে গৌরমৃগ ও গবয় হইয়াছিল; যে মেষকে বধ করিয়াছিলেন, তাহা উষ্ট্র হইয়াছিল; যে ছাগকে বধ করিয়াছিলেন, তাহা শরভমৃগ হইয়াছিল; অতএব এই সমস্ত পশুর মাংস ভক্ষণ করিবে না। কেন না এই সকল পশুর সার নাই।"

ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও ঠিক এইরূপ একই ভাবের আখ্যায়িকা আছে। ইহা উদ্ধৃত করিয়া আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। কৌতূহলী পাঠক ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ২য় পঞ্চিকায় ১ম অধ্যায়ের ৮ম খণ্ডে তাহা দেখিতে পারেন। এই আখ্যায়িকার শেষেও আছে ঐ যজ্ঞিয় সারভাগ পুরুষাদি পশু হইতে অপক্রান্ত হইয়া ব্রীহি ও যব রূপে পরিণত হয়।

এই সমস্ত আলোচনা করিলে বোধ হইবে যে, বৈদিককাল হইতেই পশুহিংসার ভাবটা ভারতীয় আর্য্যগণের হৃদয় হইতে দূরীভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এবং ইহাই ক্রমশঃ ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণাদিতে পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। পশুহিংসা যখন বেদে দৃঢ়ভিত্তি লাভ করিয়াছে, তখন অর্ব্বাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকার-

* "স যাবন্ত্ বীর্য্যবন্ত হ বা অস্যৈতে সর্ব্বে পশব আলব্ধাঃ স্যুঃ, তাবদ্বীর্য্যবদ্ধাস্য হবির্ভবিরেব ভবতি, য এবমেতদ্ বেদ।" শত. ব্রাঃ ১.২.৩.৭.

† কিম্পুরুষ শব্দের আধুনিক প্রচলিত কিন্নর-ব্যঞ্জক 'দেবযোনি' নহে। ইহা বানরজাতীয়। সায়ণ-আচার্য্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (২.১.৮) এই অর্থই করিয়াছেন। কুৎসিতঃ পুরুষঃ কিম্পুরুষঃ, কুৎসিতো নরঃ কিন্নরঃ। কুৎসিত মানুষের ন্যায় দেখায় বলিয়া বানরবিশেষকে এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ইংরাজী-অনুবাদক Prof. Haug অনুমান করেন ঐ শব্দ "বামন" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। Max Mullar বলেন তাহার অর্থ "Savage." (History of Ancient Sanskrit Literature, p. 420) বাজসনেয়ী সংহিতায় (৩০ অধ্যায়ে) পূর্ব্বকথিত ১৮৪ প্রকার বধ্য পশুর উল্লেখ করিয়া "অথৈতানষ্টৌ বিরূপান্ আলভেত"—এই উপক্রমপূর্ব্বক অতিদীর্ঘ-অতিহ্রস্ব প্রভৃতি পুরুষের নাম করা হইয়াছে। এই সমস্ত পুরুষ "বিরূপ", অতএব বোধ হয় এই "বিরূপ" পুরুষ পশুই "কিম্পুরুষ" হইতে পারে।

গণ তাহাকে স্পষ্টতঃ অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন নাই, কেন না, তাহা হইলে তাঁহাদের কথায় কোন প্রামাণ্যই থাকে না। তাঁহাদের সমস্ত কথাই বেদমূলক, বেদকে অগ্রাহ্য করিলে, তাঁহাদের কিছুই থাকে না। এজন্য তাঁহারা যজ্ঞপূজাদি ভিন্ন অন্যত্র হিংসা একবারে নিষেধ করিয়াছেন, এবং পূজাবিধিকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এইতিনভাগে বিভক্ত করিয়া হিংসাহীন সাত্ত্বিক অর্চ্চনাকে সর্ব্বোপাদেয়রূপে প্রতিপাদন করিয়া হিংসাশ্রিত রাজসিক ও তামসিককে * সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবারই কৌশল উপদেশ দিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে এই জন্যই হিংসার বিরুদ্ধে সহস্র সহস্র তীব্র বচন দেখা যায়। এবং এই কারণেই মূল পশুবধ স্থলে ঘৃতপশু, পিষ্টপশুর বধ ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ বিধান করিয়াছেন;† ছাগবলির স্থলে ইক্ষু ও কুষ্মাণ্ডবলির প্রথাও প্রচলিত আছে।

এইরূপ আলোচনা করিলে বোধ হয় বৈদিককাল হইতেই নরবলি, পশুবলি ও শস্যবলি, এই ত্রিবিধ বলিই প্রচলিত আছে, এবং সেই সময়েই নরবলি অপেক্ষা পশুবলির এবং পশুবলি অপেক্ষা শস্যবলির উপাদেয়তা ক্রমানুসারে বিবেচিত হইয়াছিল।

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

ভক্তি।

হে অধরে শুভ্র হাসি, গলে মালা, কপালে চন্দন,
কে গো তুমি চন্দ্রাননি, ভাবে ভোর, দেবের মন্দিরে?
কোন্ ভাগ্যবান কণ্ঠে ওগো তুমি করেছ অর্পণ
স্বয়ম্বর মালা? বিরহিণী সাজে জটাজুট শিরে;

* এই জন্য দুর্গাপূজাকে আমরা ত্রিবিধ দেখিতে পাই :—
"শারদী চণ্ডিকা পূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি বিশ্রুতিঃ।
সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
* * * *
রাজসী বলিদানৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা।
সুরামাংসাদ্যুপাহারৈর্জপযজ্ঞৈর্বিনা তু যা।
বিনা মন্ত্রৈস্তামসী স্যাৎ কিরাতানাঞ্চ সম্মতা।"

† "কুর্য্যাদ্‌ঘৃতপশুং সঙ্গে কুর্য্যাৎ পিষ্টপশুং তথা।" মনু। ৫.৩৭; ৫.২৭—৫৬ দ্রষ্টব্য

কাহার বিরহব্রত পালিতেছ, আঁখি মুদি ধীরে?
উন্মাদিনী রীতি তব! কভু তুমি হরি সঙ্কীর্ত্তন
করি উচ্চে, লীলাময়ি, হাবভাবে করিছ নর্ত্তন!
কভু তুমি ধ্যানমগ্না, গালে হাত, ভাস অশ্রুনীরে!
চিনেছি সুন্দরি তোমা; ভক্তি তুমি, দেবের পূজারি!
নারদ, গৌরাঙ্গ, যিশু রঙ্গে নাচে তোমার দুয়ারে!
সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্যে তব ইন্দিরা, ইন্দ্রাণী, রতি হারে;
কি মহিমা! কি গরিমা! বিশ্বে নাহি হেন বরনারী
দাও দাও পদদল; হে বৈষ্ণবি, তোমার প্রসাদে,
মম চির কাম্যফলে, কৃষ্ণধনে, লভিব অবাধে!

কনক।

("কনক" নামধারী কোনও বালককে দেখিয়া এই কবিতাটি রচিত হইল।)

মরি মরি কি সুন্দর! বালক! সুন্দর নাম তোর
যেমতি, তেমতি অঙ্গ আহা যেন কনকেতে গড়া;—
বিদ্যুতের পুত্র তুই! নাই, নাই সুষমার ওর!
কন্দর্প, বালক-বেশে, স্নেহ-জেলে পড়িয়াছে ধরা!
বালক স্কন্দের যেন একখানি ফোটো মনোহরা!
সোণার বালার্ক-রাগ ছড়াইয়া, যামিনীর ঘোর
সরাইয়া, এসেছিস? আয় ওরে, আয় চিত্তচোর,
পরাণ জুড়ায়ে গেল, হেরি তোর হাসি সুধা-ঝরা!
হেরি তোরে, মনে পড়ে, প্রাণ-মন-বিনোদন-ধন,
সোণার গৌরাঙ্গ-দেব, প্রীতিপূর্ণ নদীয়া দুলালে!
পড়েছিল বিশ্বছায়া আহা যার হৃদয়-দর্পণে;
আচণ্ডালে মুঠি মুঠি প্রেমরত্ন যে জন বিলালে।
তোরে হেরি, খুলে গেল অকস্মাৎ মন্দিরের দ্বার;—
আঁখি মুদি, একি হেরি? হাসিতেছে গৌরাঙ্গ আমার।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির বক্তৃতা। *

অদ্যকার এই মহাসভায় সভাপতির আসনে আহ্বান করিয়া আপনারা আমাকে যে সম্মান দান করিয়াছেন আমি তাহার অযোগ্য একথার উল্লেখ মাত্রও বাহুল্য। বস্তুতঃ এরূপ সম্মান গ্রহণ করা সহজ, বহন করাই কঠিন। অযোগ্য লোককে উচ্চপদে বসানো তাহাকে অপদস্থ করিবারই উপায়।

অন্য সময় হইলে এতবড় দুঃসাধ্য দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিতাম। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের আত্মবিচ্ছেদের সঙ্কট-কালে যখন ডাঙায় বাঘ ও জলে কুমীর, যখন বাহুপুরুষ কালপুরুষের মূর্ত্তি ধরিয়াছেন এবং আত্মীয় সমাজেও পরস্পরের প্রতি কেহ ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না—যখন নিশ্চয় জানি অদ্যকার দিনে সভাপতির আসন সুখের আসন নহে এবং হয় ত ইহা সম্মানের আসনও না হইতে পারে—অপমানের আশঙ্কা চতুর্দ্দিকেই পুঞ্জীভূত—তখন আপনাদের এই আমন্ত্রণে বিনয়ের উপলক্ষ্য করিয়া আজ আর কাপুরুষের মত ফিরিয়া যাইতে পারিলাম না এবং যথাসাধ্য আপন কর্ত্তব্য সাধন করিবার জন্য দীনতার সহিত ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া অযোগ্যতার বাধা সত্ত্বেও এই মহাসভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেছি।

বিশেষত জানি এমন সময় আসে যখন অযোগ্যতাই বিশেষ যোগ্যতার স্বরূপ হইয়া উঠে।

এতদিন আমি দেশের রাষ্ট্রসভায় স্থান পাইবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করি নাই। ইহাতে আমার ক্ষমতার অভাব এবং স্বভাবেরও ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে।

সেই ত্রুটি বশতই আমি সকল দলের বাহিরে পড়িয়া থাকাতে আমাকেই সকলের চেয়ে নিরীহ জ্ঞান করিয়া সভাপতির উচ্চ আসনটিকে নিরাপদ করিবার জন্যই আমাকে আপনারা এইখানে বসাইয়া দিয়াছেন। আপনাদের সেই ইচ্ছা যদি সফল হয় তবেই আমি ধন্য হইব। কিন্তু রামচন্দ্র সত্যপালনের জন্য নির্ব্বাসনে গেলে পর, ভরত যেভাবে রাজ্যরক্ষার ভার লইয়াছিলেন আমিও তেমনি আমার নমস্য জ্যেষ্ঠগণের খড়ম জোড়াকেই মনের সম্মুখে রাখিয়া নিজেকে উপলক্ষ্য স্বরূপ এখানে স্থাপিত করিলাম।

রাষ্ট্রসভার কোনো দলের সহিত আমার যোগ ঘনিষ্ঠ নহে বলিয়াই সম্প্রতি কন্‌গ্রেসে যে আত্মবিপ্লব ঘটিয়াছে তাহাকে আমি দূর হইতে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। যাঁহারা ইহার ভিতরে ছিলেন তাঁহারা স্বভাবতই এই ব্যাপারটাকে এতই উৎকট করিয়া দেখিয়াছেন ও ইহা হইতে এতই গুরুতর অহিতের আশঙ্কা করিতেছেন যে এখনো তাঁহাদের মনের ক্ষোভ দূর হইতে পারিতেছে না।

---

* সভাপতি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কিন্তু ঘটনায় যাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে বেদনায় তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করা বলিষ্ঠ প্রকৃতির লক্ষণ নহে। কবি বলিয়াছেন— যথার্থ প্রেমের স্রোত অব্যাহত ভাবে চলে না। যথার্থ জীবনের স্রোতও সেইরূপ, যথার্থ কর্ম্মের স্রোতেরও সেই দশা। দেশের নাড়ির মধ্যে প্রাণের বেগ চঞ্চল হইয়া উঠাতেই কর্ম্মে যদি মাঝে মাঝে এরূপ ব্যাঘাত ঘটিয়া পড়ে তবে ইহাতে হতাশ না হইয়া এই কথাই মনে রাখিতে হইবে যে, যে জীবন-ধর্ম্মের অতি চাঞ্চল্যে কন্‌গ্রেস্‌কে একবার আঘাত করিয়াছে সেই জীবনধর্ম্মই এই আঘাতকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া কন্‌গ্রেসের মধ্যে নূতন স্বাস্থ্যের সঞ্চার করিবে। মৃত পদার্থই আপনার কোনো ক্ষতিকে ভুলিতে পারে না। শুষ্ক কাষ্ঠ যেমন ভাঙে তেমনি ভাঙাই থাকে কিন্তু সজীব গাছ নূতন পাতায় নূতন শাখায় সর্ব্বদাই আপনার ক্ষতি পূরণ করিয়া বাড়িয়া উঠিতে থাকে।

অতএব সুস্থ দেহ যেমন নিজের ক্ষতকে শীঘ্রই শোধন করিতে পারে তেমনি আমরা অতিসত্বর কন্‌গ্রেসের আঘাতক্ষতকে আরোগ্যে লইয়া যাইব এবং সেই সঙ্গে এই ঘটনার শিক্ষা-টুকুও নম্রভাবে গ্রহণ করিব।

সে শিক্ষাটুকু এই যে যখন কোনো প্রবল আঘাতে মানুষের মন হইতে ঔদাসীন্য ঘুচিয়া গিয়া সে উত্তেজিত অবস্থায় জাগিয়া উঠে তখন তাহাকে লইয়া যে কাজ করিতে হইবে সে কাজে মতের বৈচিত্র্য এবং মতের বিরোধ সহিষ্ণুভাবে স্বীকার করিতেই হইবে। যখন দেশের চিত্ত নির্জ্জীব ও উদাসীন থাকে তখন-কার কাজের প্রণালী যেরূপ, বিপরীত অবস্থায় সেরূপ হইতেই পারে না।

এই সময়ে, যাহা অপ্রিয় তাহাকে বলপূর্ব্বক বিধ্বস্ত এবং যাহা বিরুদ্ধ তাহাকে আঘাতের দ্বারা নিরস্ত করিবার চেষ্টা করা কোনো পক্ষ হইতে কোনো মতেই চলে না। এমন কি, এইরূপ সময়ে হার মানিয়াও জয়লাভ করিতে হইবে, জিতিবই পণ করিয়া বসিলে সে জিতের দ্বারা যাহাকে পাইতে ইচ্ছা করি তাহাকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব।

সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধকে একটা বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে বাঁধিয়া তোলাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় শিক্ষা। এইশিক্ষা যদি আমাদের অসম্পূর্ণ থাকে তবে স্বায়ত্তশাসন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। যথার্থ স্বায়ত্তশাসনের অধীনে মতবৈচিত্র্য দলিত হয় না সকল মতই আপনার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া লয় এবং বিরোধের বেগেই পরস্পরের শক্তিকে পরিপূর্ণ-রূপে সচেতন করিয়া রাখে।

য়ুরোপের রাষ্ট্রকার্য্যে সর্ব্বত্রই বহুতর বিরোধী দলের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। প্রত্যেক দলই প্রাধান্য লাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। Labour Party, Socialist প্রভৃতি এমন সকল দলও রাষ্ট্র সভায় স্থান পাইয়াছে যাহারা বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে নানাদিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে চায়।

এত অনৈক্য কিসের বলে এক হইয়া আছে এবং এত বিরোধ মিলনকে চূর্ণ করিয়া ফেলি-তেছে না কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, এই সকল জাতির চরিত্রে এমন একটি শিক্ষা সুদৃঢ় হইয়াছে যাহাতে সকল পক্ষই নিয়মের শাসনকে মান্য করিয়া চলিতে পারে। নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া তাহারা প্রার্থিত ফলকে ছিন্ন করিয়া লইতে চায় না, নিয়মকে পালন

করিয়াই জয়লাভ করিবার জন্য ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে জানে। এই সংযম তাহাদের বলেরই পরিচয়। এই কারণেই এত বিচিত্র ও বিরুদ্ধ মতিগতির লোককে একত্রে লইয়া শুধু তর্ক ও আলোচনা নহে বড় বড় রাজ্য ও সাম্রাজ্য চালনার কার্য্য সম্ভবপর হইয়াছে।

আমাদের কন্‌গ্রেসের পশ্চাতে রাজ্য সাম্রাজ্যের কোনো দায়িত্বই নাই—কেবল মাত্র একত্র হইয়া দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের ইচ্ছাকে প্রকাশ করিবার জন্য এই সভাকে বহন করিতেছেন। এই উপায়ে দেশের ইচ্ছা ক্রমশ পরিস্ফুট আকার ধারণ করিয়া বললাভ করিবে এবং সেই ইচ্ছাশক্তি ক্রমে কর্ম্মশক্তিতে পরিণত হইয়া দেশের আত্মোপলব্ধিকে সত্য করিয়া তুলিবে এই আমাদের লক্ষ্য। সমস্ত দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মিলিত চেষ্টা যে-মহাসভায় আমাদের ইচ্ছাশক্তির বোধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে এমন ঔদার্য্য যদি না থাকে যাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণী ও সকল মতের লোকই সেখানে স্থান পাইতে পারেন তবে তাহাতে আমাদের ক্ষমতার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়।

এই মিলনকে সম্ভবপর করিবার জন্য মতের বিরোধকে বিলুপ্ত করিতে হইবে এরূপ ইচ্ছা করিলেও তাহা সফল হইবে না এবং সফল হইলেও তাহাতে কল্যাণ নাই। বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তি পরস্পর প্রতিঘাতী অথচ এক নিয়মের শাসনাধীন বলিয়াই বিচিত্র সৃষ্টি বিকশিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। রাষ্ট্রসভাতেও, নিয়মের দ্বারা সংযত হইয়াও প্রত্যেক মতকেই প্রাধান্য লাভের জন্য চেষ্টা করিতে না দিলে এরূপ সভার স্বাস্থ্য নষ্ট, শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও ভবিষ্যৎ পরিণতি সঙ্কীর্ণ হইতে থাকিবে। অতএব মতবিরোধ যখন কেবল মাত্র অবশ্যম্ভাবী নহে তাহা মঙ্গলকর তখন মিলিতে গেলে নিয়মের শাসন অমোঘ হওয়া চাই। নতুবা বরযাত্রী ও কন্যা পক্ষে উচ্ছৃঙ্খলভাবে বিবাদ করিয়া শেষকালে বিবাহটাই পণ্ড হইতে থাকে। যেমন বাষ্পসংঘাতকে লোহার বয়লারের মধ্যে বাঁধিতে পারিলে তবেই কল চলিতে পারে তেমনি আমাদের মত-সংঘাতের আশঙ্কা যতই প্রবল হইবে আমাদের নিয়ম-বয়লারও ততই বজ্রের ন্যায় কঠিন হইলে তবেই কর্ম্ম অগ্রসর হইবে নতুবা অনর্থপাত ঘটিতে বিলম্ব হইবে না।

আমরা এ পর্য্যন্ত কন্‌গ্রেসের ও কন্‌ফারেন্সের জন্য প্রতিনিধিনির্ব্বাচনের যথারীতি নিয়ম স্থির করি নাই। যত দিন পর্য্যন্ত, দেশের লোক উদাসীন থাকাতে, রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোনো মতের দ্বৈধ ছিল না ততদিন এরূপ নিয়মের শৈথিল্যে কোনো ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু যখন দেশের মনটা জাগিয়া উঠিয়াছে তখন দেশের কর্ম্মে সেই মনটা পাইতে হইবে, তখন প্রতিনিধিনির্ব্বাচনকালে সত্যভাবে দেশের সম্মতি লইতে হইবে। এইরূপ শুধু নির্ব্বাচনের নহে কন্‌গ্রেস্ ও কন্‌ফারেন্সের কার্য্যপ্রণালীরও বিধি সুনির্দ্দিষ্ট হওয়ার সময় আসিয়াছে।

এমন না করিয়া কেবল বিবাদ বাঁচাইয়া চলিবার জন্য দেশের এক এক দল যদি এক একটি সাম্প্রদায়িক কন্‌গ্রেসের সৃষ্টি করেন তবে কন্‌গ্রেসের কোনো অর্থই থাকিবে না। কন্‌গ্রেস্ সমগ্র দেশের অখণ্ড সভা—বিঘ্ন ঘটিবা-

মাত্রই সেই সমগ্রতাকেই যদি বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হই তবে কেবল মাত্র সভার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আমাদের এমনই কি লাভ হইবে!

এ পর্য্যন্ত আমরা কোনো কাজ বা ব্যবসায়, এমন কি আমোদের জন্য দল বাঁধিয়া যখনি অনৈক্য ঘটিয়াছে তখনি ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছি। বিরোধ ঘটিবামাত্র আমরা মূল জিনিষটাকে, হয় নষ্ট নয় পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বৈচিত্র্যকে ঐক্যের মধ্যে বাঁধিয়া তাহাকে নানা অঙ্গবিশিষ্ট কলেবরে পরিণত করিবার জীবনীশক্তি আমরা দেখাইতে পারিতেছি না। আমাদের সমস্ত দুর্গতির কারণই তাই। কন্‌গ্রেসের মধ্যেও যদি সেই রোগটা ফুটিয়া পড়ে, সেখানেও যদি উপরিতলে বিরোধের আঘাতমাত্রেই ঐক্যের মূল ভিত্তিটা পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইতে থাকে তবে আমরা কোনো পক্ষই দাঁড়াইব কিসের উপরে? যে শর্ষের দ্বারা ভূত ঝাড়াইব সেই শর্ষেকেই ভূতে পাইয়া বসিলে কি উপায়!

বঙ্গ বিভাগকে রহিত করিবার জন্য আমরা যেরূপ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি এই আসন্ন আত্মবিভাগকে নিরস্ত করিবার জন্য আমাদিগকে তাহা অপেক্ষাও আরো বেশি চেষ্টা করিতে হইবে। পরের নিকটে যে দুর্ব্বল, আত্মীয়ের নিকট সে প্রচণ্ড হইয়া যেন নিজেকে প্রবল বলিয়া সান্ত্বনা না পায়। পরে যে বিচ্ছেদ সাধন করে তাহাতে অনিষ্টমাত্র ঘটে নিজে যে বিচ্ছেদ ঘটাই তাহাতে পাপ হয়, এই পাপের অনিষ্ট অন্তরের গভীরতম স্থানে নিদারুণ প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষায় সঞ্চিত হইতে থাকে।

আমাদের যে সময় উপস্থিত হইয়াছে এখন আত্মবিস্মৃত হইলে কোনমতেই চলিবে না কারণ এখন আমরা মুক্তির তপস্যা করিতেছি; ইন্দ্রদেব আমাদের পরীক্ষার জন্য এই যে তপোভঙ্গের উপলক্ষ্যকে পাঠাইয়াছেন ইহার কাছে হার মানিলে আমাদের সমস্ত সাধনা নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব ভ্রাতৃগণ, যে ক্রোধে ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই হাত তুলিতে চায় সে ক্রোধ দমন করিতেই হইবে—আত্মীয়কৃত সমস্ত বিরোধকে বারম্বার ক্ষমা করিতে হইবে—পরস্পরের অবিবেচনার দ্বারা যে সংঘাত ঘটিয়াছে তাহার সংশোধন করিতে ও তাহাকে ভুলিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলে চলিবে না। আগুন যখন আমাদের নিজের ঘরেই লাগিয়াছে তখন দুই পক্ষ দুই দিক হইতে এই অগ্নিতে উক্ত বাক্যের বায়ুবীজন করিয়া ইহাকে প্রতিকারের অতীত করিয়া তুলিলে তাহার চেয়ে মূঢ়তা আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারিবে না। পরের কৃত বিভাগ লইয়া দেশে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে শেষে আত্মকৃত বিভাগই যদি তাহার পরিণাম হয় ভারতের শনিগ্রহ যদি এবার লর্ড্ কার্জ্জনমূর্ত্তি পরিহার করিয়া আত্মীয়মূর্ত্তি ধরিয়াই দেখা দেয় তবে বাহিরের তাড়নায় অস্থির হইয়া ঘরের মধ্যেও আশ্রয় লইবার স্থান পাইব না।

এদিকে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদের খড়্গ দেশের মাথার উপরে ঝুলিতেছে। কত শত বৎসর হইয়া গেল আমরা হিন্দু ও মুসলমান একই দেশ-মাতার দুই জানুর উপরে বসিয়া একই স্নেহ উপভোগ করিয়া আসিয়াছি, তথাপি আজও আমাদের মিলনে বিঘ্ন ঘটিতেছে।

এই দুর্ব্বলতার কারণ যতদিন আছে ততদিন আমাদের দেশের কোনো মহৎ আশাকে সম্পূর্ণ সফল করা সম্ভবপর হইবে না; আমাদের

সমস্ত রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্যপালনই পদে পদে দুরূহ হইতে থাকিবে।

বাহির হইতে এই হিন্দুমুসলমানের প্রভেদকে যদি বিরোধে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয় তবে তাহাতে আমরা ভীত হইব না—আমাদের নিজের ভিতরে যে ভেদবুদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই আমরা পরের কৃত উত্তেজনাকে অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই পারিব। এই উত্তেজনা কালক্রমে আপনিই মরিতে বাধ্য। কারণ, এই আগুনে নিয়ত কয়লা জোগাইবার সাধ্য গবর্মেণ্টের নাই। এ আগুনকে প্রশ্রয় দিতে গেলে শীঘ্রই ইহা এমন সীমায় গিয়া পৌঁছিবে যখন দমকলের জন্ত ডাক পাড়িতেই হইবে। প্রজার ঘরে আগুন ধরিলে কোনোদিন কোনোদিক্ হইতে তাহা রাজবাড়িরও অত্যন্ত কাছে গিয়া পৌঁছিবে। যদি একথা সত্য হয় যে হিন্দুদিগকে দমাইয়া দিবার জন্ত মুসলমানদিগকে অসঙ্গতরূপে প্রশ্রয় দিবার চেষ্টা হইতেছে, অন্তত ভাবগতিক দেখিয়া মুসলমানদের মনে যদি সেইরূপ ধারণা দৃঢ় হইতে থাকে তবে এই শনি, এই কলি, এই ভেদনীতি রাজাকেও ক্ষমা করিবে না। কারণ, প্রশ্রয়ের দ্বারা আশাকে বাড়াইয়া তুলিলে তাহাকে পূরণ করা কঠিন হয়। যে ক্ষুধা স্বাভাবিক তাহাকে একদিন মেটানো যায়, যোগ্যতার স্বাভাবিক দাবিরও সীমা আছে কিন্তু প্রশ্রয়ের দাবির ত অন্ত নাই। তাহা ফুটা কলসীতে জল ভরার মত। আমাদের পুরাণে কলঙ্কভঞ্জনের যে ইতিহাস আছে তাহারই দৃষ্টান্তে গবর্মেণ্ট প্রেয়সীর প্রতি প্রেমবশতই হোক্ অথবা তাহার বিপরীত পক্ষের প্রতি রাগ করিয়াই হোক্ অযোগ্যতার ছিদ্রঘট ভরিয়া তুলিতে পারিবেন না। অসন্তোষকে চিরবুভুক্ষু করিয়া রাখিবার উপায় প্রশ্রয়। এ সমস্ত শাঁখের করাতের নীতি, ইহাতে শুধু একা প্রজা কাটে না, ইহা ফিরিবার পথে রাজাকেও আঘাত দেয়।

এই ব্যাপারের মধ্যে যেটুকু ভাল তাহাও আমাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা গোড়া হইতে ইংরেজের ইস্কুলে বেশি মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্থ করিয়াছি বলিয়া গবর্মেণ্টের চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশি পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইটুকু কোনওমতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না, আমাদের মাঝখানে একটা অসূয়ার অন্তরাল থাকিয়া যাইবে। মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্যবশত জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্ত ঘটে তাহা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুরপরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্নমনে প্রার্থনা করি। কিন্তু এই প্রসাদের যেখানে সীমা সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা যেদিন দেখিবেন বাহিরের ক্ষুদ্র দানে অন্তরের গভীর দৈন্ত কিছুতেই ভরিয়া উঠে না, যখন বুঝিবেন শক্তিলাভ ব্যতীত লাভ নাই এবং ঐক্য ব্যতীত সে লাভ অসম্ভব, যখন জানিবেন, যে-একদেশে আমরা জন্মিয়াছি সেই দেশের ঐক্যকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্ম-

হানি হয় এবং ধর্ম্মহানি হইলে কখনই স্বার্থরক্ষা হইতে পারে না তখনই আমরা উভয় ভ্রাতায় একই সমচেষ্টার মিলনক্ষেত্রে আসিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইব।

যাই হৌক, হিন্দু ও মুসলমান, ভারতবর্ষের এই দুই প্রধান ভাগকে এক রাষ্ট্রসম্মিলনের মধ্যে বাঁধিবার জন্য যে ত্যাগ যে সহিষ্ণুতা যে সতর্কতা ও আত্মদমন আবশ্যক তাহা আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে।—এই প্রকাণ্ড কর্ম্মঋণই যখন আমাদের পক্ষে যথেষ্ট তখন দোহাই সুবুদ্ধির, দোহাই ধর্ম্মের, প্রাণধর্ম্মের নিয়মে দেশের যে নূতন নূতন দল উঠিবে তাহারা প্রত্যেকেই এক একটি বিরোধরূপে উঠিয়া যেন দেশকে বহুভাগে বিদীর্ণ করিতে না থাকে; তাহারা যেন একই তরুকাণ্ডের উপর নব নব সতেজ শাখার মত উঠিয়া দেশের রাষ্ট্রীয় চিত্তকে পরিণতিদান করিতে থাকে।

পুরাতন দলের ভিতর দিয়া দেশে যখন একটা নূতন দলের উদ্ভব হয় তখন তাহাকে প্রথমটা অনাহূত বলিয়া ভ্রম হয়। কার্য্যকারণ-পরম্পরার মধ্যে তাহার যে একটা অনিবার্য্য স্থান আছে অপরিচয়ের বিরক্তিতে তাহা আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না। এই কারণে নিজের স্বত্ব প্রমাণের চেষ্টায় নূতন দলের প্রথম অবস্থায় স্বাভাবিকতার শান্তি থাকে না সেই অবস্থায় আত্মীয় হইলেও তাহাকে বিরুদ্ধ মনে হয়।

কিন্তু এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, দেশে নূতন দল, বীজ বিদীর্ণ করিয়া অঙ্কুরের মত, বাধা ভেদ করিয়া স্বভাবের নিয়মেই দেখা দেয়। পুরাতনের সঙ্গেই এবং চতুর্দ্দিকের সঙ্গে তাহার অঙ্কুরের সম্বন্ধ আছে।

এই ত আমাদের নূতন দল; এ ত আমাদের আপনার লোক। ইহাদিগকে লইয়া কখনো ঝগড়াও করিব আবার পরক্ষণেই সুখে দুঃখে ক্রিয়াকর্ম্মে ইহাদিগকেই কাছে টানিয়া একসঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া কাজের ক্ষেত্রে পাশাপাশি দাঁড়াইতে হইবে। কিন্তু ভ্রাতৃগণ, Extremist, বা চরমপন্থী বা, বাড়াবাড়ির দল বলিয়া দেশে একটি দল উঠিয়াছে, এইরূপ যে একটা রটনা শুনা যায়, সে দলটা কোথায়? জিজ্ঞাসা করি এ দেশে সকলের চেয়ে বড় এবং মূল Extremist, কে? চরমপন্থিত্বের ধর্ম্মই এই যে, একদিক চরমে উঠিলে অন্যদিক সেই টানেই আপনি চরমে চড়িয়া যায়। বঙ্গবিভাগের জন্য সমস্ত বাংলাদেশ যেমন বেদনা অনুভব করিয়াছে এবং যেমন দারুণ দুঃখভোগের দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছে ভারতবর্ষে এমন বোধ হয় আর কখনো হয় নাই। কিন্তু প্রজাদের সেই সত্য বেদনায় রাজপুরুষ যে কেবল উদাসীন তাহা নহে, তিনি ক্রুদ্ধ খড়্গহস্ত। তাহার পরে ভারতশাসনের বর্ত্তমান ভাগ্যবিধাতা, যাঁহার অভ্যুদয়ের সংবাদমাত্রেই ভারতবর্ষের চিত্তচকোর তাঁহার সমুচ্চ তৃষিত-চঞ্চু ব্যাদান করিয়া একেবারে আকাশে উড়িয়াছিল—তিনি তাঁহার সুদূর স্বর্গলোক হইতে সংবাদ পাঠাইলেন—যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা একেবারেই চূড়ান্ত, তাহার আর অন্যথা হইতে পারে না।

এতই বধির ভাবে সমস্ত বাংলাদেশের চিত্তবেদনাকে একেবারে চূড়ান্ত করিয়া দেওয়া ইহাই কি রাজ্যশাসনের চরমপন্থা নহে? ইহার কি একটা প্রতিঘাত নাই? এবং সে প্রতিঘাত কি নিতান্ত নির্জ্জীবভাবে হইতে পারে?

এই স্বাভাবিক প্রতিঘাত শান্ত করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ত কোনো শান্তনীতি অবলম্বন করিলেন না—তিনি চরমের দিকেই চড়িতে লাগিলেন। আঘাত করিয়া যে ঢেউ তুলিয়াছিলেন সেই ঢেউকে নিরস্ত করিবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে কেবলি দণ্ডের উপর দণ্ড চালনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহারা যে বলিষ্ঠ এ প্রমাণ হইতে পারে কিন্তু স্বভাব ত এই প্রবল রাজাদের প্রজা নহে। আমরা দুর্ব্বল হই আর অক্ষম হই বিধাতা আমাদের যে একটা হৃৎপিণ্ড গড়িয়াছিলেন সেটা ত নিতান্তই একটা মৃৎপিণ্ড নহে, আমরাও সহসা আঘাত পাইলে চকিত হইয়া উঠি; সেটা একটা স্বাভাবিক প্রতিবৃত্তি ক্রিয়া; যাহাকে ইংরেজিতে বলে reflex action। এটাকে রাজসভায় যদি অবিনয় বলিয়া জ্ঞান করেন তবে আঘাতটা সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হয়। যাহার শক্তি আছে সে অনায়াসেই দুইয়ের পশ্চাতে আরো একটা দুই যোগ করিতে পারে কিন্তু তাহার পরে ফলের ঘরে চার দেখিলেই উন্মত্ত হইয়া উঠা বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

স্বভাবের নিয়ম যখন কাজ করে তখন, কিছু অসুবিধা ঘটিলেও, সেটাকে দেখিয়া বিমর্ষ হইতে পারি না। বৈদ্যুতের বেগ লাগাইলে যদি দেখি দুর্ব্বল স্নায়ুতেও প্রবল ভাবে সাড়া পাওয়া যাইতেছে তবে বড় কষ্টের মধ্যে সেটা আশার কথা।

অতএব এদিকে যখন লর্ড কার্জ্জন, মর্লি, ইবেট্‌সন; গুর্খা, প্যুনিটিভ পুলিস্ ও পুলিসরাজকতা; নির্ব্বাসন, জেল ও বেত্রদণ্ড; দলন, দমন ও আইনের আত্মবিস্মৃতি; তখন অপর পক্ষে প্রজাদের মধ্যেও যে ক্রমশই উত্তেজনাবৃদ্ধি হইতেছে, যে উত্তাপটুকু অল্পকাল পূর্ব্বে কেবলমাত্র তাহাদের রসনার প্রান্তভাগে দেখা দিয়াছিল তাহা যে ক্রমশই ব্যাপ্ত ও গভীর হইয়া তাহাদের অস্থিমজ্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে; তাহারা যে বিভীষিকার সম্মুখে অভিভূত না হইয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে ইহাতে আমাদের যথেষ্ট অসুবিধা ও অনিষ্টের আশঙ্কা আছে তাহা মানিতেই হইবে কিন্তু সেই সঙ্গে এইটুকু আশার কথা না মনে করিয়া থাকিতে পারি না, যে বহুকালের অবসাদের পরেও স্বভাব বলিয়া একটা পদার্থ এখনো আমাদের মধ্যে রহিয়া গেছে; প্রবলভাবে কষ্ট পাইবার ক্ষমতা এখনো আমাদের যায় নাই—এবং জীবনধর্ম্মে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার নিয়ম বর্ত্তমান, এখনো আমাদের মধ্যে তাহা কাজ করিতেছে।

চরমনীতি বলিতেই বুঝায় হালছাড়া নীতি, সুতরাং ইহার গতিটা যে কখন্ কাহাকে কোথায় লইয়া গিয়া উত্তীর্ণ করিয়া দিবে তাহা পূর্ব্ব হইতে কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে না। ইহার বেগকে সর্ব্বত্র নিয়মিত করিয়া চলা এই পন্থার পথিকদের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। তাহাকে প্রবর্ত্তন করা সহজ, সম্বরণ করাই কঠিন।

এই কারণেই, আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ যখন চরম নীতিতে দমলাগাইলেন তখন তাঁহারা যে এতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছিবেন তাহা মনেও করেন নাই। আজ ভারতশাসনকার্য্যে পুলিশের সামান্য পাহারাওয়ালা হইতে ন্যায়দণ্ডধারী বিচারক পর্য্যন্ত সকলেরই মধ্যে স্থানে স্থানে যে অসংযম ফুটিয়া বাহির হইতেছে, নিশ্চয়ই

তাহা ভারতশাসনের কর্ণধারগণের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু গবর্মেণ্ট ত একটা অলৌকিক ব্যাপার নহে, শাসনকার্য্য যাহাদিগকে দিয়া চলে তাহারা ত রক্তমাংসের মানুষ, এবং ক্ষমতামত্ততাও সেই মানুষগুলির প্রকৃতিতে অল্পাধিক পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। যে সময়ে প্রবীন সারথীর প্রবল রাশ ইঁহাদের সকলকে শক্ত করিয়া টানিয়া রাখে তখনো যদিচ ইহাদেরই উচ্চগ্রীবা যথেষ্ট বক্র হইয়া থাকে তথাপি সেটা রাজবাহনের পক্ষে অশোভন হয় না; কিন্তু তখন ইহারা মোটের উপরে সকলেই এক সমান চালেই পা ফেলে; তখন পদাতিকের দল একটু যদি পাশ কাটাইয়া চলিতে পারে তবে তাহাদের আর অপঘাতের আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু চরমনীতি যখনই রাশ ছাড়িয়া দেয় তখনি এই বিরাট শাসনতন্ত্রের মধ্যে অবারিত জীবপ্রকৃতি দেখিতে দেখিতে বিচিত্র হইয়া উঠে। তখন কোন্ পাহারওয়ালার যষ্টি যে কোন্ ভালমানুষের কপাল ভাঙিবে এবং কোন্ বিচারকের হাতে আইন যে কিরূপ ভয়ঙ্কর বক্রগতি অবলম্বন করিবে তাহা কিছুই বুঝিবার উপায় থাকে না। তখন প্রজাদের মধ্যে যে বিশেষ অংশ প্রশ্রয় পায় তাহারাও বুঝিতে পারে না তাহাদের প্রশ্রয়ের সীমা কোথায়। চতুর্দ্দিকে শাসননীতির এইরূপ অদ্ভুত দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইতে থাকিলে গবর্মেণ্ট নিজের চালে নিজেই কিছু কিছু লজ্জাবোধ করিতে থাকেন;—তখন লজ্জানিবারণের কমিশন রিপোর্টের তালি দিয়া শাসনের ছিদ্রতা ঢাকিতে চায়, যাহারা আর্ত্ত তাহাদিগকে বিশুক বলিয়া অপমানিত করা এবং যাহারা উচ্ছৃঙ্খল তাহাদিগকেই উৎপীড়িত বলিয়া মার্জ্জনা করে। কিন্তু এমন করিয়া লজ্জা কি ঢাকা পড়ে? অথচ এই সমস্ত উদ্দাম উৎপাত স্মরণ করাকেও ত্রুটি স্বীকার বলিয়া মনে হয় এবং দুর্ব্বলতাকে প্রবলভাবে সমর্থন করাকেই রাজপুরুষ শক্তির পরিচয় বলিয়া ভ্রম করেন।

অন্যপক্ষে আমাদের মধ্যেও চরমনীতিকে সর্ব্বদা ঠিকমত সম্বরণ করিয়া চলা দুঃসাধ্য। আমাদের মধ্যেও নিজের দলের দুর্ব্বারতা দলপতিকেও টলাইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় কাহার আচরণের জন্য যে কাহাকে দায়ী করা যাইবে এবং কোন্ শর্ত্তটা যে কতটা পরিমাণে কাহার তাহা নিশ্চয় করিয়া নির্ণয় করে এমন কে আছে!

এইখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। Extremist নাম দিয়া আমাদের মাঝখানে যে একটা সীমানার চিহ্ন টানিয়া দেওয়া হইয়াছে সেটা আমাদের নিজের দত্ত নহে। সেটা ইংরেজের কালোকালীর দাগ। সুতরাং এই জরিপের চিহ্নটা কখন্ কতদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে বলা যায় না। দলের গঠন অনুসারে নহে, সময়ের গতিক ও কর্ত্তৃজাতির মর্জ্জি অনুসারে এই রেখার পরিবর্ত্তন হইতে থাকিবে।

অতএব ইংরেজ তাহার নিজের প্রতি আমাদের মনের ভাব বিচার করিয়া যাহাকে Extremist দল বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে সেটা কি একটা দল, না দলের চেয়ে বেশি—তাহা দেশের একটা লক্ষণ? কোনো একটা দলকে চাপিয়া মারিলে এই লক্ষণ আর কোনো আকারে দেখা দিবে

অথবা ইহা বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবে।

কোনো স্বাতান্ত্রিক প্রকাশকে যখন আমরা পছন্দ না করি তখন আমরা বলিতে চেষ্টা করি যে ইহা কেবল সম্প্রদায়বিশেষের চক্রান্ত মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপে একটা ধুয়া উঠিয়াছিল যে, ধর্ম্ম জিনিষটা কেবল স্বার্থপর ধর্ম্মযাজকদের কৃত্রিম সৃষ্টি; পাদ্রিদিগকে উচ্ছিন্ন করিলেই ধর্ম্মের আপদটাকেই একেবারে দূর করিয়া দেওয়া যায়। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যাহারা অসহিষ্ণু তাহারা অনেকে বলিয়া থাকে এটা যেন ব্রাহ্মণের দল পরামর্শ করিয়া নিজেদের জীবিকার উপায় স্বরূপে তৈরি করিয়া তুলিয়াছে—অতএব ভারতবর্ষের বাহিরে কোনো গতিকে ব্রাহ্মণের ডিপোর্টেশন্ ঘটাইতে পারিলেই হিন্দুধর্ম্মের উপদ্রব সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত থাকা যাইবে। আমাদের রাজারাও সেইরূপ মনে করিতেছেন Extremism বলিয়া একটা উৎক্ষেপক পদার্থ, দুষ্টেরদল তাহাদের ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করিয়া তুলিতেছে অতএব কয়েকটা দলপতি ধরিয়া পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে সমর্পণ করিয়া দিলেই উৎপাত শান্তি হইতে পারিবে।

কিন্তু আসল কথাটা ভিতরের কথা। সেটা চোখে দেখার জিনিষ নহে, সেটা তলাইয়া বুঝিতে হইবে

যে সত্য অব্যক্ত ছিল সেটা হঠাৎ প্রথম ব্যক্ত হইবার সময় নিতান্ত মৃদুমন্দ মধুরভাবে হয় না। তাহা একটা ঝড়ের মত আসিয়া পড়ে, কারণ অসামঞ্জস্যের সংঘাতই তাহাকে জাগাইয়া তোলে।

আমাদের দেশে কিছুকাল হইতেই ইতিহাসের শিক্ষায়, যাতায়াত ও আদানপ্রদানের সুযোগে, এক রাজশাসনের ঐক্যে, সাহিত্যের অভ্যুদয়ে, এবং কন্‌গ্রেসের চেষ্টায় আমরা ভিতরে ভিতরে বুঝিতেছিলাম যে, আমাদের দেশটা এক, আমরা একই জাতি, সুখে দুঃখে আমাদের এক দশা, এবং পরস্পরকে পরমাত্মীয় বলিয়া না জানিলে ও অত্যন্ত কাছে না টানিলে আমাদের কিছুতে মঙ্গল নাই।

বুঝিতেছিলাম বটে কিন্তু এই অখণ্ড ঐক্যের মূর্ত্তিটি প্রত্যক্ষ সত্যের মত দেখিতে পাইতেছিলাম না—তাহা যেন কেবলই আমাদের চিন্তার বিষয় হইয়াই ছিল। সেই জন্য সমস্ত দেশকে এক বলিয়া নিশ্চয় জানিলে, মানুষ দেশের জন্য যতটা দিতে পারে, যতটা সহিতে পারে, যতটা করিতে পারে আমরা তাহার কিছুই পারি নাই।

এই ভাবেই আরো অনেকদিন চলিত। এমন সময় লর্ড কার্জ্জন যবনিকার উপর এমন একটা প্রবল টান মারিলেন, যে, যাহা নেপথ্যে ছিল তাহার আর কোনো আচ্ছাদন রহিল না।

বাংলাকে যেমনি দুইখানা করিবার হুকুম হইল অমনি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে একটিমাত্র ধ্বনি জাগিয়া উঠিল—আমরা যে বাঙালী, আমরা যে এক! বাঙালী কখন্ যে বাঙালীর এতই কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, রক্তের নাড়ি কখন্ বাংলার সকল অঙ্গকেই এমন করিয়া এক চেতনার বন্ধনে বাঁধিয়া তুলিয়াছে তাহা ত পূর্ব্বে আমরা এমন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি নাই।

আমাদের এই আত্মীয়তার সজীব শরীরে

বিভাগের বেদনা যখন এত অসহ্য হইয়া বাজিল তখন ভাবিয়াছিলাম সকলে মিলিয়া রাজার দ্বারে নালিশ জানাইলেই দয়া পাওয়া যাইবে। কেবলমাত্র নালিশের দ্বারা দয়া আকর্ষণ ছাড়া আর যে আমাদের কোনো গতিই আছে তাহাও আমরা জানিতাম না।

কিন্তু নিরুপায়ের ভরসাস্থল এই পরের অনুগ্রহ যখন চূড়ান্তভাবেই বিমুখ হইল তখন যে ব্যক্তি নিজেকে পঙ্গু জানিয়া বহুকাল অচল হইয়াছিল ঘরে আগুন লাগিতেই নিতান্ত অগত্যা দেখিতে পাইল তাহারো চলৎশক্তি আছে। আমরাও একদিন অন্তঃকরণের অত্যন্ত একটা তাড়নায় দেখিতে পাইলাম, এই কথাটা আমাদের জোর করিয়া বলিবার শক্তি আছে যে, আমরা বিলাতি পণ্যদ্রব্য ব্যবহার করিব না।

আমাদের এই আবিষ্কারটি অন্যান্য সমস্ত সত্য আবিষ্কারেরই ন্যায় প্রথমে একটা সঙ্কীর্ণ উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া আমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে দেখিতে দেখিতে আমরা বুঝিতে পারিলাম উপলক্ষ্যটুকুর অপেক্ষা ইহা অনেক বৃহৎ। এযে শক্তি! এযে সম্পদ্। ইহা অন্যকে জব্দ করিবার নহে ইহা নিজেকে শক্ত করিবার। ইহার আর কোনো প্রয়োজন থাক্ বা না থাক্ ইহাকে বক্ষের মধ্যে সত্য বলিয়া অনুভব করাই সকলের চেয়ে বড় প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

শক্তির এই অকস্মাৎ অনুভূতিতে আমরা যে একটা মস্ত ভরসার আনন্দ পাইয়াছি সেই আনন্দটুকু না থাকিলে এই বিদেশীবর্জ্জনব্যাপারে আমরা এত অবিরাম দুঃখ কখনই সহিতে পারিতাম না। কেবলমাত্র ক্রোধের এত সহিষ্ণুতা নাই। বিশেষত প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের ক্রোধ কখনই এত জোরের সঙ্গে দাঁড়াইতে পারে না।

এদিকে দুঃখ যতই পাইতেছি সত্যের পরিচয়ও ততই নিবিড়তর সত্য হইয়া উঠিতেছে। যতই দুঃখ পাইতেছি আমাদের শক্তি গভীরতায় ও ব্যাপ্তিতে ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। আমাদের এই বড় দুঃখের ধন ক্রমেই আমাদের হৃদয়ের চিরন্তন সামগ্রী হইয়া উঠিতেছে। অগ্নিতে দেশের চিত্তকে বারবার গলাইয়া এই যে ছাপ দেওয়া হইতেছে ইহা ত কোনো দিন আর মুছিবে না। এই রাজমোহরের ছাপ আমাদের দুঃখসহার দলিল হইয়া থাকিবে;—দুঃখের জোরে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইহার জোরেই দুঃখ সহিতে পারিব।

এইরূপে সত্য জিনিষ পাইলে তাহার আনন্দ যে কত জোরে কাজ করে এবার তাহা স্পষ্ট দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি। কত দিন হইতে জ্ঞানী লোকেরা উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন যে, হাতের কাজ করিতে ঘৃণা করিয়া, চাকরি করাকেই জীবনের সার বলিয়া জানিলে কখনই আমরা মানুষ হইতে পারিব না। যে শুনিয়াছে সেই বলিয়াছে, হাঁ, কথাটা সত্য বটে! অমনি সেই সঙ্গেই চাকরির দরখাস্ত লিখিতে হাত পাকাইতে বসিয়াছে। এতবড় চাকরি-পিপাসু বাংলাদেশেও এমন একটা দিন আসিল যেদিন কিছু না বলিতেই ধনীর ছেলে নিজের হাতে তাঁত চালাইবার জন্য তাঁতির কাছে শিষ্যবৃত্তি অবলম্বন করিল, ভদ্রঘরের

ছেলে নিজের মাথায় কাপড়ের মোট তুলিয়া দ্বারে দ্বারে বিক্রয় করিতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণের ছেলে নিজের হাতে লাঙল বহা গৌরবের কাজ বলিয়া স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিল। আমাদের সমাজে ইহা যে সম্ভবপর হইতে পারে আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই। তর্কের দ্বারা তর্ক মেটে না, উপদেশের দ্বারা সংস্কার ঘোচে না; সত্য যখন ঘরের একটি কোণে একটু শিখার মত দেখা দেন তখনি ঘরভরা অন্ধকার আপনি কাটিয়া যায়।

পূর্ব্বে দেশের বড় প্রয়োজনের সময়েও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিয়া অর্থের অপেক্ষা ব্যর্থতাই বেশি করিয়া পাইতাম কিন্তু সম্প্রতি একদিন যেমনি একটা ডাক পড়িল অমনি দেশের লোক কোনো অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের কথা চিন্তা না করিয়া কেবলমাত্র নির্ব্বিচারে ত্যাগ করিবার জন্যই নিজে ছুটিয়া গিয়া দান করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছে।

তাহার পরে জাতীয় বিদ্যালয় যে কোনোদিন দেশের মধ্যে স্থাপন করিতে পারিব—সে কেবল দুটি একটি অত্যুৎসাহিকের ধ্যানের মধ্যেই ছিল। কিন্তু দেশে শক্তির অনুভূতি একটুও সত্য হইবামাত্রই সেই দুর্লভ ধ্যানের সামগ্রী দেখিতে দেখিতে আকার পরিগ্রহ করিয়া দেশকে বরদান করিবার জন্য উদ্যত দক্ষিণ হস্তে আজ আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

একত্রে মিলিয়া বড় কারখানা স্থাপন করিব বাঙালীর এমন না ছিল শিক্ষা, না ছিল অভিজ্ঞতা, না ছিল অভিরুচি,—তাহা সত্ত্বেও বাঙালী একটা বড় মিল্ খুলিয়াছে, তাহা ভাল করিয়াই চালাইতেছে এবং আরো এইরূপ অনেকগুলি ছোট বড় উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

দেশের ইচ্ছা একটিমাত্র উপলক্ষ্যে যেই আপনাকে সফল করিয়াছে, যেই আপনার শক্তিকে দুঃখ ও ক্ষতির উপরেও জয়ী করিয়া দেখাইয়াছে অমনি তাহা নানা ধারায় জাতীয় জীবনযাত্রার সমস্ত বিচিত্র ব্যাপারেই যে নিজেকে উপলব্ধি করিবার জন্য সহজে ধাবিত হইবে ইহা অনিবার্য্য।

কিন্তু যেমন একদিকে সহসা দেশের এই শক্তির উপলব্ধি আমাদের কাছে সত্য হইল তেমনি সেই কারণেই আমরা নিজেদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড অভাব অনুভব করিলাম। দেখিলাম এতবড় শক্তিকে বাঁধিয়া তুলিবার কোনো ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে নাই। শীঘ্র নানাদিকে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহাকে এইবেলা আবদ্ধ করিয়া যথার্থপথে খাটাইবার উপায় করিতে পারিলে তাহা আমাদের চিরকালের সম্বল হইয়া উঠিত—এই ব্যাকুলতায় আমরা কষ্ট পাইতেছি।

ভিতরে একটা গভীর অভাব বা পীড়া থাকিলে যখন তাহাকে ভাল করিয়া ধরিতে বা তাহার ভালরূপ প্রতিকার করিতে না পারি তখন তাহা নানা অকারণ বিরক্তির আকার ধারণ করিতে থাকে। শিশু অনেক সময় বিনা হেতুতেই রাগ করিয়া তাহার মাকে মারে; তখন বুঝিতে হইবে সে রাগ বাহত তাহার মাতার প্রতি কিন্তু বস্তুত তাহা শিশুর একটা কোনো অনির্দ্দেশ্য অস্বাস্থ্য। সুস্থ শিশু যখন আনন্দে থাকে তখন বিরক্তির কারণ ঘটিলেও সেটাকে

সে অনায়াসে ভুলিয়া যায়। সেইরূপ দেশের আন্তরিক যে আক্ষেপ আমাদিগকে আত্মকলহে লইয়া যাইতেছে তাহা আর কিছুই নহে তাহা ব্যবস্থাবন্ধনের অভাবজনিত ব্যর্থ উদ্যমের অসন্তোষ। শক্তিকে অনুভব করিতেছি অথচ তাহাকে সম্পূর্ণ খাটাইতে পারিতেছি না বলিয়াই সেই অস্বাস্থ্যে ও আত্মগ্লানিতে আমরা আত্মীয়দিগকেও সহ্য করিতে পারিতেছি না।

যখন একদিনের চেষ্টাতেই আমরা দেখিয়াছি যে জাতীয় ভাণ্ডারে টাকা আসিয়া পড়া এই বহুপরিবারভারগ্রস্ত দরিদ্র দেশেও দুঃসাধ্য নহে তখন এই আক্ষেপ কেমন করিয়া ভুলিব যে কেবলমাত্র ব্যবস্থা করিতে না পারাতেই এই একদিনের উদ্যোগকে আমরা চিরদিনের ব্যাপার করিয়া তুলিতে পারিলাম না। এমন কি, যে টাকা আমাদের হাতে আসিয়া জমিয়াছে তাহা লইয়া কি যে করিব তাহাই আজ পর্য্যন্ত ঠিক করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই জমা টাকা মাতৃস্তনের নিরুদ্ধ দুগ্ধের মত আমাদের পক্ষে একটা বিষম বেদনার বিষয় হইয়া রহিল। দেশের লোক যখন ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে আমরা দিতে চাই আমরা কাজ করিতে চাই, কোথায় দিব কি করিব তাহার একটা কিনারা হইয়া উঠিলে বাঁচিয়া যাই; তখনো যদি দেশের এই উদ্যত ইচ্ছাকে সার্থক করিবার জন্য কোনো একটা যজ্ঞক্ষেত্র নির্ম্মিত না হয়, তখনো যদি সমস্ত কাজ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবেই হইতে থাকে তবে এমন অবস্থায় এমন খেদে মানুষ আর কিছু না পারিলে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করিয়া আপনার কর্ম্মরুদ্ধ উদ্যম ক্ষয় করে।

তখন ঝগড়ার উপলক্ষ্যও তেমনি অসঙ্গত হয়। আমাদের মধ্যে কেহ বা বলি আমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত স্বায়ত্তশাসন চাহি, কেহবা বলি আমি সাম্রাজ্যনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যই চাহি। অথচ এ সমস্ত কেবল মুখের কথা এবং এতই দূরের কথা যে ইহার সঙ্গে আমাদের উপস্থিত দায়িত্বের কোনো যোগ নাই।

দেবতা যখন কলোনিয়াল সেল্ফ গভর্মেণ্ট এবং অটনমি এই দুই বর দুই হাতে লইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন এবং যখন তাঁহার মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব সহিবে না তখন কোন্ বরটা তুলিয়া লইতে হইবে হাতে হাতে তাহার নিষ্পত্তি করিতে পরস্পর হাতাহাতি করাই যদি অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে তবে অগত্যা তাহা করিতে হইবে। কিন্তু যখন মাঠে চাষ দেওয়াও হয় নাই তখন কি ফসলভাগের মাম্‌লা তুলিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে?

ব্যক্তিই বল, জাতিই বল, মুক্তিই সকলের চরম সিদ্ধি। কিন্তু শাস্ত্রে বলে নিজের মধ্যেই মুক্তির নিগূঢ় বাধা আছে, সেইগুলা আগে কর্ম্মের দ্বারা ক্ষয় না করিলে কোনো মতেই মুক্তি নাই। আমাদের জাতীয় মুক্তিরও প্রধান বিঘ্ন সকল আমাদের অভ্যন্তরেই নানা আকারে বিদ্যমান;—কর্ম্মের দ্বারা সেগুলার যদি ধ্বংশ না হয় তবে তর্কের দ্বারা হইবে না এবং বিবাদের দ্বারা তাহা বাড়িতেই থাকিবে। অতএব, মুক্তি কয় প্রকারের আছে, সাযুজ্য মুক্তিই ভাল না স্বাতন্ত্র্য মুক্তিই শ্রেয় শান্তিরক্ষা করিয়া তাহার আলোচনা অনায়াসেই চলিতে পারে, কিন্তু সাযুজ্যই বল, আর স্বাতন্ত্র্যই বল, গোড়াকার কথা একই অর্থাৎ তাহা কর্ম্ম।

সেখানে উভয় দলকে একই পথ দিয়া যাত্রা করিতে হইবে। যে সকল প্রকৃতিগত কারণে আমরা দরিদ্র ও দুর্ব্বল, আমরা বিভক্ত বিরুদ্ধ ও পরতন্ত্র—সেই কারণ ঘোচাইবার জন্য আমরা যদি সত্য সত্যই মন দিই তবে আমাদের সকল মতের লোককে একত্রে মিলিতেই হইবে।

এই কর্ম্মক্ষেত্রেই যখন আমাদের সকলের একত্রে মিলন নিতান্তই চাই তখন সেই মিলনের জন্য একটি বিশেষ গুণের প্রয়োজন—তাহা অমত্ততা। আমরা যদি যথার্থ বলিষ্ঠমনা ব্যক্তির ন্যায় কথায় ও ব্যবহারে, চিন্তায় ও প্রকাশে পরিমাণরক্ষা করিয়া না চলিতে পারি তবে মিলনই আমাদের পক্ষে বিরোধের হেতু হইবে—এবং কর্ম্মের চেষ্টায় লাভ না হইয়া বারম্বার ক্ষতি ঘটাইতে থাকিবে।

এই বিষয়ে আজকালকার ভারতীয় রাজপুরুষদের সমান চালে চলিবার চেষ্টা করিলে আমাদের অনিষ্টই হইবে। বর্ত্তমান ভারতশাসনব্যাপারে একটা উৎকট হিষ্টীরিয়ার আক্ষেপ হঠাৎ থাকিয়া থাকিয়া কখনো পাঞ্জাবে, কখনো মান্দ্রাজে, কখনো বাংলায় যেরূপ অসংযমের সহিত প্রকাশ পাইয়া উঠিতেছে সেটা কি আমাদের পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত?

যাহারি হাতে বিরাট্ শক্তি আছে, সে যদি অসহিষ্ণু হইয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করাকেই পৌরুষের পরিচয় বলিয়া কল্পনা করে এবং নিজের রচনাকে নিজে বিপর্য্যস্ত করিয়া সান্ত্বনা পায় তবে তাহার সেই চিত্তবিকার আমাদের মত দুর্ব্বলতর পক্ষকে যেন অনুকরণে উত্তেজিত না করে। বস্তুত প্রবলই হোক্ আর দুর্ব্বলই হোক্ যে ব্যক্তি বাক্যে ও আচরণে অন্তরের ভাবাবেগকে যথেষ্ট পরিমাণে সংযত করিতে না পারিয়াছে সেই ব্যক্তি সকল কর্ম্মের অন্তরায় একথাটা ক্ষোভবশত আমরা যখনি ভুলি ইহার সত্যতাও তখনি সবেগে সপ্রমাণ হইয়া উঠে

সম্প্রতি দেশের কর্ম্ম বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার যথার্থ গতিটা কোন্ দিকে সে সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে সত্যকার কোনো মতভেদ আছে একথা আমি মনে করিতেই পারি না।

কর্ম্মের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র উপস্থিত একটা কোনো ফললাভ নহে। শক্তিকে খাটাইবার জন্যও কর্ম্মের প্রয়োজন। কর্ম্মের উপযুক্ত সুযোগ পাইলেই এই শক্তি নানা আশ্চর্য্য ও অভাবনীয়রূপে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। এমন যদি উপায় থাকিত যাহাতে ফলটা পাওয়া যায় অথচ শক্তিটার কোনো প্রয়োজনই হয় না তবে তাহাকে আমরা সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিতে পারিতাম না।

তেমন উপায় পৃথিবীতে নাইও। আমরা কোনো শ্রেয়ঃ পদার্থকেই পরের কৃপার দ্বারা পাই না, নিজের শক্তির দ্বারাই লই। ইহার অন্যথা হইতেই পারে না। কারণ, বিধাতা বরঞ্চ আমাদিগকে হনন করিতে পারেন কিন্তু মনুষ্যত্বকে অপমানিত হইবার পথে কোনো প্রশ্রয় দেন না।

সেই জন্যই দেখিতে পাই গবর্মেণ্টের দানের সঙ্গে যেখানেই আমাদের শক্তির কোনো সহযোগিতা নাই সেখানে সেই দানই বক্র হইয়া উঠিয়া আমাদের কত না বিপদ ঘটাইতে পারে! প্রশ্রয়প্রাপ্ত পুলিস্ যখন দস্যুবৃত্তি করে তখন প্রতিকার অসম্ভব হইয়া উঠে;

গবর্মেণ্টের প্রসাদভোগী পঞ্চায়েৎ যখন গুপ্তচরের কাজ আরম্ভ করে তখন পক্ষে তাহা যে কতবড় উপদ্রবের কারণ হইতে পারে তাহা কিছুই বলা যায় না; গবর্মেণ্টের চাকরি যখন শ্রেণীবিশেষকেই অনুগ্রহভাজন করিয়া তোলে তখন ঘরের লোকের মধ্যেই বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠে এবং রাজমন্ত্রীসভায় যখন সম্প্রদায়বিশেষের জন্যই আসন প্রশস্ত হইতে থাকে তখন বলিতে হয় আমার উপকারে কাজ নাই তোমার অনুগ্রহ ফিরাইয়া লও। আমাদের নিজের মধ্যে সতেজ শক্তি থাকিলে এই সমস্ত বিকৃতি কিছুতেই ঘটিতে পারিত না—আমরা দান গ্রহণ করিবার ও তাহাকে রক্ষা করিবার অধিকারী হইতাম—দান আমাদের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই বলিদান হইয়া উঠিত না।

অতএব আমি যাহা বলিতেছি তাহাতে এ বোঝায় না যে আমাদের কর্ম্মের কোনো উপকরণ আমরা গবর্মেণ্টের নিকট হইতে লইব না, কিন্তু ইহাই বুঝায় যে নিজের সম্পূর্ণ সাধ্যমত যদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই তবেই তাহার উপকরণ আমরা সকল স্থান হইতেই অসংকোচে সংগ্রহ করিবার অধিকারী হইব। নতুবা আমাদের সেই গল্পের দশা ঘটিবে। আমরা মা কালীর কাছে মহিষ মানৎ করিবার বেলা চিন্তা করিব না বটে কিন্তু পরে তিনি যখন অনেক ক্ষমা করিয়াও একটিমাত্র পতঙ্গ দাবী করিবেন তখন বলিব, মা, ওটা তুমি নিজে ক্ষেত্রে গিয়া ধরিয়া লওগে। আমরাও কথার বেলায় বড় বড় করিয়াই বলিব কিন্তু অবশেষে দেশের একটি সামান্য হিতসাধনের বেলাতেও অন্যের উপরে বরাৎ দিয়া দায় সারিবার ইচ্ছা করিব।

কাজে প্রবৃত্ত হইতে গেলে, রাগ করিয়া, গর্ব্ব করিয়া, বা অন্য কারণে, যে জিনিষটা নিশ্চিত আছে তাহাকে নাই বলিয়া হিসাব হইতে বাদ দিয়া বসিলে চলিবে না। ভারতে ইংরাজ গবর্মেণ্ট যেন একেবারেই নাই এমনভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা শয়নাগারেই চলে কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে সেরূপভাবে চলিলেই নিশ্চয় ঠকিতে হইবে।

অবশ্য একথাও সত্য, ইংরেজও, যতদূর সম্ভব, এমনভাবে চলিতেছে যেন আমরা কোথাও নাই। আমাদের ত্রিশকোটি লোকের মাঝখানে থাকিয়াও তাহারা বহুদূরে। সেই জন্যই আমাদের সম্বন্ধে তাহাদের পরিমাণবোধ একেবারেই চলিয়া গেছে। সেই জন্যই পনেরো বৎসরের একটি ইস্কুলের ছেলেরও একটু তেজ দেখিলে তাহারা জেলের মধ্যে তাহাকে বেত মারিতে পারে; মানুষ সামান্য একটু নড়িলে চড়িলেই প্যুনিটিভ পুলিসের চাপে তাহাকে সম্পূর্ণ নিশ্চল করিয়া ফেলিতে, মনে তাহাদের ধিক্কার বোধ হয় না; এবং দুর্ভিক্ষে মরিবার মুখে লোকে যখন বিলাপ করিতে থাকে সেটাকে অত্যুক্তি বলিয়া অগ্রাহ্য করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয়; সেই জন্যই বাংলার বিভাগব্যাপারে সমস্ত বাঙালীকেই বাদ দিয়া মর্লে সেটাকে settled fact বলিয়া গণ্য করিতে পারিয়াছেন। এইরূপে আচারে বিচারে এবং রাষ্ট্রবিধানে যখন দেখিতে পাই ইংরাজের খাতায় হিসাবের অঙ্কে আমরা কতবড় একটা শূন্য তখন ইহার পাল্টাই দিবার জন্য আমরাও উঁহাদিগকে যতদূর পারি অস্বীকার করিবার ভঙ্গী করিতে ইচ্ছা করি।

কিন্তু খাতায় আমাদিগকে একেবারে

শূন্যের ঘরে বসাইয়া গেলেও আমরা ত সত্যই একেবারে শূন্য নহি। ইংরেজের সুমারনবিশ ভুল হিসাবে যে অঙ্কটা ক্রমাগতই হরণ করিয়া চলিতেছে তাহাতে তাহার সমস্ত খাতা দূষিত হইয়া উঠিতেছে। গায়ের জোরে তাঁহাকে না করিলে গণিতশাস্ত্র ক্ষমা করিবার লোক নয়।

একপক্ষে এই ভুল করিতেছে বলিয়া রাগ করিয়া আমরাও কি সেই ভুলটাই করিব? পরের উপর বিরক্ত হইয়া নিজের উপরেই তাহারি প্রতিশোধ তুলিব? ইহা ত কাজের প্রণালী নহে।

বিরোধমাত্রই একটা শক্তির ব্যয়—অনাবশ্যক বিরোধ অপব্যয়। দেশের হিতব্রতে যাঁহারা কর্ম্মযোগী, অত্যাবশ্যক কণ্টকক্ষত তাঁহাদিগকে পদে পদে সহ্য করিতেই হইবে; কিন্তু শক্তির ঔদ্ধত্যপ্রকাশ করিবার জন্য স্বদেশের যাত্রাপথে নিজের চেষ্টায় কাঁটার চাষ করা কি দেশহিতৈষিতা!

আমরা এই যে বিদেশীবর্জ্জনব্রত গ্রহণ করিয়াছি ইহারই দুঃখ ত আমাদের পক্ষে সামান্য নহে। স্বয়ং য়ুরোপেই ধনী আপন ধনবৃদ্ধির পথ অব্যাহত রাখিবার জন্য শ্রমীকে কিরূপ নাগপাশে বেষ্টন করিয়া ফেলিতেছে এবং তাহা লইয়া সেখানে কতই কঠিন আঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে। আমাদের দেশে সেই ধনী শুধু ধনী নন জেলের দারোগা লিভারপুলের নিমক খাইয়া থাকে।

অতএব এ দেশের যে ধন লইয়া পৃথিবীতে তাঁহারা ঐশ্বর্য্যের চূড়ায় উঠিয়াছেন সেই ধনের রাস্তায় আমরা একটা সামান্য বাধা দিলেও তাঁহারা ত আমাদিগকে সহজে ছাড়িবেন না। এমন অবস্থায় যে সংঘাত আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে তাহা খেলা নহে,—তাহাতে আরাম বিশ্রামের অবকাশ নাই, তাহাতে আমাদের সমস্ত শক্তি ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন আছে। ইহার উপরেও যাঁহারা অনাহূত ঔদ্ধত্য ও অনাবশ্যক উগ্রবাক্য প্রয়োগ করিয়া আমাদের কর্ম্মের দুরূহতাকে কেবলই বাড়াইয়া তুলিয়াছেন তাঁহারা কি দেশের কাছে অপরাধী নহেন? কাজের কঠোরতাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিব, কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিব না—দেশের শিল্পবাণিজ্যকে স্বাধীন করিয়া নিজের শক্তি অনুভব করিব, দেশের বিদ্যাশিক্ষাকে স্বায়ত্ত করিব, সমাজকে দেশের কর্ত্তব্যসাধনের উপযোগী বলিষ্ঠ করিয়া তুলিব;—ইহা করিতে গেলে ঘরে পরে দুঃখ ও বাধার অবধি থাকিবে না সে জন্য অপরাজিত চিত্তে প্রস্তুত হইব কিন্তু বিরোধকে বিলাসের সামগ্রী করিয়া তুলিব না। দেশের কাজ নেশার কাজ নহে তাহা সংযমীর দ্বারা যোগীর দ্বারাই সাধ্য।

মনে করিবেন না, ভয় বা সঙ্কোচ বশত আমি এ কথা বলিতেছি। দুঃখকে আমি জানি, দুঃখকে আমি মানি, দুঃখ দেবতারই প্রকাশ; সেই জন্যই ইহার সম্বন্ধে কোনো চাপল্য শোভা পায় না। দুঃখ দুর্ব্বলকেই, হয় স্পর্দ্ধায় নয় অভিভূতিতে লইয়া যায়। প্রচণ্ডতাকেই যদি প্রবলতা বলিয়া জানি, কলহকেই যদি পৌরুষ বলিয়া গণ্য করি, এবং নিজেকে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদাই অতিমাত্র প্রকাশ করাকেই যদি আত্মোপলব্ধির স্বরূপ বলিয়া স্থির করি তবে দুঃখের নিকট হইতে আমরা কোনো মহৎ শিক্ষা প্রত্যাশা করিতে পারিব না।

দেশে আমাদের যে বৃহৎ কর্ম্মস্থানকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে কেমন করিয়া তাহা আরম্ভ করিব? উচ্চ চূড়াকে আকাশে তুলিতে গেলে তাহার ভিত্তিকে প্রশস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আমাদেরও কর্ম্মশক্তির চূড়াকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে যদি অভ্রভেদী করিতে চাই তবে প্রত্যেক জেলা হইতে তাহার ভিৎ গাঁথার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। প্রভিন্‌শ্যাল্ কন্‌ফারেন্সের ইহাই সার্থকতা।

প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভা স্থাপিত হইবে। এই সভা যথাসম্ভব গ্রামে গ্রামে আপনার শাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত জেলাকে আচ্ছন্ন করিবে—প্রথমে সমস্ত প্রদেশের সর্ব্বাংশের সকল প্রকার তথ্য সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিবে—কারণ কর্ম্মের ভূমিকাই জ্ঞান। যেখানে কাজ করিতে হইবে সর্ব্বাগ্রে তাহার সমস্ত অবস্থা জানা চাই।

দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্ম্মের এবং অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্য্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চ্চা দেশের সর্ব্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্ম্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে সেখানে কর্ম্মে ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিসের দ্বারা গ্রামের বিবাদ ও মামলা মিটাইয়া দিবে।

জোৎদার ও চাষা রায়ৎ যতদিন প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থাকিয়া চাষবাস করিবে ততদিন তাহাদের অস্বচ্ছল অবস্থা কিছুতেই ঘুচিবে না। পৃথিবীতে চারিদিকে সকলেই জোট বাঁধিয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছে; এমন অবস্থায় যাহারাই বিচ্ছিন্ন এককভাবে থাকিবে তাহাদিগকে চিরদিনই অন্যের গোলামী ও মজুরী করিয়া মরিতেই হইবে।

অন্যকার দিনে যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে সমস্ত একত্র মিলাইয়া বাঁধ বাঁধিবার সময় আসিয়াছে। এ না হইলে ঢালু পথ দিয়া আমাদের ছোট ছোট সামর্থ্য ও সম্বলের ধারা বাহির হইয়া গিয়া অন্যের জলাশয় পূর্ণ করিবে। অন্ন থাকিতেও আমরা অন্ন পাইব না এবং আমরা কি কারণে কেমন করিয়া যে মরিতেছি তাহা জানিতেও পারিব না। আজ যাহাদিগকে বাঁচাইতে চাই তাহাদিগকে মিলাইতে হইবে।

য়ুরোপে আমেরিকায় কৃষির নানাপ্রকার মিতশ্রমিক যন্ত্র বাহির হইয়াছে—নিতান্ত দারিদ্র্যবশত সে সমস্ত আমাদের কোনো কাজেই লাগিতেছে না—অল্প জমি ও অল্প শক্তি লইয়া সে সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব নহে। যদি এক একটি মণ্ডলীর অথবা এক একটি গ্রামের সকলে সমবেত হইয়া নিজেদের সমস্ত জমি একত্র মিলাইয়া দিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তবে আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে অনেক খরচ বাঁচিয়া ও কাজের সুবিধা হইয়া তাহারা লাভবান হইতে পারে। যদি গ্রামের উৎপন্ন সমস্ত ইক্ষু তাহারা এক কলে মাড়াই করিয়া লয় তবে দামী কল কিনিয়া লইলে তাহাদের লাভ বই

লোকসান হয় না—পাটের ক্ষেত সমস্ত এক করিয়া লইলে প্রেসের সাহায্যে তাহারা নিজেরাই পাট বাঁধাই করিয়া লইতে পারে—গোয়ালারা একত্র হইয়া জোট করিলে গোপালন ও মাখন ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত করা সস্তায় ও ভাল মতে সম্পন্ন হয়। তাঁতিরা জোট বাঁধিয়া নিজের পল্লীতে যদি কল আনে এবং প্রত্যেকে তাহাতে আপনার খাটুনি দেয় তবে কাপড় বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হওয়াতে তাহাদের প্রত্যেকেরই সুবিধা ঘটে।

সহরে ধনী মহাজনের কারখানায় মজুরি করিতে গেলে শ্রমীদিগের মনুষ্যত্ব কিরূপ নষ্ট হয় সকলেই জানেন। বিশেষত আমাদের যে দেশের সমাজ গৃহের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে গৃহনীতি বিচলিত হইলে ধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন জীর্ণ হইয়া পড়ে ও সমাজের মর্ম্মস্থানে বিষসঞ্চার হইতে থাকে সে দেশে বড় বড় কারখানা যদি সহরের মধ্যে আবর্ত্ত রচনা করিয়া চারিদিকের গ্রাম পল্লী হইতে দরিদ্র গৃহস্থ দিগকে আকর্ষণ করিয়া আনে তবে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত, বাসস্থান হইতে বিশ্লিষ্ট স্ত্রী পুরুষগণ নিরানন্দকর কলের কাজে ক্রমশই কিরূপ দুর্গতির মধ্যে নিমজ্জিত হইতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। কলের দ্বারা কেবল জিনিষ পত্রের উপচয় করিতে গিয়া মানুষের অপচয় করিয়া বসিলে সমাজের অধিকদিন তাহা সহিবে না। অতএব পল্লীবাসীরাই একত্রে মিলিলে যে সকল যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভবপর হয় তাহারই সাহায্যে স্বস্থানেই কর্ম্মের উন্নতি করিতে পারিলে সকল দিক রক্ষা হইতে পারে। শুধু তাই নয় দেশের জনসাধারণকে ঐক্যনীতিতে দীক্ষিত করিবার এই একটি উপায়। প্রাদেশিক সভা উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা একটি মণ্ডলীকেও যদি এইরূপে গড়িয়া তুলিতে পারেন তবে এই দৃষ্টান্তের সফলতা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

এমনি করিয়া ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হইয়া উঠিলে ভারতবর্ষের দেশগুলির মধ্যে তাহার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়া উঠিবে এবং সেই দৈশিক কেন্দ্রগুলি একটি মাহাদেশিক কেন্দ্রচূড়ায় পরিণত হইবে। তখনই সেই কেন্দ্রটি ভারতবর্ষের সত্যকার কেন্দ্র হইবে। নতুবা পরিধি যাহার প্রস্তুতই হয় নাই সেই কেন্দ্রের প্রামাণিকতা কোথায়? এবং যাহার মধ্যে দেশের কর্ম্মের কোনো উদ্যোগ নাই কেবলমাত্র দুর্ব্বল জাতির দাবী এবং দায়িত্বহীন পরামর্শ সে সভা দেশের রাজকর্ম্মসভার সহযোগী হইবার আশা করিবে কোন্ সত্যের এবং কোন্ শক্তির বলে?

কল আসিয়া যেমন তাঁতকে মারিয়াছে তেমনি ব্রিটিশ শাসনও সর্ব্বগ্রহ ও সর্ব্বব্যাপী হইয়া আমাদের গ্রাম্যসমাজের সহজব্যবস্থাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। কালক্রমে প্রয়োজনের বিস্তারবশত ছোট ব্যবস্থা যখন বড় ব্যবস্থায় পরিণত হয় তখন তাহাতে ভাল বই মন্দ হয় না—কিন্তু তাহা স্বাভাবিক পরিণতি হওয়া চাই। আমাদের যে গ্রাম্যব্যবস্থা ছিল, ছোট হইলেও তাহা আমাদেরই ছিল, ব্রিটিশ ব্যবস্থা যত বড়ই হউক তাহা আমাদের নহে। সুতরাং তাহাতে যে কেবল আমাদের শক্তির জড়তা ঘটিয়াছে তাহা নহে তাহা আমাদের সমস্ত প্রয়োজন ঠিক মত করিয়া পূরণ করিতে

পারিতেছে না। নিজের চক্ষুকে অন্ধ করিয়া পরের চক্ষু দিয়া কাজ চালানো কখনই ঠিক মত হইতে পারে না।

এখন তাই দেখা যাইতেছে গ্রামের মধ্যে চেষ্টার কোনো লক্ষণ নাই। জলাশয় পূর্ব্বে ছিল আজ তাহা বুজিয়া আসিতেছে, কেননা দেশের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ। যে গোচারণের মাঠ ছিল তাহা রক্ষণের কোনো উপায় নাই; যে দেবালয় ছিল তাহা সংস্কারের কোনো শক্তি নাই; যে সকল পণ্ডিত সমাজের বন্ধন ছিলেন তাঁহাদের গণ্ডমূর্খ ছেলেরা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যবসায় ধরিয়াছে; যে সকল ধনিগৃহে ক্রিয়াকর্ম্মে যাত্রার গানে সাহিত্যরস ও ধর্ম্মের চর্চ্চা হইত তাঁহারা সকলেই সহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন; যাঁহারা দুর্ব্বলের সহায়, শরণাগতের আশ্রয় ও দুষ্কৃতিকারীর দণ্ডদাতা ছিলেন তাঁহাদের স্থান পুলিসের দারোগা আজ কিরূপভাবে পূরণ করিতেছে তাহা কাহারো অগোচর নাই; লোকহিতের কোনো উচ্চ আদর্শ, পরার্থে আত্মত্যাগের কোনো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গ্রামের মাঝখানে আর নাই; কোনো বিধিনিষেধের শক্তি ভিতর হইতে কাজ করিতেছে না, আইনে যে কৃত্রিম বাঁধ দিতে পারে তাহাই আছে মাত্র; পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা মকদ্দমায় গ্রাম উন্মাদের মত নিজের নখে নিজেকে ছিন্ন করিতেছে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার কেহ নাই; জঙ্গল বাড়িয়া উঠিতেছে, ম্যালেরিয়া নিদারুণ হইতেছে, দুর্ভিক্ষ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; আকাল পড়িলে পরবর্ত্তী ফসল পর্য্যন্ত ক্ষুধা মিটাইয়া বাঁচিবে এমন সঞ্চয় নাই; ডাকাত অথবা পুলিস চুরি অথবা চুরি তদন্ত জন্য ঘরে ঢুকিলে ক্ষতি ও অপমান হইতে আপনার গৃহকে বাঁচাইবে এমন পরস্পরঐক্যমূলক সাহস নাই; তাহার পর যা খাইয়া শরীর বল পায় ও ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে তাহার কি অবস্থা! ঘি দূষিত, দুধ দুর্ম্মূল্য, মৎস্য দুর্লভ, তৈল বিষাক্ত; যে কয়টা স্বদেশী ব্যাধি ছিল তাহারা আমাদের যকৃৎ প্লীহার উপর সিংহাসন পাতিয়া বসিয়াছে; তাহার উপর বিদেশী ব্যাধিগুলা অতিথির মত আসে এবং কুটুম্বের মত রহিয়া যায়;—ডিপ্থিরিয়া রাজযক্ষ্মা, টাইফয়েড্ সকলেই এই রক্তহীনদের প্রতি Exploitation-নীতি অবলম্বন করিয়াছে। অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, ভরসা নাই, পরস্পরের সহযোগিতা নাই; আঘাত উপস্থিত হইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া মরি, অবিচার উপস্থিত হইলে নিজের অদৃষ্টকেই দোষী করি এবং আত্মীয়ের বিপদ উপস্থিত হইলে দৈবের উপর তাহার ভার সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকি। ইহার কারণ কি! ইহার কারণ এই, সমস্ত দেশ যে শিকড় দিয়া রস আকর্ষণ করিবে সেই শিকড়ে পোকা ধরিয়াছে, যে মাটি হইতে বাঁচিবার খাদ্য পাইবে সেই মাটি পাথরের মত কঠিন হইয়া গিয়াছে—যে গ্রামসমাজ জাতির জন্মভূমি ও আশ্রয় স্থান তাহার সমস্ত ব্যবস্থাবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; এখন সে ছিন্নমূল বৃক্ষের মত নবীনকালের নির্দ্দয় বন্যার মুখে ভাসিয়া যাইতেছে।

দেশের মধ্যে পরিবর্ত্তন বাহির হইতে আসিলে পুরাতন আশ্রয়টা যখন অব্যবহারে ভাঙিয়া পড়ে এবং নূতন কালের উপযোগী

কোনো নূতন ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠে না তখন সেইরূপ যুগান্তকালে বহুতর পুরাতন জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরাও কি দিনে দিনে উদ্বাস দৃষ্টির সম্মুখে স্বজাতিকে লুপ্ত হইতে দেখিব? ম্যালেরিয়া, মারী, দুর্ভিক্ষ এগুলি কি আকস্মিক? এগুলি কি আমাদের সান্নিপাতিকের মজ্জাগত দুর্লক্ষণ নহে? সকলের চেয়ে ভয়ঙ্কর দুর্লক্ষণ সমগ্র দেশের হৃদয়নিহিত হতাশ নিশ্চেষ্টতা। কিছুরই যে প্রতিকার আমাদের নিজের হাতে আছে, কোন ব্যবস্থাই যে আমরা নিজে করিতে পারি সেই বিশ্বাস যখন চলিয়া যায়, যখন কোনো জাতি কেবল করুণ ভাবে ললাটে করস্পর্শ করে ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আকাশের দিকে তাকায় তখন কোনো সামান্য আক্রমণও সে আর সহিতে পারে না, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষত দেখিতে দেখিতে তাহার পক্ষে বিষক্ষত হইয়া উঠে। তখন সে মরিলাম মনে করিয়াই মরিতে থাকে।

কিন্তু কালরাত্রি বুঝি পোহাইল,—রোগের বাতায়ন পথে প্রভাতের আলোক আশা বহন করিয়া আসিয়াছে; আজ আমরা দেশের শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী—যাহারা একদিন সুখে দুঃখে সমস্ত জনসাধারণের সঙ্গী ও সহায় ছিলাম এবং আজ যাহারা ভদ্রতা ও শিক্ষার বিলাস বশতই চিন্তায় ভাষায় ভাবে আচারে কর্ম্মে সর্ব্ববিষয়েই সাধারণ হইতে কেবলি দূরে চলিয়া যাইতেছি আমাদিগকে আর একবার উচ্চনীচ সকলের সঙ্গে মঙ্গল সম্বন্ধে একত্র মিলিত হইয়া সামাজিক অসামঞ্জস্যের ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে দেশের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের শক্তিকে দেশের কল্যাণকর ও দেশের শক্তিকে আমাদের কর্ম্মের সহযোগী করিয়া তুলিবার সময় প্রত্যহ বহিয়া যাইতেছে। যাহারা স্বভাবতই এক অঙ্গ তাহাদের মাঝখানে বাধা পড়িয়া যদি এক রক্ত একপ্রাণ অবাধে সঞ্চারিত হইতে না পারে তবে যে একটা সাংঘাতিক ব্যাধি জন্মে সেই ব্যাধিতেই আজ আমরা মরিতে বসিয়াছি। পৃথিবীতে সকলেই আজ ঐক্যবদ্ধ হইতেছে, আমরাই কেবল সকলদিকে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছি আমরা টিঁকিতে পারিব কেমন করিয়া?

আমাদের চেতনা জাতীয় অঙ্গের সর্ব্বত্রই যে প্রসারিত হইতেছে না—আমাদের বেদনাবোধ যে অতিশয় পরিমাণে কেবল সহরে, কেবল বিশিষ্ট সমাজেই বদ্ধ তাহার একটা প্রমাণ দেখুন। স্বদেশি-উদ্যোগটা ত সহরের শিক্ষিতমণ্ডলীই প্রবর্ত্তন করিয়াছেন কিন্তু মোটের উপরে তাঁহারা বেশ নিরাপদেই আছেন। যাহারা বিপদে পড়িয়াছে তাহারা কাহারা?

জগদ্দল পাথর বুকের উপর চাপাইয়া দেওয়া যে একটা দণ্ডবিধি তাহা রূপকথায় শুনিয়াছিলাম। বর্ত্তমান রাজশাসনে রূপকথার সেই জগদ্দল পাথরটা প্যুনিটিভ্ পুলিসের বাস্তব-মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু এই পাথরটা অসহায় গ্রামের উপরে চাপিয়াছে বলিয়াই ইহার চাপ আমাদের সকলের বুকে পড়িতেছে না কেন? বাংলাদেশের এই বক্ষের ভারকে আমরা সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া লইয়া বেদনাকে সমান করিয়া তুলিব না কেন? স্বদেশীপ্রচার যদি অপরাধ হয় তবে প্যুনিটিভ্ পুলিসের ব্যয়ভার আমরা সকল অপরাধীই বাঁটিয়া লইব। এই বেদনা

যদি সকল বাঙালীর সামগ্রী হইয়া উঠে তবে ইহা আর বেদনাই থাকিবে না, আনন্দই হইয়া উঠিবে।

এই উপলক্ষ্যে দেশের জমিদারের প্রতি আমার নিবেদন এই যে বাংলার পল্লীর মধ্যে প্রাণসঞ্চারের জন্য তাঁহারা উদ্যোগী না হইলে একাজ কখনই সুসম্পন্ন হইবে না। পল্লী সচেতন হইয়া নিজের শক্তি নিজে অনুভব করিতে থাকিলে জমিদারের কর্ত্তৃত্ব ও স্বার্থ খর্ব্ব হইবে বলিয়া আপাতত আশঙ্কা হইতে পারে— কিন্তু এক পক্ষকে দুর্ব্বল করিয়া নিজের স্বেচ্ছাচারের শক্তিকে কেবলি বাধাহীন করিতে থাকা আর ডাইনামাইট্ বুকের পকেটে লইয়া বেড়ান একই কথা—একদিন প্রলয়ের অস্ত্র বিমুখ হইয়া অস্ত্রীকেই বধ করে। রায়তদিগকে এমনভাবে সবল ও শিক্ষিত করিয়া রাখা উচিত যে ইচ্ছা করিলেও তাহাদের প্রতি অন্যায় করিবার প্রলোভনমাত্র জমিদারের মনে না উঠিতে পারে। জমিদার কি বণিকের মত কেবল দীনভাবে আদায় করিবার পথগুলিই সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত রাখিবেন? কিন্তু সেই সঙ্গে মহৎভাবে স্বার্থ ত্যাগ করিবার সম্বন্ধ যদি একান্ত যত্নে না রক্ষা করেন, উচিত ক্ষতি উদারভাবে স্বীকার করিবার শক্তি যদি তাঁহার না থাকে তবে তাঁহার আত্মসম্মান কেমন করিয়া থাকিবে? রাজহাটে উপাধি কিনিবার বেলায় তিনি ত লোকসানকে লোকসান জ্ঞান করেন না? কিন্তু যথার্থ রাজা হইবার একমাত্র স্বাভাবিক অধিকার আছে তাঁহার রায়তদের কাছে। তিনি যে বহুতর লোকের প্রভু, বন্ধু, ও রক্ষক, বহুলোকের মঙ্গল বিধানকর্ত্তা, পৃথিবীতে এত বড় উচ্চ পদলাভ করিয়া এপদের দায়িত্ব রক্ষা করিবেন না?

একথা যেন না মনে করি যে দূরে বসিয়া টাকা ঢালিতে পারিলেই রায়তের হিত করা যায়। এ সম্বন্ধে একটি শিক্ষা কোনোদিন ভুলিব না। এক সময়ে আমি মফস্বলে কোনো জমিদারী তত্ত্বাবধান কালে সংবাদ পাইলাম পুলিসের কোনো উচ্চ কর্ম্মচারী কেবল যে একদল জেলের গুরুতর ক্ষতি করিয়াছে তাহা নহে, তদন্তের উপলক্ষ্য করিয়া তাহাদের গ্রামে গৃহস্থদের মধ্যে বিষম অশান্তি উপস্থিত করিয়াছে। আমি উৎপীড়িত জেলেদের ডাকিয়া বলিলাম তোরা উৎপাতকারীর নামে দেওয়ানি ও ফৌজদারি যেমন ইচ্ছা নালিশ কর আমি কলিকাতা হইতে বড় কৌঁসুলি আনাইয়া মকদ্দমা চালাইব। তাহারা হাত জোড় করিয়া কহিল, কর্ত্তা, মামলায় জিতিয়া লাভ কি? পুলিসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে আমরা ভিটায় টিঁকিতেই পারিব না।

আমি ভাবিয়া দেখিলাম দুর্ব্বল লোক জিতিয়াও হারে; চমৎকার অস্ত্রচিকিৎসা হয় কিন্তু ক্ষীণরোগী চিকিৎসার দায়েই মারা পড়ে। তাহার পর হইতে এই কথা আমাকে বারম্বার ভাবিতে হইয়াছে আর কোনো দান দানই নহে, শক্তিদানই একমাত্র দান।

একটা গল্প আছে, ছাগশিশু একবার ব্রহ্মার কাছে গিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল, "ভগবান, তোমার পৃথিবীতে আমাকে সকলেই খাইতে চায় কেন?" তাহাতে ব্রহ্মা উত্তর করিয়াছিলেন "বাপু, অন্যকে দোষ দিব কি, তোমার চেহারা দেখিলে আমারই খাইতে ইচ্ছা করে!"

পৃথিবীতে অক্ষম বিচার পাইবে, রক্ষা পাইবে এমন ব্যবস্থা দেবতাই করিতে পারেন না। ভারত মন্ত্রসভা হইতে আরম্ভ করিয়া পার্লামেন্ট পর্য্যন্ত মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও ইহার যথার্থ প্রতিবিধান হইতে পারে না। সাধু-ইচ্ছা এখানে অশক্ত। দুর্ব্বলতার সংস্রবে আইন আপনি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, পুলিস আপনি বিভীষিকা হইয়া উঠে। এবং যাঁহাকে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া দোহাই পাড়ি স্বয়ং তিনিই পুলিসের ধর্ম্মবাপ হইয়া দাঁড়ান।

এদিকে প্রজার দুর্ব্বলতা সংশোধন আমাদের কর্ত্তৃপক্ষদের বর্ত্তমান রাজনীতির বিরুদ্ধ। যিনি পুলিস্ কমিশনে বসিয়া একদিন ধর্ম্মবুদ্ধির জোরে পুলিসকে অত্যাচারী বলিয়া কটুবাক্য বলেন তিনিই লাটের গদিতে বসিয়া কর্ম্মবুদ্ধির ঝোঁকে সেই পুলিসের বিষদাঁতে সামান্য আঘাতটুকু লাগিলেই অসহ্য বেদনায় অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকেন। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কচি পাঁঠাটিকে অন্যের হাত হইতে রক্ষাযোগ্য করিতে গেলে পাছে সে তাঁহার নিজের চতুর্ম্মুখের পক্ষেও কিছুমাত্র শক্ত হইয়া উঠে এ আশঙ্কা তিনি ছাড়িতে পারেন না। দেবা দুর্ব্বলঘাতকাঃ।

তাই দেশের জমিদারদিগকে বলিতেছি, হতভাগ্য রায়তদিগকে পরের হাত এবং নিজের হাত হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত শিক্ষিত, সুস্থ ও শক্তিশালী করিয়া না তুলিলে কোনো ভাল আইন বা অনুকূল রাজশক্তির দ্বারা ইহারা কদাচ রক্ষা পাইতে পারিবে না। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র সকলেরই জিহ্বা লালায়িত হইবে। এমনি করিয়া দেশের অধিকাংশ লোককেই যদি জমিদার, মহাজন, পুলিস, কানুনগো, আদালতের আমলা, যে ইচ্ছা সেই অনায়াসেই মারিয়া যায় ও মারিতে পারে তবে দেশের লোককে মানুষ হইতে না শিখাইয়াই রাজা হইতে শিখাইব কি করিয়া?

অবশেষে, বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশের যে সকল দৃঢ়নিষ্ঠ যুবক সমস্ত সঙ্কট উপেক্ষা করিয়াও স্বদেশহিতের জন্য স্বেচ্ছাব্রত ধারণ করিতেছেন অদ্য এই সভাস্থলে তাঁহারা সমস্ত বঙ্গদেশের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন! রক্তবর্ণ প্রত্যূষে তোমরাই সর্ব্বাগ্রে জাগিয়া উঠিয়া অনেক দ্বন্দ্বসংঘাত এবং অনেক দুঃখ সহ্য করিলে। তোমাদের সেই পৌরুষের উদ্বোধন কেবলমাত্র বজ্রঝঙ্কারে ঘোষিত হইয়া উঠে নাই, আজ করুণাবর্ষণে তৃষ্ণাতুর দেশে প্রেমের বাদল আনিয়া দিয়াছে। সকলে যাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছে, অপমানে যাহারা অভ্যস্ত, যাহাদের সুবিধার জন্য কেহ কোনোদিন এতটুকু স্থান ছাড়িয়া দেয় নাই, গৃহের বাহিরে যাহারা কাহারো কাছে কোনো সহায় প্রত্যাশা করিতেও জানেনা তোমাদের কল্যাণে আজ তাহারা দেশের ছেলেদিগকে ভাই বলিতে শিখিল। তোমাদের শক্তি আজ যখন প্রীতিতে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তখন পাষাণ গলিয়া যাইবে, মরুভূমি উর্ব্বরা হইয়া উঠিবে, তখন ভগবান আর আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন থাকিবেন না। তোমরা ভগীরথের ন্যায় তপস্যা করিয়া রুদ্রদেবের জটা হইতে এবার প্রেমের গঙ্গা আনিয়াছ; ইহার প্রবল পুণ্য-স্রোতকে ইন্দ্রের ঐরাবতও বাধা দিতে পারিবে না, এবং ইহার স্পর্শমাত্রেই পূর্ব্বপুরুষের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। হে তরুণতেজে উদ্দীপ্ত, ভারতবিধাতার প্রেমের দূতগুলি, আমি আজ তোমাদের জয়ধ্বনি উচ্চারণ

করিয়া এই নিবেদন করিতেছি—যে, দেশে অর্দ্ধোদয় যোগ কেবল একদিনের নহে। স্বদেশের অসহায় অনাথগণ যে বঞ্চিত, পীড়িত ও ভীত হইতেছে সে কেবল কোনো বিশেষ স্থানে বা বিশেষ উপলক্ষ্যে নহে, এবং তাহাদিগকে যে কেবল তোমাদের নিজের শক্তিতেই রক্ষা করিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিবে সে দুরাশা করিয়ো না।

তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ কর। শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহারসামগ্রীসম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্ত্তিত কর; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার কর, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত কর! এ কর্ম্মে খ্যাতির আশা করিয়ো না; এমন কি, গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে বাধা ও অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোনো উত্তেজনা নাই, কোনো বিরোধ নাই, কোনো ঘোষণা নাই কেবল ধৈর্য্য এবং প্রেম এবং নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র পণ যে দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।

বাংলা দেশের প্রভিন্‌শ্যাল্ কন্‌ফারেন্স্ যদি বাংলার জেলায় জেলায় এইরূপ প্রাদেশিক সভা স্থাপন করিয়া তাহাকে পোষণ করিয়া তুলিবার ভার গ্রহণ করেন—এবং এই প্রাদেশিক সভাগুলি গ্রামে পল্লীতে আপন ফলবান ও ছায়াপ্রদ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দেন তবেই স্বদেশের প্রতি আমাদের সত্য অধিকার জন্মিবে এবং স্বদেশের সর্ব্বাঙ্গ হইতে নানা ধমনী যোগে জীবনসঞ্চারের বলে কন্‌গ্রেস দেশের স্পন্দমান হৃৎপিণ্ডস্বরূপ মর্ম্মপদার্থ হইয়া ভারতবর্ষের বক্ষের মধ্যে বাস করিবে।

সভাপতির অভিভাষণে সভার কার্য্যতালিকা অবলম্বন করিয়া আমি কোনো আলোচনা করি নাই। দেশের সমস্ত কার্য্যই যে লক্ষ্য ধরিয়া চলিবে আমি তাহার মূলতত্ত্ব কয়টি নির্দ্দেশ করিয়াছি মাত্র। সে কয়টি এই:—

প্রথম, বর্ত্তমানকালের প্রকৃতির সহিত আমাদের দেশের অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে আমাদিগকে বিলুপ্ত হইতেই হইবে। বর্ত্তমানের সেই প্রকৃতিটি—জোট বাঁধা, ব্যূহবদ্ধতা, Organization। সমস্ত মহৎগুণ থাকিলেও ব্যূহের নিকট কেবলমাত্র সমূহ আজ কিছুতেই টিকিতে পারিবে না। অতএব গ্রামে গ্রামে আমাদের মধ্যে যে বিশ্লিষ্টতা, যে মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিয়াছে গ্রামগুলিকে সত্বর ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া তাহা ঠেকাইতে হইবে।

দ্বিতীয়, আমাদের চেতনা জাতীয় কলেবরের সর্ব্বত্র গিয়া পৌঁছিতেছে না। সেইজন্য স্বভাবতই আমাদের সমস্ত চেষ্টা এক জায়গায় পুষ্ট ও অন্য জায়গায় ক্ষীণ হইতেছে। জনসমাজের সহিত শিক্ষিত সমাজের নানাপ্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না।

এই ঐক্যবোধ কোনোমতেই কেবল উপদেশ বা আলোচনার দ্বারা সত্য হইতেই পারে

না। শিক্ষিত সমাজগণ সমাজের মধ্যে তাঁহাদের কর্মচেষ্টাকে প্রসারিত করিলে তবেই আমাদের প্রাণের যোগ আপনিই সর্ব্বত্র অবাধে সঞ্চারিত হইতে পারিবে।

সর্ব্বসাধারণকে একত্র আকর্ষণ করিয়া একটি বৃহৎ কর্ম্মব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষিত সমাজে নিজের মধ্যে বিরোধ করিয়া তাহা কখনো সম্ভবপর হইবে না। মতভেদ আমাদের আছেই, থাকিবেই এবং থাকাই শ্রেয় কিন্তু দুঃখের কথাকে দূরে রাখিয়া এবং তর্কের বিষয়কে তর্ক সভায় রাখিয়া সমস্ত দেশকে বিনাশ ও বিচ্ছেদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকল মতের লোককেই আজ এখনি একই কর্ম্মের দুর্গমপথে একত্র যাত্রা করিতে হইবে এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতেই পারে না। যদি থাকে, তবে বুঝিতে হইবে দেশের যে সাংঘাতিক দশা ঘটিয়াছে তাহা আমরা চোখ মেলিয়া দেখিতেছি না অথবা ঐ সাংঘাতিক দশার যেটি সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লক্ষণ—নৈরাশ্যের ঔদাসীন্য—তাহা আমাদিগকেও দুরারোগ্যরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

ভ্রাতৃগণ, জগতের যে সমস্ত বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্রে মানবজাতি আপন মহত্তম স্বরূপকে পরম দুঃখ ও ত্যাগের মধ্যে প্রকাশ করিয়া তুলিয়াছে, সেই উদার উন্মুক্ত ভূমিতেই আজ আমাদের চিত্তকে স্থাপিত করিব;—যে সমস্ত মহাপুরুষ দীর্ঘকালের কঠোরতম সাধনার দ্বারা স্বজাতিকে সিদ্ধির পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন তাঁহাদিগকেই আজ আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিব তাহা হইলেই অদ্য যে মহাসভায় সমগ্র বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা আপন সফলতার জন্য দেশের লোকের মুখের দিকে চাহিয়াছে তাহার কর্ম্ম যথার্থভাবে সম্পন্ন হইতে পারিবে। নতুবা সামান্য কথাটুকুর কলহে আত্মবিস্মৃত হইতে কতক্ষণ? নহিলে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হয়ত উদ্দেশ্যের পথে কাঁটা দিয়া উঠিবে এবং দলের অভিমানকেই কোনোমতে জয়ী করাকে স্বদেশের জয় বলিয়া ভুল করিয়া বসিব।

আমরা এক এক কালের লোক কালের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় নিক্রান্ত হইয়া চলিয়া যাইব—কোথায় থাকিবে আমাদের যত ক্ষুদ্রতা, মান অভিমান তর্ক বিতর্ক বিরোধ—কিন্তু বিধাতার নিগূঢ় চালনায় আমাদের জীবনের কর্ম্ম নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে আকৃতি দান করিয়া আমাদের দেশকে উপরের দিকে গড়িয়া তুলিবে। অন্ধকার দীনতার শ্রীহীনতার মধ্য দিয়া সেই মেঘ বিমুক্ত সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের অভ্যুদয়কে এইখানেই আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ কর যেদিন আমাদের পৌত্রগণ সগৌরবে বলিতে পারিবে, এ সমস্তই আমাদের, এ সমস্তই আমরা গড়িয়াছি। আমাদের মাঠকে আমরা উর্ব্বর করিয়াছি, জলাশয়কে নির্ম্মল করিয়াছি, বায়ুকে নিরাময় করিয়াছি, বিদ্যাকে বিস্তৃত করিয়াছি ও চিত্তকে নির্ভীক করিয়াছি। বলিতে পারিবে আমাদের এই পরম সুন্দর দেশ—এই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা মাতৃভূমি, এই জ্ঞানে ধর্ম্মে কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত, বীর্য্যে বিধৃত জাতীয় সমাজ এ আমাদেরই কীর্ত্তি—যেদিকে চাহিয়া দেখি সমস্তই আমাদের চিন্তা, চেষ্টা ও প্রাণের দ্বারা পরিপূর্ণ, আনন্দগানে মুখরিত এবং নূতন নূতন আশাপথের যাত্রীদের অক্লান্ত পদভারে কম্পমান।

তালীবনের ভারতে।

৭

দেবালয়।

ভারতে, দেবালয়ের খিলান-মণ্ডপ নিম্ন, সমাধি-মন্দিরের ছাদের ন্যায় গুরুভার ও ভারাবনত; এইজন্য দেবালয়ের মধ্যে, প্রায় সময়ের পূর্ব্বেই সন্ধ্যার আবির্ভাব হয়।

অস্তমান সূর্য্যের আলো এখনও রহিয়াছে; কিন্তু ইহারই মধ্যে মাদুরার বৃহৎ মন্দিরের প্রবেশ-পথের—প্রস্তরময় খিলান-পথের দুই ধারে ছোট ছোট দীপ জ্বালান হইয়াছে। ইহা মন্দিরের একপ্রকার প্রবেশ-দালান; এইখানে ফুলের মালা বিক্রী হয়। কুলঙ্গী প্রভৃতি মন্দিরের সমস্ত খোঁজখাঁজের মধ্যে, খিলান-পথের দুইধারে যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্ত্তি রহিয়াছে তাহাদের ফাঁকের মধ্যে মাল্য-বিক্রেতারা তাহাদের দোকান বসাইয়াছে। স্বপ্নের ন্যায় কোন লোক বাহির হইতে আসিলেই একটা ছায়া পড়িয়া, সমস্তই যেন একসঙ্গে মিশিয়া যায়;—পুতুলগুলা, বিকট মূর্ত্তিগুলা, মনুষ্যমূর্ত্তি, বড় বড় প্রস্তর-মূর্ত্তি, সেই সব বহুবাহুবিশিষ্ট মূর্ত্তি যাহাদের অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি দ্বিবাহু বিশিষ্ট মানুষেরই মত—সমস্তই মিশিয়া যায়। সেখানে 'ধর্ম্মের গরুরা'ও রহিয়াছে উহারা সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায় এবং ঘুমাইবার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, থাকূড়া ও ফুল ধীরে সুস্থে চর্ব্বণ করে।

এই খিলান-পথের পরেই একটা দ্বার; দেবমূর্ত্তিময় অভ্রভেদী মন্দিরচূড়ার তলদেশে, একটা অন্ধকেরে সুড়ঙ্গ-কাটা পথ। এই পথ দিয়া একেবারেই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করা যায়; মন্দির না বলিয়া ইহাকে একটা নগর বলিলেও চলে; এই নিস্তব্ধ অথচ শব্দায়মান নগরটি পথে-পথে একেবারে আচ্ছন্ন—পথগুলা আড়াআড়িভাবে প্রসারিত; এবং ইহার অসংখ্য লোক সমস্তই প্রস্তরময়। প্রত্যেক স্তম্ভ, প্রত্যেক বিরাটাকৃতি পিল্‌পা এক-একটা অখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত; কি উপায়ে যে উহা-দিগকে খাড়া করিয়া তুলিয়াছে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য,—(অবশ্য লক্ষ লক্ষ বাহু-পেশীর সমবেত চেষ্টায়) তাহার পর, বিবিধ দেবতা ও দানবের মূর্ত্তি খুদিয়া-খুদিয়া বাহির করা হইয়াছে। এই খিলান-মণ্ডপগুলি প্রায়ই সমতল; প্রথম দৃষ্টিতে বুঝিতে পারা যায় না কেমন করিয়া উহারা ভার-সাম্য রক্ষা করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান আছে। এই খিলান-মণ্ডপগুলি ৮।১০ গজ লম্বা অখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত, এবং দুই প্রান্তে ভর দিয়া রহিয়াছে, আমাদের সাদাসিধা কাষ্ঠফলকের মত এইরূপ কত অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড পাশাপাশি অবস্থিত। এই সমস্ত,—পুরাতন মিসরের 'থেব্‌' ও 'মেম্‌ফিস্‌' নগরের ধরণে নির্ম্মিত; কালের দ্বারা বিনষ্ট হইবার নহে—উহারা প্রায় অনন্তকাল-স্থায়ী। "শ্রী-রাগম"-মন্দিরের ন্যায়, এখানেও, আকাশে সতেজে পা ছুঁড়িতেছে এইরূপ অশ্বের মূর্ত্তি কিংবা দেবতাদের মূর্ত্তি সারি সারি

রহিয়াছে এবং সুদূর আঁধারে ক্রমশ মিশিয়া গিয়াছে। এই সকল মূর্ত্তির কৃষ্ণবর্ণ মস্থণ তলদেশ—যেখানে মানুষের হাত কিংবা শরীর পৌঁছায়—তাহা মনুষ্য ও পশুর দৈনিক গাত্র ঘর্ষণে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে—এবং শুধু ইহাতেই উঁহাদের প্রাচীনত্ব সূচিত হয়। একদিকে বিরাট মহিমা, অপরদিকে গোময়-রাশি; এক দিকে ইন্দ্রপুরীর বিলাস-বিভব, অপর দিকে বর্ব্বরোচিত অযত্ন তাচ্ছিল্য। থাকড়ার ও কাটা-কদলীপত্রের মালা—যাহা পূর্ব্বে কোন উৎসবের সময়ে টাঙ্গান হইয়াছিল, তাহা গুঁড়াগুঁড়া হইয়া মাটীতে পড়িতেছে ও পচিয়া উঠিতেছে। বিচিত্র কাল্পনিক জীবজন্তু, কাগজ ও ময়দাপিণ্ডে নির্ম্মিত সজীব হাতীর প্রমাণ সাদা হস্তি-মূর্ত্তি—সমস্তই কোণে কোণে পচিতেছে। 'ধর্ম্মের' গাভীগণ, ও যে সব জীবন্ত হাতী কুট্টিমতলে মুক্তভাবে বিচরণ করে, উহারা সর্ব্বত্রই তাহাদের বিষ্ঠা ছড়াইয়াছে—নগ্নপদের ঘর্ষণে মস্থণীকৃত চকচকে তৈলাক্ত মেজের উপরেও ছড়াইয়াছে। বড় বড় বাহুড় চাম্‌চিকা এই ভীষণ খিলান-মণ্ডপে বংশবৃদ্ধি করিতেছে; উহারা, নৌকার পালের মত, বড়-বড় কালো ডানাগুলা সর্ব্বত্রই নাড়া দিতেছে কিন্তু তাহার শব্দ শোনা যায় না—পালকের ডানা হইলে বোধ হয় খুব শব্দ হইত।......

অভ্যন্তরস্থ একটা মুক্তাকাশ অঙ্গনের মধ্যে সন্ধ্যার আলো আবার আমি মুহূর্ত্তকাল দেখিতে পাইলাম। সেখানে আর কেহই নাই, কেবল কতকগুলা ময়ূর, প্রস্তরময় পশু-মূর্ত্তির উপর বসিয়া ঘোরা-ফেরা করিতেছে। প্রাচীর-ঘেরের ঊর্দ্ধে, ন্যূনাধিক দূরে, কতকগুলা লাল ও সবুজ মন্দির-চূড়া মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। এই দেবমূর্ত্তিময় চূড়াগুলি চিরবিস্ময়-জনক। এই চূড়ার গায়ে, রাশীকৃত দেবতাদের মাঝামাঝি একস্থানে, চাতক ও টিয়ার নীড় ঝুলিতেছে এবং সেই সব নীড়ের চতুষ্পার্শ্বে পাখীগুলা নড়া-চড়া করিতেছে এবং যেখানে শূল-মুখের ন্যায় কতকগুলা খোঁচ্ উঠিয়াছে এবং যাহা এখনো সূর্য্যকিরণে আলোকিত,—সেই ঊর্দ্ধতম চূড়াদেশের খুব নিকটে, কাকেরা চীলদিগের সহিত উন্মত্তভাবে ঘোর-পাক্ দিতেছে।

এই অঙ্গন ছাড়াইয়া, মন্দিরের আর একটি গভীরতর অংশে, আমি পুরোহিতকে অবশেষে দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্বেই তাঁহার নিকট আমার সম্বন্ধে অনুরোধ-পত্র পাঠান হইয়াছিল; দেবীর বেশভূষা তিনিই আমাকে দেখাইবেন, এইরূপ কথা আছে।

বোধহয় কাল আমি সে-সব বেশভূষা দেখিতে পাইব না, কেননা কাল একটা উৎসবের দিন। শ্রীরাগমের বিষ্ণু যেমন প্রতি-বৎসর রথে করিয়া তাঁহার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন, মাহুরার শিব পার্ব্বতীও সেইরূপ প্রতি বৎসর, তাঁহাদের জন্য খনিত একটা বৃহৎ জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে নৌকা করিয়া পরিভ্রমণ করেন। সেই নৌযাত্রার পূর্ব্বদিনে আমরা এখানে আসিয়াছি।

কিন্তু পরশ্ব প্রত্যূষে, যখনই মন্দিরের মধ্যে একটু আলো দেখা দিবে,—পুরোহিত সেই গুপ্ত কক্ষের দ্বার আমার নিকট উদ্‌ঘাটিত করিবেন এবং আমাকে দেবীর রত্নভাণ্ডার প্রদর্শন করিবেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লুকান ব্যথা।

তোমরা দেখনি মোর অন্তরের ব্যথা—
কত দুঃখ জেগে আছে অন্তরের মাঝ—
বিষাদের ঘনচ্ছায়া—মর্ম্মকাতরতা—
তোমরা দেখেছ শুধু বাহিরের সাজ।

হাসি দেখে মনে কর হৃদয় আমার
রয়েছে সদাই বুঝি আনন্দে বিভোর—
গোপন অন্তরতলে ঘন অন্ধকার
ঘেরিয়া রয়েছে সদা, হিয়া জর জর !

দেখাতে চাহিনা খুলি অন্তরের দ্বার
রহিয়াছি সদা তাই আনন্দের ভাণে—
কি জানি যদি বা এই বেদনা আমার
বেদনা জাগায়ে তোলে আর কারো প্রাণে—
লুকায়ে রেখেছি তাই হৃদয়ের ভার—
ভরিয়াছি বিশ্ব তাই সুখভরা গানে !

শ্রীবসন্তকুমার দাস

প্রতীক্ষা।

তুমি গেছ নির্ব্বাসনে বিধির বিপাকে,
তা বলে রাজ্য তব র'বে নাথ হীন
হে রাজেন্দ্র ! প্রজাপুঞ্জ তোমারি অধীন,
তোমার চরণপদ্মপূত পাদুকাকে,
রেখেছে তোমার শূন্য স্বর্ণ সিংহাসনে
রাজ অভিজ্ঞান মানি ; রয়েছে চাহিয়া
দীর্ঘ রাজপথপানে ব্যাকুল নয়নে।
কবে কোন সুপ্রভাতে তোমারে লইয়া—
আসিবে সোণার রথ, কনককিরণে
আসে যথা দিবালোক নিশা অবসানে।
তোমার আহ্বানগীতি গাহিছে সকলে
আবালবনিতাবৃদ্ধ, যেন শোনে কানে
রথচক্রধ্বনি তব, হ্রেষা তুরঙ্গের,
তূর্য্যের গম্ভীর নাদ, সুরব শঙ্খের।

শ্রী—

ভারত মহিলা

তৃতীয় বর্ষ।

শ্রীমতী সরযূবালা দত্ত-সম্পাদিত উৎকৃষ্ট স্ত্রীপাঠ্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা। বৈশাখে (১৩১৪) তৃতীয় বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিমাসে তিন চারিখানা সুন্দর স্বতন্ত্র মুদ্রিত হাফ্‌টোন্ ছবি যাইতেছে। ভারত-মহিলার লেখকলেখিকাগণ :—

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী, মানকুমারী, কামিনী রায় বি, এ, মিসেস্ আর, এস, হোসেন, লাবণ্যপ্রভা বসু, হেমলতা দেবী, রাজকুমারী দাস এম, এ, সং.রাজকুমারী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ, কুমুদিনী মিত্র, বি, এ, প্রভৃতি সুলেখিকাগণ; এবং.পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, হরিদেব শাস্ত্রী, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র (সঞ্জীবনী সম্পাদক) রজনীকান্ত গুহ এম্, এ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, প্রভৃতি বহু সুলেখক। ইহাদের সকলের লেখা ভারত-মহিলায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক সাহিত্য-সম্পাদক সাহিত্যে লিখিয়াছেন :—

ভারত মহিলার কল্যাণকল্পে ভারতমহিলার সৃষ্টি। সম্পাদিকা অল্পদিনের মধ্যে লক্ষ্যের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। প্রথম বৎসরেই "ভারতমহিলা" প্রবন্ধ-সম্পদে যেরূপ গৌরবান্বিত হইয়াছেন, নূতন মাসিকের অদৃষ্টে সেরূপ সৌভাগ্য প্রায় ঘটে না। * * সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, সম্পাদিকার সাহিত্য-সাধনা সফল হউক। ভারতমহিলা বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বিরাজ করুক।

প্রবাসী বলেন :—এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রখানি বঙ্গনারীগণের জন্য গত (১৩১২) ভাদ্রমাস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বেশ ভাল লেখা থাকে। সম্পাদন কার্য্যও বেশ হইতেছে।

বসুমতী বলেন :—এই মাসিক পত্রিকাখানি বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। মহিলাপরিচালিত এই পত্রিকাখানি ক্রমেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

সুকবি মানকুমারী বসু—(সম্পাদিকার নিকট লিখিত পত্রে)—আপনার ভারত-মহিলা আমাদের গৌরবের সামগ্রী বটে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ দুই টাকা চারি আনা মাত্র। নমুনা চারি আনা। বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয় না।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত।

কার্য্যাধ্যক্ষ, ২১০।৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নূতন সামাজিক উপন্যাস।

"উড়িষ্যার চিত্র" প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ, বি, এ, প্রণীত

ধ্রুবতারা।

বান্ধব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর বলেন :—

"আপনার ধ্রুবতারা বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি অত্যুজ্জ্বল তারারূপে ধ্রুবস্থান পাইবে।"

ভক্ত কবি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন বলেন :—

"তোমার পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ পর্য্যন্ত না পড়িয়া থাকা যায় না। বর্ণনীয় বিষয়গুলি এরূপ সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত, যেন—"উন্মীলিতং তুলিকয়েব চিত্রম্"......তোমার গ্রন্থ কয়খানি পুণ্য ক্ষেত্রের সুন্দর পথপ্রদর্শক, যাত্রীকে সরল ও সুশোভন পথ দিয়া গন্তব্য স্থানে, উপনীত করে। তোমার হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা ও রচনার গুণে ঘটনাগুলি ঠিক যেন সম্মুখে প্রতিভাত হয়।"

The Amrit Bazar Patrika says :—" * * The fact is, the author is a powerful writer, and he can make even his common place dialogues interesting and instructive. This is because, he has thought, imagination and powers of observation. Add to this his descriptions which are always natural and are sometimes sublime. Thus the death scene of Bonalata is one of the finest we have seen in any language......In the end let us observe that the author deserves a foremost plalce in the ranks of our novelists. Bankim Chandra's language is possibly better but our author is more natural. Bankim Chandra wrote to create effect but our author seems not aware what effect his writing would preduce. We are unlucky in our novel writers. Bankim Chandra showed the way of copying European masters and most of those who have succeeded him, have followed the same path. But our author's conception is original and what we like most in the book is its religious tone."

কবিবর শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র, এম, এ, সি, এস, ডিষ্ট্রিক্ট জজ—লিখিয়াছেন :—

"Allow me to heartily congratulate you on your ধ্রুবতারা in which you have succeeded in producing a book which is at once eminently readable suggestively instructive and artistically meritorious. Every page has its interest apart from the scheme of the work which carries one along with the easy and restful glide of a barge on calm waters...you need not be surprised to hear that I practically finished reading the whole book at one sitting. Only a few pages remained over. The book is a series of pictures each accurately and dramatically fitted in showing powers of observation and expression—observation imaginatively sympathetic and expression full of simple pathos and earnestness—there is pathos even where fun is the outward garb......"

মুকুল।

বালক বালিকাদিগের জন্য সর্ব্বজন প্রশংসিত সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

বঙ্গদেশের বালক বালিকাগণের কল্যাণের জন্য "মুকুল" এই দ্বাদশ বৎসর ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ইহাতে সুকুমারমতি বালকবালিকাগণের শিক্ষা ও বিমল আমোদের জন্য পদ্য, গদ্য, গল্প, সাধুজীবনী, সরল বিজ্ঞানিক প্রবন্ধ, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, হেঁয়ালি, ধাঁধা প্রভৃতি বহুল পরিমাণে প্রকাশিত হয়। যে সকল গ্রাহকগণ ধাঁধার উত্তর দিতে পারেন প্রতি মাসে তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হয়। বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকগণ মুকুলে লেখেন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র—১॥০ দেড়টাকা মাত্র। নমুনার জন্য ১সংখ্যা ৴১০। পত্র লিখিলে প্রথম সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া মূল্য আদায় করিয়া লইতে পারি।

যে কেহ পাঁচজন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া ৭॥০ আমাদিগকে পাঠাইবেন তিনি বিনামূল্যে এক বৎসর মুকুল পাইবেন।

নিম্নলিখিত শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলি মুকুল আফিসে পাওয়া যায়ঃ—

১। নীতি-কথা।
২। পৌরাণিক কাহিনী।
৩। গৃহের কথা।
৪। শিশুর সদাচার।
৫। দৈনিক ১ম ভাগ।
৬। দৈনিক ২য় ভাগ।
৭। মাতা ও পুত্র।
৮। সঙ্গীত মুকুল—

টাকাকড়ি, চিঠিপত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার,
মুকুল-কার্য্যাধ্যক্ষ।
১৬নং রঘুনাথ চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

নূতন পুস্তক — **মাতা ও পুত্র।** — নূতন পুস্তক

শিশুপাঠ্য উপন্যাস।

উপন্যাস ও গল্পের বই পড়িবার প্রবৃত্তি বালক বালিকাদের মনে স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বাধা দেওয়া সহজ নহে এবং তাহাতে সুফলও ফলে না। অথচ বাঙ্গালা ভাষায় এমন কমই উপন্যাস আছে যাহা ছেলে মেয়েদের হাতে দেওয়া যাইতে পারে। এই অভাব লক্ষ্য করিয়া "মাতা ও পুত্র" রচিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় বালক বালিকাদিগের জন্য ইহাই বোধ হয় প্রথম উপন্যাস। অভিভাবকগণ এই উপন্যাস নিঃসঙ্কোচে বালক বালিকাদের হাতে দিতে পারেন। তাহারা পড়িয়া আমোদ পাইবে এবং উন্নত হইবে। ছাপা কাগজ সুন্দর, ১১৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য।৫[?]; ডাকমাশুল ৴১০; ।১০ আনার টিকিট পাঠাইলে যে কোনও ঠিকানায় পাঠান হইবে। ১৬ নং রঘুনাথ চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট, মুকুল আফিসে সিটিবুক সোসাইটীতে ও মজুমদার লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১৩১৫ সালের অর্থাৎ অষ্টম বর্ষের বঙ্গদর্শনের প্রথম (বৈশাখ) সংখ্যা আমরা ১০ই বৈশাখের মধ্যে গ্রাহক মহাশয়দের নিকট ভিঃ পিতে পাঠাইব। ইতিমধ্যে কাহারো ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে অথবা অন্য কোন প্রকার বক্তব্য থাকিলে অনুগ্রহপূর্ব্বক ২৫শে চৈত্র মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। কেহ ১৩১৫ সালের বঙ্গদর্শনের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০ ইচ্ছা করিলে ঐ সময় মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় মণিঅর্ডারেও পাঠাইতে পারেন। ভিঃ পির ও মণিঅর্ডারের খরচা একই, এক আনা মাত্র। তবে ৩৷৵০ তিন টাকা সাত আনা দিয়া ভিঃ পি গ্রহণ করাই গ্রাহক মহাশয়দের সুবিধা।

ঠিকানা পরিবর্ত্তনের জন্য বা অন্য কারণে যাহাতে ভিঃ পি ফিরিয়া না আসে গ্রাহক মহাশয়গণ সে দিকে অনুগ্রহ করিয়া দৃষ্টি রাখিবেন নতুবা আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

বঙ্গদর্শনের মূল্য অগ্রিম দেয়, মূল্য বাকী রাখা নানা কারণে অসুবিধা। সে প্রকারের কোন অনুরোধ কেহ করিলে রাখিতে না পারিয়া আমাদিগকে কেবল লজ্জিত হইতে হয়।

কাহারো কাহারো ভিঃ পি তাঁহাদের অনুপস্থিতে বা অজ্ঞাতে ফিরিয়া আসে, তাহার পরে তাঁহারা বঙ্গদর্শন না পাইয়া দুঃখিত হইয়া পত্র লেখেন। পূর্ব্ব হইতে পোষ্টাফিসে বলিয়া বা অন্যরূপে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলে ভবিষ্যতে এ প্রকার গোলের সম্ভাবনা থাকিবে না।

বঙ্গদর্শন অফিস,
সিমলা পোঃ, কলিকাতা,
১লা চৈত্র, ১৩১৪।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

চৈত্র। দ্বাদশ সংখ্যা।

বঙ্গদর্শন।

[নব পর্য্যায়]

সপ্তম বর্ষ।

এস্, মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত

ও

২০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ মিনর্ভা প্রেসে,

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৪

প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার।

"কি কারণে বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির হ্রাস হইতেছে এবং তাহা নিবারণের উপায় কি?"—এই বিষয়ে যাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও পুরস্কারের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে সেই প্রবন্ধ-লেখককে ১০০৲ একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। এবং তাঁহার প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে ও আবশ্যক হইলে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা যাইবে। লিখিত প্রবন্ধ, আগামী ১২ই আশ্বিনের (১৩১৫) মধ্যে ১৯নং ষ্টোর রোড—বালীগঞ্জ কলিকাতা—এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট প্রেরিতব্য।" বিচারক :—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী।
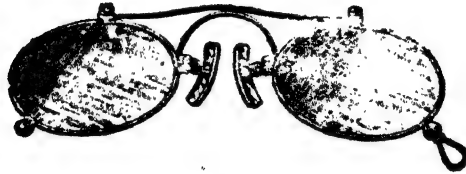
বঙ্গদর্শন।

ঐক্য বাক্য অনৈক্য।

পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় সংযুক্তবর্ণের উদাহরণের উল্লেখ করিবার সময়ে প্রথমেই লিখিয়াছিলেন—ঐক্য বাক্য অনৈক্য। এরূপ পর্য্যায়ক্রমে—প্রথমে ঐক্য, তাহার পর বাক্য এবং তাহার পর অনৈক্য—লিখিবার কারণ কি, তাহা "সুকুমারমতি বালকবৃন্দের হৃদয়ঙ্গম" হইবার সম্ভাবনা না থাকায়, প্রাচীন টীকাকারগণ তাহার ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন নাই। চেষ্টা করিলে, বলিতে হইত—গ্রন্থারম্ভের সনাতন রচনা-পদ্ধতির মর্য্যাদারক্ষার্থ গ্রন্থকার উল্লিখিত শব্দবিন্যাসকৌশলে "বস্তুনির্দ্দেশ" করিয়া থাকিবেন।* এরূপ অনুমানের প্রধান কারণ এই যে, সংযুক্তবর্ণ বিষয়ক গ্রন্থের প্রধান কথা সংযোগ অর্থাৎ ঐক্য, তাহার প্রবল অন্তরায় বাক্য, এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম অনৈক্য। আরও একটি কারণ আছে। গ্রন্থখানি বাঙ্গালীর বর্ণপরিচয় শিক্ষার জন্য রচিত হইতেছে বলিয়া, গ্রন্থকারকে প্রথমেই প্রধান কথার উল্লেখ করিতে হইয়াছে। কোন কোন টীকাকার অতিরিক্ত প্রতিভা প্রকাশের জন্য একটি "যদ্বা"র অবতারণা করিয়া লিখিতে পারিতেন,—অনৈক্যের পর ঐক্য সংস্থাপিত করিতে হইলেও, মধ্যস্থলে মধ্যস্থরূপে বাক্যকেই আসন দান করিতে হয়,—সেই কথা ইঙ্গিতে সূচিত করিবার জন্যও এরূপ শব্দবিন্যাসকৌশল অবলম্বিত হইয়া থাকিতে পারে। অধ্যাপনার সময়ে ইহার ভাবার্থ বিশদভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য শিক্ষক মহাশয়কে অবশ্যই বলিতে হইত—অসংযত বাক্যে ঐক্যের মধ্যে অনৈক্য উপস্থিত হয়, সুসংযত বাক্যে অনৈক্যের মধ্যেও ঐক্য সংস্থাপিত হইতে পারে। গ্রন্থারম্ভে এই সংসারতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্যই গ্রন্থকার এরূপ শব্দবিন্যাসকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন,—তাঁহার অদ্বিতীয় গ্রন্থ "বর্ণপরিচয়ের" পুরাতন সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, এখন এক "সংশোধিত সংস্করণ" প্রচলিত আছে। তাহাতে আর "ঐক্য বাক্য অনৈক্য" নাই; তাহাতে আছে —"ঐক্য বাক্য মাণিক্য।" এই গ্রন্থ পাঠ

* "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে।"
বিদ্যাসাগর মহাশয় মন্দ ছিলেন না, সুতরাং তিনি যে বিনা প্রয়োজনে এরূপ করিয়া গিয়াছেন, তাহা মনে করিলেও মহাপাতক হইবে।

করিয়া যাহারা বর্ণজ্ঞান লাভ করিতেছে, তাহারা বাক্যকে মাণিক্য বলিয়া মানিয়া লইয়া, কায়মনোবাক্যে বাক্যব্যয় করিতে ব্যাপৃত হইয়াছে।" সম্প্রতি অস্মদ্দেশে ইহার জন্যই বাক্য এত অতিমাত্রায় ফেণাইয়া উঠিয়া পাত্র ছাপাইয়া উছলিয়া পড়িতেছে। তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—অনৈক্য—সর্ব্বত্র অকুতোভয়ে অপ্রতিহতপ্রভাবে অবলীলাক্রমে আত্মঘোষণায় ব্যাপৃত হইয়াছে। সকল স্থানে—সকল কার্য্যে—সকল সংবাদপত্রে—সকল সভামণ্ডপে—সেই জন্য অনৈক্যের এরূপ প্রাদুর্ভাব উপস্থিত।

সভায় এবং সংবাদপত্রে একটি নূতন বাক্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সেদিন একখানি বাঙালী-পরিচালিত ইংরাজী সংবাদপত্রে তাহাই পাঠ করিতেছিলাম। পাঠ সমাপ্ত হইতে না হইতেই বন্ধু বলিয়া উঠিলেন,—"তা বটেইত। মতের অনৈক্য থাকে থাকুক; আইস আমরা কার্য্যের ঐক্য সুসংস্থাপিত করি।" কথাটা সহসা মানিয়া লইতে পারিলাম না বলিয়া,—এতটুকু সামান্য কারণেই—বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছে!

এক ব্যক্তি আস্তিক, আর এক ব্যক্তি নাস্তিক। একজন আর একজনকে ডাকিয়া কহিল,—"মতের অনৈক্য থাকে থাকুক, আইস আমরা কার্য্যের ঐক্য সংস্থাপিত করি।—উভয়ে মিলিয়া ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্ত হই।" এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে কার্য্যের ঐক্য দেখিতে পাইলে বলিতে হইবে—একজন কার্য্যের ভাণ করিতেছে! নচেৎ মতের অনৈক্য স্থির রাখিয়া, উভয়ে মিলিয়া কার্য্যের ঐক্য সংস্থাপিত করিতে পারিত না।

ইহাতে সংশয়াপন্ন হইয়া, সত্যনির্ণয়ের জন্য ইতিহাস খুলিয়া, অধিক সংশয়ে আক্রান্ত হইয়াছি। ইতিহাসে লিখিত আছে,—মতের ঐক্য থাকিলেও, সকল সময়ে কার্য্যের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় না;—মতের ঐক্য না থাকিলে, কখনও কার্য্যের ঐক্য সম্ভব হইতে পারে না! তখন সংশয় আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

ইংলণ্ড একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। এত ক্ষুদ্র যে তাহার অধিবাসিবর্গকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও বহু বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। সে দেশের লোক ইহা বুঝিতে পারিয়া, বিদেশে শক্তিবিস্তারের জন্য এবং শক্তি রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া রহিয়াছে। ইহার জন্য তাহারা মুণ্ডদান করিতেও প্রস্তুত। এরূপ মতের এবং কার্য্যের ঐক্য ইতিহাসে দুর্লভ। তথাপি তাহারা যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিল, তখন মতের ঐক্য থাকিলেও, কার্য্যের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কেহ জলপথে—কেহ স্থলপথে, কেহ ধর্ম্মপথে—কেহ অধর্ম্মপথে, কেহ বাণিজ্যে—কেহ বা পরস্বাপহরণে, ইষ্টসিদ্ধির আয়োজন করিয়াছিল। কালক্রমে ভারতরাজ্য করতলগত হইলে, কেহ বলিল—ভারতবর্ষকে শিক্ষায় সমুন্নত করিয়া পতিতোদ্ধারের পুণ্যব্রত উদ্‌যাপিত করিয়াই কৃতার্থ হইব; কেহ বলিল,—তাহাকে তরবারিবলে চিরপদানত রাখিয়া শার্দ্দূলশক্তির পরিচয় প্রদান করিব। যেখানে এরূপ মতের অনৈক্য, সেখানে কার্য্যের ঐক্য সংস্থাপিত হইতে পারিতেছে না।

ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ দেশ। এত বৃহৎ যে তাহার অধিবাসিবর্গকে কখনও কোন কিছুর জন্যই বিদেশের উপর নির্ভর করিতে

হয় নাই। এখন তাহার অধিবাসিবর্গ খাইতে না পাইয়া মরিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেহ বলিতেছে—রাজাকে ধরিয়া ইহার একটা প্রতিকার করিতে হইতেছে। কেহ বলিতেছে—প্রজাশক্তিকে ধরিয়াই ইহার প্রতিকার করিবার সম্ভাবনা—"নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

কাহার কথা মানিয়া চলিব? সেই তর্কই প্রকৃত তর্ক। তাহাকে বাক্যের আড়ালে দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া, সত্য নির্ণয় করিবার সম্ভাবনা কোথায়? বন্ধু তাহাতে অসম্মত বলিয়াই বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছে!

বিচ্ছেদ ঘটিলে, মিলন না হইতে পারে, এমন নয়। বিয়োগান্ত কাব্য ভারতবর্ষের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সেই আশায় কথাটা ভাল করিয়া আলোচনা করিতে বসিয়াছি। আমরা কি চাই? আকাশের চাঁদ—ধরণীর ধূলা—আমাদের পক্ষে তুল্যভাবে অকিঞ্চিৎকর। আমরা প্রতিকার চাই—ইহাতে মতের অনৈক্য নাই। কিন্তু কাহাকে প্রতিকার বলিব এবং কোন্ পথে তাহা লাভ করিতে পারিব, তাহাতে প্রবল অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে। "মতের অনৈক্য থাকে থাকুক, আইস আমরা কার্য্যের ঐক্য সংস্থাপিত করি"—এরূপ দুর্লভ বাক্যের বক্তা শ্রোতা সুলভ হইয়াছে বলিয়াই, সিদ্ধান্ত সুদূরে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইতেছে!

বালক যদি গ্রহণ রহস্য বুঝিতে চায়, তাহার পক্ষে সে কথা অত্যন্ত প্রশংসার কথা হইতে পারে। তথাপি তাহাকে বুঝিবার জন্য সমুচিত জ্ঞানোন্মেষের অপেক্ষা করিতে হয়। সেই জ্ঞানোন্মেষের জন্যই তাহাকে আপাততঃ যত্ন করিতে হয়। প্রতিকার কাহাকে বলিব, কোন্ পথে তাহা লাভ করিতে পারিব,—এ সকল জিজ্ঞাসা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রশংসার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু কেহ বুঝাইয়া দিলেও, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা বুঝিয়া লইবার ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া উপায় নাই। রাজাকে ধরিয়া প্রতিকার লাভ করা যায় না, ইতিহাস এমন কথা বলিতে পারে না। ইংলণ্ডের ইতিহাসই তাহার প্রধান সাক্ষী। প্রজাকে ধরিয়া প্রতিকার লাভ করা যায় না, ইতিহাস এমন কথাও বলিতে পারে না। মার্কিন জাতির ইতিহাসই তাহার প্রধান সাক্ষী।

কে ধরিবে তাহার উপরেই ফলাফলের কথা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। মানুষের মত মানুষ যাহা ধরে, তাহাই লাভ করিতে পারে। তাহার পক্ষে সকল পথই সুগম হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রতিকার চাহিবার পূর্ব্বে বলিতে হইবে—আমরা মানুষ চাই। ইহাতে যদি মতের অনৈক্য থাকে, আমাদের আশা নাই। ইহাতে যদি মতের ঐক্য থাকে, আমাদের কার্য্যের ঐক্য এই পথেই সংস্থাপিত হইতে পারিবে।

মানুষ কোথায় পাইব? মানুষ গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা না করিয়া, নিয়ত কোলাহলে সময়ক্ষয় করিলে, মানুষ পাইবার সম্ভাবনা কোথায়? মানুষ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাই এখনকার সকল চেষ্টার প্রধান চেষ্টা। তাহাতে ধৈর্য্য চাই। যাহারা অধীরভাবে ছুটাছুটি করিতেছে, তাহারা আকাঙ্খার পরিচয় দান করিলেও, কাম্যফল লাভ করিতে পারিবে না। তাহার জন্য সাধনা চাই—তাহারই নাম তপস্যা। দেবতারা স্বর্গচ্যুত হইলে, তপস্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। আত্মত্যাগে তাহা সফল হইয়া উঠিত।

আত্মত্যাগেই মনঃশক্তি বিকশিত হইয়া উঠে। মনঃশক্তি সমুচিত বিকশিত হইয়া উঠিলেই, মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়। তাহার জন্য সমুচিত আকাঙ্খার উদ্রেক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

দেশের কথা দশের কথা। দেশের দশজনের মধ্যে দেশের কথার প্রতি মমতা আকর্ষণ করিবার আয়োজন এখনও যথাযোগ্য উৎসাহ লাভ করে নাই। এখনও দেশের লোকের নিকট তাহাদের জন্মভূমি যথার্থ বাস্তব মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। একজন ইংরাজ তাহার জন্মভূমিকে যেমন হৃদয় মন দিয়া বাস্তব পদার্থের মত আঁকড়িয়া ধরিয়া ভালবাসিতে শিখিয়াছে, তাহার তুলনায় আমাদের স্বদেশপ্রীতি এখনও কত অকিঞ্চিৎকর!

যাহাকে ভাল করিয়া জানি না, তাহাকে উপন্যাসের নায়ক নায়িকার মত ভালবাসিতে পারি; সংসারের নরনারীর মত ভালবাসিতে পারি না। আমরা এখনও আমাদের স্বদেশকে ভাল করিয়া জানি না। সকল জ্ঞানের মধ্যেই এক অব্যক্ত আশঙ্কা বদন ব্যাদান করিয়া বিভীষিকা উৎপাদিত করিয়া থাকে! মনে হয়,—আমরা স্বাধীন হইয়া উঠিলে, না জানি তাহা কি অদৃষ্ট বিড়ম্বনার আধার হইয়া উঠিবে! এই আশঙ্কা প্রচ্ছন্নভাবে সকল উচ্চাকাঙ্খাকে চাপিয়া রাখিয়াছে। ইহাকে বাক্যফুৎকারে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। এই আশঙ্কা রাজাপ্রজাকে তুল্যভাবে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। এরূপ আশঙ্কার মূলমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে, রাজা প্রজা কাহাকেও ধরিয়াই প্রতিকার লাভের সম্ভাবনা নাই।

আমরা যোগ্য হইয়া উঠিয়াছি—এ কথা যোগ্যের মুখে না শুনিলে, কেবল অযোগ্যের মুখে শুনিয়া, রাজা প্রজা কেহই তাহার উপর আস্থা স্থাপিত করিতে পারে না। সুতরাং মানুষ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাই একমাত্র চেষ্টা,—তাহাই প্রতিকার এবং প্রতিকার লাভের পথ। তাহাতে মতের অনৈক্য থাকিলে, আমাদিগের উন্নতিলাভের আশা নাই।

এরূপ সরল বিষয়েও মতের অনৈক্য ঘটিবার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়,—ইহাকে মানিয়া লইতে হইলেই, বাক্য ছাড়িয়া কার্য্য অবলম্বন করিতে হয়। বাক্য সুলভ,—কার্য্য সেরূপ নয়। তাহাতে প্রতিপদে অগ্নিপরীক্ষার আশঙ্কা। সে পথ পরিত্যাগ করিয়া, আমরা যাহাকে অবলম্বন করিয়াছি, তাহার নাম—ঐক্য বাক্য অনৈক্য।

যাহারা যত কোলাহল করিতে পারে, আমরা তাহাদিগকেই তত কাজের লোক বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছি। তাহারা সেই সুযোগে আরও কোলাহল করিয়া, কে বড়—কে ছোট, তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। যাহারা এরূপ কোলাহলে অনভ্যস্ত, তাহাদিগকে আমরা মানুষ বলিয়াই গ্রাহ্য করি না!

স্বার্থত্যাগ যে ব্রতের মূলমন্ত্র, তাহার উপাসকগণের মধ্যে স্বার্থচিন্তা প্রবল হইয়া উঠিলে, আন্তরিকতা অন্তর্হিত হইয়া যায়। তখন তাহাদের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপিত করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

"অপরে ভুল বুঝিয়াছে, ভুল বুঝাইতেছে,—আমরা ঠিক বুঝিয়াছি, ঠিক বুঝাইতেছি," এই কথা কতবার শুনিলাম—আরও কতবার শুনিতে হইবে। এরূপ মতের অনৈক্যের মধ্যে

কার্য্যের ঐক্য সংস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

সংযমের অভাবে শক্তিক্ষয় সাধিত হয়। আমাদের মধ্যে সংযমের অভাব সকল কার্য্যেই দেদীপ্যমান। ভাষার সংযম ভাসিয়া গিয়াছে —তাহা পদ্যে গদ্যে কেবল বন্যার ন্যায় আবর্জ্জনা বহন করিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। ভাবের সংযম বাঁধ ভাঙ্গিয়া অপ্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে ধাবিত হইয়াছে। নিয়ম শৃঙ্খলা সর্ব্বতোভাবে খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। বিদ্যালয়ের বালকেরাও গুরুভক্তি বিসর্জ্জন দিতে ইতস্তত করিতেছে না। এরূপ ক্ষেত্রে ধীরভাবে কোন কথার বিচার করিবার উপায় নাই।

কতকগুলি প্রতিকার পরের উপর নির্ভর করে,—কতকগুলি কেবল আমাদের উপরেই নির্ভর করে। আমরা সর্ব্বাংশে পরাধীন হইলে, এরূপ হইত না। আমরা এখনও সর্ব্বাংশে পরাধীন হই নাই। যে সকল বিষয়ে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ আছে, সেই সকল বিষয়ে আমরা "স্বরাজের" কিরূপ পরিচয় প্রদান করিতেছি, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সকলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আমরা যদি ইহাকেই আমাদের কার্য্যক্ষেত্র করিয়া লইয়া কার্য্যারম্ভ করি, তাহা হইলে কার্য্যের ঐক্য সাধিত হইতে পারে। কিন্তু এখানেও মতের অনৈক্যের অভাব নাই। কেহ বলিতেছেন— "এই পথই পথ।" কেহ বলিতেছেন— "ও সকল বিষয় পড়িয়া থাকুক, আপাতত উহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন নাই!"

ক্ষুদ্র প্রারম্ভকে প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য লালায়িত হইলে, বৃহৎ পরিণাম লাভ করিতে পারা যায় না। সর্ব্বাগ্রে চূড়া গঠন করিয়া, তাহার পর প্রাসাদরচনায় অগ্রসর হইতে গেলে আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হয়!

মতের অনৈক্য থাকিতে কার্য্যের ঐক্য সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া, বসিয়া থাকিলে চলিবে না। মতের ঐক্য সাধিত করিবার জন্যই যত্ন করিতে হইবে। তাহার উপায় কি?

আমাদের মধ্যে কি কোন বিষয়েই মতের ঐক্য নাই? ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, যেখানে মতের ঐক্য আছে, সেখানে আমরা একত্র দাঁড়াইতে পারিব না কেন?

আমরা স্বদেশশিল্পের উন্নতিসাধন করিতে চাই। প্রয়োজন মত বিদেশীয় পণ্যের বর্জ্জন ব্যতীত স্বদেশশিল্পের উন্নতিসাধনের উপায়ান্তর না থাকায়, আমরা প্রয়োজনানুরোধে বিদেশী বর্জ্জন করিতে চাই। আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজনসাধনের উপযোগী করিয়া তুলিতে চাই। এই তিনটি বিষয়ে কোনরূপ মতের অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কিরূপ রাজশাসন আমাদের লক্ষ্য, তদ্বিষয়েও মতের অনৈক্য বড় অধিক নহে। যেখানে অনৈক্য আছে, তাহা ছাড়িয়া দিয়া, যেখানে—যতদূর— ঐক্য আছে, তাহা লইয়া আমরা কি এক হইয়া উঠিতে পারি না? মন্দিরচূড়া কিরূপ হইবে, তাহার কথা আপাতত রাখিয়া দিয়া, আমরা কি ভিত্তিস্থাপনে এক হইয়া কার্য্য করিতে পারি না? বন্ধু তাহাতে অসম্মত। তিনি বলেন—"চূড়া যেরূপ হইবে, তাহার উপযোগী করিয়াই ভিত্তি স্থাপিত করিতে হইবে।" তর্ক অকাট্য। তাহার জন্যই বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছে!

তর্কের জন্য তর্ক অসঙ্গতরূপে প্রশ্রয়প্রাপ্ত হইলে, তর্ক বিলক্ষণ জমিয়া উঠিতে পারে; কিন্তু কার্য্যের আরম্ভ বাধাপ্রাপ্ত হয়। আমরা যেভাবে চলিতেছি, এরূপ ভাবে চলিলে, এখন কেন—কখনও—কার্য্যের আরম্ভ সম্ভব বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। এখন যাহাকে কার্য্য মনে করিয়া আত্মবঞ্চনা করিতেছি, কালে তাহা মূল্যহীন বলিয়া প্রতিভাত হইবে। যে কোনও সামান্য কারণে ঐক্যের সঙ্গে নিয়মশৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইতে কতক্ষণ? যতদিন মতের ঐক্য সংস্থাপিত না হইতেছে, ততদিন কার্য্যের ঐক্য সংস্থাপিত হইবার আশা নাই। যদি হয়, তাহা কার্য্য নহে,—ভাণ মাত্র। যে কোনও সামান্য কারণেই তাহা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে!

আমাদের আকাঙ্খা কতদূর আন্তরিক, তাহার পরীক্ষায় আমরা দেশে বিদেশে উপহাসাস্পদ হইয়াছি। আকাঙ্খা আন্তরিক হইলে, তাহাকে কোন কারণেই লোকে বিসর্জ্জন দিতে পারে না। আমরা ঐক্য বিসর্জ্জন দিবার জন্যও প্রস্তুত হইতেছি। যাহারা আমার মতে মত প্রকাশিত করিবে না, তাহারা পৃথক্ হইয়া থাকুক,—আমি আমার মতের লোক লইয়া পৃথক্ হইয়া থাকি। এরূপ নীতি অনৈক্যনীতি,—তাহা আমাদের আকাঙ্খার বিপরীত নীতি।

আমাদের মধ্যে জাতি ধর্ম্ম আচার ব্যবহার লইয়া মতের অনৈক্যের অভাব নাই। তাহা কদাপি দূরীভূত হইবার আশা নাই। তাহার উপর আকাঙ্খা লইয়া নূতন মতভেদ ও অনৈক্য উপস্থিত হইলে, আমাদিগের আর আশা কোথায়?

আমরা যাহা চাহি, তাহার কিছুই অনায়াসলভ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তাহার জন্য তপস্যা করিতে হইবে,—তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং আমাদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য নিরতিশয় অমঙ্গলজনক। আমরা আমাদিগকে বুঝিতে না পারিলে, যাঁহারা আমাদের শাস্তা, তাঁহারা আমাদিগকে বুঝিতে পারিবেন কেন? তাঁহারা না বুঝিয়া, ব্যবস্থী-বিভ্রাটে আমাদিগকে নিয়ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছেন!

যখন পরাধীন জাতি প্রতিকার লাভের যোগ্য হইয়া উঠিতে পারে, তখন রাজাকে ধরিয়াও প্রতিকার লাভ করিতে পারে,—প্রজাকে ধরিয়াও প্রতিকার লাভ করিতে পারে। তখন আর পথের বিচার প্রতিকার লাভের অন্তরায় হইতে পারে না। যোগ্য হইয়া উঠিবার পূর্ব্বে পথের বিচারের কোলাহল। আমাদের কোলাহলস্পৃহাই আমাদিগকে অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে।

আমাদের এই কলহ কাজ করিবার কলহ নহে; কেবল বাক্যকলহের আতিশয্য। ইহাতে ঐক্য তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। যাহারা যে কোনও কাজে হাত দিয়াছে, তাহারাই বুঝিয়াছে—সহিষ্ণুতা ভিন্ন উপায় নাই। কলহে সহিষ্ণুতা বিচলিত হইয়া যায়।*

শ্রী—

* এই প্রবন্ধ সুরাটের কংগ্রেস ভঙ্গের পরেই লিখিত। স্থানাভাবে গত মাসের বঙ্গদর্শনে ইহা বাহির হয় নাই। বঃ সঃ।

গৌড়কাহিনী।

আত্ম-কলহ।

গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্য সামন্ত-প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সামন্তগণ গৌড়েশ্বরকে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিয়া, স্বরাজ্যে স্বাধীনভাবে শাসনক্ষমতা পরিচালিত করিতে পারিতেন। তাঁহারা রাজা নামেই অভিহিত হইতেন। তাঁহাদের রাজধানীর এবং রাজ-দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। ইতিহাসের অভাবে এই সকল সামন্তরাজ্যের সকল কথাই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মুসলমানাধিকার প্রবর্ত্তিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্তও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। তাম্রশাসনাদিতে তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রথা ভারতবর্ষের চিরপরিচিত পুরাতন প্রথা;—ইহা সমগ্র এসিয়াখণ্ডের সাধারণ প্রথা বলিয়াও কথিত হইতে পারে। মুসলমানগণ এদেশে রাজ্যবিস্তারে ব্যাপৃত হইবার সময়ে এই প্রথা তাঁহাদিগের নিকটেও সমাদর লাভ করিয়াছিল। তাঁহারা যে জায়গীর-প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা সামন্ত প্রথারই নামান্তর মাত্র। কারণ সামন্তগণের ন্যায় জায়গীরদারগণও স্বরাজ্যে স্বাধীনভাবে শাসন ক্ষমতা পরিচালিত করিতে পারিতেন। তাহার জন্যই গৌড়ীয় মুসলমানসমাজ প্রথম হইতেই দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া, এদেশে এক স্বতন্ত্র রাজ্যগঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

দিল্লীশ্বর এই অভিনব মুসলমানরাজ্য করতলগত করিয়া লইবার জন্য যথাযোগ্য আয়োজন করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু গৌড়ীয় মুসলমানসমাজ তাহাতে সম্মত না হইয়া বাধা প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। তাহারা কখন কখন দিল্লীর অধীন হইতে বাধ্য হইলেও, সুযোগ পাইবামাত্র আবার স্বাধীনতা ঘোষিত করিতে ত্রুটি করে নাই।

যাঁহারা এ দেশে আসিয়া মুসলমানরাজ্য বিস্তৃত করিবার জন্য যুদ্ধকলহে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এ দেশের ধনরত্ন অপহরণ করিয়া লইয়া অন্য কোন দূরদেশে বসতি করিবার জন্য লালায়িত ছিলেন না। তাঁহাদের কোনও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না,—ভাগ্য পরীক্ষার জন্য হিন্দুস্থানে উপনীত হইয়া, ভাগ্যক্রমে এদেশের সন্ধানলাভ করিয়া, তাঁহারা ইহাকেই তাঁহাদিগের স্বদেশ করিয়া তুলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের রাজপথ, রাজদুর্গ, প্রহরীমন্দির অদ্যাপি তাহারই সাক্ষ্যদান করিতেছে। রাজ্যবিস্তারের প্রথম কোলাহল নিরস্ত হইবামাত্র তাঁহারা গৌড়কে দিল্লীর সমকক্ষ করিয়া তুলিবার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর তাহাতে বাধাপ্রদান করায়, স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার্থ মুসলমানগণকে হিন্দুদিগের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহাতেই এদেশে

হিন্দুমুসলমান মিলিত হইয়া বাঙ্গালী জাতি গঠিত করিয়া তুলিবার আয়োজন করিতে লাগিল। ধর্ম্মগত পার্থক্য থাকিতেও এইরূপে দেশগত স্বার্থে এদেশের হিন্দুমুসলমান এক হইয়া উঠিতে বাধ্য হইল।

যখন এ দেশে এই বিচিত্র সামঞ্জস্য ধীরে ধীরে লোকচিত্তে অধিকার বিস্তৃত করিতেছিল, দিল্লীশ্বরগণ তৎকালে রাজপ্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া শাসন বিস্তারের চেষ্টা করিতে ব্যাপৃত ছিলেন। সে চেষ্টা সফল হইয়া উঠিল না। যাঁহারা দিল্লীর দরবারে প্রাধান্য লাভ করিতেন, তাঁহারা রাজপ্রতিনিধির পদ লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করায়, কাহারও পক্ষে দীর্ঘকাল সে পদমর্য্যাদা ভোগ করিবার সুযোগ ঘটিল না। সুলতান সামসুদ্দীন আলতমাস লক্ষ্মণাবতীরাজ্যে আলাউদ্দীনকে রাজপ্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিন বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই, তাঁহাকে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল! তাঁহার পদে সইফউদ্দীন তুর্কী নিয়োগ প্রাপ্ত হইলেন।

সইফউদ্দীন প্রথমে শাহাজাদা নাসিরুদ্দীনের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিয়া, একটি জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর কিছুদিন বিহার প্রদেশের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া গৌড়ের রাজপ্রতিনিধির পদপ্রাপ্ত হইলেন। সইফ-উদ্দীন পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা সফল না হইলেও, তিনি অনেকগুলি হস্তী লাভ করিয়াছিলেন। তাহা দিল্লীতে প্রেরণ করাই তাঁহার একমাত্র উল্লেখযোগ্য রাজকার্য্যরূপে ইতিহাসে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। তিন বৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে লোকে বিষপ্রয়োগে নিহত করিয়া ফেলিল!

ইহার পর ইজ্জুদ্দীন তুঘান খাঁ নামক ক্রীতদাসের ভাগ্য প্রসন্ন হইল। তিনি সুপুরুষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। দিল্লীশ্বরী সুলতানা রিজিয়া তাঁহাকেই গৌড়ের রাজ-প্রতিনিধি মনোনীত করিলেন। তুঘান খাঁর ত্রয়োদশ বৎসর শাসনকার্য্য পরিচালিত করিবার কথা ইতিহাসে লিখিত আছে। এই ত্রয়োদশ বৎসর এদেশের ইতিহাসের একটি বিপ্লবকাল বলিয়া কথিত হইতে পারে। এক বৎসরও যুদ্ধকলহের অভাব ছিল না;—কখন জয় কখন বা পরাজয় তুঘান খাঁর শাসনক্ষমতাকে নিয়ত দোদুল্যমান করিয়া রাখিয়াছিল। সে-কাহিনী "রিয়াজ-উস্-সলাতিন" গ্রন্থে বিস্তৃত-ভাবে প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু এই সময়ে সুবিখ্যাত মুসলমান ইতিহাসলেখক মিন্‌হাজুদ্দীন এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ "তবকাৎ-ই-নাসিরীতে" ইহার অনেক কৌতূহলপূর্ণ তথ্য লাভ করা যায়।

লক্ষ্মণাবতীপ্রদেশে এই সময়ে লাকোর আইবক নামক একজন পরাক্রান্ত জায়গীরদার ছিলেন। তাঁহার সহিত তুঘান খাঁর যুদ্ধ-কলহ উপস্থিত হয়। লক্ষ্মণাবতীর নিকটবর্ত্তী "বসন্‌কোট" নামক দুর্গমূলে আইবক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলে, রাঢ় ও বরেন্দ্র তুঘান খাঁর করতলগত হয়। *

* "বসন্‌কোট" নামক যে দুর্গের কথা ইতিহাসে পাঠ করা যায়, তাহা মিন্‌হাজের গ্রন্থে লক্ষ্মণাবতীর অতি নিকটে "close to Lakhnaeti" বলিয়া লিখিত থাকিলেও, কেহ কেহ বগুড়া জেলায় তাহার স্থান নির্দ্দেশ

এই বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয়,—তুঘান খাঁর রাজপ্রতিনিধিপদ লাভ করিবার পূর্ব্বেই গৌড়ীয় মুসলমানরাজ্য আবার স্বাতন্ত্র্য লাভের চেষ্টা করিয়াছিল। "বসনকোটের" যুদ্ধে সে চেষ্টা নিরস্ত করিয়া তুঘানখাঁকে রাঢ় বরেন্দ্র পুনরায় অধিকার করিয়া লইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল। এইরূপে রাজ্যাধিকার লাভ করিয়াও, তুঘান খাঁ নিরুদ্বেগে রাজ্য শাসন করিতে পারেন নাই। পুনরায় বিপ্লব আসিয়া তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই বিপ্লবের প্রকৃত বিবরণ ইতিহাসে বিকৃতভাবে বর্ণিত হইয়া আসিতেছে!

হিজরী ৬৪১ অব্দের সমকালে তুঘান খাঁ অযোধ্যা প্রদেশে একটি সন্ধিবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। সেই অবসরে উড়িষ্যাধিপতি সসৈন্যে রাঢ়রাজ্য অধিকার করিয়া লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিবার আয়োজন করেন। মুসলমানগণ উড়িষ্যাকে "যাজনগর" বলিতেন। সুতরাং তাঁহাদের পুরাতন ইতিহাসে ইহা "যাজনগর বিপ্লব" নামে লিখিত হইত। ইহাকে ভ্রমক্রমে "জঙ্গিস খাঁর আক্রমণ" মনে করিয়া, কোন কোন্ লেখক তাহারই উল্লেখ করিয়া গিয়াছিলেন। তাহাই এখন অধিকাংশ ইতিহাসে সত্য ঘটনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে! প্রকৃত পক্ষে মিনহাজের গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছেন,—ইহা "হিন্দুবিপ্লব"—যাজনগরের হিন্দু রাজা গৌড়রাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা করায়, এই বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। ইহাতেই তুঘান খাঁর পদচ্যুতি সংঘটিত হইয়াছিল। *

বঙ্গোপসাগর কূলের অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গরাজ্য বহুপুরাতন রাজ্য বলিয়া সুপরিচিত। এই তিনটি রাজ্য কখন এক রাজার অধীনে, কখন বা ভিন্ন ভিন্ন রাজার অধীনে শাসিত হইত। সীমাসংরক্ষণের জন্য সর্ব্বদা কলহবিবাদ উপস্থিত হইত। মুসলমানগণ রাঢ়প্রদেশ অধিকার করিবার সময়ে কলিঙ্গসীমা অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া, কলিঙ্গাধিপতি রাঢ়রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করেন। তাহা পুনরায় অধিকারভুক্ত করিবার আশায় তুঘান খাঁ যাজনগর আক্রমণের চেষ্টা করিতে গিয়া পরাভূত হইলেন। তুঘান লক্ষ্মণাবতীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না করিতে, উড়িয়াগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া লক্ষ্মণাবতী অবরোধ করিয়া ফেলিল!

করিয়া, বগুড়ার অন্তর্গত মহাস্থানকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। এ বিষয়ে সমসাময়িক লেখক মিনহাজ উদ্দীনের ভ্রমপ্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প ছিল।

* বাঙ্গালার ইতিহাসে অনেক ভ্রম প্রমাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইতিহাস সংকলন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে তাহার সংশোধন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। অধ্যাপক ব্লকম্যান প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ "যাজনগর বিপ্লব" সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। রিয়াজের ইংরাজী অনুবাদক মহাশয়ও তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—It would appear from the above that the invasion of Bengal by the Mughals under Chenghis Khan referred to in the text is a myth and a mistake for the invasion of Lakhnauti by the Hindus of Jajnagar (Orissa). 'The mistake is repeated in many histories, but Tabaquats' acocunt is most reliable, as its author was an eye-witness of the affair.

যাহারা একালের বিদেশীয় ইতিহাস লেখকগণের গ্রন্থে ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া ধিকৃত হইতেছে, সেকালের ইতিহাসের সকল যুদ্ধ-কাহিনী তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের শৌর্য্যকাহিনী মাত্র। যাঁহাদিগকে বাহুবলে সীমারক্ষা করিতে হইত, শাসনকৌশলে বিপ্লব নিরস্ত করিয়া স্বদেশের স্বাতন্ত্র্য সংস্থাপিত করিতে হইত,—যাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ দিল্লীশ্বরের পরাক্রান্ত সেনাদলের সম্মুখে জীবনবিসর্জ্জনের জন্য অকুতোভয়ে দণ্ডায়মান হইতে হইত,—তাঁহাদিগকে ভীরু বা কাপুরুষ বলিয়া অভিহিত করা যায় না। সেকালের মুসলমান ইতিহাস-লেখক যুদ্ধকাহিনীর বর্ণনা করিবার সময়ে উড়িয়াগণকে ভীরু বা কাপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিতে পারেন নাই। তাহারা উড়িষ্যা ছাড়িয়া সুবর্ণরেখা অতিক্রম করিয়া, রাঢ়রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে করিতে লক্ষ্মণাবতীর নগরদ্বারে উপনীত হইয়াছিল। সেকালে নদীমাতৃক বঙ্গদেশে এরূপভাবে সেনাচালনা করিয়া লক্ষ্মণাবতী অবরুদ্ধ করা কিরূপ কঠিন ব্যাপার ছিল, সে কথা স্মরণ করিলে, উড়িয়াগণকে তাহাদের বীরকীর্ত্তির জন্য সাধুবাদ করিতে হয়।

তুঘান তাহাদিগের নিকট পরাভূত ও তাহাদের সেনাসমাগমে লক্ষ্মণাবতী নগরে অবরুদ্ধ হইয়া, দিল্লীশ্বরের নিকট সেনাবল ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাতেই তাঁহার পদচ্যুতির সূত্রপাত হইল। তখন দিল্লীশ্বরের স্বতন্ত্র সেনাদল অধিক ছিল না। তখনও তাঁহার রাজ্য আর্য্যাবর্ত্তের সকল স্থানে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। দিল্লীর নিকটবর্ত্তী প্রদেশ ভিন্ন অযোধ্যা প্রদেশ দিল্লীশ্বরের একটি প্রধান "সুবা" বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহার পরেই বিহার এবং লক্ষ্মণাবতী "সুবা"রূপে পরিগণিত হইত। বাদশাহের প্রিয়পাত্রগণ এই সকল সুবার শাসনভার প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহারা স্বতন্ত্র সেনাদল সংগৃহীত করিয়া আপন আপন সুবা রক্ষা করিতে বাধ্য হইতেন। এক প্রদেশে বিপ্লব উপস্থিত হইলে, অন্য প্রদেশের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া, সে বিপ্লব নিরস্ত করিবার উপায় ছিল না। তুঘান খাঁ দিল্লীশ্বরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করায়, দিল্লীশ্বরকে অভ্যস্ত প্রথাই অবলম্বন করিতে হইল। তিনি অযোধ্যার রাজপ্রতিনিধিকে লক্ষ্মণাবতীর উদ্ধার সাধনে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন! *

এই সময়ে তুমার খাঁ কমরুদ্দীন নামক আলতমাস বাদশাহের একজন ক্রীতদাস ছিলেন। বাদশাহ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অশ্বরক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুলতানা রিজিয়া সেই অশ্বরক্ষককে কান্যকুব্জের শাসনভার প্রদান করিয়াছিলেন। তুমার খাঁ এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে

* Under Emperors orders a large army, led by Tamar Khan Quamruddin Qiran, feudatory of Oudh, was sent to Lakhnauti, in order to repel and chastise the infidels of Jajnagar (Orissa). The Raja of Jajnagar invaded Lakhnauti, owing to Mussulmans in the previons expedition having demolished the Orissa fort of Katasan (or Baktasan). The Orissans first took Lakore (probably Nagore) and slaughtered a large body of Mussulmans, including the commandant of Lakore, named Fakrul Mulk Karimuddin, and then approached the gate of Lakhnauti.—*Tabqyat-i-Nasiri.*

সমর নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া কালক্রমে অযোধ্যার শাসনভার লাভ করিয়া মিথিলা প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তৎকালে লক্ষ্মণাবতীতে স্বতন্ত্র রাজপ্রতিনিধি থাকায়, মিথিলা অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে অগ্রসর হইবার সুযোগ ঘটে নাই। এক্ষণে বাদশাহের আদেশে লক্ষ্মণাবতীর উদ্ধারসাধন করিতে আসিয়া তিনি শত্রুদলন করিবার পর, লক্ষ্মণাবতীর শাসনভার গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ইহাতে উভয় রাজপ্রতিনিধির মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

সেকালের দিল্লীর শাসন দূরবর্ত্তী সুবার পক্ষে নামমাত্র শাসন বলিয়া পরিচিত না থাকিলে, এক রাজপ্রতিনিধি অন্য রাজপ্রতিনিধির সহিত যুদ্ধকলহে লিপ্ত হইতে পারিতেন না। তখনও বাহুবলই সকল তর্কের মীমাংসা করিয়া দিত। বর্ত্তমানক্ষেত্রে ঐতিহাসিক মিনহাজ উদ্দীন মধ্যস্থ হইয়া উভয় রাজপ্রতিনিধির রাজ্য কলহের মীমাংসা করিয়া দিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মিনহাজের চেষ্টায় যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তদনুসারে তুঘান খাঁ ধনরত্ন লইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তুমার খাঁ গৌড়ের শাসনভার গ্রহণ করেন। এইরূপে তুঘান খাঁর ত্রয়োদশবর্ষব্যাপী শাসনকাল কেবল কলহ কোলাহলেই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল।

তুমার খাঁ দশ বৎসর গৌড়রাজ্য শাসন করিবার চেষ্টা করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। দিল্লীশ্বর আলতমাসের পুত্র নাসিরুদ্দীন মহম্মদ সম্রাট হইবার পর জালালুদ্দীন খাঁ লক্ষ্মণাবতী-রাজ্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মিনহাজের গ্রন্থ "তবকাৎ-ই-নাসিরী" এই নাসিরুদ্দীনের নাম অমর করিয়া রাখিয়াছে। "তবকাৎ" হিজরী ৬৫৮ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের মুসলমান শাসনের ইতিহাস। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গদেশের কিছু কিছু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতেই মিনহাজের গ্রন্থ লিখিত বঙ্গবিবরণের আদিগ্রন্থ বলিয়া পরিচিত হইয়া রহিয়াছে। মিনহাজ স্বয়ং যাহা পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। "তাবকাৎ-ই-নাসিরী" গ্রন্থের এই শ্রেণীর বিবরণ সমধিক বিশ্বাস যোগ্য। সে বিবরণ মধ্যে কেবল বিপ্লবের পর বিপ্লব,—সর্ব্বত্র কলহ কোলাহল,—সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইয়া রহিয়াছে। তখনও মুসলমান-শাসন আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

লোচনদাস।

জীবনীপ্রসঙ্গ।

লোচনদাস বৰ্দ্ধমানের দশক্রোশ উত্তরে কোগ্রাম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য; ইঁহার তিনটী নাম ত্রিলোচন, লোচনানন্দ ও লোচন। "চৈতন্যমঙ্গল" নামক তাঁহার রচিত গ্রন্থে এই তিনটী নামই পাওয়া যায়। শেষোক্ত লোচন নামেই তিনি বিখ্যাত।

"চৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থের শেষাংশে এবং "দুর্লভসার" গ্রন্থের আদিতে তিনি যে আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার পিতার নাম কমলাকর দাস এবং মাতার নাম সদানন্দী, মাতামহের নাম পুরুষোত্তম গুপ্ত, মাতামহীর নাম অভয়াদেবী, কোগ্রামে তাঁহার বাস এবং বৈদ্যকুলে তাঁহার জন্ম—

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস॥
মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী নাম।
যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম॥
কমলাকর দাস নাম পিতা জন্মদাতা।
যাঁহার প্রসাদে কহি গোরাগুণ গাঁথা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে একগ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়াদেবী নামে॥
মাতামহের নাম সে পুরুষোত্তম গুপ্ত।
নানা তীর্থে পূত তেঁহ তপস্যায় তৃপ্ত।
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র।
সহোদর নাহি মোর মাতামহের যে সূত্র।
মাতৃকুলের পিতৃকুলের কহিলাম কথা।
শ্রীনরহরি দাস মোর প্রেম ভক্তিদাতা॥"

চৈতন্যমঙ্গল।

তাঁহার পিতার অবস্থা মন্দ ছিল না। আজিও তাঁহাদের ভূসম্পত্তির চিহ্নস্বরূপ "লোচনের ডাঙ্গায়" বিস্তর ব্রাহ্মণ বৈদ্য বসবাস করিতেছেন। সে সমস্ত সম্পত্তি এককালে লোচনের ছিল সন্দেহ নাই। এবং এক্ষণে তাহা তাঁহার কুলগুরু বংশীয় খুড়ুরায় অধিকারীরা ভোগ দখল করিতেছেন।

বাল্যকালে পিতামাতার একমাত্র পুত্র বলিয়া লেখাপড়ায় তাঁহার ততটা আগ্রহ ছিল না, এবং সেজন্য তাঁহার মাতামহকে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল:—

যথা তথা যাই সে দুল্লিল করে মোরে।
দুল্লিল দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে।
মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাল আখর।
ধন্য সে পুরুষোত্তম গুপ্ত চরিত্র তাহার॥"

অল্প বয়সেই তাঁহার বিবাহ হয়, বিবাহের পরেই তিনি পাঠাভ্যাসের জন্য নরহরি ঠাকুরের নিকট আগমন করেন। কৈশোরে তিনি শ্রীখণ্ডেই বিদ্যাভ্যাস করেন, যৌবনে শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের আদর্শে তাঁহার চরিত্র গঠিত হয়—বহুবার তিনি সবিনয়ে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।

"প্রাণের ঠাকুর মোর নরহরি দাস।
তাঁর পদ প্রসাদে এ পথের প্রতি আশ।"
"কুলের ঠাকুর বন্দোঁ। ইষ্ট সে দেবতা।
ইহলোক পরলোকে সেই সে রক্ষিতা॥

তাঁবিনু নাহিক মোর তিনলোকে বন্ধু।
নরহরি দাঁস বন্দোঁ গোরা প্রেম সিন্ধু ॥"

জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি শ্রীখণ্ডের গুরুগৃহে যাপন করেন। সেই নিমিত্তই বোধ-হয় "প্রেমবিলাস" গ্রন্থে লিখিত হইয়া থাকিবে—

"বৈদ্যবংশোদ্ভব হয় শ্রীলোচনদাস।
শ্রীনরহরির শিষ্য শ্রীখণ্ডেতে বাস॥"

নরহরি ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের একজন পার্ষদ্ ভক্ত, গৌর প্রেমে তাঁহার হৃদয় তখন অভিষিক্ত। লোচনও তাঁহার সঙ্গ ও শিক্ষাগুণে গৌর-প্রেমামৃত সাগরে ডুবিয়া গেলেন। তাহারই ফলে "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" ও তাঁহার রচিত পদা-বলী। নরহরি ঠাকুরের আদেশে ১৪৫৯ শকে তিনি চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। চৈতন্য-মঙ্গলের প্রারম্ভেই আছে:—

"শ্রীনরহরি দাস দয়াময় দেহে।
কি দেখিয়া করে মোরে অবাধ সিনেহে॥
দুরন্ত পাতকী অন্ধ অতি অনাচার।
অনাথ দেখিয়া দয়া করিল আমার॥
তাঁর দয়া বলে আর বৈষ্ণব প্রসাদে।
এই ভরসায়ে পুঁথি হইল অবাধে"॥

"চৈতন্যমঙ্গল" আদি, মধ্যম, অন্ত এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে সংক্ষেপে প্রায় সমস্ত চৈতন্যলীলাই বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণবসম্প্র-দায়ে পাঁচালীরূপে ইহার গান হইয়া থাকে।

মুরারিগুপ্তের সংস্কৃত "চৈতন্যচরিত" অব-লম্বনে সম্ভবতঃ এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়া থাকিবে। ইহাতে ইতিহাসের শুষ্ক অস্থিপঞ্জর কবিত্বকল্পনার অপরূপ লাবণ্যে মণ্ডিত হইয়াছে।

কিন্তু এই "চৈতন্যমঙ্গল" কবি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে এবং সসঙ্কোচে তাঁহার প্রাণের দেবতার অনুপম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন:—

"মুঞি অতি অল্পবুদ্ধি কি কহিব আর।
মুরুখ হইয়া করি বেদের বিচার॥
অন্ধ যেন দৃষ্টিহীন দিব্য বড় চাহি।
খর্ব্ব যেন চাঁদ ধরিবারে মেলে বাহি॥
পঙ্গু মহী লঙ্ঘিবারে করে অহঙ্কার।
ক্ষুদ্র পিপীলিকা চাহি গিরি বাহিবার॥
ঐছন আমার আশা হৃদয়ে বিশাল।
গোরা অবতার কথা কহিতে বিচার॥"

"চৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থের নামকরণ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। প্রথমে নিত্যানন্দ ঠাকুরের আদেশে শ্রীবৃন্দাবন দাস "চৈতন্যমঙ্গল" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্ব রাত্রে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন লোচন সাধনপ্রভাবে তাহা জানিয়া শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে বর্ণনা করেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঘটনার যাথার্থ্য লইয়া বৃন্দাবন দাস ও লোচন-দাসে মহা বচসা হয়। অবশেষে বৃন্দাবন দাসের জননী নারায়ণী ঠাকুরাণী লোচনদাস বর্ণিত বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া সমস্ত বিবাদ মিটা-ইয়া দেন এবং বৃন্দাবন দাসের পুস্তকের নাম সেই হইতে "চৈতন্যভাগবৎ" রাখিয়া দিলেন। এই প্রবাদের মূলে কতটা সত্য আছে—বলা যায় না।

লোচনদাস যে প্রস্তরের উপর বসিয়া "চৈতন্যমঙ্গল" রচনা করিতেন আজিও তাহা শোভা পাইতেছে।

"চৈতন্যমঙ্গল" ব্যতীত "দুর্লভসার" "রাগ-লহরী" "বস্তুতত্ত্বসার" "আনন্দলতিকা" "প্রার্থনা" "শ্রীচৈতন্য প্রেমবিলাস" ও "দেহনিরূপণ" নামক

তাঁহার আরো সাতখানি গ্রন্থ আছে। "দুর্লভসার" গ্রন্থ চৈতন্যমঙ্গলের ন্যায়ই প্রসিদ্ধ; ইহাতে চৈতন্যমঙ্গলের নাম ও বিবরণ আছে বলিয়া অনুমান করা যায়—ইহা সম্ভবতঃ চৈতন্যমঙ্গলের পরে রচিত হইয়া থাকিবে।

"রাগলহরী" "ভক্তিরসামৃত সিন্ধু" গ্রন্থের অধ্যায়বিশেষের কাব্যানুবাদ। ইহাতে আচার্য্য প্রভুর নাম থাকাতে ইহা তাঁহার সর্ব্বশেষ গ্রন্থ ও বৃদ্ধবয়সে রচিত বলিয়া বোধ হয়।

দুর্লভসার। লোচনদাস বিরচিত।

তাহার আরম্ভ, ভণিতা ও শেষ এইরূপ :—

আ। জয়তি জয়তি দেব শচীগর্ভজন্মা।
জয়তি জয়তি ভক্তপ্রেম জনৈক ধর্ম্মা॥

* * * *

এক নিবেদন করি শুন সর্ব্বজন।
বাচাল কর এ গোরা—শুনে মূকজন॥

ভ। এতেক কহিএ ইহা কহনে না যায়।
কহএ লোচনদাস কৃষ্ণের কৃপায়॥

শেষ। সবজনে কৃপা বিশেষ-ভক্ত জনে।
মায়াতে মুগ্ধতে সন্দেহ ধরে মনে॥
আমার বচনে তুমি করিহ বিশ্বাস।
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস॥

দেহনিরূপণ। লোচনদাস বিরচিত।

আ। আমার হৃদয়খানি হইল রাজপাট।
পাটেতে বসিয়া রাজা করে কত নাট॥
দেউটী জ্বালিয়া আভ নীলাচলপুরে।
প্রভুরে রাখিয়া আজ খুঁজে ঘরে ঘরে॥

(শ্লোক সংখ্যা ১০০)

শ্রীচৈতন্য প্রেমবিলাস। লোচনদাস বিরচিত।

আ। শ্রীরামানন্দ রায় পদুমনমিশ্রকে শিক্ষাদীয়-তাম ইত্যাদি।

সেই ভক্ত কৃষ্ণপদ আত্ম করি লয়।
সেই ভক্তজন হয় রাধিকা আশ্রয়॥

শেষ। ভক্তবৃন্দ পদদ্বন্দ্ব হৃদে করি আশ।
চৈতন্য প্রেমবিলাস কহে এ
লোচনদাস॥

(শ্লোক সংখ্যা ১০০)

আর একখানি পুঁথি।

আ। প্রথম পাত নাই দ্বিতীয় পাতে আছে।
চরণ মাধুরী দুই আদ্র বন কঁহি।
যাহাতে গমন করে নেত্রপদ্ম দুই॥

শেষ। নরহরি পাদপদ্ম হৃদে করি আশা।
জন্মেই ইহা বিনু নাহিক ভরসা॥
চৈতন্য প্রেমবিবর্ত্ত বিলাস এই হও।
ইহা বিনু অন্য কিছু মনে সব লও॥
শ্রীচৈতন্য প্রেমবিলাস শুনে যেই জন।
অনায়াসে পাও সে চৈতন্য চরণ॥
ভক্ত পাদপদ্ম হৃদয়ে কবি আঁসি।
চৈতন্য প্রেমবিলাস কহে লোচনদাস॥

"কাঁদড়া" নিবাসী বিখ্যাত "চৈতন্যমঙ্গল"—গায়ক প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহে আজিও তাঁহার স্বহস্ত লিখিত পুঁথি সযত্নে রক্ষিত ও পূজিত হইতেছে। তবে ভক্তির আতিশয্যবশতঃ চন্দন লিপ্ত হইয়া স্থানে স্থানে অপাঠ্য হইয়া আসিতেছে।

লেখা দেখিয়া তাঁহার সুন্দর হস্তলিপির পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ "জগন্নাথ বল্লভ" নাটকের ইনিই অনুবাদক। ইহা ছাড়া তাঁহার বিস্তর পদ আছে, ঐ পদাবলীর জন্য তাঁহার নাম সর্ব্বত্রই সুপ্রসিদ্ধ।

আজন্ম ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় পরম ভাগবৎ নরহরি ঠাকুরের সঙ্গগুণে তাঁহারও সংসার-বৈরাগ্য ছুটিল। তিনি স্বগৃহ ত্যাগ করিয়া

শ্রীখণ্ডেই রহিয়া গেলেন, অথচ তাঁহার শ্বশুরালয় আমোদপুর্ব কাকুট গ্রামে তাঁহার উদ্ভিন্ন-যৌবনা স্ত্রী দিন দিন শিশিরমথিতা পদ্মিনীর মত বিরহে ম্লান হইতেছিলেন। বহু নির্ব্বন্ধে তিনি একদিন পদব্রজে শ্বশুরালয় অভিমুখে চলিলেন, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। গ্রামে প্রবেশ করিয়া পথিপার্শ্বে একটী যুবতীর সাক্ষাৎলাভ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মাতঃ, কোন পথে যাইব ?" পরে জানা গেল সেই যুবতীই তাঁহার স্ত্রী। লোচন স্থির করিলেন ইহা বিধাতারই ইচ্ছা, বিষাদে ফল নাই। ভগবদ্ভক্ত স্বামী-স্ত্রী সেই দিন হইতে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের দাম্পত্যপ্রেমের পুষ্পাঞ্জলি তিনি প্রাণের দেবতার পদে অর্পণ করিলেন, ক্ষুদ্র দাম্পত্য-প্রেম বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইল। অথচ শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার স্ত্রীর প্রতি একান্ত অনুরাগের পরিচয় চৈতন্যমঙ্গলে পাওয়া যায়।

এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ তিনি স্ত্রীর অনুমতি লইয়াই রচনা করেন।

চৈতন্যমঙ্গলের প্রথমেই এই পদটী আছে :—

"প্রাণ ভার্য্যা নিবেদো নিবেদো নিজ কথা।
আগে আশীর্ব্বাদ মাগো
যত যত মহা ভাগ
তবে সে গাইব গুণগাথা॥"

এই যতিপুরুষ গৌর প্রেমযজ্ঞে কামের আহুতি দিয়া যে অমৃত লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কত যে তাপিত তৃষিতজন সঞ্জীবিত, সরস ও সুন্দর হইয়াছে তাহার আর সীমা নাই।

১৫৮৯ খ্রীঃ ২৯শে পৌষ ৬৬ বৎসর বয়সে তাঁহার তিরোভাব ঘটে। ঐ উপলক্ষে অজয়-নদীতীরে লোচনডাঙ্গায় তিনদিবসব্যাপী বহু জনাকীর্ণ এক মেলা বসিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন উক্ত মেলার প্রবর্ত্তক স্বয়ং লোচন-দাস। কোগ্রামের পূর্ব্ব নাম অনুসরণ করিয়াই বোধহয় উহা উজানীর মেলা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

কুনুর নদীর তীরে আজিও কোগ্রামে লোচনের সমাধি রহিয়াছে। প্রতিদিন সেই সমাধি-মোহন্তগণ ও বহুদূরসমাগত বৈষ্ণব-গণকর্ত্তৃক পূজিত হয়। উহা কবির সমাধির উপযুক্ত স্থানই বটে, উপরে আকাশের নীল চন্দ্রাতপ—চারিদিকে হরিৎতৃণ ক্ষেত্র, সমাধি-প্রদেশ কুসুমিত মাধবী-লতাদাম পরিবেষ্টিত; মাধবী-কুসুম যেন প্রকৃতির পুষ্পাঞ্জলির মত দিবানিশি বর্ষিত হইতেছে।

কবিত্ব।

"চৈতন্য মঙ্গল" কাব্যে কবি ইতিহাসের নীরস অস্থিপঞ্জর ভাব প্রবাহে সরস ও কল্পনার অপরূপ লাবণ্যে ভূষিত করিয়াছেন। এবং অনুর্ব্বর ইতিহাসের যেখানে একটু অবকাশ পাইয়াছেন, সেইখানেই কবিতার শ্যামনিকুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছেন। তাঁহার কবিত্বের সোণার কাঠি স্পর্শে যেন নির্জ্জীব কঠোর সত্যও চকিতে সরস ও সজীব হইয়া উঠিয়াছে। এবং চৈতন্যমঙ্গল কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্যের জীবন চরিত না হইয়া, যেন তাঁহার সুখ দুঃখ বিরহ-মিলন, মান-অভিমান, জয়-পরাজয়, ধ্যান ধারণা, সাধ্য সাধনা, প্রেম ভক্তির উচ্ছ্বাস,

কঠোর বৈরাগ্য, অতুলকরুণা ও সর্ব্বোপরি তাঁহার বিরাট মহিমার মহান্ চিত্রগুলি লোচন দাসের অপূর্ব্ব তুলিকাস্পর্শে, অতুলচিত্রাঙ্কনী প্রতিভায় এবং কবিত্ব ও কল্পনার সুন্দর বর্ণা-ভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আর শ্রীচৈতন্য দেবের জীবন চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে শচীদেবীর স্নেহবৎসল মাতৃহৃদয়, দেবী বিষ্ণু প্রিয়ার বিরহ মথিতা সকরুণমূর্ত্তিখানি, তাঁহার পরিচরগণের ভক্তিবিহ্বল আত্মহারা ভাব ও সর্ব্বোপরি এ সকলের অন্তরালে লোচনের সকরুণ দীন ভক্তি রসার্দ্র কবিহৃদয় কি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে! সেই জন্যই চৈতন্য মঙ্গল, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত কিম্বা শ্রীচৈতন্য ভাগবৎ হয় নাই।

লোচনদাস বলিতেছেন পৃথিবী সোহাগ শ্রীচৈতন্যের মুখচন্দ্র দেখিয়া :—

"মধুময় কমলে যেন ষট্পদ ভ্রমরাবুলে
যেন চন্দ্র চকোরের মেলি।"

"বনের হাথিয়া যেন বনদাবানলে পুড়ি
অমিয় সাগরে দিল ঝাঁপ।"

সংসার তাপপীড়িত জনগণ সে মুখচন্দ্র দেখিয়া এমনি হরষিত হইল।

"প্রতি অঙ্গে অমিয়া সঞ্চরে রাশিরাশি।
নিরখিতে নয়নে হৃদয়ে কৈনে বাসি॥"

বুঝি তাঁহার "প্রতি অঙ্গরস রাশি অমিয়া অখণ্ড" সে "রসময় তনু" দেখিয়া "নয়ানে লাগিল সভার অমিয়া অঞ্জন।" তাই

"অবেকত আধ আধ লহু লহু বোলে।
চাঁদের সায়রে যেন অমিয়া উথলে॥"

শ্রীচৈতন্যের তরুণ মলিন মুখ দেখিয়া তিনি বলিয়াছেন :—

"সুবরণ পদ্ম যেন আতপে মৈলান।
মধু নিকলায় যেন বদনের ঘাম॥"

সমস্ত কবিতায় যেরূপ চৈতন্যমঙ্গলে ও সেইরূপ লোচন দাস এক একটি অতি সহজ কথায় বা একটী মাত্র পদে কবি সুন্দর এক একটী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন :—

"বালক দেখিয়া হিয়া করয়ে কি জানি।"
"গড়ল কেমনে বিধি ধৈরজ ধরিয়া।"
"হরিণ নয়ানীগণ গৌরাঙ্গ দেখিয়া।"
বলিতে না পারে সে ধরিতে নারে হিয়া॥"
"সুবর্ণ দর্পণ করে যেন পূর্ণচন্দ্র।
হেরি লোক নিজ হিয়া না হয় স্বতন্ত্র॥"
"ডর নাহি হিয়ায় মোর যে বলু সে বলু লোকে।
হেন মন করিছে গোরা তুলিয়া রাখি বুকে॥"
"সে রূপ দেখিতে কারু না লেউঠে আঁখি॥"
"অঙ্গের বাতাসে সব কাঁপয়ে শরীর॥"

দু'টী কথায় শচীদেবীর স্নেহবৎসল মাতৃ-হৃদয়খানি ফুটিয়া উঠিয়াছে!

"সকল পাশরি এক তোর মুখ চাহি।"
"তোমা না দেখিলে মোর সকলি অরণ্য।"
"জল বিনু যেন মীন না ধরে পরাণ।
তোমা বিনা আমার তেমতি সমাধান॥

বিষ্ণু প্রিয়া বলিতেছেন যাঁর :—

শিরীষ কুসুম যেন সুকোমল চরণ,
পরশিতে ডর লাগে হাথে।

তিনি কি করিয়া পদব্রজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দেশ দেশান্তরে বিচরণ করিবেন। এবং যাঁহার "অমিয় পসারে যেন অঙ্গের মাধুরী" "অমিয়া সিঞ্চিল মুখ দেখিতে দেখিতে" এবং "দেখিতে শীতল হয় হৃদয় নয়ন" তাঁর বিরহ তিনি কি করিয়া সহ্য করিবেন—সমস্ত সংসার যে তাঁর বিরহে বিষময় বোধ হয় :—

অমিয়া অধিক প্রভু তোর যত গুণ।
এখনে সকল সেহ ভৈগেল আগুন॥"

নিত্যানন্দ সহ শ্রীচৈতন্যের প্রেমবিগলিত করুণমূর্ত্তি কবি সুন্দর অঙ্কিত করিয়াছেন :—

দোঁহার নয়নে ঝুরে প্রেমানন্দ নীর।
আনন্দে বিভোর দোঁহে অমিয় শরীর॥

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল হইতে কতকগুলি সুন্দরপদ ও শব্দচিত্র যথেচ্ছ উদ্ধৃত করিলাম :—

করুণ অরুণ, কমলরস সুগন্ধি, বজর অন্তর, চলিতে না চলে পদখানি, পৃথিবী সোহাগ, রস লাবণ্য, অরুণ কমল আঁখি করুণা জলে ভাসে, অমিয়া অধিক পরকাশ, মধুরিম হাস, হিয়াশোব, ত্রিভুবন জন মনরঙ্গে, আউলায় শরীরবন্ধ, কমললোচন, আলসিত আঁখি, অনিমিখ আঁখি, প্রেম পরবন্ধ, প্রাণ নিবেদন, কুরঙ্গ নয়নী চারু-কুঞ্জর গামিনী, মরাল গমন সুঠাম, লীলারসময় তনু, তরল চাহনি, সরস নয়ান, কৌতুকরভসে, জগমনমোহিনী, তরল নয়ানবঙ্ক, আত্ম নিবেদন, আনন্দ হিল্লোল, অবাধ করুণা, করুণাকিরণ, শশী রঞ্জিত রজনী, অরুণনয়ান, পুলকে আকুল-তনু প্রেমে ডগমগি, বিহ্বল চেতন, যমুনাজল-সুশীতল বায়, প্রেমপরবশ চিত, অনঙ্গনয়ন, কাতর বয়ান, বিরহ অনলশ্বাস, অঝর নয়ন, অমিয়া মিশাল, হিয়া পরসাদ, মৌনী হয়ে রহে, সমুদ্র গম্ভীর, ভাবময় হৈলদেহ, হেমকিরনীয়া পঁহু, ইত্যাদি। ইহা হইতে কবির শব্দচয়ন-ক্ষমতা ও রচনা মাধুর্য্য অনুভব করা যায়।

"চৈতন্যমঙ্গলে" বহু শব্দদ্বৈতের উদাহরণ পাওয়া যায়, কয়টী উদ্ধৃত করিলাম :—

"লহ লহ বোল, বেরিবেরি, গদগদ, আধ আধ বোল, ঢুলিয়া ঢুলিয়া, হুলাহুলি, কাঁনা-কানি, আনসানি, গুরগর, ছলছল, ঢলঢল, লস লস আলসে, জরজর, টলবল, ধকধক, ঘানাঘুনা, ছুমছুম, ধাওয়াধাই।"

"শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে" কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার বানান ও গঠনে একটী প্রাচীন প্রাদেশিক ভাষার চিহ্ন মুদ্রিত দেখা যায় :—

"বন্দোঁ, নিবেদোঁ, বাড়িল, খুঞি, হঙ, সর্ব্বথায়, পাঞা, শুনিঞা, নিবেদঙ, ইথি, ইথে, সঙরণ, আউলায়, ধাএ, চিন্তা অগ্যে, কথু, কোঙরে, দঢ়াইল, ঠাকুরাল, নিবড়িল, কথোদিন, হঞাছে, নিয়ড়, বহুরী, সোঙরণ, বৈল, তথিঁ, কয়্য, বঙ্কিমনয়ান, বিনানিঞাবাণী, কাকুবাণী, ফেলাঙ, দেও, ঝুরে, লৈউটিলা প্রবন্ধ করিয়া কয়্য।" ইত্যাদি।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও তাঁহার রচিত "ধামালী" ও পদাবলীতেই তাঁহার কবিত্ব ও প্রেমাভিষিক্ত হৃদয়ের সমধিক পরিচয় পাওয়া যায়। কবি যেন ভাবে ও প্রেমে তন্ময় হইয়া আত্মহারা হইয়াছেন। তাঁহার মনে হইয়াছে যে লীলাময়ের বিশ্বরূপ লীলামণ্ডপে যেন কেবলমাত্র তিনি ও তাঁহার প্রাণেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গদেব। তিনি যেন চিরদাসী হইয়া তাঁহারই চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া আছেন। তাই কখনও প্রিয়তমের রূপে মুগ্ধ, বিরহে আকুল, মিলনে আত্মহারা, আবেগে উন্মত্ত, অভিমানে অধীর, ভক্তিতে আর্দ্র ও প্রেমে তন্ময় হইয়াছেন। মনবৃন্দাবনে এই মধুর রসধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

সে কবিত্ব কি সুন্দর! এই প্রেমপ্রবাহে, এই ভাবধারায়, কবিতার উৎস বলিয়া তাহা এত মধুর। প্রেমের ভিতর দিয়া অসীমের ভাব তাঁহার মনে ফুটিয়াছে বলিয়াই তাহা বিশ্ব-বিজয়িনী। বহুদিনের সাধনার ধন বলিয়া তাহা আমাদিগকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে।

লোচন দাসের কবিতা অত্যন্ত সরল খাঁটী বাঙ্গালা ভাষায় রচিত; তাহাতে অলঙ্কারের ঘনঘটা বা কল্পনার ছটা নাই। অলৌকিক শাব্দিকতা এবং ছন্দের ঝঙ্কারও তাহাতে বিরল। প্রেমের ভাষা ভাবসর্ব্বস্ব হৃদয়ের ভাষা বলিয়াই বোধ হয় তাহার কৃত্রিম বেশভূষার বড় একটা প্রয়োজন হয় নাই। ভাষা বড় স্বচ্ছ, বড় সরল, কিন্তু ভাব বড় গভীর অতলস্পর্শ! ভাবস্রোতে ডুবিলে কূল কিনারা পাইবার যো নাই।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর রূপ বর্ণনা উপলক্ষে কবি বলিতেছেন :—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥"

"প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গমোর" এই একটিমাত্র ছত্রে ক্ষমতাশালী কবি যে গভীরভাব, বিরহের তীব্রতা, আকুল মিলন লালসা, অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা অন্য কবির কাব্যে দুর্ল্লভ। অথচ হাহুতাশ নাই, বৃথা আড়ম্বর কিম্বা বিশাল বাক্‌জালের রচনা কুহেলি নাই, বিরহের বৃশ্চিক দংশন কিম্বা জ্বালাময়ী লালসার তীব্র শিখা নাই। ইহাই লোচনদাসের বিশেষত্ব। একস্থলে কবি বলিতেছেন :—

"আমার নয়ন বলে ওরূপ দেখে আসি।
আমার মন বলে তার হইগে দাসী॥
করি নয়নপথে আনাগোনা।
আমার পাঁজর কেটে করলে থানা॥"

গৌরাঙ্গের রূপবর্ণনা উপলক্ষে কবি বলিতেছেন :—

"ও বা কে রসের দে, রূপের সীমা নাই।
কোন্ বিধি, রূপের নিধি কৈল এক ঠাই॥
যুগ্ম ভুরু, কামের গুরু ছাড়ছে ফুলের বাণ।
কেমন কুরি ধরে তুলি করেছে নির্ম্মাণ॥
আঁখির তল নিরমল নীলকমলের দল।
অরুণতা দুটী পাতা করছে ছলছল॥
তিল ফুল কিসে তুল এমনি নাসার শোভা।
কুঁদে কাটী পরিপাটী কিবা দন্তের আভা॥
হিঙ্গুল ভালে হরিতালে নবনী দিল ভেজে।
কাঁচাসোনা চাঁদখানা রসান দিল মেজে॥
আলতা তুলি দুধে গুলি কর দিয়াছে ছেনে।
চাঁদকে আনি ছানি ছানি তায় রসাল জেনে॥
রূপের নাগর রসের সাগর উদয় হ'লো এসে।
নাগরী লোচনের মন তাইতে গেল ভেসে॥"

স্থানান্তরে,

"চরণতলে অরুণ খেলে কমল শোভে তায়।
চলে চলে ঢলে ঢলে পড়্‌ছে সখার গায়॥
আমাপানে নয়নকোণে চাইল একবার।
মনহরিণী বাঁধা গেল ভুরুপাশে তার॥"

রূপমুগ্ধা কোন যুবতীর মুখে কবি বলিতেছেন :—

"অঙ্গঘটা রূপের ছটা পথে চলে যায়।
গৌররূপের ঠমক্ দেখে চমক লাগে গায়॥
হটাৎ কারে দেখ্‌তে গেলাম এমন কে তা জানে।
অনুরাগের ডুরি দিয়া মনকে ধৈরা টানে॥
"আমার গৌরাঙ্গ নাচে হেম কিরনিয়া।
হেমের গাছে প্রেমের রস পড়্‌ছে চুয়াইয়া॥
ঠারঠম্‌কা কাঁকালবাঁকা মধুর মাখা হাসি।
রূপ দেখিতে জাতিকুল হারাই হারাই বাসি॥
"প্রতি অঙ্গ নিরূপম কিদিব তুলনা।
হিয়ার আরতি মাত্র করিতে যোটনা॥"

এইরূপ অতি সহজ কথায় কবি আমাদের হৃদয়ে বিরহমিলনের যে বিচিত্র কাহিনী ধ্বনিত করেন তাহার তুলনা নাই।

অত্যন্ত সহজ গ্রাম্যভাষায় কবি বিরহিনীর কথায় কেমন সুন্দর হৃদয়ের ব্যথা প্রকাশ করিয়াছেন :—

"ছনছনানি মনলো সই ছটফটানি প্রাণ।"

স্থানান্তরে,—

"প্রাণ ছন্‌ছন্‌ করে আমার মন ছন্‌ছন্‌ করে।
আধকপালে মাথার বিষে রৈতে নারি ঘরে॥
লোচন বলে কাঁদিস্ কেন ঢোক্ আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে গোরাচাঁদে মনডুবায়ে ধর॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ কথা কহিতেছেন, তাহাতে লোচনদাস বলিতেছেন তাঁহার মনে হয় "চাঁদ যেন উগারয়ে সুধা।"

আর কত উদ্ধৃত করিব—সুন্দর কুসুম-স্তবকের কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টী দেখাইব? সকল পদগুলিতেই লোচনদাসের অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু সকল গুলির ভিতরেই এমন একটা সরলতা, আন্তরিকতা ও হৃদয়ের ভাষা উপভোগ করা যায়—যাহা চণ্ডীদাস ভিন্ন অন্য বৈষ্ণব কবির কাব্যে দুর্লভ। কবি এইরূপে সহজ কথায় গভীর ভাব প্রকাশ করেন। রচনার কোথাও কোনও যত্ন বা বিন্দুমাত্র আয়াস উপলব্ধি হয় না, তাহা যেন আরণ্য কুসুমের মত স্বতঃ বিকশিত হইয়া সুবাসে দশদিক আমোদিত করে। কবি হৃদয়ে যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা যেন যত্ন করিয়া পরিবেশন করেন নাই। তাহা আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। ভাবনির্ঝরিণী হৃদয় ছাপাইয়া বহিয়া চলিয়াছে। তাহা যেন স্বতঃ উৎসারিত ভোগবতী ধারা, তাহা যেন কবি-কল্পনার পারিজাত ছায়াস্নিগ্ধভাব মন্দাকিনী। তাই ভাষা-সম্পদে ও ছন্দের ঝঙ্কারে কবি-তাকে কোথাও কৃত্রিম রূপলাবণ্যে ভূষিত করিতে হয় নাই—শব্দ ও ধ্বনি যেন স্বেচ্ছায় ভাবকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। তাঁহার প্রিয়তমের বিষয় বর্ণনা করিতে করিতে ভাব-সরোবর উচ্ছ্বসিত হইয়া যেন হৃদয়ের দুই কূল ছাপাইয়া দেয় এবং তাহাতে তাঁহার চিরারাধ্য দেবতার রাতুলচরণ দুখানি রাখিবার জন্য কি সুন্দর কবিত্বের ফুল্ল শতদল ফুটিয়া উঠে। উদাহরণের দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট করিতেছি :—

"এহেন সুন্দর গোরা কোথা বা আছিলগো
কে আনিল নদীয়া নগরে।
নিরখিতে গৌররূপ হৃদয়ে পশিলে গো
তনু কাঁপে পুলকের ভরে॥
ভাবের আবেশে ওলো এলায়ে পড়েছে গো
প্রেমে ছল ছল দুটি আঁখি।
দেখিতে দেখিতে আমার হেন মনে হয় গো
পরাণপুতলি করে রাখি॥
বিধি কি আনন্দনিধি মথি নিরমিল গো
কিবা সে গড়িল কারিকরে।
পীরিতি কুঁদের কুঁদে উহারে কুঁদিল গো
উহার নয়ন কুঁদিল কাম-সরে॥"

কিন্তু এত করিয়াও কবির রূপ বর্ণনা যেন সমাপ্ত হইল না, চিত্রাঙ্কনে বুঝি বর্ণের অভাব হইল। কবে প্রেমিকের প্রিয়তমের চিত্র অঙ্কিত করিয়া হৃদয়ের আশা মিটিয়াছে? পুনশ্চ তাই কবি বলিতেছেন :—

"অমিয়া মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো
তাহাতে গড়িল গোরা দেহ।
জগৎ ছানিয়া কেবা রস নিঙারিল গো
এক কৈল সুধুই সুনেহ॥
অথও পীযূষ ধারা কেবা আওটিয়া গো
সোনার বরণ কৈল চিনি।

সে চিনি মথিয়া কেবা এ ফেণী তুলিল গো
হেন বাঁসি গোরা অঙ্গখানি।
বিজুরী বাটিয়া কেবা গাখানি মাজিল গো
চান্দে মাজিল মুখখানি।
লাবণ্য বাটিয়া কেবা চিত্র নিরমান কৈল
অপরূপ রূপের বলনী॥
সকল পূর্ণিমার চান্দে বিকল হইয়া কান্দে
করপদ-পদ্মিনী গন্ধে।
কুড়িটি নখের ছটা জগৎ আলা কৈল গো
আঁখি পাইল জনমের অন্ধে॥
সকল রসের রাস বিলাস হৃদয় খানি
কেবা গড়াইল রঙ্গ দিয়া।
মদন বাঁটিয়া কেবা বদন গড়িল গো
বিনিভাবে মো মলুঁ কাঁদিয়া॥
নাচাহে আঁখির কোণে সদাই সবায় ভনে
দেখিবারে আঁখি পাখী ধায়।
আঁখির পিয়াসা দেখি, মুখের লালস গো
আলসত জর জর গায়॥"

স্থানান্তরে :—

"অরুণ কমল আঁখি তারকা ভ্রমর পাখী
ডুবু ডুবু করুণা মকরন্দে।
বদন পূর্ণিমার চাঁদে, ছটা হেরি প্রাণ কাঁদে
কত মধু মধুর্য্যানুবন্ধে॥"

অন্যস্থানে—নিত্যানন্দের রূপ বর্ণনায় কবি বলিতেছেন :—

মথিয়া লাবণ্য সিন্ধু, তাহে নিঙারিয়া ইন্দু
সুধা দিয়া মুখানি গড়িল।
"নবকঞ্জদল আঁখি তারকা ভ্রমর পাখী
ডুবি রহ প্রেম মকরন্দে॥"

কথনও কবি অনন্তরূপগুণসাগরের সীমা না পাইয়া উচ্ছ্বাসে বলিতেছেন—

শুন ওগো প্রাণসই জগতে তুলনা কই
তবে সে তুলনা দিব কিসে।
জগতে তুলনা নাই যার তুলনা তার ঠাঁই
অমিয়া মিশাবো কেন বিষে?
কেবা তার গুণ গায় গুণের কে ওর পায়
করে কেবা রূপ নিরূপণ।
রূপ নিরূপিতে নারে গুণ কে কইতে পারে
ভাবিয়া বাউল হইল মন॥
পক্ষী যেন আকাশের, কিছুই না পায় টের
যতদূর শক্তি উড়ে যায়।
সেই রূপ গোরাঙ্গের, রূপের না পায় টের
অনুসারে এ লোচন গায়॥"

কথনও কবি মহাভাবে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কল্পনা-আলোকে দেখিতেছেন যে শুধু তিনি নহেন, অণুপরমাণু হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত যেন সেই মহাপুরুষের প্রেমে নৃত্য করিতেছে। সমস্ত চরাচর যেন তাঁহারই সৌন্দর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত, জগৎ বেড়িয়া যেন তাঁহারই প্রেম-ধারা ক্ষরিত হইতেছে তথা :—

"চাঁদ নাচে সূর্য্য নাচে আর নাচে গোরা।
পাতালে বাসুকী নাচে বলে গোরা গোরা॥"

কথনও আধ্যাত্মিকতার চরমশিখরে উঠিয়া কবি বলিতেছেন, হে প্রভু তোমাতে আমাতে যে প্রেম, সে প্রেম হে-প্রেমময় তোমারই প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গ মাত্র। তাঁহারই রূপ ও গুণের ভিতর দিয়া কবি অসীম সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন; নিজভাব মহাভাবে লয় হইয়াছে। সসীম অসীমে মিশিয়াছে। কবি বলিতেছেন :—

"এমন এ বিনোদিয়া কোথাও না দেখি গো
অপরূপ প্রেম বিনোদে।

প্রকৃতি পুরুষভাবে কান্দিয়া আকুল গো

রমণী কেমনে প্রাণ বান্ধে॥"

তাই হউক, কবি করযোড়ে বলিয়াছেন যে তাঁহার প্রাণের দেবতার রাতুল দুটী পদ-কমলে তিনি যেন মত্ত মধুকর হইয়া থাকেন, তাহা হইলেই তাঁহার সব বাসনা তৃপ্ত হইবে, সব কামনা পূর্ণ হইবে, তাঁহার অন্য কোন প্রার্থনা নাই :—

"কর জুড়ি বোল পঁহু ওপদ কমল মহু

মধুকর করি দেহ বরণ"

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

আঁদিয়া আপ্পাজী।

পোর্টুগাল দেশবাসী প্রসিদ্ধ বণিক পিদ্‌মো (Piedmont) সাহেব সর্ব্বপ্রথমে আপ্পার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইউরোপে প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন Appa's life reads like a romance অর্থাৎ আপ্পার জীবনচরিত উপন্যাসের ন্যায় কৌতুকাবহ। আমরা সেই আপ্পার জীবন সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব।

সুপ্রসিদ্ধ কান্যকুব্জ (কনোজ) নগরে এক প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশে আপ্পাজী জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পূজ্যপাদ জনক মহাশয় তদ্দেশীয় হিন্দু নরপতির সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর প্রধানাচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আপ্পাজীর শৈশবকালে তাঁহার পিতৃদেবের মৃত্যু হয় এজন্য জ্যেষ্ঠতাত মহোদয় দ্বারা তিনি প্রতিপালিত হয়েন। বাল্যকাল হইতেই আপ্পার দেহে প্রভূত বলের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হয়; যুবাকালে তিনি একজন অতীব শৌর্য্যশালী বীর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই সময়ে কনোজের নরপতি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে সস্ত্রীক দেশান্তরে গমন করায় রাজার কনিষ্ঠ সহোদর মহাশয় সিংহাসনাধিরোহণ করিয়া রাজার আদেশানুসারে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে থাকেন। সুযোগ্য নরপতি দূরবর্ত্তী বিদেশে গমন করিবার অব্যবহিত কাল পরে মুসলমানেরা কনোজ নগরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে হিন্দুদিগের উপরে প্রবলভাবে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, মুসলমানদিগকে দমন করিবার কোন প্রকার ব্যবস্থা না করিয়া, অস্থায়ী রাজা, অত্যাচারী মুসলমান দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হিন্দু গৃহস্থের ধনরাশির অংশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। প্রজারা ইহাতে রাজবিদ্রোহী হইয়া আপ্পাজীর শরণাগত হইল। একদিবস প্রাতঃকালে প্রতিনিধি রাজা গঙ্গাস্নান করিয়া কয়েকজন ভৃত্যসহ পদব্রজে নদীতট হইতে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন এমন সময়ে পথিমধ্যে আপ্পাজী তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে মুষ্ট্যাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজাও দৈহিক

সামর্থ্যে কমতর ছিলেন না, সুতরাং উভয়ে প্রবল মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু অবশেষে আপ্পাজী জয়ী হইয়া রাজাকে প্রাণে বধ করিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে আপ্পা ও তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, কিন্তু ঐ আদেশ কার্য্যে পরিণত হইবার অগ্রেই আপ্পাজী এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় কনোজ পরিত্যাগ করিয়া সংগোপনে দেশান্তরে পলাইয়া যান। আপ্পাজী বা আপ্পালালের জ্যেষ্ঠতাতের নাম ছিল—নন্দদুলাল।

অনেক দেশ বিদেশ পরিব্রজন করিয়া আপ্পালাল মহারাষ্ট্র প্রদেশে উপনীত হন। বর্ত্তমান কালে যাহাকে বোম্বাই কহা হইয়া থাকে, সে সময়ে তাহাকে মুম্বই নগরী কহা হইত। এই প্রাচীনা মুম্বই নগরীর ৫০ ক্রোশ পশ্চিমে সমুদ্রকুলে অন্দিয়া নামে এক সুবৃহৎ গ্রাম ছিল, এখনও ঐ গ্রাম ক্ষুদ্রাকারে বর্ত্তমান থাকিয়া আঁদিয়া আপ্পার মহতী কীর্ত্তিমালার পরিচয় দিতেছে। ইহার ইংরাজী নাম Andiah (আণ্ডিয়া), কেহ কেহ অপভ্রংশে আঙ্গিরিয়াও কহিয়া থাকে। প্রবলপরাক্রান্ত মহারাষ্ট্র রাজার হস্ত হইতে কৌশলে এই গ্রামটিকে নিজের করতলগত করিয়া আপ্পাজী এই স্থানে বসতি স্থাপন করেন এবং স্বল্পকাল মধ্যে "আঁদিয়া সর্দ্দার" (অধিপতি) উপাধিতে বিঘোষিত হয়েন। তিনি আন্দিয়া গ্রামের মালিক হইয়াছিলেন বলিয়া আঁদিয়া আপ্পানামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। মহারাষ্ট্রীয় বীরেরা তাঁহার অসাধারণ পরাক্রম, বুদ্ধিকৌশল ও শৌর্য্যবীর্য্য দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন সুতরাং পেশাওয়া সর্দ্দারগণ তাঁহার বিরাগভাজন হইতে আদৌ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন না। আপ্পাজী কনোজ-ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রগণ ঐ শ্রেণীভুক্ত নহেন, এই জন্য অথবা স্বাতন্ত্র্য বুঝাইবার জন্য আপ্পাজী মহাশয় "কনোজী" বলিয়াও সামাজিক ভাবে আখ্যাত হইতেন। দুই বৎসর কাল পরে, আপ্পার পিতৃসহোদর ঐ স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

পাঠকদিগের বোধহয় জানা আছে, বাঙ্গালার নবাব সেরাজুদ্দৌলার মাতামহ যখন রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন দৌহিত্রকে সম্মুখে উপবিষ্ট করাইয়া কহিতেন—"হে সিরাজ! এই যে শ্বেতকায় মানবগণকে বিচরণ করিতে দেখিতেছ ইহারা কেবল দেশবৈরী নহে, পরন্তু ইস্‌লাম-সামর্থ্যের অধঃপতনের মূলীভূত কারণ। ইহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত না করিলে মুসলমান রাজ্যের মঙ্গল নাই। আমার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া তুমি সর্ব্বপ্রথমে এই শ্বেতকায়দিগকে বিদূরণ করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিও।" মাতামহের মরণ হইলে সিরাজের মনোমধ্যে শ্বেতকায় মনুষ্যগণকে প্রদমিত করিবার ইচ্ছা নিশিদিন বলবতী থাকিত এবং সেই ইচ্ছানুসারেই তাঁহার স্বল্প রাজত্বকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। আপ্পার জ্যেষ্ঠতাত ভবলীলা সম্বরণ করিবার সময়ে আপ্পাকে ঠিক্ ঐরূপ কথাই কহিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন "বৎস! নীলাকাশে শুভ্রকায় বকপুঞ্জের ন্যায়, নীলোর্ম্মিমালা সমাচ্ছন্ন সমুদ্রজলে এই যে শ্বেতকায় পুরুষদিগকে দেখিতেছ, ইহারা ক্রমশঃ জল পরিত্যাগ করিয়া তটে আসিবে, তদনন্তর নগরে প্রবেশ করিবে,

তাহার পরে গ্রামে যাইবে এবং তদনন্তর অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বিনাশ করিবে। তুমি ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম রক্ষা করিও, হিন্দু হইয়া হিন্দুয়ানী রাখিও এবং ভারতবাসী হইয়া ভারতের স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিও, ইহাতে তোমার ইহকালে ও পরকালে কল্যাণ হইবে। ইহারা কেবল ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের শত্রু নহে পরন্ত সমস্ত ভারতের মহাবৈরী। দেখিতেছ না, দেশীয় বাণিজ্য ও ব্যবসায়ে ইহারা উত্তরোত্তর কিরূপ হস্তক্ষেপ করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে ?" পাঠক! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখনকার স্বদেশী, বন্দেমাতরং ও বয়কট্ দলের লোকেরা যাহা করিতেছে বা ভাবিতেছে, প্রায় কিঞ্চিৎ ন্যূন দুইশত বর্ষ কাল পূর্ব্বে একজন বৃদ্ধ হিন্দু-স্থানী ব্রাহ্মণ মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া সেই কথা ভবিষ্যৎ বক্তার ন্যায় ভাবিয়া গিয়াছিলেন। নন্দদুলালের মৃত্যু হইল বটে কিন্তু আঁদিয়া আপ্পাজী তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের শেষবাণী স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রহিলেন।

আঁদিয়া আপ্পাজী সর্ব্বপ্রথমে ভয় দেখা-ইবার জন্য পর্টুগীজদিগের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণিজ্যপোত আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিলেন। পর্টুগীজেরা ভীত হইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিল, কিন্তু তাহারা ইহাকে "ক্ষিপ্ত" বা পাগল বলিয়া ভাবিতে লাগিল। অন্যান্য ইউরোপীয় জাতীয় বণিকেরাও আপ্পাকে উদ্ধত ও ক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। পাঠকমহাশয়দিগের বোধহয় জানা আছে, ইউরোপীয়শক্তি (Powers) যেখানে অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগে ভীত হয়েন অথবা সমর-সজ্জায় গমন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন, সেখান-কার রাজা, সম্রাট বা নায়কগণকে তাঁহারা অপশব্দের বিশেষণে আখ্যাত করিতে বিস্মৃত হয়েন না। আফ্রিকার সেই মহাবীর ও দুর্দ্দান্ত মোল্লা এই কারণে ইংরাজের নিকট Mad Mollah ক্ষেপা মোল্লা নামে অভি-হিত; আফগানিস্তানের দোস্ৎ মহম্মদ আমীর সাহেবও এই কারণে শ্বেতকায়গণের দ্বারা Fanatic Pathan বলিয়া আখ্যাত হইতেন এবং এই জন্য তুরস্কের দিগ্বিজয়ী সম্রাট এখনও Sick man বলিয়া ইউরোপীয়গণের দ্বারা উপহসিত হয়েন; সুতরাং আঁদিয়া সর্দ্দার সাহেব "ক্ষেপা" বলিয়া অভিহিত হইবেন, ইহা তো কিছু বিচিত্র কথা নহে !! যাহাহউক, স্বল্পকাল মধ্যে যখন বড় বড় বাণিজ্যপোত আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইতে লাগিল এবং কোন জাহাজই নিস্তার পাইতে লাগিল না, তখন নিতান্ত নিরাপদ দেখিয়া ইউরোপীয় নাবিক ও বণিকেরা আঁদিয়ার বিরুদ্ধে জলযুদ্ধের ঘোষণা করিলেন। কয়েকজন মহারাষ্ট্রীয় রাজা ইতিপূর্ব্বে আপ্পাজীর উপরে ক্রুদ্ধ ছিল, বিশেষতঃ আন্দি পরগণা মহারাষ্ট্রাধিকার হইতে বিচ্যুত হওয়ায় আপ্পাজী অনেকের বিরাগভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন, সুতরাং কতিপয় মহারাষ্ট্রীয় নরপতি ইউরোপীয়দের সহিত যোগ দিয়া আপ্পাজীর বিরুদ্ধে অসিধারণ করিল। আপ্পা সর্ব্বপ্রথমে মারাট্টাদিগকে দমন করিয়া তাহাদের দুর্গ ও রণপোত হস্তগত করিয়া লইলেন। মারাট্টারা ভয়ে লুকাইয়া রহিল। আপ্পাজী প্রায় সতেরটি মহারাষ্ট্রীয় দুর্গের অধিপতি হইলেন, তন্মধ্যে সুবর্ণপুরের দুর্গ প্রধানতম। খৃষ্টীয় ১৭১০ অব্দে মহা-রাষ্ট্রগণ আঁদিয়ার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া

নীরব হয়েন এবং আপ্পার কোন কর্ম্মে বাধা দিবেন না বলিয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করেন। এই সুযোগে আপ্পাজী সমুদয় ইউরোপীয় বাণিজ্যপোত লুণ্ঠন করিয়া বিদেশীয় দ্রব্যসমূহকে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বোম্বাই নগরের নিকট হইতে গোয়া পর্য্যন্ত সমুদ্রোপকূলের সকল স্থানেই দুর্ভেদ্য দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত হইয়া সমুদ্রের খাঁরি অথবা ঘাট-পর্ব্বত-বিনিসৃত নদীর মোহনায় আপ্পাজীর যুদ্ধজাহাজ সর্ব্বদা সুসজ্জিত থাকিত। ঐ সকল জাহাজের অধ্যক্ষদিগের দৃষ্টিপথে কোন বিদেশীয় বাণিজ্যপোত পড়িবামাত্র তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিত। তখন ইউরোপীয়গণ কহিতে লাগিল He is a regular Pirate King অর্থাৎ আপ্পাজী একজন বাস্তব জলদস্যুপতি। চার্লস বুণ ও কমোডর ম্যাথিউ প্রভৃতি সুশিক্ষিত ইংরাজ যোদ্ধাগণকে ধৃত করিয়া আপ্পাজীর লোকেরা বন্দী করিল কিন্তু তাহারা "আর বিদেশীয় দ্রব্য আমদানী করিবে না" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করায় আঁদিয়া তাহাদিগকে কিছুকাল পরে নিষ্কৃতি দিবার আদেশ দেন। সালির্ভা নামক ফরাসী ঐতিহাসিক লেখক, আঁদ্রিয়ার জাহাজ ও নৌকার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। তিনি লিখিয়াছেন—

"They make in Bombay a peculiar kind of ship which they call Gerab or Grab. It contains three masts, a pointed prow and a bow spirit. Its crew consists of a Nakoda or nikodar (captain) and a few chlasys (khalasies) who are mainly Moorish Sailors. The Grabs are very strong aud they admirably endure the lurtenleiice of the sea. It appears that navigation was brought to some degree of perfection at a very early period in India. The pointed prow which distinguishes the grab belong to the Hindoo construction, and is not met with in any other country. The Portugese have imitated it in their Indian ships."—Solyvont's "Les Hindoos." (Translated into English).

অনুবাদ।—বোম্বাই নগরে ইহারা একপ্রকার অদ্ভুত তরণী প্রস্তুত করে, ইহার নাম গোরাব বা গ্রাব। ইহাতে তিনটি মাস্তল থাকে, সম্মুখভাগ সূচীর ন্যায়, তাহার বিদেশীয় নাম বোস্পিরীট। ইহাতে একজন নাখোদা বা পোতাধ্যক্ষ এবং কয়েকজন খালাসী (মুসলমান বা স্পেনদেশীয় মুর) নাবিক থাকে। এই তরণীতে বোঝাই হয়। ইহাতে বোধ হইতেছে, পূর্ব্বকাল হইতে ভারতবর্ষে নৌবিদ্যার উন্নতি হইয়াছে। গোরাবের সহিত কোনপ্রকার জাহাজের সাদৃশ্য নাই, ইহা অপূর্ব্ব। হিন্দুরা এই প্রকারে জাহাজ নির্ম্মাণ করে, পর্টুগিজেরা এক্ষণে ইহার অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইউরোপীয় নাবিকেরা মালাবার উপকূলে পলাইয়া গিয়া কিয়ৎকালের জন্য আঁদিয়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছিল কিন্তু বোম্বাই অঞ্চলে তাহাদের বাণিজ্য একেবারে

লোপপ্রাপ্ত হয়। আপ্পাজী অবশেষে মালাবার উপকূলে গিয়া ইহাদিগকে আক্রমণ করে, এই জন্য ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী মহাড়ম্বরে আপ্পার বিরুদ্ধে জলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু পরিণামে কোম্পানী বাহাদুর এই মহাবীরের নিকটে, এই স্বদেশপ্রেমিক ব্রাহ্মণের নিকটে, পরাজিত হইয়া ইহাঁকে একখানি পত্র লেখেন। এই লিপির প্রত্যুত্তরে আন্দ্রি আপ্পা যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার অবিকল ইংরাজি অনুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"You have raged the question of possessing another man's goods by piracy which is, in your Judgment, immoral and impious. I do not find the merchants exempt from this sort of ambition, for this is the way of the world. God gives nothing immediately from Himself, but takes from one to give to anothers. Whether this is right or not, who is able to determine? It little behoves the merchants, I am sure, to say our Government is supported by violence, insults, and piracies, for as much as Maharaja Sivaji making war against four kings founded and established his kingdoms. This was our introduction and beginning and whether or no by these ways this Government hath proved durable, your Excellency well knows, so likewise did your predecessors."—Duff's History of the Mahrattas.

অনুবাদ।—আপনারা লিখিয়াছেন, পরের দ্রব্য দস্যুতা করিয়া অপহরণ করা অধর্ম্ম। কিন্তু সওদাগরগণ কি এই দোষ শূন্য? এই তো সংসারের নিয়ম! ভগবান স্বয়ং কাহাকেও কিছু দেন না, তিনি একের লইয়া অপরকে দেন। বিধাতার এই নিয়ম বা কার্য্য অন্যায় কি ন্যায় কে তাহার বিচার করিবে? আমরা যে অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়া থাকি, একথা বলা তোমাদের সাজে না, কারণ তোমরাও ঐ দলভুক্ত। মহারাজা শিবাজী চারিজন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া স্বীয় রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইরূপে আমাদেরও সূত্রপাত হইয়াছে। এই উপায়ে আমরা স্থায়ী হইব কি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইব, তাহা আপনি বেশ জানেন এবং আপনার পূর্ব্বপুরুষেরাও জানিতেন না কি?

যাহাহউক ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী অবশেষে বার্ষিক পঞ্চলক্ষ মুদ্রা কর দিয়া আঁদিয়া আপ্পাকে সন্তুষ্ট করিতে বাধ্য হয়েন। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে আপ্পাজী পরলোক গমন করিলে তবে ইংরাজেরা ভারতসাগরে পুনরায় মস্তকোত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে কর্ণেল ক্লাইব, আড্‌মিরেল ওয়াট্‌সন প্রভৃতি বীরেরা সুবিধাপ্রাপ্ত হইয়া আঁদিয়ার সম্প্রদায়কে জলযুদ্ধে পরাজিত করেন এবং পুনর্ব্বার বিদেশী দ্রব্যের বাণিজ্যে প্রযত্ন হইতে সক্ষম হয়েন।

ইউরোপীয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত

করিতে না করিতে মারাত্মক রোগ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় আপ্পাজি নিতান্ত নিরাশান্তঃকরণে ভবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু কখন বিলাসী হয়েন নাই। পরোপকার ও স্বদেশপ্রেম তাঁহার অসাধারণ গুণ ছিল, তিনি সদাসর্ব্বদা দেশের হিতকল্পে ব্যস্ত থাকিতেন। স্বদেশের কল্যাণকামনা ভিন্ন তিনি এতবড় সাহসী ও বলবান বীর হইয়াও কখন অন্য কারণে অসি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার আবির্ভাব কালের পূর্ব্বে শ্রীপাদ গৌড়পাদ স্বামী নামক একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী বাঙ্গালী পণ্ডিত ভিন্ন আর কেহ দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য সংরক্ষণে এবং বিদেশীয় বণিকের হস্ত হইতে ভারতকে রক্ষার জন্য প্রযত্ন হয়েন নাই। "বেঙ্গলি" নামক ইংরাজি সম্বাদপত্রে প্রায় সার্দ্ধেক বৎসর কাল পূর্ব্বে আমি গৌড়পাদ স্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকাশ করিয়াছিলাম; ইনি সেই প্রসিদ্ধ গৌড়পাদ স্বামী যিনি সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

কপিলায় নমস্তস্মৈ যেনাবিদ্যাম্বুধৌ জগতি মগ্নে।
কারুণ্যাৎ সাংখ্যময়ী নৌরিব বিহিতা প্রতারণায়।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

তালীবনের ভারতে।

৮

মীনাক্ষী-দেবীর রত্নভাণ্ডার।

আজ আমি প্রত্যূষে সূর্য্যোদয় হইবামাত্রই (১) দেবালয়ে উপস্থিত হইলাম। এই প্রস্তরময় গোলোকধাঁধার প্রবেশ-পথগুলিতে ইহারই মধ্যে প্রাভাতিক জীবন-উদ্যমের স্ফূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। প্রবেশ-বীথীর ধারে ধারে, সমস্ত প্রস্তর-মঞ্চের উপর, ভীষণদর্শন প্রতিমা-সমূহের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত কুলাঙ্গির মধ্যে, ফুলের দোকানীরা কাজে বসিয়া গিয়াছে; গাঁদা ফুলের মালা গাঁথিতেছে, তাহার সহিত গোলাপ ফুল ও স্বর্ণসূত্র সংমিশ্রিত করিতেছে। অর্দ্ধনগ্ন লোকেরা যাতায়াত করিতেছে; সদ্যস্নাত ব্যক্তির আর্দ্র কেশ হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহাদের চক্ষে ধ্যানের ভাব,—ভক্তির ভাব। পবিত্র হস্তী, পবিত্র গাভী,—যাহারা তমসাচ্ছন্ন মন্দিরের কুট্টিমতলে বাস করে; পক্ষীগণ, যাহারা রক্তিম মন্দির-চূড়ার বিভিন্ন উচ্চ-অংশে নীড় বাঁধিয়া আছে, সকলেই এই প্রভাত-আলোকে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, ক্রীড়া করিতেছে;—পশুপক্ষীর মধ্যে—কেহ বা হম্বারব, কেহ বা

(১) বৃহৎ ঘেরের মধ্যে দুইটি মন্দির। যে মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত বড় উহা "সুন্দরেশ্বর" নামক শিবের নামে উৎসর্গীকৃত। অপরটি, বামদিকে, সরোবরের সম্মুখে, "পত্র-মরাল"—পার্ব্বতীর নামে উৎসর্গীকৃত। এই পার্ব্বতীর আর একটি নাম "মীনাক্ষী"।

বৃংহিত, কেহ বা কূজন, কেহ বা গান করিতেছে।

পূর্ব্বের কথামত পুরোহিতেরা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন; তাঁহারা আমাকে অন্ধকারময় মন্দিরের গভীরদেশে লইয়া গেলেন।

আমার সম্মুখে, একটা গুরুভার তাম্র-দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; উহাই মন্দিরের গুপ্ত অংশ। প্রথমে একটা দালান, তাহার দুই ধারে সারি সারি কৃষ্ণবর্ণ দেবমূর্ত্তি, গুহাগহ্বরের মত সমস্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন,—তাহার পরেই বিমল আলোকচ্ছটা, "স্বর্ণপদ্ম-সরোবর" নামে একটি পবিত্র পুষ্করিণী;—মুক্ত আকাশতলে, একটি চতুষ্কোণ গভীর জলাশয়; নামিবার জন্য, চারিধারে পাথরের সিঁড়ি; জলাশয়ের চারিদিকে, শোভন-সুন্দর স্তম্ভশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে; কতকগুলি খিলান-মণ্ডপ খোদাই-কাজকরা ও কতকগুলি খিলান-মণ্ডপ পবিত্র গম্ভীর বর্ণে রঞ্জিত; আর সারি সারি ঢাকা-বারাণ্ডা; এই বারাণ্ডাগুলি, ব্রাহ্মণদিগের গুপ্ত বিচরণ-ভূমি। এই বদ্ধ ঘেরের একটা দিক্, সুশীতল নীল ছায়ায় এখনও পরিস্নাত; অন্য দিক্, সূর্য্যের উদয়ে ইহারই মধ্যে পাটল-রাগে,—প্রাভাতিক সিন্দুররাগে রঞ্জিত হইয়াছে। এই সরোবরের চতুর্দ্দিকস্থ সারি সারি বারাণ্ডা-দালানের মাথা ছাড়াইয়া, ঊর্দ্ধে রক্তিম মন্দির-চূড়াগুলি সমুত্থিত;—সকল স্থান হইতেই এই চূড়াগুলি দেখা যাইতেছে; এই চূড়াগুলি বিভিন্ন ব্যবধানে ও বিভিন্ন উচ্চতায় অবস্থিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে এবং প্রত্যেক চূড়ার চারিধারে পাখীরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া বেড়াইতেছে; আর একটি সোনার গম্বুজও ঝিক্‌মিক্ করিতেছে—মন্দিরের যে স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যময়, যেখানে আমি কোন উপায়েই প্রবেশলাভ করিতে পারি নাই—এই গম্বুজটি তাহারই মাথায় অধিষ্ঠিত। অপূর্ব্ব সরোবর! নিষ্পন্দতা যেন মূর্ত্তিমতী! তীরস্থ কঠোর ও বিরাট দৃশ্যের মধ্যে এই সরোবরের জল যেন মৃত বলিয়া মনে হয়—উহাতে একটি রেখামাত্র নাই। চতুর্দ্দিকের স্তম্ভশ্রেণী, জলের উপর প্রতিবিম্বিত, দ্বিগুণিত, দীর্ঘীকৃত, ও বিপর্য্যস্ত ভাবে দেখা যাইতেছে। এই "স্বর্ণপদ্ম-সরোবর",—এই তপন-তারা জলদ-রাজির দর্পণ—যাহা বিরাট মন্দিরের হৃদয়-দেশে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত—এইখানে এমন একটি শান্তির ভাব সর্ব্বত্র ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে যে তাহা বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। এই সমস্ত খিলান-মণ্ডপের গোলোকধাঁধার মধ্যে, কোন্ পথ দিয়া, পুরোহিতেরা যে আমাকে লইয়া গেলেন, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা বৃথা। যতই আমি অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই যেন সমস্ত আমার নিকট অতিভারাক্রান্ত ও অতিমানুষিক বলিয়া মনে হইতে লাগিল;—সমস্ত মন্দির উত্তরোত্তর আরও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাক্‌লায় গঠিত। বিংশতি বাহুবিশিষ্ট দেবতা, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীবিশিষ্ট দেবতা—এই সমস্ত অসংখ্য বিরাট দেবমূর্ত্তি ছায়ান্ধকারের মধ্যে সারি সারি কতই যে চলিয়াছে তাহার শেষ নাই—তাহার কোন শৃঙ্খলাও নাই। আমি তাহার মধ্যদিয়া চলিয়াছি। যেন স্বপ্নে অতিকায় দৈত্যদের রাজ্যের মধ্যদিয়া—ভয়ানকের রাজ্যের মধ্যদিয়া চলিয়াছি। চারিদিকেই অন্ধকার, এবং আমাদের পদক্ষেপে

সমাধি-গহ্বরসুলভ মুখরতা যেন জাগিয়া উঠিল।

ক্রমাগতই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রতিমা—ক্রমাগতই বিরাট ব্যাপার নেত্রপথে পতিত হইতেছে; আবার সেই সঙ্গে বর্ব্বরোচিত অযত্ন তাচ্ছিল্য, বিষ্ঠা ও আবর্জ্জনা রাশি। মানুষ-প্রমাণ সমস্ত দেয়াল, দেয়ালের গাত্রনিঃসৃত অংশগুলা—সমস্তই কালিমাগ্রস্ত, আর্দ্রতা ও ময়লায় চিক্‌চিক্ করিতেছে। এই একটা বারাণ্ডা—ইহা গজমুণ্ডধারী গণেশের নামে উৎসর্গীকৃত; গণেশের পদতলে, শুণ্ডের নীচে, কতকগুলি ধূমায়মান প্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহারই আলোকে গণেশের বিকটাকার শরীরটা আলোকিত হইয়াছে। এই দেখ, একটা ভীষণ কোণে, ঘোর রাত্রিকালে, এই সকল বিকটাকার প্রস্তরমূর্ত্তির মধ্যে, এক পাল জীবন্ত পশু অবস্থিত, উহাদের নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে; একটা সমস্ত গো-পরিবার এখনও নিদ্রা যাইতেছে—যেন এখনও সূর্য্যের উদয় হয় নাই; মন্দিরকুট্টিমের যাণ্ উহাদের গোময়ে আচ্ছন্ন—তাহার মধ্যে পা পড়িয়া পা পিছ্‌লাইয়া যাইতেছে; ঘৃণিত বলিয়া কেহ তাহা বাহিরে নিক্ষেপ করিতে সাহস করে না,—কেন না, যাহা তাহাদের অঙ্গ হইতে নিঃসৃত; তাহাও তাহাদেরই ন্যায় পবিত্র। বড় বড় ডানা-ওয়ালা বাদুড় চাম্‌চিকা ভয়-চকিত হইয়া আমাদের মাথার উপর ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

আমার পথপ্রদর্শকেরা, কোন এক বিশেষ মুহূর্ত্তে, উৎকণ্ঠিত হইয়া তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল; সেই সময়ে আমরা একটা অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও তমসাচ্ছন্ন দালানের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলাম; সেই দালানের গভীর-দেশে কতকগুলা বিরাটাকার দেবমূর্ত্তি কতকগুলি দীপের আলোকে আমি 'চোরা-গোপ্তান্' দেখিয়া লইয়াছিলাম। আমাকে যাঁহারা লইয়া যাইতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একটি ব্রাহ্মণ, আমার নিকট আসিয়া মৃদুস্বরে আমাকে বলিলেন ঐটিই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র স্থান; আগে আমাকে বলেন নাই, পাছে আমি বেশী দেখিয়া ফেলি।

অবশেষে, এই গুরুপিণ্ডাকার স্তম্ভারণ্যের একটা জায়গায় আসিয়া পুরোহিতেরা থামিলেন: এই স্থানটি খুব বিশাল ও অন্ধকালো। কতকগুলা বৃহৎমন্দিরের মধ্যবর্ত্তী যেন একটা চৌমাথা রাস্তা। এইখানে অনেকগুলি দালানের কুট্টিম উদ্‌ঘাটিত ও সর্ব্বদিকে প্রসারিত হইয়া ক্রমে ছায়ান্ধকারে মিশাইয়া গিয়াছে। অখণ্ড প্রস্তরের বিরাটাকার বিগ্রহ সমূহ চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে; উহারা বল্লম, অসি, নরমুণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া আস্ফালন করিতেছে; উহারা কালো, চিক্‌চিকে, তেলা,—হস্তঘর্ষণে উহাদের উপর লম্বা-লম্বা দাগ পড়িয়াছে; উহারা লোকের গাত্রঘর্ম্ম শোষণ করিয়াছে! কতকগুলি বেদীর উপর, তাম্র ও রৌপ্য সামগ্রী ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; কতকগুলা পিতলের চূড়াকার সামগ্রী বহুশতাব্দিব্যাপী কালপ্রভাবে বাঁকিয়া গিয়াছে,—বোধ হয় পূর্ব্বে দীপাধার ছিল;—এই সমস্ত দেবীর রহস্যময় পূজার সামগ্রী। এবং ইহারই মাঝখানে, দীর্ঘকুন্তল ও নগ্নকায় ভিক্ষুকের জনতা; মন্দিরই ইহাদের প্রধান আড্ডা; রক্ষিগণ চীৎকার করিয়া, ঠেলাঠেলি করিয়া, উহাদিগকে সরাইয়া দিতেছে: কেন

না, ভিক্ষুকেরা কৌতূহলাকৃষ্ট হইয়া, এক প্রকার বেড়ার চারি ধারে ক্রমাগত ঠেলিয়া আসিতেছে; দুই দিক্‌কার দুইটা পিলপার দুইগাছা রসি বাঁধিয়া এই বেড়াটি সংরচিত।

আমার প্রবেশের জন্য, টানা রসির কিয়দংশ শিথিল করিয়া ভূমিতে নামাইয়া দেওয়া হইল, তাহার পর, পূর্ব্বের মত আবার সটানে বাঁধা হইল; আমি পুরোহিতদের সহিত রজ্জু-চক্রের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার সম্মুখে একটা বৃহৎ টেবিল কালো গালিচায় ঢাকা;—তাহারই উপর দেবীর অলঙ্কারগুলি স্তূপাকার। এই রাশীকৃত স্বর্ণ ও রত্নময় অলঙ্কারের নিকটে, উহারা আমাকে একটা আরাম-কেদারায় বসাইল; আমার গলায় গেঁদা ফুলের মালা পরাইয়া দিল; তাহার পর, পুরোহিতেরা আমার হস্তে অলঙ্কারগুলি দিতে আরম্ভ করিলেন; এই অলঙ্কারগুলি কোন গভীরতম গুপ্ত কক্ষ হইতে ঘণ্টাখানেকের জন্য বাহির করা হইয়াছে; তাঁহারা আমার হাতে অলঙ্কারগুলি স্পর্শ করাইতে লাগিলেন; এবং আমোদ করিয়া একটার পর একটা আমার জানুর উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বিবিধ বর্ণের মণিরত্নে খচিত ডজন্-ডজন্ ভারী-ওজনের সোনার মুকুট। অজগর সর্পের ন্যায়, মাণিক ও মুক্তার পাকানো হার, সহস্র বৎসরের পুরাতন বলয়। পুরাতন কণ্ঠমালাগুলা এত ভারী যে এক হাতে উঠানো কঠিন। রমণীরা কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য যে সব কলস ব্যবহার করে সেইরূপ বড় বড় কলস,—কিন্তু উহা পাতলা সোনার, এবং হাতুড়ী পিটিয়া গঠিত। বক্ষদেশ বিভূষিত করিবার জন্য নীলরত্নের একটী অতুলনীয় কবচ—বাদামের মত বড় বড় মসৃণীকৃত নীলকান্তমণি দিয়া বিরচিত। যে সময় তাঁহারা এই সব অপূর্ব্ব রত্ন ঐশ্বর্য্যে আমার হাত ভরিয়া দিতেছিলেন, সেই সময়ে দূর হইতে সঙ্গীত-লহরী আমার কাণে আসিয়া পৌছিতেছিল:—ঢাক-ঢোলের ঘোর গর্জ্জন, পবিত্র শঙ্খ ও শানাইয়ের বিলাপ-ধ্বনি। মধ্যে মধ্যে আমার পশ্চাতে ঘোর কোলাহল; ক্ষুধাতুর ভিক্ষুকদিগকে রক্ষিগণ তাড়াইতেছে; ভিক্ষুকেরা এতদূর ঠেলিয়া আসিয়াছে যে ভঙ্গুর দড়ির বেড়াটা ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে। আবার এই দেখ, হীরক-খচিত কতকগুলা ঘোড়ার রেকাব,—নিশ্চয়ই দেবীর অশ্ব-বাহনের জন্য গঠিত। এই দেখ কতকগুলা সোনার কৃত্রিম কাণ, তাহাতে সূক্ষ্ম মুক্তাগুচ্ছ; উৎসব-যাত্রাকালে দেবীর ভ্রূণাকার ক্ষুদ্র গোলাপী-মস্তকের দুই পাশে উহা আট্‌কাইয়া দেওয়া হয়। এই দেখ, কতকগুলা সোনার কৃত্রিম হাত ও কৃত্রিম পা; দেবী যখনই ভ্রমণার্থ মন্দির হইতে বাহির হয়েন, তখনই উহা তাঁহার ভ্রূণ-প্রায় ক্ষুদ্র হস্তপদের প্রান্তদেশে বাঁধিয়া দেওয়া হয়…

এই রত্নভারাক্রান্ত টেবিলের রত্ন-ঐশ্বর্য্য যখন সমস্তই দেখা হইয়া গেল, আমি মনে করিলাম এই বুঝি শেষ। কিন্তু না; ভীষণ মূর্ত্তিসমূহে পরিপূর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ বারাণ্ডাগুলার মধ্যদিয়া পুরোহিতেরা আমাকে একটা অঙ্গনে লইয়া গেলেন; সেখান হইতে তূরীনাদের মত ঘোর তীব্র শব্দ নিঃসৃত হইতেছিল; সেখানে লাল পোষাকে আচ্ছাদিত ছয়টা হস্তী, রদ্দুরে দাঁড়াইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল;

আমি আসিবামাত্রই, তাহাদের বৃহৎ ও স্বচ্ছ কর্ণরূপ তালপত্রের বীজনে ক্ষান্ত না হইয়া, আমার সম্মুখে নতজানু হইল। আমি প্রত্যেককে রৌপ্যমুদ্রা দিলাম; উহারা অতি সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র চক্ষু দিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিল এবং মুদ্রাটি উঠাইয়া লইয়াই, কতকগুলা বৃহৎ চামড়ায় 'কৃপোর মত', 'নড়বড়' করিতে করিতে চলিয়া গেল; আপনার খেয়াল-অনুসারে যেখানে খুসি চলিয়া গেল;—কেহ বা সুঁড়ি বারাণ্ডাপথে, কেহ বা মন্দিরের কুট্টিমতলে; এই মন্দিরের মধ্যে উহারা মুক্তভাবে বিচরণ করে।

তাহার পর, উহারা আমাকে মন্দিরের দালানে লইয়া গেল; উহার ছাদ-আদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাক্‌লায় গঠিত; দেখিলে মনে হয়, অতিকায় দৈত্যদিগের গুহাভবন; যে সকল ভৃত্য আমাদের সঙ্গে ছিল, তাহারা দেওয়াল বাহিয়া উঠিয়া দর্মার ঝাঁপ্‌গুলা সরাইয়া দিল, ঝাঁপ্‌গুলা অপসৃত হইলে, দেয়ালের গায়ে কোন কোন স্থানে আলো আসিবার ফুকোর-পথ দেখা গেল। কিন্তু তাহা থাকা-না থাকা সমান, ঠিক রাত্রির মত অন্ধকার,—দীপ জ্বালানো আবশ্যক।

কতকগুলি নগ্নকায় ক্ষুদ্র বালক, দীপ কিম্বা মশাল লইয়া দৌড়িয়া আসিল; এই মশাল-গুলা মান্ধাতা-যুগের, এই জ্বলন্ত মশালগুলি হইতে খুব ধোঁয়া উঠিতেছে; এইগুলি দীর্ঘ পিত্তলদণ্ড,—অগ্রভাগ শুঁড়ের মত বাঁকানো।

লোহার পতর-মারা একটা দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, সর্ব্বপ্রথমেই সেই ক্ষুদ্র বালকেরা প্রবেশ করিল…এখন আমরা দেবীর বিচিত্র পশু-শালায় উপস্থিত; জীবন্ত পশুর প্রমাণ একটা রূপার গরু, কতকগুলা সোণার ঘোড়া, সেই চির রাত্রির অন্ধকারেও চির আর্দ্র উষ্ণ-তার মধ্যে—সারি সারি সজ্জিত রহিয়াছে; বালকেরা আসিয়া সেই খোদিত মূর্ত্তিদের নিকট মশালের আলো ধরিল; সেই আলোকে গরু ও ঘোড়ার সাজের রত্নগুলি ঝিক্‌মিক্ করিতে লাগিল। উপরে—ভীষণ প্রস্তর-খিলানমণ্ডপে, পালোকহীন কতকগুলা ডানা ক্রমাগত সঞ্চালিত হইতেছে এবং সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু তীক্ষ্ণ শব্দ শুনা যাইতেছে;—বাদুড় চাম্‌চিকার ঝাঁক্ উন্মত্তভাবে ঘোরপাক দিতেছে।

লোহার পতর-মারা দ্বিতীয় দ্বার; রূপা ও সোণার পশুদের জন্য আর একটা ঘর।

তৃতীয় দ্বার এবং ইহাই শেষ-দ্বার। এই খানে একটি রূপার সিংহ, একটি সোণার প্রকাণ্ড ময়ূর—প্যাখোম তোলা; প্যাখোমের 'চোখ্‌গুলা' পান্না দিয়া রচিত; একটা রূপার গরু, তাহার মুখ নারীমুখের মত, কিন্তু আসল নারীমুখ অপেক্ষা অনেক বড়; হিন্দু রমণীর ন্যায়, কাণে ও নাসিকার অগ্রভাগে বিবিধ রত্নালঙ্কার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই ঘরের কোণে দেবীর একটা সোণার পাল্কী রক্ষিত; এই পাল্কীর গায়ে অনেক খোদিত কারুকার্য্য—হীরা ও মাণিকের ফুল উৎকীর্ণ। নগ্নকায় বালকেরা এই ঔপন্যাসিক রত্নবিভবের উপর তাহাদের মশাল ধরিল; এই মশালে আলো অপেক্ষা ধোঁয়াই বেশী, যাই হোক্ এই মশালের আলোকে কোথাও কোথাও স্বর্ণালঙ্কারের খুঁটি নাটিগুলি প্রকাশ পাই-তেছে, কোন কোন বহুমূল্য রত্ন হইতে অগ্নিচ্ছটা উচ্ছ্বসিত হইতেছে, কিন্তু মোটের

উপরের সমস্তই নিবিড় নৈশ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। দেয়ালগুলা মাকড়শার জালে বিভূষিত—স্থানে স্থানে পাথরের গুঁড়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, স্বেদ ও ঝঝর্ঝার গড়াইয়া পড়িতেছে; আর বাদুড় চাম্‌চিকায় জাগিয়া উঠিয়া, ক্রমাগত ঘোরপাক দিতেছে; কিন্তু তাহাদের ডানার শব্দ শোনা যাইতেছে না। কালো রঙ্গের কাপড় হইতে ছিন্ন একটা বড় টুকরার মত তাহাদের ডানা; সেই ডানার বাতাস উহারা আমাদের গায়ে লাগাইয়া চলিয়া গেল। এবং এক প্রকার তীব্র শব্দ করিয়া উঠিল, ইঁদুরের কলে ইঁদুর পড়িলে যেরূপ শব্দ করে কতকটা সেইরূপ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ষড়্দর্শন।

কোন বিষয় বলিতে হইলে, প্রথমত তাহার প্রয়োজন বলা আবশ্যক। তাহা না হইলে, শ্রোতৃবর্গ সে বিষয় শুনিতে, বিশেষ মনোযোগী হন না। সুতরাং শ্রোতৃবর্গের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সাধারণ ভাবে বক্তব্য বিষয়ের প্রয়োজন প্রদর্শন করিয়া, অভীষ্ট বিষয়ের বর্ণনা করাই কর্ত্তব্য। অতএব আমি প্রথমে প্রয়োজন সম্বন্ধে, দুই একটি কথা বলিয়া, অভিলষিত বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক যে সকল কার্য্য করিয়া থাকি তাহা আপাতত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। স্বার্থসাধক এবং পরার্থসাধক। যাহা নিজের দুঃখ নিবৃত্তি বা সুখ অথবা তাহার উপায় লাভের জন্যই করা হয় তাহা স্বার্থসাধক এবং যাহা পরের দুঃখ নিবৃত্তি, সুখ অথবা তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য করা হয় তাহা পরার্থসাধক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে কোন কার্য্যই পরার্থ মাত্র সাধক বলিয়া মনে হয় না। আমরা আত্মীয়বর্গের দুঃখ নিবারণ ও সুখ এবং শত্রুবর্গের দুঃখের জন্য সর্ব্বদা যে সব কার্য্য করিয়া থাকি তাহাতেও আমাদের স্বার্থ আছে। ঐ সমস্ত কার্য্যদ্বারাও আমাদের নিজের দুঃখ নিবৃত্তি বা সুখ হইয়া থাকে। আত্মীয়বর্গের দুঃখে ও শত্রুর সুখে কষ্ট হওয়া আত্মতত্ত্বানভিজ্ঞ মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যখনই আমরা আত্মীয়বর্গের দুঃখ বা শত্রুবর্গের সুখ হইতেছে এইরূপ অনুমান করি তখনই আমাদের দুঃখ উপস্থিত হয়, অনন্তর সেই আত্মদুঃখ প্রতীকার বা আত্মসুখ সম্পাদনের জন্য আমরা আত্মীয়ের দুঃখ নিবারণ বা সুখ এবং শত্রুর দুঃখ সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। সুতরাং পরার্থ কার্য্যে আমাদের স্বার্থ নাই, ইহা বলা সঙ্গত নহে। তবে স্বার্থসাধক ও পরার্থসাধক কার্য্যের এইরূপ প্রভেদসূচক লক্ষণ বলা যাইতে পারে, যে যাহা নিজ দুঃখনিবৃত্তি বা সুখ কিম্বা তাহার উপায় সম্পাদনের অভিলাষেই কৃত হয় তাহা স্বার্থ-

সাধক কার্য্য এবং যাহা পরের দুঃখ নিবারণ ও সুখ অথবা তাহার উপায় সম্পাদনদ্বারা, নিজ সুখ ও নিজ দুঃখনিবৃত্তি অথবা তাহার উপায় সাধনের অভিলাষে কৃত হয় তাহা পরার্থসাধক কার্য্য। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন পরার্থ কার্য্যে আমাদের কোনরূপ স্বার্থাভিলাষ থাকে না, পরের উপকার সম্পাদনেচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই, তাহা আমরা করিয়া থাকি। বাস্তবিক এই কথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ পরদুঃখের অনুমানদ্বারা যাহাদের মনে কোনরূপ কষ্টের উদয় হইয়া থাকে, তাহারাই পরের দুঃখ নিবারণের জন্য অভিলাষী হন। যাহাদের মনে কোনরূপ কষ্টের উদয় হয় না, তাহারা কখনও পরের দুঃখ নিবারণে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না; ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা না হইলে এই জগতের সকল মনুষ্যই পরের দুঃখ প্রতিকারের জন্য, সর্ব্বদা যত্নবান্ হইতেছেন, ইহা আমরা দেখিতে পাইতাম। যখন আমরা জগতের সকল মনুষ্যকে পরদুঃখ প্রতীকারে নিযুক্ত দেখিতে পাইতেছি না, তখন এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত যে যাহারা পরদুঃখে নিজকে দুঃখী বলিয়া মনে করেন, তাহারাই আত্মদুঃখ নিবারণের জন্য পরদুঃখ নিবারণের অভিলাষী হইয়া থাকেন। এবং পরের দুঃখ নিবারক উপায় উদ্ভাবনদ্বারা, আত্মদুঃখনিবারণের পথ পরিষ্কার করেন। অতএব এক্ষণে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে যে ইচ্ছাপূর্ব্বক আমরা যে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকি, তাহার সকলেরই মূলে আমাদের স্বার্থাভিলাষ আছে। স্বার্থাভিলাষ না থাকিলে কখনও তাহাতে আমরা প্রবৃত্ত হইতে পারি না। এখন স্বার্থ কি এই বিষয়ে দুই একটি কথা বলিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের অবতারণা করিতে প্রবৃত্ত হইব। 'স্বার্থ' এখানে দুইটি শব্দ আছে, 'স্ব' ও 'অর্থ'। 'স্ব' শব্দের প্রতিপাদ্য আত্মা এবং অর্থ শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থনীয় অর্থাৎ বাঞ্ছনীয়। যাহা রক্ষা করিতে বা যাহা পাইতে আমাদের আত্মা সর্ব্বদা বাঞ্ছা অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, তাহারই নাম স্বার্থ বা আত্মার প্রয়োজন। শাস্ত্রকারগণ এই প্রয়োজনকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। স্বতঃ প্রয়োজন ও গৌণ-প্রয়োজন। সুখ, দুঃখনিবৃত্তি ও আত্মস্বরূপ রক্ষা স্বতপ্রয়োজন। উক্ত স্বতপ্রয়োজন সম্পাদনেচ্ছায় ভোজনাদি যে সকল ক্রিয়া আমাদের অভিলষিত হয়, তাহার নাম গৌণ-প্রয়োজন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যে আত্মস্বরূপ রক্ষা স্বতপ্রয়োজন নহে, দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখের উপায় বলিয়া তাহা গৌণ-প্রয়োজন। কিন্তু বিশেষরূপে বিবেচনা করিলে বোধ হয় এই কথা তত সঙ্গত নহে। কারণ সুখাদির কোনরূপ অভিলাষ না থাকিলেও, আত্মরক্ষার জন্য, সর্ব্বদা আমাদের আকাঙ্ক্ষা বলবতী। অদ্বৈতবাদি বৈদান্তিকগণের মতে, আত্মা নিত্য সুখস্বরূপ অতএব তাহাদের মতে, আত্মরক্ষা সুখস্বরূপ সুতরাং তাহা স্বতঃ-প্রয়োজন, ইহা বলিতে কোনওরূপ আপত্তিরই সম্ভাবনা নাই। মুক্তিনিরূপণে এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। এইক্ষণে পূর্ব্বোক্ত বিচারদ্বারা, ইহা সিদ্ধান্তিত হইতে পারে, যে প্রয়োজন না থাকিলে, কেহই ইচ্ছাপূর্ব্বক, কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না।

অতএব এইক্ষণে ইহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য, যে দর্শন শাস্ত্র কখনও শ্রবণের, কোন-

রূপ প্রয়োজন আছে কি না? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ইচ্ছাকৃত কার্য্য মাত্রই, প্রয়োজনাভিলাষ সমুদ্ভূত সুতরাং দর্শনশাস্ত্র কথনে ও শ্রবণে, বক্তা শ্রোতা উভয়েরই প্রয়োজন আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে, ইহা দেখা উচিত; যে উক্ত বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের মধ্যে, কাহার কি প্রকার প্রয়োজন অভিলষিত?

কারুণিক মনুষ্যগণ সর্ব্বদা পরের দুঃখে, দুঃখানুভব করিয়া থাকেন। যখনই তাঁহারা, মনে করিতে পারেন, যে অন্যের দুঃখ বা দুঃখকারণ উপস্থিত হইয়াছে, তখনই সেই দুঃখ বা তৎকারণের, বিনাশোপায় সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া, স্বীয় দুঃখ প্রতীকারের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

এই জগতে আমরা চতুর্ব্বিধ মনুষ্য দেখিতে পাই। কতক অজ্ঞান, কতক সন্দিগ্ধ, কতক ভ্রান্ত ও কতক যথার্থ জ্ঞানী। যাহার যে বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান নাই তাহাকে সে বিষয়ে অজ্ঞান, যাহার যে বিষয়ে সংশয় আছে তাহাকে সে বিষয়ে সন্দিগ্ধ, যিনি এক বস্তুকে তাহার বিপরীত ভাবে অর্থাৎ অন্য বস্তু বলিয়া জানেন, তাহাকে সে বিষয়ে ভ্রান্ত, ভ্রমনিশ্চয়পূর্ণ, বা বিপর্য্যস্ত, এবং যিনি যে বিষয় প্রকৃতরূপে বিশেষভাবে জানেন, তাহাকে সে বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানী বা নিশ্চিতমতি বলা যায়। যাঁহারা যথার্থ জ্ঞানী তাঁহারা উপদেশের পাত্র নহেন। প্রথমোক্ত ত্রিবিধ লোকই উপদেশের যোগ্য। কারণ তাহারা স্ব স্ব অজ্ঞানাদি, প্রভাবে কর্ত্তব্য পথ ভ্রষ্ট হইয়া দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইতে পারেন। আমাদের কারুণিক মহর্ষিগণ স্বসিদ্ধান্তিত বিষয় উপদেশ দ্বারা, উক্ত অজ্ঞানাদি ত্রিবিধ মনুষ্যের অবশ্যম্ভাবী দুঃখ প্রতিকারের পথ প্রদর্শন করাইয়াছেন। এবং তদ্দারা আত্মসুখ এবং পরদুঃখজনিত নিজ নিজ কষ্ট নিবারণে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং দর্শনশাস্ত্র প্রণয়নের স্বতঃ প্রয়োজন, শাস্ত্রকর্তৃগণের স্বদুঃখ নিবৃত্তি বা স্বসুখ সম্পাদন। এবং শ্রোতৃবর্গের দর্শনশাস্ত্র শ্রবণের স্বতঃ প্রয়োজন অজ্ঞানাদি জনিত স্ব স্ব দুঃখনিবৃত্তি বা সুখসম্পাদন। এইক্ষণে ইহা সিদ্ধান্তিত হইল যে দর্শনশাস্ত্র কথনও শ্রবণের স্বতঃ প্রয়োজন, বা চরম ফল, দুঃখ নিবৃত্তি বা সুখ।

দর্শনশাস্ত্র শ্রবণে কিরূপে আমাদের দুঃখ নিবৃত্তি বা সুখের কারণ হইতে পারে? যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক এইক্ষণে এই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা উচিত। তাহা না করিলে "দর্শনশাস্ত্রশ্রবণ সুখাদির কারণ" এই কথার উপর সাধারণের বিশ্বাস হইতে পারে না। বিশ্বাস না হইলে কেহই তাহা শুনিতেও প্রবৃত্ত হইবে না। সুতরাং শাস্ত্রশ্রবণের প্রয়োজন আছে, এই কথাতে সাধারণের বিশ্বাস উৎপাদনার্থ, যুক্তি প্রদর্শন আবশ্যক।

অজ্ঞান, সংশয় ও মিথ্যাজ্ঞান আমাদের দুঃখের কারণ। দর্শনশাস্ত্র শ্রবণ করিলে, তদীয় যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা, আমাদের অজ্ঞাত, সন্দিগ্ধ ও বিপর্য্যস্ত অর্থাৎ মিথ্যাভাবে জ্ঞাত বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং তাহা হইলেই আমাদের দুঃখকারণ অজ্ঞানাদি বিদূরিত হইয়া পড়ে সুতরাং তখন কারণ না থাকায় দুঃখ হইতে পারে না। বিশেষত কোন কোন স্থলে যথার্থ জ্ঞান হইলে আমাদের সুখও হইয়া থাকে। দর্শনশাস্ত্র শ্রবণ করিলে, আমাদের অজ্ঞানাদিজনিত দুঃখ নিবারণ, বা

বিমল সুখোদয় হওয়ার সম্বন্ধে, যে সকল যুক্তি, দার্শনিকগণ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, মুক্তি-নিরূপণে তাহার বিশেষ আলোচনা করা যাইবে। এস্থলে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা না করিয়া দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলাই আবশ্যক বোধ হয়।

আমাদের দেশে সম্প্রতি যে সকল দর্শন শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাঁহার মত সকল বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে, সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথমতই সে সমস্ত সূত্রাকারে লিখিত হয় নাই। সে সমুদয়ের বিচার প্রণালী অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িলে, কণাদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাহা সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়া শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। যিনি যে দর্শনের মত সূত্রাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন তিনিই সেই দর্শনের কর্ত্তা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। আমাদের দেশে যে সমস্ত শাস্ত্র প্রচলিত আছে তন্মধ্যে দর্শনশাস্ত্র যুক্তিপ্রধান। যুক্তিদ্বারা পদার্থ প্রতিপাদন করাই দর্শনশাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য। যে বিষয় যুক্তিসিদ্ধ নহে তাহা দার্শনিকগণ স্বীকার করেন না। বাহ্য জগতের তত্ত্ব নির্ণয় আমাদের দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। অন্তর্জগত্তত্ত্ব অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব নির্ণয় করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার কারণ সম্ভবতঃ এইরূপ হইতে পারে যে, দর্শন শাস্ত্রের রচনা সময়ে আমাদের দেশীয় সাধারণ লোকেরাও বাহ্য জগৎ বা জড় জগত্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত বিশেষ ভাবে অবগত ছিলেন। সে জন্য তাঁহাদের ঐ সকল বিষয় জানিবার জন্য তখন কোনরূপ সন্দেহই হইত না। অসন্দিগ্ধ বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রকারগণ কখনও কোনও উপদেশ প্রদান করেন না। যে বিষয় সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ, সে বিষয়ে তাঁহারা কোনরূপ উপদেশ প্রদান করিতে ইচ্ছুক নহেন। বিশেষত সে সময়ে বাহ্য জগত্তত্ত্ব সাধারণ্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট থাকিলেও, তদ্দ্বারা 'অনন্ত' সুখ বা অসীম দুঃখ নিবৃত্তির কোনরূপ সম্ভাবনা নাই, এই বিবেচনা করিয়া অসীম সুখ বা দুঃখ নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে তাঁহারা আত্মতত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আজকাল অনেকেই বলিয়া থাকেন যে আমাদের দেশে জড় বিজ্ঞানের চর্চ্চা ছিল না, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ভ্রমপূর্ণ বলিয়াই আমার মনে হয়। কারণ যে দেশে অন্তর্জগত্তত্ত্ব সম্বন্ধে অতুলনীয় যুক্তি ও যোগশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ নানাবিধ কৌশলাদি এক সময়ে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, সে দেশের লোক জড় জগত্তত্ত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ ছিলেন ইহা বিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। সংসার চক্রের গতি অনুসারে উন্নতির পর অবনতি এবং তৎপরে উন্নতি ও পুনঃ অবনতি। আমাদের দেশে জড়বিজ্ঞান উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিয়া এইক্ষণ অবনতির মুখে পতিত হইয়াছে। কালে তাহার পুনঃ উন্নতি হওয়া বিচিত্র নহে। ফল কথা আমাদের আর্য্য মহর্ষিগণ জড়বিজ্ঞানকে ক্ষণিক সুখের কারণ বলিয়া বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। তাঁহারা অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে অতিশয় প্রীতিপূর্ণ নেত্রে অবলোকন করিতেন। সম্ভবত সে জন্যই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনাসময়ে, জড়বিজ্ঞানের চর্চ্চা একবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল। এবং সেই বিলোপবশতঃ অদ্যাপি আমাদের দেশ জড় বিজ্ঞানানভিজ্ঞ ভাবে সময় যাপন করিতেছেন। অতএব আমাদের অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ মহর্ষিগণ জড়বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ ছিলেন

এইরূপ অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমার বিবেচনায় তাঁহারা জড় জগৎকে অতিশয় অকিঞ্চিৎকর মনন করিতেন। সেজন্য আমাদের দর্শন শাস্ত্রে বাহ্য বা জড় জগৎ সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিচার দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে অন্তর্জগত্তত্ত্ব আত্মতত্ত্বনির্ণয়ের উপযোগী বলিয়া কোন কোন স্থলে বাহ্য বিষয়ের বিচার অতি সংক্ষিপ্তভাবে করা হইয়াছে। আমরা সর্ব্বদা দুঃখ পরিহার ও সুখের আকাংক্ষা করিয়া থাকি। যে সমুদয় বাহ্যবস্তু আমাদের দুঃখ নিবারণ বা সুখ সম্পাদনে সমর্থ মনে করি প্রকৃত পক্ষে সে সমুদয় সকল সময়ে আমাদের সুখাদি সম্পাদন করিতে পারে না। আজ যে বস্তু আমাদের সুখের কারণ হইয়াছে সেই বস্তুই সময় বিশেষে দুঃখেরও কারণ হইয়া থাকে। আজ যে অর্থ আমাদের সুখের কারণ, তস্করকর্ত্তৃক অপহৃত হইলে, তাহাই আবার দুঃখের কারণ হইয়া থাকে! বিশেষত অর্থাদি বাহ্য উপায়দ্বারা, আমাদের যে দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ হইয়া থাকে, তাহা দুঃখমিশ্রিত; কারণ অর্থাদির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং ভাবী বিনাশ জনিত কষ্ট, তখন ও আমাদের মনকে ক্লিষ্ট করে। আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে দুঃখনিবৃত্তি বা সুখ সমুদ্ভূত হইলে, ভাবী দুঃখের কোনরূপ সম্ভাবনা থাকে না। ইহা মুক্তি নিরূপণে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

বাহ্য জগৎ, আমাদের স্বতপ্রয়োজনের (দুঃখ নিবৃত্তি বা সুখের) কারণ নহে, একমাত্র আত্মতত্ত্বজ্ঞানই তাহার কারণ, ইহা দেখাইবার জন্য উক্ত বিষয় সমুদয় আলোচিত হইল।

কোন্ সময় হইতে আমাদের দেশে দর্শন শাস্ত্র প্রচলিত হইয়াছে তাহা স্থির করা বড়ই কঠিন। এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে অতি প্রথমে এদেশে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই বেদচতুষ্টয়ের বিশেষ সমাদর ছিল। তখন প্রায় সকলেরই এইরূপ ধারণা ছিল যে বেদ সকল স্বতঃ প্রমাণ। কালক্রমে কতক লোকের মনে বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে সংশয়ের উদয় হয়। তখন সেই সংশয়ের দূরীকরণমানসে, যুক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, কতক ব্যক্তি বেদের প্রামাণ্য এবং কতক ব্যক্তি বেদের অপ্রামাণ্যসাধক যুক্তি প্রদর্শন করেন। যাহারা বেদপ্রামাণ্যসাধক যুক্তির পক্ষপাতী তাহারা আস্তিক এবং অপ্রামাণ্য বিষয়ক যুক্তিবাদিগণ নাস্তিক নামে পরিচিত হইলেন। বেদপ্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যবাদিগণের পরস্পর বিচারদ্বারা তাহাদের পরস্পরের অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি সকল বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইল, তখন আস্তিক ও নাস্তিক উভয় দার্শনিকই নিজ নিজ মত সমুদয় সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেন। যখন সকল দার্শনিকই বেদের প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্য সম্বন্ধে, বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্ত বিচার করিয়াছেন, তখন বেদপ্রচারের পর দার্শনিক মত প্রচারিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত।

এক সময়ে সকল দর্শনের মত সূত্রাকারে লিখিত হয় নাই। কিন্তু সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই দার্শনিক মত সকল প্রচারিত ছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, সকল দার্শনিকই, স্ব স্ব মত সংস্থাপন সময়ে, অন্যের মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। খণ্ডনীয় মত সকল তৎপূর্ব্বে প্রচারিত না থাকিলে, এইরূপ খণ্ডন কখনও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

প্রত্যেক দর্শন সম্বন্ধীয় বিচারের সময়ে, সেই সকল দর্শনের, সূত্রাকারের লিখন সময়ের নির্দ্ধারণ করিতে যথাসম্ভব যত্ন করিব।

আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে দর্শন দুইপ্রকার। যাহা বেদানুগত তাহা আস্তিক এবং যাহা বেদের অনুগত নহে তাহা নাস্তিক দর্শন নামে পরিচিত।

বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্ব মীমাংসা, উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত এই ছয়টী আস্তিক দর্শন নামে প্রসিদ্ধ। মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে পূর্ণপ্রজ্ঞ, রামানুজ, নকুলীশ, পাশুপত, শৈব, প্রত্যভিজ্ঞা, রসেশ্বর ও পাণিনি এই কয়টী দর্শনেরও উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু উক্ত সপ্তবিধ দর্শন, পূর্ব্বোক্ত বৈশেষিকাদি দর্শনেরই অন্তর্গত। পূর্ণপ্রজ্ঞ ও রামানুজ দর্শন উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তের দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মত সংস্থাপক, সুতরাং তাহা বেদান্ত দর্শনে পরিগণিত। নকুলীশ, পাশুপত, শৈব, প্রত্যভিজ্ঞা ও রসেশ্বর এই চারিটি মাহেশ্বর দর্শন নামে প্রসিদ্ধ। নকুলীশ পাশুপত ও শৈব দর্শন ঈশ্বর ও সৎকার্য্যবাদী সুতরাং এই দুইটি পাতঞ্জল দর্শনের অন্তর্গত। প্রত্যভিজ্ঞা ও রসেশ্বর, জীবেশ্বরের একত্ববাদী, অতএব এ দুটিকে বেদান্তের অদ্বৈতবাদের প্রস্থানান্তর বলাই সঙ্গত। পাণিনি দর্শন শব্দশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ হইলেও, অদ্বৈতবাদ সমর্থনই, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, সুতরাং ইহাকে বেদান্তের অন্তর্গত বলাই উচিত। পূর্ণপ্রজ্ঞ প্রভৃতি উক্ত সাতটি দর্শন, আত্মতত্ত্ব ও বেদপ্রামাণ্য সম্বন্ধে বৈশেষিকাদি আস্তিক দর্শনের অবিরুদ্ধবাদী। যখন প্রধান বিষয়ে তাহাদের ঐকমত্য পরিলক্ষিত হইতেছে, তখন উক্ত সাতটিকে আস্তিক দর্শনে পরিগণিত করাই কর্ত্তব্য।

নাস্তিক দর্শন আপাতত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। চার্ব্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিলে তাহাও ছয়ভাগে বিভক্ত বলিয়া প্রতীত হইবে। কারণ, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার ভেদে বৌদ্ধ দর্শন চারিভাগে বিভক্ত। সুতরাং চারি বৌদ্ধ এবং চার্ব্বাক ও জৈন সমুদয়ে নাস্তিক দর্শন ছয়প্রকার।

আস্তিক ও নাস্তিক প্রত্যেক দর্শনই ছয়ভাগে বিভক্ত। কিন্তু বহুকাল হইতে আমাদের দেশে "ষড়দর্শন" এই শব্দ আস্তিক দর্শনেই প্রযুক্ত হইতেছে। "ষড়দর্শন" বলিলেই আমরা বৈশেষিকাদি আস্তিক ষড়দর্শনই বুঝিয়া থাকি। নাস্তিক "ষড়দর্শন" বুঝাইবার জন্য আমরা এই ষড়দর্শন শব্দের ব্যবহার করি না। আমার বোধ হয় আস্তিক ও নাস্তিক উভয়েই স্ব স্ব মত প্রবর্ত্তক দর্শনকে "ষড়দর্শন" এই সাধারণ আখ্যা প্রদান করিতেন। অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থে সদানন্দ উভয় দর্শনেই, ষড়-দর্শন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে নাস্তিক দর্শনের বিশেষ সমাদর ও প্রচলন না থাকায়, আস্তিক দর্শনই এই "ষড়-দর্শন" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আস্তিক দর্শনের মতে, আত্মা নিত্য, নিরবয়ব। তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। নাস্তিকদিগের মধ্যে আত্মার সম্বন্ধে অতিশয় মতভেদ দৃষ্ট হয়। জৈন মতে আত্মা সাবয়ব ও নিত্য। বৌদ্ধ মতে আত্মা নিরবয়ব ও অনিত্য। অর্থাৎ তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। জৈন ও বৌদ্ধ উভয় মতেই আত্মার জন্মান্তর স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু চার্ব্বাকগণ আত্মার পুনর্জন্ম স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যেমন নানাবিধ দ্রব্য

সংযোগে মাদকতা শক্তির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু, এই চতুর্ব্বিধ ভূত সংযোগে স্বভাবতই চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই চৈতন্য বা তদযুক্ত শরীরই আত্মা নামে অভিহিত, এবং উক্ত চৈতন্যের বিনাশ হইলেই আত্মার বিনাশ হইয়া থাকে।

আস্তিক ও নাস্তিক উভয় দার্শনিকের, কোন কোন বিষয়ে পরস্পর মতভেদ থাকিলেও, মোক্ষাবস্থায় দুঃখনিবৃত্তি সম্বন্ধে তাহাদের ঐকমত্য আছে। কেহই ঐ অবস্থায় দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

আস্তিক ও নাস্তিকের পরস্পর মতভেদ ও ঐকমত্য এবং চার্ব্বাকাদি নাস্তিকগণের পরস্পর মতভেদ সংক্ষেপে বলা হইল। কিন্তু বৈশেষিকাদি আস্তিকগণেরও পরস্পর মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রত্যেক দর্শনের আলোচনা সময়ে, সে সমস্ত বিষয়ের যথাসম্ভব বিস্তৃত বর্ণনা করা যাইবে। আমি প্রথমে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধেই কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

আমাদের দেশীয় আস্তিক দার্শনিক সকলেই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে বেদান্তদর্শনের, বিশেষত বেদান্তসম্মত মায়াবাদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন। দার্শনিকপ্রবর মাধবাচার্য্য, সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের শেষভাগে লিখিয়াছেন যে—"সর্ব্বদর্শনশিরোমণিভূতংশাঙ্করদর্শনমন্যত্র লিখিতমিত্যত্রোপেক্ষিতং"। ইহা হইতে বুঝা যায় শাঙ্করদর্শন নামে বিখ্যাত বৈদান্তিক মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ, দর্শনের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া মাধবাচার্য্য স্বীকার করিতেন। বিখ্যাত নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য আত্মতত্ত্ব বিবেকে শূন্যবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "আগতোসি মার্গে অদ্বৈতমত প্রবেশাৎ। ননু অদ্বৈতবাদস্যাপি বৈশেষিকাদিপ্রতিপক্ষিত্বাৎ তদপিত্বয়া নিরাকরণীয়ং কিমস্মাকমার্দ্রবণিজাং বহিত্রচিন্তয়া" ইহার ভাবার্থ এই—উদয়ন, শূন্যবাদীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে তোমরা অদ্বৈতমতের অনুবর্ত্তী হওয়ায় পথে আসিয়াছ। ইহা শুনিয়া শূন্যবাদী বলিলেন যে অদ্বৈতবাদ, বৈশেষিকাদি দর্শনের প্রতিপক্ষ, অতএব তাহার খণ্ডন করাও তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য? এই প্রশ্নে উদয়ন বলিলেন যে আমরা আদার ব্যাপারী, আমাদের জাহাজের চিন্তায় (অনধিকার চর্চ্চায়) প্রয়োজন কি? এই সকল বিচার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যে উদয়ন অদ্বৈতবাদকে বিশেষ সমাদর করিতেন। তিনি একস্থানে অদ্বৈতবাদ সম্মত আত্মজ্ঞানের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে "সাবস্থা নহেয়া মোক্ষনগরগোপুরায় মানত্বাৎ" অর্থাৎ বৈদান্তিক আত্মতত্ত্বজ্ঞান হেয় নহে, কারণ, দ্বার না থাকিলে পুরে প্রবেশ যেমন অসম্ভব, সেইরূপ বৈদান্তিক আত্মতত্ত্বজ্ঞান না হইলে, মুক্তি নগরে প্রবেশের কোনও প্রত্যাশা নাই। কোনও নৈয়ায়িক বলিয়াছেন যে "ইদন্ত কণ্টকাবরণং তত্ত্বন্তু বাদরায়ণাৎ" গোতমের এই ন্যায়শাস্ত্র কণ্টকাবরণ মাত্র। যথার্থ আত্মতত্ত্ব, বাদরায়ণ অর্থাৎ বেদান্তদর্শন হইতেই জ্ঞাতব্য। এই বাক্যটীর তাৎপর্য্য "এই যে ক্ষেত্রস্থ শস্যের, গোমহিষাদি হইতে রক্ষার জন্য, কৃষকেরা যেমন চতুর্দ্দিকে কণ্টকদ্বারা আবৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ বৈদান্তিক আত্মতত্ত্বকে, কুতার্কিক হইতে সুরক্ষিত করিবার জন্য গোতম ন্যায়দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছেন। মীমাংসা বার্ত্তিকের তর্কপাদে ভট্টপাদ বলিয়াছেন "ইত্যাহনাস্তিক্য নিরাকরিষ্ণুরাত্মাস্তিতাং

ভাষ্যকৃদত্রযুক্ত্যা দৃঢ়ত্বমেতদ্বিষয়স্তবোধঃ প্রয়াতি বেদান্তনিষেবনেন।" ইহার ভাবার্থ এই নাস্তিকতার দূরীকরণার্থ যুক্তিদ্বারা ভাষ্যকার আত্মাস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই বিষয়ে জ্ঞানের সম্যক্ দৃঢ়তা, বেদান্ত বিচার দ্বারাই সাধিত হইবে। এই সরল কথা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে আস্তিক দার্শনিকগণ বৈদান্তিক মায়াবাদের বিশেষ পক্ষপাতী। সুতরাং বেদান্ত, অন্যান্য দর্শন হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহা স্থির করা যাইতে পারে। এইক্ষণ বেদান্ত-দর্শন কি? তাহার নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। বেদান্ত—বেদের শেষভাগ অর্থাৎ উপনিষদ্; দর্শন—তাৎপর্য্যনির্ণায়ক সূত্র। উপনিষদের তাৎপর্য্যনির্ণায়ক সূত্র সমূহ, বেদান্তদর্শন নামে পরিচিত। এই বেদান্তদর্শন, ব্রহ্মসূত্র, ব্রহ্ম-মীমাংসা প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বেদান্তসূত্র কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছে এবং রচনা কর্ত্তা কে? তাহা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। সূত্র ও শাঙ্করভাষ্য হইতে এই সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মাধ্বভাষ্য প্রারম্ভে শ্রীমদানন্দতীর্থ স্কন্দপুরাণ হইতে এই বিষয়ের কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই বচন কয়টী এই—

"নারায়ণাদ্বিনিষ্পন্নং জ্ঞানং কৃতযুগেস্থিতং
কিঞ্চিত্তদন্যথাজাতং ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽখিলং।
গৌতমস্য ঋষেঃ শাপাৎজ্ঞানেত্বজ্ঞানতাং গতে
সঙ্কীর্ণ বুদ্ধয়োদেবা ব্রহ্মরুদ্র পুরঃসরাঃ।
শরণ্যং শরণংজগ্মু নারায়ণমনাময়ং
তৈর্বিজ্ঞাপিত কার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ
উৎসন্নান্ ভগবান্ বেদানুদ্জহার হরিঃস্বয়ং।
চতুর্দ্ধাব্যভজত্তাংশ্চ চতুর্ব্বিংশতিধা পুনঃ
শতধা চৈকধাচৈব তথৈবচ সহস্রধা।
কৃষ্ণোদ্বাদশধাচৈব পুনস্তস্যার্থবিত্তয়ে
চকারব্রহ্মসূত্রাণি যেষাং সূত্রত্বমঞ্জসা।"

ইহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্যার্থ এই—দ্বাপরযুগে বৈদিকজ্ঞানের অবনতি হওয়ায়, দেবগণের প্রার্থনানুসারে ভগবান নারায়ণ সত্যবতীর গর্ভে ও পরাশরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া, কৃষ্ণনাম ধারণ পূর্ব্বক বেদসকলকে ৪।২৪।১০০।১০০০ এবং ১২ ভাগে বিভক্ত করেন। অনন্তর তদীয় সন্দিগ্ধস্থান সমূহের অর্থ নির্ণয়ার্থ ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত রচনা দ্বারা ইহাই প্রমাণ করা যায় যে পরাশরনন্দন কৃষ্ণ, বেদের বিভাগ ও ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন। উক্ত কৃষ্ণ বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন, সেজন্য তিনি বেদব্যাস উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত বেদব্যাস কৃষ্ণ, বাদরায়ণ ও দ্বৈপায়ন নামে প্রসিদ্ধ। বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মবিচার বর্ণিত হইয়াছে, সে জন্য তাহাকে ব্রহ্মসূত্র বলা হইয়া থাকে। এই অবস্থায় ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে যে পরাশরনন্দন, বেদব্যাস উপাধিভূষিত মহর্ষি কৃষ্ণ, দ্বৈপায়ন বা বাদ-রায়ণ ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ বেদান্তদর্শন রচনা করিয়াছেন। যদি ইহা স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে এইক্ষণে তাহার রচনাসময়ের অবধারণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বেদান্তসূত্র রচনার সময় সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কোন রূপ সিদ্ধান্তে উপ-নীত হওয়ার অনুকূলে বিশেষ প্রমাণ নাই। যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা সাধারণ-ভাবে সময় নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

ভগবদ্গীতার ১৩শ অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকের 'ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব' এই অংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, গীতা রচনাসময়ে ব্রহ্মসূত্র নামে প্রসিদ্ধ কোন গ্রন্থ ছিল। স্কন্দপুরাণীয় পূর্ব্বোক্ত বচন

হইতে ইহা উপলব্ধ হয় যে দ্বাপরযুগে বৈদিক-জ্ঞানের অবনতি অবস্থার পরে পূর্ব্বোক্ত বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং স্কন্দপুরাণীয় বচন হইতে ইহাও প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, বেদান্তদর্শনের সময়, বৈদিকজ্ঞানের অবনতির পরবর্ত্তী। এবং গীতার উক্ত শ্লোকাংশ হইতে বুঝা যায় ঐ সময় গীতা রচনার পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং গীতা রচনা ও বৈদিকজ্ঞানাবনতির মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে বেদান্তদর্শন রচিত হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে। এইক্ষণে দেখা যাক উক্ত সময়, বর্ত্তমান সময়ের কত পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে? মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে পূর্ব্বোক্ত বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। রাজতরঙ্গিনীর মতে যুধিষ্ঠিরের জন্ম সময় কলিযুগের ৬৫৩ বৎসরের পরবর্ত্তী। যদি রাজতরঙ্গিনীর নির্দ্ধারিত যুধিষ্ঠিরের সময় সত্য হয়, এবং মহাভারতানুসারে বেদব্যাস, যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক বলিয়া প্রমাণিত হন, তাহা হইলে আপাততঃ এইরূপ স্থির করা যাইতে পারে, যে দ্বাপরের শেষ বা কলির প্রথমভাগে বেদান্তদর্শন রচিত হইয়াছে। এবং উক্ত সময় বর্ত্তমান সময়ের ৪ চারি হাজার বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। দ্বাপরের শেষভাগ, বেদব্যাস ও বেদান্তদর্শনের সময়, ইহা স্বীকার করিলেও কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর ও তৎপরবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরের সময়ে উক্ত বেদব্যাস জীবিত থাকা অসম্ভাব্য নহে। কারণ যোগপ্রভাবে ঋষিগণ সহস্রাধিক বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারিতেন, ইহা যোগশাস্ত্র ও পুরাণাদিতে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে।

উক্ত বেদান্তদর্শনের অনেক ভাষ্য আছে। তন্মধ্যে শাঙ্কর বা শারীরকভাষ্য, রামানুজভাষ্য ও মাধ্বভাষ্যই বিশেষ প্রসিদ্ধ। আমাদের দেশে শাঙ্করভাষ্যই সমধিক আদরণীয়। রামানুজ ও মাধ্বভাষ্যের বিশেষ সমাদর নাই। কারণ সেই সকল সম্প্রদায়ের লোক আমাদের দেশে খুব বিরল। আমি প্রথমে শাঙ্করমত অবলম্বন করিয়াই কয়েকটী কথা বলিব। বেদান্তসূত্রের শঙ্করাচার্য্য প্রণীত ভাষ্য, শাঙ্করভাষ্য নামে প্রসিদ্ধ। কলিযুগের ৩৮৮৯ বৎসর গত হইলে, শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। শঙ্কর মন্দার সৌরভে নীলকণ্ঠ ভট্ট লিখিয়াছেন—

> "প্রাসূত তিষ্য শরদামতিজাতবত্যাং
> একাদশাধিক শতোনচতুঃ সহস্র্যাং।"

আরও একটী প্রাচীন প্রমাণ আছে যে

> "নিধিনাগেভ বহ্ন্যব্দে বিভবে মাসিমাধবে
> শুক্লেতিথৌদশম্যান্ত শঙ্করাচার্য্যোদয়ঃ স্মৃতঃ
> কলিযুগস্তেতি শেষঃ।"

প্রথম শ্লোকের অর্থ এই যে কলিযুগের, একাদশ ন্যূন চারি হাজার বৎসর অর্থাৎ ৩৮৮৯ বৎসর গত হইলে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ এইরূপ— সংস্কৃত অঙ্ক পরিভাষানুসারে নিধি ৯, নাগ ৮, ইভ ৮ এবং বহ্নি শব্দে তিন সংখ্যা বুঝায়। এবং অঙ্ক সকল বাম দিকে গমন করে অর্থাৎ যাহার নাম শেষে উচ্চারিত হইবে তাহা প্রথমে বসিবে। সুতরাং (১) কলিযুগের ৩৮৮৯ বৎসর গত হইলে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয় দশমী তিথিতে শঙ্করাচার্য্য উদিত হইয়াছিলেন।

উক্ত শ্লোকদ্বয় হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে শঙ্করভাষ্যের সময়, বেদান্তসূত্র রচনার ত্রিসহস্রাধিক বর্ষ পরবর্ত্তী এবং বর্ত্তমান সময়ের সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী। এই ক্ষণে ইহা

(১) নিধি নাগেভ বহ্নি শব্দের অর্থ ৩৮৮৯ সংখ্যা।

দেখা উচিত যে কোন্ শকে শঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর গত হইলে শক বর্ষের আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি কলিযুগের ৫০০৫ বর্ষ এবং শকের ১৮২৬ বর্ষ চলিতেছে। সুতরাং ৭১০ শকাব্দে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন এবং তৎপরবর্ত্তী ৩২ বর্ষমধ্যে এই বেদান্তভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। কারণ শঙ্করবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে, ৩২ বর্ষ বয়সে তাঁহার দেহত্যাগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

উক্ত ভাষ্য রচনাসময়ে আমাদের দেশে বৌদ্ধমতের বিশেষ প্রাধান্য হইয়াছিল। বৌদ্ধমতের প্রাধান্য খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করাই তাঁহার ভাষ্য রচনার উদ্দেশ্য। এস্থলে বৌদ্ধমত সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু বলা আবশ্যক। তাহা হইলে শঙ্করের সহিত তাহাদের মতের কিরূপ পার্থক্য তাহা বুঝিতে বিশেষ সুবিধা হইবে। বৌদ্ধগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। শূন্যবাদী, বিজ্ঞানবাদী, বাহ্যবিষয়ের অনুমেয়ত্ববাদী ও বাহ্যবিষয়ের প্রত্যক্ষতাবাদী। শূন্যবাদী মাধ্যমিক, বিজ্ঞানবাদী যোগাচার, বাহ্যানুমেয়ত্ববাদী সৌত্রান্তিক এবং বাহ্যবিষয়ক প্রত্যক্ষবাদী বৈভাষিক নামে বৌদ্ধদর্শনে অভিহিত হইয়া থাকে। শূন্যবাদীগণ কিছুই মানেন না। তাঁহাদের মতে জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় সকল পদার্থই মিথ্যা। বিজ্ঞানবাদীগণ বলেন যে একমাত্র জ্ঞানই সত্য, স্বপ্রকাশ এবং তাহা ক্ষণিক। আমাদের আত্মা সেই ক্ষণিক বিজ্ঞানস্বরূপ, প্রতিক্ষণে তাহার বিনাশ, এবং পুনঃ পুনঃ নূতন আত্মার উৎপত্তি হইতেছে। বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোন বাহ্য বিষয় নাই। তাহা জ্ঞানেরই অবস্থাবিশেষ। বাহ্য বিষয়ের অনুমেয়ত্ববাদীগণ বলেন যে বাহ্য বিষয়, ও বিজ্ঞান রূপ আত্মা, উভয়ই সত্য, এবং ক্ষণিক। বিজ্ঞানরূপ আত্মা স্বপ্রকাশ। বিষয় সকল অনুমেয়। জ্ঞান, দর্পণের মত স্বচ্ছ তাহাতে বিষয়ের ছায়া বা প্রতিবিম্ব পতিত হয়। সেই ছায়া বা প্রতিবিম্বদ্বারা আমরা বিষয়ের অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারি। কোন বাহ্য বিষয়ই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে। বাহ্যার্থ প্রত্যক্ষতাবাদীগণের মতে জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়ই সত্য, এবং ক্ষণিক। আত্মা জ্ঞান স্বরূপ, এবং স্বপ্রকাশ। জ্ঞেয় পদার্থ সকল, যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ ও অনুমানগম্য। বৌদ্ধগণের বিজ্ঞানবাদ ও শঙ্করের অদ্বৈত ব্রহ্মবাদে, অনেক বিষয়ে সামঞ্জস্য দেখা যায়। শঙ্কর বলেন ব্রহ্ম সৎ চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ, এবং ইহাই একমাত্র সত্য ও নিত্য এবং সর্ব্বব্যাপী। আমাদের আত্মা ও ব্রহ্ম উভয়ই এক, পরস্পর ভিন্ন নহে। পরিদৃশ্যমান জগৎ, কল্পনামাত্র। বাস্তবিক তাহার কোন সত্ত্বা নাই এবং তাহা অনির্ব্বাচ্য। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতের সহিত শাঙ্কর মতের এই প্রভেদ, যে বিজ্ঞানবাদীগণ বিজ্ঞানের ক্ষণিকতা ও পরিচ্ছিন্নতা এবং অনেকত্ব স্বীকার করেন এবং বাহ্য বিষয় সকল ও বিজ্ঞানের অভিন্ন, এইরূপ বলেন। বাহ্য বিষয় সকল, জ্ঞানেরই একপ্রকার অবস্থামাত্র। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার বশত জ্ঞান সকল বিষয়াকার ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু শঙ্কর ইহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে জ্ঞান সত্য, নিত্য, এক এবং অসীম। কারণ, জ্ঞানশূন্য স্থান কখনও আমাদের অনুভূত হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানের সসীমত্ব, প্রমাণসিদ্ধ নহে। যদি জ্ঞান অসীম হয়, তবে, ইহা

বলিতে হইবে যে, তাহা উৎপত্তি বিহীন। কারণ, অসীম পদার্থের উৎপাদনে কেহই সমর্থ নহে। যেমন আকাশ; বাস্তবিক এক হইলেও, ঘট পটাদির ভেদবশত ঘটাকাশ পটাকাশরূপে তাহার অনেকত্ব ব্যবহার হইতেছে। সেইরূপ জ্ঞেয় ঘট পটাদির ভেদদ্বারা, "জ্ঞান অনেক" এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। বাস্তবিক জ্ঞানের স্বাভাবিক কোন ভেদ নাই। জ্ঞেয় বিষয় সকল পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ, সুতরাং অসীম জ্ঞান হইতে ভিন্ন এবং তাহা মিথ্যা। এই অবস্থায় শঙ্কর ও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ উভয়েরই জ্ঞানের অসীমত্ব, স্বপ্রকাশত্ব, বাহ্য বিষয়ের স্বাভাবিক মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে এক মত এবং তাহার অসীমত্ব, একত্ব, নিত্যত্ব এবং জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞান স্বরূপত্ব সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধের বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনের জন্য শঙ্কর বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হইতে তদীয় প্রতিভা শক্তির বিশেষ উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তিনি বৌদ্ধ, মীমাংসক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, জৈন, পাশুপত, পূর্ণপ্রজ্ঞ ও রামানুজ প্রভৃতি দার্শনিকগণের মত যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়া, অদ্বিতীয় ব্রহ্মাত্মবাদ বা একাত্মবাদ স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত অদ্বৈতাত্ম বা—একাত্মবাদই, বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য, ও অন্যান্য দার্শনিক মত উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য নহে; ইহা স্বকৃত ভাষ্যে বিশেষভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

"একমেবাদ্বিতীয়ং" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি"—এই সকল উপনিষদ্‌বাক্যই শঙ্করের অদ্বৈতাত্মবাদ বা একাত্মবাদের মূল ভিত্তিস্বরূপ। উক্ত বাক্যগুলির এই অর্থ—অদ্বিতীয় পদার্থই একমাত্র সৎ এই জগতে নানাবিধ কিছুই নাই; সেই অদ্বিতীয় পদার্থই সত্য এবং তাহাই আত্মা ও সেই আত্মাই তুমি। উপরোক্ত উপনিষদ্‌বাক্যের কথিতরূপ অর্থই যুক্তিসিদ্ধ, ইহা সমর্থন করাই শঙ্করের ভাষ্য রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য। শঙ্করের মতে জীব ও ব্রহ্ম এক, ইহাদের মধ্যে পরস্পর কোন ভেদ নাই। জীবভাব শরীরে অনুভূত হয়, সে জন্য জীবকে, শারীরক বলা হইয়া থাকে। শারীরকের অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মরূপতা শঙ্করভাষ্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব শাঙ্কর দর্শন, শারীরক দর্শন বা শারীরক মীমাংসা নামে পরিচিত।

শঙ্করের মতে একটীমাত্র সৎ পদার্থ। সেই সৎ পদার্থ জ্ঞান ও সুখস্বরূপ। ইহাই শ্রুতিতে সচ্চিদানন্দ নামে অভিহিত হইয়াছে। এই সচ্চিদানন্দই আমাদের আত্মা এবং ইহা উৎপত্তি ও বিনাশবিহীন সুতরাং নিত্য। এই নিত্য সচ্চিদানন্দরূপ আত্মা স্বপ্রকাশ এবং সর্ব্বত্র অবস্থিত। কোন স্থানেই তাঁহার অভাব নাই।

নিজের মনোগত ভাব অপরকে বুঝাইবার জন্য শব্দ বা অন্যবিধ ইঙ্গিতের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। মনোগত ভাব বুঝাইবার জন্য শব্দ অপেক্ষা সহজ উপায় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মনোগত ভাব বুঝাইবার জন্য মনুষ্য সমাজে বহুল পরিমাণ শব্দ প্রচলিত আছে, সে জন্য মনুষ্য সমাজ, জগতের শ্রেষ্ঠ, এইরূপ আমরা মনে করিয়া থাকি। কোন বিষয় বুঝাইতে হইলে কিরূপভাবে শব্দের ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহার সম্বন্ধে বিশেষ

দৃষ্টি রাখা সঙ্গত। এই সম্বন্ধে ন্যায়দর্শনে যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়। ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, যে প্রথমে বক্তব্যবিষয়ের নাম নির্দ্দেশ তৎপরে তাহার লক্ষণ এবং অনন্তর তৎসম্বন্ধীয় প্রমাণের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, এবং ন্যায় শাস্ত্র সেই প্রণালীতেই রচিত হইয়াছে। বাৎস্যায়নের বাক্যটি এই "ত্রিবিধা চাস্য শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিঃ, উদ্দেশোলক্ষণং পরীক্ষা-চেতি নামধেয়েন পদার্থ মাত্রস্যাভিধানং উদ্দেশঃ উদ্দিষ্টস্যাতত্ত্ব ব্যবচ্ছেদকোধর্ম্মোলক্ষণং, লক্ষিতস্য যথা লক্ষণমুপপদ্যতে নচেতি প্রমাণৈরবধারণং পরীক্ষা"। ইহার ভাবার্থ এই, যে উক্ত ন্যায় শাস্ত্রের পদার্থপ্রতিপাদকতা তিন প্রকার; প্রথম প্রতিপাদ্য বস্তুর নাম নির্দ্দেশ, দ্বিতীয় লক্ষণ, যাহাদ্বারা প্রতিপাদ্য বস্তু অন্য পদার্থ হইতে ভিন্ন ইহা বুঝিতে পারা যায়; তৃতীয় পরীক্ষা যাহাদ্বারা প্রতিপাদ্য বস্তু আছে কি না এই সংশয় বিদুরিত হইয়া তৎসম্বন্ধে অবধারণ হইয়া থাকে। বেদান্তশাস্ত্রসম্বন্ধে আমি যেরূপ গুরূপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনা দ্বারা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, সে সমুদয় বিষয় শব্দদ্বারা বুঝাইতে সমর্থ হইব বলিয়া মনে করিতে পারি না। ষড়্‌দর্শনটীকাকার বাচস্পতিমিশ্র এক স্থলে বলিয়াছেন "নহি ইক্ষুক্ষীর গুড়াদীনাং মধুর রসভেদঃ সরস্বত্যা অপিআখ্যাতুং শক্যতে" অর্থাৎ ইক্ষু, ক্ষীর ও গুড়ের মাধুর্য্যের পরস্পর পার্থক্য স্বয়ং সরস্বতীও শব্দদ্বারা বুঝাইতে পারেন না। এই অবস্থায় আমার মত ব্যক্তির বেদান্তপ্রতিপাদ্য" দুর্জ্ঞেয় বিষয় শব্দদ্বারা বুঝাইবার আকাঙ্ক্ষা, অন্ধের রূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষার মত, উপহাসের কারণ বলিয়াই মনে হয়।

বারান্তরে আমরা ন্যায়দর্শনোক্ত কথিত প্রণালী অনুসারে, ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীগুরুচরণ তর্কতীর্থ।

জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় জীবন।

হে, বঙ্গসাহিত্য সেবকগণ—অদ্য এই ক্ষুদ্রমতি নিবেদক আপনাদিগের নিকট যে কয়েকটি কথা নিবেদন করিতে চাহিতেছে, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া যদি তাহা পাঠ করেন, তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ চিন্তা করেন এবং আপনাদিগের ঈশ্বর-দত্ত শক্তি দেশকে অমঙ্গলের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি কৃতার্থ হইবে। আমি আমার বক্তব্য অসঙ্কোচে বলিতে চাহি। ভরসা করি তাহাতে কাহারও অভিমান আহত হইবে না।

আমি কর্ম্মক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে সাহিত্যের তূরীধ্বনি শুনিতে চাহি। কত দিন হইতে কাণ পাতিয়া রহিয়াছি। কই, সে তূরীধ্বনি ত শুনিতে পাই না। তৎপরিবর্ত্তে শুনিতে পাই, প্রণয়-আবেশের মোহন বংশীরব, গবেষণার গুড় গুড় শব্দ, "অন্ত ও সান্তে"র অনন্ত ব্যাখ্যা, "ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ডে"র সম্বন্ধে বিপুল বক্তৃতা। এ সব খুব ভাল, কিন্তু জাতীয় জীবনের উদ্ধারের জন্য সাহিত্যে আরও কিছু চাহি না কি?

এমন সাহিত্যের নিতান্ত প্রয়োজন হই-

য়াছে যাহা জাতীয় জীবন-সঙ্কটে মুক্তিদাতা— এমন সাহিত্য যাহা নৈরাশের নিশীথ অন্ধকারে দীপ্তিময় দীপ। এমনি সাহিত্য চাহি যাহা সংশয়-বিপদ-সঙ্কুল-চিন্তা-সাগরে দোদুল্যমান সমাজপোতের প্রশান্ত কর্ণধার, যে সাহিত্যের সহিত জাতীয় জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহার শক্তি মহীয়সী। সে সাহিত্য জাতীয় চিন্তার উদ্বেগ, হর্ষ উল্লাস, চেষ্টা ও উদ্যমের মন্থনে উদ্ভূত হয়। সে সাহিত্য জাতীয় জীবনের গুরুতর সমস্যা আলোচনায় মগ্ন হইয়া জাতীয় সমস্যা মীমাংসা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। সে সাহিত্য এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে গুরুতর তথ্য নির্ণয় করে। সে সাহিত্য জাতীয় জীবনে যে যে অবস্থা সংঘটিত হইয়া যে যে ফল হইয়াছে, তাহা অতি সূক্ষ্ম-ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ অবধারণ করে এবং কার্য্যকারণ অবধারণ করিতে গিয়া, সে সাহিত্য কখন বিস্ময়ে, কখন প্রীতিতে, কখন কোপে, কখন ন্যায়পরায়ণতায় কখন ধর্ম্মভাবে আপ্লুত হইয়া কখন বা উচ্চ-শ্রেণীর কাব্য রচনা করে, কখন বা বিমল বাগ্মিতার নির্ঝর প্রবাহিত করে, কদাপি বা বিপ্লবনিবারিণী শক্তি ধারণ করিয়া জনসমাজের সম্প্রদায় বিশেষকে অন্যায় বা অত্যাচার হইতে মুক্ত করে।

ইতিহাস দেখুন। আমার কথা প্রতিপন্ন হইবে। বঙ্গে যখন বৈষ্ণব ধর্ম্মের জাতীয় জীবনে আলোচিত হইয়াছিল, তখন বৈষ্ণব কবিকুলের ভাষায় সাহিত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। ফরাসীদেশে যখন ধনী অভিমানী আভিজাত্যের পীড়নে ফরাসীর জনসাধারণ মর্ম্মবেদনায় ব্যথিত ও কাতর হইতেছিল, তখন দীন কুটীরে বসিয়া একটি দরিদ্র ব্যক্তি জাতীয় জীবনকে দুঃখ ও অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, জাতীয় সমস্যা সমাধানার্থে দীন হীন কুটীরে বসিয়া Le Contrat Social নামক গ্রন্থ রচনা করিল। ধনীগণ তাহা পাঠ করিয়া তাহা একখানি উদ্ভট গ্রন্থ ভাবিয়া উপ-হাসপূর্ব্বক ছুড়িয়া ফেলিল। কিন্তু সেই পুস্তকে জাতীয় জীবন ঘনীভূতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাই উহা বিপ্লববিধাতা হইল। তাই সেই ক্ষুদ্র পুস্তক হইতে ফরাসীদেশে শোণিত উৎস ছুটিল। একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়াছেন, যে সকল ধনিগণ ঐ পুস্তকের প্রথম খণ্ড পাঠান্তে হাসিয়াছিল যেন তাহাদেরই চর্ম্ম দিয়া ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড বাঁধা হইল। দেখুন, এখানে সাহিত্যের বিপ্লববিধায়িনী শক্তি। ইংলণ্ডের ইতিহাস আলোচনা করুন। হতভাগ্য প্রথম চার্লসের সময় রাজভক্ত ও প্রজাভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষণ হইল। তাহাতে জাতীয় জীবন, আশা নৈরাশ্যে, উৎপীড়নে উপদ্রবে, রাজভক্তি ও প্রজাভক্তি সংঘর্ষণে ওলট পালট হইয়াছিল। যখন জাতীয় জীবন, চঞ্চল অসার প্রথম চার্লসের উচ্ছৃঙ্খলতায় মুহুর্মুহু প্রকম্পিত হইয়াছিল—তখন মিল্টনের কবিত্ব, ভাল ও মন্দ, স্বাধীনতা ও দাসত্ব, জাতীয় উন্নতি ও অবনতি, অবসাদ ও উল্লাসের কাহিনী, জাতীয় উদ্বেগ ও উদ্যমের গীতিতে ইংলণ্ডকে প্রতিষ্ঠিত করিল। যখন ব্রিটিশ বণিককুল ভারত জননীকে বিবিধরূপে লাঞ্ছিত করিয়া তাহার দেহ হইতে রত্নরাজি একে একে খুলিয়া লইতে লাগিল, দুর্দ্ধর্ষ ওয়ারেণ হেষ্টিংস দুর্ব্বল ভারততনয়তনয়াকে তৎহস্তন্যস্ত দুর্ব্বল প্রজাবৃন্দকে রক্ষা না করিয়া—দেবীসিংহ প্রমুখ

প্রজাপীড়ক নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষের এক লোমহর্ষণ নৃশংস নাটকের অভিনয় করিতে লাগিল। তখন ইংলণ্ডের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিবেকের গভীরতম প্রদেশ হইতে একটা হাহাকার উত্থিত হইয়াছিল, আহত ধর্ম্মের কোপাগ্নি এডমণ্ড বার্ক প্রভৃতি বাগ্মীর নেত্রে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন ইংলণ্ডের ইংরেজ সাধুজনের ন্যায়পরতা বজ্রনাদে পার্লেমেণ্টসৌধকে এবং পাপিষ্ঠ ওয়ারেণ হেষ্টিংসের ঘোর অপরাধী হৃদয়কে প্রকম্পিত করিয়াছিল। ইংলণ্ডের এই বণিকসম্প্রদায়ের অর্থলোলুপতা এবং শিক্ষিত উচ্চ সম্প্রদায়ের জাতীয় জীবনের যে সংঘর্ষ হইয়াছিল, বর্ক পিট, সেরিডান প্রভৃতির বক্তৃতা তাহারই সূক্ষ্মতত্ত্ব। বর্ক জাতীয় জীবনের সঙ্কটস্থলে যে সকল বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা রাজনীতি ও শাসননীতি সূত্রের ভাণ্ডার স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। সেই সূত্রগুলি কেবল তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধেই খাটে এমন নহে; বর্কের অনেক ব্যাখ্যা, অনেক সূত্রই, অন্য দেশেরও সদৃশ অবস্থায় প্রযোজ্য বলিয়া সময় সময় উদ্ধৃত হইয়া থাকে। সেইগুলি সাময়িক স্থানীয় ঘটনা হইতে উদ্‌ভূত হইলেও, নিত্য-সত্য, তাহা স্থায়ী সাহিত্য। কেন? না জাতীয় জীবনের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

দেখুন, ইংরেজ জাতির এক সম্প্রদায় অর্থাৎ বণিক্ সম্প্রদায়ের লোভপ্রসূত অত্যাচার দমন ও নিবারণ করিবার জন্য আর এক সম্প্রদায়, অর্থাৎ উদার শিক্ষিত সম্প্রদায়, যে অত্যুগ্র উদ্যম ও চেষ্টা জাতীয় জীবনে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহার ফলে বর্ক প্রভৃতির বক্তৃতা মহীয়ান্ সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে; আবার অন্যদিকে ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য, যখন বিদেশীয় পণ্যের উপর অত্যধিক কর স্থাপিত হওয়ায় ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডের স্বার্থ নষ্ট হইতে লাগিল, তখন আডাম স্মিথ ধনতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। আডাম স্মিথ জাতীয় জীবনের সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা করায় ধনতত্ত্বের কতকগুলি সূত্র নিরূপিত হইল। তাহার পরে ইংলণ্ডের মুদ্রা বিষয়ক বিশৃঙ্খলতায় লোকের বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। তখন ডেভিড রিকার্ডো (David Recardo) তাহার তথ্য নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এবং রজত ও সুবর্ণ মুদ্রা এবং ব্যাঙ্কনোট সম্বন্ধে তাঁহার সারবান গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। এ দিকে নেপোলিয়নের আমলের পরে, ইংলণ্ডের কৃষির বড়ই অবনতি হইল। চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ তদ্বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই জাতীয় সঙ্কট হইতে উদ্ধার হইবার চেষ্টায় ভূমির কর সম্বন্ধে নানা গভীর তথ্য আবিষ্কৃত হইল, এবং তাহা সাহিত্যের মধ্যে উচ্চ স্থান পাইল। রিকার্ডোর বিখ্যাত "থিয়োরি অব রেণ্ট" এই সময়ই আখ্যাত হয়। আবার, যখন ইংলণ্ডে দারিদ্র্যের বৃদ্ধি হইত, তখনই সহৃদয় পণ্ডিতগণ কিসে দারিদ্র্যের প্রতিকার হয়, কিসে গরিব লোক কাজ পায় কিসে দুই মুটা খাইতে পায়, এ বিষয় চিন্তা করিতেন ও লিখিতেন। আবার যখনি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস হইল তখনিই বুধগণ তাহার তত্ত্বনিরূপণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে থোরল্ড রজার্স (Thorold Rogers) প্রণীত History of Agriculture and Prices

in England ইত্যাদি গ্রন্থ রচিত হইল। অপর দিকে, ব্যবসায়ে বাণিজ্যে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে এই বিবেচনা করিয়া Laisser faire "না হাত দেই" পন্থায় চলিতে লাগিলেন। অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজ নিজ বুদ্ধি ও জ্ঞানানুসারে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে পায়, এবং গবর্ণমেণ্ট যদি তাহাতে আইন কানুন দ্বারা হস্তক্ষেপ না করেন, তাহা হইলে সমাজ উন্নতি লাভ করে, এই মন্ত্রণা অনুযায়ী ইংলণ্ড চলিতে লাগিল। ইংলণ্ডে ধনবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি দরিদ্র লোকের ঘোর দারিদ্র্য-বিপত্তি ঘুচিল না। সহৃদয় গ্রন্থকারগণ এই জাতীয় বিপদের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মভাবে তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। দীনদুঃখীজনের কাতর ধ্বনিতে তাহাদের কোমল সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল। তাঁহারা জাতীয় বিপত্তিকে স্বকীয় বিপত্তি জ্ঞান করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা তারস্বরে বলিতে লাগিলেন যে "না হাত দেই" রাজনীতি উত্তম নীতি নহে। তাহারা জাতীয় জীবন, জাতীয়নীতি উন্নত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার ফল কার্লাইলের (Carlyle) "Past and Present" রস্কিনের (Ruskin) 'Unto this Last' এবং Munera Pulveris ইত্যাদি নূতন ধরণের গ্রন্থ।

ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনের সহিত জাতীয় সাহিত্যের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে বুদ্ধিমান পাঠক ধারাবাহিকরূপে ইংলণ্ডের সাহিত্যমাত্র আলোচনা করিলে, ইংলণ্ডের ইতিহাসের সারভাগ, প্রধান প্রধান ঘটনা অনেকটা অনুমান করিয়া লইতে পারেন।

কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গদেশে জাতীয় জীবনের সহিত জাতীয় সাহিত্যের নিকট সম্পর্ক তত দেখা যায় না। অযুত অযুত লোকের সুখ দুঃখ যাহাতে জড়িত, অগণ্য লোকের জীবন মৃত্যু যাহাতে সংশ্লিষ্ট, বঙ্গসাহিত্য সেই সকল গুরুতর বিষয় উপেক্ষা করিয়া প্রায়ই অন্য বিষয়ের আলোচনায় মগ্ন থাকে। সমগ্র বঙ্গজাতি, কেবল বঙ্গজাতি বলি কেন, সমগ্র ভারতবাসিগণ যে বিষম সঙ্কট স্থলে উপস্থিত বঙ্গসাহিত্য যেন তৎপ্রতি উদাসীন—যেন সে বিষয় বাঙ্গালী লেখক ভাবিতে চাহেন না! যাহাদের উচ্চ বুদ্ধি সাংখ্য ও বেদান্তে আকাশে উড়িতে ভালবাসে, তাহা যেন ধরাতলে নামিয়া স্বদেশীয় অন্নকষ্টের বিষয়, দিগন্তব্যাপী দুর্ভিক্ষের বিষয়, লক্ষ লক্ষ লোকের অনশন মৃত্যুর ঘোর যন্ত্রণার বিষয়, চিন্তা করা তাহার নিজের অবমাননা বিবেচনা করে।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ লেখকই কি ভুলিয়া যান যে, উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য, জাতীয় সমস্যার সমাধান? যেমন উচ্চ শ্রেণীর সেনাপতি স্বজাতিকে সকল সঙ্কটে রক্ষা করেন, তেমনি উচ্চ শ্রেণীর লেখকগণ স্বজাতিকে সামাজিক বিপত্তিতে রক্ষা করেন, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরকালের স্বদেশীয়দিগের জন্য—কখন কখন মানবজাতির জন্য—মাঙ্গল্যবাক্য পরম্পরা লিপিবদ্ধ করিয়া যান। এবম্বিধ সাহিত্যে প্রকাশ পায় যে, লেখকের হৃদয় ও মস্তিষ্ক সমবেত হইয়া, অনুসন্ধান ও চিন্তা সমন্বিত হইয়া, দেশের মঙ্গলের জন্য দীর্ঘকাল নানা লোকাকীর্ণ স্থানে নানাবিধ ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়াছিল এবং নিশীথে নির্জ্জনকক্ষে দীপালোকে, সমাহৃত উপকরণচয় সমন্বয় করিয়া,

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য অপরিমিত পরিশ্রম করিয়াছিল। ঈদৃশী সাধনার সিদ্ধি, অমর সাহিত্য। এবম্বিধ সাহিত্য মুমূর্ষু জাতিকে জীবন দেয়। তাহাতে ভগবৎ প্রেরণা আছে, তাহাতে ভগবানের ছাপ-মোহর আছে। যাহা সত্য নিত্য সমাজের মঙ্গলসাধক তাহাতেই ঈশ্বরের মোহর আছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই—যে ভারতের বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষরূপ লোমহর্ষণ অমঙ্গল হইতে ভারত রক্ষা পাইতে পারে, কিসে দেশ হইতে নৃশংস মৃত্যুকে বিতাড়িত করিয়া—আশা ও সুখময় জীবনকে আনয়ন করা যাইতে পারে—ইহা কি উচ্চশ্রেণী সাহিত্যের অন্তর্গত হইতে পারে না? এই অতি গুরুতর বিষয় যাহাতে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনমৃত্যু জড়িত তাহা কি বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান লেখকের আলোচ্য হইবার যোগ্য বিষয় নহে? এই যে ট্রাজেডি নিরতিশয় গভীর দুঃখাত্মক দুর্ভিক্ষস্বরূপ ট্রাজেডি—যাহা হতভাগ্য ভারতের বিশাল রঙ্গমঞ্চে অবিরাম অভিনীত হইতেছে—এক অপূর্ব্ব নীরব অশ্রুপ্লুত আতঙ্কময় নাটকের অভিনয় হইতেছে, তাহাতে কি কোন ক্ষমতাশালী-লেখকের হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছে না? যদি এমন ক্ষমতাবান সহৃদয় লেখক থাকেন তাহা হইলে কেন মাসে মাসে মাসিক পত্রিকাতে এ বিষয় প্রায়ই একটিও প্রবন্ধ বাহির হয় না? অনেকেই যদি এ বিষয় আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন, অনেকেই যদি দুর্ভিক্ষ হইতে উদ্ধার হইবার পথ খুঁজিতে প্রয়াসী হন, নিশ্চয়ই কেহ কেহ না এই পথ বাহির করিতে পারিবেন; কেহ না কেহ অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে এমন কিছু লিখিতে পারিবেন যাহা কেবল বঙ্গসাহিত্যে নহে, জগতের সাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করিতে পারিবে, এবং স্বদেশের বিশেষ উপকার সাধন করিবে।

এমন একটা সঙ্কট স্থানে আমরা আসিয়া পড়িয়াছি, যে এ সময় যিনি যেটুকু পারেন, সেইটুকু সাহায্য করিলে, অবশেষে মঙ্গল হইবে। যিনি যেমন পারেন, তিনি এই বিষয় আলোচনা করুন, চিন্তা করুন, লিখুন। এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া কোন শিক্ষিত লেখকের বসিয়া থাকা উচিত নহে। ঘরে যখন আগুন লাগে তখন কি ঘরের কোন লোক সেই আগুন দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, না নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? ভারতে দুর্ভিক্ষের আগুন লাগিয়াছে। এক্ষণ নিশ্চিত থাকিবার সময় নহে। যে যে দিক দিয়া পারেন জল আনুন; জল ঢালুন, আগুন নিবাইবার পক্ষে সাহায্য করুন। দেশে শিল্পের উন্নতি করিবার যে চেষ্টা হইয়াছে তাহা জল ঢালার কাজ হইতেছে। তাহা কার্য্যগত সাহায্য, তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি এখানে সাহিত্যগত সাহায্যের কথা বলিতেছি, যে সাহায্যে কার্য্যের আরও সুবিধা হইবে, যে সাহায্যে আমরা গন্তব্য স্থানে যাইবার প্রকৃষ্ট পথ বাহির করিতে পারিব। সুধী লেখক! কার্য্যোদ্দেশে জ্ঞান প্রচার করুন। জনসাধারণের জ্ঞান হইলে উৎকৃষ্ট কার্য্য হইবে, দেশের শতধা মঙ্গল হইবে। পনর বৎসর পূর্ব্বে, ভারতে ক্রমে যে দুর্ভিক্ষ সমগ্র দেশব্যাপী হইবে আমি তাহা মাসিক পত্রে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। হণ্টার প্রভৃতি "অপ্টিমিষ্ট"গণের ভবিষ্য সূচনা যে অমূলক, বর্ত্তমান অবস্থায় রেল বিস্তারে

দুর্ভিক্ষ, প্রশমিত না হইয়া, যে উত্তরোত্তর প্রসারিত হইবে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। পরেও মধ্যে মধ্যে যথাসাধ্য লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার চেষ্টা তুচ্ছ কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ। যাঁহারা অধিক দেখিয়াছেন অধিক ভাবিয়াছেন, অধিক পড়িয়াছেন, যাঁহারা অধিক ক্ষমতাশালী, ঈশ্বরদত্ত শক্তিতে মহীয়ান তাঁহাদিগের নিকট আমি সানুনয় প্রার্থনা করিতেছি, যে তাঁহারা এই বিষয় চিন্তা করিতে ও লিখিতে আরম্ভ করিয়া আমাদিগকে শিক্ষাদান করুন, এবং দেশকে রক্ষা করিবার উপায় দেখাইয়া দিন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

রাজতপস্বিনী।

[জীবনীপ্রসঙ্গ]

২২

যে মুষ্টিমেয় পুরাতন এবং বিশ্বাসী কর্ম্মচারী পুটিয়া রাজ সংসারের স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন, আনন্দমোহন ওরফে বামু সরকার মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। সম্প্রতি ন্যূনাধিক সত্তর বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

সচরাচর অপ্রিয় সত্যবাদী এবং কৃষ্ণকায় বামু সরকার যতটা বাহ্যিক সম্ভ্রম ও ভীতির সঞ্চার করিতেন, তাহাতে তাঁহার অন্তর্নিহিত কমনীয় গুণরাজি বাহিরের লোকের কাছে প্রকাশ পাইত না। তিনিও আপনা হইতে তাহার পরিচয় দিতে কখন ব্যস্ত ছিলেন না। বরং সাধারণে তাঁহাকে ঠিক্ উল্টা বুঝিলে তিনি যেন একটা আনন্দ অনুভব করিতেন। স্বর্গীয় পিতৃদেব মহাশয় ১২৭৮ সালে যখন দ্বিতীয়বার রাজ-সংসারের দেওয়ান হন, আমাদের সেই কিশোর কালে সর্ব্বপ্রথমে সরকার মহাশয়ের সহিত পরিচয় হয় এবং আমরা পিতার সহিত পূর্ব্ব ঘনিষ্ঠতার দরুণ তখন হইতে চিরদিন তাঁহাকে পিতৃব্যবৎ মান্য করিয়া আসিয়াছি। তখন পাঁচ আনির নূতন চৌকীর দক্ষিণদিকে দেওয়ানজীর জন্য নূতন বাসগৃহ নির্ম্মিত হইতেছিল। সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে কয়মাসের জন্য আমাদের বাসা নির্দ্দিষ্ট হইল। এই সূত্রে ভ্রাতৃগণসহ আমি তাঁহার শুদ্ধান্তঃপুরে ঘরের ছেলের মত পরিচিত হইয়াছিলাম এবং তদীয় সহধর্ম্মিনী ও বিধবা ভগিনীর যে অপত্যবৎ স্নেহ তখন হইতে লাভ করিয়াছিলাম কখন তাহার লাঘব হয় নাই। ফলত তাঁহার পারিবারিক জীবন বড় মধুর এবং শান্তিময় ছিল এবং সেই সিংহরাশি পুরুষ কি কঠোরে কোমল হৃদয় লইয়া জন্মিয়াছিলেন, লক্ষ্মীরূপা গৃহিণী এবং গৌতমী সদৃশা ভগিনী অধিষ্ঠিত আম্র-নারিকেল-ছায়াচ্ছন্ন তাঁহার সেই আশ্রম তুল্য গৃহে তাঁহাকে না দেখিলে তাহা ঠিক্ বুঝা যাইত না।

তিনি জাতিতে তৌলিক ছিলেন এবং সেই

জাতির মুকুট স্বরূপ দীঘাপতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারামসুলভ অসাধা কুশলতা তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইত। গল্প আছে প্রাতস্মরণীয়া-রাণী ভবানী ও তাঁহার স্বামীর নাবালকী অবস্থায় দয়ারাম কয়টি জায়গীর দান করেন। রাণী পরে তাহা কর্ম্মচারীর অধিকার বহির্ভূত বলিয়া বাজেয়াপ্ত করিতে উদ্যত হইলে দয়ারাম বলিলেন, মা তা হলে যে তোমার অস্তিত্ব থাকে না, কেন না আমিই তোমাদের বিবাহ দেওয়াইয়াছি। এইরূপ নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা বাসুসরকার মহাশয়েরও চরিত্রের অস্থি মজ্জা ছিল এবং তাঁহার সম্বন্ধে সময়ে সময়ে যে অদ্ভুত জনরব উঠিত, তাহার মূলও ইহাই। মহারাণীমাতার নিজ মুখে একবার শুনিয়াছিলাম, চারিআনির রাণী গল্পচ্ছলে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে বাসু সরকারের পায়ের কাছে একবার একটা বেলগাছ হইতে পড়িয়াছিল। সরকারজী তাহাতে হাসিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন—"দেখ, শিবের চেয়ে মাহাত্ম্য আমার বেশী! শিব বিল্বপত্র মাথায় ধরেন, বেল আমার পায়ে পড়িল!"

পুটিয়ার ন্যায় ব্রাহ্মণপ্রধান ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব সমাজে নবশাখ সম্প্রদায়ের কোনরূপ প্রাধান্য যে সেকালে অসহনীয় ছিল তাহা বলা বাহুল্য। প্রধানত আমার উদ্যোগে একবার ব্রাহ্ম প্রচারক একজন রাজবাটিতে উপাসনা এবং সঙ্গীত করিয়াছিলেন। অপরাধের মধ্যে তিনি তাঁহার বক্তৃতার মাঝে মাঝে ভগবদ্গীতা এবং উপনিষদ্ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এজন্য সমাজের তিলকপুণ্ড্রধারীদের কাছে আমায় ভর্ৎসিত হইতে হইয়াছিল—"ছি বাবা, শূদ্রে গীতার ব্যাখ্যা করে, তাই কি শোনা লাগে?" এই শ্রেণীর লোক বাসুসরকার মহাশয়ের দ্বেষক ছিলেন। ভণ্ডামির জন্য মাঝে মাঝে তাঁহারা তাঁহার কাছে স্পষ্ট দুকথা শুনিয়া জ্বলিয়া যাইতেন। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার সরকার যেমন জাতির কথায় গৌরব করিয়া বলিতেন, "চাষ এখনও ছাড়ি নাই, বিজ্ঞানের চাষ চলিতেছে," ইনিও তেমনি সে পরিচয়ে তদ্রূপ আনন্দানুভব করিতেন। কুমারের প্রথম দেশভ্রমণ জন্য লুকাইয়া পলায়নের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সেই উপলক্ষে বাসুসরকার মহাশয়ও কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সেখানে এক অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নিকট তাঁহাকে পরিচিত করার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী তাঁহার এক সুহৃদ্ কিছু সঙ্কোচ বোধ করিয়া বলিতেছিলেন, মহারাণী স্বর্ণময়ী যে জাতীয়, বাবু কৃষ্ণদাস পাল যে জাতীয়, ইনিও সেই জাতীয়।" বন্ধুকে সেরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া সরকারজী স্মিতমুখে এবং ধীর প্রশান্তভাবে বলিলেন—মহাশয় আমরা তিলি!

সরকার মহাশয় "সুশিক্ষিত" দলভুক্ত ছিলেন না, জমীদারী সেরেস্তার বাঙ্গলায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন মাত্র। কিন্তু পাণ্ডিত্যের বড় সমাদর করিতেন। চরিত্রবান্ শিক্ষানুরাগী যুবকদের সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করা তাঁহার একটা অবশ্য কর্ত্তব্যকার্য্যের মধ্যে ছিল। তিনি ছোট ছেলেদের লইয়া আমোদ-প্রমোদ করিতে বড় ভাল বাসিতেন— এবং তাহাদের ভিতর কাহারও রচনাশক্তির পরিচয় পাইলে তাহাকে উৎসাহিত করিতেন। শৈলেশচন্দ্রের বয়স যখন ৮।৯ বৎসর মাত্র, তখন একদিন সরকার মহাশয়ের ফরমাইস হইল, রাজবাড়ীর এক

বর্ণনা লেখে। শৈলেশের সেই রচনার প্রথম দিকের দুই একটা লাইন মনে পড়িতেছে :—

মস্তকে ধরেছ তুমি বাঘ,
আর তুমি ধরিয়াছ বাবু নীলমণি,—
ছাড়িওনা কভু তারে !

তখন বালকের কবিতার এই বাবু নীলমণীতে ভারি হাসি পড়িয়া গিয়াছিল। এখন মনে হয়, সরকার মহাশয় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া রাজসংসারের কি বল ভরসা ছিলেন! তাঁহার স্থান বাস্তবিক পূর্ণ হইবার নহে।

সাধক রামপ্রসাদ ভগবতী আদ্যাশক্তির মাতৃস্নেহ ধ্রুব নিশ্চয় জানিয়া যেরূপ নিঃসঙ্কোচে আদুরে ছেলের মত বাৎসল্যের অভিনয় করিতেন, মহারাণীমাতার প্রতি সরকার মহাশয়ের সেই ভাব ছিল। মাতা ইহা বেশ জানিতেন এবং তাঁহার সেই দুরন্ত দুর্ম্মুখ ছেলেটির উপর মাঝে মাঝে খুব রাগ করিলেও শেষে সব ভুলিয়া যাইতেন।

কুমারের বিবাহের পর রাজসংসারের ব্যয় সঙ্কোচ আরম্ভ হইল,—নহিলে দেনা বাড়িয়া যায়। কিন্তু মহারাণীমাতার হাত অত্যন্ত দরাজ —দানাদির ব্যাপারে খরচ কমাইতে কিছুতে তিনি সম্মত হন না। বাবু সরকার ধনাধ্যক্ষ, টাকাকড়ি সব তাঁর হাতে, মনিব আদেশ দিলেও দানের পুরা টাকা এবং পূর্ব্বের মত সত্বর, আর খাজাঞ্চিখানার বাহির হয় না। ক্রমে ইহা মহারাণী মাতার গোচর হইল, তিনি বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। হাজার অসন্তুষ্ট হইলেও মাতা কাহাকেও কটু কথা বলিতেন না, কিন্তু বাবু সরকার এই নিয়মের ব্যতিক্রম স্থল ছিলেন। একদিন ত্রৈলোক্যকে বলিতেছিলেন, "তিলির পায় ধরা অপেক্ষা গোবিন্দ মজুমদার ব্রাহ্মণ, তার পায় ধরিও, কাজ হইবে। * * *" আর এক সময় সরকারজীর কথায় বলিয়াছিলেন —"দেখ, সবাই একদিন ক্ষমতা পায়, কিন্তু ক্ষমতা স্থায়ী নয়। জানি, রামজয় মজুমদার একদিন বড় ক্ষমতা দেখাইয়াছিল!"

মহারাণীর স্বসম্পর্কীয় রোহিণী সান্যাল বাবু সরকারের অধীনে কাজ করিতেন এবং তাঁহাকে জ্যাঠা বলিয়া ডাকিতেন। এক ঠাকুরাণী একদিন সান্যাল মহাশয়ের সমক্ষে বলিলেন, রোহিণীর চেহারা বাবুসরকারের মত হইতেছে। মা কহিলেন—"চেহারা ত জ্যাঠার মত হইতেছে, স্বভাবও বা হয়!" পরে সরকারজীর কথা উঠিল। তাঁহাকে কেয়ার করে না, তিনি টাকা চাহিতে পাঠাইলে তহবিলে টাকা থাকিলেও দেয় না, বরং তুচ্ছ করে। বৃন্দাবন দত্ত বলিল—মা তাহা কি হইতে পারে? মাতা বলিলেন—কাল পনর টাকা চাহিতে পাঠাইয়া পনর ঝাঁটা পাইয়াছি। কথা প্রসঙ্গে আর একদিন বলিতেছিলেন,— "কিছুতে দস্তখৎ করে না, এদিকে সাড়ে ষোল আনার কর্ত্তা!"

(ক্রমশ)

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

কর্ম্ম কি ও তাহার অনুষ্ঠান প্রণালী কি।

দুর্ভাগ্যবশত আমি পাবনা কনফারেন্সে উপস্থিত হইতে পারি নাই, উপস্থিত হই নাই বলিয়া কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের মধু-বর্ষি-বক্তৃতা স্বকর্ণে শুনিতে পারি নাই। পত্রিকায় দেখিয়াছি, দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় একদিন রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছিলেন; "আমি যদি চতুর্ভুজ ও পঞ্চবক্ত্র হইতাম, তবে আমি চারিহাত তুলিয়া পাঁচমুখে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা করিতাম।" আজ আমি কনফারেন্সে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সেই কথার যাথার্থ্য অনুভব করিলাম। রংপুরে এই সম্বন্ধীয় সভায় নরম গরম দলের সংমিশ্রণের উদ্দেশে আমি যে, "একান্ত শীতল জলে অঙ্গ অসাড় হয়, কার্য্যকারিতা লুপ্ত হয় ও একান্ত উষ্ণজলে শরীরে ফোস্কা পড়ে, শরীর সহ্য করিতে পারে না, সেই দুইয়ের মিশ্রণে যে মিশ্রিত জল জন্মে, তাহাই শরীরের উপযোগী ও উপকারক" বলিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের বয়লারের দৃষ্টান্ত সমধিক উৎকৃষ্ট ও সাদৃশ্যব্যঞ্জক। এই দুই সম্প্রদায়কে এক করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ অনেক যুক্তি, অনেক তর্ক, অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহার উপরে তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্বের বর্ণবিন্যাস করিয়া প্রবন্ধটিকে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সমালোচনা করিবার জন্য আমার এ প্রবন্ধের অবতারণা নয়। তিনি যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিয়াছেন, কর্ম্মক্ষেত্রে সকলকে অবতরণ করিবার জন্য উদ্বোধন করিয়াছেন, কর্ম্ম ভিন্ন নিষ্কৃতির উপায়ান্তর নাই, নানা যুক্তি, নানা তর্কে বুঝাইয়াছেন, কর্ম্মগ্রহণের জন্য পুনঃপুনঃ সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন, সেই কর্ম্ম কি, কি প্রকারে তাহার সংসাধন হয়, সেইটিই একান্ত ভাবিবার বিষয়, বুঝিবার বিষয় ও বলিবার বিষয়। সেই সম্বন্ধে আমি কিঞ্চিৎ বলিব বলিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ভারতের হিতকামী শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই সে বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, অনেকেই নিজের নিজের চিন্তাপ্রসূত নবাবিষ্কৃত-পথে চলিয়াছেন ও ভারতের কল্যাণকর-পথ মনে করিয়া এই দুর্দ্দিনে—অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে, মুখের গ্রাসের বিনিময়ে তাহাতে অর্থসাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না, পশ্চাৎপদ হইতেছেন না। ইহা দ্বারা ভারতের জাগরণ হইয়াছে বুঝা যায়, প্রাণের ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে বুঝা যায়, কিন্তু সেইটীই প্রশস্ত পথ কিম্বা—প্রকৃত পথ কি না—বুঝা যায় না। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লাঙ্গল ধারণ করিলে, হলচালনা করিলে উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে, কে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিবে, কে ইহার প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে, বুঝি না। পক্ষান্তরে ইংরাজ যাহা চায় তাহা হইবে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মত শিক্ষিত সমাজের আবাসভূমি বঙ্গদেশ একমাত্র মূর্খ, নিরক্ষর, বর্ব্বর ও

ভীরু লোকের আবাসভূমিতে পরিণত হইবে। তখন রাজনৈতিক স্বত্ব পাইবার জন্য বাঙ্গালী কোন দাবি করিতে পারিবে না, তখন আর বাঙ্গালীর রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার সামর্থ্য থাকিবে না, ইংরেজও তখন নির্ভয়ে উত্তর পশ্চিমবাসীর মত বাঙ্গালী দ্বারা কুলীর কার্য্য করাইবে। মানভূম ও বীরভূমের অধিবাসীর মত বাঙ্গালীকে অনায়াসে চা-বাগিচায় চালান দিবে, তাহাদিগের সবুট-দৃঢ়-চরণগ্রহণের জন্যও তাহাদিগের হস্তের শোভা সম্পাদনকারী বেত্রদণ্ড গ্রহণের জন্য বাঙ্গালীর বিনীত-পৃষ্ঠ প্রস্তুত হইবে। একথা অবশ্যই স্বীকার করি যে একমাত্র বর্ত্তমান প্রণালীর কৃষিদ্বারা—ভারতের উৎপন্ন শস্যদ্বারা—এই অবিচ্ছিন্ন দুর্ভিক্ষের উপশম হইবে না। বিভিন্ন দেশে ভারতোৎপন্ন শস্যের প্রয়োগ করিয়া ভারতের ক্ষতি নিবারণের সম্ভাবনা থাকিবে না। যাহারা ভেক-মূষিক ভক্ষণ করিয়া বুভুক্ষা নিবৃত্তি করিত, যাহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে সমস্ত প্রাণীই মানুষের আহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল রক্ষঃ-সহচর জাতি এক্ষণে ভারতের দৃষ্টান্তে ও সাহচর্য্যে মানুষ হইয়াছে, অনেক পরিমাণে তাহাদিগের মাংসাহার কমিয়াছে, ডাল রুটী সেস্থান পরিপূরণ করিতেছে। সেজন্য আমাদিগের দুঃখ, ক্ষোভ, ঈর্ষা বা বিদ্বেষ নাই, সেজন্য বিদেশে শস্য প্রেরণ রহিত করিবার ব্যবস্থাও আমাদিগের পক্ষে—হিন্দুর পক্ষে একান্ত নীতিবিরুদ্ধ, ধর্ম্ম-গর্হিত, শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও অর্থনীতির অননুকূল। সকল মানুষ ধার্ম্মিক হয়, হিন্দু তাহাই চায়। কোন প্রাণীর উপরে কোন প্রাণী হিংসা না করে, হিন্দু তাহাই চায়। হিন্দুর নিকট হইতে সকল প্রাণী আহার ও উপকার লাভ করে, হিন্দু তাহাই চায়। হিন্দু বাঁচিয়া থাকুক, আর সকলেই মরিয়া যাউক, এ নীতি হিন্দুর বেদ, উপনিষৎ, তন্ত্র, স্মৃতি, পুরাণ সকলেরই অনভিমত। "যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ"—যাহাদিগের শাস্ত্রের উপদেশ, তাহারা "বৈষম্য" পাইবে কোথা হইতে? "বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে" "শ্বপাকে" (চণ্ডালে) এমন কি কুক্কুরে পর্য্যন্ত যাঁহাদিগের সমদৃষ্টি, তাঁহারা বৈষম্য পাইবেন কোথা হইতে? "যাচিতারশ্চনঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন" সহস্র সহস্র যাচক আমার নিকটে উপস্থিত হউক, আমি যেন কোন ব্যক্তির নিকটেও যাচ্ঞা না করি; দেবতার নিকটে এইরূপ যাহাদিগের প্রার্থনা, তাহারা কি কখনও দেই বলিয়া দুঃখিত হইতে পারে বা না দিয়া হস্তসংকোচন করিতে পারে? তবে দিব কোথা হইতে এইটিই ভাবিবার কথা। বর্ত্তমান যুগে অজন্মা হইয়াছে বলিয়া লোকে মরে না, দৃষ্টান্ত ইউরোপ; ইউরোপে ত কোন দিনেও যথেষ্ট শস্য জন্মে না। বর্ত্তমান যুগে ইউরোপ ত কেবল মাংসাহারী নয়, ভোজনে ডাল রুটী ও আলুর ব্যবস্থা হইয়াছে, তথাপি ইউরোপে কি দুর্ভিক্ষ? সমুদ্র সভ্য-জাতির বিস্তীর্ণ ও বাধাশূন্য পথ হইয়াছে, পৃথিবীও সর্ব্বত্র পুষ্পকরথ বহন করিবার উপযোগী নির্ব্বাধ লৌহবর্ত্ম ধারণ করিয়াছে, এমন অবস্থায় দেশে ধন থাকিলে অজন্মায় মানুষকে যমদ্বারের অতিথি করিতে পারে না। ইউরোপে পারে না, ভারতে পারে কেন? এইটিই হইতেছে প্রশ্ন। উত্তর-ভারতে অর্থ নাই, দরিদ্রবহুল ভারত উচ্চ মূল্য দিয়া বিদেশা-গত আহার্য্য কিনিতে অসমর্থ। পর্জ্জন্যদেব

জলধারা বর্ষণে ধান্ত, গোধূম প্রভৃতির বৃক্ষগুলিকে সতেজ রাখিতে বা জীবিত রাখিতে সমর্থ, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধনধারা-বর্ষণে অসমর্থ। রাজর্ষি জনকের সময়ে বা রাজাধিরাজ পুণ্যশ্লোক রাম যুধিষ্ঠিরের সময়ে তাঁহাদিগের পুণ্যবলেও কখনও আকাশ হইতে ধনবৃষ্টি হয় নাই। আর আজ-ত আমরা পাপী, তাপী, অধর্ম্মাসক্ত জীব, আমাদিগের সময়ে এই ঘোর কলিযুগে ধনবৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা কৈ? পৃথিবীর নাম বসুন্ধরা, সমুদ্রের নাম সমুদ্র (মুদ্রার সহিত বর্ত্তমান) বা রত্নাকর। পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া তাহার বক্ষঃস্থল হইতে ধনরাশির উত্তোলন আবশ্যক ও সমুদ্র সন্তরণ করিয়া ধন অর্জ্জন করা বা হনুমানের ন্যায় বিদেশগত লক্ষ্মীর অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। পৃথুর প্রবর্ত্তিত নিয়মে কৃষিকার্য্য করিলে আর আমরা তাদৃশ ধনধান্যে অধিকারী হইব আশা করা যায় না। বহুযুগ যুগান্তরের কর্ষণে বলরামের লাঙ্গল, কর্ষণে কর্ষণে ভীমের লাঙ্গল ভোতা হইয়া গিয়াছে। ভীম বা বলভদ্রের লৌহময় লাঙ্গল-ফলকের তীক্ষ্ণতা সম্পাদনের জন্য, হয় একবার তাহাতে অগ্নিসংযোগ কর, নয়, সেই জীর্ণলাঙ্গলের পরিহার করিয়া নূতন লাঙ্গলের প্রবর্ত্তনা কর। এজন্য ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের স্বহস্তে লাঙ্গল ধরার প্রয়োজন নাই, ধরিলেও সুফল হইবে আশা করা যায় না। রুড়কি, পুণা ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে অনেক ছাত্রই কৃতবিদ্য হইয়া বাহির হইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কেহ খানিকটা দেওয়াল গাঁথিবার জন্য অগ্রসর হয়েন, তবে তিনি সেই কার্য্যে যতটা সময়ের অপব্যবহার করিবেন, একজন নিরক্ষর রাজের অভ্যস্ত-হস্ত তাহা অপেক্ষা অতি অল্প সময়ে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে সুচারু ও পরিষ্কার রূপে গ্রথন করিতে সমর্থ। জ্ঞান ও হস্তক্রিয়া এক নয়, জ্ঞান ও কর্ম্ম এক নয়। পুনঃপুনঃ কর্ম্মানুষ্ঠানে হস্তাদির জড়তা লুপ্ত হয়, হস্তাদি কর্ম্মক্ষম সমর্থ ও সেই সেই কর্ম্মে নিপুণ হয়। অভ্যাস ব্যতিরিক্ত হস্তাদির কর্ম্মক্ষমতা ও নৈপুণ্য অসম্ভব। দুই একদিনের অভ্যাসেও হস্তাদির তাদৃশ ক্রিয়াকারিতা জন্মে না, এজন্য দীর্ঘকাল অভ্যাসে হস্ত শিক্ষার প্রয়োজন। যে ব্যক্তি এইরূপ অভ্যাসে নিযুক্ত থাকিবে, তাহার পক্ষে জ্ঞানার্জ্জন অসম্ভব। জ্ঞানী তর্কবলে বিষয়ের অবধারণ করিয়া কর্ম্মীর হস্তে অনুষ্ঠানের ভার অর্পণ করিবেন। কর্ম্মী তাহার অনুষ্ঠান করিয়া যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া তাহার ফল আহরণ করিবে; এইরূপ ব্যবস্থাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত, এইরূপ ব্যবস্থাই বোধ হয় ন্যায়ানুমোদিত। কৃষি-প্রধান-ভারতে কৃষকের অভাব নাই, শ্রমজীবীর অভাব নাই। যে নিরীহ কৃষক-শ্রেণীর শ্রমোপার্জ্জিত অন্নে এত কাল জীবিত রহিয়াছি, যাহাদিগের উপার্জ্জিত অর্থে এত কাল বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছি, এক্ষণে তাহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া স্বহস্তে হল চালনার ভার গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে, উৎসন্ন করা ম্লেচ্ছনীতির অনুসরণ ভিন্ন আর কি বলা যায়। হিন্দু এব্যবস্থায় প্রশ্রয় দিতে অসমর্থ। একেত বিদেশীয়ের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে না পারিয়া তন্তুবায়কুল তন্ত ছাড়িয়া লাঙ্গল ধরিয়াছে; ট্রাম গাড়ীর কৃপায় বাহককুল শিবিকাদণ্ড ছাড়িয়া লাঙ্গল ধরিয়াছে, ট্রেণ ও ষ্টিমারের অকৃত্রিম অনুগ্রহে নৌকাবাহিকুল ক্ষেপণীদণ্ড ছাড়িয়া

লাঙ্গল ধরিয়াছে; ইংরাজী সভ্যতা অনুচিকীর্ষু শিক্ষিত সম্প্রদায়ে শ্মশ্রুধারণ বা প্রত্যহ স্বহস্তে শ্মশ্রুমুণ্ডনের প্রবর্ত্তনায় নাপিতদিগের অনেকেই ক্ষুর ছাড়িয়া লাঙ্গল ধরিয়াছে, বিদেশাগত কাচ পাত্রের (১) বাহ্য চাকচিক্যের সম্মোহনে কাংস্য-কার ও কুম্ভকারের অনেকে যন্ত্র ছাড়িয়া লাঙ্গল ধরিয়াছে, আবার আমরাও যদি পুস্তক পত্র ও লেখনীদণ্ড ছাড়িয়া হলদণ্ড ধারণ করি; তবে যে দিবারাত্রি অপরিসীম পরিশ্রমের ফলে নিরীহ কৃষককুল দুবেলা এক মুটো করিয়া মোটা ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করে, তাহারও সংস্থান থাকিবে না। আমেরিকায় যেমন সভ্য জাতির অনুগ্রহের ফলে আদিমনিবাসীরা নির্ম্মূল হইয়াছে, এদেশে হিন্দুর অত্যাচারে হিন্দুর সহোদর ভ্রাতা সহস্র সহস্র বর্ষের অন্নদাতা-অকপট নিরীহ প্রাচীন কৃষককুলের নির্ম্মূল হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। ভারতে কৃষিক্ষেত্র আছে সত্য, কৃষক আছে সত্য, কিন্তু উপদেষ্টা নাই। এই উপদেষ্টার অভাবে, কার্য্যপ্রণালীর অভাবে ভারতের উর্ব্বরভূমি ক্রমে মরুভূমিতে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। মানুষের যেমন আহার আছে, বৃক্ষেরও তেমনি আহার আছে। মানুষ যেমন স্বচ্ছন্দ আহার না পাইলে রুগ্ন, শীর্ণ ও বীর্য্যহীন হইয়া পড়ে, বৃক্ষও তেমনি স্বচ্ছন্দ আহার না পাইলে রুগ্ন, শীর্ণ ও ফলোৎপাদনে অক্ষম হইয়া পড়ে। প্রাণি জগৎ ও উদ্ভিজ্জগতে একটী আদান প্রদানের ক্রিয়া আছে, পরস্পরকে পরস্পরের সম্পদ বিনিময়ের বিধান আছে। বৃক্ষের ফল, পুষ্প, পত্র ও কাণ্ড আমাদিগের আহার; আমাদিগের আবার মল, মূত্র, অস্থি প্রভৃতি বৃক্ষের আহার। আমরা যে শ্বাস ত্যাগের সঙ্গে অঙ্গারাম্লজনি বাষ্প (Carbonic-oxide) ত্যাগ করি, বৃক্ষ আবার তাহা হইতে অঙ্গারভাগকে (carbon) গ্রহণ করিয়া অম্লজানভাগকে (oxygen) ত্যাগ করে। আমরা আবার তাহার সেই পরিত্যক্ত অম্লজানকে (oxygen) বায়ুমণ্ডল হইতে শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত্তে গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করি। সুতরাং প্রাণিজগতের সহিত উদ্ভিজ্জগতের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্পষ্ট বুঝা যায়। জগতে বৃক্ষশ্রেণী না থাকিলে মানুষের অবস্থিতি হইত কি না সন্দেহ। মনুর শাসনের সময়ে মানুষ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অনাবৃত-ক্ষেত্রে যাইয়া স্বহস্তে গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে মলত্যাগ করিত ও পরিত্যক্ত মলকে মৃত্তিকাদ্বারা প্রোথিত করিত।

জঠরাগ্নি যেমন ভুক্তদ্রব্যকে পরি-পাচিত করিয়া শরীরের উপযোগী করে, বহির্জগতেও তেমনি বৃক্ষের খাদ্য প্রস্তুত করিতে একবার পরিপাক ক্রিয়া হয়, একই ক্রিয়া সর্ব্বত্র বিদ্যমান। সূর্য্যরশ্মি সেই পরিপাক ক্রিয়ার বাধা দেয়, সেই জন্য মলাচ্ছাদনের ব্যবস্থা। আবার মল হইতে উত্থিত দূষিত বাষ্প মানবের অস্বাস্থ্য উৎপাদন করিতে পারে। বিজাতীয় দুর্গন্ধ নাসিকার সহিত মানুষকে উত্ত্যক্ত করিতে পারে, সে জন্যও মলাচ্ছাদনের ব্যবস্থা। হিন্দু স্বাধীনতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর আয়াস-সাধ্য অনেকগুলি শাস্ত্রোক্ত আচার লুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং অনেক দিন

(১) প্রাচীন ভারতে কাচপাত্রের ব্যবহার ছিল, ও করিবার পদ্ধতি ছিল। বাচস্পতি মিশ্রের ওদ্ধি চিন্তামণি ও প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত বচন এবং অঙ্গিরসের নামাঙ্কিত স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ তাহা প্রমাণ করিতেছে।

পূর্ব্ব হইতেই মলাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হিন্দু সমাজ হইতে বিদূরিত হইয়াছে। ছিল কেবল মলত্যাগ। তাহাও আমরা সভ্যতার খাতিরে দূর করিয়াছি। সভ্যতাভিমানী-আমরা একান্ত আলস্যপর,—আমরা নগরে মিউনিসিপালিটির প্রবর্ত্তনায়, গ্রামে, আবার তাহার দৃষ্টান্তে শয়নগৃহের অদূরে, পাকশালা ও ভোজন গৃহের অদূরে, শাস্ত্রে যাহা কেবল রোগীর জন্য ব্যবস্থিত, অন্যের জন্য নহে, সেই বর্চ্চঃ স্থানের (পায়খানার) প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। ক্ষেত্রে অনাবৃত মলের অবস্থানে ধান্যাদির তাদৃশ উপকার না হইলেও কিয়ৎপরিমাণে উপকার হইত মনে করা যায়। ইন্ধনের অভাবে ক্রমে গোময়কে শুষ্ক করিবার ব্যবস্থা পুরন্ধ্রী মহলে খুব বাড়িতেছে। সুতরাং ক্ষেত্রে আর পূর্ব্ববৎ এই উভয় বিধ ব্যবস্থায় কোনওরূপ মল বর্ষণই হয় না, মল বর্ষণ হয় না বলিয়া ধান্যাদি বৃক্ষ পূর্ব্ববৎ আহার পায় না। তিলকল্ক প্রভৃতি (খৈল) ধান্যাদি বৃক্ষের একটী প্রধান খাদ্য। এক্ষণে ক্ষেত্রে খৈল দিবার ব্যবস্থা নাই। গরুকে আহারের সঙ্গে যে পূর্ব্বে খৈল দেওয়া হইত, গোময়ের সঙ্গে তাহার অনেকটা বাহির হইয়া ক্ষেত্রে পতিত ও ধান্যাদির আহার হইত, এক্ষণে বিদেশে আস্ত তিল, আস্ত সর্ষপ, আস্ত তিসির রপ্তানি হইতেছে বলিয়া গোজাতি আর পূর্ব্ববৎ খৈল পায় না। পায় না বলিয়া ক্ষেত্রেও গোময়ের সঙ্গে দিতে পারে না। অস্থি, ধান্যাদি বৃক্ষের একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। রাজা রিপুঞ্জয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত তাঁহার রচিত কৃষিতন্ত্রে "মাসীনংসার্ষপং তৈলং কল্কমঙ্গারভস্মচ ক্ষেত্রেক্ষেত্রপতির্দদ্যাচ্চূর্ণাস্থীনিচ নিত্যশঃ।" এই বচনে খৈল, অঙ্গার, ভস্ম এবং অস্থি চূর্ণ ক্ষেত্রে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কৃষকদিগের মূর্খতা ও অজ্ঞতার প্রাবল্যে, আলস্যের আধিক্যে ক্ষেত্রে অস্থি চূর্ণাদি দিবার পদ্ধতিও অনেক দিন উঠিয়া গিয়াছে। গবাদি পশুর অস্থিগুলি দীর্ঘকাল মৃত্তিকায় থাকিয়া ধান্যাদির আহারোপযোগী হইত, এক্ষণে আর তাহাও হইবার সম্ভাবনা নাই। ট্রেণে চড়িয়া ইতস্তত পথের পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, পথের দুই পার্শ্বের অনেক স্থলে পর্ব্বতাকার অস্থিস্তূপ। কৃষককে জানিতে দেওয়া হয় নাই, বুঝিতে দেওয়া হয় নাই, তাহাদিগের অনুমতি না লইয়াই, তাহাদিগের অজ্ঞাতসারেই বিদেশীয় সুসভ্য সাম্যবাদী বণিক্‌কুল পূর্ব্বে ট্রেণে, পরে জাহাজে বোঝাই করিয়া স্ব স্ব দেশে ভারতবর্ষের অস্থি সমূহ চালান দিতেছেন। মূর্খ নিরীহ কৃষক কুল দেখিয়াও তাহা দেখে না, দেখিয়াও বাধা দেয় না, অস্থি থাকিলে তাহাদিগের কি উপকার হইত জানে না, গেলেই কি অপকার হইবে জানে না। আস্ত তিল, আস্ত সর্ষপ, আস্ত মসিনা না পাঠাইয়া সেইগুলির যদি তৈল প্রস্তুত করিয়া পাঠান যায়, তাহা হইলে বিদেশেও তৈলের অভাব হয় না। আমাদিগেরও অর্থের ক্ষতি হয় না, দেশের খৈল দেশে থাকিয়া ধান্যাদির উপকার ও তদ্দ্বারা দেশের উপকার করে। পাশ্চাত্য কৃষিবিজ্ঞানেও ক্ষেত্রে খৈল প্রভৃতি (plantfood) দিবার ব্যবস্থা আছে। আমাদিগের দেশের নিরক্ষর কৃষকেরা বিজ্ঞান জানে না, জানিবার প্রয়োজন মনে করে না। বিজ্ঞানানুমোদিত প্রণালী জানিলেই যথেষ্ট। ড্রাইভার বিজ্ঞান জানে না, প্রণালী জানে। প্রণালী জানে বলিয়াই ট্রেণ চালাইতে সমর্থ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতে কৃষকের অভাব নাই, অভাব আছে উপদেষ্টার। এই উপদেষ্টা প্রস্তুত করা এক্ষণে আবশ্যক। উপদেষ্টা প্রস্তুত করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিশিক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ড, জর্ম্মাণ, জাপান, বা আমেরিকায় ছাত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা সমধিক মনে করি না। যখন ভারতবর্ষে একমাত্র মিথিলা ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনার কেন্দ্রভূমি ছিল, সে সময়ে দুই চারিটি প্রসিদ্ধ (কন্দলিকার—শ্রীধরাচার্য্য প্রভৃতি) নৈয়ায়িককে লইয়াও বঙ্গদেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই, বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্রের তাদৃশ প্রসার হয় নাই। যখন রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি অধ্যাপকগণ নবদ্বীপেই অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন, সেই অবধি ন্যায়শাস্ত্রের জন্য বঙ্গদেশের প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। ক্রমে মিথিলা বঙ্গদেশের নিকটে হীনপ্রভ হইয়া দাঁড়াইল। ভারতে যদি ইংরেজি শিক্ষার জন্য স্কুল, কলেজের সৃষ্টি না হইত, ইংলণ্ডে ছাত্র পাঠাইয়া যদি আমাদিগকে ইংরেজি শিক্ষা করাইতে হইত, তবে কি এই অল্প সময়ের মধ্যে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার এত বিস্তৃতি বা প্রতিপত্তি হইত? কখনই না, হইবার সম্ভাবনা নাই! যাহাকে বিদেশে পাঠাইতেছি, সে ছাত্রটি সাহিত্যে ভাল হইতে পারে, দর্শনে ভাল হইতে পারে, অঙ্কে ভাল হইতে পারে, তাই বলিয়া তাহার মস্তিষ্ক যে বিজ্ঞান গ্রহণে সমর্থ, কি করিয়া এ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইব? আবার এক একটি বালকের পিছনে অনেক অর্থব্যয়, বিদেশে যাইতে বিদেশে থাকিতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। এত অর্থব্যয় করিয়াও পাইলাম, দুই চারিটি মাত্র বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত। এই সুবিস্তৃত ভারতভূমির পক্ষে দুই চারিটি বৈজ্ঞানিকের দ্বারা বিশেষত কৃষিবিজ্ঞানে কৃতবিদ্য দুই চারিটি মাত্র পণ্ডিতের দ্বারা কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা যদি বিদেশে ছাত্র না পাঠাইয়া ভারতেই বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষত কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষার স্কুল কলেজের প্রবর্ত্তনা করি তাহা হইলে সেই পরিমিত ছাত্রের বিনিময়ে আমরা অপরিমিত ছাত্র পাইব। একজনের মস্তিষ্ক বিজ্ঞান গ্রহণের উপযোগী না হইলেও বিজ্ঞান গ্রহণে উপযোগী মস্তিষ্ক যাহার, এইরূপ শত ছাত্র আমরা সেই স্থানে পাইব। সুতরাং অল্প দিনেই এই অল্প দিনের চেষ্টাতেই আমরা ভারতকে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতসমাচ্ছন্ন করিতে পারিব। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পি, এন, বসু, ও বি, সি, বসু প্রভৃতি বিদেশ হইতে প্রত্যাগত বৈজ্ঞানিকদিগকে লইয়া সম্প্রতি আমরা একটি বিদ্যালয় খুলিতে পারি। আবশ্যক হইলে বিদেশ হইতে—বিদেশীয় কৃতবিদ্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরও আনয়ন অসম্ভব নহে। এই অর্থপ্রিয়যুগে অর্থব্যয় করিলে কিছুই অসম্ভব থাকে না। সেই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষিত ছাত্রগণ বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া কৃষকদিগকে বুঝাইতে সমর্থ হইবেন। অবশ্য সেই সকল ছাত্র ব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌতম, কণাদ হইবেন না যে, অরণ্যানীস্থিত কুটীরে বাস করিয়া বল্কল পরিধান করিয়া, ফল, মূল, ভক্ষণ করিয়া গ্রামে ও নগরে আসিয়া নিঃস্বার্থভাবে উপদেশ দিবেন। এক্ষণে সে কাল নাই, সেকালোপযোগি পরিচ্ছদের জগতে পূজা নাই, সেকালোপযোগী ফলকন্দবহুল অরণ্য নাই। এক্ষণে দণ্ডকারণ্য নগর হইয়াছে,

সুন্দরবন মাঠ হইতে চলিয়াছে। সুতরাং সেই সব কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অর্থের প্রয়োজন হইবে। ভারতীয় রাজা ও ভূম্যধিকারিগণ তাঁহাদিগের ধনসম্পত্তির উন্নতিকল্পে বিষয়ের বিস্তৃতির অনুপাতে একটি বা দুইটি বা যতটি আবশ্যক, সেই কৃষিবিজ্ঞানে পারদর্শী পণ্ডিতকে বেতন দিয়া রাখিবেন। তাঁহারা কৃষকদিগের উপদেষ্টা হইবেন ও ক্ষেত্রের পরিদর্শক হইবেন। আর যদি রাজা ভূম্যধিকারী ইহার উপযোগিতা একান্ত না বুঝেন, তাহা হইলে ডিষ্ট্রিক্ট কমিটী স্বহস্তে ইহার ভারগ্রহণ করিবেন। তখন কৃষকেরা বুঝিবে, জগতে কোন বস্তুই উপেক্ষিত হইবার নহে। ছাই, বিষ্ঠারও প্রভূত উপকারিতা আছে। তখন আর পবিত্র-সলিলা গঙ্গার ন্যায় দেবনদীর পবিত্রজল পতিত মলরাশিদ্বারা দূষিত হইয়া মানুষের জন্য জীবন্ত নরকাগ্নিকে আহ্বান করিবে না। তখন মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ কৃষকদিগের হস্তে মলময় ইষ্টক বিক্রয় করিয়া মিউনিসিপালিটির আয় বৃদ্ধি করিবেন ও একস্থানে মলপুঞ্জ প্রোথিত করিয়া তাহার সন্নিহিত পানীয়জলের জলাশয়স্থ জলরাশিকে দূষিত করিয়া টাইফায়েড্ ফিবারের ন্যায় দুশ্চিকিৎস্যরোগের প্রসার বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে অতি প্রাচীন সময়ে বৃদ্ধ ঋষিগণ নগর গ্রাম ও জনপদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে সকল বিধানের প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন, আজ এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোক প্রাপ্ত আমরা তাহার প্রতিপালন না করিয়া গ্রাম, নগর ও জনপদকে দিন দিন অস্বাস্থ্যের আবাসভূমি করিয়া তুলিতেছি। ঋষিগণ নিরুদ্ধ জলাশয়ে অবতরণ করিয়া স্নান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কূপ হইতে ঘটদ্বারা, তড়াগ হইতে পিণ্ড (জলশূন্য কলস) দ্বারা জল উদ্ধৃত করিয়া দূরে (যাহাতে জল গড়িয়া বা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বসিয়া জলাশয়ের জল দূষিত করিতে না পারে এতদূরে) স্নান করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। মল, মূত্র, পূয, শোণিত, শ্লেষ্মা ও ঘর্ম্ম প্রভৃতিকে জলে ফেলিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর আজ আস্থাবান্ হিন্দু জলশৌচ অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করিয়া জলাশয়ের জললগ্নতীরে মূত্রোৎসর্গ করিতেছেন। আপামর সাধারণ পুরীষোৎসর্গের পর জলে অবতরণ করিতেছে, আস্থাবান হিন্দু তাহাতে বাধাপ্রদান করিতেছেন না। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য, বলিষ্ঠ হইবার জন্য আমাদিগের একান্ত যত্ন ও চেষ্টার প্রয়োজন। কেবল কাপড়ে স্বদেশীভাবকে সীমাবদ্ধ না করিয়া সকল বস্তুর জন্য স্বদেশী হওয়া কর্ত্তব্য। মোটর কার, বাইসাইকেল, গ্রামোফোন, ল্যাম্প প্রভৃতিতে বহু অর্থ বিদেশে যাইতেছে, চিনি লবণে অনেক টাকা বিদেশে প্রস্থান করিতেছে। তাহার বাধা দিয়া আমরাই বরং সেই সকল সামগ্রীর ব্যবহার করিতেছি। স্বর্ণপ্রসূ ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া বিদেশাগত স্বর্ণে আমরা গৃহিণীকে ভূষিত করিতেছি। পৃথিবীর মধ্যে ভারতের হীরক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত। আমরা কি ভারতের হীরক কখনও চক্ষে দেখিয়াছি? বিদেশাগত হীরকে অলঙ্কৃত হইয়া আমাদিগের গৃহিণীবর্গ অহঙ্কারের মাত্রা বাড়াইতেছেন। ভারতের সর্ব্বত্র অন্নবিস্তর স্বর্ণ আছে, রৌপ্য আছে, তাম্র আছে, লৌহ আছে, সীসা আছে, অভ্র প্রভৃতি আছে, মূর্খ আমরা বুঝি না, অলস আমরা তুলিবার চেষ্টা

করি না। বলা বাহুল্য সমস্তই ইউরোপ হইতে আসিতেছে।

যাহাদের নির্বোধ প্রতিপন্ন করিবার জন্য শত আখ্যায়িকার সৃষ্টি হইয়াছে, আমোদপ্রিয়, গল্পপ্রিয় পুরস্ত্রীগণ ও পুরুষগণ যাহার সম্বন্ধে শত উপন্যাসদ্বারা শ্রোতৃবর্গকে আমোদিত করেন, আশ্চর্য্যের বিষয় ও বিস্ময়ের বিষয়, সেই রাজা ভবচন্দ্রের ভগ্নপ্রাসাদের অভ্যন্তরে আজিও লৌহ পরিষ্কারক যন্ত্রের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। মধুপুরের গড়ে এখনও স্তূপে স্তূপে লৌহমল রহিয়াছে। ভবচন্দ্রের সময়ে গৃহে ও ইন্দারায় যে একরূপ সিমেণ্টের (সংস্কৃতে সিমেণ্টকে লেপ বলিত) ব্যবহার ছিল, কি প্রণালীতে ও কিরূপ উপাদানে তাহা প্রস্তুত, স্থাপত্য বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ আজও তাহার নির্ণয় করিতে পারেন নাই। রাজা ভবচন্দ্রের ভগ্নপ্রাসাদ রঙ্গপুর নগরের দক্ষিণে ৭।৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত, ভবচন্দ্রের পাঠনামে আখ্যাত। এই বিস্তৃত বঙ্গদেশে একটীমাত্র কাপড়ের পুরাতন কলের সংস্কার ও উন্নতি হইয়াছে। জলবিন্দু প্রক্ষেপ দ্বারা মরুভূমির উপকার অপেক্ষা তাহাতে বঙ্গদেশের অধিক উপকার হইতেছে মনে করা যায় না। অন্তত প্রত্যেক জিলায় এক একটি কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। সেই সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে তাম্র, লৌহ প্রভৃতি ধাতুনিচয়ের আবিষ্কার ও যন্ত্রবলে পরিষ্কার হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। স্থানে স্থানে দেশলাই ও চিনির কলের প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। লবণ সমুদ্রের তটে বসিয়া লিবারপুলের মুখাপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়। "ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ" অন্যের দ্বারে ভিক্ষার্থী হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। দেবতার নিকটে আমাদিগের প্রার্থনায় আছে "মা চ যাচিষ্য কঞ্চন" আমরা যেন কখনও কোন ব্যক্তির নিকট যাচ্ঞা না করি, উহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। বোধ হয় আমি এই প্রবন্ধের অনর্থক কলেবর বৃদ্ধি করিয়া পাঠক পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি করিয়া ফেলিলাম। যাহা হইবার হইয়াছে; অজ্ঞানকৃত যাহা করিয়াছি, তাহার ক্ষমা আছে, জ্ঞানকৃত পাপের ক্ষমা নাই, সুতরাং এই স্থানেই আমার এই প্রবন্ধের উপসংহার।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

মনীষা।

[মিশ্রকাব্য.]

চতুর্থ সর্গ।

"তাপাধার সূর্য্যগ্রহ অস্ত ওই করিল প্রয়াণ
(তাপ হ'তে সূর্য্যোৎপত্তি—ইহা যদি হয় সপ্রমাণ),
বিশ্রামার্থ এস সবে ফিরে যাই।" বহিয়া তখন
নতোন্নত রুক্ষ দীর্ণ ভূমিভাগ গুহা-সুশোভন

আলোক জড়িত তরু,—জাফরাণ-সুরভি আঁধার
লক্ষ্য করি শিবিরের খদ্যোতিকাক্ষীণ রশ্মিধার
নামিয়া চলিনু গিরিপথে। ভর করি স্কন্ধে মোর
মাঝে মাঝে ধরি মোর হাত, কৈল প্রিয়া সুধাভোর
এ মোর হৃদয়।—রক্ত স্ফীত বহিত ধমনী মম,
গুরু গুরু বক্ষোমাঝে আনন্দের তাল মনোরম
বাজিল তাহার সঙ্গে অপরূপ উত্থানে—পতনে।
অবশেষে অবতরি' সমতল ভূমে সর্ব্বজনে,
ডুবিয়া শিবির-গর্ভে নানা-মণি-রতন-সুন্দর
গালিচায় লভিনু আরাম। কনুয়ে করিয়া ভর
হইনু মগন অর্দ্ধ-শায়িত আলাপে। ভোজ্যাধার
নানা রসভরা যত্নে বহিতেছে কতনা আহার—
(কবির-মানস-নেত্র-পরিতপী নবরসে-স্বপ্ত
কাব্যসম) চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সুরা দৃপ্ত
সৌরভ উৎসারি'।
কহিলা রূপসী—"কেহ কর গান
আনন্দে লভুক্ এই বিরাম-মুহূর্ত্ত অবসান
সঙ্গীত-ঝঙ্কার-রাগে। জনৈক রূপসী অষ্টাদশী—
তীব্র ঝঙ্কারিয়া বীণা আরম্ভিলা সঙ্গীত উল্লসি'।—

গান।

অশ্রু,—অকারণ অশ্রু, নাহি বুঝি ভাষা কি যে তা'র
গভীর নিরাশা কূপে মর্ম্মমাঝে জনম লভিয়া
হৃদয় ভরিয়া উঠি আঁখি পথে বহে অনিবার
সুখের শরত ক্ষেত্রে চাহি যবে অতীত ফিরিয়া
ভাবি সে সুখের দিন, সে মধু অতীত কোথা গেল হায়।

বিদেশ হইতে তরী বন্ধু জনে যবে আনে বহি'
তাহার বার্ত্তা সে যথা রবি রেখা প্রথম উজলে
যে তরণী পুনঃ প্রিয় জনে সুদূর প্রয়াণে
রবি-রেখা পালে তা'র যেমতি প্রকাশে দুঃখাতুরা
এত দুঃখময়—এমন সরস দিন কোথা গেল হায়!

শেষ মধু যামিনীর আধ জাগরিত পাখী-গান
বিষাদ বিস্ময় আনে মুমূর্ষুর শ্রবণে যেমন
তখন মরণ আসি জড়িমা করেছে চোখে দান
অস্ফুট আলোক ভরা হেরিছে সে ক্রমে বাতায়ন।
এমনি বিষণ্ণ, এমনি বিস্মিত দিন কোথা গেল হায়!

মরণের পরে যথা চুম্বন স্মরণে প্রিয়তর
আশা শূন্য-কল্পনার দৌত্যে কিম্বা যথা সুমধুর,
যে ওষ্ঠ পরের তরে চুম্বন সে—তাহারি উপর,
প্রথম-প্রণয়-সুগভীর মত্ততায় পরি পূর
জীবনে মরণ ওরে সে সুখের দিন নাহি আর হায়।

এমনি উচ্ছ্বাসে বালা গাহিল,—করিল টলমল
(যা'র কথা বর্ণিত গাথায়) বিন্দু সেই আঁখি জল।
মুক্তাসম গড়াইয়া মিলাইল স্ফীত বক্ষোমাঝে;
কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহ রাজ্ঞী কহে "হেন ধ্বনি বাজে
যদি নষ্ট অতীতের মাঝে এমন বেদনা ভরা
নারীর অনিষ্ট সাধি'—তুলা দিয়ে কর্ণ রোধ করা
শ্রেয় শত বার। কিন্তু এ কল্পনা তব অনুমানি
নিতান্ত অলীক, রঙ্গীন আলস্যসূত্রে জালখানি
যতনে গেঁথেছে তুলি। ব্যর্থ অনুশোচনায় কোথা
কবে ফলেছে সুফল? তা'র চেয়ে অতীত বারতা
অতীতের সিন্ধুনীরে করি বিসর্জ্জন, বাহি' চল
তরি—বৃদ্ধ তুষারের দ্বীপ, যেমতি সে হিমাচল—
উত্তম-রবির তাপে গলিবে নিশ্চয়,—দূর করি
জীর্ণ প্রথা—মুক্ত করি নারী পথ; চক্ষু ভরি
হেরুক্ ধরণী—বিবর্ত্তনে বিশ্বের কল্যাণ; শুভফল
উদ্দেশিয়া, সর্ব্ব বিশ্ব ক্লান্তি না মানিয়া অবিরল
ছুটিয়াছে মঙ্গলেরি পথে। সত্য বটে ছিল সব—
শিল্প-জ্ঞান, তত্ত্ববিদ্যা—অতি উচ্চ অতীত বৈভব
তবুও অন্যায়-দৈত্য অন্ধ বিশ্বাসের দণ্ড ধরি
নিয়ন্ত্রিত লোকপুঞ্জ অবিচারে সর্ব্ব দেশ ভরি'।

ধ্বংসিয়াছে তা'রে কাল—দেখ চাহি পূরবে নূতন
জাগিতেছে উষারাগ,—সমুদিবে নবীন তপন
রমণী-মহিম-দীপ্ত,—ভেদাভেদ ঘুচিবে অচিরে,
দাসীত্ব-বন্ধন-মুক্ত ভ্রমিবে রমণী উচ্চ শিরে।"
কহিলেন মোরে অতঃপর—"আপনি দেশের জ্ঞান
তুমি কি জান না কিছু? কিন্তু হেন নিরাশার তান
(অতীত-বেদনা-মাখা) চাহি না শুনিতে। পার যদি
বহাইতে হৃদিমাঝে আশা-কল-নিনাদিনী নদী
গাহ তবে শুনি গান।
তখন পড়িল মোর মনে
সরসীর শ্যাম বক্ষে রাজহংস নেহারি নয়নে
কবিতা রচিয়াছিনু,—কিছু অংশ মনে ছিল তা'র
কল্পনা পূরা'ল কিছু,—যথাসাধ্য করি অনুকার
রমণীর বংশীকণ্ঠ গাহিয়া উঠিনু সেই গান;—
ছদ্মবেশ বিস্মরিয়া উচ্ছ্বাসিল মোর কণ্ঠতান।

গান।

মরাল! ও করে ধরি' আমি অনুনয় করি
উড়ে যা' দক্ষিণে যথা প্রিয়া
বাতায়নে বসি' তার' আমার হৃদয়-তার
নিবেদিস্ হাসিয়া কাঁদিয়া।

বলিস্ মরাল! তা'রে ছলা কিছু জানিনা রে
এ প্রেম চোখের নহে নহে
গভীর এ হৃদিমাঝে কলধ্বনি মধু বাজে
তারি প্রেমামৃত স্রোত বহে।

বলিস্ মরাল! তা'রে পবন হইলে যারে
পশিতাম সেই মুখে চাহি'
শতেক কাকলি তুলি রহিতাম সব ভুলি
ঘুরিতাম লক্ষ প্রেম গাহি'।

মরাল হতা'ম যদি তাহা হ'লে নিরবধি
আমারে ডাকিত প্রিয়া ঘরে
আদরে জড়ায়ে বক্ষে নির্নিমেষ মত্ত চক্ষে
কত কি বলিত প্রেমভরে।

ধরায় বসন্ত আসে । কত তরু প্রেমে হাসে
ফুটাইয়া হাসি ফুলময়
কেবলই সে কুন্দলতা গুপ্ত রাখে প্রেমকথা
প্রিয়া তথা উদাসিনী রয়।

নিবেদিস্ প্রেয়সীরে বসন্ত এসেছে ফিরে
মানসে গিয়াছে হংসকুল ,
বিরহ-অনলে তাপি দিবস রজনী যাপি
শুষ্ক হইল মোর হিয়াফুল।

ওরে আর কতদিন বসে র'বে প্রেমহীন
ক্ষয় হয় ক্ষণিক যৌবন
প্রেম, সে যে অন্তহীন আমরা দু'চারি দিন
এ মরতে এনেছি জীবন।

সোণার কানন হ'তে চড়িয়া পবন রথে
যা'বে উড়ি' প্রিয়ার নিকটে
সেধে সেধে গেয়ে গান তাহারে বাঁধিয়া আন্
বাঁচা' মোরে এ প্রেম সঙ্কটে।

(ক্রমশ)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

হুজুর।

১

মনুষ্য-চরিত্র অতি দুর্জ্ঞের সন্দেহ নাই!

কালের প্রভাব যে অনতিক্রমণীয় একথা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অথচ লোকে সম্প্রতি "চার পায়ে"র উপর উপবেশন করিয়া মৃৎপাত্র হইতে "পোই"এর "কালিয়া"এবং বার্ত্তাকুর "কোর্ম্মা" সহযোগে "ঠাণ্ডি পোলাও" ভোজন-নিরত, খাঁ সুলতান, গরিবুল্লা সাহেবের পূর্ব্বগৌরবকাহিনীর কথা শুনিয়া বিদ্রূপের হাসি কেন হাসিত, ইহার যুক্তিসঙ্গত কারণত কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না!

খাঁ সাহেবের শৈশবকালে খাঁ সাহেব প্রত্যহ গাজিপুরি "ইত্তর" পরিপূর্ণ চৌবাচ্চায় নিমগ্ন হইয়া স্নান করিতেন বা তাঁহার "পেয়ারের" কুত্তার গলায় দুই লক্ষ মুদ্রা মূল্যের

হীরক-বিজড়িত বহুনী রোজ পাইত অথবা তাঁহার "বকরি" কেবল এঁদাটি ও আকরাথ খাইয়াই প্রাণ ধারণ করিত ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। তবু কি জানি কেন লোকে একথা লইয়া খাঁ সাহেবের সমক্ষে ও পরোক্ষে পরিহাসের হাসি হাসিত। হায় মুঢ়ের মানব-চরিত্র! কিন্তু প্রকান্তরে যাহারা নির্ধনতার মধ্যে আমীরের মেজাজ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা "না-লায়েক" এবং "বেতমিজ" লোকের এই ঘৃণিত পরিহাস কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। কাজেই খাঁ সাহেব এই সকল অর্ব্বাচীনকে কিরূপে সমুচিত শিক্ষা দিবেন এই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া প্রতিদিন বিস্তর কষ্টসংগৃহীত তাম্রকুট আপনার অজ্ঞাতসারে ভস্মীভূত করিতেছিলেন।

আজ তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্রুদ্ধ এবং বিষন্ন দেখাইতেছিল। বখ্‌তিয়ারপুরের উদ্ধত জমিদার নেমধারী সিং (যাহার "পরদাদা" খাঁ সাহেবের "পরদাদা"র "পেয়াদগি" পাইলে কৃতকৃতার্থ হইত।) আজ খাঁ সাহেবকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত করিয়াছিল। খাঁ সাহেব আজ অপরিসীম হীনতা স্বীকার করিয়া নেমধারী সিংহের বাটীতে একটা পাটোয়ারির কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া দর্শন দিয়াছিলেন। নেমধারী সিং তাহাতে পরম সম্মানিত বোধ না করিয়া কিনা তাঁহাকে "খাঁ সাহেবকে নওকর রাখ্‌নে ক্যা হামরা আওকাৎ থোরা নেহি হায়।" বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল। "বেতমিজ," "কমবক্ত্‌"। "বেশিরাজ্‌"!! খাঁ সাহেব উচ্ছ্বসিত ক্রোধাবেগ সংযত করিতে না পারিয়া "করুয়া" অম্বাকুকে দুই বিন্দু গোলাপজল সহযোগে "খামিরায়" পরিণত করত, স্বহস্তে সাজিয়া (নিজে খোদা! "হাজারো নফর" যাহার হুকুম তামিল করিবার জন্য "হামেশা" "মুস্তৈদ" থাকিত, এবং যাহার ললাটে এক বিন্দু ঘর্ম্ম দেখিলে তিন শত "বাঁদী" পাখা করিবার আগ্রহে আপোষে ভীষণ দাঙ্গা বাধাইয়া ফেলিত।) উপর্য্যুপরি তিন ছিলিম তাম্রকুট নির্দ্দয়ভাবে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। তবু নেমধারী সিংহের পরিহাস-বাণী তাঁহার কর্ণে নিনাদিত হইতে লাগিল। খাঁ সাহেব বহুক্ষণ দীর্ঘশ্মশ্রুমধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া কঠোর প্রতিজ্ঞা করিলেন, ইহার প্রতিকার যদি না করিতে পারি, তাহা হইলে "ফকিরি" গ্রহণ করিয়া "মক্কাসরিফ্‌" রওয়ানা হইব!

২

সংসার মরুভূমে খাঁ সাহেবের জীবনকে কোন প্রকারে সহনীয় করিবার জন্য খাঁ সাহেবের পরিচিত জনমণ্ডলীমধ্যে একটিমাত্র সুরভি কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল—সেটি খাঁ সাহেবের একমাত্র রাইয়ত্‌ মীর মশরফ্‌ আলি।

দৌলতপুরে মশরফই একমাত্র খাঁ সাহেবের "কদর" বুঝিত। সে "কুর্ণিশ্‌" না করিয়া কদাচ খাঁ সাহেবের সম্মুখীন হইত না এবং কদাচ তাঁহাকে "হুজুর" ভিন্ন অন্য শব্দে সম্বোধন করিত না।

খাঁ সাহেবের মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ শোচনীয় তখন সহসা মশরফ্‌ আলিজান "কুর্ণিশ" করত তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। খাঁ সাহেব সাগ্রহে মশরফ্‌কে হাত ধরিয়া আপনার পার্শ্বে বসাইতে উদ্যত হইলেন কিন্তু মশরফ্‌ স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের প্রাবল্যে কিছুতেই আসন

বে-আদবি দেখাইতে সাহস হইল না। হজুরের সঙ্গে একাসনে উপবেশন! মশরফ পরলোকে গিয়া "খোদাতালার" নিকট কি জবাব দিবে? অনুরক্ত ভক্তের আনুগত্য দর্শনে খাঁ সাহেব মনে মনে অপরিসীম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন এবং প্রশংসমান চক্ষে মশরফের দিকে চাহিয়া অস্ফুট কণ্ঠে কহিলেন "মশরফ্ দুনিয়ার সকল লোক যদি তোমার মত "কদর দাঁ" হইত।"

কিছুক্ষণ আদর আপ্যায়নে অতিবাহিত হইলে মশরফ্ কহিল "হুজুরকে আজ এমন বিষন্ন দেখাইতেছে কেন?" দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হুজুর কহিলেন "আর মশরফ্, বুঝি আর এ দুনিয়ায় থাকা হয় না, আমি শীঘ্রই ফকিরি গ্রহণ করিয়া এক দিকে চলিয়া যাইব স্থির করিতেছি।"

ভীত চকিত মশরফ্ কহিল "একি আজ্ঞা করিতেছেন হজুর? হুজুরের মত লোক যদি সংসার হইতে চলিয়া যান তাহা হইলে সংসারে আর অরণ্যে প্রভেদ কি রহিল হুজুর?" বলিতে বলিতে ভাবাবেগে মশরফের কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল।

মশরফের মনোবেদনায় ব্যথিত হইয়া হুজুর কহিলেন "কিন্তু এরূপ অপমান সহ করিয়া কেমন করিয়া চুপ করিয়া থাকি মশরফ্?" তখন খাঁ সাহেব করুণ কণ্ঠে নেশাখোর সিংহের দম্ভ এবং ঔদ্ধত্যের কাহিনী ধীরে ধীরে মশরফের কর্ণগোচর করিলেন। শুনিয়া মশরফ ক্ষণকাল অগ্নিগর্ভ ভূধরের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে হুঙ্কার করিয়া কহিল "কি স্পর্দ্ধা! হুজুরের সঙ্গে এই "শেখিবাজি! —ইহার সমুচিত প্রতিফল যদি না দিতে পারি তবে বৃথাই "খোদা" জনাবে "হুজুর" নিমক খাইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি।" মশরফ অদম্য ক্রোধানলে গর্জিতে গর্জিতে দু চার গাছ কৃষ্ণ শ্মশ্রু সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিল।

ক্ষণকাল প্রশংসমান চক্ষে মশরফের দিকে চাহিয়া চাহিয়া খাঁ সাহেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। উচ্ছ্বসিত আবেগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া মশরফকে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং মশরফের এই আপত্তি সত্ত্বেও তাহাকে আপন গড়গড়া হইতে দগ্ধাবশেষ তাম্রকূট ধুম বার বার পান না করাইয়া কিছুতেই ছাড়িয়া দিলেন না। তার পর ক্ষণকাল পরামর্শের পর মশরফ রীতিমত "কুর্ণিশ" করিয়া খাঁ সাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

৩

সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি নগদ পাঁচ শত মুদ্রায় বাঁধা দিয়া খাঁ সাহেব ভাগ্যপরীক্ষার্থে সুদূরে উপনীত হইলেন। মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায় খাঁ সাহেবের জন্য আবাসবাটী স্থিরীকৃত হইল। মাসিক ৩০্ টাকা ভাড়ায় এক খানি ঘোড়ার গাড়ী সর্ব্বদা খাঁ সাহেবের দ্বারে উপস্থিত থাকিতে স্বীকৃত হইল। খাঁ সাহেবের পরিধানার্থ জরিখচিত সাটিনের পোষাকের বায়না দেওয়া হইল—খাঁ সাহেবের গমনাগমন ঘোষিত করিবার জন্য দ্বারদেশে নহবৎ বসিল —রাত্রে নৃত্যগীতের জন্য বাইজি নিযুক্ত হইল —দুই চারি দিনের মধ্যে পাড়ায় হুলস্থুল পড়িয়া গেল—কোথা হইতে এক নবাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

মশরফ দিবারাত্রি চক্রবৎ ঘুরিতে লাগিল এবং লোকজনের কাছে এবং হুজুর মজলিসের

মাত্রা যথেষ্ট বাড়াইয়া ফেলিল। অল্পকালের মধ্যে খাঁ সাহেব "উচ্চ চক্রে" পরিচিত হইলেন এবং অতি মহার্ঘ্য মূল্যে বৎস মাংস এবং ফলাদি ক্রয় করিয়া নিজের জমীদারি হইতে সমানীত বলিয়া জেলার হাকিমবৃন্দকে "সওগাদ" দিয়া দিয়া যুগপৎ আপনার গৌরবকে স্ফীত এবং অর্থের থলিকে কুঞ্চিত করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পাঁচ শত মুদ্রার অধিকাংশ শেষ হইয়া আসিল কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোনই সম্ভাবনা দেখা গেল না। গোপনে এক দিন খাঁ সাহেব কাতরকণ্ঠে মশরফ্‌কে বলিলেন, "মশরফ্‌ কিছু ত হইল না ভাই।" মশরফ্‌ কহিল "হতাশ হইবেন না, আর কিছু দিন সবুর করুন, আমি ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট বন্দোবস্ত করিতেছি।"

খাঁ সাহেব পুনশ্চ ভগ্ন-হৃদয় উৎসাহে বাঁধিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট আফিসের অতি তুচ্ছ কেরাণীকে পর্য্যন্ত সেলাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আরদালিগণকে ভোজ্য পানীয় এবং বখ্‌সিসে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন, সেরিস্তাদার সাহেবের জুতি নিজের রেশমি রুমাল সাহায্যে ঝাড়িয়া দিলেন এবং ক্লাবে উপস্থিত হইয়া "বিলিয়ার্ড" ক্রীড়া-নিরত ডেপুটি ও সাব্‌ ডেপুটী-বৃন্দের বাজির টাকা যোগাইতে এবং তাঁহাদের ক্রীড়াকালে "মার্কারের" কার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তবু কিছু হইল না। অবশেষে খাঁ সাহেবের শুভাদৃষ্ট ক্রমে বিহারে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। খাঁ সাহেব দেশের এই দারুণ অবনতিতে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া প্রাণপণে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে এবং প্রত্যহ সায়ংকালে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট গিয়া সমস্ত সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া আসিতে লাগিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব খাঁ সাহেবের কার্য্যতৎপরতা দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিলেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় গম্ভীর হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন "খাঁ সাহেব ভারতবর্ষে এই বিদ্রোহের সূত্রপাত, আর উপেক্ষা করা চলে না। "লৌহহস্তে" ইহার দমন প্রয়োজন, কিন্তু আমার অধীনস্থ ম্যাজিষ্ট্রেটদের মধ্যে দুই একজন মুসলমান ডেপুটি ভিন্ন যোগ্য লোক ত দেখি না। আমার বিশ্বাস আপনাকে "অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট" করিলে কাজের অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। আপনি কি বলেন?" খাঁ সাহেব তাড়িতস্পৃষ্টের ন্যায় লাফাইয়া উঠিলেন। কষ্টে আত্মসংযম করিয়া কহিলেন, "গরিব পরবর হুজুরের "বান্দা"-গিরিতে জীবন সমর্পণ করা অপেক্ষা তাঁবেদারের পক্ষে অধিকতর শ্লাঘনীয় আর কি হইতে পারে?"

এতদিনে খাঁ সাহেবের চিরপোষিতা আশালতা ফলবতী হইল—গভর্ণমেন্ট গেজেটে প্রকাশিত হইল খাঁ সাহেব সদরের "অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট" নিযুক্ত হইয়াছেন।

৪

খাঁ-বাহাদুর অনরারি-ম্যাজিষ্ট্রেট পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহত প্রতাপে "স্বদেশী"-দমন ও "বিদেশী"-প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। অল্পদিনে খাঁ-সাহেবের খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্ত জেলায় প্রবাহিত হইয়া পড়িল। খাঁ সাহেবের দুঃখ দৈন্য ঘুচিয়া গেল।

বাড়ীওয়ালা আর সাহস করিয়া বাকী ভাড়ার তাগাদা করে না। দোকানদার

[illegible]ল্য না পাইলেও শুধু জিনিস যোগাইয়াই কৃতার্থ হয়—গোয়ালা দুধের দাম চাহিতে আসিয়া শুধু সেলাম করিয়াই ফিরিয়া যায়—খাঁ সাহেব সুখসাগরের কূল দেখিতে পাইতে-ছিলেন না।

মশরফের আদেশে খাঁ সাহেবকে "হুজুর" ভিন্ন অন্য নামে সম্বোধন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। খাঁ সাহেব ভাবিতেছিলেন "একবার নেমধারী সিং যদি এই প্রতিপত্তিটা দেখিত।" "নেমধারী সিং!" হুজুর দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিলেন! আজও হুজুরের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বাকী রহিয়া গিয়াছে! হুজুর মশরফকে ডাকিয়া পরামর্শে নিযুক্ত হইলেন।

হুজুর এইরূপ সুগভীর পরামর্শে ব্যাপৃত আছেন এমন সময়ে স্থানীয় মধ্যইংরাজী স্কুলের হেড্‌মাষ্টার লালা ভুবনেশ্বরী প্রসাদ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। লালাজি হুজুরের সম্মুখীন হইয়াই ব্যাকুলভাবে কহিলেন "হুজুর ইহার প্রতীকার না করিলে ত আর চলে না। বলদেও সিং আজ এক স্বদেশী সভার আয়োজন করিয়াছে, সভার জন্য স্কুলে "বেঞ্চ" চাহিতে আসিয়াছিল, আমি দিই নাই বলিয়া আমাকে শাসাইয়া গিয়াছে যে সে স্কুলের তালা ভাঙিয়াও "বেঞ্চ" কোন প্রকারে লইবেই। এক্ষণে কি উপায় করা যায়? স্বদেশী সভায় "বেঞ্চ" গেলে আমার ত চাকুরি থাকে না!"

মশরফ সোৎসাহে বলিল "বলদেও সিং নেমধারী সিংহের পুত্র না?" মাষ্টার সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িলেন। মশরফ বলিল "হুজুর শিকার আপনা হইতে মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। নেমধারী সিংহকে জব্দ করিবার আর কোন চিন্তা নাই।" মাষ্টারকে কহিলেন "আপনি বলদেও সিংকে বলুন যে বেঞ্চ দিতে আপনার কোন আপত্তি নাই। বলদেও বেঞ্চ লইবার যাইবামাত্র দরজায় একটা তালা আঁটিয়া লাগাইয়া থানায় গিয়া "[illegible]" দিন যে বলদেও সিং বলপূর্ব্বক তালা ভাঙিয়া বেঞ্চ লইয়া গিয়াছে।" এদিকে হুজুরও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট যাইতেছেন। এইবার দেখা যাইবে নেমধারি সিংহের কত তেজ!

বিদ্যালয়ের বালকবৃন্দের ধর্ম্মশিক্ষক এবং তাহাদের আদর্শস্থানীয় লালাজি "[illegible]" এই ঘৃণিত প্রস্তাব সমর্থন করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। বিচারকর্ত্তা খাঁ সাহেবও উচ্ছ্বসিত আবেগে বহু মিথ্যা অলঙ্কারে সাজাইয়া এই পরম সত্যকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের গোচর করিলেন। ইহাতে উপরিওয়ালাদের কাছে তাঁহার রাজভক্তি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া গেল!

৫

সকল শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন।

"চুরি", "অনধিকার প্রবেশ", "স্বদেশী"! একেবারে ত্র্যহস্পর্শ। তখনি ইন্‌স্পেক্টর গিয়া বলদেও সিংকে গ্রেপ্তার করিল। জামিনের দরখাস্ত পত্রপাঠ নামঞ্জুর হইল।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিশেষ অনুরোধে মোকদ্দমা খাঁ সাহেবের এজলাসে আসিল। খাঁ সাহেব, সমস্ত যুক্তি, তর্ক, আইন তুচ্ছ করিয়া বলদেওকে ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। বাস "আক্‌শোষ"! খাঁ সাহেব প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা আর বুঝেন নাই।

খাঁ সাহেবের আজ জীবন সার্থক হইল, নেমধারী সিং কঠোর মনঃপীড়া পাইলেন, তাহার পুত্র লাঞ্ছিত হইল। খাঁ সাহেব উচ্ছ্বসিত হর্ষাবেগে সেদিন সমস্ত হাকিমকে ভোজ দিলেন। ঋণের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল।

নেমধারী সিং পুত্রের দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল করাইলেন। বলা বাহুল্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল নিষ্ফল হইল। পরিশেষে হাইকোর্ট কোন প্রকারে ইংরাজ-বিচারের মুখরক্ষা করিলেন। বহু অর্থব্যয়ে বলদেও সিং অব্যাহতি পাইল।

এইবার নেমধারী সিংহের কোপ প্রজ্বলিত বজ্রাশনের মত খাঁ সাহেবের উপর পতিত হইল।

মশরফ্ কেবলমাত্র প্রভুভক্তি ও পরোপকার প্রবৃত্তির আতিশয্যে খাঁ সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই।

খাঁ সাহেব দুগ্ধমাত্র দোহন করিয়াই পরিতুষ্টি লাভ করিতেন—দুগ্ধপান কেবল মীর মশরফ্ আলির ভাগ্যেই ঘটিত।

খাঁ সাহেবের "ফাইলে" যে সকল মোকদ্দমা আসিত, তাহাদের প্রকৃত বিচার, মীর সাহেবই সম্পন্ন করিতেন, খাঁ সাহেব আদালতে বসিয়া মশরফ্ প্রদত্ত রায়ের পুনরুক্তি করিতেন মাত্র।

বলা বাহুল্য মীর মশরফ্ আলির বিচারব্যবস্থা কিছু অভিনব প্রণালীর ছিল। সাধারণ [illegible] সাক্ষ্য প্রমাণের উপর তিনি কিছুমাত্র নির্ভর করিতেন না।

[illegible] নিকট উভয়পক্ষ বিচারপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে মশরফ প্রথমেই এক পক্ষকে জিজ্ঞাসা করিতেন "তুমহারা [illegible] কেয়া ?" সে হয়ত একখানি দশ টাকার "নোট" দেখাইত। তখন, মশরফ অপর পক্ষকে সুধাইতেন "তুমহারা ?" সে হয়ত দুইখানি দশ টাকার নোট দেখাইত। [illegible] মশরফ্ গম্ভীর হইয়া প্রথম পক্ষকে কহিতেন "ইস্‌কো সাবুদ তুম্‌সে বড়কে মালুম হোতা হায়!" এবং সে যদি "উচ্চতর" প্রমাণ না-দেখাইতে পারিত তাহা হইলে দ্বিতীয় পক্ষকেই বিজয়মাল্য দান করিতেন।

কোন্ কোন্ মোকদ্দমায় কি কি রায় দিতে হইবে তাহা খাঁ সাহেবের কাছারি গমনের পূর্ব্বে মশরফ্ খাঁ সাহেবকে যত্নপূর্ব্বক শিখাইয়া দিতেন। কাজেই খাঁ সাহেবের বিচার করিতে কোনই কষ্ট হইত না। এবং প্রভুভক্ত মীর মশরফ আলিরও বেশ চলিয়া যাইত।

এক্ষণে নেমধারী সিং খাঁ সাহেবকে বিপন্ন করিবার জন্য তন্ন তন্ন করিয়া এই সকল বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সর্ব্বতোগামিনী প্রতিভাবলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জলের মত বুঝিয়া ফেলিলেন—হিন্দুর মুসলমান বিদ্বেষ ইহার মূলে। নেমধারী সিং আরও উপরে উঠিলেন—কিন্তু দেখিলেন সব এক সুরে বাঁধা—সর্ব্বত্র "settled fact"-এর প্রতিধ্বনি।

হতাশ হইয়া নেমধারী সিং [illegible] আদালতের আশ্রয় লইলেন। যে যে মহাজনের নিকট খাঁ সাহেব টাকা ধারিতেন তাহাদের [illegible] দিয়া নালিশ রুজু করাইয়া দিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বান হইতে কিছুতেই স্বীকৃত হইবেন না। "যোশেপা বড়া হয়ে ইজ্জৎ বড়া" ?

মোকদ্দমায় একতরফা ডিক্রি হইয়া গেল। হুজুরের ভদ্রাসন বিক্রয় করিয়াও সকল টাকা উশুল হইল না। তখন তাহারা নেমধারী সিংহের পরামর্শে হুজুরের বিরুদ্ধে "গ্রেপ্তারি পরোয়ানা" বাহির করাইল।

হুজুর মেহ্দি-পত্র সাহায্যে আপনার অর্দ্ধ পক্ক শ্মশ্রুকে রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া, চক্ষে "সুর্‌মা" লাগাইয়া পারিষদ্ মধ্যে বসিয়া ভর্জ্জিত পেস্তাসহযোগে তাম্বুলসেবন এবং তাম্বুলরক্ত নিষ্ঠীবন সাহায্যে নিকটবর্ত্তী দেওয়ালকে সুরঞ্জিত করিতেছিলেন, এমন সময় দুই জন দেওয়ানি আদালতের পেঁয়াদা আসিয়া হুজুরের হস্তধারণ করিল। পারিষদমণ্ডলী সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন। "হুজুরের অঙ্গে হস্তক্ষেপ ?" কিন্তু তাহারা কিছুমাত্র ভীত না হইয়া আদালতের "ওয়ারেণ্ট" দেখাইল। হুজুর হুঙ্কার করিয়া বলিলেন "ম্যাজিষ্ট্রেট বড়া হয়ে মুন্সিফ্ বড়া ? হাম্ মুন্সিফ্‌কে হুকুম তামিল কর্‌নেকো পাবন্দ নেহি।"

পেয়াদারা কহিল তাহারা এরূপ গুরুতর বিষয়ের বিচার করিতে অক্ষম। আদালতে উপস্থিত হইলে ইহার সুমীমাংসা হইতে পারে।

অগত্যা হুজুরকে "বেতমিজ" মুন্সিফ সত্বরে ইহার ফলভোগ করিবে"—এইরূপ গর্জ্জন করিতে করিতে পেয়াদাদের সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইল।

বলা বাহুল্য মুন্সিফ সাহেব হুজুরের তর্জ্জন গর্জ্জনে চিহ্ন মাত্র ভীত হইলেন না। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া খাঁ সাহেবকে জেলখানায় লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। মশরফও কিছু উপায় করিতে পারিল না। সে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া হুজুরের দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়াছিল। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব শুধু বলিয়াছিলেন "sorry, লেকিন হাম্ কেয়া কর সক্তে হেঁ ?" হুজুরের পতনকাহিনী দেখিতে দেখিতে সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। বলদেও সিংহও স্বদেশ-সেবক যুবকবৃন্দের সঙ্গে জেলখানার পথে সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। হুজুর তাহাদের সম্মুখীন হইবামাত্র তাহারা "আদাব হুজুর" বলিয়া কপট ভক্তিভরে আভূমিপ্রণত হইয়া সেলাম করিল।

হুজুর পশ্চাদ্গামী মশরফের দিকে মুখ ফিরাইয়া গর্ব্বভরে কহিলেন "লেকিন্ কেয়া নোক্‌রি ভইয়া, আভিতক্ ভি—"হুজুর !""

মশরফ নীরবে ক্ষণকাল খাঁ-সাহেবের মুখ পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

শ্রীক্ষতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

আমার দেশ।

বঙ্গ আমার! জননী আমার,
ধাত্রী আমার, আমার দেশ!
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন?
কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ?
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন?
কেন গো মা তোর মলিন বেশ?—
সপ্তকোটি সন্তান যার,
ডাকে উচ্চে আমার দেশ।
(কোরস্)
কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!—
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে
ডাকে যখন আমার দেশ।

উদিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা
মুক্ত করিতে মোক্ষ দ্বার;
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ
ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর;
অশোক, যাঁহার কীর্ত্তি ছাইল
গান্ধার হ'তে জলধি শেষ;—
তুই ত না মা গো তাদের জননী
তুই ত না, মা গো তাদের দেশ?
(কোরস্)
কিসের দুঃখ ইত্যাদি।

একদা যাহার বিজয়সেনানী
হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণব-পোত
ভ্রমিল ভারত-সাগরময়,
সন্তান যার—তিব্বত, চীন,
জাপানে, গঠিল উপনিবেশ—
তার কি না এই ধূলায় আসন,
তার কি না এই ছিন্ন বেশ।
(কোরস্)
কিসের দুঃখ ইত্যাদি।

উঠিল যেখানে মুরজ মন্দ্রে
নিমাই কণ্ঠে মধুর তান;
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি;
চণ্ডীদাস গাহিল গান;
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য;
—তুই ত মা সেই ধন্য দেশ।
ধন্য আমরা, যদি এ শিরায়
থাকে তাঁদের রক্তলেশ।
(কোরস্)
কিসের দুঃখ ইত্যাদি।

যদিও মা তোর দিব্য আলোকে
ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ,—নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর;
আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা,
মানুষ আমরা, নহি ত মেষ।
দেবী আমার, সাধনা আমার,
স্বর্গ আমার, আমার দেশ।
(কোরস্)
কিসের দুঃখ ইত্যাদি।